TABU EKOLABYA
ISSN 0976-9463

৪১

তবুএকলব্য

কলা ও মানববিদ্যা বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

২৬ বর্ষ • ৪১ সংখ্যা • ২০২১

TABU EKALABYA

UGC Approved International Peer-Reviewed (Refereed)
Research Journal on Arts & Humanities

UGC-CARE LISTED JOURNAL, SL. NO. 16

লোকসংস্কৃতি ও লোকসাহিত্য
বিশেষ সংখ্যা

দি গৌরী কালচারাল এন্ড এডুকেশনাল অ্যাসোসিয়েশন
সমাজ-সংস্কৃতি-সাহিত্য গবেষণাকেন্দ্র

TABU EKALAVYA

UGC Approved International Peer-Reviewed (Refereed) Research
Journal on Arts & Humanities

ISSUE 26, Vol. 41 ● October - December, 2020

2nd Edn. : May 2021

ISSN : **0976-9463**

প্রথম প্রকাশ : ২৫ ডিসেম্বর, ২০২০

দ্বিতীয় প্রকাশ : ২৫ বৈশাখ/৯ মে ২০২১

TABU EKALAVYA

Chief Advisor	:	**Swami Shastrajnananda**
		Selina Hossin
		Ramkumar Mukhopadhyay
		Soma Bandyopadhyay
		Sadhan Chattopadhyay
President	:	**Biplab Majee**
Vice-President	:	**Tapan Mandal**
Executive Editor	:	**Sushil Saha**
Editor	:	**Debarati Mallik**
Joint Editor	:	**Tapas Pal**
Editor-in-Chief	:	**Dipankar Mallik**
e-mail	:	**tobuekalabya@gmail.com / tabuekalavya@gmail.com**
Website	:	**www.tabuekalabya.in**
facebook	:	**তবু একলব্য গবেষণা পত্রিকা**
গ্রুপ	:	**তবু একলব্য গবেষণা পত্রিকা**

প্রাপ্তিস্থান : দে'জ, দিয়া, দে বুক স্টোর (দীপু), পাতিরাম, ধ্যানবিন্দু, পাতাবাহার

মূল্য : ৪০০ টাকা

ISSN : **0976-9463**

তবুএকলব্য

UGC-CARE LISTED JOURNAL, SL. NO. 16

সভাপতি
বিপ্লব মাজী

সহ-সভাপতি
তপন মণ্ডল

মুখ্য উপদেষ্টা
স্বামী শাস্ত্রজ্ঞানন্দ
সেলিনা হোসেন
রামকুমার মুখোপাধ্যায়
সোমা বন্দ্যোপাধ্যায়
সাধন চট্টোপাধ্যায়

কার্যনির্বাহী সম্পাদক
সুশীল সাহা

যুগ্ম সম্পাদক
তাপস পাল

সম্পাদক
দেবারতি মল্লিক

মুখ্য সম্পাদক
দীপঙ্কর মল্লিক

কার্যকরী কমিটির সম্পাদক
মধুসূদন সাহা ও সোমালি চক্রবর্তী

আহ্বায়ক
বিদিশা সিন্‌হা, অঙ্কিতা মুখার্জী, রামকৃষ্ণ মণ্ডল

উপদেষ্টামণ্ডলী

পবিত্র সরকার, সমীর রক্ষিত, শ্রীনলিনী বেরা, অমর মিত্র, জয়া মিত্র, বাসব চৌধুরী, তপোধীর ভট্টাচার্য, রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রততী চক্রবর্তী, বারিদ বরণ ঘোষ, সত্যবতী গিরি, শ্রুতিনাথ চক্রবর্তী, অপূর্ব বন্দ্যোপাধ্যায়, সুমিতা চক্রবর্তী, বিশ্বজিৎ ঘোষ, শহীদ ইকবাল, দীপক রায়, উদয়চাঁদ দাশ, সুখেন বিশ্বাস, শুভময় মণ্ডল

সম্পাদকমণ্ডলী

সোনালি মুখার্জি, সনৎকুমার নস্কর, মুনমুন গঙ্গোপাধ্যায়, মীর রেজাউল করিম, হোসনে আরা জলি, বরেন্দু মণ্ডল, অর্জুন সেনশর্মা, শামস্ আলদীন, শ্যামশ্রী বিশ্বাস সেনগুপ্ত, সোমা ভদ্র রায়, স্বাগতা দাস মোহান্ত, আশিস রায়, মণিশঙ্কর মণ্ডল, বরুণজ্যোতি চৌধুরী, শ্যামাচরণ মণ্ডল, রাধেশ্যাম সাহা, সুব্রত ঘোষ, শকুন্তলা দাস, বিদিশা সিন্‌হা, অনিমেষ গোলদার, হৃষিতা গুপ্তবক্সী, প্রিয়ব্রত ঘোষাল, শুভঙ্কর রায়, অর্ণব সাধুখাঁ, প্রসেনজিৎ বিশ্বাস

বিষয় বিশেষজ্ঞ অধ্যাপকমণ্ডলী

গোপা দত্ত ভৌমিক, অপর্ণা রায়, বেলা দাস, রমেন কুমার সর, অরিন্দম চট্টোপাধ্যায়, অতনু শাশমল, শেখর সমাদ্দার, জ্যোৎস্না চট্টোপাধ্যায়, বিশ্বতোষ চৌধুরী, সৌরেন বন্দ্যোপাধ্যায়, বিশ্বজিৎ রায়, সুমনা দাস শূর, নন্দিনী ব্যানার্জী, সুজিতকুমার পাল

কার্যকরী কমিটি

পুষ্পেন্দু মজুমদার, দিব্যেন্দু পালধী, অস্মিতা মিত্র, দীপক কুমার ঘোষ, অরুণাভ চক্রবর্তী, বাপ্পা প্রামাণিক, ঐন্দ্রিলা চক্রবর্ত্তী, সুদীপ্তা ঘোষ, পিয়ালী দাশগুপ্ত, মিলন সিংহ, মনসা ঘাঁটা, দীপ্ত সরদার, সৈকত মাহাত, অলোকদ্যুতি নন্দী, সুস্মিতা মণ্ডল, বৈশাখী পাঠক, কাকলি মোদক, প্রিয়াঙ্কা মিত্র, নবনীতা সরকার, জ্যোতি বসাক, সুপ্রিয়া বারুই, সৃজনী মণ্ডল, স্বরূপ দত্ত

পত্রিকা কমিটির সম্মাননীয় সদস্যবৃন্দ

সোমদত্তা ঘোষ, বিপ্লব সাহা, লিপিকা বিশ্বাস, সুশান্ত মণ্ডল, সুভাষচন্দ্র দাস, শম্পা সিন্‌হা বসু, সুব্রত পুরকাইত, মমতা চক্রবর্তী, সুবীর সেন, দীপঙ্কর মণ্ডল, বিপুলকুমার মণ্ডল, সুব্রতকুমার মান্না, বুম্পা দাস, জয় দাস, অর্পিতা দাস, সন্দীপকুমার রায়, মিহিরকুমার মণ্ডল, প্রসূন মাজী, গিরিধারী মণ্ডল, তমসা দত্ত, বোধিসত্ত্ব ভট্টাচার্য, পায়েল সাহা, নবনীতা বসু, সৌরভ সামন্ত, মন্টু বিশ্বাস, সাবির মণ্ডল, সুস্মিতা বণিক, অরিন্দম সরকার, সুদীপ্ত সামন্ত, দীপাঞ্জন দে, অনিন্দিতা মুখার্জী চৌধুরী

লোকসংস্কৃতি ও লোকসাহিত্য

মুখবন্ধের অভিমুখ

লোকসংস্কৃতি ও লোকসাহিত্য : পাঠের ভূমিকা ১৩
দীপঙ্কর মল্লিক

লোকসংস্কৃতি ঠিক কোন্ সংস্কৃতি ৫৫
সৌগত চট্টোপাধ্যায়

ফিরে দেখা

বাংলার লোকউৎসব : তৃপ্তিহীন জিজ্ঞাসা ও মহান সম্বল ৫৯
তুষার চট্টোপাধ্যায়

পশ্চিমবঙ্গের লোকনৃত্যের ভূমিকা ৭১
সনৎকুমার মিত্র

বাংলার লোকধর্ম ও লৌকিক দেবতা ৮১
গোপেন্দ্র কৃষ্ণ বসু

রূপকথা চর্চায় সমস্যা ও বাংলা রূপকথার প্রাচীনত্ব ৯০
অরুণকুমার রায়

বাংলা লোকনাট্যে জীবন পাঠ ৯৯
মানিক সরকার

বাক্‌কেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতি

● **ছড়া**

'ছড়া' প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ১০৫
প্রতিম দত্ত

বাংলার লোকছড়া ১১০
অন্তরা মিত্র

'ঘুমপাড়ানি ছড়া' থেকে 'ঘুমতাড়ানী ছড়া' : বাংলা ছড়ার বিবর্তনের ইতিহাস ১২০
অলোকদ্যুতি নন্দী

● **প্রবাদ-প্রবচন**

নিম্ন অসমের ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার চর অঞ্চলে প্রচলিত প্রবাদ ১৩১
আনন্দ ঘোষ

সাগর দ্বীপের প্রচলিত প্রবাদ ১৩৭
বিনয় পাত্র

শাশুড়ি-বধূ সম্পর্কিত লোক প্রবাদ : প্রসঙ্গ বরাক উপত্যকা ১৪৩
বুবুল শর্মা

● **বারোমাস্যা**

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে বারোমাস্যা : লোকায়ত জীবন প্রসঙ্গে ১৫১
পবিত্র বিশ্বাস

● **লোককথা**

'ফর্মুলা টেল' বা সূত্রমূলক লোককথা : একটি গঠনগত সমীক্ষা ১৫৭
সুদীপ্ত চৌধুরী

লোককথা, মিথকথা ও সাহিত্যে তারকেশ্বর মন্দির-প্রতিষ্ঠা কাল নির্ণয় ১৬৪
সৌমেন মণ্ডল

মন্দির 'মিথ', লোককথা ও আঞ্চলিক সংস্কৃতি : তারকেশ্বর ১৭১
জয়দীপ ঘোষ

লোককথায় নারী : লোকজ জীবনের অন্তরঙ্গ সম্পর্ক ১৭৮
শামস আলদীন

মুর্শিদাবাদের সংগৃহীত লোককথা : বিষয়ভাবনার বৈচিত্র্য ও মূল্যায়ন ১৯০
জুনেজার ইসলাম

● **রূপকথা**

রূপকথায় চেনা মানুষদের জানা মানসিকতার খোঁজ ১৯৭
দিতিপ্রিয়া দাশগুপ্ত

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর-এর 'ক্ষীরের পুতুল'—একটি লোকায়ত রূপকথা ২০২
পিউ চক্রবর্তী

বাংলা কথাসাহিত্যে রূপকথা : নির্বাচিত ছোটোগল্প অবলম্বনে কিছু কথা ২০৯
দেবলীনা চৌধুরী

● **লোকসংগীত**

❑ **টুসু**

টুসু গান ও নারী ২১৪
মধুমিতা সরকার

❑ **ভাদু**

ভাদুগান : উদ্ভব ও বিবর্তন ২২০
অমিত মণ্ডল

❑ **গম্ভীরা**

মালদা জেলার গম্ভীরা চর্চা ২২৪
রোকেয়া পারভীন

মালদহের গম্ভীরা এবং স্বদেশি আন্দোলন ২২৯
সমিত সাহা

❑ **পটসংগীত**

বীরভূমের পটুয়া, পটশিল্প ও পটসংগীত : একটি সমীক্ষা ২৩৬
সেখ একরামুল হোসেন

❑ **কাঁদনাগীত**
'কাঁদনাগীত' প্রসঙ্গো ২৪৩
শান্তনু দলাই
❑ **মাড়োরগান**
মধ্যসুবর্ণরেখার মাড়োরগান ২৫২
লক্ষীন্দর পলোই
❑ **অন্যান্য লোকসংগীত**
বাউলসম্রাট শাহ আবদুল করিম ও তাঁর গণসংগীত ২৫৯
শৌভিক পাল
মালদা জেলার বাঙ্গাল সম্প্রদায়ের নির্বাচিত লোকগান : একটি সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ২৬৫
মহ. মহিদুর রহমান
হুদুমদেও-এর গান ও পরিবেশ ভাবনা ২৭১
গোবিন্দ্র বর্মন
উনিশ শতকে কলকাতার নাগরিক লোকসংস্কৃতিতে পল্লিগানের নাগরিক রূপায়ণ ২৭৭
সোহিনী নন্দী
মুর্শিদাবাদের অনালোচিত পূজা-গীতি : বসন বুড়ির গান ২৮৪
টুকটুকি হালদার
বাংলার অপ্রচলিত লোকসংগীত প্রসঙ্গো ২৯০
সোমা দাস মণ্ডল
● **লোকভাষা**
লোকভাষা : বিশ্বাস সংস্কার ও নিষেধাজ্ঞার আড়ালে ২৯৬
তনুশ্রী মিশ্র
ভাষা, উপভাষা ও লোকভাষা ৩০১
দীনবন্ধু কুণ্ডু
লোকভাষার ভবিষ্যৎ ৩০৭
শ্যামসুন্দর প্রধান
পূর্ব মেদিনীপুরের উপকূলবর্তী এলাকার কিছু আঞ্চলিক শব্দ বিলুপ্তির পথে ৩১৬
নীলোৎপল জানা
● **মোটিফের প্রয়োগ**
মধ্যযুগীয় শৈব-আখ্যানে মোটিফের প্রয়োগ বৈচিত্র্য ৩২৩
লিলি হালদার
অঙ্গাভঙ্গিকেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতি
● **লোকনৃত্য**
ত্রিপুরি লোকনৃত্য গড়িয়া : সুর ও তালের যুগলবন্দি ৩৩৩
অনুপম সরকার
প্রসঙ্গা বাংলার লোকনৃত্য 'ছৌ' ও বিশ্ব-পরিক্রমা ৩৪০
নীলোৎপল জানা

● **লোকনাট্য**

❑ **ছুক্‌রি**

লোকনাট্যে ছুক্‌রি : প্রসঙ্গ ব্যক্তিজীবন ৩৪৯

দেবব্রত রায়

❑ **আলকাপ**

লোকনাট্য আলকাপ : হিন্দু-মুসলমান মিলন সেতুর সেকাল-একাল ৩৫৬

শম্পা সাহা

❑ **লোকনাট্য নিয়ে**

লোকনাট্য নিয়ে দু-চার কথা ৩৬৩

বোধিসত্ত্ব ভট্টাচার্য

● **যাত্রা**

মনসাযাত্রায় পালাকারদের জনপ্রিয় সংযোজন : ভাসান পালা ৩৬৯

তনুশ্রী বিশ্বাস

সুন্দরবনের মনসার ভাসান গান : বিভিন্ন বৃত্তিজীবি মানুষের জীবনের গান ৩৭৫

দীপ্ত সরদার

হাওড়া জেলার কালিকাপাতাড়ি : নৃত্য ও নাট্যশৈলী'র এক অনুপম মেলবন্ধন ৩৮২

অংশুমান রায়

লোকায়ত জীবন ও সংস্কৃতিতে দেবী মনসার উৎস, মাহাত্ম্য এবং মনসা পালার উপস্থাপন রীতির বিবর্তন ৩৮৮

বিশ্বজিৎ দাস

বস্তুকেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতি

● **লোকপ্রযুক্তি**

সুন্দরবনের লোক প্রযুক্তি ৩৯২

উজ্জ্বল সরদার

● **লোকবাদ্য**

নৃত্য-গীতে পুরুলিয়ার লোকবাদ্য ৩৯৭

নিবেদিতা দিন্দা

লোকপেশায় লোকবাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার ৪০১

শ্রীকান্ত কর্মকার

শিল্পবস্তুকেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতি

● **তাঁতশিল্প**

বাংলার তাঁতি ও তাঁতশিল্প : ক্ষেত্রসমীক্ষাভিত্তিক একটি ভাবনা ৪০৬

বেণীমাধব দাস বৈরাগ্য

● **মৃৎশিল্প**

লোকশিল্পচর্চায় মাটির পুতুল ৪১২

শুভঙ্কর মণ্ডল

● **পাটিশিল্প**

কালের প্রেক্ষাপটে হারিয়ে যাচ্ছে পাটি শিল্প ৪১৯

নিজামুদ্দিন সেখ

অঙ্কনকেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতি

● আলপনা

বঙ্গ সংস্কৃতির অঙ্গ 'আলপনা' ৪২১
সৃজন দে সরকার

● পটশিল্প

বীরভূম জেলার পটুয়া, পটশিল্প ও পটসংগীত : সমীক্ষা ও পর্যালোচনা ৪২৯
সেখ একরামুল হোসেন

পটচিত্র : একটি সামগ্রিক পর্যালোচনা ৪৩৮
মুনমুন বন্দ্যোপাধ্যায়

● জরি শিল্প

জরি শিল্প ৪৪৪
সাক্ষীগোপাল কুণ্ডু

আচার-বিচার-প্রথা-সংস্কারকেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতি

● লোকাচার

'হাইট্টারা' লোকাচার : পালনের উপলক্ষ, রীতি ও স্বরূপ ৪৪৯
মোহাম্মদ মেহেদী উল্লাহ

●লোকসংস্কার

সুন্দরবনের বাউলে-মৌলে-জেলে জীবনকেন্দ্রিক লোকাচার ও সংস্কার ৪৫৫
শেখ রেজওয়ানুল ইসলাম

ব্রত-লোকধর্ম-লোকায়ত দেবদেবী

● ব্রত

বর্তমান নাগরিক সমাজ ও সংস্কৃতির নিরিখে বিস্মৃতপ্রায় বাংলা ব্রত : একটি সমীক্ষা ৪৬৩
লিপিকা বিশ্বাস

বাংলার ব্রত ও পার্বণ ৪৬৯
তিতলী ব্যানার্জী

পৌষ পুজো ও বার লক্ষ্মীপুজো : কৃষি সম্পর্কিত ব্রত-পার্বণ ৪৭৪
মানস মান্না

●লোকধর্ম

কর্তাভজা লোকধর্মের আলোকে সতী মায়ের ধর্মীয় বাস্তবতা ৪৭৮
দীপঙ্কর ঘোষ

● লৌকিক দেবতা

সুন্দরবনের পূজারীতি : শাস্ত্র ও লৌকিকতার দ্বন্দ্ব-সমন্বয় ৪৮৪
প্রদিতি রাউত প্রমা

লোকদেবী বনাম মা : জেন্ডার উন্নয়নে প্রায়োগিক ফোকলোরের সম্ভাবনা ৪৯০
মৌ কর্মকার

উত্তরবঙ্গের রাজবংশি সমাজের মাশান লোকদেবতা ৪৯৪
স্বপন বর্মন

উত্তর দিনাজপুর জেলার লৌকিক দেব-দেবী : বাঘাই চণ্ডীর ধাম ৫০০
মহাদেব মণ্ডল

লোকায়ত দেবী শীতলা ও শীতলাখ্যান ৫০৬
গৌতম দাস

পূজাপার্বণ-লোকউৎসব-লোকঅনুষ্ঠান

● পূজাপার্বণ

উত্তরবঙ্গের ক্ষত্রিয় রাজবংশী সমাজের পূজো-পার্বণ ৫১৪
প্রসেনজিৎ রায়

● মেলা

মালগড়িয়া অম্বুবাচীর মেলা ৫২০
তমাল পাল

মেলা : সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির মেলবন্ধনে লোকজীবনের উৎসব ৫২৩
অনিন্দিতা মুখার্জী চৌধুরী

● গাজন

লোকায়ত সংস্কৃতি চর্চায় কালুরায়ের গাজন : একটি সমীক্ষা ৫৩০
মমতা খাঁ

● লোকউৎসব

গাসি উৎসব ৫৩৫
প্রদীপ মণ্ডল

ক্রীড়াকেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতি-লোকক্রীড়া

পূর্ব মেদিনীপুরের লোকক্রীড়া : একটি ক্ষেত্র-সমীক্ষামূলক অনুসন্ধান ৫৪০
সোনালি গিরি, সুমন কল্যাণ সামন্ত, লিটন মল্লিক

বাংলার লোকসংস্কৃতিতে লোকক্রীড়ার প্রভাব ৫৪৬
মহঃ আবু নাসিম

তরাই ও ডুয়ার্স অঞ্চলের লোকক্রীড়া : একটি সমীক্ষা ৫৫৩
ড. বিপ্লব কুমার সাহা

লোকঔষধ ও লোকচিকিৎসা

ক্ষেত্রসমীক্ষার আলোকে লোকঔষধ ও চিকিৎসা ৫৬০
নীতীশ ঘোষ

লোকচিকিৎসার স্বরূপ ও পর্যালোচনা ৫৬৮
আকবর হোসেন

সাহিত্যে লোকায়ত পাঠ অনুসন্ধান

‘গণদেবতা’ উপন্যাসে লোকায়ত উৎসব-অনুষ্ঠান ৫৭২
পরিতোষ মণ্ডল

আশাপূর্ণা দেবীর ‘প্রথম প্রতিশ্রুতি’ উপন্যাসে প্রবাদ প্রয়োগের প্রাসঙ্গিকতা ৫৭৯
সুদেষ্ণা কোনার

লোকউৎসবের আলোকে ‘তিতাস একটি নদীর নাম’ ৫৮৫
প্রীতম মণ্ডল

তিতাস তীরের লোকসংস্কৃতি ও লোকজীবন ৫৮৯
নিলয় বক্সী

সুন্দরবনকেন্দ্রিক বাংলা ছোটোগল্প : লোকসংস্কৃতির অন্বেষণ ৫৯৫
প্রহ্লাদ রায়
তিন ঔপন্যাসিকের কলমে প্রান্তিক জীবন ও লোকসংস্কৃতি ৬০৩
(অভিজিৎ সেন, অনিল ঘড়াই ও নলিনী বেরা)
নুনম মুখোপাধ্যায়
বিভূতিভূষণের 'আরণ্যক' : অরণ্যলালিত লোককথা ৬১১
সৌমিলি দেবনাথ
লোকায়ত সমাজ ও সংস্কৃতি
লোকসাহিত্যে রাজবংশী সমাজ ও সংস্কৃতি ৬১৫
বহুবিস্মৃত পদচিহ্নের পদাবলী
অসীম বর্মন
মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের অঙ্গানে বারুইপুর জনপদ ৬২১
শিবানী মণ্ডল
সমাজ দর্পণে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার লোকসংস্কৃতি ৬২৭
বিশ্বজিৎ যোদ্দার
বাংলার মুসলিম সমাজ : লোক সংস্কৃতির প্রাঙ্গাণে ৬৩৬
মহম্মদ শামীম ফিরদৌস
জনজাতি জীবন ও সংস্কৃতি
ছোটনাগপুরের জীবন্ত অসুর উপজাতি ও তাদের ইতিহাস : একটি ক্ষেত্র সমীক্ষা নির্ভর পর্যালোচনা ৬৪৩
গৌরব দেবনাথ
মুণ্ডা : জীবন ও সংস্কৃতি ৬৪৮
প্রিয়াংকা মিত্র
লোকসংস্কৃতির অঙ্গানে বিরহড় জনজাতি ৬৫৭
নির্মল প্রধান
লোধা : সমাজ ও সংস্কৃতির প্রেক্ষিতে একটি পর্যালোচনা ৬৬৬
সৌমিতা মিত্র
তুলনামূলক পাঠ
বাংলা, অসমিয়া এবং বোড়ো ভাষার ছেলেভুলানো ছড়া : একটি তুলনামূলক অধ্যয়ন ৬৭১
মৌমিতা পাল
পর্ব : ১৭
➲ লোকসংস্কৃতি ও লোকসাহিত্য : নানা বর্ণে নানা রূপে
ঝুমুর পাণ্ডের উপন্যাসে নারীকেন্দ্রিক লোক-উপাদান : একটি সমীক্ষাত্মক পর্যালোচনা ৬৭৯
পাপড়ি বিশ্বাস
বাংলার পটুয়া সম্প্রদায়ের উৎস অনুসন্ধান : একটি সমীক্ষা ৬৮৭
দীপাঞ্জন দে
বাংলার ব্রতের দেবতা : বেদ-পুরানের উত্তরাধিকার ও স্বতন্ত্রতা ৬৯৪
স্বাগত ভট্টাচার্য্য

গোরক্ষাকারী বিভিন্ন দেবতা : লোকায়ত পরিবেশ জনজীবন ৬৯৯
সঞ্চিতা সাহা

সাঁওতালি জন্মসংস্কারে : লোকাচার ও লোকগীত ৭০৪
ছোটু টুডু

ঝুমুর : পরতে পরতে উন্মোচিত রসরূপ ৭০৯
অদিতি বেরা

উত্তরের রাজবংশি লোকদেবতা মাশান ৭১৪
কৃষ্ণকান্ত রায়

~~সমাজ দর্পণে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার লোকসংস্কৃতি~~ ~~৭২২~~
~~**বিশ্বজিৎ যোদ্দার**~~

'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' : লোকসংস্কৃতির এক উজ্জ্বল প্রতিভাস ৭৩১
সোমা ভদ্র রায়

লোকসংস্কৃতি ও লোকসাহিত্যকেন্দ্রিক ইংরেজি লেখা

Understanding the Nepali Teej songs : A study of woman's emancipation through music ৭৩৬
Aratrika Gunguly

Non-Medical Masks as Living Archive of Folklore Amidst the Pandemic ৭৪১
Ayantika Chakraborty

The Art of Survival : The World of the Patuas of Bengal with special reference to The Kalighat School of Painting ৭৪৬
Doyel De

(Subsection : Field Study, Folk gods) ৭৫৩
Symbiosis of Binary Cultures
Field Study on Mohajmata Temple
Kuntak Chatterjee

Mangalakavyas in Patacitra ৭৫৮
Rohini Kar

The Tradition of Jenana Mehfil : Bengali Muslim Women and their Wedding Centric Songs ৭৬৪
Jemima Nasrin

বই বিজ্ঞাপন ৭৬৯-৭৭৭

পর্ব : ১

মুখবন্ধের অভিমুখ

লোকসংস্কৃতি ও লোকসাহিত্য : পাঠের ভূমিকা

দীপঙ্কর মল্লিক

॥ আলোচনার অভিমুখ ॥

লোকসংস্কৃতি ও লোকসাহিত্যের সাধারণ পরিচয়
টাইপ ও মোটিফ ইনডেক্‌স, বাংলার ব্রত ও পার্বণ

১.

লোকসংস্কৃতি ও লোকসাহিত্যের সাধারণ পরিচয়

সমমনোভাবাপন্ন মানুষের জীবনচর্যা ও মানসচর্চার সামূহিক কৃতি হল সংস্কৃতি। সংস্কৃতি বহু মানুষকে একসূত্রে বেঁধে রাখে এবং এমন বোধে একত্রিত করে যেখানে অতি সহজেই মূল্যায়ন করা চলে একটি জাতি অন্য জাতি অপেক্ষা কতখানি স্বতন্ত্র। হারস্কোভিট্‌স মনে করেন, 'Culture is the man-made part of the environment.'[১] একই ঐতিহ্য ও আত্মবোধে লালিত সেই জাতি, যাদের জীবনধারণের মধ্যে রয়েছে 'general attitude', 'view of life' এবং 'specific manifestation of civilization' যা কিনা 'give a particular people its distinctive place in the world', তারাই নিজস্ব জাতিচরিত্রের বৈশিষ্ট্যে স্বতন্ত্র সংস্কৃতির স্রষ্টা। সংস্কৃতি প্রসঙ্গে এজন্যে 'জাতিস্বভাব', 'জাতিচরিত্র', 'আত্মবোধ'-এর গুরুত্ব নিঃসন্দেহে অনেক খানি।[২] প্রসঙ্গক্রমে ক্লাইভ ক্লাক্‌হোন-এর মন্তব্য স্মরণীয়, যেখানে তিনি বলেছেন 'to be human is to be culture.'[৩]

➲ সংস্কৃতি 'মনের কৃষি'

লোকসংস্কৃতির স্বরূপ-সন্ধানের পূর্বে 'সংস্কৃতি' নামক সভ্যতা-বৃক্ষের পুষ্পিত শাখাটিতে নানা বিরোধী বক্তব্যের বাইরে দাঁড়িয়ে খোলা চোখে দেখে নেওয়া যেতে পারে। সেই আলোচনায় প্রথমে বলে নেওয়া ভালো, সভ্যতা ও সংস্কৃতির মধ্যে গভীর সংযোগ থাকলেও এরা কোনো অর্থেই সমার্থক নয়। সভ্যতা যেখানে 'Organisation of life,' সংস্কৃতি সেখানে 'Expression of life' ইংরেজি 'Culture'-এর আভিধানিক অর্থ 'কৃষ্টি', 'সংস্কৃতি', 'সভ্যতা' কে বোঝালেও এই তিনটি শব্দের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের পছন্দ ছিল সংস্কৃতিকে। 'কৃষ্টি'র বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের অভিমত ছিল শব্দটি 'কুশ্রী' এবং তা একই সঙ্গে 'তীক্ষ্ণ কাঁটার মতো বাংলা ভাষার পায়ে বিঁধেছে।' তাছাড়া 'কৃষ্টি' শব্দটি 'ইংরেজি শব্দের পায়ের মাপে বানানো। এতটা প্রণতি ভালো লাগে না।' বরং 'সংস্কৃতি'র একটি 'Linguistic aesthetics' আছে। যেকারণে

'সংস্কৃতি' থেকে 'সাংস্কৃতিক' বেশ লাগে, কিন্তু কোনক্রমেই চলে না 'কৃষ্টি' থেকে 'ত্রৈষ্টিক'। 'কৃষ্টি'র ওপরে রবীন্দ্রনাথের বিরক্তিবোধ থাকলেও সানন্দ সমর্থন ছিল 'সংস্কৃতি' শব্দটির ওপরে।

সমাজ-দেহে বসবাসকারী ঐতিহ্যাশ্রয়ী মানুষের মার্জিত রুচি, অর্জিত জ্ঞান, রীতি-নীতি, প্রথা, নৈতিকতা—এই সবকিছু নিয়ে সংস্কৃতি। সংস্কৃতি মানুষকে একত্রিত করে, স্বতন্ত্র করে এবং জড়ত্বমুক্ত করে। আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সহজ-সুন্দর অনুধ্যানে ধরা পড়েছে সংস্কৃতির রূপ। তিনি লিখেছেন—"একাধারে সভ্যতা তরুর পুষ্প তার আভ্যন্তর প্রাণ বা মানসিক অনুপ্রেরণা যা তা হচ্ছে Culture."[৪]

বস্তুত, সংস্কৃতি হলো একটি জাতির চিন্তা-চেতনা ও মননের সামগ্রিক প্রতিফলন এবং জীবনচর্যার অখণ্ড চিত্রণ। ধর্ম, দর্শন, শিল্প, সাহিত্য, রীতি-নীতি, আচার-প্রথার সামগ্রিক প্রতিফলিত রূপ হলো সংস্কৃতি। সংস্কৃতির সত্য পরিচয় কোথায় এবং কিভাবেই বা বহমান থাকে, তার চরিত্র নির্ণয়ে লিখেছেন ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—

> বংশধারা সংক্রামিত দোষগুণের ন্যায়, রক্তকণা বাহিত শক্তি দুর্বলতার ন্যায়, সমগ্র জাতির অতীত জীবন সাধনা হইতে প্রাপ্ত এ মানস বৈশিষ্ট্য আমাদের সচেতন চিত্তের ভিত্তি রচনা করে। অন্তরের এই গোপন স্তরশায়ী প্রবণতা, ঐতিহ্য হইতে আগত মনোলোকের এই প্রচ্ছন্ন জীবনশক্তিই সংস্কৃতির সত্য পরিচয়।[৫]

'আমাদের সচেতন চিত্তের ভিত্তি' এবং 'প্রচ্ছন্ন জীবনশক্তি' যা আমাদের অস্তিত্বকে বহু যুগ-যুগান্তরের পরেও স্মরণে রাখার মতো স্পর্ধা দান করে; সেই প্রাণবন্ত 'মানস বৈশিষ্ট্য' হলো 'সংস্কৃতি'। সংস্কৃতি মানুষকে ছন্দোময় করে, মার্জিত করে। এই অর্থে 'Culture' অর্থে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'চিত্তোৎকর্ষ' শব্দটিও ব্যবহার করেন।[৬] কৃষিজমি পতিত রাখলে একসময় তা সবুজ-সন্তান ধারণে অক্ষম হয়; 'মনের কৃষি' বা 'মানব-জমিন' সংস্কার বা পরিমার্জনা ব্যতীত তা কখনই উৎকর্ষ লাভ করে না। সংস্কৃতি তাই শরীর সম্পর্কিত বিষয় ততটা নয়, যতটা মন সম্পর্কিত বিষয়। 'রাশিয়ার চিঠি'র ছয় সংখ্যক পত্রে রবীন্দ্রনাথ মনের সংস্কার সাধনকারী সংস্কৃতিকে বলেছেন 'মনের কৃষি'। সংশয়ীকালে বসে শাক্ত সাধক-কবি রামপ্রসাদ সিদ্ধান্তে এসেছিলেন এই 'মনের কৃষি' কেই 'আবাদ করলে ফল্‌তো সোনা।' আমরা জানি যে, বিরাট বিস্তৃতি নিয়ে যে সংস্কৃতি তার ত্রিমূর্তি বিভাজন লক্ষণীয়। যথা—

১. নগরসংস্কৃতি : যার স্রষ্টা নগরসভ্যতা। নগরায়ন যার মূলে।
২. লোকসংস্কৃতি : যার স্রষ্টা বৃহত্তম লোকসমাজ। 'লোক' নামে বৃহত্তর গণজীবন যার অনুপ্রেরণা।
৩. আদিমসংস্কৃতি : যার স্রষ্টা উপজাতি সমাজ।

লোকসংস্কৃতি এই নগর সংস্কৃতি ও আদিম সংস্কৃতির মধ্যবর্তী সচল ও প্রাণবন্ত সত্তা। উভয় সংস্কৃতির সংযোগ-সেতু রক্ষার দায়-দায়িত্ব তার। লোকসংস্কৃতি বিশেষজ্ঞরা লক্ষ করেছেন, স্বভাবে ও চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যে লোকসংস্কৃতি অন্তর্দেশীয় বা National, তাই এর সঙ্গে মাটির যোগ অত্যন্ত স্পষ্ট। সংস্কৃতির আপাত ত্রিবিধ বিভাজনের মধ্যে এই শাখাটি তাই এককথায় দেশজ। প্রাণের স্পন্দন এর মধ্যে প্রতি মুহূর্তে অনুভববেদ্য।

লোকসংস্কৃতি মূলত প্রাকৃত জীবনের সামগ্রিক জীবনচর্যা ও মানসচর্চার মার্জিত রূপায়ণ। লোকায়ত বিশ্বাসের প্রতিফলন ঘটে এর মধ্যে। এখানে থাকে দেশজ, লৌকিক, প্রাকৃত উপাদান। দেশজ সংস্কৃতিকে তাই এই অর্থে লোকসংস্কৃতি বলা হয়। বস্তুত মহৎ সৃষ্টির অন্তঃপ্রেরণা হলো লোকসংস্কৃতি। অভিজাত সংস্কৃতির বিপরীত মেরুবাসী এই লোকসংস্কৃতির মধ্যে লোকসমাজের ইচ্ছা-অনিচ্ছা, ভয়-ভীতি, রুচি-অরুচি, ধর্ম-সংস্কার, জীবন-অভিজ্ঞতা তথা জীবন-যাপনের বিস্তৃত বিবরণ থাকে। এদিক থেকে 'লোক' নামে চিহ্নিত বৃহত্তর জনসমষ্টির সংস্কৃতি হলো লোকসংস্কৃতি।

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, 'লোকসংস্কৃতি' হলো বহুবিস্তৃত, দিকদিগন্তপ্রসারী ও চলমান সংস্কৃতি। কৃষিজীবী ও শ্রমজীবী মানুষের অতীত ইতিহাস, বর্তমান কর্মধারা ও আগামী জীবনের সমস্ত পরিকল্পনা ও সম্ভাবনা লোকসংস্কৃতির বিস্তৃত বলয়ে নিহিত থাকে। আপাত বিচারে অভিজ্ঞানপ্রসূত ও অসঙ্গতিপূর্ণ মনে হলেও লোককথা, অলংকার বর্জিত ছড়া ও ধাঁধা, বীরত্বব্যঞ্জক আখ্যানধর্মী গীতিকা, কৃষি সম্পর্কিত লৌকিক ক্রিয়া-কর্মাদি, গ্রামীণ ও আঞ্চলিক সংস্কার ইত্যাদির মধ্যে লোকসমাজের পৃথক অথচ প্রাণচঞ্চল অস্তিত্ব অনুভব করা যায়। প্রজন্ম পরম্পরায় লোকসমাজের অন্তঃপ্রেরণা ও ঐতিহ্যানুসারে লোকসংস্কৃতি নদীর স্রোতের মতো বহমান থাকে। নিম্নবর্গ ও নিম্নবিত্তের লৌকিক জীবনাচরণে অভ্যস্ত লোকই লোকসংস্কৃতি নামক বিরাট-বিস্তৃত স্বতন্ত্রময় সংস্কৃতির স্রষ্টা। 'লোকহিত' প্রবন্ধে অত্যন্ত সহজ সূত্রে রবীন্দ্রনাথ ঘোষণা রাখেন—"চিরদিনই লোকসাহিত্য লোক আপনি সৃষ্টি করিয়া আসিয়াছে।"

এখন তাত্ত্বিক সিদ্ধান্তে জেনে নিতে হয়, এই 'লোক' কারা, কী তাদের পরিচয়, কীভাবেই বা যুগ-পরম্পরায় লোকায়ত দর্শনে বিশ্বাসী এ সব লোক প্রবহমান সংস্কৃতির জন্ম দিয়ে থাকে। এই আলোচনাকালে মিলিয়ে নিতে হয় 'লোকসমাজ' বলতে আমরা কোন্ স্বতন্ত্র জনগোষ্ঠীকে চিহ্নিত করি ইত্যাদি বিষয়গুলি। বলাবাহুল্য, আমাদের এই পর্যালোচনায় আমরা ক্ষেত্রসমীক্ষার অভিজ্ঞতাকেও মিলিয়ে নেব।

বিবাদ-বিতর্ক যাই থাকুক না কেন, লোকসংস্কৃতির দেহ ও আত্মা সন্ধানে লক্ষ করা যাবে জীবনঘনিষ্ঠতা। এই জীবনঘনিষ্ঠতা বা মৃত্তিকাসম্পৃক্ততার পরিচয় পাওয়া যায় প্রাক্-আর্য সংস্কৃতির নিজস্ব জীবনসাধনার মধ্যে। মৃত্যুর পরে স্বর্গলোকের কল্পনা এবং আত্মায় বিশ্বাস, পূর্বপুরুষের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা ও পূজা, কৃষি সম্পর্কিত লৌকিক আচার-অনুষ্ঠান, ব্রতপালন এবং নদ-নদী, পাহাড়-পর্বত, বৃক্ষপূজা এসব লোকসমাজের ধর্মীয় আচার-ব্যবহারের অন্তর্ভুক্ত।

বহু প্রাচীনকাল থেকে লিঙ্গপুজো, ঘটপুজো, চড়ক, গাজন ধর্মের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে লোকসংস্কৃতির পরিধিকে বিস্তৃতি দান করেছে। বিবাহ অনুষ্ঠানে এয়োতীদের মধ্যে পারস্পরিক সিঁদুর বিনিময়, নব পরিণীতার হাতে নোয়া পরা, শঙ্খ পরিধান করা, উলুধ্বনি দেওয়া, মাঙ্গলিক আলপনা অঙ্কন ইত্যাদি বিষয়গুলি দেশজ সংস্কৃতির পরিচায়ক।

লোকসমাজের প্রচলিত বিশ্বাসের সূত্র ধরে ঐন্দ্রজালিক প্রক্রিয়া ও তন্ত্রের ব্যবহার, 'টোটেম'-এর প্রতি অন্ধ ভক্তি-শ্রদ্ধা, ওঝার প্রতি সুগভীর বিশ্বাস, ভূত-প্রেত-জীন-পরীর প্রতি ভয়-ভীতি নিঃসন্দেহে সংস্কৃতির লৌকিক দিকের প্রমাণ হিসেবে বহন করে। আমরা দেখেছি যে, আনুষ্ঠানিক কর্মে ব্যবহৃত ঘট, সরা, মালসা, কলাগাছ, সুপারি, পান, ধান, দূর্বা, শিসযুক্ত

নারকেল, আম্রপল্লব, গোময় ইত্যাদি প্রাক্-আর্য নিয়মনিষ্ঠা, পূজা-পার্বণের রীতি থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত হয়েছে।

ষষ্ঠীপুজো, শীতলাপুজো, চণ্ডীপুজো, ধর্মঠাকুরের কাছে মানত, শুভ-অশুভ বিচার, অরন্ধন, অম্বুবাচী কিংবা ধ্বজাপূজা এ সবই অনার্য জাতির কাছ থেকে গৃহীত। খাদ্যাখাদ্য বিচার, বাঙালির লৌকিকজীবনে জ্যোতিষীর বিচার, পাত্র-পাত্রী নির্বাচনে গ্রহ-তিথি-বার-গণ বিচার, শাস্ত্রবহির্ভূত স্ত্রী-আচার পালন, কালরাত্রি পালন, ছাদনাতলায় পালিত অনুষ্ঠানসমূহ লৌকিক সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত। লৌকিকজীবনের সামূহিক কৃতি ঐতিহ্য পরম্পরায় স্থানান্তরিত হয়।

➲ লোকসংস্কৃতি ও অভিজাত সংস্কৃতির পার্থক্য

যতই আর্যরা তাদের সংস্কৃতির গর্ব করুন না কেন, এদেশে অনার্যদের কাছ থেকেই তারা সব থেকে বেশি গ্রহণ করেছেন। লৌকিক জীবনচর্চার নানা প্রয়োগমূলক দিক প্রাচীন জনজাতি সমাজ থেকে প্রাপ্ত এবং স্বীকার্য যে, প্রাচীন বাংলার জনজাতি ছাড়াও মাঝি, মাল্লার, হাড়ি, ডোম, বাগদি প্রভৃতি নিম্নবর্গের লোকজীবনের সংস্পর্শে এসে আর্য সংস্কৃতির উত্তরাধিকারীরা বহু তথ্য লাভ করেছেন।

লোকসমাজের প্রাত্যহিক দিন চর্চায়, তাদের আচার-অনুষ্ঠানে, জীবন-যাপনে, উৎসব-অনুষ্ঠানে গোষ্ঠীর যে আনুগত্য, আঞ্চলিকতা বোধ, নিজস্ব বিশ্বাসের জগৎ থাকে সেগুলি অভিজাত সংস্কৃতির মধ্যে একেবারেই অনুপস্থিত। বাংলার আদিম অধিবাসিরা ছিলেন অস্ট্রিকভাষীর মানুষ। নৃতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে এঁরা প্রাক্-দ্রাবিড় শ্রেণিভুক্ত। প্রাচীন সাহিত্যে এঁরা চিহ্নিত হয়েছিলেন 'নিষাদ' রূপে। সাঁওতাল, মুন্ডা, লোধা প্রভৃতি জনজাতির মানুষ 'বেদ' গ্রন্থে চিহ্নিত হয়েছিলেন অসুর রূপে। এরা কৌমভিত্তিক জীবনযাপন করতেন এবং নানা 'টোটেম' ও 'ট্যাবু'তে বিশ্বাস করতেন। বাঙালি ধর্মীয় সাধনা ও লৌকিক জীবনের প্রচলিত আচার-বিচারের অনেকটাই এদের থেকে পাওয়া। বাংলা সংস্কৃতির মূল উৎস সন্ধানে এগিয়ে গেলে দেখা যায়, লৌকিক ধর্ম ও জীবনচর্যার সবটুকু আমরা প্রাগার্য মানুষের থেকে পাওয়া গিয়েছে। লৌকিক দেবতার থানে 'হত্যে' দেওয়া বা 'মানত' করার বিষয়টি অভিজাত সংস্কৃতির মানুষজন ভাবতেই পারে না; বৃক্ষের সঙ্গে লোকায়ত মানুষের গভীর সংযোগ রয়েছে। অশ্বত্থ, বট, কলা, দূর্বা, তুলসী, বেল, সিজ, ধান—এগুলি শুধুমাত্র কাজের গাছ নয়, বৃহৎবঙ্গ এসব বৃক্ষের মধ্যে দেখেছে দেবতার নানা খেলা। বিশেষ করে ব্রতের সঙ্গে সম্পৃক্ত পার্বণে বৃক্ষের একটি ব্যাপক ভূমিকা আছে।

নগরসংস্কৃতি লোকঐতিহ্যকে মান্যতা দেয় না। লোকঐতিহ্যের বহমান ধারা তাদের কাছে নিতান্তই অজ্ঞানতাপ্রসূত নিরক্ষর মানুষের চিন্তা-চেতনার পরিচয় বহন করে। লোকসাহিত্য মূলত অনগ্রসর কৃষিনির্ভর পল্লিমানুষের নিজস্ব লোকপ্রজ্ঞা। 'প্রজ্ঞা' অর্থে জ্ঞান নির্দেশিত হলে এক্ষেত্রে নগর সংস্কৃতি শুধুমাত্র জ্ঞানচর্চার পীঠস্থান, অন্যদিকে আদিমসংস্কৃতি এবং লোকসংস্কৃতি কৃষিকেন্দ্রিক ও পল্লিজীবন নির্ভর ঐতিহ্যের সহজাত ফসল। তাই এখানে ব্যক্তি প্রতিভা অপেক্ষা গোষ্ঠীর সামগ্রিক জীবনচর্যা তথা প্রযত্নহীন সংস্কৃতির নান্দনিক কৃতির প্রকাশ ঘটে; তবে তা একেবাই শৌখিনতাবর্জিত, প্রযত্ন নিরপেক্ষ ও অধিকাংশ ক্ষেত্রে লোকায়ত সমাজের ঐতিহ্য পরম্পরায় বাহিত শ্রুতিনির্ভর সাহিত্য। তাই লোকসাহিত্যচর্চার বিষয়

একেবারেই মৃত্তিকা ঘনিষ্ঠ বলেই লোকায়ত মানুষের সঙ্গে তার 'ভিতরকার একটি যোগ আছে।' বাংলার লোকসংস্কৃতি ও অভিজাত সংস্কৃতির মধ্যে পার্থক্যের জায়গাটি বেশ স্পষ্ট। কৃষিনির্ভর গ্রামীণ সমাজ অনেকাংশেই প্রাচীন জীবন-যাপন ও ঐতিহ্যকে আঁকড়ে বেঁচে থাকেন। কামার-কুমোর-তাঁতি-মাঝি ইত্যাদি বিচিত্র জীবিকার মানুষেরা প্রতিমুহূর্তে আঞ্চলিক বা স্থানীয় ধর্ম-অনুষ্ঠান বিশ্বাস-সংস্কারের মধ্যে আবদ্ধ থাকেন। ফলে উভয় সংস্কৃতির পার্থক্য নির্ণয়ে বলা যায়—

১.

নগরজীবনের অভ্যস্ত মানুষ যে সংস্কৃতিকে লালন করেন সেই সংস্কৃতি একেবারেই মার্জিত ও সূক্ষ্ম মননের পরিচয় বহন করে। সেই সংস্কৃতির সঙ্গে প্রযুক্তিবিজ্ঞানের এবং বিশ্বায়নের সম্পর্ক ওতোপ্রতোভাবে যুক্ত। অন্যদিকে লোকসংস্কৃতির যারা ধারক ও বাহক তাদের নান্দনিক বোধ-বুদ্ধি লোকায়ত শিল্প নির্ভর। এখানে আন্তরিকতার অভাব নেই কিন্তু আভিজাত্যের অভাব রয়েছে। অবশ্য এই পার্থক্যটুকু আছে বলেই পুঁজিনির্ভর ইন্ডাস্ট্রিয়াল কালচারের সঙ্গে লোকসংস্কৃতির ব্যবধান বুঝে নেওয়া যায়।

২.

বহুজাতিক সংস্থাগুলি নগর সংস্কৃতিকে প্রভাবিত করায় সেখানে জীবনের মানোন্নয়ন অতিদ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে। অবশ্য এর কুফলও আছে—পুঁজিবাদী সভ্যতা প্রতিমুহূর্তে চায় সামাজিক সংঘবদ্ধতা থেকে মানুষকে বিযুক্ত করতে। ফলে শহরকেন্দ্রিক সংস্কৃতি অগণিত মানুষের থেকে নির্বাসিত হয়ে ব্যবচ্ছিন্ন ব-দ্বীপের মতো পড়ে রয়েছে। অন্যদিকে লোকসংস্কৃতি বিশেষ কোনো অঞ্চলের ভূগোল ভেঙে আরও বহুদূর প্রসারিত করেছে তাদের জীবনের সঙ্গে যুক্ত ঐতিহ্যের জ্ঞানপ্রতিমাকে।

৩.

নগরকেন্দ্রিক জীবন মূলত উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্তকে অবলম্বন করে গঠিত হয়। ফলে সেখানে উঁচু মাপের কবি-শিল্পী ও বুদ্ধিজীবিদের জ্ঞানচর্চার চলাফেলা লক্ষণীয়; অন্যদিকে পল্লিকেন্দ্রিক নিম্নবিত্তের জীবন ও সংস্কৃতির মধ্যে রয়েছে ব্রত-পাঁচালি-কথকতাকেন্দ্রিক অসংখ্য রূপ-রূপান্তরের ছবি।

৪.

শহুরে সংস্কৃতি পুঁজিনির্ভর হওয়ায় সেখানে বৈদ্যুতিন চ্যানেলের দৌরাত্ম্যে আমাদের মূল সংস্কৃতির ঐতিহ্য বিলুপ্তপ্রায় হতে চলেছে। দর্শক-শ্রোতাদের চাহিদার উপযোগী সিরিয়াল আমাদের চেতনার ঝুঁটি ধরে টান দেওয়ায় আমরা শৌখিন বিলাসী বানানো সংস্কৃতিতে অভ্যস্ত। নগর সংস্কৃতি শীততাপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষে যে পরিশীলিত চোখ ধাঁধানো প্রোগ্রাম উপস্থাপন করে তার সঙ্গে কোনো মিল নেই বাউল, ভাটিয়ালি, বৈষ্ণব গানের। নগর জীবন তো এখন ভুলেই গিয়েছে লোকগীতি, ছড়া, লোকনৃত্য, ভাটিয়ালি, বৈষ্ণব গানের।

> নগর জীবন তো এখন ভুলেই গিয়েছে লোকগীতি, ছড়া, লোকনৃত্য কিংবা চণ্ডীমণ্ডপবেষ্টিত সংস্কৃতি। শুধু 'বারোয়ারি' শব্দটি শারদীয়া এলে মনে পড়ে, অন্য সময় লালনরা চর্চিত হন অধ্যাপকদের টেবিলে কিংবা বুদ্ধিজীবিদের রোববারের আড্ডায়।
>
> ৫.
>
> কথকতা, রূপকথা, পুরাণাশ্রয়ী পাঁচালি, মহিলা মহলে সুর করে ব্রত পাঠ, রয়ান গান, নীলের গান—এসব এখনও বিলুপ্ত প্রায়। কৃষ্ণযাত্রা, কবিগান, তরজা এখন বিস্মৃত অধ্যায়ের মতো। ছৌ, মুর্শিদা, আলকাফ, বোলান—এসব নৃত্য-নাট্য-গীতাদি শহরের কোনো হল ভাড়া করে শৌখিন কিছু মানুষ দেখেন ঠিকই; কিন্তু পরবর্তী জেনারেশন এই মূল মাটির সংস্কৃতিকে ভুলে যাবে। যেমন তারা ভুলেছেন পটের গান কিংবা উৎসবের নিত্য প্রযোজনে যুক্ত আলপনা প্রদানের বিষয়। এসব সংস্কৃতি এখন 'বাবু কালচার' গ্রহণ না করলেও বঙ্গসংস্কৃতির এই শিকড়কে অস্বীকার করা যাবে না।

অবশ্য শহুরে অভিজাত সংস্কৃতি এত দ্রুত গ্রামীণ জীবনে পৌঁছে যাচ্ছে যে, লোকসংস্কৃতির মূল শিকড়ের গায়ে এসব নাগরিক সংস্কৃতি প্রচুর শৌখিন গুচ্ছমূল জড়ো হয়েছে। বিশ্বায়নের মার্কেটিং ব্যবস্থা গ্রামবাংলাকেও আমূল বদলে দিচ্ছে। ফলে লোকসংস্কৃতির মূল ঐতিহ্য নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা থেকে গিয়েছে। তবে আশার কথা এই যে, লোকসংস্কৃতি বিবর্তনশীল। ফলে তার বিবর্তন ও নবরূপায়ণকে স্বাগত জানাতে হবে।

➲ লোকসংস্কৃতির 'লোক'—'ব্রাত্য' ও 'মন্ত্রহীন'

যে দেশে মানবপ্রেম একমাত্র স্বীকৃত প্রেম, ভক্তি যেখানে তদ্‌গত চিত্ত এবং দেবতার আধিপত্য হাটে-বাজারে-মাঠে-ময়দানে সর্বত্র; সেই অধ্যাত্মবাদী দেশ ভারতবর্ষে মানুষের প্রতি মানুষের ঘৃণা, উপেক্ষা নিষ্পেষণ হতবাক করে। অথচ শুনতে খারাপ লাগলেও অমোঘ সত্য এই ভারতবর্ষ শুধু ভদ্রলোকের নয়। যে ভদ্রলোকেরা নিজেদের সুবিধার জন্যে লোকসাহিত্য সৃষ্টির অনর্থক অনিচ্ছাকৃত শ্রম ব্যয় করেন, তাদের প্রতি কটাক্ষ করে বলেছিলেন রবীন্দ্রনাথ "যদি নিজেদের হৃদয়ের দিকে তাকাই তবে একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, ভারতবর্ষকে আমরা ভদ্রলোকের ভারতবর্ষ বলিয়াই জানি।" 'ভদ্রলোকের ভারতবর্ষে' অবশ্য রবীন্দ্রনাথের হৃদয়ের সমর্থন ছিল না। তাই নিজের আত্মপরিচয়ে তিনি ব্রাত্য, মন্ত্রবর্জিতদের সঙ্গে একাত্মতার কথা জানান—

আমি ব্রাত্য, আমি মন্ত্রহীন,
দেবতার বন্দীশালায়
আমার নৈবেদ্য পৌঁছল না।

এই ব্রাত্যদের কথা রবীন্দ্রনাথ 'গীতাঞ্জলি'র 'হে মোর চিত্ত পুণ্য তীর্থে' (মাতৃ অভিষেক), 'যেথায় থাকে সবার অধম দীনের হতে দীন' (প্রণতি), 'হে মোর দুর্ভাগা দেশ, যাদের করেছ অপমান' (অপমান)—এই তিনটি কবিতায় বলেছেন। স্বামী বিবেকানন্দ লক্ষ

করেছিলেন, এই তথাকথিত ব্রাত্যরাই ভারতীয় সভ্যতার মূল স্তম্ভ। স্বামী জিতাত্মানন্দ যথার্থেই বলেছেন, 'বিরাট মানবতা বোধের প্রেরণায় বিবেকানন্দই প্রথম ইতিহাসের অবহেলিত অনাদৃত এই শূদ্র সমাজকে আহ্বান করেছিলেন নতুন শক্তিতে জাগাবার জন্য—'নতুন ভারত বেরুক'।[৭] স্বামীজীর প্রত্যাশিত 'নতুন ভারত' শুধুমাত্র শিষ্ট-মার্জিত সংস্কৃতির একাধিপত্য বিস্তারের জায়গা নয়; বরং এই ভারতবর্ষ নিঃসন্দেহে কর্মে ও ঘর্মে সিক্ত লোকায়ত সংস্কৃতির ভারতবর্ষ। লোকসাধারণ প্রকৃত অর্থে এই ভারতবর্ষের চালিকা শক্তি। এই লোকসাধারণ বা লোক গ্রামে, শহরতলীতে এমনকি শহরেও থাকতে পারে। কিন্তু নিজেদের প্রথা, বিশ্বাস, সংস্কার, ঐতিহ্য, ধর্মের সম্পর্কে তারা স্থান-কালের সীমারেখা টপকে যায়। শুধু তাই নয়, এই বৃহত্তর জনগোষ্ঠী কৌমভিত্তিক মানসিকতার পরিচয় দেয়। ক্ষেত্রসমীক্ষায় দেখা গিয়েছে কলকাতার অনতিদূরে শহরতলী হৃদয়পুরের শিবতলার সঙ্গে প্রায় সমসাদৃশ্য রয়েছে গাইঘাটা থানার রামপুর, সেয়না, মণ্ডলপাড়ায় অনুষ্ঠিত চড়কের।[৮] এর কারণ সম্ভবত এই যে, সমমনোভাবাপন্ন লোকসাধারণ যে ভৌগোলিক দূরত্বে থাকুক না কেন, গোষ্ঠীচেতনায় তারা এক। অর্থাৎ, 'লোক' নামে চিহ্নিত সমাজদেহের বৃহত্তম অংশ ধর্ম-কর্ম-বিশ্বাসে সমমনোভাবাপন্ন এবং তারা সমষ্টিগত জীবনচর্যায় অভ্যস্ত। লোক বা 'Folk'-এর পরিচয় নির্দেশে 'Encyclopaedia Britanica'-তে বলা হয়েছে—

> It is narrowed down to include only those who are mainly out side the currents of urban culture and systematic education, the un-lettered or little lettered in havitants of village or countryside.[৯]

বহুত্ববোধক 'লোক' শব্দটির ইংরেজি করলে যে 'Folk' বোঝায় তার কাছাকাছি আরও তিনটি শব্দ হলো 'People', 'nation' এবং 'race'[১০]। প্রত্যেকটি শব্দ 'সমগ্র', 'বৃহৎ', 'সমষ্টি' ইত্যাদি অর্থে প্রযুক্ত। বৃহত্তর জনসমষ্টি যারা নাগরিক সভ্যতার থেকে দূরে মূলত কৃষি সভ্যতার সঙ্গে একাত্ম তারাই 'লোক'। আরও প্রসারী দৃষ্টিতে বলা চলে, যারা চাকুরিজীবী নয়, আর্থিকভাবে সম্পন্ন নয়, শহুরে জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত নয়, শিক্ষার আলোকশিখায় বর্ণোজ্জ্বল নয় তারাই হলো 'লোক'। 'লোক' কারা তার একাধিক প্রচলিত সংজ্ঞার তিনটি এমন—

i. Folk, a group of associated people; a primitive kind of post-tribal social organization; the lower classes or common people of an area.[(১১)]
ii. Folk in ethnology the common people who share a basic store of old tradition.[(১২)]
iii. Folk would be any group of people who share at least on common factor (for example common ocupation, religion or ethnicity.)[১৩]

কর্ম ও ধর্মসূত্রে যারা এক, জীবনযাত্রার মান ও জীবিকা বিষয়ে প্রায় কাছাকাছি এবং ভাষা, বাসস্থান, পোশাক-পরিচ্ছেদ, আচরণগত দিক থেকে সমদৃষ্টিসম্পন্ন তারাই হলেন 'Folk' বা 'লোক'। এই 'লোক' মূলত অনগ্রসর জনসমাজ, কিন্তু তারা ঐতিহ্যবাহী। ড. তুষার চট্টোপাধ্যায় 'ফোক' বা 'লোক' সম্পর্কে লিখেছেন—

> সাধারণত 'ফোক' বা 'লোক' বলতে সেই বিশিষ্ট মানুষকে বোঝায় যারা কৃষিভিত্তিক পল্লি সমাজের অনগ্রসর মানুষ এবং প্রাচীন ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক। আধুনিক

> লোকসংস্কৃতি বিজ্ঞানে 'ফোক' শব্দটি বিশিষ্ট জনগোষ্ঠী বোঝাতে ব্যবহৃত হয়, যারা ভৌগোলিক, প্রাকৃতিক এবং নৃ-জনজাতিগত বা ভাষা, পেশা ও জীবন-জীবিকাগত সমন্বয়ের সূত্রে গঠিত। সমচেতনা ও জীবনযাপন অন্বিত এবং সম ঐতিহ্যের বন্ধনে আবদ্ধ সংহত সমাজের মানুষই 'ফোক' বা 'লোক'।[১৪]

শহরে বাস করে নাগরিক জীবন যাপনে অভ্যস্ত হয়ে যারা লোকনৃত্য, লোকনাট্য, লোকগান পরিবেশন করেন তারা কিন্তু 'লোক' বা 'ফোক' নন। 'ফোক'কে তারা ব্যবহার করেন জীবিকার স্বার্থে। আবার পল্লি অঞ্চলে আর্থিকভাবে সম্পন্ন বিত্তবান শিক্ষিত মানুষও 'ফোক' নন। শহরে বাস করেও যারা জীবনচর্চা ও মানসচর্চায় পল্লির শিকড়টি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়নি, বিশ্বায়নের যুগেও যারা ঐতিহ্যবিমুখ হননি, বরং ভীষণভাবে ঐতিহ্যমুখী, তারা 'ফোক' এর অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং শহরে বাস করলে কেউ 'লোক' নন, গ্রামে বাস করলেই তিনি লোক, এমন ভৌগোলিক মানচিত্রের বৃত্তে 'লোক'-এর মানদণ্ড বিচার্য নয়। আমরা অন্তত 'ফোক' বা 'লোক'-এর দশ-দিগন্তের সন্ধান দিতে পারি, যারা এই বৃত্তের মধ্যে পড়লে 'ফোক' রূপে বিবেচিত হবেন। যেমন—

১. মূলত সংঘবদ্ধ এবং বিশেষভাবে চিহ্নিত জনগোষ্ঠী (Particular class or group) হল 'ফোক' বা লোক'। এরা বিশেষ ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে অবস্থান করে অন্য জনসমাজ থেকে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য প্রমাণিত করে। আঞ্চলিক পরিবেশ প্রসূত চিন্তা-চেতনা, লোক-লৌকিকতা, জীবিকা-পদ্ধতিতে এরা মূলত এক।

২. ভূমিজীবী ও শ্রমজীবী মানুষ এই সংহত জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। এরা সরল বিশ্বাসী। অবৈদিক ধর্মাচরণে আগ্রহী। প্রাত্যহিক চলমান জীবন-সংগ্রামে কঠোর এবং স্বভাবতই এরা শৌখিনতা-বর্জিত।

৩. লোকসমাজের 'লোক'-এর বৃহত্তর অংশ নগরজীবন থেকে বহু দূরে নিভৃত পল্লি অঞ্চলে, কর্মসূত্রে কলকার-খানার কাছাকাছি শহরতলিতে বাস করে। জাত-পাত, ধর্ম-অধর্ম, ছুৎমার্গ, তিথি-নক্ষত্র, দিন-ক্ষণ-মাস, গোত্র-বর্ণ, সমাজ-সংস্কার, স্ত্রীআচার-প্রথা, ন্যায়-অন্যায় বোধ নিয়ে বাদ-প্রতিবাদে মুখর থাকে।

৪. এরা সম ঐতিহ্যে বিশ্বাসী এবং এই ঐতিহ্য দীর্ঘকাল ধরে ব্যক্তি পরিচয়বিহীনভাবে সমষ্টিচেতনার পরিচয়বাহী। বাংলা শিল্প ও সাহিত্যের আদি উৎস ব্রতশিল্প ও ব্রতকথা এদের ধর্মসাধনার অঙ্গ।

৫. শিক্ষার আলোকশিক্ষা থেকে দূরস্থিত ও স্বাক্ষরতা অভিযানের প্রচেষ্টায়

কোনোরকম প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষিত এবং আর্থিকভাবে স্বাচ্ছন্দ্য-বঞ্চিত। শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা কোন সময় যারা নিশ্চিন্ত মনে ঘরে বসে থাকার সৌভাগ্য অর্জনে ব্যর্থ।

৬.

সহৃদয় ও প্রাণবন্ত হলেও একালের মার্জিত নাগরিক রুচির দৃষ্টিতে যারা পুরাতন, সেকেলে এবং নিতান্তই লোকায়ত, তারাই হলো 'লোক'। প্রাক্-আর্য সংস্কৃতির ওপর ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রভাববিস্তার সত্ত্বেও যাদের নিজস্ব নৃত্য-গীত, শিল্প-সংস্কৃতি বেশ পুষ্ট ও ঐতিহ্যবাহী, তারা চিহ্নিত হয় 'লোক' নামে।

৭.

'লোক' বলতে বোঝায়, আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যা ও বিজ্ঞানের অসম্ভব গতির সঙ্গে যাদের পরিচয় ঘটেনি এবং এখনও স্থিতিশীলতায় যারা মন্থর। জীবনযাপনে নিতান্তই সাদাসিধে। লোকায়ত লোকধর্মে যাদের বুদ্ধি-বিবেক-বোধ পরিচালিত। তুকতাক, ঝাড়-ফুঁক, মন্ত্র-তন্ত্র-বশীকরণ, কবচ-মাদুলীতে যারা কল্যাণের পথ খোঁজে।

৮.

নিজেদের বিশ্বাসের জগৎ ও নীতি-নৈতিকতায় এরা একত্রিত। গোষ্ঠীগত ঐতিহ্যে বিশ্বাসী। কর্মসূত্রে স্থানান্তরিত হলেও এরা মূলত ঐতিহ্যে শ্রদ্ধাশীল।

৯.

প্রথাগত আচার-অনুষ্ঠানে অভ্যস্ত। অসংখ্য গ্রামদেবতা, প্রকৃতি-দেবতা, ভূত-প্রেত-ডাইনি-দৈত্য সম্পর্কে কৌতূহলী।

১০.

জীবন-যাপন, পোশাক-পরিচ্ছদ, খাদ্য-বাসস্থান, কথাবার্তা, ভাষা চয়ন, বিশ্বাস-সংস্কার, ঔষধপত্র, নান্দনিক অভিব্যক্তিতে যারা স্বতন্ত্র; তারাই হলো 'লোক'।

এভাবে আরও একাধিক বৈশিষ্ট্যে চিহ্নিত হতে পারে রাষ্ট্র ও সমাজের গরিষ্ঠ অংশ 'লোক' বা 'Folk'। আর সমাজ জীবনের এই বৃহত্তম অংশ 'লোক' যে-সমাজে বাস করে সেই বিশেষ ভৌগোলিক অঞ্চলের চিহ্নিত মানুষজনেরাই 'লোকসমাজ'।

➲ লোকসংস্কৃতি ঐতিহাসিক বস্তুবাদী দৃষ্টিকোণে

বিশেষভাবে কোনো চিহ্নিত ভৌগোলিক অঞ্চলে দীর্ঘদিন ধরে সমজাতি-সম্প্রদায়-বর্ণের মানুষ বসবাস করলে এবং সমপ্রাণতার মাধ্যম হিসেবে একই ভাষা, ধর্ম, আচার-আচরণ, ঐতিহ্যে বিশ্বাসী হয়ে উঠলে সেই ঐক্যবদ্ধ সমাজকে 'লোকসমাজ' বলা হয়। এই লোকসমাজকে তার নিজস্ব প্রাণধর্মে ও স্বভাবগত স্বকীয়তায় চিনে নেওয়া যায়। নিজস্ব জীবনপ্রণালী, ধ্যান-ধারণা, আর্থিক অবস্থা, শিক্ষা-দীক্ষা, রাজনৈতিক অবস্থান ইত্যাদি দিক থেকে

লোকসমাজের নিজস্বতা রয়েছে। উচ্চবিত্ত ও উচ্চবর্ণের মার্জিত সমাজ ও আদিম সমাজের সংযোগ সেতু হল লোকসমাজ। সুতরাং এদিক থেকে 'আদিম স্তর থেকে উন্নত এবং সংহত জীবন যাত্রার প্রণালিবদ্ধ রূপকে বলে লোকসমাজ।'[১৫]

লোকসমাজ সংহত। বরাবরই স্বতন্ত্র। তারা যূথবদ্ধ। গোষ্ঠীর আনুগত্যে চলা এই লোকসমাজ অনেক ক্ষেত্রেই অনমনীয় এবং কোথাও চূড়ান্ত রক্ষণশীল। শিক্ষার অরুণোদ্ভাস সম্বলিত সর্ববিস্তারী আলো সেখানে বর্ষণ না করায় সংস্কারের চোরাবালিতে নিমজ্জিত হওয়ার সম্ভাবনা থেকেই যায়। আবার একটি বৃহত্তর অঞ্চলে পৃথক পৃথক লোকসমাজ স্বতন্ত্র বৃত্ত রচনা করলে অনেক সময় ভ্রম হয়, এই ভিন্ন অথচ নিজস্ব ছন্দে চলা লোকসমাজ অন্য অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত কিনা।

ক্ষেত্রসমীক্ষায় দেখা গিয়েছে উত্তর চব্বিশ পরগণার স্বরূপনগর থানার অন্তর্গত চারঘাট গ্রামে রাজবংশী ও পৌণ্ড্রক্ষত্রীয়রা একত্রে বাস করছে; অথচ জীবনযাপনের পদ্ধতিতে অদ্ভুতভাবে পৃথক এবং স্বতন্ত্র। এ থেকে অনুমেয় যে, একই বৃত্তের মধ্যে থেকেও একের অধিক স্বতন্ত্র জীবনাচরণে অভ্যস্ত লোকসমাজ থাকতে পারে। এমনকি লোকমানসের পার্থক্য হেতু কখনও স্পষ্ট বিভাজন রেখাও লক্ষ করা যায়। যেমন, সাক্ষাৎকারে পূর্বে উল্লেখিত চারঘাটের রাজবংশীরা পাগলা বাবা বা শিবের ভক্ত। তারা মহাসমারোহে চৈত্র সংক্রান্তিতে চড়ক করে। মেলাও করে। তাদের বিশ্বাস—এর ফলে চাষবাস ভালো ও আর্থিক সমৃদ্ধি রক্ষিত হবে।[১৬]

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখেছি, পৌণ্ড্রক্ষত্রীয়রা শিব নন, শিবকন্যা মনসাকে পুজো করেন। তাদের বিশ্বাস এর ফলে মনসার কোপ থেকে গ্রাম রক্ষা পাবে। ঝড়-বৃষ্টি থেকে মুক্ত থাকা যাবে।[১৭] এভাবে একই ভূখণ্ডের মধ্যে লোকসমাজের ভিন্ন অথচ স্বতন্ত্র চিহ্নিত একের অধিক শ্রেণিবিন্যাস গড়ে ওঠা আশ্চর্যের নয়। স্বতন্ত্র এই শ্রেণীবিন্যাস সচল, প্রাণবন্ত ও নিজস্ব ঐতিহ্য অনুসারী। এভাবে আচার-অনুষ্ঠান, বিশ্বাস-সংস্কার, উৎসব, পূজা-পার্বণ, চিন্তা ও মননের সুস্পষ্ট প্রতিফলনে গড়ে ওঠে স্বতন্ত্র-বৈশিষ্ট্য সমুজ্জ্বল এক-একটি লোকসমাজ। আর এই লোকসমাজ যেহেতু নাগরিক সমাজ ও আদিম সমাজের মধ্যবর্তী স্বতন্ত্র সমাজ তাই এর মধ্যে চলমানতার সুর অনেক বেশি। লোকসংস্কৃতি গবেষকের মনে হয়েছে—"A folk society as opposed to a primitive tribe on the one hand and modern civilization on the other."[১৮]

নাগরিকতার সামুদ্রিক ঝোড়ো ঢেউ লোকসমাজের উচ্ছল প্রাণের তটে অনেক সময় আছড়ে পড়ে ঠিকই; তথাপি সুখের কথা এখনও লোকসমাজকে এক ঝলকেই চিনে নেওয়া যায়। খুঁজে নেওয়া যায় 'লোক' ও তার 'সমাজ' অর্থাৎ 'লোকসমাজ' এবং 'লোক' ও তার 'সংস্কৃতি' অর্থাৎ 'লোকসংস্কৃতি'কে।

সমকালীন রাজনীতি-ধর্ম-সমাজ-সংস্কৃতির প্রভাবে লোকসমাজ পরিবর্তিত হয়। তবু এই সমাজ যেহেতু ব্যক্তিকেন্দ্রিক নয়, সেহেতু গোষ্ঠীর প্রভাব এখানে অবধারিত সত্য। ফলে লোকসমাজের মধ্যে জাতি-চরিত্র এবং দেশ-কালের প্রভাব অনস্বীকার্য। ঐতিহাসিক বস্তুবাদীরা ভাবের ঘোরে বিশ্বাস করেন না। এঁরা কাল সম্পর্কে সতর্ক বলেই একটি জাতির ক্রমবিকাশে ইতিহাসকে নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করেন। অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সঙ্গে কার্য-কারণের পারস্পরিক সম্পর্ক রয়েছে বলে অতীতের উপর নির্ভর করে বর্তমানকে তাঁরা বিচার করেন।

সাহিত্যের বিচার তাই এক ঐতিহাসিক বীক্ষা, কেননা 'সাহিত্যমাত্রই একটি ঐতিহাসিক শিল্প'।

বিমলকুমার মুখোপাধ্যায় 'ঐতিহাসিক' শব্দে ঐতিহ্যের সঙ্গে সাহিত্যের নিবিড় যোগ দেখেছেন এবং সে সম্পর্কে আলোচনা করেছেন 'সাহিত্য বিচার: তত্ত্ব ও প্রয়োগ' নামাঙ্কিত গ্রন্থে। লোকসমাজ ঐতিহ্য পরম্পরায় যে সৃজনশীল প্রজ্ঞার পরিচয় দিয়েছে তার মধ্যে আর্থ-সমাজ বীক্ষার অলিখিত বহু উপাদান পাওয়া যায়। এগুলি কল্পনা নির্ভর নয়, বরং লোকায়ত জনজীবন বিশ্লেষণে অপরিহার্য অঙ্গ। কীভাবে সমাজ-রাজনীতির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে লোকসমাজের পরিবর্তন হয় সে বিশ্লেষণে ঐতিহাসিক বস্তুবাদী গবেষকেরা লোকসমাজের সামগ্রিক কৃতিকে সবিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন।

⊃ লোকসংস্কৃতি—তত্ত্বগত পরিসর

এক অর্থে 'লোক'-এর 'সংস্কৃতি' হলো 'লোকসংস্কৃতি'। যে 'লোর'-এর বুৎপত্তি ও তাৎপর্য নির্ণয়ে হাজারতর বিতর্ক, প্রশ্ন ও পরিপ্রশ্ন সেই বিতর্কের রায়ে সহৃদয় পাঠক কিন্তু অন্যান্য বিকল্প অর্থকে স্মরণে রেখেও 'লোর'-এর বাংলা প্রতিশব্দ হিসেবে 'সংস্কৃতি'কে বেছে নিয়েছেন। 'ফোকলোর'-এর অন্তত পনেরোটি প্রতিশব্দ এবং নিজের অভিমত অনুসারে 'লোককৃতি' শব্দটিকে নির্বাচন করেও অবশেষে সুন্দর মীমাংসিত সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন ড. তুষার চট্টোপাধ্যায়ের—

> 'লোক' ও 'সংস্কৃতি' শব্দদ্বয় একত্রে ব্যবহৃত হলে তা সাধারণ মানুষের লৌকিক সংস্কৃতির তথা 'ফোকলোরেরই প্রতীক হয়ে ওঠে।... পন্ডিতমহলে বা বিশেষজ্ঞগণের মধ্যে প্রতিশব্দ সম্পর্কিত বিতর্কের অবকাশ স্বীকার করে নিয়েও প্রচলনগত সিদ্ধির কথা স্মরণে রেখে 'লোকসংস্কৃতি' শব্দটি গ্রহণ বা ব্যবহার করা যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়।[১৯]

যথার্থ প্রতিশব্দ প্রণয়নে বিদগ্ধ পণ্ডিত সমাজের অনেকেই যেমন 'ফোকলোর'কে করেছেন ধরাশায়ী, তেমনি সংজ্ঞা নির্ণয়েও তাঁরা 'ফোকলোর'কে জটিলতামুক্ত ও সৌন্দর্যমণ্ডিত সঠিক অবয়ব দিতে পারেননি। আসলে লোকসংস্কৃতি সম্পর্কিত আলোচনার ক্রমাগত ব্যাপকতা পাওয়ায় একটি মেদহীন, একমুখীন সংজ্ঞায় এর সমস্ত শরীরকে বেঁধে দেওয়া সুকঠিন ও বিতর্কিত বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। বস্তুত, 'লোকসংস্কৃতি' সেই আত্মগোপনকারী ও বর্ণচোরা শব্দ, যার সম্পর্কে ধারণা করা চলে কিন্তু যথার্থ ও নির্দোষ সংজ্ঞা টানা চলে না।

পুথিনির্ভর ও পাণ্ডিত্যসর্বস্ব জীবন অনেক সময় বিচ্ছিন্ন করে বৃহত্তর গোষ্ঠীজীবন থেকে। বিচ্ছিন্ন জীবন থেকে আসে বিযুক্তিকরণ। এই বিযুক্তিকরণ নগরসভ্যতার সবচেয়ে বড় অভিশাপ। কেননা এর ফলে ব্যক্তি আমি যেমন প্রচণ্ড স্বার্থপর হয়ে ওঠে; তেমনি নৈরাশ্য, হতাশা, বিষাদে ভোগে। এরা একক ও নিঃসঙ্গ, যে কারণে এদের সংস্কৃতি প্রাণহীন ও জড়সর্বস্ব। এরাই জন্ম দেয় যৌন ও শরীর-সম্পর্কিত স্থূল ধারণা। তাই নগরসংস্কৃতি সভ্যতার ধারক ও বাহক নয়। এ সংস্কৃতি বাঙালির নিজস্ব সংস্কৃতি নয়। ধার করা, ঋণ নেওয়া পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণ-সর্বস্ব অর্ধ-মৃত সংস্কৃতি। তবে পল্লির সঙ্গে যাঁরা প্রাণের সম্পর্ক রেখেছে, তাঁরাই শেষপর্যন্ত সুস্থ ও বিকল্প সংস্কৃতির জন্ম দিতে পেরেছেন। বর্তমান একুশ শতকের নারিক লেখকদের মধ্যে যাঁরা গ্রাম সংস্কৃতিকে পছন্দ করেন ও লেখার মধ্যে উপস্থাপন করেন, সম্ভবত তাঁদের গরিষ্ঠ অংশ 'পপুলার' লেখক হিসাবে পরিগণিত হচ্ছেন। অন্যদিকে

যে মহাজীবন অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গ সর্বত্র কাজ করে চলেছে, তাদের সংস্কৃতি হল স্বতস্ফূর্ত; প্রাণসমৃদ্ধ ও সচল। এই প্রবাহমান ও গতিশীল সংস্কৃতির প্রাণ হলো লোকায়ত চেতনা। লোকায়তচেতনা সম্পৃক্ত সংস্কৃতির মধ্যে সভ্যতার হৃৎস্পন্দন বহমান থাকে। তাই কোনো জাতির সামগ্রিক সত্তাকে জানতে হলে লোকসংস্কৃতির পাঠ অপরিহার্য।

পৃথিবীর আদি মহাকাব্যগুলি যেমন বহু হাতের ফসল এবং একটি জাতির প্রাণস্পন্দন তার মধ্যে ধ্বনিত হয়; তেমনি লোকসংস্কৃতিও একক কোনো ব্যক্তির মেধা, বুদ্ধি ও জ্ঞানের নন্দিত পুষ্প নয়। লোকসমাজ থেকে অভিজ্ঞতা ও উপকরণ নিয়ে কোনো লোক বা ব্যক্তি লোকসংস্কৃতির এক একটি পর্বের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে। তারপর কালের বহমানতার স্রোতে লোকসমাজের মধ্যে 'এক দেহে হল লীন'-এর মতো মিশে যায় একক ব্যক্তির সৃষ্টি। যেমন, লোকসাহিত্যের নির্মাতা একসময় মিশে যায় গোষ্ঠীর মধ্যে। লোকশিল্প, লোকগান, লোককথা কবে কার মাধ্যমে সূচিত হয়েছিল, তার হিসেব মেলানো দুঃসাধ্য। তাই 'Individual creation' নির্মাণ ও বিনির্মাণের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় 'Communal re-creation' বা 'Collective creation'-এ রূপ পায়। লোকসংস্কৃতি তাই ব্যক্তির নয়, সমষ্টির। এর স্রষ্টা একজন নয়। বহুস্বরের হয়ে একজন প্রতিনিধিত্ব করে মাত্র। এক সময় যা বংশ পরম্পরায় মেনে আসা হয়েছে, তাকেই যখন কোনো একজন নিজের মতো লেখ্যরূপ দান করেছে, তখন তা প্রামাণিক উপাদান হিসেবে পরবর্তী প্রজন্মের সামনে উপস্থিত হয়েছে। কোনো একজন ব্যক্তির নাম যুক্ত হলেই, তার একার কৃতিত্ব সেখানে আরোপিত হবে না। এই অর্থে জি.পি. কুঠার 'Communal product'-এর প্রসঙ্গকে গুরুত্ব দিয়ে লিখেছেন—

> It is essentially a communal product, handed down from generation to generation, and committed to writing by trained investigators.[২০]

সংহত লোকসমাজের ঐতিহ্যপরম্পরায় বিশ্বাস, সংস্কার, প্রথা, ধর্মানুশীলন থেকে শুরু করে তাদের মুখের ভাষা বা লোকভাষা, খেলা-ধূলা বা লৌকিক ক্রীড়া, লোকনৃত্য, লোকসংগীত কাল থেকে কালান্তরের পথ বেয়ে কবে এগিয়ে যায়। এইসব সৃষ্টির যেটুকু সমাজের নান্দনিক অনুভূতিরূপে অনুমোদন পায়, তাকেই সংস্কৃতিরূপে মেনে নেওয়া হয়। তাই লোকসংস্কৃতির মধ্যে 'group-oriented and tradition-based creation' বড় হয়ে দেখা দেয়।[২১]

Mac Edward Leach বিষয়টিকে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করে বললেন, 'Probably originally the product of individuals' শেষ পর্যন্ত একক-দশক-শতক পেরিয়ে পরিণত হয় 'group product'-এ। এভাবে ব্যক্তি-স্রষ্টা মিশে যায় লোকসমাজের প্রবাহিত সামুদ্রিক সৃষ্টিকর্মের অকূল জলতরঙ্গে। আর তখন এককের মধ্যে মিশে যায় বহুস্বর। ঘুরিয়ে বললে বহুকণ্ঠের মধ্যে বিলুপ্ত হয় একক কণ্ঠ। লোকসংস্কৃতি সম্পর্কে Mac Edward Leach বলেছেন—

> Folklore is the generic term to designate the customs, beliefs, tradition, tales, magical, practices, proverbs, songs etc. in short the accumulated knowledge of a homogenous unsophisticated people.[২২]

লোকসংস্কৃতির সঙ্গে Archar Taylor অনুরূপে ‘Tradition’-এর যোগসূত্র অন্বেষণ করেছেন। এর মধ্যে কারা অন্তর্ভুক্ত হতে পারে, সে সম্পর্কে লিখেছেন—“It may be folk songs, folk tales, riddles, proverbs or other materials preserved in words.”[২৩] লোকসংস্কৃতির সামগ্রিক ব্যাপ্তি শুধুমাত্র মৌখিক সাহিত্যে বা লোকসাহিত্যে সীমাবদ্ধ নয়। লোকসাহিত্য লোকসংস্কৃতি নামক বিরাট বিস্তৃত সমুদ্রে যেন মগ্ন শৈলশিলা। সুতরাং “আমরা যাকে লোকসাহিত্য বলি, তা ইংরেজি Folklore কথাটির অনুবাদ বা প্রতিশব্দ নয়।” ড. আশরাফ সিদ্দিকীর স্পষ্ট অভিমত “ইংরেজি ফোকলোর কথাটি আরও ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়।” কি সেই ব্যাপক অর্থ এবং তার অর্থই বা কতখানি প্রসারিত, সেই আলোচনায় ড. দুলাল চৌধুরী লিখছেন—

> শুধুমাত্র লোকসাহিত্যকে ফোকলোর বলা চলে না, আবার শুধুমাত্র পালাপার্বণ, আচার অনুষ্ঠানই ফোকলোর নয়। বরং লোকায়ত সংস্কৃতির সামগ্রিকতাই ফোকলোর।[২৪]

বলাবাহুল্য, ড. মযহারুল ইসলামের মতো কোনো কোনো সংস্কৃতিবিদ ‘ফোকলোর’ এর প্রতিশব্দ হিসেবে ‘লোকসংস্কৃতি’কে গ্রহণযোগ্য বিবেচনা করেননি। তবে তাঁর যুক্তিকেও স্বাগত জানাতে হয়—

> লোকসংস্কৃতির মধ্যে ফোকলোরের Formalised দিক অর্থাৎ শুধু লোকসাহিত্য, লোকশিল্প, লোকভাস্কর্য ইত্যাদি নেই, অথবা ফোকলোরের Material দিক অর্থাৎ লাঙ্গল, জোঁয়াল, ঘর, বেড়া ইত্যাদি উপকরণসমূহ নেই, আছে লোকজীবনের একটি পূর্ণাঙ্গ পরিচয়, আছে লোকধর্ম, লোকখাদ্য পদ্ধতির বিচিত্র দিক। অন্যদিকে ফোকলোরের দিগন্ত লোকসংস্কৃতির (Folkculture) ন্যায় বিস্তৃত নয়—ফোকলোর এদিক থেকে Folkculture-এর একটি অংশ মাত্র।[২৫]

বস্তুত, লোকসংস্কৃতির পরিধি অনেক বিস্তৃত। তাই লোকায়ত সংহত সমাজের কর্মজীবন ও শিল্পজীবন তথা ‘জীবনচর্যা ও মানসচর্চার সামগ্রিক কৃতি’কে ড. তুষার চট্টোপাধ্যায় বললেন ‘লোকসংস্কৃতি’।[২৬] নতুন ঐতিহ্য সৃষ্টি নয়, কিংবা ব্যক্তির মেধা, প্রতিভা, সৃজনীতে লোক-সংস্কৃতির প্রসার নয়, লোকসংস্কৃতি পুরাতন ঐতিহ্যকে সংরক্ষণ করে এবং কোন বিশেষ জাতির আচার-আচরণ-ধর্ম-বিশ্বাস-সংস্কার-উৎসব-অনুষ্ঠান-লোক-লৌকিকতা-তুকতাক-মন্ত্রতন্ত্র ইত্যাদির মধ্যে লোকসংস্কৃতির শৈশব-বাল্য-যৌবন অতিবাহিত হয়।

দৈনন্দিন অতি তুচ্ছ ঘটনা থেকে শুরু করে ব্যস্ততম জীবনযাত্রার ফাঁকেও লোকসমাজ তাদের নান্দনিক ক্রিয়াকর্মকে প্রাণবন্ত করে তোলেন লোকসংস্কৃতির মধ্যে। লোকসংস্কৃতি তাই পরম্পরাগত বিদ্যা, জাতিবিদ্যা। পুরুষানুক্রমিক ঐতিহ্য এর মধ্যে থাকে সংরক্ষিত, গোষ্ঠীর বিদ্যা-বুদ্ধি, বিশ্বাস-ধারণা, লোকবিজ্ঞান, লোককথা, লোকসংগীত, লোকাভিনয়, লোকভাষা, ছড়া, ধাঁধাঁ, প্রবাদ ইত্যাদি লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ লোকায়ত লোকসমাজের স্বতঃস্ফূর্ত মনের জাতক। লোকসমাজের সৃজনশীল কর্ম (Creative artistic work) প্রয়োজনগত মূল্যকে অতিক্রম করে অন্য আর এক শিল্পনন্দনতত্ত্বগত মূল্যকে প্রকাশ করেছে।

➲ লোকসংস্কৃতি ও লোকসাহিত্যের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ

‘লোকসংস্কৃতি’ অর্থে লোকসমাজের সৃষ্টি মৌখিক সাহিত্য থেকে শুরু করে নৃত্য, গীত,

অভিনয়, সংগীত, শিল্প, ক্রীড়াকৌতুক, উৎসব-অনুষ্ঠান, ধর্ম-কর্ম, ঔষধ-পথ্য, পালা-পার্বণ, বিশ্বাস-সংস্কার ইত্যাদি সামগ্রিক অভিজ্ঞানকে নির্দেশ করে। তাই লোকসংস্কৃতির ভূগোল দ্বীপ থেকে মহাদেশ সর্বত্র প্রসারিত। শহর ও শহরতলিতে এই সংস্কৃতির শাখামূলের সন্ধান পাওয়া গেলেও গ্রামের মৃত্তিকার গভীরে প্রোথিত রয়েছে এর প্রধান মূল। রবীন্দ্রনাথ তাই পল্লি ও পল্লির কোলে লালিত সংস্কৃতিকে এত গুরুত্ব দিয়েছিলেন—

১. ভালোবাসার দৃষ্টি দিয়ে আমি পল্লিগ্রামকে দেখেছি।[২৭]
২. গ্রামের সামাজিক প্রাণ সুস্থ হয়ে উঠুক।[২৮]
৩. গাছের শিকড়টা যেমন মাটির সঙ্গে জড়িত তাহার অগ্রভাগ আকাশের দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, তেমনি সর্বত্রই সাহিত্যের নিম্ন অংশ মাটির মধ্যেই অনেক পরিমাণে জড়িত হইয়া থাকে।[২৯]

সাহিত্যের উপরি অংশ হলো গাছের উপর দিকের পত্র-পল্লব-ফুল-ফল সুশোভিত অংশের মত। আর নিম্ন অংশ গাছের শিকড় যা মাটির সঙ্গে মাখামাখি করে আছে। তাই লোকংস্কৃতি নামক শিকড়ের ওপরে উচ্চসংস্কৃতি বা নগর সংস্কৃতির নান্দনিক পরিকাঠামো নির্ভরশীল।

মানুষের ঐতিহ্যপরম্পরায় সংস্কৃতির যে প্রবহমান ধারাটি বয়ে চলেছে সেই ধারা কালে কালে এবং দেশভেদে এতখানি বৈচিত্র্যমুখী যে লোকসংস্কৃতির সামগ্রিক চিত্রকে বিভিন্ন পর্যায়ে বিন্যস্ত করা তর্কাতীত নয়। তথাপি আলোচনার পরিধিকে ধারাবাহিক ছন্দে ফেরানোর অভিলাযে আমরা এর কতকগুলি বৈচিত্র্যমুখী বিভাজন করে নিতে পারি। তবে এই বিভাজনই শেষ কথা নয়। নয়, এই কারণে যে, নিত্যনব নিরীক্ষার ফলে লোকসংস্কৃতির ব্যাপ্তি ঘটে চলেছে। তথাপি আমরা লোকসংস্কৃতির বস্তুকেন্দ্রিক (Material folklore) ও প্রায়োগিক (Formalised folklore) দিকের কতকগুলি বিভাজন উল্লেখ করতে পারি—

১. বাক্‌কেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতি
২. অঙ্গভঙ্গাকেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতি
৩. আচার-সংস্কার-বিশ্বাসকেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতি
৪. পূজা-পার্বণ-উৎসব অনুষ্ঠানকেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতি
৫. ক্রীড়াকেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতি
৬. বস্তুকেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতি
৭. লিখনকেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতি
৮. শিল্পবস্তুকেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতি
৯. লোকসমাজ ও লোকসংস্কৃতির অন্যান্য দিক

লোকসংস্কৃতির এই যে বিবিধ শ্রেণিবিভাজন, তার মধ্যে রয়েছে বহুবিধ প্রসঙ্গ। যেমন—

১.

বাক্‌কেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতি

১. ছড়া, ২. প্রবাদ, ৩. ধাঁধা, ৪. লোকসংগীত বা লোকগীতি, ৫. গাথা বা গীতিকা, ৬. কথা বা লোককথা, ৭. লোকবক্তৃতা, ৮. লোক-ব্যবহৃত উপমা, ৯. লোকভাষার বিভিন্ন দিক ইত্যাদি।

২.

অঙ্গভঙ্গকেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতি

১. লোক-নৃত্য ২. লোকভঙ্গি ৩. লোক-কসরৎ ৪. লোকনাট্য ইত্যাদি।

৩.

আচার-সংস্কার-বিশ্বাস কেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতি

১. লোকাচার ২. লোকবিশ্বাস ৩. লোক সংস্কার ৪. লোকবিজ্ঞান বা যাদু ৫. সর্বপ্রাণবাদ ৬. রূপান্তরবাদ ৭. নিয়তিবাদ ৮. মোক্ষলাভ ৯. পরলোকতত্ত্ব ১০. অলৌকিকতা ১১. আদেশ, উপদেশ, স্বপ্নাদেশ ১২. টোটেম ও টাবু ১৩. প্রথা ১৪. মিথ ১৫. বন্দনা ১৬. মন্ত্র ১৭. গুপ্তবিদ্যা ইত্যাদি।

৪.

পূজা-পার্বণ-উৎসব-অনুষ্ঠানকেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতি

১. বৃক্ষ ও ঘট পূজা ২. লোকানুষ্ঠান ৩. মেলা ৪. লোক পার্বণ ৫. লৌকিক দেব-দেবীর পূজা ৬. তন্ত্র ইত্যাদি।

৫.

প্রয়োগধর্মী লোকসংস্কৃতি

১. গুপ্তবিদ্যা ২. ঝাঁড়ফুক ৩. লোকচিকিৎসা ৪. লোকঔষধ ৫. তাবিজ, কবজ ইত্যাদির ব্যবহার।

৬.

ক্রীড়াকেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতি

১. নৌবাহন বা বাইচ ২. কুস্তি ও লাঠিখেলা ৩. কবুতর উড়ানো ৪. কানামাছি ৫. বাঘবন্দী ৬. ড্যাংগুলি ৭. বুড়ির চু ৮. কিৎকিৎ ৯. অনস্ক্লিয়াস ১০. রুমালচুরি ১১. পিট্টু ১২. লালকাঠি ১৩. গোল্লাছুট ১৪. লুকোচুরি ১৫. কড়িখেলা ইত্যাদি।

৭.

বস্তুকেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতি

১. গৃহ সংক্রান্ত : পাটকাঠি বা চাঁচের বেড়া, কাঠ বা মাটির গৃহনির্মাণ ইত্যাদি।

২. কৃষি সংক্রান্ত : লাঙ্গল, জোয়াল, বিঁদে কাঠি, মই, কাস্তে, নিড়ান, পাঁচুনি, ঢেঁকি ইত্যাদি।

৩. যানবাহন সংক্রান্ত : গরুর গাড়ি, কলার-মান্দাস, নৌকা, পাল্‌কি ইত্যাদি।

৪. উৎপাদন সরঞ্জামসংক্রান্ত : কুমোরের চাকা, নাপিতের ক্ষুর, করাত, বড়শি, জাঁতি ইত্যাদি।

৫. অস্ত্রসংক্রান্ত : তীর, ধনুক, বল্লম, লাঠি, মুগুর ইত্যাদি।

৬. প্রসাধন সংক্রান্ত : বিভিন্ন ধাতু, পোড়ামাটি, ফুল, চন্দন, সিঁদুর, কাজল, নোয়া ইত্যাদি।

৭. বাদ্যযন্ত্র সংক্রান্ত : বাঁশি, শিঙা, ঢাক-ঢোল, মৃদঙ্গ মাদল, করতাল ইত্যাদি।

৮.

অঙ্কন বা লিখনকেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতি

১. আলপনা ২. পট ৩. ঘটচিত্র ৪. দেওয়ালচিত্র ৫. তোয়ালি ৬. আসন ৭. রুমাল ৮. স্মৃতিফলক ইত্যাদি।

৯.

শিল্পবস্তুকেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতি

১. নক্‌শি কাঁথা ২. নক্‌শা করা টুপি ৩. নক্‌শা-করা পিঠা ৪. মুখোশ চিত্র ৫. লক্ষ্মীর সরা ৬. মাটির কাজ ৭. শঙ্খের কাজ ৮. শাঁখার কাজ ৯. বাঁশ-বেত-চাচের কাজ ১০. তালপাতা-খেজুর পাতা-হোগলা পাতার কাজ ১১. টেরাকোটা ইত্যাদি।

১০.

লোকসমাজ ও লোকসংস্কৃতির অন্যান্য দিক

১. নিম্নবর্গের বৃত্তি পরিচয় ২. জাতিভেদ ৩. লোক-লৌকিকতা ৪. ছুৎমার্গ ৫. লৌকিক শান্তি ও স্বস্তি ইত্যাদি।

যুগের স্বাভাবিক প্রবণতা অনুসারে এই উপাদানগুলিও একসময় সংস্করণ হতে পারে, কোনোটা লুপ্ত হতেও পারে। এমনকী, নতুন অনেক উপাদান যুক্ত হতে পারে। কারণ লোকসংস্কৃতি পল্লীসমাজে লালিত হলেও তা স্থিতিশীল নয়। সুতরাং এ সংস্কৃতির ক্ষয় বা বিলোপ নেই। বলাবাহুল্য, প্রাচীন সভ্যতার পীঠস্থান গ্রিসের প্রাচীন সংস্কৃতি বর্তমানে অনেকখানি লুপ্ত হলেও, সুখের কথা এই যে, পৃথিবীর যে কোনও দেশের লোকসংস্কৃতির বিবর্তন ঘটে চলেছে, কিন্তু বিলোপ ঘটেনি।

২.

টাইপ ও মোটিভ ইনডেক্‌স

সারা পৃথিবী জুড়ে অসংখ্য লোককথা রয়েছে। সেই লোককথার শ্রেণিবিন্যাস করে তাকে নির্দিষ্ট একটি শৃঙ্খলায় আনার প্রচেষ্টা থেকে টাইপ-ইনডেক্‌সের প্রয়োজন হয়। স্টিথ টমসন 'The Folktale' নামাঙ্কিত গ্রন্থে টাইপের সংজ্ঞায় লিখেছেন—"A type is a traditional tale that has an independent existence. It may be told as a complete narrative and does not depend for its meaning on any other tale." (1977, P. 415)

টাইপ থেকে আমরা বুঝতে পারি একই বিষয় সমগ্র বিশ্ব জুড়ে আর কোথায় কোথায় রয়েছে। অর্থাৎ এর মাধ্যমে সম্ভাব্য উৎসস্থল জানা যায়। যে আখ্যান পশ্চিমবঙ্গে রয়েছে, সেই একই আখ্যান পূর্ববঙ্গ কিংবা আরও প্রসারিত ভূগোলে এশিয়া এবং সমগ্র বিশ্বে কীভাবে শৃঙ্খলিত হয়েছে, তা টাইপ ইনডেক্‌স থেকে বোঝা যায়। স্টিথ টমসন লোককথা টাইপ-ইনডেক্‌স এভাবে করেছেন—

১. পশুকথা

১—৯৯ বন্য পশু
১০০—১৪৯ বন্য পশু ও গৃহপালিত পশু

১৫০—১৯৯ মানুষ ও বন্য পশু
২০০—২১৯ গৃহপালিত পশু
২২০—২৪৯ পাখি
২৫০—২৭৪ মাছ
২৭৫—২৯৯ অন্যান্য জন্তু ও বস্তু

২. সাধারণ লোককথা

৩০০—৩৪৯ ঐন্দ্রজালিক কাহিনি
৩৫০—৩৯৯ অলৌকিক বাধা
৪০০—৪৫৯ অলৌকিক বা মোহময় স্বামী/মোহময়ী স্ত্রী ও অন্যান্য আত্মীয়
৪৬০—৪৯৯ অস্বাভাবিক বা অলৌকিক কার্য, অসাধ্য সাধন
৫০০—৫৫৯ অলৌকিক সাহায্যকারী/সাহায্যকারিণী
৫৬০—৬৪৯ জাদু বা ঐন্দ্রজালিক বস্তু
৬৫০—৬৯৯ অলৌকিক শক্তি বা জ্ঞান
৭০০—৭৪৯ অন্যান্য অলৌকিক কাহিনি
৭৫০—৮৪৯ ধর্মীয় বা নীতিমূলক কাহিনি
৮৫০—৯৯৯ রোমাঞ্চকর বা রোমান্টিক কাহিনি
১০০০—১১৯৯ বোকা রাক্ষসের কাহিনি

৩. হাসি ও পারিবারিক কাহিনি

১২০০—১৩৪৯ বোকার গল্প
১৩৫০—১৪৩৯ স্বামী-স্ত্রী
১৪৪০—১৫২৪ একজন নারীর/বালিকার কাহিনি
১৫২৫—১৮৭৪ একজন পুরুষের/বালকার কাহিনি
১৮৭৫—১৯৯৯ মিথ্যাবাদীর কাহিনি
২০০০—২৩৯৯ সূত্রমূলক কাহিনি
২৪০০—২৪৯৯ অশ্রেণিভুক্ত কাহিনি

মোটিফ-ইনডেক্সের সংজ্ঞা নির্ধারণে টমসন বলেছেন—

> A motif is the smallest element in a tale having a power to persist in tradition. In order to have this power it must have something unusual and striking about it.

লোককথা সমগ্র পৃথিবীজুড়ে যেভাবে আছে, তাদের এক একটি শ্রেণিতে সংযুক্ত করে বিশ্বজনীন একটি চিহ্নিতকরণ প্রক্রিয়ায় আবদ্ধ করা হয়। এরফলে বিশ্বের যেকোনো মানুষ সেই চিহ্নিতকরণ সংখ্যা থেকে সহজেই অনুধাবন করতে পারেন, যে বিষয়টি তিনি পড়ছেন, সেই বিষয়টি বিশ্বের আর কোথায় কোথায় সাদৃশ্যসূত্রে অন্বিত রয়েছে। স্টিথ টমসন তাঁর

বিশ্ববিখ্যাত 'মোটিফ-ইনডেক্স অব ফোক-লিটারেচার' নামাঙ্কিত গ্রন্থে মোটিফগুলি যেভাবে বিন্যস্ত করেছেন, তা নিম্নে সজ্জিত হলো—

এ. লোকপুরাণ

এ ০	এ ৯৯	সৃষ্টিকর্তা
এ ১০০	এ ৪৯৯	দেবতা
এ ৫০০	এ ৫৯৯	উপদেবতা ও লৌকিক বীর
এ ৬০০	এ ৮৯৯	বিশ্বসৃষ্টিতত্ত্ব ও বিশ্বতত্ত্ব
এ ৯০০	এ ৯৯৯	বিশ্বের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যসমূহ
এ ১০০০	এ ১০৯৯	প্রাকৃতিক দুর্বিপাক
এ ১১০০	এ ১১৯১	প্রাকৃতিক শৃঙ্খলা-প্রতিষ্ঠা
এ ১২০০	এ ১৬৯৯	মানুষের সৃষ্টি ও স্থিতি
এ ১৭০০	এ ২১৯৯	জীবজন্তুর সৃষ্টি
এ ২২০০	এ ২৫৯৯	জীবজন্তুর বৈশিষ্ট্য
এ ২৬০০	এ ২৬৯৯	গাছ-গাছালির সৃষ্টি
এ ২৭০০	এ ২৭৯৯	গাছ-গাছালির বৈশিষ্ট্যের সৃষ্টি

বি.জীবজন্তু

বি ০	বি ৯৯	লোকপৌরাণিক জীবজন্তু
বি ১০০	বি ১৯৯	ঐন্দ্রজালিক জীবজন্তু
বি ২০০	বি ২৯৯	মানবিকগুণসম্পন্ন জীবজন্তু
বি ৩০০	বি ৫৯৯	বন্ধুভাবাপন্ন বা উপকারী জীবজন্তু
বি ৬০০	বি ৬৯৯	মানুষের সঙ্গে জীবজন্তুর বিয়ে
বি ৭০০	বি ৭৯৯	জীবজন্তুর অত্যাশ্চর্য গুণ

সি. ট্যাবু বা বিধিনিষেধ

সি ০	বি ৯৯৯	

ডি. ঐন্দ্রজালিকতা বা জাদু

ডি ০	ডি ৬৯৯	রূপান্তরকরণ বা আকৃতি পরিবর্তন
ডি ৭০০	ডি ৭৯৯	জাদুশক্তি থেকে মুক্ত হওয়া
ডি ৮০০	ডি ১৬৯৯	ঐন্দ্রজালিক বস্তুসমূহ
ডি ১৭০০	ডি ২১৯৯	জাদুশক্তি ও তার প্রকাশ

ই. মৃত

ই ০	ই ১৯৯	পুনর্জীবন
ই ২০০	ই ৫৯৯	ভূতপ্রেত ও অন্যান্য অশরীরী আত্মা
ই ৬০০	ই ৬৯৯	অবতারত্ব বা পুনরায় শরীর গ্রহণ
ই ৭০০	ই ৭৯৯	আত্মা

এফ. অসাধ্য-সাধন

এফ ০	এফ ১৯৯	অন্য বিশ্বে যাত্রা
এফ ২০০	এফ ৬৯৯	বিচিত্র প্রাণী
এফ ৭০০	এফ ৪৯৯	অস্বাভাবিক স্থান ও বস্তু
এফ ৯০০	এফ ১০৯৯	অস্বাভাবিক ঘটনাসমূহ

ডি. ঐন্দ্রজালিকতা বা জাদু

ডি ০	ডি ৬৯৯	রূপান্তরকরণ বা আকৃতি পরিবর্তন
ডি ৭০০	ডি ৭৯৯	জাদুশক্তি থেকে মুক্ত হওয়া
ডি ৮০০	ডি ১৬৯৯	ঐন্দ্রজালিক বস্তুসমূহ
ডি ১৭০০	ডি ২১৯৯	জাদুশক্তি ও তার প্রকাশ

ই. মৃত

ই ০	ই ১৯৯	পুনর্জীবন
ই ০	ই ৫৯৯	ভূতপ্রেত ও অন্যান্য অশরীরী আত্মা
ই ৬০০	ই ৬৯৯	অবতারত্ব বা পুনরায় শরীর গ্রহণ
ই ৭০০	ই ৭৯৯	আত্মা

এফ. অসাধ্য-সাধন

এফ ০	এফ ১৯৯	অন্য বিশ্বে যাত্রা
এফ ২০০	এফ ৬৯৯	বিচিত্র প্রাণি
এফ ৭০০	এফ ৮৯৯	অস্বাভাবিক স্থান ও বস্তু
এফ ৯০০	এফ ১০৯৯	অস্বাভাবিক ঘটনাসমূহ

জি. রাক্ষস-খোক্কক-দৈত্য-দানব-ডাইনি

জি ০	জি ৩৯৯	নানাবিধ দৈত্য ও ডাইনি
জি ৪০০	জি ৫৯৯	পরাভূত দৈত্য-দানব

এইচ. পরীক্ষা

এইচ ০	এইচ ১৯৯	শনাক্তকরণ পরীক্ষা : চিনতে পারা
এইচ ২০০	এইচ ৪৯৯	বিবাহ-পরীক্ষা
এইচ ৫০০	এইচ ৮৯৯	চাতুর্যের পরীক্ষা
এইচ ৯০০	এইচ ১১৯৯	পৌরুষের পরীক্ষা : কার্যভার
এইচ ১২০০	এইচ ১৩৯৯	সাহসের পরীক্ষা : অনুসন্ধান
এইচ ১৪০০	এইচ ১৫৯৯	অন্যান্য পরীক্ষা

জে. চালাক ও বোকা

জে ০	জে ১৯৯	জ্ঞানার্জন ও রক্ষা
জে ২০০	জে ১০৯৯	চালাক ও বোকা স্বভাব
জে ১১০০	জে ১৬৯৯	চালাকি
জে ১৭০০	জে ১৭৯৯	বোকামি

কে. প্রতারণা

কে ০	কে ৯৯	প্রতারণার দ্বারা প্রতিযোগিতায় জেতা
কে ১০০	কে ২৯৯	প্রতারণার দ্বারা লাভ
কে ৩০০	কে ৪৯৯	চুরি ও প্রতারণা
কে ৫০০	কে ৬৯৯	প্রতারিত করে মুক্তি পাওয়া
কে ৭০০	কে ৭৯৯	প্রতারিত করে বন্দি করা
কে ৮০০	কে ৯৯৯	সাংঘাতিক প্রতারণা
কে ১০০০	কে ১১৯৯	নিজের ক্ষতি করেও প্রতারণা করা
কে ১২০০	কে ১২৯৯	অপমানিত হয়েও প্রতারণা করা
কে ১৩০০	কে ১৩৯৯	প্রলোভিত করে বা প্রতারিত করে বিয়ে
কে ১৪০০	কে ১৪৯৯	প্রতারিতের সম্পত্তি বিনষ্ট
কে ১৫০০	কে ১৫৯৯	ব্যভিচারের সঙ্গো যুক্ত যে প্রতারণা
কে ১৬০০	কে ১৬৯৯	প্রতারক নিজেই নিজের ফাঁদে পড়ে
কে ১৭০০	কে ১৭৯৯	মিথ্যার দ্বারা প্রতারিত করা
কে ১৮০০	কে ১৮৯৯	ছদ্মবেশ বা ভ্রান্তির দ্বারা প্রতারণা
কে ১৯০০	কে ১৯৯৯	ভণ্ড প্রতারক
কে ২০০০	কে ২১৯৯	মিথ্যা অপবাদ
কে ২২০০	কে ২২৯৯	খলনায়ক ও বিশ্বাসঘাতক
কে ২৩০০	কে ২৩৯৯	অন্যান্য প্রতারণা

এল. ভাগ্যচক্র

এল ০ — এল ৪৯৯

এম. ভাগ্য বা নিয়তিকে বশে আনা

এম ০ — এম ৪৯৯

এন. অদৃষ্ট ও কপাল

এন ০ — এন ৮৯৯

পি. সমাজ

পি ০ — পি ৬৯৯

কিউ. পুরস্কার ও শাস্তি

কিউ ০ — কিউ ৫৯৯

আর. বন্দি ও পলাতক

আর ০ — আর ৩৯৯

এস. অস্বাভাবিক নিষ্ঠুরতা

এস ০ — এস ৪৯৯

টি. যৌনবিষয়ক

টি ০ — টি ৬৯৯

ইউ. জীবন-প্রকৃতি

ইউ ০ ইউ ২৯৯

ভি. ধর্ম

ভি ০ ভি ৫৯৯

ডাবলিউ. চারিত্রিক গুণ বা বৈশিষ্ট্য

ডাবলিউ ০ ডাবলিউ ২৯৯

এক্স. হাসি-ঠাট্টা

এক্স ০ এক্স ১৭৯৯

জেড. বিভিন্ন মোটিফ

জেড ০	জেড ৯৯	সূত্র
ডেড ১০০	জেড ১৯৯	সংকেতধর্মিতা
জেড ২০০	জেড ২৯৯	বীর
জেড ৩০০	জেড ৩৯৯	বিশেষ ব্যতিক্রম

টমসনের এই মোটিফ ইনডেক্স বিজ্ঞানসম্মত। তিনি A–Z পর্যন্ত O, I এবং Y বাদে মোট ২৩টি বর্গ করেছেন। এর বাইরে কোনো ইনডেক্স হওয়ার সম্ভাবনা নেই। তিনি মূল ভাগের অন্তর্গত মোটিফের সংখ্যায় দশমিক ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছেন। ফলে তাঁর প্রদত্ত মোটিফ ইনডেক্সের বাইরে যদি নতুন কোনো ইনডেক্স-এর প্রয়োজন হয়ে পরে তাহলে দশমিক ব্যবহার করে সংযুক্তিকরণ করা সম্ভব।

➲ মোটিফ ইনডেক্স ব্যবহারের সুবিধা

১. লোককথায় যে বিষয়গুলি রয়েছে তার মধ্যে একটি সাদৃশ্য সন্ধান করা হয়। সেই সাদৃশ্যকে মোটিফ ইনডেক্স-এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ফলে এর মধ্যে রয়েছে বিশ্বজনীনতা এবং গ্রহণযোগ্যতা।

২. সংস্কৃতি, ভাষা, আচার-আচরণ-বিশ্বাস-প্রথা-সংস্কার ইত্যাদি নিয়ে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। ইনডেক্স সেই পার্থক্যগুলিকে সরিয়ে মূলত একটি নির্দিষ্ট শৃঙ্খলায় বর্গীকরণের ব্যবস্থা করায় যেকোনো লোককথাকে একটি নির্দিষ্ট বর্গে বিন্যস্ত করা যায়।

৩. আঞ্চলিক বা স্থানীয় যে বৈশিষ্ট্যগুলি লোককথায় থাকে, গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় তার মধ্যেও রয়েছে এক বিশ্বজনীন আবেদন। অর্থাৎ, প্রত্যেকটি লোককথার মধ্যে কোথাও না কোথাও একটি সাদৃশ্য রয়েছে। ফলে এই লোককথাগুলিকে বৈশিষ্ট্য অনুসারে বর্গীকরণ করা যায়।

৪. লোকসংস্কৃতির গবেষক দিব্যজ্যোতি মজুমদার খুব চমৎকারভাবে লোককথা বিশ্লেষণে টাইপ ও মোটিফ ইনডেক্সের প্রাসঙ্গিকতা আলোচনায় লিখেছেন—“লোকসমাজ সামাজিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্কের মধ্যে যা কিছু মানুষের চিন্তাকে আলোড়িত ও আন্দোলিত করেছে তার পরিচয় স্পষ্টভাবে কিংবা প্রতীক-অভিপ্রায়ের মাধ্যমে

লোককথায় ছড়িয়ে আছে। আর এইসব সম্পর্কের স্বরূপ উপলব্ধি করা যাবে টাইপ ও মোটিফ ইনডেক্সের মাধ্যমে।" (বাংলা লোককথার টাইপ ও মোটিফ ইনডেক্স, গাঙচিল, নভেম্বর ২০১২, পৃ. ৩৯)

❍ বাংলা লোককথার বিভিন্ন ভাগ এবং টাইপ ও মোটিফ ইনডেক্স

বাংলা লোককথার বিভিন্ন ভাগ এবং টাইপ ও মোটিফ ইনডেক্স নির্মাণে যে সূচি নির্দেশ করেছেন দিব্যজ্যোতি মজুমদার, সেগুলি হলো এমন—

১. পশুকথা

মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যগুলির অধিকাংশ কাহিনি লোককথাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে। রূপকথা, উপকথা, ব্রতকথা, লোকপুরাণের অসংখ্য উপাদান মঙ্গলকাব্যের কাহিনিকে করেছে পুষ্ট। কাহিনির ব্যাপ্তি ও কবির সৃজনী প্রতিভার মৌলিকত্বে কোনো কোনো মঙ্গলকাব্য হয়ে উঠেছে 'primitive epic'-এর কাছাকাছি; কখনও এদের কোনটি 'National poetry' বা বাঙালির জাতীয় কাব্যের সমপর্যায়ভুক্ত হয়েছে। লোককথার নেপথ্যে আছে গভীর সমাজদৃষ্টি। Poetics নির্দেশিত 'a copy of reality'-এর মধ্যে না থাকলেও 'a higher reality'-র উপস্থিতি এখানে ঘটেছে। আমাদের প্রাচীন ইতিহাস ও ধর্মের সঙ্গে লোককথার সংযোগসূত্র রক্ষিত হয়েছে এবং এর কাহিনিতে পাওয়া গিয়েছে 'social and political change' সম্পর্কিত সংবাদ। 'লোককথা' এদিক থেকে 'by the fact that it is still part of the living culture of every level society.'

পশুপাখিকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে নানা লোককাহিনি। এগুলি আকারে সংক্ষিপ্ত। পশুরা এখানে রূপক। এরা মানুষের মতো আচরণ করে। মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা, হীনতা-দীনতা, ভয়-বীরত্ব সবই পশুরূপকে প্রকাশিত হয়। এই পশুকথার অসংখ্য আখ্যান রয়েছে মঙ্গলকাব্যের মধ্যে। লোকায়ত মানুষের উপরে যে শোষণ-পীড়ন দেখা যায়, তা পশুর আদলে আমাদের সামনে উঠে আসে।

বস্তুত, 'পশুকথা' হল লোককথার উল্লেখযোগ্য মোটিফ। এর কাহিনিতে কৌতুকরসের পরিচয় পাওয়া যায়। কবিরা পশুকথার মাধ্যমে নীতিকথার প্রচার করতে পারেন। তবে আখ্যানের প্রয়োজনেই পশু চরিত্রে মানব চরিত্রের গুণ সঞ্চার করেছেন। আর তখন আরণ্যক প্রাণী পারিবারিক কণ্ঠস্বরে কান্না-হাসির দোলাচলতায় মানুষের বোধ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। ড. আশরফ সিদ্দিকী পশুকথা ও নীতিকথার পারস্পরিক সম্পর্ক অনুসন্ধান করে লিখেছেন, "যে সব জীবজন্তুর গল্পে উপদেশ বা নীতি সংযুক্ত থাকে সেগুলিকে ইংরেজিতে Fable বলা হয়। বাংলায় এগুলিকে 'নীতিকথা' বলা যেতে পারে।" পশুকথাকে নীতিকথা বলতে চেয়ে আব্দুল হাফিজ লিখেছেন, "জীবজানোয়ারের কাহিনির সঙ্গে নীতি বা উপদেশ যুক্ত করলে তাই পরে Fable বা নীতিকাহিনিতে পরিণত হয়।" সপ্তদশ শতাব্দীতে রচিত মনসামঙ্গল কাব্যের কাহিনি লোকসমাজের মৌখিক ধারা থেকে পরিমার্জিত ও পরিবর্দ্ধিত আকারে গৃহীত হয়েছে। আজকের বিজ্ঞান-নির্ভর যুক্তিবাদের যুগে পশুকথার ভিত্তি দুর্বল বলে মনে হলেও মধ্যযুগের শ্রোতা বহু প্রাচীন কাহিনিগুলি মুগ্ধ দৃষ্টিতে শুনেছেন এবং

নীতিকথার গভীরে ডুব দিয়ে সমাজ-সত্তাকে উপলব্ধি করেছেন। পুরুষ পরম্পরায় মুখে মুখে প্রচলিত ও কাব্যে বর্ণিত জনশ্রুতিমূলক কথাগুলির মধ্যে লোকমনস্তত্ত্বের অন্দরমহলের সংবাদ পাওয়া যায়। আলোচ্য শতাব্দীতে রচিত মঙ্গলকাব্যের মধ্যে পশুকথার প্রাসঙ্গিক ভূমিকা ও গুরুত্বকে এভাবে আলোচনায় আনা যায়—

১.

টিয়াপাখির লঙ্কায় গমন ও তেঁতুল আনয়ন

কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের 'মনসামঙ্গল' কাব্যের 'মথন-পালায়' মহেশের আদেশ, উপদেশ ও নির্দেশ সত্ত্বেও কোনও পাখি লঙ্কায় যাওয়ার সিদ্ধান্তে দুঃসাহসের পরিচয় দিলেন না। কপোত, কোকিল, চকোয়া, রায়মণি, সারস—এদের কেউ লঙ্কায় যেতে রাজি হয়নি। মহেশ্বরের আদেশ শোনা সত্ত্বেও সবাই হতাশাজনক সুর শোনালে অগত্যা টিয়া তার ছোট্ট ডানাদুটি ভাসালেন নীল আকাশে—

যত পক্ষগণ রহে হেঁটমুণ্ড হৈয়া।
লঙ্কারে যাইতে পান উঠাইল টিয়া।।

শিব খুশি হয়েছিলেন। টিয়ার অসাধ্য সাধনের প্রয়াসের মধ্যে শিবের সুধাপানের পথ পরিষ্কার হওয়ায় তুষ্ট শিব জানিয়েছিলেন—"মহেশ বলেন টিয়া তোমার কল্যাণ।/তোমার প্রসাদে তবে করি সুধাপান।।/তেঁতুল আনিতে পার তবে দেখি ভাল।/মনে না করিহ ভয় লঙ্কাপুরী চল।/সুবর্ণে তোমার পাখা করিব ভূষিত।/অন্তে তোর বর দিব কাম্য বিরচিত।।" মহাশূন্যে ডানা ভাসিয়ে কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের সবুজ নরম পালকের টিয়া চলল রূপসী বাংলা ছেড়ে লঙ্কার গহন পুরীতে। তেঁতুলের বন দেখে হরষিত হলো কর্তব্যসচেতন টিয়া। কেতকাদাস দুঃসাহসী এই পক্ষীর কথা জানিয়ে লিখেছেন—"পবনে করিয়া ভর তথা গেল টিয়া।/মনে হরষিত বড় তেঁতুল দেখিয়া।।/ডালেতে বসিয়া তার খাল্য একখান।/একখান তেঁতুল লয়্যা করিল পয়ান।।/যেখানে বসিয়াছিলা দেবগণ সাথে।/তেঁতুল আনিয়া দিল মহেশের হাতে।।" লোককথার মোটিফ ইনডেক্স্ অনুসারে 'জীবজন্তু' পর্যায়ভুক্ত এই অংশে পাখির এই প্রশংসনীয় পরোপকারকে বি ৪৫০ বিভাগের অন্তর্ভুক্ত করা যায়।

২.

কাক কথা বলে

কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের 'মনসামঙ্গল' কাব্যের "মনসার জাগরণ পালা"র অন্তর্ভুক্ত দুটি বিষয় হল—

১. অমলার নিকট শ্বেতকাকের গমন।
২. লখিন্দরের মৃত্যু-সংবাদ শ্রবণে অমলার ক্রন্দন ও বেহুলাকে ফিরিয়ে আনতে পুত্রদের নির্দেশ।

বেহুলার সংবাদ প্রদানে শ্বেতকাকের ভূমিকা মানবিক এবং দূতীর। 'শ্বেতকাকের প্রতি বেহুলার বাণী' নামাঙ্কিত কাব্যাংশে শ্বেতকাকের কাছে বাল্যবিধবা বেহুলা তাঁর ভাগ্যবিপর্যয়ের কথা শুনিয়ে বললেন—"বসিয়া চাঁপার ডালে শুন শ্বেতকাক।/লোহার বাসরে হৈল আমার

বিপাক।।.../এমন ব্যথিত এথা নাহিক আমার।/আমার বাপের বাড়ী কহে সমাচার।।" বেহুলার অনুরোধে শ্বেতকাক 'মনুষ্যভাষা'য় বেহুলার যন্ত্রণাকে ব্যক্ত করেছে। বেহুলার শোকে সমব্যথী শ্বেতকাকের কাছে বেহুলার মাতা অমলাসুন্দরী জানতে চান—"কোথা হৈতে আল্যা হে ব্যথিত শ্বেতকাক।/তুমি কিছু জানহ বেহুলার বিপাক।।" লখিন্দরের মৃত্যুসংবাদ শোনায় শ্বেতকাক এবং অনুরোধ করে দ্রুত বেহুলার কাছে তারা যেন পৌঁছে যান। শ্বেতকাকের বক্তব্য এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়— "শ্বেতকাক বলে শুন অমলাবেন্যানী।/ বেহুলার সমাচার আমি ভাল জানি।।/লোহার বাসরে তার হৈল দৈবাঘাত।/কালসর্পেতে খাইল তার প্রাণনাথ।।/উপদেশ শ্বেতকাক বলে বাক্যছলে।/বেহুলা ভাসিয়া যায় প্রভু লৈয়া কৈলে।।/বেহুলার পিতৃকুলে যদি কেহ থাকে।/বেহুলা ভাসিয়া যায় দেখ গিয়া তাকে।।"

৩.

শৃগাল কথা বলে

কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের 'বেহুলার শিআল্যায় গমন' শীর্ষক কাব্যাংশে মৃত স্বামীকে নিয়ে বঙ্গের বধূ বেহুলা আম-জাম-কাঁঠাল-হিজল-অশ্বত্থের ছায়াঘন গ্রামবাংলা পিছনে ফেলে চলেছিলেন গাঙুরের ছলাৎ ছলাৎ ঢেউয়ের টানে। দুর্গম সে যাত্রা। তবু নিরুপায় বেহুলা ভাসতে থাকে। প্রতিকূল পরীক্ষায় সে উত্তীর্ণ হবেই। কবি কেতকাদাসের কলমে বেহুলার অনন্ত পথযাত্রা অপূর্ব বর্ণনায় যথাযথ রূপ পেয়েছে। মৃত স্বামীর মুখে মাছি এসে বসলে বেহুলা কাপড়ের অঞ্চল দিয়ে মেদুর মমতায় মাছি তাড়িয়েছেন। কঙ্কালসর্বস্ব স্বামী তাঁর কাছে মৃত জড়মাত্র নয়। বেহুলার স্বামীপ্রেমের আন্তরিকতায় অভিভূত কবি লিখেছেন—"মাছি ক্ষণে ক্ষণে/প্রভুর বদনে/উড়িয়া বৈসে গিয়া।/বেহুলা নাচনী/তাড়েন আপনি/নেতের আঁচল দিয়া।।"

স্বামী বেহুলার কাছে জীবন-মরণের সমান। 'স্বামী' বঙ্গের বধূর কাছে একটা 'আইডিয়াল'। তাই 'মৃত পতি কোলে' 'দিবস রজনী/ভাসেন নাচনী'। 'নাচনী' শব্দ প্রয়োগের মধ্যে কবি বঙ্গললনার নৃত্যপটীয়সী রূপের চিত্রময় আর্কেটাইপ তুলে ধরেছেন। বহমান নদীর স্রোতে ভেসে যাওয়ার সময় 'সপ্ত দিবানিশি' উপবাসী শৃগালেরা বেহুলাকে উদ্দেশ্য করে জানায়— "সপ্ত দিবানিশি/আছি উপবাসী/যতেক শৃগাল পাল।/মড়া দিয়া মোরে/তুমি যাহ ঘরে/খ্যাতি রহু চিরকাল।।" কিন্তু বেহুলা নিরুপায়। গলিত শবের মূল্য তাঁর কাছে প্রাণাধিক। আসলে এক একটি সময় আসে যখন সামান্য বস্তু অসামান্য ও অমূল্য হয়ে ওঠে। লখিন্দরের প্রাণহীন দেহ বেহুলার কাছে প্রাণতুল্য। সুতরাং বেহুলাকে জানাতে হয় শৃগালের প্রত্যাশিত খাদ্যবস্তু তাঁর প্রাণের অধিক—

কি আর কহিব যারে খাত্যে চাহ
সেই সে আমার প্রাণ।।

বেহুলার কথা শুনে উপস্থিত শৃগালেরা মৃতের পুনরুজ্জীবনের অসম্ভব বক্তব্যে কৌতুকবোধ করেছে। এখানে শৃগালের ভাবনার মধ্যে সাধারণ মানুষের অনুভূতি যুক্ত হওয়ায় পশুর মানবায়ন ঘটেছে। সপ্তদশ শতাব্দীর মনসামঙ্গাল কাব্যে যে পশুকথাগুলি আলোচনা আমরা করেছি সেগুলি নিঃসন্দেহে নিম্নলিখিত মটিফ ইনডেক্স-এর অন্তর্গত—

১—৯৯	বন্য পশু
১০০—১৪৯	বন্য পশু ও গৃহপালিত পশু
১৫০—১৯৯	মানুষ ও বন্য পশু
২০০—২১৯	গৃহপালিত পশু
২২০—২৪৯	পাখি
২৫০—২৭৪	মাছ
২৭৫—২৯৯	অন্যান্য জন্তু ও বস্তু

২. রূপকথা

রূপকথার আখ্যান সম্ভব-অসম্ভব কল্পজগতের গল্প। প্রখ্যাত কথাসাহিত্যক ও প্রথিতযশা অধ্যাপক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছিলেন, "সভ্যতার প্রথম পর্যায়ে মানুষের আকাঙ্ক্ষা আর স্বপ্নের সর্বাঙ্গীণ অভিব্যক্তি ঘটেছে এই সব রূপকথায়।" রূপকথার মধ্যে পুরাতনকালের সুর অনুরণিত হয়। ড.শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মনে হয়েছে, "আজকাল সাহিত্যে যে নানাদিক দিয়া পুরাতন কালের সুরটি ধরিবার চেষ্টা হইতেছে, কুণ্ঠিত, সঙ্কুচিত গ্রাম সাহিত্যের অবগুণ্ঠন মোচনের প্রয়াস চলিতেছে, তাহার প্রভাব রূপকথার উপরে বিস্তৃত হইতেছে।"

হাজারতর নিষেধবাক্য, বাধা-বিপত্তি, রহস্যজাল রূপকথার জগৎকে Fantacy-র মোহময় জগতে নিয়ে যায়। আমাদের জীবনে যা কিছু 'অপ্রাপ্য' এবং যা 'দুর্বোধ্য' ও 'রহস্যময়', রূপকথা তাকেই পরিপূর্ণতা দান করে। প্রাপ্ত বয়স্ক বোদ্ধারা এর মধ্যে 'অলীকতা ও অবাস্তবতা'-র বিলাস লক্ষ করলেও শিশুর কল্পরাজ্যে রূপকথার মায়াময় জগৎ সজীব স্পর্শ দান করে। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

> মনে পড়ে সুয়োরানী দুয়োরানীর কথা
> মনে পড়ে অভিমানী কঙ্কাবতীর ব্যথা।
> মনে পড়ে ঘরের কোণে মিটিমিটি আলো,
> চারিদিকের দেওয়াল জুড়ে ছায়া কালোকালো।

রূপকথার রাজ্যে বিবাদ আছে, রক্তপাত নেই। ভয় আছে, মৃত্যুর অন্ধকার স্পর্শ নেই। ড. মযহারুল ইসলাম লিখেছেন—"রূপকথার এই সব পেয়েছির দেশে সাধারণ নায়ক ও কখনো নায়িকা প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাজিত করে রাজ্য লাভ করে এবং শেষপর্যন্ত রাজকন্যাকে বিয়ে করে সুখে দিন যাপন করে।"

১.

মনসার শ্বেতকাকের রূপ ধারণ

দেবতার রূপ পরিবর্তনের ধারণা পুরাণপ্রিয়তার ফল। 'মনসামঙ্গল' কাব্যে দেবী মনসা একাধিকবার রূপ বদল করেছেন। 'Transformation motief'-এর দৃষ্টান্তস্বরূপ মনসার শ্বেতকাকের রূপ ধারণ উল্লেখনীয়। 'কলার মান্দাসে লখিন্দরসহ বেহুলা' শীর্ষক কাব্যাংশে কবি কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ মনসার রূপবদলের কথা লিখেছেন। কাব্যের কাহিনি অগ্রগতির কারণেই কবি এই বিষয়টি এনেছেন। বেহুলার অনিকেত পথে ভেসে যাওয়ার ঘটনাকে

পিতৃগৃহে পৌঁছে দেওয়ার জন্যে মনসা এখানে দূতির ভূমিকা পালন করেছেন এবং সেই কারণে সশরীরে উপস্থিত হওয়ার পরিবর্তে রূপ পরিবর্তনের প্রয়োজন হয়েছে। কবি ক্ষেমানন্দ লিখেছেন—

বেহুলা ভাসিয়া যায় কলার মান্দাসে।
মনসা আইলা তথা শ্বেতকাক বেশে॥

২.

মনসার মালিনী রূপ ধারণ

কেতকাদাসের কাব্যে 'ধন্বন্তরির শিষ্যবধার্থ মনসারা মালিনীবেশে গমন' অংশে দেবী ফুলওয়ালী হয়েছেন এবং শঙ্খিনীনগরে অবস্থিত ধন্বন্তরির ঘরে গিয়েছেন। ধন্বন্তরি শিষ্যদের নিয়ে 'ঝাঁপান'-এ ব্যস্ত ছিলেন। কবি লিখেছেন—"তথাকারে গেলা দেবী হইয়া মালিনী।/পুষ্প নিবে নিবে বলে উচ্চনাদ বাণী॥/শুনিয়া আইল ওঝা কিনিবারে ফুল।/ছয় কুড়ি ছয় শিষ্য সঙ্গে অনুকূল॥" 'বিষমালা পরিধান করিয়া ওঝার শিষ্যগণের মূর্চ্ছিত হওন এবং ধন্বন্তরি কর্ত্তৃক পুনঃপ্রাণদান' অংশে চতুরা মনসা ধন্বন্তরীর শিষ্যদের হত্যা করবার কৌশল আবিষ্কার করে মালা পরালেন। এর ফলে শিষ্যরা বিষাক্রান্ত হলেন। কবি লিখেছেন—

পরাইয়া পুষ্পমালা বিষহরি দেবী গেলা
নিজ বেশে আপনার স্থানে।
বিনি সূতে পুষ্প-হার গলে দোলে সভাকার
বিপরীত লাগিল নিদানে॥

দেবী মনসা যে এখানে মায়াশক্তি বিস্তার করেছেন, সেই প্রসঙ্গের উল্লেখ করে কেতকাদাস লিখেছেন—"মায়া করি সেই ধনী/এসেছিল সুমালিনী/পুষ্প দিয়া পাতিল প্রলয়॥" দেবীর এই মায়া সৃজন ও প্রতারণা করা নিঃসন্দেহে কাব্যকাহিনি নির্মাণের অন্যতম কৌশল। পরবর্তীতে 'মেঘনাদবধ' কাব্য-এর ষষ্ঠ সর্গে মায়াদেবীর মায়া সৃষ্টি ও ইন্দ্রজিৎকে কৌশলে নিধনের উল্লেখ দেখি।

৩.

মনসার ব্রাহ্মণীবেশ ধারণ

কেতকাদাসের 'মনসা-মঙ্গল' কাব্যের 'বিষহরির ব্রাহ্মণীবেশ ধারণ ও রাখাল-বালকদের ছলনা' শীর্ষক কাব্যাংশে রাখালদের ছলনা করেছেন দেবী। তিনি নির্জের স্বার্থসিদ্ধির অভিপ্রায়ে ছল করে রূপ গোপন করেছেন। তাঁর ছদ্মবেশ ধারণ পদ্ধতি আকর্ষণীয়, অভিনব। কবি কেতকাদাস লিখেছেন—"শুনিয়া সখীর বোল ভুজঙ্গ-জননী।/নিজ রূপ ত্যজি হইল বৃদ্ধ ব্রাহ্মণী॥/গলে গজমতী-হার তাহা কৈল দূর।/হাতে কঙ্কণ-তাড় পায়ের নূপুর॥/পাণ্ডুর-আকৃতি হৈল মাথার কুন্তল।/তনু জরজর বুড়ী হীন হৈল বল॥" বনের রাখালরা দেবী সম্পর্কে সচেতন হয়েছেন। বৃদ্ধার মধ্যে এমন কোনও শক্তি থাকতে পারে, যা ডাকিনীবিদ্যার মতোই অব্যর্থ এবং নঙর্থক। সুতরাং রাখাল বালকেরা সচকিত হয়েছে। তারা ভয়ে সংকুচিত হয়ে সাবধানতা অবলম্বন করেছে—

ডাকিনী যোগিনী প্রত্যয় কি জানি
মনেতে রাখিহ ভয়।

হাসিয়া প্রশংসা করহ জিজ্ঞাসা
বুড়ী মাগী কিবা কয়॥

'রাখাল-পূজা পালা'য় দেবী মনসা ছলনায় নিজের পুজো লাভ করেছেন। যদিও রাখালদের কাছ থেকে পুজো পাওয়ার পর দেবীকে অভিজাত সমাজের প্রতিনিধি চন্দ্রসদাগর বণিকের কাছ থেকে পুজো আদায় করতে হয়েছে। কেননা, নিম্নবর্গের মানুষেরা পুজো দেওয়ার পরেও উচ্চবর্গের মানুষেরা দেবীকে স্বীকৃতি দেননি।

রূপকথা আখ্যানগুলি বাংলা লোককথা টাইপ ও মোটিফ ইনডেক্স অনুসারে বিন্যস্ত করলে দাঁড়ায় এমন—

৩০০—৩৯৯	অলৌকিক বাধা
৪০০—৪৫৯	অলৌকিক বা মোহময় স্বামী/মোহময়ী স্ত্রী ও অন্যান্য আত্মীয়
৪৬০—৪৯৯	অস্বাভাবিক ও অলৌকিক কার্য, অসাধ্যসাধন
৫০০—৫৫৯	অলৌকিক সাহায্যকারী বা সাহায্যকারী
৫৬০—৬৪৯	জাদু বা ঐন্দ্রজালিক বস্তু
৬৫০—৬৯৯	অলৌকিক শক্তি বা জ্ঞান
৭০০—৭৪৯	অন্যান্য অলৌকিক কাহিনি
৭৫০—৮৪৯	রোমাঞ্চকর বা রোমান্টিক কাহিনি
৮৫০—৯৯৯	বোকা রাক্ষসের কাহিনি
১০০০—১১৯৯	স্বামী-স্ত্রী

৩. পরিকথা

মূলত পরিকে কেন্দ্র করে শিশু মনস্তত্ত্বে ভয়-ভীতিবোধ লক্ষণীয়। পরি সম্পর্কে আমাদের মনের মধ্যে নানা রকম বিশ্বাস-অবিশ্বাসের বিচিত্র রূপ ধরা পড়ে। আসলে এই সবই কাল্পনিক একটি বোধের জন্ম দেয়। বাংলা পরিকথাকে বিন্যস্ত করতে হলে যে মোটিফ ইনডেক্সের অনুসরণ করা আবশ্যক, সেগুলি হলো—

এফ ২০০	পরি
এফ ২১০	পরির দেশ
এফ ২১৩	দ্বীপের মধ্যে পরির রাজ্য
এফ ২৫১	পরির জন্মকথা
এফ ২৫২.২	পরিরানি
এফ ২৬১	নৃত্যরতা পরি
এফ ২৬৫	স্নানরতা পরি
এফ ৩৭০	পরিরাজ্যে গমন

৪. কিংবদন্তি

কিংবদন্তির মধ্যে রয়েছে বুদ্ধি-শক্তি-সাহসের বিষয়। কিংবদন্তির মধ্যে সম্ভব-অসম্ভব নানা আখ্যান লুকিয়ে থাকে। গুপ্তধনের সন্ধান, বীরত্বব্যঞ্জক আখ্যান, অভিশপ্ত কোনো বিষয়,

অসম্ভব কোনো কাজ ইত্যাদি কিংবদন্তির মূল প্রেক্ষণবিন্দু। মঙ্গলকাব্যে কিংবদন্তির দৃষ্টান্ত তুলনামূলকভাবে লোককথার অন্য উপাদানের থেকে বেশ কম। কিংবদন্তির মধ্যে সত্য কম, সম্ভব-অসম্ভবের অলীক কাহিনি তুলনায় অনেক বেশি। কিংবদন্তির মধ্যে থাকে আত্মত্যাগ, পদে পদে মৃত্যুর সংকেত, ভয়, রোমাঞ্চ, বীরত্ব, শৌর্য ও প্রতিপক্ষকে জয় করবার অনমনীয় ইচ্ছা। পুরাকাহিনির অনেক পরে এসব শৌর্য-বীর্যমূলক কাহিনির জন্ম, তবে ঠিক কবে এদের উদ্ভব তার সময় নির্ধারণের অঙ্ক মিলিয়ে নেওয়া কঠিন। বস্তুত 'We do not know when these stories were first told in their present shape ; but wherever it was, primitive life has been left far behind.' 'মনসামঙ্গল' কাব্যে 'স্বর্গে বেহুলা'র যাত্রাকে কিংবদন্তির অন্তর্ভুক্ত করা যায়। 'বেহুলা-সহ নেতার দেবসভায় গমন' শীর্ষক কাব্যাংশে বেহুলা দেবসভায় যাওয়ার অনুমতি আদায় করেছেন নেতার সম্মতিতে—

দেবতাসভায় আমি লৈয়া যাব তোহে।
সন্ধানে নাচিবে যেন দেবগণ মোহে॥

'বেহুলার দেবসভায় নৃত্য' শীর্ষক অংশে নৃত্যে পারদর্শী বেহুলা দেবতাদের অভিভূত করেছেন। কবি কেতকাদাস মনসার নৃত্য ও গানের সাফল্যের মধ্যে মৃত স্বামীর পুনরুজ্জীবনের গল্প বেঁধেছেন। তিনি লিখেছেন—''নাচেন অপূর্ব্বতালে/দেবগণ ভাল বলে/বেহুলা নাচেন সুরপুরে।" কিংবদন্তির টাইপ-ইনডেক্সের ৮০২ স্বর্গে কৃষক-এর মতো বেহুলার দেবসভায় পৌঁছানো যেন এক অপরূপ কল্পকাহিনি। বাংলা কিংবদন্তি টাইপ-ইনডেক্সের কয়েকটি পরিচয় নিম্নে প্রদত্ত হলো—

৪০৬খ	ভাগ্যের খোঁজে যাত্রা
৭০৫	মাছ থেকে জন্ম
৭৫৫	পাপ ও পুরস্কার
৭৫৬	তিনটি সবুজ ডাল
৭৫৬ক	নিষ্পাপ পুণ্যবান সাধু
৭৫৬গ	মহাপাপী
৭৮০	গান-গাওয়া হাড়
৮০২	স্বর্গে কৃষক
৮১২	দৈত্যের ধাঁধা
৮৩১	অসৎ পুরোহিত

৫. ব্রতকথা

ব্রতের মধ্যে মূলত পারিবারিক মঙ্গালের কথা থাকে। ব্রতকথা নির্ভেজাল ধর্মীয় আখ্যান। তবে একথা বলতেই হয় যে, সব ব্রতকথা একই আখ্যানকে অবলম্বন করেই হয়। অর্থাৎ সেই ব্রতকথার মধ্যে নতুন কোনো বিষয় পরিকল্পনা করা হয় না। যে-কোনো ভাবে হোক না কেন, ভক্তির প্রতিষ্ঠা করাই যেন এই ব্রতকথার একমাত্র উদ্দেশ্য। বাংলা ব্রতকথা টাইপ-ইনডেক্সের কয়েকটি দৃষ্টান্ত এখানে প্রদত্ত হলো—

৭৫ দুর্বলকে সাহায্যদান
১২০ প্রথম সূর্যোদয় দেখা
১৬০ কৃতজ্ঞ পশু, অকৃতজ্ঞ মানুষ
২৮৫ শিশু ও সাপ
৩০৩ যমজ ভাই
৩০৪ শিকারি
৩১৫ অবিশ্বাসী বোন
৩৩৫ মৃত্যুদণ্ড
৪০৩ক ইচ্ছা
৪৩০ গাধা
৪৭৩ খারাপ বউয়ের শাস্তি
৫৬৪ মোহরভর্তি থলে
৬১৩ দুই পথিক
৬৭০ পশুর ভাষা
৭২৫ স্বপ্ন
৭৩৬ ভাগ্য ও ধনরত্ন
৭৫০খ আতিথেয়তার পুরস্কার
৭৫১ লোভী চাষিবউ
৭৫৬ক নিষ্পাপ পুণ্যবান সাধু
৭৫৬গ মহাপাপী
৮৩১ অসৎ পুরোহিত
৮৪০ মানুষের পাপের শাস্তি
৯৩০ ভবিষ্যৎ-বাণী

৬. লোকপুরাণ

লোকপুরাণ থেকে মহাকাব্যের অধিকাংশ আখ্যান গৃহীত হয়েছে। লোকপুরাণের মধ্যে প্রতিভাত হয়েছে সৃষ্টিরহস্যের নানা তথ্য। লৌকিক দেবদেবীকে অবলম্বন করে অসংখ্য লোকপুরাণ মঙ্গালকাব্যের প্রতি পাতায় স্বর্ণাক্ষরে খোদিত রয়েছে। আমরা পঞ্চদশ শতাব্দীর মনসামঙ্গালকাব্যে প্রতিফলিত লোকপুরাণের দিকে চোখ রাখতে পারি।

১.

<u>সৃষ্টি প্রকরণ</u>

পঞ্চদশ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত সুদীর্ঘকালের সময়সীমায় রচিত মঙ্গলকাব্যগুলিতে সৃষ্টি প্রকরণ ব্যাখ্যা মঙ্গলকাব্যের গঠন কৌশলের সাধারণ বিষয়। বিপ্রদাস পিপিলাইয়ের 'মনসামঙ্গল' কাব্যে সৃষ্টি প্রকরণ ব্যাখ্যায় কবি লিখেছেন—"যখন না ছিল গোসাঞি সৃষ্টি স্থিতি লয়।/পবন আকার গোসাঞি ছিলা জ্যোতির্ময়।।/নাহি আদ্য অন্ত মধ্য কেবল কারণ।/পঞ্চ-মহাভূত সৃষ্টি করিলা সৃজন।।"

২.

সৃষ্টিকর্তা

যে সৃষ্টিরহস্যের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা কারও জানা ছিল না, তাকে মনোমত ব্যাখ্যা প্রদানের কৌশল রূপে একজন সৃষ্টিকর্তার প্রয়োজন দেখা গিয়েছিল। মহাশূন্যের মধ্যে বিচরণ করা সেই সৃষ্টিকর্তার কোনো মূর্তি কল্পনা না করে তাঁকে আদিদেব রূপে চিহ্নিত করে তাঁকে দিয়েই বিশ্বসৃষ্টির রহস্যকে আবিষ্কার করা হলো—"আদ্যা শক্তি সৃজন করিলা মহাশয়।/কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড সৃজিলা তেজোময়।।/সত্ত্ব রজ তম গুণে ব্রহ্মা হরিহর।/সৃজন পালন ক্ষয় করে নিরন্তর।।" সৃষ্টির রহস্য আবিষ্কারে সে যুগে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার অভাবে ভয়-বিস্ময় মিশ্রিত কল্পনায় পুরাকথার রহস্যময় জগৎ উন্মোচিত হয়েছিল।

৩.

বৃষবাহন দেবতা

স্বামী নির্ম্মলানন্দ লিখেছেন—

> বৃষভ শব্দটির আক্ষরিক অর্থ বলবান্ এবং শুক্রল। কৃষি, পরিবহনাদি কার্যের দ্বারা বৃষভ যেমন গৃহস্থের নানা প্রয়োজন সিদ্ধ করে, তেমনি প্রজননের প্রয়োজনে একটি বৃষভকে বহু গাভীর কামনা পূরণে সমর্থ দেখা যায়। বৃষভ কামবর্ষী। আশুতোষ শিবও নিত্য বরদ, তিনি ভক্তগণের কামনা বা অভীষ্ট পূরণে সর্বদা উন্মুখ। ভক্তের মঙ্গল বিধানে তিনিও কামবর্ষী বা অভীষ্টবর্ষী। এ বিচারেও শিবের সার্থক বাহন হয়েছে বৃষভ।

হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য লিখেছেন, "যিনি রুদ্র-শিব তিনিই রুদ্র শিবের বাহন।" শিবমঙ্গল ও অন্নদামঙ্গল কাব্যে বৃষবাহন দেবতার কথা উল্লেখ আছে। বিজয় গুপ্তের 'পদ্মাপুরাণ' কাব্যে শিবের বাহনরূপে বৃষের সবিস্তার বর্ণনাটি আছে—"আড় নয়ানে শিব চাহে এক দিষ্টে।/লাফ দিয়া উঠে শিব বলদের পীষ্টে।।/চল চল বলি শিব ঠেলা দিল পায়ে।/অন্তরীক্ষে যায়ে বৃষ বায়ুগতি ধায়ে।।/অতি শীঘ্র চলে বৃষ বায়ু সমতুল।/আঁখির নিমিষে গেল সরযুতের কুল।।" বাংলা লোককথার টাইপ ও মোটিফ ইনডেকস্ অনুসারে বৃষবাহন দেবতা এ১৩৬.১.৩-এর অন্তর্গত।

৪.

সিংহবাহন দেবতা

পশুরাজ সিংহ মহাশক্তিময়ী দেবী দুর্গার বাহন। দেবীপুরাণ মতে "সিংহের অঙ্গে অঙ্গে নানা দেবতার শক্তি বিন্যস্ত। তার গ্রীবাতে বিষ্ণু, শিরে মহাদেব, ললাটে পার্বতী।" বিজয় গুপ্তের 'পদ্মাপুরাণ' কাব্যের 'মনসার জন্ম পালা'য় সিংহবাহন দেবীর কথা বলেছেন কবি—"দুই হাতে পিতলের খাড়ু কানে মদন কড়ি।/বায়ুবেগে জায়ে দেবী সিংহ পৃষ্ঠে চড়ি।।"

৫.

মূষিকবাহন দেবতা

মূষিক কৃষিভূমি ও গৃহে বসবাস করে। ধান, চাল, ফল তার প্রিয় খাদ্য। ফলে কৃষির সঙ্গে তার সম্পর্ক রয়েছে। হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য গণেশের বাহনকে বুদ্ধিসম্পন্ন জীবরূপে

প্রতিপন্ন করে একজন পাশ্চাত্য পণ্ডিতের অভিমত শুনিয়েছে—The mouse is the master of the inside of everything. বেহুলা-লখিন্দরের বিবাহে মূষিকবাহনে গণপতি উপস্থিত হয়েছিলেন—"মূষিক বাহনে গতি/আগে চলে গণপতি/সিন্দুরে মুণ্ডিত স্থূলকায়ে।।"

৬.

অশ্ববাহন দেবতা

স্বামী নির্মলানন্দ লিখেছেন, "অশ্ব একটি হৃষ্টপুষ্ট ও তেজস্বী জন্তু এবং সেও যজ্ঞের অন্যতম মেধা—এ হিসেবে অগ্নির অশ্ববাহন যুক্তিযুক্ত।" বিজয় গুপ্ত লিখেছেন—"হরিণে পবন ধায়ে/আপনে আনল যায়ে/সপ্ত ঘোড়া রথে দিবাকর।।"

৭.

ময়ূরবাহন দেবতা

কার্তিক কৃষি ও প্রজননের দেবতা। তার প্রণয়িনী সন্তানোৎপাদনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ষষ্ঠী। ফলে কার্তিক ও ষষ্ঠীর সঙ্গে শস্য উৎপাদন ও সন্তান জন্মগ্রহণের সম্পর্কটি রয়েছে। সনৎকুমার মিত্র লিখেছেন, "কার্তিকের সঙ্গে শস্য উৎপাদন বা fertility এবং ময়ূরের সঙ্গে বর্ষা সমাগমের সম্পর্ক।" কার্তিক ও ময়ূর উভয়েই সৌন্দর্য ও বীর্যের সম্পর্কে অন্বিত হওয়ায় কার্তিকের ময়ূরবাহন যথার্থ। কার্তিকের ময়ূরবাহন মূর্তি মনে রেখে বিজয় গুপ্ত লিখেছেন—"মউরে কার্ত্তিক চড়ে/বামাগতি মনোহরে/পুষ্পরথে চলে ধনেশ্বর।।"

৮.

হস্তীবাহন ইন্দ্র

নবজলধর মেঘমালার রূপের সঙ্গে কোথাও যেন সূক্ষ্ম সাদৃশ্য আছে হস্তির। 'যুদ্ধ, পরিবহন ও মৃগয়াদিতে' হস্তীর আভিজাত্যের কারণে দেবরাজ ইন্দ্রের বাহন হওয়ার যোগ্যতা এই বিরাট বপু পশুটির আছে। বিজয় গুপ্ত লিখেছেন—"পারিজাত পুষ্পের মালা/ভরিয়া সকল গলা/ ঐরাবতে চলে সুরপতি।।"

৯.

সর্পবাহন দেবতা

মৃত্তিকালগ্ন অশিক্ষিত মানুষ সর্পের বক্রগতির মধ্যে দেখেন দেবী মনসার প্রতিকৃতি। মনসামন্দিরে অনেক সময় বেদির উপরে দেবীর বাহন রূপে সর্পের প্রতীকী মূর্তি স্থাপন করা হয়। ড. নীহাররঞ্জন রায় লিখেছেন, "সাপ প্রজননশক্তির প্রতীক এবং মূলত কৌম সমাজের প্রজনন শক্তির পূজা হইতেই মনসা পূজার উদ্ভব।" ড. নির্মলেন্দু ভৌমিক লিখেছেন, "দেবদেবীর চরিত্র, ধর্ম-গুণ-কর্ম প্রভৃতির সঙ্গেই তাঁদের বাহনও যুক্ত।" হংসবাহন দেবী মনসার কথা উল্লেখ করে বিজয়গুপ্ত লিখেছেন—"পদ্মা বলে নেতা তুমি হও সাবধান।/এই সর্প দিয়া সাজাও রথখান।।/একে নেতা আর পদ্মার আজ্ঞা পায়ে।/পদ্মার সাক্ষাতে নেতা রথ সাজায়ে।।/নেতা রথ সাজায়ে দেখিতে সুন্দর।/নাগরথে পদ্মাবতী চলিল সত্বর।।"

১০.

দেবতার ঈর্ষাপরায়ণ স্ত্রী—পার্বতী

বিজয় গুপ্তের মনসা দেবসমাজ ও মানবসমাজের কোথাও সহজ স্বীকৃতি পাননি। চণ্ডী তাঁকে গৃহ থেকে বিতাড়িত করেছেন। প্রহার করেছেন। অমানবিক আচরণ করেছেন তাঁর সঙ্গে। চণ্ডীর এই রণংদেহী ক্রুদ্ধস্বভাব তাঁর চরিত্রের ক্রূরতা ও জিঘাংসার পরিচয় বহন করে। 'মনসাকে চণ্ডীর দর্শন ও প্রহার' শীর্ষক কাব্যাংশে চণ্ডীর দুর্ব্যবহার স্মরণীয়—"চুলে মুখে পেটে পিষ্টে মারে ঘারকাতা।/বিপরীত বোলে পদ্মা মনে লাগে বেথা।।/নিষ্ঠুর হইয়া মারে চণ্ডী প্রাণে সইতে নারে।/বাপ বাপ বলি পদ্মা ডাকে উচ্চৈঃস্বরে।।" এখানে চণ্ডী সৎমায়ের ভূমিকায় থেকেছেন। আর মনসা লাঞ্ছিতা কন্যার ভূমিকায় উপনীত হয়েছেন। সংসারে মাতৃ বিয়োগ হলে পিতার পুনর্বিবাহে সন্তানের যে করুণ অবস্থা হয়; মনসা তারই দৃষ্টান্ত।

১১.

দুর্ভাগ্যের দেবতা

মনসা ব্যক্তিজীবনে ছিলেন অসুখী। তাঁর চরিত্রগত এই দিকটি তাঁকে প্রতিহিংসাপরায়ণ করে তুলেছে। অভীপ্সিত কর্ম সম্পাদনের অভিপ্রায়ে তিনি প্রতিপক্ষকে সমূলে বিনাশ করেছেন। যেমন—

১. ধন্বন্তরিকে হত্যা করেছেন, ফলে চাঁদ বান্ধবহীন হয়েছেন।
২. চাঁদের গুয়াবাগান নষ্ট করেছেন, ফলে চাঁদের গৃহ সৌন্দর্যহীন হয়েছে।
৩. বাণিজ্যতরী নিমজ্জিত করেছেন, ফলে চাঁদের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।
৪. লখিন্দরসহ অন্য পুত্রদের প্রাণ নাশ করায়, তিনি সন্তানহীন হয়েছেন।

তাঁর চরিত্রের নেতিবাচক দিক থেকে তাই প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক যে, মনসামঙ্গল কাব্যধারায় তিনি দুর্ভাগ্যের দেবতারূপে কল্পিত হয়েছেন। ভাগ্য যেন তাঁর সঙ্গে নিরন্তর দুষ্টুমির খেলা করেছে। বাংলা লোকপুরাণে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য মোটিফ নিম্নে প্রদত্ত হলো—

এ ২১.১	নারী ও পুরুষ সৃষ্টিকর্তা
এ ১২৩.২.১.২	চতুর্মুখ দেবতা
এ ১২৩.৩.১.২	সহস্রলোচন দেবতা
এ ১২৩.৫.১	বহুভুজ দেবতা
এ ১২৪.১	অগ্নিলোচন দেবতা
এ ১৩১	পশু-আকৃতির দেবতা
এ ১৩২	পশুর রূপে দেবতা
এ ১৩৩	দানবরূপী দেবতা
এ ১৩৬.১.৩	বৃষবাহন দেবতা
এ ১৩৬.১.৪.১	হংসবাহন দেবতা
এ ১৩৬.১.৬	মহিষবাহন দেবতা
এ ১৩৬.১.৭	সিংহবাহন দেবতা
এ ১৫১	দেবতাদের আবাসবস্থল

এ ১৫১.৩	সাগরতলে দেবতার আবাসস্থল
এ ১৫১.৮	দুধসাগরে দেবতা
এ ১৫৫.৫	দেবহস্তী
এ ১৫৬.৫	দেবতার রথ
এ ১৬২	দেবতাদের মধ্যে বিরোধ
এ ১৬২.১	দেব-মানবে যুদ্ধ
এ ১৬৫.২	দেবদূত
এ ৪২১	সাগর-দেব
এ ৪২১.১	সাগর-দেবী
এ ৪২৫	নদী-দেব
এ ৪২৫.১	নদী-দেবী
এ ৪৫৪.১	আরোগ্যের দেবী
এ ৪৬২.১	রূপের দেবী
এ ৪৬৩	ভাগ্যদেবতা
এ ৪৬৪	ন্যায়ের দেবতা
এ ৪৭৩.১	সম্পদের দেবী
এ ৪৭৮.২	বসন্তরোগের দেবী
এ ৪৮২.১	দুর্ভাগ্যের দেবতা
এ ৪৮৭	মৃত্যুর দেবতা
এ ৪৮৮	ধ্বংসের দেবতা
এ ৬৬১	স্বর্গ
এ ৭৫১.৮.১	চাঁদে চরকা-কাটা বুড়ি
এ ১০০১.১	স্বর্ণযুগ

৭. গীতিকা

বাংলা সাহিত্যে তিন ধরনের গীতিকার উল্লেখ পাওয়া যায়। এরা হলো—নাথ গীতিকা, ময়মনসিংহ গীতিকা ও পূর্ববঙ্গ গীতিকা। এই গীতিকাগুলির মধ্যে ব্যক্তিত্বশালিনী নারীর স্বাধিকারে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর স্পর্ধা অর্জিত হতে দেখা যায়। নারীর কোমলতা-কমনীয়তা-ব্যক্তিত্ব—সব মিলিয়ে ময়মনসিংহ গীতিকা বা পূর্ববঙ্গ গীতিকা আমাদের কাছে আলোকবর্তিকাস্বরূপ। স্টিথ টমসন এবং র‍্যালফ স্টিলবগস বাংলা গীতিকার মোটিফ ইনডেক্স অনুসারে যে তালিকা করেছেন, তা নিম্নরূপ—

সি ২০০	গীতিকা
সি ৩২০	ভাবাবেগ
সি ৩২২	প্রেম
সি ৩২৩	ঘৃণা
সি ৩২৪	আনন্দ
সি ৩২৫	বিষাদ

সি ৩২৬	প্রশংসা
সি ৩২৭	ভর্ৎসনা
সি ৩৩০	প্রাত্যহিক জীবন
সি ৩৩৪	ক্রিয়াশীলতা
সি ৩৩৬	সামাজিক মিলন
সি ৩৪০	জীবনের চরম মুহূর্ত
সি ৩৪২	জন্ম
সি ৩৪৫	বিবাহ
সি ৩৪৬	মৃত্যু
সি ৩৪৭	বিচ্ছেদ-বিরহ
সি ৩৬০	ছেলে-মেয়ে
সি ৩৬৬	দোলনার গান-ঘুমপাড়ানি গান
সি ৪২৪	দম্পতি
সি ৪২৬	গোষ্ঠী
সি ৪৩২	আরাধনা
সি ৪৩৪	জীবনবৃত্ত
সি ৪৩৬	উৎসব
সি ৪৮২	যন্ত্রাণুষঙ্গ
সি ৪৮৪	পোশাক
সি ৪৯০	নাটকীয়তা
সি ৫৩০	মানসিক ক্রিয়া

৩.

বাংলার ব্রত ও পার্বণ

হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতি মিশ্র প্রকৃতির। সংযম ও তপস্যা, জ্ঞান ও সত্যানুসন্ধিৎসা এবং প্রত্যেকের মধ্যে পরমাত্মার আলো অনুসন্ধাই হিন্দুধর্মের প্রাণের কথা। সমদৃষ্টি ও সমপ্রাণতা এবং বিশ্বমানবের কল্যাণ কামনা করে হিন্দুধর্ম। বাংলার বিভিন্ন উৎসব-অনুষ্ঠানকেন্দ্রিক সংস্কৃতির মধ্যে দিয়ে উভয় বাংলার মানসিক ও আধ্যাত্মিক দৃষ্টি উন্মোচিত হয়েছে। ভাবপ্রবণ বাঙালি জাতি ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্ক রচনার উদ্দেশ্যে ব্রত-উৎসব-অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। মঙ্গলকাব্যের ন্যায় ধর্মভিত্তিক সাহিত্য সৃষ্টির পূর্বে ব্রতকথার মধ্যে এসব অনুষ্ঠানের উৎস নিহিত ছিল। অর্থাৎ প্রাক্-পুরাণ পর্ব থেকে লোকমুখে মঙ্গলকাব্যের লৌকিক অংশগুলি উচ্চারিত হয়ে আসছিল। তাই মধ্যযুগের বাঙালি সমাজ কথকতা, কীর্তন, মঙ্গল গান, মৌখিক ছড়ার মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান করতেন। বস্তুত, এই ব্রতের মধ্যে বঙ্গরমণীর আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণের কাহিনি ব্যক্ত হয়েছে। আর্যদের চোখে যারা ব্রাত্য, অনার্য, অসুর ইত্যাদি নামে চিহ্নি(ত তাদের আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি, পূজা-পার্বণ, ব্রতাচার, মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান এবং কৃষিকেন্দ্রিক সমস্ত পালা-পার্বণকে পরবর্তী কালে আর্যভাষীরা গ্রহণ করেছেন। ড. নীহাররঞ্জন রায় ল(

করেছেন—"বিশেষ বিশেষ ফল-ফুল-মূল সম্বন্ধে যে সব বিধি-নিষেধ আমাদের মধ্যে প্রচলিত, যে সব ফল-মূল আমাদের পূজার্চনায় উৎসর্গ করা হয়, আমাদের মধ্যে যে নবান্ন উৎসব প্রচলিত, আমাদের ঘরের মেয়েরা যে সব ব্রতানুষ্ঠান প্রভৃতি করিয়া থাকেন, বস্তুত, আমাদের দৈনন্দিন অনেক আচার-অনুষ্ঠানই এই আদিম অস্ট্রিক ভাষাভাষী জনদের ধর্মবিশ্বাস ও আচার-অনুষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত।" একটি জাতির বর্ণময় প্রাণসত্তার প্রকাশ পায় যে ব্রতের মধ্যে তার সম্পর্কে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মন্তব্য—

> ব্রত হল মনস্কামনার স্বরূপটি। আল্পনায় তার প্রতিচ্ছবি, গীতে বা ছড়ায় তার প্রতিধ্বনি এবং প্রতিক্রিয়া হচ্ছে তার নাট্যে, নৃত্যে, এককথায় ব্রতগুলি মানুষের গীত, কামনা, চিত্রিত বা গঠিত কামনা, সচল জীবন্ত বাসনা।

ব্রতকথা মূলত মেয়েদের 'সচল জীবন্ত বাসনা'। ব্রতে মন্ত্রের কোন স্থান নেই। এর মধ্যে রয়েছে যাদুবিদ্যাগত দিক। লৌকিক দেব-দেবীকে কেন্দ্র করে লোকসমাজের বিভিন্ন ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ছাপ পরে তাদের আচার-অনুষ্ঠানে। কিন্তু ব্রত একান্তই ব্যক্তিগত প্রার্থনার ক্ষেত্র বলে লোকসংস্কৃতির বিশুদ্ধ রূপ সেখানে পাওয়া যায়। ১৩০৩ বঙ্গাব্দে অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের 'মেয়েলি ব্রত' নামাঙ্কিত গ্রন্থের ভূমিকায় একটি জাতির স্পন্দন কীভাবে ব্রতকথা থেকে লাভ করা যায় সে আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন—

> যে সকল কথা ও গান সমাজের অন্তঃপুরের মধ্যে চিরকাল স্থান পাইয়া আসিয়াছে তাহা দর্শন, বিজ্ঞান ও ইতিহাসের মূল্যবান উপকরণ না হইয়া যায় না—যাহারা স্বদেশকে অন্তরের সহিত ভালোবাসে তাহারা স্বদেশের সহিত সর্বতোভাবে অন্তরঙ্গরূপে পরিচিত হইতে চাহে এবং ছড়া রূপকথা ব্রতকথা প্রভৃতি ব্যতিরেকে সেই পরিচয় কখনো সম্পূর্ণতা লাভ করে না।

ব্রতকথার দেব-দেবী লৌকিক। লোককথার সুরারোপিত মৌখিক রূপ হল ব্রতকথা। ব্রতকথার গল্পগুলি কোনো অলৌকিক দেবতার কথায় উৎসাহী নয়। পুরাণানুসারী যেসব দেবী ব্রতকথায় স্থানলাভ করেন, তাঁদের নামটুকুমাত্র পৌরাণিক, বাকি সব বৈশিষ্ট্য লৌকিক। বাংলার লোকসাহিত্য সংগ্রহ, চর্চা ও বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে বিদ্যাগত শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার আদিগঙ্গা-ভগীরথ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্যবিভাগের প্রাক্তন অধ্যক্ষ ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য 'ব্রতকথা' আলোচনায় লিখেছেন—

> ব্রতকথাগুলির মধ্যে যে সকল দেবতার মাহাত্ম্য কীর্তন করা হইয়াছে, তাঁহারা কেহই হিন্দু পুরাণোক্ত দেবদেবী নহেন। অনেক সময় তাঁহাদের নাম দেখিয়া ভ্রম হইতে পারে, কিন্তু নামে কিছুই আসিয়া যায় না—দেবদেবীদিগের প্রকৃত পরিচয় তাহাদের নামে নহে, তাঁহাদের আচরণে। অতএব লক্ষ্মী নাম দেখিলেই তিনি পৌরাণিক বিষ্ণুর সমুদ্রমন্থনোদ্ভবা পত্নী বলিয়া মনে করিবার কোনও কারণ নাই। আদিম সমাজের সঙ্গে উচ্চতর সমাজের সংমিশ্রণের (fusion) ফলে সমাজের মধ্যে দেবতা সম্পর্কে অনিষ্টকারিণী শক্তির (malignant power) পরিকল্পনার সঙ্গে সঙ্গে একটি শুভঙ্করী (benevolent) শক্তির পরিকল্পনাও স্থান পাইয়াছিল। আর্য ও আর্যেতর সমাজের মিশ্রণের ফলে যে-সকল দেশে নূতন সমাজ-সংহতি গড়িয়া উঠিয়াছিল, কেবলমাত্র তাহাদেরই সমাবেশ হইয়াছে।

ব্রতকথার দেবতা প্রাত্যহিক জীবনের ইষ্ট বা অনিষ্ট করতে পারেন। মঙ্গলকাব্যের দেব-দেবীর মত তিনি মঙ্গলকারিনী আবার প্রতিহিংসাপরায়ণা। এই দেবতার শক্তি 'ঐহিক জগতের মধ্যে সীমাবদ্ধ'। এঁদের কার্যকলাপের মধ্যে মনুষ্য আচরণ পরিস্ফুট। দেবতা ও মানুষে কোন পার্থক্য এখানে নেই। মানুষের মঙ্গলের জন্যে এখানে দেবতার কল্পনা ও মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাই ব্রতকথা মন্ত্র-তন্ত্র-জাঁকজমকহীন অতি সাধারণ পূজাচার। মঙ্গলকাব্যের দেবতার সঙ্গে ব্রতকথার দেবতার সম্পর্কের ইতিবৃত্ত রচনায় ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য্য লিখেছেন—

> ব্রতকথার দেবতাদিগের সঙ্গে মঙ্গলকাব্যের দেবতাদিগের ভাবগত সম্পর্ক আছে। প্রকৃতপক্ষে ব্রতকথা ভিত্তি করিয়াই উচ্চতর সাহিত্যে মঙ্গলকাব্যের সৃষ্টি হইয়াছে।[৫৫]

একথা বললে মনে হয় অত্যুক্তি হবে না, ব্রতকথার প্রসারিত কাহিনি সম্বলিত রূপ হল আখ্যানধর্মী মঙ্গলকাব্য। লোকসমাজ থেকে সূত্র সংগ্রহ করেছে ব্রত এবং ব্রত শেষাবধি সুগঠিত আঙ্গিকের বাঁধনে রূপ পেয়েছে মঙ্গলকাব্যে। লোককথার সঙ্গে ব্রতের সাদৃশ্য এখানে যে, লোককথা থেকে ব্রতকথার উপাদান সংগৃহীত হয়েছে। ফলে ব্রতকথার মধ্যে রয়েছে নির্ভেজাল সরলতা। 'ব্রত' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ এমন—

১. প্রার্থনা করা।
২. নিয়ম ও সংযম রক্ষা করা।
৩. নিয়মবিহিত ধর্ম-কর্ম পালন করা।

পুনশ্চ, বেদব্রত সম্পর্কে উদাসীন বা অজ্ঞানীদের বলা হত ব্রাত্য। কখনও সংস্কারহীন পতিত 'ব্রাত্য' রূপে চিহ্নিত হয়ে নিন্দিত হত আর্যদের চোখে। দশ সংস্কার মানেন না যিনি তিনিই ব্রাত্য। 'ব্রত' অর্থে শাস্ত্রবিহিত নিয়ম বোঝায় ঋগ্বেদে। সহজ কথায়, 'ব্রতচ্যুতই হল ব্রাত্য'। প্রচলিত ব্রতকথাগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—

১. কুমারী ব্রত : পুণ্যিপুকুর, যমপুকুর, সেঁজুতি, তুষ-তুষলি, মাঘমণ্ডল, বসুধারা, দশপুতুল, শিবব্রত।

২. সধবা ব্রত : ষষ্ঠী, সাবিত্রী, কোজাগরী, লক্ষ্মীপুজো, শিবরাত্রি, মঙ্গলচণ্ডী, ইতু।

৩. বিধবা ব্রত : অম্বুবাচী, একাদশী, অরণ্য ষষ্ঠী, সংকটতারিণী, তাল নবমী।

প্রাক্‌বৈদিক জনগণের মধ্যে ব্রতের প্রচলন ছিল এবং তারা নিয়মিত নানা ব্রত পালন করতেন। এসব ব্রতাচার বৈদিক আর্যদের পূজা পদ্ধতির থেকে একেবারেই পৃথক। বাঙালির লৌকিক সংস্কৃতিতে প্রাক্-আর্য এইসব ব্রতকথার প্রভাব অনেকখানি। আট থেকে আশি বছর বয়স পর্যন্ত কোনো না কোনো ব্রত মেয়েরা নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করতেন। এগুলি শাস্ত্র বহির্ভূত লৌকিক স্ত্রী আচার। ব্রতের জন্মকথা জানাতে গিয়ে নীহাররঞ্জন রায় লিখেছেন—

> ব্রতোৎসবের ইতিহাস অতি জটিল ও সুপ্রাচীন। তবে এই ধরনের ধর্মোৎসব যে প্রাক্-বৈদিক আদিবাসী কোমদের সময় হইতে সুপ্রচলিত ছিল এ সম্বন্ধে সংশয় বোধ হয় নাই।... ব্রতানুষ্ঠানে আলপনা দিয়া অথবা বৃত্তাকারে সীমা রেখা টানিয়া ব্রতস্থান নির্বাচন করিয়া লওয়া হয়; এই সীমারেখা টানা স্থান নির্বাচন বা চিহ্নিত করার মধ্যে যাদুশক্তির বা ম্যাজিকের বিশ্বাস প্রচ্ছন্ন।... এই ম্যাজিক-বিশ্বাসী ব্রতচারী লোকেরাই ঋগ্বেদীয় আর্যদের চোখে বোধ হয় ছিলেন ব্রাত্য।

ব্রতের সঙ্গে যাদুশক্তির সম্পর্ক অবশ্য বাধ্যতামূলক নয়। কল্পনা, বিশ্বাস, সংস্কার, কামনা, বাসনার একত্রিত সমাবেশ হল ব্রত। ব্রত বাসনা চরিতার্থ করতে সহায়তা করে। পূরণ করে পার্থিব কামনা। যে বক্তব্য কখনও অপরের কাছে আত্মপ্রকাশ করা সম্ভব নয়, নারীর একান্ত সেই কামনাও ব্রতের দেবতা শোনেন। পূরণ করেন অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা। সমাজ বিরূপ হলেও ব্রতের দেবতা বিরূপ হল না, এটাই সুবিধা। তবে ব্রত পালনে বিঘ্ন হলে দেবতা অখুশী হন। তখন পুণ্যলাভ তো দূরের কথা, অনিষ্ট আশঙ্কা হয় প্রবল। এমনকি রুষ্ট দেবতার প্রকোপে দারিদ্র্য হয় প্রকট। স্বামী-পুত্র হয় ক্ষতিগ্রস্ত। এই ক্ষতি আর্থিক, শারীরিক এমনকি মানসিক হতে পারে। সেক্ষেত্রে পুনরায় ব্রত পালন করা আবশ্যক। দেবতার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা, মানত করা, কঠিন সংযম রক্ষা করা বাধ্যতামূলক। পরিণামে ব্রতের দেবতা খুশি হলে ব্রতপালনকারিণীর হৃত সম্পদ পুনরুদ্ধার ও সমুদয় বিঘ্ন অপসারণ হয়। ব্রতের মূল লক্ষ্য প্রত্যেকের মঙ্গল কামনা। ফলে এখানে অনাবিল প্রশান্তি, স্নেহ-প্রেম-মমতা, উদ্বেগ-আকুলতা থেকে বিশেষ কোনো দেবতার উদ্দেশ্যে ব্রত পালন করা হয়। এমন কোনো মাস নেই যে ব্রত-পার্বণ পালন করা হয় না। অতি প্রাচীনকাল থেকে বঙ্গ বধূর মনে ব্রত পালনের ইচ্ছা সংগুপ্ত থাকত। এ প্রসঙ্গে কয়েকটি বিষয় লক্ষণীয়—

১. ব্রতের জন্মকথা অতি প্রাচীন। 'স্মরণাতীত কাল' থেকে চলে আসছে ব্রতানুষ্ঠান।
২. ব্রতের মধ্যে সামাজিক ও নৈতিক শিল্প থাকে প্রচ্ছন্ন।
৩. ব্রতের 'কথা' গুলি হল অতীতের 'অলিখিত ইতিহাস'। এদিক থেকে এর গুরুত্ব তুল্যমূল্য।
৪. ব্রতের মধ্যে থাকে 'অনাবিল সৌন্দর্যের ছবি'।
৫. ব্রতের যে আখ্যান বা 'কথা', তার ভাষা আদিম ও আন্তরিক। সে ভাষা অলংকারবিলাস বিহীন। এজন্যে তা ঐতিহ্যবাহী।
৬. ব্রতকথায় দেখা যায়, দেবীমূর্তির অন্তরালে অবস্থান করে মানবীমূর্তি।
৭. ব্রতের লক্ষ্য গৃহকল্যাণ। নষ্টসম্পদ উদ্ধার কিংবা পরিবারের সুখ-সমৃদ্ধি প্রত্যাশা।
৮. কখনও বা রুষ্ট দেবতাকে তুষ্ট করে 'লব্ধৈশ্বর্যে গরীয়সী' হওয়া ব্রতকারিণীর উদ্দেশ্য।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রতের উৎপত্তির ইতিহাস নির্ণয়ে লিখেছেন—"নানা ঋতুর মধ্যে দিয়ে নানা সব ঘটনা মানুষের চিন্তাকে আকর্ষণ করেছে এবং এই সকল ঘটনার মূলে দেবতা অপদেবতা নানারকম কল্পনা করে নিয়ে তারা শস্য কামনায়, সৌভাগ্য কামনায়—এমনি নানা কামনা চরিতার্থ করবার জন্য ব্রত করেছে, কি আর্য, কি 'অন্য ব্রত' সব দলেই। এইটেই হল ব্রতের উৎপত্তির ইতিহাস।"

৩.১ পুণ্যিপুকুর

বৃষ্টির জন্যে ঐন্দ্রজালিক অনুষ্ঠান করা হয়ে থাকে। এই রীতি মূলত জনজাতি সংস্কৃতি সংঞ্জাত। এই ব্রত মূলত বৃষ্টিকামনা বিষয়ক। বাংলাদেশে মেঘরানির ব্রত পালন করা হয় একই উদ্দেশ্যে।

এমনকি বসুধরা ব্রতের উদ্দেশ্যও তাই। বৈশাখ মাসে এই ব্রত পালন করা হয়। ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়ায় বৃষ্টিপাত করিয়ে পৃথিবীকে শস্য-শ্যামলা রূপদান করাই এই ব্রতের মূল লক্ষ্য। এই ব্রতের সঙ্গে যুক্ত থাকে ঐশ্বর্য কামনা। এই ব্রত একান্তই লৌকিক ব্রত। পুরোহিতের কোনো প্রয়োজন এখানে নেই। ব্রতকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে অসংখ্য ছড়া। এই ছড়াগুলি আসলে অনুষ্ঠানের মন্ত্রস্বরূপ। নারী তার মনের কামনার প্রকাশ হিসেবে এই ছড়া আবৃত্তি করে থাকে। এমন একটি ছড়া হলো—

পুণ্যিপুকুর পুষ্পমালা
কে পূজে গো দুপুরবেলা
আমি সতী লীলাবতী
সাত ভাইয়ের বোন ভাগ্যবতী
স্বামীর কোলে পুত্র দোলে
মরণ হয় যেন একগলা গঙ্গাজলে।

পুণ্যিপুকুর ব্রত কুমারী ব্রত। কুমারীরা এই ব্রত ছাড়া মাঘমণ্ডল, শিব ব্রত, সেঁজুতি ব্রত, তুষ-তুষলি ব্রত পালন করে থাকে। এই ব্রতের কিছু নিজস্ব নিয়ম আছে। একটি ছোটো গর্ত করে তার চারপাশে চারটি ঘর স্থাপন করতে হয়। এই চারটি ঘরে থাকে—একটি শাঁখ, একটি চন্দনকাঠ, একটি সুপারি ও একটি সিঁদুর কৌটো। পুকুরের মাঝখানে একটি তুলসী গাছের সঙ্গে একটি বেল গাছের ডাল পুঁতে দেওয়া হয়। এরপরেই মেয়েরা ছড়া কাটতে থাকে। এই ব্রতের বৈশিষ্ট্য হলো—

১. এই ব্রতের আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া মূলত একটি পুকুরকে কেন্দ্র করেই সম্পন্ন হয়। এই ব্রতটি ঐন্দ্রজালিক উপায়ে বৃষ্টিপাত করিয়ে পৃথিবীকে শস্য-শ্যামলা করার আকাঙ্ক্ষা থেকেই পালিত হয়।
২. কুমারী ও সধবা নারীরা তাদের কামনা-বাসনা প্রকাশ করে ছড়ার মাধ্যমে। প্রিয়জনের মঙ্গলকামনায় এই ব্রতের ছড়া আবৃত্তি করে ব্রতটি পালন করা হয়। ব্রতের ছড়ায় বলা হয়, যে এই ব্রত পালন করে তার ধন-সম্পদ-সার্বিক সমৃদ্ধি হয়।
৩. ব্রতের মূল উদ্দেশ্য হলো—প্রবল দাবদাহের হাত থেকে সজীব-সতেজ গাছপালাগুলিকে বাঁচানো। বৈশাখ মাসের প্রচণ্ড গরমে যাতে জল শুকিয়ে না যায় এবং ফসল নষ্ট না হয়, সেই চিন্তা-ভাবনা থেকে এই ব্রত পালন করা হয়।
৪. প্রত্যেকটা ব্রতের মধ্যে থাকে একটি গল্প। সেই গল্পের মধ্যে ভালো-মন্দ দুই থাকে। এই গল্পের মধ্যে রয়েছে এক ব্রাহ্মণকে ভোজন করানোর আর্শীর্বাদ প্রাপ্তি।
৫. প্রত্যেক ব্রতের শেষে দেখা যায় অলৌকিক ক্ষমতাশালী কেউ এসে অভূতপূর্ব কোনো অসাধ্য বিষয় সাধন করে দিচ্ছেন।
৬. পুণ্যিপুকুর ব্রতে ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশ ধরে বুদ্ধবেশী নারায়ণ পূজারিণীকে আর্শীবাদ করেন, পূজারিণীর পুণ্যিপুকুর ব্রত সঠিকভাবে সম্পন্ন হয়েছে। সুতরাং, প্রভাতেই তার দুঃখ দূর হবে।
৭. ব্রতের শেষে অসম্ভব সম্ভবপর ঘটনা সম্পন্ন হয়। এই ব্রতে দেখা যায় স্বয়ং রাজা তাঁর ছেলের সঙ্গে ব্রাহ্মণের কন্যার বিবাহ দেওয়ার সংকল্প করেছেন। অর্থাৎ ব্রত

সংকল্পকারিণী নারায়ণের ইচ্ছায় অসাধ্যসাধন করেছে।

৮. ব্রত শেষে ব্রতের মাহাত্ম্যকথা চারিদিকে কীর্তিত হয়। এই ব্রতের মধ্যে ধনী ও দরিদ্র্যের পারস্পরিক বিরোধ অবসিত হয়েছে। দেখা গিয়েছে ব্রত করার ফলে ব্রতকারিণী রাজৈশ্বর্যের অধিকারিণী হয়েছে। সেই থেকে পুণ্যিপুকুরের ব্রত চারিদিকে প্রচারিত হয়েছে।[৩০]

৯. পাশাপাশি এটাও দেখার যে, লোকায়ত মানুষ বিশ্বাস করে এই ব্রত করার ফলে প্রকৃতি তার রুদ্র রূপ পরিত্যাগ করে অবশেষে শুভঙ্করী সত্তায় আত্মপ্রকাশ করেন।

১০. গ্রীষ্মের প্রচণ্ড দাবদহের হাত থেকে খাল-বিল-নদ-নদী-পুকুরের জল যাতে শুকিয়ে না যায়, সেই সংকল্প থেকে এই ব্রত পালিত হয়েছে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, একদিকে সামগ্রিক মঙ্গল ও পাশাপাশি বৃষ্টির আবাহন কামনায় নারীরা এই ব্রত পালন করে থাকে। এই ব্রত চৈত্র মাসের সংক্রান্তির দিন থেকে শুরু হয়। পুরো বৈশাখ মাস ধরে এই ব্রত পালন করা হয়। রাঢ় অঞ্চলে চৈত্র সংক্রান্তি থেকে বৈশাখ সংক্রান্তি পর্যন্ত পালিত এই ব্রতের মূলে রয়েছে বৃষ্টি কামনা। মূলত বাঁকুড়া ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলায় এই ব্রতের ব্যাপক প্রচলন রয়েছে।

৩.২ মাঘমণ্ডল

আদিম প্রভাবজাত উর্বরতা বৃদ্ধির জন্যে নানারকম জাদুক্রিয়ার প্রচলন লক্ষণীয়। এই জাদু ক্রিয়ার সঙ্গে নানারকম আচার-বিচার প্রথার গভীর সংযোগ রয়েছে। এই ব্রতের সঙ্গে শস্য-উর্বরতা-কৃষি-জাদু শক্তির সম্পর্ক রয়েছে। সৌর জগতের সঙ্গেও এই ব্রতের সম্পর্ক সূত্র নির্দেশ করা হয়। মাঘ মাসে এই ব্রত পালন করা হয়। সূর্যের সঙ্গে এই ব্রতের গভীর সক্ষতা রয়েছে। বস্তুত এই ব্রতের সঙ্গে সূর্যের উপাসনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রতি মাঘ মাসে গৃহের প্রাঙ্গানে আলপনা এঁকে এই ব্রত পালন করা হয়। মাঘ মাসের প্রথম দিন থেকে সংক্রান্তি পর্যন্ত এক মাস ধরে এই ব্রত পালন করে মেয়েরা। সূর্য ওঠার আগে তার স্নান করে শুদ্ধ কাপড় পড়ে দলবদ্ধভাবে পুকুর ঘাটে যায়। সূর্যের উদ্দেশ্যে তারা মন্ত্র উচ্চারণ করে। সেই মন্ত্র কোনো সংস্কৃত পণ্ডিতের উচ্চারিত দুর্বোধ্য মন্ত্র নয়। এই মন্ত্রের মধ্যে রয়েছে সহজ-সরল গ্রাম বাংলার ব্রতবাসিনী মেয়েদের নিজস্ব সুর ও স্বর। একটি করে ফুল সূর্যের উদ্দেশ্যে সমর্পণ করা হয়। আর তার সঙ্গে চলে সুরের আবাহন। এই ব্রতের মধ্যে থাকে কৃষিকাজের শ্রীবৃদ্ধির সম্ভাবনা। এই ব্রতের কতকগুলি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হলো—

১. অবিবাহিতা মেয়েরা এই ব্রত পালন করে মনের মতো পতিপ্রাপ্তির কামনায়।

২. পরিবারের মঙ্গালকামনাতেও এই ব্রত পালন করা হয়।

৩. এই ব্রতের মধ্যে থাকে গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষের লোকবিশ্বাস।

৪. ব্রতের আলপনায় সূর্য-চন্দ্র-তারা-পৃথিবী ইত্যাদির ছবি আঁকা হয়।

৫. ব্রতের মধ্যে ধরা পড়ে আদি বৃক্ষ উপাসনা। এর সঙ্গে সংযুক্ত হয় সূর্যোপাসনা। সূর্যের সঙ্গে পৃথিবীর অঙ্গাঙ্গি সম্পর্ক। ফলে ব্রতের মধ্যে পৃথিবীর উপাসনাও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পায়।

৬. এই ব্রতের সঙ্গে কৃষিকেন্দ্রিক আর্থ-সামাজিক অবস্থানের প্রত্যক্ষ সংযোগ ঘটে।

৭. শস্য সংক্রান্ত জাদুক্রিয়া মাঘমণ্ডল ব্রতের মধ্যে দেখা যায়।

৮. সূর্য ছাড়া জগতের কোনো অস্তিত্ব নেই। তাই সূর্যোকেই ব্রতবাসিনীরা সশ্রদ্ধ প্রণতী জ্ঞাপন করে।

৯. এই ব্রত পালনের নিজস্ব কতকগুলি নিয়মাচার রয়েছে। যেমন—পুকুরের স্নান ঘাটে কলাগাছ পুতে তার গোড়ায় আম্রপল্লবসহ মাটির ঘট বসাতে হয়। মাঘ মাসের সংক্রান্তির দিন পুরোহিত পুকুরের ধারে খোলা জায়গায় পুজো করেন। এই সময় ব্রতীরা এভাবে ছড়া উচ্চারণ করেন—

আউলে মাঘে শ্রীদুর্গার আগে
শ্রীদুর্গা জল না ছুইতে আমরা ছুইছি আগে।
আউগে মাঘে সইষ্য ফুলের আগে
সইষ্য ফুলে জল না ছুইতে আমরা ছুইছি আগে।

ড. শীলা বসাক 'বাংলার ব্রতপার্বণ' নামাঙ্কিত গ্রন্থে লিখেছেন, "মাঘমণ্ডল ব্রত আসলে সূর্যপূজা। সূর্যের রশ্মিতে সব জীবাণু নষ্ট হয়ে যায়।" অর্থাৎ এই ব্রতের সঙ্গে বিজ্ঞানের একটা সম্পর্ক রয়েছে। শুধু পশ্চিমবঙ্গ নয় ত্রিপুরার কোনো কোনো অঞ্চলে এই ব্রত পালন করা হয়। আবার বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলাতে এই ব্রত পালন করা হয়। কুমিল্লা জেলায় দেখা যায়, "ব্রতের দিন ব্রতিনী স্নান করে শুচি বস্ত্রে পিটুলি, তুষ, ইঁটের গুঁড়ো, আবির ইত্যাদি মিশিয়ে একপ্রকার রং তৈরি করে তা দিয়ে উঠোনের মাঝখানে পৃথিবী অর্থাৎ একটি গোলাকার বৃত্ত অঙ্কন করে। বৃত্তের পূর্ব দিকে সূর্য এবং পশ্চিমদিকে চন্দ্রের চিত্র আঁকা হয় এবং বৃত্তের ভিতরে মানুষের মূর্তি অঙ্কন করা হয়।"[৩১]

৩.৩ সেঁজুতি ব্রত

সেঁজুতি ব্রত হলো কুমারী ব্রত। কার্তিক মাসের সংক্রান্তি থেকে অগ্রহায়ণ মাসের সংক্রান্তি পর্যন্ত এক মাস ধরে প্রতি সন্ধ্যায় বাড়ির প্রাঙ্গণে আলপনা দিয়ে ও প্রদীপ জ্বালিয়ে এই ব্রত পালন করা হয়। এই ব্রতের মূল উদ্দেশ্য হলো পারিবারিক শ্রীবৃদ্ধি কামনা। ব্রতের আলপনায় ও ছড়ায় কুমারী মনের প্রার্থনা উচ্চারিত হয়। এই ব্রত একেবারেই অশাস্ত্রীয় ব্রত। কোনো পুরোহিতের প্রয়োজন নেই। কোনো মন্ত্রের অনুশাসন নেই। তিনটি পর্যায়ে এই ব্রত পালন করা হয়। বিষয়টি এমন—

- প্রথম পর্যায়ে ব্রত পালনের প্রয়োজনীয় উপকরণ অর্থাৎ একটি কলসি, পিটুলি, দুর্বাঘাস, প্রদীপ, ধূপ ও একটি জলে পরিপূর্ণ ঘট সংগ্রহ করা হয়।
- দ্বিতীয় পর্যায়ে আলপনা আঁকা হয়। সেই আলপনার মধ্যে কুমারী মনের বাসনা এবং তার প্রার্থনা সুচিত্রিত হয়।
- তৃতীয় পর্যায়ে প্রতিটি লেখাচিত্রের উপর একটি করে দুর্বা দিয়ে মনের ইচ্ছা পূরণ করার জন্যে ছড়া আবৃত্তি করা হয়।

সেঁজুতি ব্রতের ছড়ায় ব্রতিনীর বাসনা প্রকাশিত হয় যথাযথ শিল্পীত ছড়ার বাঁধনে—

কোঁড়ার মাথায় দিয়ে ঘি
আমি হই রাজার ঝি।

কোঁড়ার মাথায় দিয়ে মৌ
আমি হই বাজার বৌ।
কোঁড়ার মাথায় দিয়ে ফাগ
আমি হই রাজার মাগ।

এই প্রসঙ্গে বলে নেওয়া ভালো যে, ব্রত মূলত নারীর বাসনার বহিঃপ্রকাশ। কল্পনা, বিশ্বাস, জাদু, স্বপ্ন, বাস্তবতা, প্রতীক, চিত্র, রেখা, কথন ইত্যাদির সমন্বয় হলো ব্রত। বাঙালির আচার-বিচার-উপাচার বিচার করলে দেখা যায়, এই ব্রতগুলির মূল লক্ষ্যই হচ্ছে পরিবার কল্যাণ ও সমাজকল্যাণ। দেশাচার ও কুলাচার এই ব্রতের সঙ্গে যুক্ত। ব্রতের সব ছড়াতেই সুখ-সৌভাগ্য, ঐশ্বর্য আর শত্রু বিনাশের কামনা আছে। ব্রতের চতুরঙ্গ উপাদান লক্ষণীয়। যথা—আচার, আলপনা, ছড়া বা মন্ত্র ও কথা। ব্রত দুই প্রকার—শাস্ত্রীয় ও লৌকিক। এই ব্রতের মধ্যে রয়েছে প্রাচীনতার স্বাক্ষর। ব্রতের মধ্যে বাঙালির আদিমতা ও বাঙালির অন্দরমহলের ঐতিহ্যের সন্ধান পাওয়া যায় অনায়াসে।

উৎসের সন্ধানে

১. Herslovites, Melville j, 1966, Cultural Dynamics, New York, Alfred A. Kropf. P. 4.
২. পবিত্র সরকার। লোকভাষা : লোকসংস্কৃতি। ১৯৯৭, পৃ ১১।
৩. Kluckhohn, Mirror for Man, Greenwich, Conn, Fawcett Publications, Inc. p-42.
৪. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। সংস্কৃত শিল্প ইতিহাস, পৃ. ৬।
৫. ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। সাহিত্য ও সংস্কৃতির তীর্থ সঙ্গমে। পৃ. ৪৫৮।
৬. জ্যোর্তিময় ঘোষ। রবীন্দ্রমনন ও সৃষ্টিলোক। দে'জ। জানুয়ারী ১৯৯৮, পৃ. ৬২।
৭. স্বামী লোকেশ্বরানন্দ সম্পাদিত : ভারত-সংস্কৃতির রূপরেখা। রামকৃষ্ণ মিশন লোকশিক্ষা পরিষদ, ১ জানুয়ারি, ২০০৩। পৃ. ২১৪।
৮. সাক্ষাৎ : সুকুমার সরকার। পিতা—ঁবনমালী সরকার। গ্রাম—শিবতলা। ডাকঘর—হৃদয়পুর। থানা—বারাসত। কল—৭০০ ১২৭। সম্প্রদায়—নমঃশূদ্র। পেশা—কৃষিকাজ। সাক্ষাতের তাং-৩১শে চৈত্র ১৪১১।
৯. Encyclopaedia Britanicca. Vol. IV, 1929, P. 444.
১০. Gouri Prasad Ghose : Everyman's Dictionary, Ramakrishna Pustakalaya, September 20001, P. 664.
১১. Charles Wirck : Dictionary of Anthropology 1956, U.S.A. p. 217.
১২. International Dictonary of Regional European Ethnology and Folklore, Vol-1, 1960, p-126.
১৩. Devid E Hunter and Phillip Whiten : Encyclopaedia of Anthropology, U.S.A., 1976, P. 173.
১৪. ড. তুষার চট্টোপাধ্যায় : লোকসংস্কৃতি পাঠের ভূমিকা। দে'জ, কলকাতা। বৈশাখ, ১৪০৮। পৃ. ৪৩-৪৪।

১৫. প্রাণরঞ্জন চৌধুরী সম্পাদিত। 'গণকণ্ঠ' পত্রিকা, ১৯৮৫, ''লোকসংস্কৃতি'' শীর্ষক প্রবন্ধ, পৃ. ৪০।
১৬. সাক্ষাৎ : মানিক সিংহ। প্রযত্নে—বিশ্বেশ্বর সিংহ। গ্রাম-চারঘাট। ডাকঘর—চারঘাট। থানা—স্বরপনগর। জেলা—উত্তর চব্বিশ পরগনা। সম্প্রদায়—রাজবংশী। পেশা—মৎস্য শিকার। সাক্ষাতের তারিখ—১২-০২-২০০২।
১৭. সাক্ষাৎ : বলাই মণ্ডল। প্রযত্নে—কানাই মণ্ডল। গ্রাম—চারঘাট। ডাকঘর—চারঘাট। থানা—স্বরপনগর। জেলা—উত্তর চব্বিশ পরগনা। সম্প্রদায়—পৌণ্ডক্ষত্রীয়। পেশা—চাষাবাদ। সাক্ষাতের তারিখ—১২-০২-২০০২।
১৮. Elman R. Service : Profiles in Ethonologies, 1971, U.S.A., P. 170.
১৯. ড. তুষার চট্টোপাধ্যায়। লোকসংস্কৃতি পাঠের ভূমিকা। দে'জ, কলকাতা। বৈশাখ ১৪০৮, পৃ. ৪০।
২০. G. P. Kurath : S D. F. L., P. 40.
২১. United Nations Educational Scientific & Cultural Organisation, Paris, 1984.
২২. Mac Edward Leach : The Standard Dictionary of Folklore, Mythology and Legends, Vol. I, P-401.
২৩. Archar Tylor : Folklore and the students of literature, volume 2, Pacific spectator, 1948, P. 216.
২৪. দুলাল চৌধুরী। বাঙলার লোকসাহিত্য ও সংস্কৃতি। লোকায়ত প্রকাশনী, কলকাতা। ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৩।
২৫. মযহারুল ইসলাম। লোককাহিনী সংগ্রহের ইতিহাস। স্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা। ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৫০।
২৬. তুষার চট্টোপাধ্যায়। লোকসংস্কৃতির তত্ত্বরূপ ও স্বরূপ সন্ধান। এ মুখার্জী এণ্ড কোম্পানী প্রাঃ লিঃ। ১৪০১ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৮৬।
২৭. বাঁকুড়ার সভায় ভাষণ। ফাল্গুন, ১৮, ১৩৪৬।
২৮. শ্রীনিকেতনে বাৎসরিক উৎসবে ভাষণ। চৈত্র, ১৩৩৭।
২৯. লোকসাহিত্য, বিশ্বভারতী, পৃ. ৯২।
৩০. সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায় : 'পশ্চিম সীমান্ত-বঙ্গের লোকসাহিত্য', ১৯৭৬ খ্রি., পৃ. ১৬৬-১৬৮
৩১. ড. শীলা বসাক : 'বাংলার ব্রত পার্বণ', পুস্তক বিপণি, মে ১৯৯৮, পৃ. ৪১৪

লোকসংস্কৃতি ঠিক কোন্ সংস্কৃতি

সৌগত চট্টোপাধ্যায়

জাতীয়তাবোধ পৃথিবীর প্রায় সব দেশের লোকসংস্কৃতি চর্চার প্রথম পর্বে সক্রিয় ছিল একথা ঠিকই, কিন্তু নিছক স্বাজাত্যবোধের স্ফূরণই যে 'লোকসংস্কৃতিচর্চা' নয়, সেকথা বুঝতে আমাদের অনেক দিন অপেক্ষা করতে হয়েছে। 'Folk' বা 'লোক' বলতে গোটা আঠারো এবং উনিশ শতকের বিশ্ব মূলত গ্রামীণ অশিক্ষিত কৃষিজীবী মানুষকেই বুঝেছিলেন। 'আদিবাসী সংস্কৃতি' এবং 'লোকসংস্কৃতি' যে আলাদা এমন ধারণাও বিদ্যমান ছিল। 'লোকসংস্কৃতি' বলতে তাঁরা মূলত বুঝতেন, শ্রেণিভিত্তিক গ্রামীণ অঞ্চলের সংহত সমাজে বসবাসকারী নিরক্ষর কৃষিজীবী সম্প্রদায়ের নৈর্ব্যক্তিক পরিশীলিত মৌখিক ঐতিহ্যকে।

গোষ্ঠীবদ্ধ সমাজ : নির্দিষ্ট ঐতিহ্য বা সংস্কৃতিকে আশ্রয় করে যে 'সংহত' সমাজ। গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষ তিনিই, যার বলতে বোঝায় 'গোষ্ঠীচেতনা'। এই চেতনা প্রকাশ পায়, নির্দিষ্ট যে গোষ্ঠীতে তার বাস, সেই গোষ্ঠীর অন্তর্গত মানুষের সঙ্গে তাঁর দৈনন্দিন যাপনের অভিন্নতায়।

ঠিক এমনই গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষের দেখা মিলেছিল কিছুটা উন্নততর সমাজে এসে। সমাজ তখনও পুরোপুরি কৃষিভিত্তিক হয়নি। কিছু মানুষ শিকার, সংগ্রহ ইত্যাদির সঙ্গে সঙ্গে পশুপালনকেও তাদের জীবিকা করে নিয়েছিলেন। কেউ কেউ কৃষিকে নির্ভর করেও নিজেদের জীবিকার সংস্থান করতে শুরু করেছিলেন। তুলনায় অগ্রবর্তী এই স্তরের সংস্কৃতিই 'আদিবাসী লোকসংস্কৃতি' নামে পরিচিত। আদিবাসীরা আদিম মানুষের উত্তরসূরী রূপে কথিত হয়। কিন্তু ড. মযহারুল ইসলাম লিখেছেন: দেশে দেশে বিভিন্ন সমাজ ও দল যখন একটি স্তর থেকে আর একটি স্তরে উন্নীত হয়েছে তখন উন্নয়নের পথে সে তার সঙ্গে এনেছে প্রত্যেক স্তরের সৃষ্টিকে। সেই সৃষ্টি যেমন বস্তুগত তেমনি অ-বস্তুগত, যেমন সংস্কৃতিগত তেমনি সমাজগত। যুগ ও সমাজস্তরের পরিবর্তনে তার সংস্কৃতিতে ফলত নেমে এসেছে রূপান্তর। 'ফোকলোর'-এর মধ্যে এ সৃষ্টিকর্ম বস্তুতে ও ভাবে, শিল্পে ও সাহিত্যে, আচারে ও বিশ্বাসে, উৎসবে ও সংস্কারে নানা ভাবে রূপায়িত। একদিক থেকে দেখতে গেলে তাই 'ফোক' তারাও যারা সুদূর আদিম কালে সংস্কৃতির বীজ বপন করেছিলেন[১], যদিও আদিম মানুষ 'ফোক' নন। কারণ আদিম কালে 'গোষ্ঠী' সেভাবে প্রকট হয়নি। লোকসংস্কৃতি কিন্তু 'গোষ্ঠীকেন্দ্রিক' সংস্কৃতি। Premitive Lore হয়, কিন্তু Premitive Folklore হয় না।

'Folklore' বলতে আমরা কী বুঝি এপ্রসঙ্গে বলা যায়—উনিশ শতক পর্যন্ত লোকসংস্কৃতিবিদ্‌দের ধারণা ছিল নিম্নবিত্ত গ্রামীণ পরিবেশের কৃষিজীবী মানুষরাই শুধু 'লোক',

তাদের সংস্কৃতিই 'লোকসংস্কৃতি'। এই ধারণা বলবৎ ছিল, যখন ফোকলোর 'Popular Antiquity' এবং 'Popular Literature' নামে পরিচিত ছিল তখন থেকেই। তারপর বিশ শতকের তিনের দশক পর্যন্ত সেই ধারণা পুরদস্তুর বিদ্যমানও ছিল। রাশিয়ার বস্তুবাদী তাত্ত্বিকদের হস্তক্ষেপেই প্রথম শোনা গেল লোকসংস্কৃতি 'শ্রমজীবী' মানুষেরও সংস্কৃতি। তারপর আমেরিকার প্রখ্যাত লোকসংস্কৃতিবিদ্ অ্যাল্যান ডান্ডেস স্পষ্ট ঘোষণা করলেন— 'লোক' হলো একটি গোষ্ঠী বা বর্গের অন্তর্গত একজন সদস্য, যার থাকবে একটি নির্দিষ্ট ঐতিহ্য বা সংস্কৃতি, যাকে তিনি একান্ত 'নিজেদের' বলে মানবেন। এই ঐতিহ্য বা সংস্কৃতি যেমন পরম্পরা সূত্রে প্রাপ্ত হতে পারে, তেমনি হতে পারে একান্ত সাম্প্রতিকও বটে। গোষ্ঠী যেমন ছোটো আকারের একটি পরিবার হতে পারে, তেমনি হতে পারে বড়ো আকারের একটি জাতিও। কিন্তু তারা নিশ্চয় জানবেন তাদের ঐতিহ্যের মূল সূত্রগুলি। তাতেই তৈরি হবে তাদের গোষ্ঠীচেতনার ভিত্তি।[২]

একটি বড়ো গোষ্ঠীতে আবার নানান উপবর্গও থাকতে পারে এবং থাকেও। বাঙালি জাতির ফোকলোরে কৃষক যেমন আছেন, তেমনি আছেন মজুর ও কারিগরেরা। কিংবা আরও কেউ কেউ। এরা আবার হিন্দু-মুসলমান-খ্রিষ্টান ভেদে পৃথক। নিশ্চয় সকলের ফোকলোর এক নয়। তবে তাদের সকলের মাতৃভাষা যে বাংলা তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু তা বলে কি সকলে একই রকম বাংলা ভাষায় কথা বলেন? নিশ্চয় তা নয়। বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলার বাঙালি আর পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তের বাঙালির মাতৃভাষা নিশ্চয় একরকম নয়। তাই যখন বলা হয় লোকসংস্কৃতি 'সংহত' জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতি, তখন 'সংহত' শব্দটিতে আপত্তি ওঠে, উঠতে পারে। একই গোষ্ঠীর অন্তর্গত হওয়া সত্ত্বেও ধর্ম-ভাষা-পেশা ইত্যাদির নিরিখে তাদের মধ্যে বিভেদ যথেষ্ট। তবে প্রত্যেক স্বতন্ত্র গোষ্ঠীর মানুষই স্বতন্ত্র ভাবে 'ফোক' এবং এইরকম প্রত্যেক গোষ্ঠীর সমন্বয়ে গড়ে ওঠা বাঙালি জাতির সংস্কৃতি 'বাঙালি ফোকলোর'-এর অন্তর্গত সন্দেহ নেই।

এখন কথা হল, 'গোষ্ঠীভিত্তিক' এই যে সংস্কৃতি তাতে কি ব্যক্তি'র কোনো স্থান নেই? অবশ্যই আছে। ছড়া-প্রবাদের স্রষ্টা তো কোনো না কোনো একজন 'ব্যক্তি'। লোকশিল্পের কারিগর তো কোনো না কোনো একজন 'মানুষ'। কিন্তু কথা হল, 'ব্যক্তি' থাকলেও তিনি ডুবে যান 'দল'-এ। সমষ্টির সৃষ্টি বলেই আসে লোকসংস্কৃতির মান্যতা।

গোষ্ঠীবদ্ধতা লোকসংস্কৃতির সবচেয়ে বড়ো সূচক। তার সৃষ্টি গ্রামে না নগরে, তা শীলিত না অপরিশীলিত, লিখিত না মৌখিক, পরম্পরাবাহিত না একান্ত সাম্প্রতিক, এসব প্রশ্ন অবান্তর। 'গ্রামীণ' বা 'নাগরিক' যেকোনো লোকই যে-কোনো সময়ে 'ফোক'। যেহেতু পেশা-ভাষা-ধর্ম ইত্যাদির ভিত্তিতে আমরা সবসময়ই কোনো না কোনো গোষ্ঠীতে বিচরণ করছি তাই আজ আর স্বতন্ত্রভাবে কোনো 'লোকসমাজ' এর কল্পনা করা যায় না। 'লোকসমাজ' থাকলে একটি অ-লোকসমাজ'-ও আছে ধরে নিতে হবে। দুটি সমাজের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব কী বাস্তবে দেখানো সম্ভব? আবার একই ব্যক্তির একাধিক গোষ্ঠীতে বিচরণ করার ঘটনাও সমানভাবে সত্য। যেমন—একজন ছৌ মুখোশ নির্মাতা একই সঙ্গে 'সাঁওতাল' এবং 'কারিগর', দুটি গোষ্ঠীর অন্তর্গত। 'Non Folk' বা অ-লোক বলে তাই কেউ নেই। তবে 'Non Folklore' অবশ্যই আছে। কারণ আমরা সকলে কোনো না কোনো অর্থে 'ফোক' বলে গণ্য হলেও

আমাদের অভিব্যক্তি (Expression) মাত্রেই 'ফোকলোর' হয়ে যায় না। অবশ্যই সেই অভিব্যক্তিতে আসতে হবে 'যে গোষ্ঠীতে আমার বাস' অথবা 'যে গোষ্ঠীর হয়ে তা রচিত' তার স্বীকৃতি। Ben Amos তাই বিশ শতকে 'লোকসংস্কৃতির' নতুন সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বললেন, তা গোষ্ঠীর অন্তর্গত শিল্পিত সংযোগ অথবা গোষ্ঠীকেন্দ্রিক সংযোগ প্রক্রিয়া।[৩]

গোষ্ঠীকেন্দ্রিক এই সংস্কৃতিকে অবশ্যই বিচার করতে হবে গোষ্ঠী বিশেষের সামাজিক অবস্থান বা 'Context' এর ভিত্তিতে। সেই অনুযায়ীই তাদের ঐতিহ্য বা সংস্কৃতি, যাকে বলে 'Text' , তার বিচার সম্ভব। 'Text' এর মধ্যেই লুকিয়ে থাকে 'Texture', বা যে শৈলীতে ওই নির্দিষ্ট সংস্কৃতিটি গড়ে উঠেছে তার বৈশিষ্ট্য। কিন্তু 'Context' ছাড়া এসব বিচার করাই অর্থহীন। নির্দিষ্ট কোনো লোককথার তাৎপর্য ঠিক ঠাক বোঝা যাবে না, যে নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীতে তার উদ্ভব, সেখানে উপস্থিত না হলে। 'গম্ভীরা' বোঝা যাবে না তার পরিবেশে গিয়ে উপনীত না হলে। 'Context' ছাড়া 'Text' এবং 'Texture'-এর কোনো মূল্যই নেই। লোকসংস্কৃতি ও লোকসাহিত্যের বিচার বিশ্লেষণে তাই 'Contextural Methodology' বা 'পরিবেশ প্রসঙ্গ বিচার পদ্ধতি'র আজ এত গুরুত্ব! পরবর্তীকালে অবশ্য এই পদ্ধতির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আরও একটি ধারণা, যার নাম 'অভিকরণতত্ত্ব'। এতে বলা হচ্ছে যে, 'context'-কে আমরা এত গুরুত্ব দিচ্ছি, সেই 'Context' বা পরিস্থিতিও তো নিয়ত পরিবর্তনশীল। ফলে বদলে যেতে পারে 'Text' এবং 'Texture' ও। বারংবার 'পর্যবেক্ষণ' তাই জরুরি।

লোকসংস্কৃতির আজ স্পষ্ট তিনটি পরিসর—'আদিবাসী লোকসংস্কৃতি' (Tribal Folklore) 'গ্রামীণ লোকসংস্কৃতি' (Rural Folklore) এবং 'নাগরিক লোকসংস্কৃতি' (Urban Folklore)। দীর্ঘ কালাবধি আমরা 'লোকসংস্কৃতি' বলতে 'আদিবাসী' এবং 'গ্রামীণ' লোকসংস্কৃতিকেই বুঝে এসেছি, 'নাগরিক লোকসংস্কৃতি'র চর্চা শুরু হল এবং ক্রমশ বাড়ল বিশ শতকের ছয়-সাত দশকে এসে। ড. সৌমেন সেন লিখেছেন—

ওই সময় থেকে বিশেষত পাশ্চাত্যে, শিল্পাঞ্চলে, আবাসন-এলাকায়, হাটে-বাজারে এমনকি শিল্পমহল, বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর ইত্যাদি বলয়ে যে নতুন নতুন কিংবদন্তি, রঙ্গকথা, ছড়া-প্রবাদ, বাগধারা, ইত্যাদি তৈরি হল এবং কীভাবে গণমাধ্যম—পর্যটন শিল্প, বিজ্ঞাপন ইত্যাদিতে লোকসংস্কৃতির প্রয়োগ ঘটল, সেসব বিষয়ে চর্চা ক্রমশ বিস্তৃত হল। যিনি এই বক্তব্যে সবচেয়ে এগিয়ে এলেন তিনি জার্মানের লোকসংস্কৃতিবিদ্ হারমান বসিংগার। তিনি ঘোষণা করলেন, প্রযুক্তির জগৎ এবং লোকসংস্কৃতির জগতের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই। তিনি হারিয়ে যাওয়া বা নষ্ট হয়ে যাওয়ার তত্ত্ব বাতিল করে সম্প্রসারণের কথা বললেন। আমেরিকায় উদ্ভূত হল 'পাবলিক ফোকলোর'-এর ধারণাও।[৪]

ইতিপূর্বে ১৯৬২ সালে জার্মান লোকসংস্কৃতিরবিদ্ হ্যান্স মোজার প্রস্তাব করেছিলেন 'Folklorism' তত্ত্বটি। তারও আগে রাশিয়ায় প্রস্তাবিত হয়েছিল 'Folklorizm' এর ধারণা। এসব ধারণা বা তত্ত্ব ঘোষণা করছে লোকসংস্কৃতি পাল্টাচ্ছে অহরহ। কোনটা আসল কোনটা নকল—এসব প্রশ্ন না তুলে বরং আজ সেই পরিবর্তিত ঐতিহ্যকে বিচার করা জরুরি। 'ফোকলোরিজম'-এর তত্ত্ব সেই ধারণা বা উপলব্ধিরই লব্ধ ফল। কোনো সংস্কৃতিরই ঘাঁটি বা বিশুদ্ধ রূপ বলে কী সত্যি কিছু হয়? রেজিনা বেনডিক্সের লেখা 'In search of

Authenticity : The Formation of Folklore Studies' বইটি এক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বলে আমি মনে করি।

লোকসংস্কৃতির ভবিষ্যৎ নিয়ে তাই আতঙ্কের কিছু নেই। যুগে যুগে তার স্বরূপ বদলেছে, বদলেছে তার সংজ্ঞাও। ভবিষ্যতেও বদলাবে। কোনো সংস্কৃতিই স্থবির নয়। ইতিহাস যেমন 'অতীতের প্রবাহমাত্র নয়, ধারাবাহিকও নয়', দেশকালের সীমাহীনতায় তার নানা ছেদ, তেমনি 'সংস্কৃতিও' সময়ের নির্মাণ। সময় বদলানোর সঙ্গে সঙ্গে তার রূপান্তর স্বাভাবিক। তবু তারও মধ্যে কিছু থেকে যায় যা সংস্কৃতির 'মৌলিক' চরিত্র। একটি লোককথা যতই পরিবর্তিত হোক না কেন,তার মৌলিক চরিত্রের কিন্তু কোনো পরিবর্তনই হয় না। লোকসংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে এই কথাটি মনে রাখতে হবে।

উৎসের সন্ধানে

১. মযহারুল ইসলাম : 'ফোকলোর পরিচিতি ও পঠন-পাঠন', বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮৩, পৃ. ৮৮

২. Alan Dundes : 'Interpreting Folklore'. Bloomington : Indiana University Press, 1980, P. 6-7

৩. Ben-Amos Dan : 'Toward a Definition of Folklore in context', Journal of American Folklore 84, 1971, P. 17

৪. সৌমেন সেন : 'লোকসংস্কৃতি তত্ত্ব-পদ্ধতি', অঞ্জলি পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০১২, পৃ. ৮০

পর্ব : ২

ফিরে দেখা

বাংলার লোকউৎসব : তৃপ্তিহীন জিজ্ঞাসা ও মহান সম্বল

তুষার চট্টোপাধ্যায়

সৌভাগ্যক্রমে, একদিকে যখন শিক্ষাগত শৃঙ্খলাহীন স্বেচ্ছাচারী কর্মধারায় লোকসংস্কৃতি সাম্প্রতিককালের সর্বাধিক অপব্যবহৃত বিষয়, অন্যদিকে তখনই সাম্প্রতিক লোকসংস্কৃতি অন্বেষায় ব্যবসায়িক প্রচেষ্টা ও অদীক্ষিত প্রয়াস থেকে নিষ্ক্রমনের আর্তি সুস্পষ্ট এবং তথ্যের সাক্ষ্য থেকে তত্ত্বের দীপ্তদ্যুতিতে নবতর জিজ্ঞাসার, প্রান্তস্পর্শী হবার অভিনিবেশ অকুণ্ঠিত। অনুরূপে পটভূমিতে দাঁড়িয়ে সমগ্ররূপে বাংলার লোকধর্ম ও উৎসব অনুষ্ঠান পর্যালোচনা আকাঙ্খিত হলেও আলোচনাচক্রের সময় ও রচনা বিশেষের সীমাবদ্ধতায় এই মুহূর্তে তা কতিপয় সুনির্দিষ্ট বিষয়ের অনুষঙ্গেই রূপায়িত। বিষয়ানুষঙ্গে বর্তমান আলোচনা—টুসু, ভাদু, খেদাইবাবা, ভীম, প্রভৃতি কয়েকটি বাংলার তাৎপর্যপূর্ণ লৌকিক দেবদেবীর নামাঙ্কিত এবং অনিবার্যরূপে সংক্ষিপ্ত পরিক্রমায় স্থিত। অবশ্য সংক্ষিপ্ত অবয়বে স্থিত হলেও বর্তমান আলোচনা অনুশীলনের সুদীর্ঘ অন্তরালে নিঃসন্দেহে নিজস্ব চিন্তধারার পরিচয়ে প্রতিষ্ঠিত এবং স্বকীয় উচ্চারণে সংগৃহীত।

পশ্চিমবাংলার লৌকিক দেবদেবীর মধ্যে নদীয়া জেলার 'খেদাইবাবা'-র নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। নদীয়া জেলার চাকদহ থানার খেদাই ঠাকুরের বিশেষ প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। প্রধানত কৃষিযোগ্য জলজনিম্নভূমি বা আবাদ অঞ্চলে খেদাইবাবার পুজো ব্যাপকভাবে অনুষ্ঠিত হয়। সাধারণত সম্ভবপর প্রতি মঙ্গলবার ও শনিবার নিয়মিত পুজো হয়। শ্রাবণ সংক্রান্তির দিন খেদাই ঠাকুরের বাৎসরিক পুজো সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়। বাৎসরিক পুজোর কালে ব্যাপক উৎসব ও বৃহৎ মেলা সংগঠিত হয়।

খেদাই বাবার কোনোরূপ মূর্তি নেই। বৃক্ষ বিশেষের পাদমূলে খেদাই পুজো অনুষ্ঠিত হয়। সাধারণত নিমগাছ (Margosa-Azadirachta Indica) তলাই খেদাইতলা বা খেদাই বাবার থান হিসাবে বিবেচিত হয়। ক্ষেত্রবিশেষে বৃক্ষমূলে সর্পফণা শোভিত মাটির মূর্তি স্থাপিত হয়। ওই সমস্ত মূর্তি সাধারণত পঞ্চ বা অষ্টফণা যুক্ত হয়। ব্রাহ্মণ পুরোহিত কর্তৃক পুজো অনুষ্ঠিত হলেও জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সব শ্রেণির মানুষ খেদাই পুজোয় ভক্ত হিসাবে অংশ গ্রহণ করেন। বাৎসরিক পুজো সূর্যোদয়ের কালে সুরু হয় এবং সূর্যাস্ত পর্যন্ত সমস্ত দিন ব্যাপক উদ্দীপনার মাধ্যমে পূজানুষ্ঠান চলে। 'বন্দে ক্ষেত্রপাল খেদাই নম'—মন্ত্র উচ্চারণ করে, ক্ষেত্রপাল ও মনসার ধ্যানমন্ত্রে পুজো অনুষ্ঠিত হয়। প্রচুর পরিমাণ দুধ এবং বহু সংখ্যক প্রাণি বলির শোণিত ধারাই খেদাই পুজোর মূল উপাচার। পায়রা, হাঁস, মোরগ, পাঁঠা, শুকর,

মহিষ, প্রভৃতি প্রাণির রক্তে খেদাই তলার মাটি সিক্ত হয়ে যায়। উৎসর্গীকৃত পশুর ঘাড়ের দিকের কিছু মাংস এবং কর্তিত মুণ্ড বৃক্ষমূলে রাখা হয়। খেদাই বাবার নিকট জমির প্রথম ফসল ও গাছের প্রথম ফল উৎসর্গের প্রথা খুব প্রবল।

ক্ষেত্রবিশেষে খেদাই পূজায় বারাঙ্গনাদের আধিপত্য সাধারণভাবে পরিলক্ষিত হয়। এই সূত্রে চাকদহ থানার অন্তর্গত মথুরাগাছির বাৎসরিক খেদাই পুজোর দৃষ্টান্ত বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়। এই খেদাই তলাটি সম্ভবত খেদাই ঠাকুরের পুজো, মেলা ও উৎসবের সর্ববৃহৎ কেন্দ্র এবং এখানকার খেদাই ঠাকুর সর্বপ্রাচীন খেদাইবাবা 'বুড়োখেদাই' নামে অভিহিত হয়। এই স্থানে ঐতিহ্যাশ্রয়ী প্রথানুসারে বাৎসরিক পূজা বারাঙ্গনাদের পূজার্ঘ দ্বারা শুরু হয় এবং তৎপরে মুসলমানদের পুজো নিবেদিত হয়। তারপর কৃষ্ণনগরের মহারাজা, সেবাইত ও অন্যান্যদের পুজো অনুষ্ঠিত হয়।

খেদাই ঠাকুরের বাৎসরিক উৎসবে বিভিন্ন স্থান থেকে হাজার-হাজার মানুষ পুজো ক্ষেত্রে সমবেত হয়। এই উৎসবের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য বিভিন্নস্থান থেকে আগত সাপুড়েদের সমাবেশ। সাপুড়েরা মেলাজনে ও পথের দুই পাশে জীবন্ত সাপ নিয়ে খেলা দেখায় এবং উচ্চস্বরে মন্ত্র আওড়ায় ও গান করে। সমবেত ভক্ত ও দর্শকেরা 'খেদাইবাবা' নাম উচ্চারণ করে ভক্তিভরে সাপের উদ্দেশে সাপুড়েদের পয়সা দান করে। এই দিন সাপের গায় কোনও প্রকার আঘাত করা বা সাপ মারা নিষেধ।

খেদাই বাবার দৈবক্ষমতা সম্পর্কে লোকসমাজে নানাবিধ বিশ্বাস প্রচলিত আছে, যথা— ১. খেদাই বাবার দয়ায় যে-কোনো প্রকার মন্দভাগ্য দূরীভূত হয় এবং অশুভশক্তি বিতাড়িত হয়, ২. খেদাইবাবার দয়ায় সাপের ক্রোধ ও দংশন থেকে রক্ষা পাওয়া যায়, ৩. খেদাইবাবার দয়ায় ভালো ফসল ও ধনসম্পদ হয় এবং নারীদের বন্ধ্যাত্ব দূর হয়। এই সমুদয় মাহাত্বের মধ্যে জমি ও কৃষির মঙ্গল বিধান খেদাইবাবার প্রধান ক্ষমতা বলে বিবেচিত হয়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে সাধারণ মানুষ খেদাই তলার মাটি সংগ্রহ করে নিয়ে যায় এবং নিজ নিজ কৃষিক্ষেতে এই বিশ্বাসে ওই মাটি ছড়িয়ে দেয় যে খেদাই তলার মাটির মাহাত্ম্যে চাষ নির্বিঘ্নে হবে, পোকা মাকড় বা প্রাণীর দ্বারা ফসলের ক্ষতি হবে না এবং জমিতে উত্তম ফসল হবে। তাছাড়া খেদাই তলার মাটি গোয়াল ঘরেও ছড়ানো হয় এবং মনে করা হয় এর দ্বারা রোগের আক্রমণ থেকে গোরুর। মুক্ত থাকে এবং হারানো গোরু পাওয়া যায়।

কখন কিভাবে খেদাই পুজোর উদ্ভব ঘটেছিল তা সঠিকভাবে জানা যায় না। এই পূজানুষ্ঠান সম্পর্কে লোকমুখে বিভিন্ন প্রকার স্থানীয় কিংবদন্তির প্রচলন আছে। বিভিন্ন কিংবদন্তি বা প্রচলিত কাহিনি অনুসারে বলা হয় জনৈক অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন সাধক বা জনৈক বাগদি সম্প্রদায়ের লোক বা কৃষ্ণনগরের মহারাজা খেদাই ঠাকুরের পুজোর প্রচলন করেন। মনসা-দেবীর স্বপ্নাদেশে খেদাই ঠাকুরের পুজোর প্রচলন হয়েছে এমন বিবরণও শোনা যায়। মোটের উপর পরস্পরবিরোধী কিংবদন্তি বা লোককাহিনির অনুসরণে বোঝা যায় খেদাই ধর্মানুষ্ঠানের প্রকৃত উদ্ভব ও বিকাশের ইতিহাস হারানো অতীতের অন্ধকারে নিমজ্জিত। অবশ্য লোকসংস্কৃতি বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে খেদাই পুজোর উদ্ভবের ইতিহাস বা তাৎপর্য উদ্ঘাটন করা অসম্ভব নয়। যদিও ক্ষেত্রবিশেষে খেদাই ঠাকুর মামনসা রূপে কথিত হন, তথাপি অধিকাংশ

ক্ষেত্র খেদাই ঠাকুর বাবাখেদাই বা ক্ষেত্রপাল হিসেবে পূজিত হন। নদীয়ার আবাদ অঞ্চলে খেদাই ঠাকুরের পূজার প্রচলন অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং কৃষি ভিত্তিক সমাজের পটভূমিতে জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষা সূত্রেই খেদাই ঠাকুরের পুজোর উদ্ভব ও বিকাশ ঘটেছে।

যদিও কৃষ্ণনগরের মহারাজা ও ব্রাহ্মণ্য প্রভাবের প্রাধান্যের ফলে খেদাইবাবাকে শাস্ত্রীয় মনসা পুজো রূপে চিহ্নিত করার প্রচেষ্টা হয়েছে, তথাপি খেদাই ঠাকুরের লোকায়ত চরিত্র সহজেই অনুধাবন করা যায়। খেদাই পূজানুষ্ঠান মূলত—বৃক্ষ, সর্প ও ধরিত্রী পুজোর সঙ্গে সম্পর্কিত। আদিম বিশ্বাসে বৃক্ষ ও সর্প উর্বরতার প্রতীক এবং ধরিত্রীর বুকে রক্তপ্রদানের মধ্যে জমির বা ধরিত্রীমাতার উর্বরতা বৃদ্ধির জাদুবিশ্বাস নিহিত। সর্বোপরি যেহেতু জলজ নিম্নভূমির আবাদ অঞ্চলে চাষের পক্ষে প্রধান ছিল সাপের উপদ্রব, তাই কৃষিসমাজের পক্ষে ভয় ও ভক্তির উৎসে সর্প পুজোর প্রচলন ছিল একান্ত স্বাভাবিক।

সাধারণভাবে কথিত হয় যে খেদাইবাবা জমি থেকে অশুভ শক্তির প্রভাব দূরীভূত করেন এবং জনগণের সৌভাগ্য প্রণয়ন করেন। এদিক থেকে সংশ্লিষ্ট দেবতার নামের তাৎপর্য দ্বিবিধরূপে অনুধাবন করা যায়—১. বাংলাভাষায় 'খেদানো' শব্দের অর্থ বিতাড়ণ করা এবং খেদাই শব্দটি খেদানো শব্দজাত। এই দিক থেকে যে দেবতা অশুভকে খেদান অর্থাৎ দূরীভূত করেন বা বিতাড়ন করেন তিনিই 'খেদাইবাবা'। ২. খেদাই ঠাকুর মূলত 'খেতাই ঠাকুর' বা ক্ষেতের ঠাকুর। ক্ষেত বা কৃষিক্ষেতের দেবতা হিসাবেই তিনি খেতাইবাবা। মোটের উপর খেদাই নামটি দেবতার মূল প্রকৃতিটিকে উদ্‌ঘাটন করে, যিনি অশুভকে বিতাড়ন করেন, কৃষিক্ষেত্রকে রক্ষা করেন এবং কৃষি সমাজের সুখৈশ্বর্য বৃদ্ধি করেন।

এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়, লোকসমাজে কৃষিক্ষেত্রে বা কৃষিকর্মের সংরক্ষণ ও সমৃদ্ধি সংঠনের ক্ষমতাই খেদাই ঠাকুরের প্রধান মাহাত্ম্য হিসাবে বিবেচিত হয়। এই সঙ্গে আরও মনে করা হয় যে খেদাই ঠাকুর কৃষিকর্মের প্রধান সহায়ক গোরুর মঙ্গল বিধান করেন। উল্লেখযোগ্য যে খেদাই ঠাকুর ক্ষেত্রপাল হিসাবে অভিহিত হন, এবং খেদাই পূজার ক্ষেত্রপালের ধ্যান মন্ত্র উচ্চারিত হয়। এই সমুদয় ঘটনা নিঃসন্দেহে খেদাইবাবা ও কৃষির অবিচ্ছিন্ন সম্পর্ক চিহ্নিত করে।

খেদাই বাবার মাহাত্ম্য, নাম, পূজানুষ্ঠানে বারাঙ্গানাদের প্রাধান্য ও হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে অংশগ্রহণ, স্থান, কাল, আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকলাপ, উৎসর্গ ইত্যাদির সামগ্রিক বিশ্লেষণ এই সত্য উদ্ঘাটন করে যে খেদাই ঠাকুর শাস্ত্রীয় দেবদেবী থেকে দূরে মূলত লৌকিক কৃষি দেবতা। দেবতা ধর্মানুষ্ঠানের মধ্যে আদিম উর্বরতা জাদু বিশ্বাস সংশ্লিষ্ট বৃক্ষ, সর্প এবং ধরিত্রীমাতার পূজা মিশ্রিত হয়ে গেছে। মোটের উপর খেদাইবাবা কৃষি সমাজের এক বিশিষ্ট লৌকিক দেবতা।।

২.

পশ্চিম সীমান্ত বাংলার অন্যতম প্রধান লোকউৎসব— ভাদু বাংলার পশ্চিম প্রান্তবর্তী জেলাসমূহ ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলে ভাদু পূজার প্রাধান্য দেখা যায়। প্রধানত পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, বর্ধমান এবং বীরভূম জেলায় ব্যাপক রূপে ভাদু উৎসবে প্রতিপালিত হয়। ভাদু পূজার কাল

সাধারণত ১ ভাদ্র থেকে ভাদ্র সংক্রান্তি পর্যন্ত বিস্তৃত। অনেক ক্ষেত্রে শ্রাবণ সংক্রান্তি থেকে ভাদ্র সংক্রান্তি পর্যন্ত এই উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। ক্রমানুসারে ভাদু অনুষ্ঠানের চারটি স্তর—শ্রাবণ সংক্রান্তি বা ১ ভাদ্র ভাদু স্থাপন, সমস্ত ভাদ্র মাস ভাদু পালন, ভাদ্র সংক্রান্তি বা তার পূর্বরাত্রে জাগরণ এবং ভাদ্র সংক্রান্তি বা তার পরের দিন ভাদু বিসর্জন। ১লা ভাদ্র বা ক্ষেত্রবিশেষে ভাদ্র সংক্রান্তি বা তার তিনদিন পূর্বে ভাদু স্থাপন করা হয়। সাধারণত নুতন সরায় গোবরের উপর ভাদই ধান ছড়িয়ে ভাদুর রূপদান করা হয়। অবশ্য বর্তমানে প্রায় প্রতি ঘরে মৃৎনির্মিত ভাদুর মূর্তি প্রতিষ্ঠা করা হয়। ভাদুর মূর্তি—হেমবর্ণা, সাধারণত ক্ষুদ্রাকৃতি, অনেকটা বীনাহীনা সরস্বতীর অনুরূপ। ভাদুমূর্তি দণ্ডায়মানা বা পদ্মের উপর উপবিষ্ট অবস্থায় থাকে। ভাদুর কোন বাহন নেই। অনেক সময় ভাদুর একহাতে মোন্ডা বা সন্দেশ এবং অন্যহাতে ধানের শীষ বা পান বা পদ্মফুল থাকে। অবশ্য ক্ষেত্রবিশেষে শূণ্যহাতে প্রতিমাও দেখা যায়। ভাদু মূর্তি স্থাপন করে উৎসবের সূত্রপাত করা হয় এবং প্রতিমার স্থলে প্রত্যহ সন্ধ্যারতি ও মুড়ি-চিড়া-মিঠাই ভোগ দেওয়া হয়। প্রতিদিন সন্ধ্যায় সমবেত মেয়েরা ভাদুকে ঘিরে নাচ-গান করে। অনেক ক্ষেত্রে পল্লির মধ্যে কোনও কেন্দ্রীয় স্থানে—আখড়া বা সমাজপতির গৃহাঙ্গানে সমবেত হয়ে ভাদুর গান করা হয় এবং ক্ষেত্রবিশেষে গান করতে করতে পল্লি পরিভ্রমণ বা প্রদক্ষিণ করা হয়।

ভাদু পুজোয় সাধারণত কোনও পুরোহিতের প্রয়োজন হয় না এবং কোনও প্রকার আনুষ্ঠানিক পূজার্চনার মাধ্যমে উৎসব প্রতিপালিত হয় না। নৃত্যগীতের মাধ্যমেই ভাদু উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। পুরোহিতহীন ও শাস্ত্র মন্ত্রহীন এই লৌকিক ধর্মানুষ্ঠানে বা লোকউৎসবে সমবেত নরনারীদের নৃত্যগীতই প্রধান অঙ্গ। গোটা ভাদ্রমাস নৃত্যগীতে উৎসব পালন করে ভাদ্রমাসের শেষদিন সারারাত নৃত্য-গীত অনুষ্ঠানে 'জাগরণ' প্রতিপালিত হয়। জাগরণের অনুষ্ঠানকালে সমবেত নর-নারীরা অবাধ মেলামেশা করেন, কোনো কোনো ক্ষেত্রে যৌন শিথিলতাও পরিদর্শিত হয়। জাগরণ রাত্রে অনেক অঞ্চলে দুই পরিবার বা প্রতিবেশী ভাদুর মধ্যে মালাবদল করে বিবাহ দেবার রীতির প্রচলন দেখা যায়। জাগরণের পরের দিন ভাদু বিদায়ের গান করতে করতে ভাদুকে স্থানীয় জলাশয়ের নিকটে নিয়ে যাওয়া হয় এবং ভাদুকে জলে বিসর্জন দেওয়া হয়। অনেক অঞ্চলে বাউরি সম্প্রদায় বিসর্জনের দিন ভাদু মূর্তি নিয়ে শবযাত্রার অনুরূপ অনুষ্ঠান করে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য স্থান বিশেষে উচ্চবর্ণের বর্ধিষ্ণু পরিবারে ভাদুপূজা ও উৎসবের প্রচলন দেখা গেলেও ভাদু অনুষ্ঠানের প্রধান অংশগ্রহণকারী— বাগদি-বাউরি, প্রভৃতি নিম্নশ্রেণি ও আদিবাসী সমাজের মেয়েরা। ভাদুপূজায় অংশগ্রহণকারী রমণীকুলের মধ্যে কুমারী মেয়েদের বিশেষ প্রাধান্য দেখা যায় এবং ক্ষেত্রবিশেষে বারাঙ্গানালয়ে বিশেষভাবে ভাদু পূজা অনুষ্ঠিত হতে দেখা যায়। অনেক ক্ষেত্রে ভাদু উৎসবের প্রাঙ্গাণে অবাধ মিলনের মাধ্যমে যুবক-যুবতীগণ মনের 'বন্ধু' নির্বাচন করে নেয়।

ভাদু পুজোর প্রচলন সম্পর্কে লোকসমাজে নানারকম কিংবদন্তীমূলক লোককথার প্রচলন দেখা যায়। ভাদু কাহিনি সর্বত্র একপ্রকার নয়, তবে সাধারণভাবে দেখা যায়—পঞ্চকোটের রাজা নীলমনি সিংহদেবের অধিকবয়সে একটি কন্যা জন্মগ্রহণ করে। ভাদ্রমাসের পয়লা তারিখে কন্যার জন্ম হয় বলে তার নাম রাখা হয় ভাদ্রেশ্বরী বা ভদ্রেশ্বরী, ডাকনাম ভাদু।

স্বীয় চরিত্র মাধুর্যে রূপে-গুণে সুলক্ষণা ভাদু ছিলেন সর্বজন প্রিয়। সর্বজনপ্রিয় ভাদুর আকস্মিক মৃত্যু হয়। বিভিন্ন কাহিনিতে মৃত্যুর বিভিন্ন কারণ বর্ণিত হয়েছে যেমন প্রজাদের মঙ্গল বিধানে অসমর্থ হয়ে প্রাণত্যাগ, অসামাজিক প্রেম ও প্রেমিকের জন্য দেহত্যাগ, নির্দ্ধারিত পতির মৃত্যুতে সতী হিসাবে অগ্নিতে আত্মাহুতি দান, পিতার অন্যায় আচরণে ক্ষুব্ধ হয়ে আত্মবিসর্জন, বা মন্দিরের বিগ্রহের সঙ্গে লীন হয়ে যাওয়া, ইত্যাদি। মৃত্যুর কারণ যাই হোক ভাদুর মৃত্যু হয় ভাদ্র সংক্রান্তিতে। ভাদুর অকাল মৃত্যুতে রাজা-প্রজা সকলেই অত্যন্ত শোকাকুল হয়ে পড়েন। এই পরিস্থিতিতে রাজা নাচ গান-উৎসবে ভাদুর স্মৃতি উদ্‌যাপনের আদেশ দেন এবং এইভাবে ভাদু পূজার প্রচলন হয়েছে বলে কথিত হয়।

নৃত্যগীতে উদ্‌যাপিত ভাদু অনুষ্ঠানের মৌলিক তাৎপর্য সম্পর্কে মতভেদের অবকাশ আছে। সাধারণভাবে প্রচলিত মতে— ভাদু মূলত স্মৃতি পূজা এবং এই মতের কারণ ভাদু সম্পর্কিত প্রচলিত লোককাহিনিগুলিতে পঞ্চকোট কাশীপুরের রাজা নীলমণি সিংহদেবের ভাদু নামক কন্যার প্রসঙ্গ উল্লেখ। আমরা পূর্বেই লক্ষ করেছি যে ভাদুসংক্রান্ত কাহিনিগুলি সর্বত্র একরূপ নয়। বলাবাহুল্য কাহিনির এই স্ববিরোধিতা কাহিনির ঐতিহাসিক ভিত্তির যৌক্তিকতাকে শিথিল করে। তাছাড়া পঞ্চকোটরাজ নীলমণি সিংহদেবের সূত্রে বিচার করলে ভাদু পূজার উৎপত্তিকাল হয় উনবিংশ শতকের মধ্যপর্ব।

এতো অল্পসময়ে এই জাতীয় ঘটনার আপাত বিরোধিতা কাহিনির ঐতিহাসিক সত্যতা সম্পর্কেও সন্দেহের অবকাশ সৃষ্টি করে। তাড়াছা একান্ত রাজাদেশে বা ব্রাহ্মণ উচ্চবর্ণের প্রচেষ্টায় ভাদুর ন্যায় ব্যাপক চরিত্রের লোক উৎসবের উদ্ভবও সম্ভবপর নয়। ভাদু উৎসবের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় অন্যান্য লোকউৎসবের ন্যায় এই উৎসবটিরও বিকাশ লোকসমাজের আশা-আকাঙ্ক্ষায় মৌলিক উৎসে। লোকসমাজে ব্রতকথার মাধ্যমে যেমন প্রতি দেবীর মাহাত্ম্য ঘোষিত হয়, তেমন ভাবেই ভাদুর কাহিনি সৃষ্টি হয়েছে এবং ইতিহাস পুরাণের প্রসঙ্গে জনসমাজে সে কাহিনি বিস্তার লাভ করেছে।

ভাদ্র মাসে উৎপন্ন ভাদুই শস্য তোলার সময়ই ভাদু উৎসবের কাল। ভাদ্রমাসে গৃহাঙ্গনে কাটা আউশ ধানের সমারোহ এবং মাঠে প্রান্তরে কচি আমন ধানের সজীবতা। ভাদ্রমাসের শস্য হিসাবে মকাই ফসলও এ ক্ষেত্রে উপেক্ষণীয় নয়। অঞ্চল বিশেষে ভাদ্রমাসেই নবীন আউসে নবান্ন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। মোটের উপর একদিকে রোয়া পোতার কাজ শেষ (?) অন্যদিকে আউশ বা আশু ধান ঘরে তোলা, একদিকে আগামী আমনের কামনা ও অন্যদিকে ভাদুই আউশের নবান্ন এই পটভূমিতেই ভাদু উৎসবের অনুষ্ঠান।

তাই ভাদুকে ফসল সংক্রান্ত শস্য উৎসব রূপে বিবেচনা করাই যুক্তিযুক্ত। এদিক থেকে কুমারী রূপে ভাদুর কল্পনা, ভাদু অনুষ্ঠানে কুমারী মেয়েদের প্রাধান্য, বেশ্যালয়ের বিশেষ অনুষ্ঠান এবং জাগরণ রাত্রে যুবক যুবতীর অবাধ মিলন ও উদ্দাম নৃত্যগীতের প্রসঙ্গ সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। নৃতত্ত্ব ও লোকসংস্কৃতিবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ করলে ভাদু উৎসবের মধ্যে একান্ত রূপে আদিম কৃষি সংক্রান্ত উর্বরতা জাদুবিশ্বাসের অবশেষ লক্ষ করা যায়, এবং সামগ্রিকভাবে উৎসবের কাল, আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকলাপ ও প্রকৃতি অনুসরণে মনে হয় ভাদু অনুষ্ঠান মূলত উর্বরতা সহায়ক কৃষি সম্পর্কিত লৌকিক উৎসব।

৩.

বাংলার লোকউৎসবের মধ্যে টুসু বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। মানভূম থেকে আরম্ভ করে বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর অঞ্চলেই টুসু উৎসবের সমারোহ। পশ্চিম সীমান্ত বাংলার পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর এবং বিহার প্রদেশের ধানভূম, সিংভূম অঞ্চল টুসু পরবের প্রধান কেন্দ্র। কেন্দ্রের বাইরে এই উৎসব অন্যত্র কম বেশি প্রচলিত থাকলেও লোকপ্রিয়তা, ব্যাপকতা ও কিংবদন্তীর সূত্রে পুরুলিয়াকেই টুসু উৎসবের মূল কেন্দ্র রূপে অভিহিত করা যায়। অগ্রহায়ণ সংক্রান্তি থেকে পৌষ সংক্রান্তি পর্যন্ত একমাস ব্যাপী টুসু উৎসব প্রতিপালিত হয়। প্রাধনত নিম্নশ্রেণির মধ্যে হলেও প্রায় সর্বস্তরের ও শ্রেণির লোকের মধ্যেই টুসু পুজোর প্রচলন দেখা যায়। টুসু পূজার অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে কুমারী মেয়েরাই প্রধান।

টুসু সম্পর্কে লোকসমাজে নানারূপ লোককথার প্রচলন দেখা যায়। এই সমস্ত কাহিনির একটিতে টুসু এক ব্রাহ্মণ কন্যা যার জন্ম হয়েছিল মোঘল শাসনের কালে। রূপ যৌবনে অনন্য টুসু ঘটনা চক্রে এক মুসলমান রাজার দৃষ্টিতে পড়ে এবং তিনি টুসুকে ছিনিয়ে আনতে সক্রিয় হন। এই পরিস্থিতিতে টুসু আত্মগোপন করে পালিয়ে যান, কিন্তু রাজা ও তার চরবৃন্দ টুসুর পশ্চাদধাবন করে। তখন অনন্যোপায় টুসু সতীত্বরক্ষার জন্য জলে ঝাঁপিয়ে পড়েন। যে ঘাটে টুসু আত্মবিসর্জন দেন তার নাম— সতীঘাট। টুসু সম্পর্কিত অপর কাহিনিতে টুসু কুর্মী সমাজের কন্যা।

টুসুর সঙ্গে প্রতিবেশী এক কুর্মী যুবকের ছিল ভালোবাসা। ওই যুবকের সঙ্গে বিবাহের দিন টুসু ও তার স্বামী মুসলমান দস্যুদের দ্বারা অপহৃত হয়। কিন্তু শূকরের মাংস টুসুরা গ্রহণ করে শুনে দস্যুগণ টুসুদের পরিত্যাগ করে। অবশ্য মুসলমান কর্তৃক অপহৃতা হওয়ায় টুসুর সঙ্গে স্থানীয় আত্মীয় স্বজনগণ কুর্মী যুবকের আর বিবাহ দিতে রাজি হন না। এই অবস্থায় যুবক সন্ন্যাসী হয়ে বনে চলে যায় এবং প্রেমাস্পদের সঙ্গে মিলনের জন্য টুসু গৃহত্যাগ করে। অনেক কষ্টের পর টুসু স্বামীকে সুবর্ণরেখা নদীর ঘাটে খুঁজে পান। কিন্তু অনাহার-অনিদ্রায় অসুস্থ টুসুর মৃত্যু হয়। অপর একটি কাহিনিতে দেখা যায় টুসু কাশীপুরের রাজার মেয়ে। সর্বজনপ্রিয় অপূর্ব সুন্দরী টুসু অকস্মাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং পৌষ সংক্রান্তিতে তার অকাল মৃত্যু হয়।

সাধারণত মাটির সরা প্রতীকে টুসু ব্যাপক রূপে পূজিতা হন। সরার গর্ভে থাকে নুতন ধান, নবান্নের ধানের তুষ মিশ্রিত নাড়ু, গোবরের তালের উপর ছড়ানো হয়, ধান, সরষে ও মূলা ফুল, কুঁচ এবং সরষে। অনেক ক্ষেত্রে সরার পরিবর্তে টুসু ঘটের প্রচলন দেখা যায়। টুসু ঘটের মধ্যেও সরার অনুরূপ দ্রব্য সমূহ সংরক্ষিত হয়। টুসু সরা ও ঘটের গায় সিন্দুর ও পিটনি গোলার লাল—সাদা টিপ অঙ্কিত থাকে। হলুদ ছোপানো কাপড়ের টুকরো টুসু ঘট ও সরার উপর স্থাপন করা হয়। টুসুর অন্যতম বিশিষ্ট অঙ্গ 'চোড়ল'। বাঁশের বাখারি বা চেলা কাঠের কাঠামোতে রঙ-বেরঙের কাগজ লাগিয়ে চার পায়া বিশিষ্ট রথাকৃতি চোড়ল প্রস্তুত হয়। ক্ষেত্রবিশেষে টুসুর সরা পাতা হয় চোড়লের মধ্যে বা সেই সরা ও মূর্তির পাশে সুসজ্জিত চোড়ল রক্ষিত হয়। অনেক স্থলে টুসুর মৃৎমূর্তির প্রচলন দেখা যায়। সাধারণ ঐতিহ্যানুসারে টুসু অনধিক এক হাতে বিশিষ্ট মূর্তি—গায়ের রং হলুদ ও পরিধেয় বস্ত্র নীল।

মূর্তির হাতে থাকে রঙিন কাগজের তৈরি পদ্ম এবং মাথার পশ্চাতে থাকে অনুরূপ প্রভামণ্ডপ। সাধারণত ছোটো কাঠের চৌকি বা কাঁসার থালার উপর মূর্তি স্থাপিত হয়।

টুসু উৎসব ও পূজানুষ্ঠানের কয়েকটি সুস্পষ্ট সূর দেখা যায়—স্থাপন, পালন, জাগরণ ও বিসর্জন। অগ্রহায়ণ সংক্রান্তিতে টুসু স্থাপন করা হয়—আল্পনামণ্ডিত গৃহাঙ্গানে, ঘরের বাস্তু খুটির পাদদেশে বা কুলুঙ্গিতে। সমগ্র পৌষ মাসের সন্ধ্যাকালে টুসুর থানে প্রদীপ জ্বালা হয়, তাঁর ঘুম ভাঙিয়ে পুষ্পার্ঘ ও চিড়ে-মুড়ি-গুড়-মণ্ডা প্রভৃতি উৎসর্গ করা হয়। অধিক রাত পর্যন্ত নাচ-গান অনুষ্ঠিত হয়। সবশেষে টুসুকে ঘুম পাড়ানো হয় আগামী দিনের সন্ধ্যা পর্যন্ত। এক মাস ব্যাপী নিয়মিত নৃত্য—(বর্তমানে খুব কম) গীত অনুষ্ঠানের পর পৌষ সংক্রান্তির আগের রাত্রিটিকে বিশেষভাবে উদ্‌যাপন করা হয়। ওই দিন সারারাত ধরে টুসুর থানে প্রদীপ জ্বেলে বা তাঁকে গৃহাঙ্গানে স্থাপন করে নাচ-গান অনুষ্ঠিত হয়।

জাগরণের রাত্রে কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রতিবেশী টুসুর মধ্যে বিবাহ দেওয়া হয় (প্রসঙ্গাত উল্লেখ্য অনেক ক্ষেত্রে বিসর্জনের ঘাটেও মালা বদল করে বিভিন্ন টুসুর মধ্যে বিবাহ দেওয়া হয়)। মোটের উপর টুসুকে ঘিরে ওই দিন সারা রাত জেগে চলে উদ্দাম উৎসব। জাগরণের পরের দিন—পৌষ সংক্রান্তি বা মকর সংক্রান্তির বিসর্জনের মেলায় অবাধ মেলামেশায় যুবক-যুবতীগণ মনের বন্ধু নির্বাচিত করে নেয়। ভোরে নিকটবর্তী জলাশয়ে টুসু বিসর্জিত হয়। অনেক ক্ষেত্রে তার ঘট বা সরা বিসর্জিত হয় না, কেবল মাত্র চোড়ল বিসর্জিত হয়। পুজোপচার সমেত ঘটে বা সরা ঘরের নির্দিষ্ট স্থানে সম্বৎসরের জন্য তোলা থাকে এর নাম নিজের ঘরে লক্ষ্মীকে বেঁধে রাখা বা লক্ষ্মীবাধা'। বিসর্জনান্তে সবশেষে গৃহে প্রত্যাবর্তনের পর নবান্নের পিঠে পায়েস ভক্ষণের মধ্য দিয়ে এই উৎসবের পরিসমাপ্তি ঘটে।

টুসু উৎসবে কোনও শাস্ত্রীয় অনুশাসন বা পুরোহিতের স্থান নেই। পূর্বাপর লোকাচারের ভিত্তিতে, সমবেত নৃত্য-গীতে এই সরব প্রতিপালিত হয়। বর্তমানে এই উৎসবে নৃত্য প্রায় গৌণ হয়ে পড়েছে, সংগীতই মুখ্য স্থান অধিকার করেছে।

টুসু উৎসবের বৈশিষ্ট্য ও তাৎপর্য সম্পর্কে বিদগ্ধ সমাজে ভিন্নমত দেখা যায়। কারো মতে পশ্চিম সীমান্ত বাংলার টুসু ও বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে তুষ-তুষলি ব্রত অভিন্ন, অনেকের মতে একপ্রকার গঙ্গাপূজা, অনেকের মতে পুষ্যা বা তিষ্য নক্ষত্রের সঙ্গো সংশ্লিষ্ট পূজাই টুসু উৎসব এবং অনেকের মতে ভাদু উৎসবের প্রভাব জাত অনুষ্ঠান। পূর্বাপর টুসু উৎসবের প্রকৃতি বিশ্লেষণে ও তুলনামূলক আলোচনায় বোঝা যায় এই উৎসব তোষালাব্রতর নামান্তরিত বা স্থানান্তরিত রূপ নয়। ভূ-প্রকৃতি ও জন প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী টুসু সীমান্ত বাংলার একান্ত দেশজ-আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য সমৃদ্ধ উৎসব।

বলাবাহুল্য এর সঙ্গো গঙ্গাপূজার কোনোরূপ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ মিল নেই। সর্বোপরি 'পুষ্যা' বা 'তিষ্য' নক্ষত্রের সঙ্গো সংশ্লিষ্ট উৎসব হিসেবে টুসুকে ব্যাখ্যা করারও কোনো যৌক্তিকতা নেই, কোনও লোকউৎসব শাস্ত্রীয় তিথি নক্ষত্র মিলিয়ে উদ্ভূত হয় না—জন জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও প্রয়োজন প্রতীতির লৌকিক পটভূমিতেই লোক উৎসবের উদ্ভব ও বিকাশ হয়। ভাদু ও টুসু উৎসবের অঞ্চল, মূর্তি প্রকরণ, কাহিনিগত কম-বেশি সাদৃশ্য, সংগীত-নৃত্যভিত্তিক অনুষ্ঠানের বহুবিধ সাদৃশ্য অনুসরণে অনেকে মনে করেন টুসু ও ভাদু পরস্পর সম্পর্কিত বা প্রভাব জাত। কিন্তু প্রকৃত বিচারে বোঝা যায় বহু বিষয়ে আপাত সাদৃশ্য থাকলেও উৎসব

দুটি পারস্পরিক প্রভাব জাত নয়। 'ভাদু' পশ্চিমসীমান্ত বঙ্গের ভাদুই ফসলের নবান্ন উৎসব, আর 'টুসু' পশ্চিম সীমান্ত বাংলার পৌষালি ফসলের নবান্ন উৎসব। কৃষি-সমাজের লোকউৎসব হিসাবেই আঞ্চলিক সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যে উভয়ের মধ্যে অন্তর্লীন ঐক্য বর্তমান।

কৃষি প্রধান বাংলার পল্লি অঞ্চলে পৌষ মাস লক্ষ্মী মাস রূপে বিবেচিত হয় কেননা চাষিদের ঘরে তখন নূতন ধান ওঠে। পৌষ মাসের নূতন ধানের চালে উদ্‌যাপিত হয় নবান্ন বা পিঠে পার্বণ। টুসু পূজার প্রধান উপকরণ জল ভরা ঘটকে সেচ, গোবরকে সার ও তুষকে শস্যের প্রতীক হিসাবে কল্পনা করা যায়। এই পূজায় গোবর তুষের আনুষ্ঠানিক ব্যবহার প্রকৃতপক্ষে সার-মাটি দিয়ে ক্ষেত উর্বরা করে তোলার রূপক এবং শূন্য গর্ভ তুষের থেকে পূর্ণ শস্য লাভের উর্বরতা জাদুবিশ্বাস জাত আদিম fertility cult-এর অবশেষ বলা যায় প্রকৃতপক্ষে ধানের খোসা তুষের অনুষঙ্গেই তুষু বা টুসু দেবীর উদ্ভব এবং কৃষি সমাজের শস্য সম্পর্কিত মৌল তাৎপর্যেই এই উৎসবের বিকাশ।

৪.

ভীমপূজা মেদিনীপুর জেলার এক বিশিষ্ট লোকউৎসব। মেদিনীপুরের পার্শ্ববতী জেলায় ও অন্যান্য অঞ্চলের কোনো কোনো স্থানে ভীমপূজার প্রচলন দেখা গেলেও, এই উৎসবটি প্রধানত মেদিনীপুর জেলায় ব্যাপকরূপে অনুষ্ঠিত হয়। মেদিনীপুর জেলার প্রায় সর্বত্র অদ্যাপি ভীমপূজার ব্যাপক ও সর্বজনীন প্রচলন লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। (বলা বাহুল্য, ভীমপূজা কেবলমাত্র ঘাটাল মহকুমার সীমায় ও বিশেষ সম্প্রদায়ের মধ্যে আবদ্ধ ধারণাটি অজ্ঞতা প্রসূত। মাঘ মাসের শুক্লপক্ষের একাদশী তিথিতে ভীমপূজা হয়।

উন্মুক্ত প্রান্তরে, ক্ষেতের ধারে গ্রামের মধ্যে বা সীমান্তে, হাট বা বাজারের মধ্যে, অথবা রাস্তার মোড়ে বিরাট আকৃতির মূর্তি তৈরি করে ভীমপূজা অনুষ্ঠিত হয়। গদাহস্তে দন্ডায়মান ভীমের বলিষ্ঠ মূর্তির অধিক প্রচলন থাকলেও, ভীমের বীরত্বব্যঞ্জক বিভিন্ন ঘটনা অবলম্বনে বিভিন্ন প্রকার মূর্তি গঠিত হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে বয়ঃবৃদ্ধের মুখে কাঁধে গদা ও হাতে লাঙল নিয়ে ভীমের মূর্তির বর্ণনা শোনা গেলেও ব্যাপকরূপে মহাভারতোক্ত ভীমের বীর মূর্তিই প্রত্যক্ষ করা যায়। ভীমের বিভিন্ন প্রকার মূর্তির মধ্যে—গদাহস্তে একক ভীম, ভীমের জরাসন্ধ বধ কিচক বধ, দুর্যোধনের উরু ভঙ্গ, জতুগৃহ থেকে পলায়ন, হনুমানের সঙ্গে শক্তিপরীক্ষা, দুঃশাসনের রক্তপান, ভীষ্মের সঙ্গে যুদ্ধ, অশ্বমেধের ঘোড়া নিয়ে যুদ্ধ প্রভৃতি মূর্তি প্রধান।

সাধারণত স্বর্ণাভ হলুদ, রক্তাক্ত খয়েরী বা ধুসর বর্ণের ভীমমূর্তি হয়। মূর্তির মাথায় দীর্ঘ কুঞ্চিত বাসরি চুল এবং মুখে দীর্ঘ জুলফি ও গোঁফ থাকে। আয়ুধ হিসেবে হাতে থাকে গদা, কোনো কোনো ক্ষেত্রে কাঁধে ধনুক দেখা যায়। সাধারণত গ্রামাগত বা পাড়াগত হিসেবে ও সার্বজনীন রূপে ভীমপূজা হয়। স্থানভেদে ভীমপূজা অনুষ্ঠিত হয়—দিনে, সন্ধ্যায় বা রাত্রে। সাধারণত একাদশীর তিথি ধরে পূজারম্ভ নয় এবং অনেক ক্ষেত্রে রাত্রে চার প্রহরে চারবার পূজা হয়। ভীমপূজায় আতপচাল, ফলমূল ও বিভিন্ন প্রকার মিষ্টির নৈবেদ্য দেওয়া হয়। পূজায় লেবু, নারিকেল, শস্য, লাল আলু প্রভৃতি কাঁচা ফল, নুনবিহীন লাল আলু ও মুগডাল সিদ্ধ, লুচি, বাতাসা, তিলে পাটালি, সন্দেশ প্রভৃতির শীতল ও মকর দেওয়ার প্রথা প্রচলিত আছে। ভীমপূজায় কোনো কোনো ক্ষেত্রে অব্রাহ্মণ পূজারী দেখা গেলেও বর্তমানে সাধারণত

ব্রাহ্মণ পুরোহিত ভীমপূজা করেন এবং স্থানীয় অন্তত একজন উপবাসী থাকেন। পূজায় স্থানীয় সর্বশ্রেণির অধিবাসী অংশ গ্রহণ করেন। পুজোয় ঢাক কাঁশি, শঙ্খ প্রভৃতির বাজান হয় অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভীমপূজার দিন—হালচাষ, ঢেঁকির কাজ, হাতুড়ি-হাপরের কাজ, চুলদাড়ি কাটা, কাপড় কাচা প্রভৃতির আনুষ্ঠানিক বনধ (ট্যাবু) প্রতিপালিত হয়। পূজান্তে ভীমের জলঘট বিসর্জিত হলেও, মূর্তি বিসজিত হয় না—পূজাস্থানে প্রতিষ্ঠিত থাকে।

প্রচলিত লৌকিক বিশ্বাসে—সন্তান লাভ, সম্পদ বৃদ্ধি, কুপ্রভাব মুক্তি, সুবর্ষণ-সুফলন, বন্ধ্যাত্বমোচন, জাগতিক মঙ্গালবিধান প্রভৃতি ভীমপুজোর মাহাত্ম্যরূপে বিবেচিত হয়। উচ্চ ব্রাহ্মণ প্রভাবিত অঞ্চলে ক্ষেত্রবিশেষে ভীমপূজায় নানা প্রকার শাস্ত্রমন্ত্রের আনুষ্ঠানিকতার প্রাধান্য দেখা গেলেও, সাধারণভাবে লোকায়ত সমাজে শাস্ত্রীয় বিধি-বিধানগত শিথিলতা পরিলক্ষিত হয় এবং মূলত সমবেত আনন্দ-অনুষ্ঠানের মধ্যে ভীম-উৎসব উদযাপিত হয়। অনেক ক্ষেত্রে ভীমপূজা উপলক্ষ্যে মেলা সংগঠিত হয়, যা এক থেকে সাত-আট দিন পর্যন্ত চলে এবং ভীমপুজো উপলক্ষে লাঠিখেলা, ব্যায়াম প্রদর্শনী, সার্কাস, থিয়েটার, যাত্রা, পুতুল নাচ প্রভৃতি আয়োজিত হয়।

তত্ত্বসাগরের মতে একাদশী পালন সর্বাধিক পুণ্যকর্ম। বিভিন্ন পুরাণে নানা প্রকার একাদশীর নাম উল্লেখিত হলেও সাধারণভাবে শয়ন, উত্থান, পার্শ্বপরিবর্তন ও ভীম একাদশীর মাহাত্ম্যই সবিশেষ ঘোষিত হয়। মাঘ মাসের শুক্লপক্ষের একাদশী তিথি ভৈমী বা ভীম একদশীরূপে চিহ্নিত। লৌকিক প্রবচনে দেখা যায়—

শয়ন উত্থান পাশমোড়া
তার মধ্যে ভীমে ছোড়া।

একাদশীতত্ত্ব অনুসারে ভীম একাদশী প্রতিপালন বিষ্ণুপাদ পদ্মলাভের প্রকৃষ্ট উপায়—

ততঃ পুণ্যামি মা ভীমতিথি
পাপ প্রণাশিনীম
উপোষ্য বিধানেন গচ্ছে দ্বিষ্ণোঃ
পরং পদম।।
ভীম তিথিং ভৈমীত্বেন
খ্যাতামেকাদশীং।।

শাস্ত্রানুসারে মাঘী শুক্লা একাদশী ভীমের নামে চিহ্নিত হলেও মূলত নারায়ণ পূজার বিভিন্ন তিথির একটি অন্যতম একাদশী তিথি এবং ভৈমী একাদশীর মূল পূজার লক্ষ্য নারায়ণ, ভীম উপলক্ষ্য মাত্র। কিন্তু মেদিনীপুরের লোকায়ত সমাজে ভৈমী একাদশী তিথিতে স্বয়ং ভীমেরই প্রাধান্য নানাভাবে সূচিত হয়। ভৈমী একাদশী সম্পর্কে মেদিনীপুরের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন প্রকার কিংবদন্তী প্রচলন দেখা যায়। শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশে নির্জলা উপবাসে যে একাদশী পালন করে বিষ্ণুপূজান্তে ভীম জরাসন্ধ/দুর্যোধনকে বধ করতে সক্ষম হয়েছিলেন সেই একাদশীর নাম ভীম-একাদশী। গ্রামাঞ্চলে সংগৃহীত একটি তথ্যের সূত্রে দেখা যায়—মাতা কুন্তী একবার মাঘ মাসে পুকুরের জল অত্যন্ত ঠান্ডা থাকায় কিছুতেই স্নান করতে বা একাদশী ব্রত পালন করতে সক্ষম হচ্ছিলেন না, তখন পাশের ক্ষেত থেকে উঠে এসে ভীম লাঙলের ফাল গরম করে পুকুরের জলে ডুবিয়ে জল গরম করে দেন এবং মাতা কুন্তীর একাদশী প্রতিপালনে

সহায়তা করেন, তখন থেকে কুন্তীর আদেশে, বিষ্ণুর নির্দেশে ওই একাদশী ভীম একাদশী নামে বিঘোষিত হয়। অন্য মতে মাঘ মাসের শেষে বৃষ্টিতে ভিজে ভীম যেদিন প্রথম মর্ত্যে চাষের কাজ শুরু করেছিলেন সেই দিনটি ছিল মাঘ মাসের শুক্লা একাদশী, ওই দিনটির স্মরণে প্রতি বৎসর ভীম একাদশী প্রতিপালিত হয়। মোটের উপর মেদিনীপুরের লোকসমাজে ভীম-একাদশীর উদ্ভব সম্পর্কে শাস্ত্র-পুরাণ-অতিরিক্ত নানা প্রকার স্থানীয় লৌকিক কিংবদন্তীর প্রচলন দেখা যায় যা সবিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

মেদিনীপুরের বিভিন্ন স্থানে মহাভারত ও ভীম সম্পর্কিত নানা প্রকার কিংবদন্তীর সবিশেষ প্রচলন দেখা যায়। মেদিনীপুরের বাঁকুড়ার সীমান্তে গড়বেতা সংলগ্ন গণগনির ডাঙা লোকশ্রুতির ভীম ও বকরাক্ষসের যুদ্ধক্ষেত্ররূপে উক্ত হয় (এই প্রসঙ্গে গণগনির ডাঙার বকরাক্ষসের হাড় বলে কথিত 'ফসিলাইসড উড'-এর কথাও উল্লেখযোগ্য), বগড়ি-কৃষ্ণনগরের নিকটস্থ একারিয়া গ্রাম পাণ্ডবগণ ভিক্ষা করতেন বলে জনশ্রুতি প্রচলিত, মেদিনীপুর শহরের তিন মাইল পশ্চিমে গোপগিরি মহাভারতোক্ত মৎস্যাধিপতি বিরাট রাজার দক্ষিণ গোগৃহ ছিল বলে কথিত হয়, দাঁতনের নিকটস্থ একটি পুষ্করিণী ভীমের পদাঘাতে সৃষ্ট বলে উক্ত হয়, খড়্গপুরের নিকটে ইন্দ গ্রামে খড়্গেশ্বর মন্দিরের সুপ্রশস্ত প্রান্তর হিড়িম্বাডাঙা নামে পরিচিত। জনশ্রুতি—এই স্থানে হিড়িম্বার সঙ্গে ভীমের যুদ্ধ হয়েছিল এবং এখানেই ভীম হিড়িম্বাকে বিবাহ করেছিলেন, দিগ্বিজয়ার্থে পূর্বদিকে বহির্গত হয়ে ভীম বঙ্গদেশ জয় করেন এবং মেদিনীপুরের শালবনি থানার ভীমপুর গ্রাম পর্যন্ত অধিকার বিস্তার করেন বলে কথিত হয়। তা ছাড়া গোপগৃহে ভীমের পাদুকা প্রাপ্তির কথা গোপের কাছে ও গণগনির ডাঙা প্রভৃতি স্থানে মৃত্তিকার ফাটলকে ভীমের গদার আঘাতের বা লাঙল চালানোর ফাটল বলে বর্ণনার কথা প্রভৃতির শোনা যায়। মোটের উপর বিভিন্নভাবে মেদিনীপুরে ভীম সম্পর্কিত নানা প্রকার কিংবদন্তীর সবিশেষ প্রচলন দেখা যায়, যা এই অঞ্চলের লোকমানসে ভীমের আধিপত্যের স্মারক।

অবশ্য মেদিনীপুরে বিভিন্ন ভাবে মহাভারতের ও ভীম প্রসঙ্গের কথা প্রচলিত থাকলেও ভীমপূজার সঙ্গে মহাভারতের সম্পর্ক অভিন্ন এমন দাবি করা যায় না, বরং বিপরীতক্রমে লৌকিক ভীমের আধিপত্যের সূত্রেই কালের বিবর্তনে মহাভারতের ও পৌরাণিক ভীমের প্রসঙ্গ মেদিনীপুরে পল্লবিত হয়েছে বলে অনুমান করা যায়। এদিক থেকে মহাভারতের স্বর্ণবর্ণাভ ও তুবরক ভীমের সঙ্গে মেদিনীপুরের লোকায়ত সমাজে পূজিত ভীমের মূর্তিতত্ত্ব ও দেহবিষয়গত পার্থক্যের কথা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

কালের বিবর্তনে যে রূপই পরিগ্রহ করুক না কেন ভীম মৌল উৎসে লৌকিক দেবতা এবং কৃষি অনুষঙ্গেই তার বিশিষ্ট বিকাশ বলে মনে হয়। প্রাগৈতিহাসিক প্রস্তরযুগ পর্যন্ত বিস্তৃত মেদিনীপুরের যে মৃত্তিকায় বিভিন্ন সংস্কৃতির ঘাত-প্রতিঘাত ও মিলন-মিশ্রণ ঘটেছে তার পটভূমিকায় গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে ভীমপূজার আদিম উৎসে হয়তো আদিমতম বিশ্বাস-অনুষ্ঠানের উত্তরাধিকার উদ্ঘাটন করা সম্ভব। পৌরাণিক স্মার্তপ্রভাবে আদিম লৌকিক ভীমকে মধ্যম পাণ্ডব রূপে চিহ্নিত করলেও লোকায়ত সমাজে ভীম মুখ্যত চাষি। লোক প্রচলিত বিভিন্ন কিংবদন্তীর সূত্রে দেখা যায়, ভীমের প্রধান কাজকর্ম এবং লোকায়ত সমাজে

ভীমের বিশেষ পরিচয়—খেত্তী, চাষি, হালুয়া, কৃষিকর্মের মুনিশ। অবশ্য উচ্চ সমাজের প্রভাবে শিষ্ট সাহিত্যে কৃষি অনুষঙ্গে ভীম শিবের কৃষিকর্মের প্রধান সহায়ক। মেদিনীপুরের কবি রামেশ্বরের শিবায়ম কাব্যের সাক্ষ্যে দেখা যায়, ভীম শিবের কৃষিকর্মের মুনিশ, হাল্যা। কবি রামেশ্বর শিব-সংকীর্তন বা শিবায়ন কাব্যের লৌকিক খণ্ডে দেখা যায়, পার্বতীর পরামর্শে শিব দারিদ্র্যপীড়িত সংসারের অচলাবস্থা দূর করার জন্য দেবরাজ ইন্দ্রের নিকট থেকে বুচিজমির পাট্টা সংগ্রহ করেন, শল ভেঙে হাল প্রস্তুত করেন এবং কৃষিকর্মের জন্য কৈলাস ত্যাগ করে দেবীচকে যান সঙ্গে চলেন শিবের কৃষিকর্মের প্রধান সহায়ক প্রধান হাল্যা ভীম—

ভীম আছে হাল্যা আর অনির্বাহ কি
হয় বলে হদ্দ কৈলে হেমন্তের ঝি॥...
চন্দ্রচূড় চলে বৃষে চণ্ডীরয় চায়্যা
পিছু ভীম চলিল চাষের সজ্জা লয়্যা॥...
এই রূপে প্রতিদিন যায় রাত্রিকাল
ভীম কর‍্যা ভোজন প্রভাতে যুড়ে হাল॥

মেদিনীপুরের লোকসমাজে প্রচলিত বিশ্বাস, মেদিনীপুরের মাটিতেই ভীম প্রথম চাষ করেন এবং ভীমের দ্বারাই কৃষিকর্মের প্রবর্তন হয়। এ সম্পর্কে একটি লৌকিক ছড়া উল্লেখযোগ্য—

মেদিনীপুরে হালুই ভীম,
ভীম হুড়া চাষী
তাই—ভীম একাদশী।।

এখানে স্পষ্টতই কৃষিকর্মের সঙ্গে ভীমের প্রত্যক্ষ সংযোগ এবং সেই সূত্রেই ভীম একাদশী আখ্যা বিঘোষিত হয়েছে, যা ভীম একাদশী বা ভীমপূজার অনিবার্য কৃষি অনুষঙ্গের স্বাক্ষর বহন করে।

ভীমের কৃষিসহায়ক চরিত্রের অন্যতম প্রধান পরিচয় বহন করে, ভীমপূজার কাল। ভীমপূজার কাল মাঘ মাস। পৌষ সংক্রান্তির ফসলোত্তর নবান্ন উৎসবের পর মাঘ মাস বাংলার কৃষককুলের নতুন উদ্যমে কৃষিকর্মের প্রস্তুতির কাল। খনার বচনে দেখা যায়, মাঘের মাটিই কৃষিকর্মের পক্ষে সর্বাধিক মূল্যবান—

মাঘের মাটি
হীরের কাঠি।

লৌকিক প্রবাদে কৃষিকর্মের অনুকূল হিসেবে মাঘ মাসের শেষের বর্ষণের বিশেষ খ্যাতি ঘোষিত হয়েছে—

যদি বর্ষে মাঘের শেষ
ধন্য রাজার পুণ্য দেশ।

এই সূত্রে মাঘ মাসে ভীমকে পূজা করে কৃষি-সমাজের প্রার্থিত সুবর্ষণ লাভ করার কামনার কথা অনুভব করা যায় এবং সমগ্র ভারতবর্ষের পটভূমিকায় কোনো কোনো আদিবাসী সমাজে ভীমকে সুবর্ষণের দেবতারূপে চিহ্নিত করার কথাও উল্লেখ করা যায়। সর্বোপরি পূজান্তে সম্বৎসর দণ্ডায়মান ভীম যেন ক্ষেত-খামার, গ্রাম লোকালয়ের বলিষ্ঠ প্রহরী, যিনি সমস্ত প্রকার দুষ্টশক্তি ও কু-প্রভাব বিতাড়ন করে সকলের শুভ ও মঙ্গল বিধান করেন বলে বিবেচিত

হন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, বীরত্বের প্রতিমূর্তি ভীম বিবর্তনের ধারায়, বিশেষত স্বদেশী আন্দোলনের পটভূমিকায়, সম্মিলিত যুবশক্তির প্রতীক হিসাবে পরিগণিত ও পূজিত হন।

মোটের উপর পূর্বাপর লোকসংস্কৃতিবিজ্ঞানের আলোয় ভীমপূজার উদ্ভব ও বিকাশের গতি-প্রকৃতি বিশ্লেষণে বোঝা যায়—মেদিনীপুর জেলায় ব্যাপকরূপে অনুষ্ঠিত ভীমপূজা এক সার্বজনীন লোকায়ত উৎসব, প্রাগৈতিহাসিক প্রস্তর যুগে পর্যন্ত বিস্তৃত মেদিনীপুরের হারানো অতীতের অন্ধকারে তার আদিম উৎস হয়তো বিস্তৃত। মেদিনীপুর জেলার ঐতিহাসিক-ভৌগোলিক ও সামাজিক অর্থনৈতিক পটভূমিকায় ভীম-কাল্টের সামগ্রিক পর্যালোচনায় বলা যায়—যুগ পরিবেশের প্রভাবে ও Little tradion ও Great tradition-এর প্রতিক্রিয়াজাত Universalization ও Parochialization-এর বৈশিষ্ট্যে মহাভারতের মধ্যম-পাণ্ডবের বা শিবের উপাখ্যানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হলেও এবং স্বদেশি আন্দোলনের পটভূমিকায় সম্মিলিত যুবশক্তির পূজা হিসাবে বিবর্তিত হলেও, ভীম মূলত আদিম লৌকিক বিশ্বাস-অনুষ্ঠানের উৎসে উদ্ভূত ও বিকশিত, অশুভ শক্তি বিতাড়ক, ক্ষেত্র ও গ্রামরক্ষক এবং কৃষিসহায়ক দেবতা রূপেই বিবেচিত হয়।

আলোচ্য প্রবন্ধে ব্যাপক ক্ষেত্রানুসন্ধান লব্ধ তথ্য ও আধুনিক লোকসংস্কৃতিবিজ্ঞানের তত্ত্বনিষ্ঠ বিশ্লেষণ পদ্ধতি প্রয়োগে পৌরাণিক-শাস্ত্রীয় প্রভাবের থেকে দূরে লৌকিক প্রথানুসারে পূজিত প্রধানত লোকদেবতার ও তৎসংশ্লিষ্ট উৎসবের রূপ ও প্রকৃতি পরিক্রমা করা হয়েছে। স্বভাবতই এই পরিক্রমা একদিকে যেমন উৎসবের বর্তমান ব্যবহারিক (Functional) রূপ অনুধাবন করেছে, তেমন অতীত অনুসন্ধান বা আদিম উৎস (Origin) অনুসন্ধানে তৎপর হয়েছে। এক কথায় এক্ষেত্রে স্বল্পায়তনে হলেও কমবেশি সামগ্রিক রূপ পরিক্রমা করার চেষ্টা হয়েছে, লোকসংস্কৃতি অনুশীলনের পদ্ধতিগত (Methodology) পরিভাষায় যাকে সামগ্রিক পরিদর্শন বলা যায়।

স্বভাবতই কমবেশি মৌলিক সিদ্ধান্ত সম্পন্ন মূল ও অনুষঙ্গী দেব-দেবী বা অনুষ্ঠান ধরে মোট ছয়টি লোকউৎসব সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা বর্তমান প্রবন্ধের সীমিত পরিসরে পরিবেশন করা সম্ভবপর নয়। তাই বর্তমান প্রবন্ধে প্রধানত মূল বক্তব্যের রূপরেখাই তুলে ধরা হয়েছে। এ বিষয়ে বিস্তৃত ও স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনার বাসনা মনে পোষণ করে সবিনয়ে নিম্নলিখিত রচনাদির দিকে অনুসন্ধিৎসু পাঠকবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এবং সকলের নিকটে প্রবন্ধ আলোচিত বিষয় সম্পর্কে নতুন তথ্য, জিজ্ঞাসা ও মন্তব্যাদি প্রার্থনা করছি যার দ্বারা ভবিষ্যৎ গবেষণা অধিকতর সার্থক হয়ে উঠবে বলে বিবেচিত হয়।

পশ্চিমবঙ্গের লোকনৃত্যের ভূমিকা

শ্রী সনৎকুমার মিত্র

১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ১৫ অগাস্ট বঙ্গব্যবচ্ছেদের মাধ্যমে ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করার পর বৃহৎ বঙ্গের খুব সামান্যতম অংশই আজ পশ্চিমবঙ্গ নামে পরিচিত হয়েছে। তথাপি 'এত ভঙ্গ বঙ্গদেশ তবু রঙ্গে ভরা'-র মতো এই খণ্ডিত বঙ্গদেশেও বৈচিত্র্যের অভাব নেই। এর উত্তরে তুষারমৌলী হিমালয় এবং দক্ষিণে সদা পাদবন্দনারত তরঙ্গ-সংক্ষুব্ধ বঙ্গোপসাগর। পশ্চিমে উষর ও রুক্ষ বন-প্রান্তর এবং পূর্বে গঙ্গাবাহিত পলিমাটি সমৃদ্ধ শ্যামল শস্যক্ষেত্র। প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য যেমন এর জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিভিন্নতা ও ঐক্য সৃষ্টি করেছে তেমনি এর রস-মানসও নানা খাতে প্রবাহিত হওয়ার প্রবণতা অর্জন করেছে। তবে সবেরই লক্ষ্য এক গৌড়-বঙ্গীয় মহাসমুদ্রে আত্ম-বিসর্জনান্তে সাম্য লাভ।

এ-হেন পশ্চিমবঙ্গের মোট আয়তন ৮৭, ৬১৭ বর্গ কিলোমিটার। কলকাতা সহ মোট জেলার পরিমাণ ষোল। জলঢাকা, তিস্তা, মহানন্দা, ভাগীরথী বা হুগলী, ময়ূরাক্ষী, অজয়, দামোদর, কংসাবতী ও রূপনারায়ণ এর প্রধান প্রধান নদীগুলির নাম। মূল 'আ-মরি' বঙ্গভাষা-জননী বরেন্দ্রী-রাঢ়ী-সমতটী-ঝাড়খণ্ডী প্রমুখ উপভাষা-বন্যা সমৃদ্ধ হয়ে বঙ্গীয় মনীষার গৃহলক্ষ্মী রূপে বসবাস করেছে। সঙ্গে আছেন সহোদরা স্বরূপা বিভিন্ন আদিজাতিগুলির মুখের ভাষা। এই ভাব সম্পদ সম্বল করে একেবারে মাটি মায়ের কোলে আশ্রয় পেয়েছেন বেশ কয়েকজন আদি মানবকের বংশসম্ভূত পার্বত্য বা অপার্বত্য উপজাতি, প্রচুর সংখ্যক অ-বর্ণহিন্দু, আর্যরক্তের গৌরবাভিমানী বিমিশ্র বর্ণহিন্দু ও বিপুল পরিমাণের মুসলমান বাঙালি। এঁদের ধর্ম-কর্ম বিশ্বাস আচার-আচরণ অনেক কিছুতেই যেমন মেরু ব্যবধান পার্থক্য রয়েছে, তেমনি এক অখণ্ড বাঙালির জীবনবোধ ও বহু যুগ বাহিত সাংস্কৃতিক ঋক্ থেকে যদি অনুসন্ধান করা যায় তা হলেও ব্যর্থ হতে হবে না।

এই পটভূমিকাকে মনে রেখে আধুনিক পশ্চিমবঙ্গের লোকনৃত্যের পরিচয় গ্রহণ করতে হবে। এখানে একথা বলা-বাহুল্য যে পশ্চিমবঙ্গে অন্য অনেক কিছুর মতোই লোকনৃত্যেরও অভাব নেই। এই মন্তব্যকে আরও একটু বাড়িয়ে দিয়ে বলা যেতে পারে যে পশ্চিমবঙ্গের নৃত্য-সম্পদ বলে যদি কোনও কিছুকে উপস্থিত করতে হয় তবে অবশ্যই তাকে তার ভূমি-জ 'লোক' ভান্ডরের দরজায় হাত পাততে হবে। কারণ, পশ্চিমবঙ্গের ঐতিহ্য-চিহ্নিত নিজস্ব কোনও ধ্রুপদী নৃত্য নেই।

● **উৎস পরিচয় :** বঙ্গীয় লোকনৃত্যের পরিচয় গ্রহণে প্রবিষ্ট হবার আগে এর আন্তরিক

গুণকর্মের প্রসঙ্গটি আলোচনার সূত্রে তার উৎস-তাৎপর্যের কথা জেনে নেওয়ার প্রয়োজন। দেশ-বিদেশের প্রাজ্ঞ পণ্ডিতগণ নৃত্যের জন্ম-রহস্যটি খুঁজে বার করতে গিয়ে নানা ধরণের মত প্রকাশ করেছেন। যেমন—

১. আদিম সমাজে ব্যক্তি এবং সমাজকে দৈব-দুর্বিপাক থেকে রক্ষার উপায় হিসাবে ঐন্দ্রজালিক জাদুক্রিয়ার অঙ্গ হিসেবে নৃত্যের উদ্ভাবন হয়েছিল বলে কোনো কোনো বিশেষজ্ঞ মনে করেন। তাঁদের মতে, 'সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে আদিম সমাজ হইতে উদ্ভূত এই ক্রিয়া পরিত্যক্ত না হইয়া বরং নানা দিক হইতে শিল্প ও সৌন্দর্যবোধের দ্বারা যুগোচিত পরিমার্জনা লাভ করিয়া আধুনিক জীবনে সামাজিকতার প্রয়োজনেও ইহাকে রক্ষা করা হইয়াছে। সুতরাং ইহার ধারা অত্যন্ত প্রাচীন—মানব সভ্যতার ক্রমবিকাশের ধারার সঙ্গে ইহা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।

২. কারোর মতে ভাষাহীন আদিম মানুষ হাত-পা-নেড়ে যে অঙ্গভঙ্গী করতো তাই ধীর বিবর্তন পথে নৃত্যের রূপ নেয়। 'আদিম যুগে মানুষের যখন ভাষা ছিল না তখন নানা প্রকার অঙ্গভঙ্গির সাহায্যে ভাব প্রকাশ করতো।'

৩. কেউ কেউ মনে করেন যে, আদিম মানুষের যে শ্রমের ব্যবহার তার সঙ্গে যে অঙ্গবিক্ষেপ যুক্ত ছিল তা-ই ক্রমে ক্রমে নৃত্যে পরিণত হয়েছে। অনেক সময় শ্রমকে লাঘব করার জন্যেও নৃত্য ব্যবহৃত হতো।

৪. যে শস্য মানুষের জীবন ধারণের অবলম্বন, তার সু-ফলন এবং সুফল প্রাপ্তি এই দুই প্রসঙ্গেই নৃত্যের ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায়। অর্থাৎ মানুষের বিভিন্ন বিষয়ক কামনা বা আকাঙ্ক্ষা নৃত্যের জন্ম দিয়েছে, এই মতকেও একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

৫. 'যৌনাকর্ষণ নৃত্যের উদ্ভবের আর একটি কারণ বলে অনেকে মনে করেন। নৃত্য নরনারীর অঙ্গভঙ্গির কলাকৌশল এবং পরস্পরের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য পরিশেষে যৌনবোধকে তীব্র করে—এই আদিম ধারণা থেকে নৃত্যের চর্চা অসম্ভব ছিল না'।

এইভাবে অতি প্রাচীনকালে গোষ্ঠীবদ্ধ মানব-জীবনের নানা বিশ্বাস ও আকাঙ্ক্ষা, বিভিন্ন প্রকারের আচার-অনুষ্ঠান ও কর্মৈষণা নৃত্য তথা লোকনৃত্যের উদ্ভব ও বিকাশকে সম্ভব করেছে।

● **সাধারণ বৈশিষ্ট্য :** সাধারণভাবে লোকনৃত্যের আন্ততাৎপর্যের সন্ধান করার পর, সেই অভিজ্ঞান অবলম্বন করে পশ্চিমবঙ্গের লোকনৃত্যের সাধারণ বৈশিষ্ট্যটি কি তা জেনে নেওয়া দরকার। এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন যে এই বৈশিষ্ট্য যে কেবল পশ্চিমবঙ্গের আলোচনার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, তা মনে করার কোনও কারণ নেই। কেন না এই সাধারণত্ব তাবৎ লোকনৃত্যের পটভূমিকাতেই অনুসৃত হয়ে থাকে এবং প্রসঙ্গ সূত্রে আন্তর্ভারতীয় ধ্রুপদী নৃত্যের সঙ্গে তার যোগ বা বিচ্ছিন্নতা কোথায় বা কতখানি তাও এসে যাবে।

১. রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'লোকসাহিত্য' গ্রন্থে 'ছেলেভুলানো ছড়া'র আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন, "এই ছড়াগুলি আমাদের নিয়ত অপরিবর্তিত অন্তরাকাশের ছায়া মাত্র, তরল স্বচ্ছ সরোবরের উপর মেঘ-ক্রীড়িত নভোমণ্ডলের ছায়ার মতো। সেইজন্যই বলিয়াছিলাম, ইহারা আপনি জন্মিয়াছে।"[৪] এই বক্তব্যের মূল তাৎপর্য লোক-নৃত্যেরও বৈশিষ্ট্য দ্যোতক। এও হয়ে

ওঠা শিল্পকলা'। যদি একটি সুশৃঙ্খল, ছন্দোময় এবং সংযমশীল অঙ্গাবিক্ষেপই নৃত্য—বা ধ্রুপদী নৃত্যের প্রাথমিক শর্ত, অন্যথা লোক-নৃত্যের ক্ষেত্রে ওইগুলির ব্যবহার ও ওই বিষয়ে শিক্ষণীয় শাস্ত্র অনেকখানি আলগা। দীর্ঘ শিক্ষার মধ্যে দিয়ে, কঠিন আয়াসে, অপরিবর্তনীয় শাস্ত্রবন্ধনে দেহ ভঙ্গিমা সুষমা-মণ্ডিত হয়ে ওঠে যে শাস্ত্রীয় নৃত্যের ক্ষেত্রে, লোকনৃত্যের বেলায় তা অত কঠিন শিক্ষা বা অতখানি আয়াসসাধ্য শাস্ত্রীয় সংযম প্রার্থনা করে না। বহু সময়ে বা অনেক ক্ষেত্রেই মনের এক স্বাভাবিক আবেগ থেকেই দেহ-কাঠামো 'দোলায়িত' হয়ে ওঠে। অপরপক্ষে ধ্রুপদী নৃত্যে কিন্তু দেব বল্লরী 'লীলায়িত' হওয়ার প্রয়োজন বোধ করে।

২. ওপরের ওই মন্তব্য থেকে একথা মনে করার কোনো কারণ নেই যে লোকনৃত্যের জন্যে কোনো শিক্ষা বা চর্চার প্রয়োজন হয় না, যেমন—তেমন ভাবে শরীরটাকে দুলিয়ে দুমদাম করে হাত পা নাড়লেই লোকনৃত্য দেখানো যাবে। ব্যাপারটা কিন্তু তা নয় এবং সেকথা বলা আমাদের উদ্দেশ্যও নয়। আসলে, লোক-নৃত্যের ক্ষেত্রে শিক্ষার বদলে অভ্যাসের প্রয়োজন, জ্ঞানের পরিবর্তে আবেগ প্রার্থনীয়, কৌশলগত প্রকাশভঙ্গী অপেক্ষা মোটাদাগের স্বতঃস্ফূততাই প্রধান। তাই লোকনৃত্য 'লোক'-এ নেচেই শেখে—অন্যদিকে ধ্রুপদী নৃত্য শিক্ষার পরেই নাচা যায়। অবশ্য কোনো কোনো নৃত্য-বিশেষজ্ঞ লোকনৃত্যকে এতখানি স্বাভাবিকতার ক্ষেত্রে মুক্তি দিতে না চেয়ে আঙ্গিক বিনিয়োগের তারতম্যে লোকনৃত্যে এমন দুটি ভাগ উপস্থিত করেন যার দ্বিতীয় অংশটি আবার শাস্ত্রীয় নৃত্যের খুব কাছাকাছি। তাঁদের মতে লোক-নৃত্যের দু-ভাগের মধ্যে একভাগ, 'স্বতঃস্ফূর্ত, সহজ, সাবলীল, একঘেয়ে, সমবেত গোষ্ঠী নৃত্য। অন্যভাগ, জটিল তাল-লয়-ছন্দে শাস্ত্রীয় আজিকের গতি-চারী-চলন-উৎপ্লাবন, ভ্রামরী, অঙ্গাভেদা, ও হস্তকর্মে পুষ্ট লোক-সমাজের নাট্যধর্মীয়'।

৩. উক্ত বৈশিষ্ট্যের জন্যেই লোকনৃত্যের মধ্যে কোনও ক্ষেত্রেই চোখ হাত আঙ্গুল বা মুখমণ্ডলের কোনও মুদ্রা বা প্রতীক-ব্যঞ্জনা নেই। এদিক থেকে লোকনৃত্য সরল (Flat) বা কোনও মাত্রা (Dimession) রচনা করতে পারে না। অপর পক্ষে যথোপযুক্ত ভাব-সমৃদ্ধ মুদ্রা ব্যবহারের দ্বারা শাস্ত্রীয়-নৃত্য রূপক ব্যঞ্জনায়, প্রতীক-সৃষ্টির মাধ্যমে সৌন্দর্যমণ্ডিত হয়ে ওঠে। ফলে এ জটিল ও বহুযাত্রিকতা গুণ অর্জন করে।

৪. পোশাক-পরিচ্ছদ বা অঙ্গাসজ্জা—যাকে ইংরেজি পরিভাষায় বলে—dress, costume and make-up তা লোকনৃত্যের ক্ষেত্রে অপ্রয়োজনীয় বা বাহুল্য মাত্র। রোজকার জীবনে ব্যবহৃত সাধারণ বা সীমিত বস্ত্র-অলঙ্কার বা দেহ সজ্জাই লোকনৃত্যের ক্ষেত্রে যথেষ্ট বলে বিবেচিত হয়। অন্যদিকে শাস্ত্রীয় নৃত্যের নর্তক তাঁর পোশাক-পরিচ্ছদ, তাঁর সুনিপুণ অঙ্গা সজ্জার মধ্যে দিয়ে একটি রীতিবন্ধ-নিয়মনিষ্ঠা সযত্নে রক্ষা করার চেষ্টা করে থাকেন। ক্ষেত্র বা নৃত্য বিশেষে সজ্জা বা ভূষণের অভাব বা পরিবর্তন ঘটাটা শাস্ত্রীয় নৃত্যের পক্ষে অনাচার হিসেবেই গণ্য হয়ে থাকে।

৫. আমরা জানি যে, লোকসংস্কৃতির ক্ষেত্রে নৈর্ব্যক্তিকতা হচ্ছে তার প্রাথমিক শর্ত। এখানে একের সৃষ্টি দশজনের হাত বেয়ে সমগ্র সমাজের সম্পত্তিতে পরিণতি লাভ করেই লোকসংস্কৃতি স্বাভাবিক স্ফূর্তি লাভ করে। এখানে সচেতন-ব্যক্তিত্ব বিকাশের কোনও অবকাশ নেই। এবং যেহেতু লোকনৃত্য লোকসংস্কৃতিরই একটি উপাঙ্গ সেহেতু এখানে নৈর্ব্যক্তিকতা আবশ্যকীয়। ফলে একের ভাব বা আবেগ সমগ্র লোকসমাজের মধ্যে মিশে গিয়ে ব্যষ্টির

সামান্যতম সচেতনতাকে সমষ্টির যৌথ অভিজ্ঞানের ক্ষেত্রে পূর্ণ মুক্তি দিয়ে ফেলে। এ হয়ে ওঠে সাধারণের সম্পত্তি। এই জন্যেই লোকনৃত্যের আসরে দূরে বসে বাবুমশায় দর্শক হয়ে থাকলে পূর্ণ আনন্দ পাওয়া যায় না—কখন যে অজান্তে পায়ে পায়ে, মনে মনে, সমগ্র দেহ কাঠামোটিতে নাচের ছন্দ এসে যোগ দিয়ে ফেলেছে, ওই নৃত্যে অংশগ্রহণ করে ফেলা গেছে তা বোঝা যায় না।

স্বচ্ছন্দ, সহজ-সরল প্রাণাবেগে পূর্ণ দলবদ্ধ আনন্দ-সৃষ্টি ও তার উপভোগেই লোকনৃত্যের মৌলিক সিদ্ধি। তার আবেগ এবং শক্তি দর্শককে আসরে টেনে এনে নাচিয়ে ও নেচে অনাবিল আনন্দরস পান করায়। অপরদিকে ধ্রুপদী নৃত্য ব্যক্তিকেন্দ্রিক, আত্মসুখসর্বস্ব। শিল্পীর সামগ্রিক চৈতন্যের (intellect) রঙে, অহংবোধের (ego) উজ্জ্বল উপস্থিতিতে, ব্যষ্টির সন্তোষবিধান এবং উৎকর্ষ প্রদর্শনের মধ্যেই এর স্ফূর্তি এবং ঠিক এই কারণেই সচেতন ব্যক্তিত্ব (Individuality)-চিহ্ন এই নৃত্যে একটি সূক্ষ্ম রসবোধ এবং সজ্ঞান সৌকর্য সৃষ্টি করে থাকে।

৬. এরই সঙ্গে লোকনৃত্যের আরও একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য আলোচ্য। তা-হচ্ছে যূথবদ্ধতা। আমাদের জানা আছে যে সমগ্র 'লোক'-এর জীবন-ব্যবস্থার সংহত চৈতন্যের বোধ একান্ত ভাবে সক্রিয়। তাই লোকনৃত্য মাত্রেই হয়ে ওঠে প্রতিষ্ঠিত জীবনাবর্তের গতিময় এবং দলবদ্ধ প্রথানুসরণ। অন্যদিকে ধ্রুপদী নৃত্যের ক্ষেত্রে যেমন সংহত গোষ্ঠী চেতনার কোনও স্থান নেই, তেমনি দেখতে পাওয়া যায় না কোনও প্রথানুসরণ। যুগে যুগে কালে কালে অসংখ্য নৃত্যবিদ্ আপন ব্যক্তিত্ব-বুদ্ধি বা প্রতিভার শক্তিতে প্রথার শৃঙ্খলকে ভেঙে নব নব সম্ভাবনার ক্ষেত্রে মুক্তি দিয়ে ধ্রুপদী নৃত্যকে একঘেঁয়েমি থেকে বাঁচিয়ে দিতে পেরেছে। এই কারণে যাঁরাই লোকনৃত্য দেখেছেন তাঁদের কাছ থেকেই একঘেয়েমির অভিযোগ শুনতে হয়েছে।

৭. লোকনৃত্য অকৃত্রিম এবং স্বতঃস্ফূর্ত। এর মধ্যে দিয়ে একটি জাতির জীবন-বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে থাকে। লোকশিল্পীর চৈতন্য সংবদ্ধ থাকে নৃত্যে—আত্মপ্রকাশে নয়। অপর পক্ষে ধ্রুপদী নৃত্যের শিল্পী চেস্টা করেন দর্শকের কৌতুকবোধ জাগ্রত করতে, তার বুদ্ধিকে উদ্বুদ্ধ করতে। এখানে শিল্পীর চেস্টা থাকে নৃত্যের ব্যাকরণকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অনুসরণ করে আপন ব্যক্তিত্ববিকাশের সঙ্গে সঙ্গে দর্শকের মনোরঞ্জন করা। ফলে বহুক্ষেত্রেই কৃত্রিমতা ধ্রুপদী নৃত্যের সরল ও উদ্দাম প্রাণৈশ্বর্যকে ব্যাহত করে। এ প্রসঙ্গে যথার্থভাবেই বলা হয়েছে—

> লোকনৃত্যের জন্য কৃত্রিম মাচা বাঁধতে, আলো জ্বালতে বা পট ঝোলাতে হয় না। শিল্পীদের পায়ের তলায় থাকে অনাবৃত শ্যামল ভূমি, মাথার উপরে থাকে অসীম আকাশের নীলিমা।... শিল্পীরা হয়তো সেখানে নিজেদের শিল্পী বলেই জানে না, শুকনো ব্যাকরণের বাঁধা বচনও তাদের অজানা। নাচে তারা অচলায়তন থেকে মুক্ত প্রবল জীবনের আনন্দে এবং অঙ্গাভঙ্গো ছন্দে ছন্দে প্রকাশ করে সরল প্রাণের আশা-আকাঙ্ক্ষাই। যে কোন জাতির সত্যিকার আত্মা খুঁজে পাওয়া যায় তার লোকনৃত্যে।

৮. বাদ্যযন্ত্র ব্যবহারে বৈচিত্র্যহীনতা হচ্ছে লোকনৃত্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। অন্যপক্ষে ধ্রুপদী নৃত্যে বাদ্যযন্ত্র ব্যবহারের পরিধি যেমন বিস্তৃত তেমন তার বৈচিত্র্যও লক্ষণীয়। তালযন্ত্র ছাড়া ধ্রুপদী নৃত্য যেমন অসম্ভব, অপরদিকে লোকনৃত্যের ক্ষেত্রে তালযন্ত্রের ব্যবহার কিছু কম, কোনো কোনো জায়গায় আবার কেবল হাততালির সাহায্যে লোকনৃত্য অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

গ্রাম্য অর্থাৎ দেশজ বা লোকসমাজের দৈনন্দিন জীবন-যাত্রায় যে সমস্ত বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করা হয়ে থাকে তাদের নৃত্যের ক্ষেত্রেও সেইগুলিই অকপটে এবং সহজ শিক্ষায় বাজানো হয়ে থাকে। লোকনৃত্যের ক্ষেত্রে বাদ্যযন্ত্র ব্যবহারের বৈশিষ্ট্য বিষয়ে বলতে গিয়ে স্বনামখ্যাত লোকনৃত্য গবেষক গুরুসদয় দত্ত মহাশয় যা বলেছেন তা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তিনি লিখছেন—

> Bengali folk dances are robust in character and entirely wanting in the melting softness of movement and sensual music... The instrument accompanying most of them, not excluding women’s dances is the robust drum,... Even the softest Bengali folk dance, the Brata dance of girls and married women, is accompanied by the virile dhak (big drum), characterized by a great sturdiness and by the complete absence of any cloying sensual suggestion’.

লোকনৃত্যের ক্ষেত্রে বাদ্যযন্ত্র ব্যবহারে আরও একটি বিষয় লক্ষ করার মতো তা হচ্ছে এই যে, এক একটি নাচের জন্য এক বা একাধিক সুনির্দিষ্ট বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার। যেমন—বাউল নাচের ক্ষেত্রে পায়ে নুপূর, একতারা বা লাউ, কোমরে বাঁয়া অপরিহার্য। অথবা ছৌ-নাচে ঢোল, ধামসা ও সানাই অবশ্য প্রয়োজনীয়। অন্য সবই বাহুল্য মাত্র। কিন্তু উচ্চাঙ্গ নৃত্যের ক্ষেত্রে এই ধরনের কোনও সুনির্দিষ্ট বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করার রীতি বা ট্যাবু লক্ষ করা যায় না।

৯. কণ্ঠ-সংগীত বা Vocal Music-প্রায় সব লোক-নৃত্যের ক্ষেত্রে একটি আবশ্যিক উপাঙ্গা। যে স্বতঃস্ফূর্ত আবেগে দেহে নাচ আসে, সেই একই প্রাণোচ্ছলতায় কণ্ঠে সুর জাগে। বা বিপরীত ভাবে বলা যায় যে লোক-সংগীতের মধ্যে যে সহজ সুরবোধ অথবা ভাবালুতা রয়েছে তাই-ই দেহে দোলা জাগায়। গান আপনিই নাচকে টেনে আনে। লোকসংস্কৃতিতে গান ও নাচ হরগৌরীর মতো সম্মিলিত।

১০. লোকনৃত্য গান ব্যবহারের ক্ষেত্রে আরও কিছু বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করা যায়। যেমন লোকসংগীতের ভাবের তাৎপর্য লোকনৃত্যের মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত হবেই এমন কোনও বাধ্যবাধকতা নেই। এ প্রসঙ্গে নৃত্য ও সংগীতবিদ্ বলেছেন—“নাচে গান থাকলেও গানের প্রত্যেক শব্দ ধরে অর্থ প্রকাশের কোনও চেষ্টাই করে না নাচিয়েরা। গানের মূল ছন্দটাই এ নাচের প্রধান অবলম্বন হয়ে ওঠে।” ইনি অন্যত্র আরও বলছেন—

> গানের কথায় যে অর্থই প্রকাশ পাক না কেন, নাচিয়েরা নাচের ভিতর দিয়ে... তার অর্থ প্রকাশের চেস্টা করে না। একমাত্র লক্ষ্য থাকে গানে ও বাজনার ছন্দের সঙ্গে নিজেদের দেহভঙ্গির ছন্দকে মিলিয়ে নেবার। এইসব গানের কলির পর কলিতে কথা বদলে যাচ্ছে, কিন্তু সুরের বদল হয় না। নাচেও ঠিক তাই। ভঙ্গির পুনরাবৃত্তি দেখতে পাই এই সব নাচে, গানের সুরের মত।

ফলে লোকসংগীতে যেমন সুরের একঘেয়েমি ও দীনতা, নৃত্যেও তেমন গভীর ইঙ্গিতবত ভঙ্গীর অভাব। এই প্রসঙ্গে লক্ষণীয় যে, “কলাকৌশল দ্বারা গানের অর্থ প্রকাশের ভেতর দিয়ে নাচকে নিখুঁত করার চেয়ে অন্তর আবেগের টানে আনন্দলোক রচনা করাই লোকনৃত্যের প্রধান লক্ষ্য।” আরও খুঁটিয়ে অনুসন্ধান করলে লোকনৃত্যের আরও কিছু অপ্রধান বৈশিষ্ট্য উপস্থাপিত হতে পারে। কিন্তু সেই ধরনের অতিব্যাপ্তি দোষ এড়িয়ে আমরা উপরে

পর্যালোচিত বিষয় থেকেই লোকনৃত্যের সাধারণ বিশিষ্টতাকে বুঝে নিতে পারবো আশা করি। এখন অমরা পশ্চিমবঙ্গের লোকনৃত্যকে তার প্রয়োগ লক্ষণ রীতি প্রভৃতির বিচারে কয়েকটি বিভাগে বিভক্ত করবো।

⊃ শ্রেণিবিভাগ

প্রাথমিকভাবে এবং অংশগ্রহণকারীদের প্রকৃতি নির্ণয় করে লোকনৃত্যকে তিন ভাবে ভাগ করা যায়—

১. পুরুষের নৃত্য বা Male Dance : এমন অনেক নৃত্য আছে যেখানে কেবল পুরুষেরাই অংশগ্রহণ করে থাকে। এতে মেয়েদের অংশ গ্রহণ করতে দেখা যায় না, সাধারণত দুটি কারণে—প্রথমত, এই সব নাচে মহিলারা শারীরিক ভাবে অপটুত্ব অনুভব করে থাকেন। যেমন, পাইক নাচ, বা ছৌ-নাচ ইত্যাদি। দ্বিতীয়ত, ধর্মীয় নিষেধ বা ট্যাবু (Taboo)। যেমন—ছৌ-নাচ, কি আলকাপ নাচ বা গম্ভীরা নাচ।

২. নারী নৃত্য বা মেয়েলী নাচ বা Female Dance : এই সব মেয়েলি নৃত্যে পুরুষদের অংশগ্রহণ সাধারণত ট্যাবু হিসবেই গণ্য। যেমন, হুদেমদেও নৃত্য বা মুসলমানী বিয়ের নাচ ইত্যাদি ইত্যাদি।

৩. মিশ্র নৃত্য বা Common Dance : এমন কিছু নৃত্য আছে যাতে নারী এবং পুরুষ উভয়েই অংশ গ্রহণ করে থাকে। উভয়ের মিলিত নাচে সমগ্র-নৃত্য প্রাঙ্গণ আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে ওঠে। একে আমরা মিশ্র নৃত্য বা Common Dance বলতে পারি। যেমন, নাচনী নাচ নাচনী ও রসিকের মিলিত নৃত্য।

এই প্রসঙ্গে একটি বিষয় লক্ষণীয় যে তুলনামূলক বিষয়ে নারী বা পুরুষের পৃথক পৃথক নৃত্যের সংখ্যাধিক্যের পাশে উভয়ের মিশ্রনৃত্যের সংখ্যা অনেক অনেক কম। এর প্রকৃত কারণ কি তার বিস্তৃত ব্যাখ্যার অবকাশ এখানে না থাকলেও মোটামুটিভাবে মনে হয় মধ্যযুগের বাংলাদেশে যে সমাজ-ঐতিহাসিক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল তাতে মেয়েরা ব্রত ও আচার অবলম্বন করে প্রধানত অন্তঃপুরে নৃত্য করে থাকলেও প্রকাশ্যে পুরুষের সঙ্গে একত্রে নাচতে এগিয়ে আসতে দ্বিধা করেছে। অথচ প্রাচীন বঙ্গদেশে নারী-পুরুষ প্রায়শই মিলিতভাবে নাচে যে অংশ নিত তা চর্যার একটি পদ থেকে জানতে পারা যাচ্ছে। সেখানে বলা হচ্ছে—"নাচন্তি বাজিল গান্তি দেবী। বুদ্ধ নাটক বিষমা হোই।।" (১৭/৫)। অথচ এর আশে পাশে আদিবাসী সমাজে নারী পুরুষের মিলিত নৃত্যই সর্বাপেক্ষা উদ্দাম ও আকর্ষণীয়।

এরপর আমরা লোকনৃত্যকে তার প্রকরণের দিক্ থেকেও আবার দু-ভাগে ভাগ করতে পারি। যেমন—

১. দলবদ্ধ নৃত্য বা গ্রুপ ডান্স বা Group dance : দলবদ্ধ নৃত্য বা গ্রুপ ডান্স-এর প্রকৃত অর্থ তাৎপর্য নির্ণয় করতে গিয়ে লোকসংস্কৃতিবিদ্ লিখছেন—

> ইংরেজি গ্রুপ ডান্স (Group dance) কথাটিকেই সারি নৃত্য বলিয়া বাংলায় উল্লেখ করা যাইতে পারে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ইহার মধ্যে কতটা অস্পষ্টতা থাকিয়া যায়। সারি নৃত্য বলিলেই হয়ত কেহ সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াইয়া বহু সংখ্যক নরনারীর নৃত্য মনে করিতে পারেন, কিন্তু ইংরেজি 'গ্রুপ ডান্স' কথার অর্থ তাহা নহে, ইহাতে সারিবদ্ধভাবে না দাঁড়াইয়াও অর্থাৎ

> এলোমেলোভাবে দাঁড়াইয়া ক্ষুদ্র জনতার যে নৃত্য, তাহা বুঝাইতে পারে। বাংলায় এই ভাবটি গোষ্ঠীনৃত্য শব্দ দ্বারাও প্রকাশ করা যাইতে পারে। কিন্তু 'গোষ্ঠীনৃত্য' কথাটি বাংলায় অপরিচিত, বরং সমবেত কণ্ঠে যে লোক-সংগীত গীত হয়, তাহা সারি গান বলিয়া পরিচিত। সুতরাং এই সূত্রে এই অর্থে নৃত্য কথাটি ব্যবহার করা যায়।

অর্থাৎ আমরা 'দলবন্ধ নৃত্য' বা (Group dance)-কে 'সারি নৃত্য' বলে পরিচিত করতে পারি।

২. একক বা সোলো ডান্স বা Solo dance : এই বিভাগ-পর্যায়ের দ্বিতীয় ভাগটি হচ্ছে একক বা সোলো ডান্স বা Solo dance। লোকসংস্কৃতিতে একক চৈতন্য বা Individuality অস্বীকৃত। তথাপি যে গোষ্ঠী বা সংহত জীবনের অনুপন্থী হিসেবে লোকসংস্কৃতির অন্যতম উপাঙ্গ লোকনৃত্যের জন্ম হয়েছিল সেখানে নির্বিশেষে 'একক নৃত্য'-এর মধ্যে কোনো কোনোভাবে ব্যক্তি চৈতন্যের ছিটে ফোঁটা অনুপ্রবেশ হয়ে থাকতেও পারে এবং সেখানেই একক নৃত্য হয়ে উঠেছে সুন্দর—হয়তো বা গতানুগতিকতা মুক্ত। তবে লোকনৃত্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যেহেতু ধর্মের আঁচল ধরে আছে সেহেতু একক লোকনৃত্যের আবেদন প্রকৃত 'লোক' সমাজে অনেক কম।

এই প্রসঙ্গে দুই বিভাগের লোকনৃত্য-র উদ্ভব ও বিকাশ সম্পর্কে কিছুটা তুলনার অবকাশ থেকে যায়। প্রথমত, 'সারি নৃত্য'র বৈশিষ্ট্য আলোচনা প্রসঙ্গে কারোর মত, মানুষের সমাজ সভ্যতার আদি ফসল। কারণ মানুষের সাংস্কৃতিক জীবনের সময় ফসলই আদিতে গোষ্ঠীচেতনার গর্ভে জন্ম লাভ করেছিল এবং এই সূত্রে লোকসংস্কৃতির অন্যান্য উপাদানের মতো লোকনৃত্যও গোষ্ঠীগত ভাবেই প্রথমে উদ্ভূত হয়। এর বিপক্ষে কেউ কেউ মত দেন যে যাদুবিশ্বাস ও তৎ-অনুসঙ্গী ঐন্দ্রজালিক প্রক্রিয়া আদিম অবস্থায় যে নৃত্যের সৃষ্টি করেছিলো তা 'সারি নৃত্য' নয়, 'একক নৃত্য' বা Solo dance। তাই 'এককনৃত্য'-ই মানব চেতনার 'আদিগঙ্গা ভগীরথ'। কিন্তু যারা লোকনৃত্যের মৌল তাৎপর্যটি অনুধাবন করতে পেরেছেন তারাই স্বীকার করবেন যে কোনো মতবাদই চূড়ান্ত নয়। কেন না 'সারি' ঐন্দ্রজালিক নৃত্যও যেমন আছে, তেমনি গোষ্ঠী চৈতন্যের প্রকাশক 'একক অথবা তার কাছাকাছি দ্বৈত নৃত্যও আছে।

এরপর আমরা ব্যবহারের দিক থেকে লোকনৃত্যকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করতে পারি। এইভাবে ভাগ করতে গিয়ে প্রখ্যাত লোকসংস্কৃতিবিদ গুরুসদয় দত্ত বাংলার সমগ্র লোকনৃত্যকে ১১টি অভিপ্রায় বা Motive-এ ভাগ করেছেন। এবং এইভাবে ভাগ করতে গিয়ে তিনি লিখছেন—

> The motive and content of the various folk dances of Bengal constitute an extremely interesting field for study and also furnish a basis for their classification. The following classification will help to distinguish the characteristics and the basic feature of the various folk dances of Bengal. In each case an attempt has been made to distingnish the motive on the one hand and the content on the other. It must be explained here , however, that although some classification of this kind is obiously essential for clearly distingnishing the general features and character of the various dances as they are practised today, It is perhaps at the same time correct to say that all dances..... may be considered as directly related to spiritual aspirations'.

এরপর তাঁর কৃত বিভাগগুলি হলো—

১. যুদ্ধ অভিপ্রায় বা War Motive
২. ক্রীড়া অভিপ্রায় বা Play Motive
৩. আনুষ্ঠানিক অভিনন্দন, বর দেওয়া ও প্রার্থনা করা অভিপ্রায় বা Ceremonial Greeting, Boon giving and Boon asking motive
৪. সামাজিক অনুষ্ঠান এবং শুভাকাঙ্ক্ষা অভিপ্রায় বা Social ceremony and well-wishing Motive
৫. আনন্দাত্মক ভাব-সম্মিলন অভিপ্রায় বা Joyous self-Union Motive
৬. আধ্যাত্মিক বিনতি এবং আত্মশুদ্ধি অভিপ্রায়' বা Spiritual Supplication and Self-Purification Motive
৭. নীতিমূলক অভিপ্রায় বা Didactic Motive
৮. স্মৃতিরক্ষার্থক অভিপ্রায় বা Commemoration Motive
৯. প্রতিনিধিত্বক এবং ভাবান্তরাত্মক অভিপ্রায় বা Representational and Interpretative Motive
১০. উপযুক্ত প্রমাণাত্মক অভিপ্রায় বা Fitness proving Motive
১১. প্রসন্ন-ক্রিয়াত্মক অভিপ্রায় বা Propitiation Motive

এই অভিপ্রায়গত বিভাগগুলি লোকনৃত্যে'র বিভাগের ক্ষেত্রে চরম স্থিতিস্থাপকতার নিদর্শন। এবং অন্তর্গত নাচগুলির অনেক কটিকেই ঠিক লোকনৃত্য হিসেবে গণ্য করা শক্ত। নৃত্য প্রকরণ, আঙ্গিক রূপসজ্জা, 'অভিপ্রায়' বা Motive-এর মাধ্যমে ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণ করতে গিয়েই এমনটি ঘটেছে এবং অনাবশ্যক জটিলতা বৃদ্ধি করেছে। এর চেয়ে বরঞ্চ আমরা আমাদের লোক-নৃত্যকে ১. আচার নৃত্য, ২. আনুষ্ঠানিক নৃত্য, ৩. আঞ্চলিক নৃত্য, ৪. ঋতু বা Seasonal নৃত্য, ৫. বীর বা যুদ্ধ নৃত্য, ৬. মুখোশ নৃত্য, ৭. কাহিনি নৃত্য প্রভৃতি কয়েকটি ভাগে ভাগ করি তবে মনে হয় অতিব্যাপ্তি দোষকে অনেকখানি এড়ানো যাবে।

পরিশেষে এই শ্রেণিবিভাগ প্রসঙ্গে একটি কথা আমাদের লোকনৃত্য সম্পর্কে মনে রাখলে বিষয়টি অনেকটা সরল হয়, এই সব বিভাগ বা উপবিভাগের কোনোটিই অসূচিভেদ্য বিচ্ছেদ রেখা মেনে স্থির হয়ে থাকে না। মোটামুটিভাবে প্রত্যেকটিই পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক।

➲ নৃত্য পরিচয়

ওপরে সামগ্রিকভাবে লোকনৃত্যের উৎস, সাধারণ বৈশিষ্ট্য এবং শ্রেণি বিভাগের মধ্যে দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের লোকনৃত্যের যে পরিচয়-পটভূমিকা রচিত হয়েছে এবার তার কয়েকটি নৃত্যের সঙ্গে পরিচিত করে দেওয়া প্রয়োজন। প্রথমে আমরা পুরুষ কর্তৃক সারিনৃত্যের অন্তর্গত প্রতিনিধিত্ব এবং ভাবান্তরাত্মক অভিপ্রায়ের দ্যোতক একটি মুখোশ পরিহিত আচার নাচের পরিচয় উপস্থিত করবো।

১. নৃত্যটির নাম ছৌ-নৃত্য। ঝাড়খণ্ড তথা রাঢ়বঙ্গের অন্তর্গত পুরুলিয়া জেলার সবচেয়ে জনপ্রিয় এই নাচ। ছৌ আবশ্যিক ভাবেই মুখোশ নৃত্য। বাঙালির স্বাভাবিক যে মূর্তি নির্মাণ কুশলতা তার প্রতিভার সংযোগে ভারতীয় পুরাণের বিভিন্ন দেব-দেবী, দৈত্য-রাক্ষস, নর-বানর

চরিত্রগুলির অনুরূপ মুখোশ তৈরি করা হয়। এগুলির বর্ণ-সুষমা এবং স্বাভাবিকতা প্রথম দর্শনেই রসিক দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

এই নাচের উৎসমূলে যে শিব-গাজনের প্রভাব আছে তা এক প্রকার স্বীকৃত। তবে এই নাচের তাল, ভঙ্গিমা, রস-নিষ্পত্তি লক্ষ করে কেউ কেউ একে যুদ্ধ-নৃত্য বা সৈন্য-বাহিনীর আরামস্থল ছাউনির নৃত্য বলতে চান। এই প্রসঙ্গে আরও একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, এই জেলায় 'নাচনী' নামে একধরনের লোকনৃত্য আছে। এই 'নাচনী'র আদি রূপ যে 'জমিদারী নাচনী' তার বাদ্য যন্ত্র, নৃত্য-ভঙ্গী ইত্যাদি কতকগুলি বৈশিষ্ট্যের দিকে খুব সচেতন ভাবে নজর দিলে দেখা যাবে যে ছৌ-নাচের উৎস পরিকল্পনায় উক্ত 'নাচনী নাচে'র কিছু কিছু প্রভাব একেবারে অস্বীকার করা যাচ্ছে না।

যাই হোক, ছৌ-নাচ পুরুলিয়া জেলা এবং তার সন্নিকটবর্তী অঞ্চলের মধ্যে ব্যাপকভাবে অনুশীলিত হয়ে থাকে। যদিচ, ছৌ-নাচের সঙ্গে অচ্ছেদ্য ভাবে কোনও গান সংযুক্ত নেই, তথাপি প্রত্যেক পালা আরম্ভ হওয়ার আগে সেই সেই পালার পরিচয়সূচক একটি করে গান গাওয়া হয়। একে 'রঙ' বা 'রঙ ঝুমুর' বলে। যেমন, মহাভারতের 'অভিমুন্য বধ' পালাটি আসরে অভিনীত হলে ঝুমুর গায়ক আসরের চারধার ঘুরে ঘুরে গান ধরলেন—

কোথা আছ হে মামা শ্রীমধুসূদন।
বিপদ সময়ে হরি দাও হে দরশন।।
কোথা পিতা পার্থবীর কোথা রাজা যুধিষ্ঠির
কোথায় আছ বীর বলরাম।।
কোথায় আছ দুই মাতৃ সূত আজি রণে হলাম হত,
তাই আমি ডাকি ঘনে ঘন।।
সপ্তরথী তনু সুধা ধনুর্বাণ আদি গদা
অস্ত্র নাই হস্তের উপর।
চতুর্দিকে ফিরে যাই কারে না দেখিতে পাই
আজি রণে নিশ্চয়ই মরণ।।

এই 'রং'টি গীত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ধামসার গুমগুম শব্দ উঠতে থাকবে। ঢোল ও সানাই-এর সুরে এই রংটিকে বাজানো বা 'রং ভাঙ্গানো' হবে। তারপরেই তাল ফিরিয়ে নতুন বোলে ঢোল ও সানাই এবং সঙ্গে ধামসা অভিমুন্য বধের সুর ধরবে। এবং এই সুর অনুসরণ করে হাতে অস্ত্র ও মুখে মুখোশ বেঁধে আসরে প্রবেশ করবে অভিমুন্য।

রামায়ণ-মহাভারত ও বিভিন্ন পুরাণের কাহিনিই ছৌ-নাচের মাধ্যমে উপস্থাপিত করা হয়ে থাকে। সাধারণত ওই কাব্যগুলির যুদ্ধাত্মক অংশগুলিকেই আসরে টুকরো টুকরো ভাবে হাজির কথা হয়। যেমন—অভিমন্যু বধ, গো-সিংগা বধ, রাবণ বধ, তাড়কা বধ ও হরধনু ভঙ্গ, কিরাত অর্জুনের যুদ্ধ, বৃত্রাসুর বধ ইত্যাদি। তবে কোনো কোনো জায়গায় রাজা দশরথের পুত্রেষ্টি যজ্ঞ থেকে আরম্ভ করে রাবণ বধ পর্যন্ত সম্পূর্ণ রাম কাহিনি নিয়েও সারা রাত ধরে ছৌ-নাচ অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

ছৌ-নাচ একটি পূর্ণ-রাত্রির অনুষ্ঠান। অনেকে তাঁদের বিশ্বাসনুযায়ী সূর্য আকাশে থাকলে এই নাচ আরম্ভ করতে চান না। খোলা আকাশের নিচে, যাত্রার মতো গোল আসরে, মাটির

ওপরেই এই নৃত্য অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। চৈত্র মাসের শেষ থেকে প্রায় গোটা আষাঢ় মাস পর্যন্ত অর্থাৎ যতদিন ভালো করে বর্ষা না নামে ততদিন ছৌ-নাচের একটা না একটা আসর পুরুলিয়ার কোনো না কোনো গ্রামে দেখতে পাওয়া যাবে।

সাধারণত নিম্নাঙ্গে মালকোঁচা মেরে পরা ধুতি বা কোথাও কোথাও ঘুট্‌না এবং নিরাবরণ ঊর্ধ্বাঙ্গ, ও মুখে মুখোশ এই হচ্ছে ছৌ-নাচের পোষাক। তবে কিছু কাল থেকে যাত্রার বর্ণাঢ্য পোশাক ব্যবহারের চল হয়েছে। এই নাচের উদ্দামতা, সীরভার, লাবণ্যমণ্ডিত মুখোশ ও দৃঢ়বন্ধ কাহিনি একে এক উচ্চাঙ্গের লোকগীতি নাট্যের মর্যাদা দান করেছে।

এখানে ছৌ-নাচের প্রারম্ভে আবশ্যিক ভাবে অনুষ্ঠেয় 'গণেশ নন্দন'-র একটি 'রঙ ঝুমুর' এর উদ্ধৃতি এই নৃত্য পদ্ধতির আলোচনা শেষ করা হলো—

সকল সিদ্ধিদাতা
জয় দয় হর-গৌরীর নন্দন।
কি সুন্দর চতুর্ভুজ গজেন্দ্র বদন,
বিঘ্ন বিনাশন।

২. এখানে আমরা আরও একটি ভিন্ন প্রকরণ বা অভিপ্রায়ের লোকনৃত্যের উদাহরণ দেবো, যার নাম 'কাঠি নাচ' গুরুসদয় দত্ত মহাশয় একে 'ক্রীড়া অভিপ্রায়' বা Play Motive-এর অন্তর্গত করতে চেয়েছেন। এই মত মেনে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই নৃত্যের মধ্যে যুদ্ধের বীর নৃত্যের ভাবও যে আছে অস্বীকার করা যায় না। আবার একে আঞ্চলিক নৃত্য বলেও চিহ্নিত করা যায়।

বিষ্ণুপুর-বাঁকুড়া ঝাড়গ্রাম অর্থাৎ মোটামুটি ভাবে মধ্য রাঢ় অঞ্চল বলতে যে স্থানকে বোঝায় সেখানে দুর্গা পূজার অষ্টমী-নবমী থেকে আরম্ভ হয়ে সপ্তাহ কালব্যাপী এই **কাঠি নাচ** অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। ছেলেরা মেয়েদের মতো শাড়ীকে ঘাঘরার মতো ও ব্লাউজ পরে হাতে দুটো ছোট এবং লালরঙ করা কাঠি নিয়ে গানের সঙ্গে নাচ করে। এটি দলবদ্ধ বা 'গ্রুপ ডান্স'। যারা নাচে তারা সাধারণত গান করে না। অন্য একজন মাদল বাজায় বা মৃদঙ্গ নিয়ে নেচে নেচে এবং ঘুরে ঘুরে গান করে আর এই গায়ককে ঘিরে একটি বৃত্ত রচনা করে কাঠির আঘাতের দ্বারা তাল তুলে নাচ হয়। সঙ্গে কাঁসি, আড়বাঁশি বা খঞ্জনি বাজতে থাকে। ঝাড়গ্রাম অঞ্চলে এই নাচ যারা নাচে তারা মুখে উৎকট পেন্ট (Paint) করে। বিষ্ণুপুর অঞ্চলে কিছু কম।

উমা-মেনকা বা হর গৌরী কিংবা কৃষ্ণের বাল্যলীলাকে বিষয় করে এই গানগুলি রচিত হয়। অনেকে মনে করেন যে এই নাচ ও গান কৃষ্ণের গোষ্ঠলীলার স্মারক। এখানে একটি 'কাঠি নাচে'র গান উদ্ধৃত হলো—

সম্মুখে দাঁড়ায়ে গৌরী
কহে নতি বিনয় করি,
শুন হর করি নিবেদন। হো-হো-হোই।
এসেছেন পিতা লয়িতে
যাব জননী দেখিতে
তাই বিদায় মাগি ত্রিলোচন॥ হো-হো-হোই।

বাংলার লোকধর্ম ও লৌকিক দেবতা

গোপাল কৃষ্ণ বসু

বাংলার শহর বা উন্নত জনপদ হতে দূরে, নাগরিক সংস্কৃতি—উচ্চআদর্শ বা শাস্ত্রীয় দেবতার পূজাচার বা প্রভাব বিস্তার করেনি। এরূপ পল্লি অঞ্চলে, ঝোপ-ঝাড়, বন-জঙ্গালের মাঝ দিয়ে সরু পায়ে মাড়ানো মেটে পথের ধারে বা জলাশয়ের তীরে, কোনো কোনো প্রাচীন গাছের তলায় বা পর্ণ কুটিরে বা থানে মাটির তৈরি বহু দেবতার মূর্তি, ঘট, গাছের শাখা, কিংবা পোড়া মাটির ক্ষুদ্রাকৃতি বাঘ, হাতি, ঘোড়া প্রভৃতির মূর্তি বা দেবতার প্রতীক পূজিত হতে দেখা যায়।

এসকল দেবতা, পল্লিসমাজে প্রায় সর্বজনীন ও বহুজনপূজ্য হলেও এদের উল্লেখ কোনো শাস্ত্রগ্রন্থে নেই। শাস্ত্রীয় বিধানেও পূজিত হয় না। পূজায় পৌরোহিত্য করেন ব্রাহ্মণেতর বর্ণের ব্যক্তি, এমনকি নিম্নতম বর্ণের হাড়ি ডোম। এসকল দেবতার পূজা-পার্বণ অনুষ্ঠিত হয় পূর্ণ লোকায়ত বিধানে গ্রাম-প্রধান বা মোড়লের নায়কত্বে। পূজায় বর্ণ ভেদাভেদ এমনকি সাম্প্রদায়িকতা বা কুসংস্কার দেখা যায় না।

ওই সকল পল্লিদেবতার পূজায় আড়ম্বর বা নৈবেদ্যে বহুলতা নেই, দেবতার কাছে পূজকদের কামনা প্রার্থনা ও সামান্য স্বর্গ-মোক্ষ-যশ-সম্পদ নয়, তারা চায় সুফসল এবং হিংস্র জন্তু, ভূতপ্রেত, সর্পের দংশন, রোগ-ব্যাধিতে ও প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে মৃত্যুর কবল হতে ত্রাণ।

জনপদ সমাজে এই সকল দেবতার প্রভাব-প্রতিপত্তি-ভক্তি শ্রদ্ধা শাস্ত্রীয় দেবতা অপেক্ষা আজও অধিক। ওই সকল দেবতার পূজাপার্বণ লক্ষ করলে অনুমান হয় পল্লিপ্রধান এদেশে, শাস্ত্রীয় দেবতার পজক সংখ্যার তুলনায় পল্লির অশাস্ত্রীয় দেবতার উপাসকদের সংখ্যা কম হবে না। তবে এই সকল দেবতাদের অধিক সংখ্যক আঞ্চলিক অর্থাৎ ইহাদের পূজাচার একটি স্থানের মধ্যে সীমাবদ্ধ, অন্যত্র প্রায় অজ্ঞাত, তাহলেও এদেশের সকল পল্লিতে এই জাতীয় দেবতাদের পূজাপার্বণ শতাব্দীর পর শতাব্দী ও লোক পরম্পরায় প্রচলিত হয়ে আসছে, শাস্ত্রীয় দেবতাদের পূজাচার আদর্শ বা প্রভাবে এসকল পল্লিদেবতার প্রতিপত্তি একেবারে কমে যায়নি।

এসকল অশাস্ত্রীয়-অব্রাহ্মণী-অপৌরাণিক দেবতাদের স্বরূপ কি? এঁরা কোন্ যুগে ও সমাজে পরিকল্পিত বা উদ্ভূত? মনে প্রশ্ন জাগে। সে বিষয়ে বলা যায়, এ দেবতাদের পূজাচারে লোকায়ত বিধান, ব্রাহ্মণেতর জাতির পৌরোহিত্য, গ্রাম-প্রধান বা মোড়লের নায়কত্বে গ্রাম বা সমাজগত পূজা-পার্বণ, অনুষ্ঠান, দেবতাদের মূর্তিতে উগ্রভাব, দেবতার প্রতি ভয়-মিশ্রিত ভক্তি, পূজায় অত্যধিক পশুপক্ষী বলি, নৈবেদ্যে বলি করা পশুপক্ষীর মস্তক বা রক্তদান, পূজায়

মদ্য বা গঞ্জিকার বিশেষ ব্যবহার ও রুচি বিরুদ্ধ আচার দেবতার কাছে ভক্তদের পার্থিব স্বার্থপূর্ণ কামনা প্রার্থনা। এগুলি লক্ষ করে অনুমান করা যেতে পারে এসকল দেবতা পূজাচার আদিমযুগে পরিকল্পিত।

আদিমযুগে মানব ধারণা করতো—তাদের জীবনযাত্রায় যা কিছু বিপর্যয়, মৃত্যু, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, রোগব্যাধি, পশু বা সর্প দ্বারা জীবনহানি প্রভৃতি সব বিপদই এক অদৃশ্য মহাহিংস্র শক্তি ঘটিয়ে থাকে। কিছু যুগ পরে, আদিম মানব একটু উন্নত হলে, তাদের ওই ধারণার অনেক পরিবর্তন হয়, ধারণা করে, ওই অদৃশ্য শক্তি ভীতিজনক হলেও, বশীকরণ নরবলি ও কৃপা প্রার্থনা দ্বারা যদি তুস্ট করা যায়, তাহলে জীবনযাত্রায় বিপদ ঘটবে না। কালক্রমে এ ধারণাও আদিম সমাজে হল যে, ওই বিপদ নিয়ন্ত্রক শক্তি একটি নয় বহু, হিংস্রপশুর বিষাক্ত সর্পের, রোগ-ব্যাধির, প্রাকৃতিক দুর্ঘটনার জন্য ভিন্ন ভিন্ন শক্তি আছে।

নব আদিমযুগে মানবদের কোনও কোনও কৌম বা শাখা আকস্মিক ভাবে চাষ করতে বা বন্যপশু বশ করতে অক্ষম হলে চাষের ও পশুরক্ষার দেবতা তাদের মধ্যে কল্পিত হল। এরপরে সেই অদৃশ্যশক্তির প্রতি ভয় কিছু পরিমাণে হ্রাস পায়। তখন তারা ধারণা করতে আরম্ভ করল, ওই সকল শক্তি কোপন স্বভাবের হলেও তাদের কৃপা প্রার্থনা ও তুষ্টি বিধান দ্বারা মঙ্গল হতে পারে, তারা ওই বিষয়-উদ্‌যোগী হলো, আদিম সমাজে ভিন্ন উপাস্যের পরিকল্পনা ও তাদের কৃপা প্রার্থনা দেখা গেল। এসময় তারা মৃত পূর্বপুরুষ, জড়পদার্থ, পশুপক্ষী, বৃক্ষাদি পূজা আরম্ভ করলে। তাদের মধ্যে কোন কোন নিজেদের বিশেষ বিশেষ পশু পক্ষী বা বৃক্ষের বংশধর বলে ওই সকলের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও হয়েছিল। কিন্তু পূজা বলতে ঠিক যা বোঝায় তার প্রবর্তন আদিম সমাজে হয়, ওই সময় এদেশবাসী অস্ট্রিক, মোঙ্গালীয় ও দ্রাবিড়দের দ্বারা। এরাই বিভিন্ন বিষয়ের বিভিন্ন দেবতাদের মূর্তিও কল্পনা করেছিল, এমনকি 'পূজা' শব্দটি তাদের ভাষা থেকে এসেছে।

এখন প্রশ্ন হতে পারে, এই সব পল্লিদেবতারা আদিম যুগীয় তার নিদর্শন কি এবং তাদের পূজা কি করে যুগযুগান্তর অতিক্রম করে পরবর্তী পরিবর্তন বিবর্তন-বিভিন্ন উচ্চতর ধর্মের প্রভাবে ও প্রসারে লুপ না হয়ে বর্তমানেও অস্তিত্ব রক্ষা করে আছে।

পল্লির একান্ত দেবতাদের বা তাদের পূজাচারের মধ্যে আদিমযুগীর ধর্মাচারের নিদর্শনগুলির কয়েকটির বিষয় উপস্থিত করা যায়। এসকল দেবতার উল্লেখ কোনও শাস্ত্রগ্রন্থে নেই। উচ্চবর্ণের হিন্দুরাও এদের পূজা করেন না, এদের প্রতিপত্তি-পূজা পার্বন, অনুন্নত শ্রেণিদের মধ্যে কতকটা সীমাবন্ধ (অনুন্নতরাই বাংলা ভূখণ্ডের আদি অধিবাসী)। এদের পুজো লোকায়ত বিধানে অনুষ্ঠিত হয়। বর্তমানে দু'এক স্থান ব্যতীত পৌরহিত্য করে অব্রাহ্মণ, এমন কি নিম্নশ্রেণি লোক—হাড়ি, ডোম প্রভৃতি। দেবতার কাছে ভক্তের কামনা ব্যক্তিগত এবং পার্থিব সুখ-সুবিধা ও বিপদাদি হতে ত্রাণের জন্য। দেবতাদের প্রতি ভক্তদের ভক্তিমিশ্রিত ভয়। পূজাচারে বীভৎস আচার আচরণ, অত্যধিক পশু হত্যা, দেবতার নৈবেদ্যে বালিকারা পশু মুণ্ড ও রক্ত এবং মদ্য গঞ্জিকা দেওয়া। দেবতার উপর রাগ অভিমান করা বা তাঁরা অনিষ্ঠের কারণও ভাবা। বৃক্ষ বা বৃক্ষ শাখা ও ছোটো ছোটো মাটির ঢিপি এবং স্বাভাবিক প্রস্তর খণ্ডকে দেবতা বা দেবতার প্রতীক বলে ধারণা করা। এ সকল দেবতাই আঞ্চলিক পূজ্য। পুজোর

ব্যাপারে বর্ণ সম্প্রদায় ভেদাভেদ না থাকা ও সাধনা, প্রার্থনা কম কিন্তু পুজায় নাচগান আমোদ প্রমোদ প্রভৃতি বেশি থাকা। দেবতা দেখতে পারে এই বিশ্বাসে মন্দিরে ঢিল ঝুলিয়ে দিয়ে মানত বা তাঁর কাছে কামনা বাসনা জ্ঞাপন করা ও 'জোড়া পাঁঠা খেতে দেব'—এরূপ লোভ দেবতাকে দেখানো। এ সকল দেবতার পুজো কারও ব্যক্তিগত ভাবে হয় না, সর্বদা গ্রাম-মোড়লের নায়কত্বে গ্রাম বা সমাজগত ভাবে অনুষ্ঠিত হয় এবং পল্লিবাসীদের নিকট মাঙন বা পুজোর জন্য ফলমূল শস্য অর্থাদি সংগ্রহ করে পুজোর ব্যয় নির্বাহ করা হয়। কোনও কোনও লৌকিক দেবতার নাম দুর্বোধ্য, প্রচলিত ভাষায় নয়। দাক্ষিণাত্যের কয়েকটি পল্লি দেবতাদের সঙ্গো বাংলার কয়েকটি লৌকিকদেবতার বিস্ময়জনক সাদৃশ্য।

লোকধর্মের একটি বিশেষ অঙ্গা কুমারীদের দ্বারা অনুষ্ঠিত ব্রতগুলি, এই সকল আর্যপূর্ব মাতৃতান্ত্রিক সমাজে উদ্ভূত, তা সহজেই বোঝা যেতে পারে। এ ব্রতগুলিতে পশুপক্ষী, পৃথিবী, বৃক্ষ, নদ-নদী, সূর্য-চন্দ্র প্রভৃতিকে আরাধনা করা হয়। পারিবারিক ও গ্রামসমাজের মঙ্গাল উদ্দেশ্যে। তবে সকল দেবতাই যে আদিমযুগীয় তা নয়, পরবর্তীকালে বিশেষ করে বাংলার বৌদ্ধধর্ম অপ্রিয় হলে, তন্ত্রযোগীদের বহু দেবতা ছদ্মবেশে বা নাম পরিবর্তন করে লৌকিকদেবতাদের মধ্যে অনুপ্রবেশ করেছে। মধ্যযুগে মুসলমানদের কয়েকটি বিখ্যাত মৃত পির-গাজি-বিধিও গ্রামবাংলার লৌকিক-দেবতাদের দলভুক্ত হয়েছেন এবং জনপদ সমাজের হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই তাঁদের উদ্দেশ্যে পুজো দিয়ে থাকে।

অপর প্রশ্ন—সেই আদিমযুগে পরিকল্পিত দেবতা ও তাঁদের পুজো-পার্বণ ধারা কিভাবে যুগের পর যুগ অতিক্রম করে পরবর্তীকালের পরিবর্তন-বিবর্তন বিভিন্ন উচ্চতর ধর্মের প্রচার প্রভাব নব নব ধর্ম বা ধর্মীয় সংস্কৃতির আদর্শে লুপ্ত না হয়ে বর্তমান কালেও প্রবাহিত থাকা সম্ভব হল। তার উত্তরে বলা যায়—উচ্চতর বা বহিরাগত ধর্মগুলির প্রচার বা প্রসার উন্নতস্থানের উচ্চকোটি সমাজে প্রভাব বিস্তার করেছিল, কিন্তু প্রাকৃতিক কারণে বিচ্ছিন্ন দ্বীপাবদ্ধ প্রশস্ত নদনদী হতে দুরন্ত বনময় স্থানে বা অনুন্নত সমাজে প্রচার কিংবা প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়নি। উচ্চকোটি সমাজ পূর্বাগত ধর্ম ত্যাগ করে যেমন ভাবে নবধর্ম স্বীকার করেছে, অনুন্নতরা তা আদৌ করেনি, ধর্মাচার বিষয়ে তারা অতিমাত্রায় রক্ষণশীল, ঐতিহ্যবাহী, এমনকি আপোষ বিরোধী। পূর্বপুরুষগণ বংশ পরম্পরায় যে সকল দেবতা পুজো করেছেন যে বিধান পালন করেছেন পল্লিসমাজের লোকরা চিরদিনই তাই অনুসরণ করে আসছে, এমন কি বর্তমানেও শাস্ত্রীয় দেবতা অপেক্ষা ঐ সকলকে অধিক ভক্তি ও বিশ্বাস তারা করে থাকে। এই সকল কারণে আদিম যুগের দেবতার পূজাচার জনপদ সমাজে লুপ্ত হয়নি, হয়ত কিছু পরিবর্তন হয়েছে, নামে বিশ্বাসে মূর্তিতে বা পূজাচারে।

প্রসঙ্গাত একটি কথা বলা প্রয়োজন বর্তমানে যে সকল আঞ্চলিক দেবতাদের লৌকিক বলা হয়, শহর বা উন্নত স্থান হতে দূরে পূজিত হন এবং ব্রাহ্মণ বা উচ্চকোটি সমাজ স্বীকার করবেন না, সেই সকল বা সেই জাতীয় দেবতাই ভারতে আর্য আগমনের পূর্বে সর্বত্র ও সর্বস্তরের ব্যক্তিদের দ্বারা পূজিত হতেন, পরে যখন উচ্চকোটি ও উন্নত স্থানের অধিবাসীরা আর্য-ব্রাহ্মণ্য ধর্ম পূর্ণভাবে গ্রহণ করেন, সেই সময় আদি যুগের দেবতারা অনুন্নতদের পল্লি সমাজে অস্তিত্ব রক্ষা করেন এবং আঞ্চলিক হয়ে যান। কিন্তু তাঁর প্রভাব প্রতিপত্তি পূজাচার হ্রাস পায়না বর্তমানেও তাদের প্রতি ভক্তদের ধারণা বিশ্বাস শ্রদ্ধা নির্ভরতা পূর্বের মতই আছে।

প্রাচীন কোনও চিন্তাধারা বা ধর্মীয় সংস্কার একবার কোনও দেশে বা সমাজে প্রবেশ করলে পরবর্তীকালে (নানা পরিবর্তনের মধ্যেও) একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় না। ঠিক এই বিষয়ে পাশ্চাত্য গবেষক মনীষী Donald Makenzie তাঁর 'Indian Myth and Legend' গ্রন্থে যা বলেছেন উদ্ধৃত করছি—"A people may change their weapons and their languages time and again, and yet retain ancient modes of thoughts."

বাংলার কয়েকটি লৌকিক দেবতাদের বিষয় আলোচনা করছি—তার-পূর্বে একটি বিষয় বলা অবশ্য প্রয়োজন—লৌকিক দেবতাদের মধ্যে কয়েকটি বিশেষ বিখ্যাত, তাঁদের ভক্ত সংখ্যা এবং পুজোক্ষেত্র বহু দেবতা অপেক্ষা অধিক, তাঁদের প্রথম স্তরের বলা যায়। এইরূপ প্রথমস্তরের দেবতাগুলি যথাক্রমে—ধর্মঠাকুর, দক্ষিণ রায়, পঞ্চানন্দ, ঢেলাইচণ্ডী, বাসলী।

➲ ধর্মঠাকুর

বাংলার জনপদ সমাজে সর্বাপ্রেক্ষা প্রসিদ্ধ, অধিক জনপূজ্য ও গবেষকদের মধ্যে বহু আলোচিত লৌকিক দেবতা—ধর্মঠাকুর বা ধর্মরাজ। এঁর বিভিন্ন প্রকার মূর্তি, প্রতীক, বাহন, নামও আছে। ভক্তদের মধ্যে ধর্মঠাকুরের পুজোর রীতিনীতি ও বিশ্বাস ধারণার কিছু কিছু পার্থক্য লক্ষ করা যায়। এই দেবতাটির স্বরূপ বিষয় গবেষক বা মনীষীদের মধ্যে মতভেদ আছে, তাঁদের বিভিন্ন ধারণাগুলির বিষয় উল্লেখ করছি—

১. কুর্ম উপাসনা : ধর্ম ঠাকুরের পুজো আদিম যুগের 'কুর্ম উপাসনা' থেকে এসেছে। এই দেবতার কর্ম প্রতীকই সর্বাপ্রেক্ষা অধিক পূজিত হয়। আদিম যুগে লোকে বহু পশুকে পুজো করতো তাদের পূর্ব-পুরুষ ধারণায়।

২. ডোম জাতির দেবতা : ধর্মঠাকুরের পুজোয় বর্তমানেও ডোমজাতি অধিক ক্ষেত্রে পৌরোহিত্য করেন। কোনো কোনো মনীষী মন্তব্য করেছেন, ধর্মঠাকুর পুজোর প্রবর্তক ও প্রচারক ছিলেন রামাই পন্ডিত। তিনি জাতিতে ডোম ছিলেন এবং 'ডোম' শব্দ থেকে 'ধর্ম' শব্দ এসেছে। এসেছে অবশ্য চলতি কথার অপপ্রয়োগে—ডোমরাজ > ডোমরা > ধরম > ধর্ম। তুলনা যমরাজকে চলতি ভাষায় = 'যমরা' বলা হয়।

৩. ধর্মঠাকুর আদিম দেবতা : যে বিষয়ে প্রথম উল্লেখ করতে হয় ধর্মঠাকুরর প্রতীক হলো ধর্মশালা ও স্বাভাবিক প্রস্তর খণ্ড। ধর্মশিলা দেখতে মশলা পেষণের নোড়ার মতো। প্রস্তর পুজো আদিম যুগের মানুষরা যে সময়, চেতন-অচেতন সকল দ্রব্যে ঐশীশক্তি আছে ধারণা করে পুজো করতো সেই (fetism) যুগীয়।

ধর্মঠাকুরের গাজন উৎসবে বিগ্রহের পাশে মদ্যপূর্ণ বৃহৎ কলস স্থাপন, ভক্তদের মদ্যপান, আগুন নিয়ে খেলা, অঙ্গো বাণ ফোঁড়া, পেরেক লাগানো পাটাতনের উপর শনয়, গ্রাম মোড়লের বা কৌমপতির নায়কত্বে গ্রামগত পুজো। পুজোয় মাগুন করা, পৌরোহিত্যে সর্বাপেক্ষা নিম্নবর্ণের জাতি ডোমেদের আধিক্য। বর্ণসম্প্রদায় বিষয় বাদ-বিচারহীনতা—এই সবই আদিম যুগীয় ধর্মাচারের লক্ষণযুক্ত দেখা যায়।

৪. ধর্মঠাকুর রাজা দেবতা : আমাদের দেশে কিংবা অন্যত্রও রাজা বা ধর্মনেতাকে দেবতার মর্যাদাদানের প্রীতি ছিল। কালক্রমে বহু রাজা বা ধর্মনেতা ভক্তসমাজে দেবতায় উন্নীত হয়ে যান বা অপর কোনো প্রচলিত পূজাচারের সঙ্গো তাঁদের পুজো মিশ্রিত হয়। ব্যাঘ্রদেবতা

দক্ষিণরায়ের ব্যাপারে বোধহয় সেরূপ হয়েছিল। সীমান্ত বাংলার ছাতা পরবেও রাজার পুজো দেখা যায়।

এ ধারণা হয় ধর্মঠাকুরের (কোনো কোনো স্থানের) গাজন উৎসব লক্ষ করলে। ধর্মঠাকুর এখানে ধর্মরাজ। তিনি রাজপোষাক পরেন। তিনি সিংহাসনে বসেন। ভক্তদের কয়েকজন নগর কোটাল, দ্বার রক্ষকরূপে মন্দির কক্ষ ঘিরে থাকেন। কক্ষের মধ্যে শুধু থাকেন ধর্মের পণ্ডিত (ধর্ম ঠাকুরের ও লৌকিক চণ্ডীর পুরোহিতদের 'পণ্ডিত' বলা হয়, অনুন্নত শ্রেণির লোক ও ধর্মের বা চণ্ডীর পণ্ডিত হতে পারেন)। পুজোর কালে ভক্তরা মন্দির প্রাঙ্গণে বসে তাঁর আরাধনা করতে থাকেন। পুজো অন্তে পুরোহিত গ্রাম্য লোকদের একটির পর একটির নাম ডাকেন। একে 'ধর্মের ডাক' বা গোয়াডাক বা গুয়াডাক বলা হয়। গ্রামের লোকরা একজন করে দেবতার বিগ্রহের সম্মুখে এসে তার পায়ের উপর রৌপ্যমুদ্রা দিয়ে যায়। রৌপ্যমুদ্রা সিকি আধুলি হলেও চলে। কোনো কোনো ধর্মঠাকুরের মন্দিরের শাকদ্বীপ ব্রাহ্মণ পুরোহিতরা প্রচার করেন ধর্মঠাকুর সূর্যদেবতা, আবার দু'এক স্থানে এঁকে যম বা যমরাজ বলা হয়। পশ্চিমবঙ্গে নাথ ধর্ম বহু প্রাচীন, নাথ যোগীরা ধর্মঠাকুর পুজায় পৌরহিত্য করেন, তাঁদের ধারণা ধর্মঠাকুর বুদ্ধদেবের অবতার। এই বিষয়ে একটা কথা মনে হয় নাথ ধর্ম-তান্ত্রিক শৈবধর্ম ও বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে ধর্মপূজা মিশ্রণে সৃষ্ট। তান্ত্রিক ও তন্ত্রযানী বৌদ্ধদের ধর্মে বহু আদিম দেবতার পুজো মিশ্রিত ও প্রচলিত হয়েছিল, সে কারণ নাথদের ওই জাতীয় ধারণা হতে পারে। কিন্তু তাঁদের ধর্মঠাকুর পুজোয় এমন কয়েকটি বিধানও আবার দেখা যায় যেগুলি আদিম যুগীয় বলে মনে হয়।

১ দক্ষিণ রায়

দক্ষিণ রায় সুন্দরবনের ব্যাঘ্রদেবতা বলেই অধিক খ্যাত, এর জন্য পরিচয় আছে। বাংলার লৌকিক দেবকুলে দক্ষিণ রায়ের স্থান একেবারে উচ্চে। এঁর স্বরূপ সম্বন্ধে বিভিন্নকালে বহু মনীষী ও গবেষক দীর্ঘকাল ব্যাপী যে অনুসন্ধান ও প্রবন্ধাদি রচনা করেছেন, তা অপর কোনও অশাস্ত্রীয় দেবতার ভাগ্যে ঘটেছে বলে যানা যায় না।

সুন্দরবন অঞ্চলে ব্যাঘ্রভীতি থেকে এই দেবতা কল্পিত বলে অনেকে মনে করেন। কিন্তু অন্য অভিমতও আছে, আদিম যুগে মানব দু'টি কারণে ব্যাঘ্র পুজো করতো, একটি ব্যাঘ্রদের বা ব্যাঘ্রদের নিয়ন্ত্রণকারী অদৃশ্য শক্তিকে তুষ্ট রাখার জন্য, অপর কারণ হলো—আদিম মানবদের কোনও কোনও কৌম নিজেদের ব্যাঘ্র বংশীয় ধারণা করতো, পূর্বপুরুষ পুজো আদিম যুগে প্রচলিত ছিল। ধারণাগুলি যাই হোক, দক্ষিণরায় পূজার উৎপত্তি ব্যাঘ্র পুজো থেকে হয়েছে, একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। পরে ব্যাঘ্রপুজোর সঙ্গে দক্ষিণরায় (তিনি হয়ত দক্ষিণ অঞ্চলে রাজা বা ধর্ম সমাজ রক্ষক ছিলেন) পুজো মিশ্রিত হয়ে যায়, আদি দেবতা বা ব্যাঘ্র দক্ষিণরায়ের বাহন হয়ে যান। কিন্তু পূর্ব ধারণা স্থির থাকে। অর্থাৎ দক্ষিণরায় ব্যাঘ্রকুলের নিয়ন্ত্রক বা অধিদেবতা ও অরণ্যরাজ্যের অধিপতি। ব্যাঘ্রদেবতার আদিতে কোনো নাম বা রূপ না থাকাই সম্ভব, মনে হয় রূপ বা মূর্তি পরে হয়েছে। 'দক্ষিণরায়' নাম ও সুন্দর আকৃতি মধ্যযুগের পূর্বে হতে পারে না। রূপ ও নাম পরিবর্তিত হলেও ভক্তদের তাঁর প্রতি ধারণা ভক্তি বা পূজাচারে বিশেষ পরিবর্তন ঘটেনি। এখনও সুন্দরবন প্রবেশকালে, সকল মৌলে

(মোম-মধু সংগ্রহকারী), বাউলে (কাঠুরিয়া বা কাঠ ব্যবসায়ী), মালঙ্গী (নুন প্রস্তুতকারক), আবাদকারী শিকারীরা (হিন্দু-অহিন্দু সকলেই) ব্যাঘ্রের গ্রাস হতে রক্ষা পাবে—এই বিশ্বাসে দক্ষিণরায়ের থানে পূজা-হাজোত দেন। বনাঞ্চলে দক্ষিণরায় পুজোয় পুরোহিত থাকে না।

এই প্রসঙ্গে আমরা মনে রাখব যে, দক্ষিণরায় চব্বিশ-পরগনা জেলার দক্ষিণতম অঞ্চলের প্রায় সর্বজনীন দেবতা। তিনি শাস্ত্রীয় না হয়েও শাস্ত্রীয় দেবতার মর্যাদা ওই অঞ্চলে পেয়ে থাকেন। উন্নত জনপদে বা স্থানে এর পুজোয় যে সকল থানে বা মন্দিরে ব্রাহ্মণ পুরোহিত তাঁর পুজো করেন সেরূপ ক্ষেত্রে, মিশ্রিত (শাস্ত্রীয় ও লৌকিক) বিধানে পুজো করা হয়। পুরোহিতরা নানারূপ প্রচার করেন দক্ষিণ রায় সম্বন্ধে। কোনো কোনো পুরোহিত বলেন ইনি শিবপুত্র। অন্যে প্রচার করেন ইনি গণেশের বিচ্ছিন্ন মুণ্ড হতে পূর্ণাকৃতি ধারণ করেছেন। অতএব শাস্ত্রীয় দেবতা। পৌষ সংক্রান্তি অথবা ১ মাঘে, সারা দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় এই দেবতার মূর্তি বা মুখচিত্রিত ঘট প্রতীক বা বারা সর্বত্র পূর্জিত হয়ে থাকে। এঁর বড়ো বড়ো স্থায়ী থান এমনকি পাকা মন্দিরও দেখা যায়। এই সকল স্থানে সারা বৎসর প্রতি শনি-মঙ্গালবারে নিয়মিতভাবে দক্ষিণ রায়ের পূর্ণমূর্তি পূজিত হয়। দক্ষিণ রায়ের মতো সুশ্রী আকৃতির লৌকিক দেবতা বিরল। তাঁর পৌরাণিক রাজা বা যোদ্ধার বেশ। তাঁর হাতে ঢাল বা অপর কোনো অস্ত্র-শস্ত্র। কোনো কোনো স্থানে তাঁর হাতে বন্দুক। পাশে ব্যাঘ্রমূর্তিও দেখা যায়। পূর্ণমূর্তি দক্ষিণ রায়কে ব্রাহ্মণ পৌরাহিত্য করেন। ঘট বা বারার প্রতীক পুজোয় অব্রাহ্মণকেও পৌরহিত্য করতে দেখা যায়। প্রতীক ঘট সর্বদা দুটি থাকে—একটি দক্ষিণ রায়ের অপরটি নারায়ণী বা তাঁর মাতার বলে কথিত। দক্ষিণ রায়ের পুজোয় ব্রাহ্মণ পুরোহিত গণেশের মন্ত্র ব্যবহার করেন। কিন্তু অন্যত্র বাংলা ও সংস্কৃত মিশ্রিত ছড়া ব্যবহৃত হয়। তার দু'একটির স্থান বিশেষ উদ্ধৃত করছি—

> চন্দ্রবদন-চন্দ্রকায়, শার্দুল বাহন দক্ষিণরায় বা সাগরসঙ্গাম সুন্দরকায়, ঘোটক বাহন দক্ষিণ রায়, ঢাল তলোয়ার টাঙ্গি হস্তে, দক্ষিণ রায়, নমোহস্ততে।' বীজ মন্ত্রও ব্যবহৃত হয়—ওঁ দম্ দম্ দম্—মুণ্ডমাতা, মুণ্ডপিতাং নারায়ণী।/ক্ষেত্রপাল মহালক্ষী, গণেশায় নমো নম॥

বার্ষিক সাপ্তাহিক ব্যতীত দক্ষিণ রায়ের একটি পুজো হয় সুন্দর বনের বসতি অঞ্চলে—তাঁকে জাঁতাল পুজো বলে। এই পুজো দু'টি বৃহৎ আকারের মুখচিত্র অঙ্কিত বারা বা ঘট থাকে। একটি দক্ষিণ রায়ের অপরটি তাঁর ভাই কালুরায়ের প্রতীক।

এ পুজোর কোনো নির্দ্ধারিত দিন থাকে না। ধান কাটা শেষ হলে—পৌষ বা মাঘ মাসের যেকোনো রাত্রে জাঁতাল পুজো অনুষ্ঠিত হয়। ঘন জঙ্গালের মধ্যে কোনো জলাশয়ের তীরে পুজার স্থান নির্বাচন আবশ্যক। সেস্থানের মধ্যভাগে একটি বড়ো বেদি মাটি দিয়ে তৈরি করা হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ব্যাঘ্রের ভয়ে সারা পূজা বা উৎসব ক্ষেত্রটি গরান বা হেঁতাল গাছের বড়ো বড়ো মশাল জ্বালা থাকে। জয় ঢাক, ঢোল, কাঁশি প্রভৃতির বাদ্য এবং নৈবেদ্যে নানারূপ মাদক দ্রব্য, বলি করা ছাগ, হাঁস, মুরগীর মস্তক অংশ ও রক্ত দেওয়া লোকায়ত বিধান। পুজো অধিক সময় ধরে হয় না। বাউলে বা অঞ্চল পুরোহিত বাংলায় একটি ছড়া আবৃত্তি করেন ও দেবতা দু'জনের উদ্দেশ্যে শালফুল দেন। দক্ষিণ রায়ের এই জাঁতাল পূজায় সময়—বিশেষত বলির কালে, বাদ্যের উৎকট শব্দে ও ভক্তদের ভয়াবহ চিৎকার ও উল্লাসে

শুধু পুজোক্ষেত্র নয়, বনভূমি কম্পিত হতে থাকে। বলি করা পশু-পক্ষীর রক্তে পুজোক্ষেত্র ভেসে যায়, ভক্তরা মাদক দ্রব্য সেবন করে মশাল হস্তে নৃত্য করে থাকে।

এই জাঁতাল পুজোর আচার-আচরণ ও কৃত্যগুলি লক্ষ করলে ধারণা হবে ওইগুলি বা জাঁতাল পুজো, আদিম যুগীয় পূজাচারের লুপ্তাবশেষ। তবে বর্তমানে এই পুজো প্রায় লোপ পেয়েছে।

দক্ষিণ রায়ের স্বরূপ সম্বন্ধে এঁর ভক্তজনের এবং গবেষকদের বিভিন্ন ধারণাগুলির কয়েকটি উল্লেখ করছি—

১. দক্ষিণরায় আদিতে ব্যাঘ্র, এঁর পুজো আদিম যুগের ব্যাঘ্র উপাসনা থেকে এসেছে।
২. তিনি আদিম যুগে কল্পিত ব্যাঘ্রকুলের অধিদেবতা। সে সময় কি নাম ছিল জানা যায় না, তবে দক্ষিণ রায় রূপে যিনি ছিলেন তিনি ব্যাঘ্র ছিলেন না ধারণা হয়।
৩. আর্যেতর অস্ট্রিক দ্রাবিড় দেবতা। অস্ট্রিক-দ্রাবিড়রা আদিমকাল থেকে আর্যদের আগমনের সময় পর্যন্ত বাস করতেন ওই স্থানে।
৪. দক্ষিণ রায় মানুষই ছিলেন, জনভক্তিতে দেবতাপদ উন্নীত হয়েছেন। কোনো কোনো গবেষক বলেন, এককালে বাংলার এক অধিপতি ছিলেন 'মুকুট রায়' নামে তাঁর অধীনে আলোচ্য দক্ষিণ রায় ঐ রাজ্যের দক্ষিণতম অংশ (সুন্দরবন) শাসন করতেন। তিনি ধর্ম ও সমাজ রক্ষক জননেতা ছিলেন, সে কারণ তাঁর সঙ্গে বিধর্মী প্রচারকদের সংঘর্ষ হয়েছিল এবং তিনি বিজয়ী হন।
৫. দক্ষিণ রায় আরণ্যক সমাজে প্রথমে সভ্য কৃষকদেরও দেবতা, এ মতের সমর্থন পাওয়া যায় তাঁর অপর নাম ক্ষেত্রপাল হতে।
৬. দক্ষিণ রায় আরোগ্য দেবতা। দক্ষিণ রায়ের কোনো কোনো মন্দিরে ঔষধাদি দেওয়া হয়।

গবেষকদের নানারূপ অভিমত থাকলেও একটি মিল আছে যে, দক্ষিণ রায় পুজো (বিভিন্ন নাম পরে হলেও) আদিম যুগে আর্যতর সমাজে উদ্ভূত।

❍ ঢেলাইচণ্ডী বা বৃক্ষ দেবতা

বৃক্ষ-পুজো আদিম যুগের একটি ধর্মীয় সংস্কার। পরবর্তীকালে কোনো কোনো বৃক্ষ, যথা—তুলসী, বট, অশ্বত্থ, বেল প্রভৃতি উচ্চকোটি হিন্দুদের মধ্যে শাস্ত্রীয় স্বীকৃতি পেয়েছে। তেমনই সমাজে বহু বৃক্ষ যথা—বাঁশ, খেঁজুর, ডুমুর, কলাগাছ, শ্যাওড়া গাছ লৌকিক দেবতা বা প্রতীকের মর্যাদা লাভ করে বহুকাল অবধি পূজ্য হয়ে আছে। ইংরেজি ১৯০২ সাল নাগাদ মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তাঁর নৈহাটির বাসভবনের কিছুদূরের একটি পল্লিতে একটি খেঁজুর গাছ 'ঢেলাইচণ্ডী' নামে পুজো হতে দেখে সেই সময়ের বিদ্বান সমাজে জানান। ওই সময়ের চব্বিশ পরগনা জেলা পরিচিতি বা Gazettear গ্রন্থে প্রকাশিত হয়—

> A curious form of survival of tree worship which still practised in the district under the name of Dhelaichandi was discovered by Mohamohopadhaya Haraprasad Sastri.

শাস্ত্রীমহাশয় নৈহাটির নিকট মাঝিপাড়া পল্লিতে যে খেজুরগাছটির পুজো দেখেছিলেন, সেটি বর্তমানে নেই। ঠিক সেই স্থানে অপর একটি খেজুর গাছ পূজিত হয়। শুধু ওইখানে নয়

নিকটস্থ হালিশহর, কাঁচড়াপাড়া প্রভৃতি উন্নত স্থানে পথের ধারে কয়েকটি গাছকে পুজো করতে দেখা যায়। এ পুজোয় পুরোহিত কোনও মন্ত্র, এমন কি নৈবেদ্য বলতে যা বোঝায় তাও থাকে না, ওইরূপ পূজ্য গাছের সম্মুখ দিয়ে যাতায়াতকারীরা গাছের তলদেশে একটি মাটির ঢেলা শ্রদ্ধাসহ অর্পণ করেন—এই হলো পূজা। বজবজের নিকট বাখড়াহাট পল্লিতে একটি প্রাচীন গাছ বেশ সমারোহের সহিত নিয়মিতভাবে শনি মঙ্গলবারে পূজিত হয়, পুজোর স্থানটিকে 'বড়-কাছারি' বলে। ভক্তেরা এখানে গাছটির মূলদেশে মদ্য, মাংস, ফলমূল দিয়া পুজো করে, পুরোহিত সময় সময় থাকেন, বিশেষ পুজো কালে।

মেদিনীপুর, মুর্শিদাবাদের পল্লি বিশেষে এরূপ গাছ পুজো দেখা যায়। তবে মেদিনীপুরে পূজ্য-গাছগুলি-কোল দেবতা, উপদেবতা, মৃত মহাপুরুষ বা ফকিরের অধিষ্ঠান বিশ্বাসে পূজিত হয়ে থাকে। কতকটা হিন্দু শাস্ত্র অনুযায়ী হয়। নৈবেদ্য কিন্তু ঢেলা। রাঢ় অঞ্চলে ইতু পুজো শাল গাছের এবং করম পুজো করম গাছের পুজো ব্যতীত অন্য কিছু নয়। বনদুর্গার অধিষ্ঠান বিশ্বাসে উত্তরবঙ্গে শ্যাওড়া গাছ পুজো হয়। দিনাজপুর, রংপুরে ক্ষেত্রপাল ও মহারাজ পুজো আদিতে বাঁশ পুজো থেকে এসেছে। যেমন মানকুমার পুজো এসেছে কলা গাছ পুজো থেকে।

বহু মনীষী মন্তব্য করেন দুর্গা পুজোর অঙ্গ নবপত্রিকা আদিমকালের নয়টি গাছের পুজো থেকে এসেছে। দুর্গার একটি নাম 'শাকম্ভরী' অর্থাৎ শস্য দেবী। সুবিখ্যাত লোকসংস্কৃতি গবেষক শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন—

> The greatest bengali national festival Durga Puja seems to be based on the cult vegetation spirit in as much as the worship of the nine plants known as Navapatrika, forms an important item of its various rituals. Sometimes the nine plants are addressed as the goddes Durga herself.... The nine plants which area ceremoniasly worshipped on the occasion of the Durga Puja have been supposed to represent the deities of vegetation of pre-historic Bengal.
> (“Cult of Tree-deities of Bengal” by A. Bhattacharji Indian Folklore 1958. Oct.)

বৃক্ষ দেবতাকে কোনো কোনো স্থানে নারী বলে বিশ্বাস করা হয়। লৌকিক দেবতাদের মধ্যে নারী বা দেবীর সংখ্যা কম নয়। তাঁদের কয়েকজনের পরিচয় দেওয়া গেল—

- **ওলাবিবি বা ওলাইচণ্ডী :** বিসূচিকা বা কলেরা রোগ নিরাময় কারিণী দেবী।
- **হাঁড়িঝি চণ্ডী :** মন্ত্র-তন্ত্রের ও সর্পবিষ হারিণী। ওঝা-গুণিন প্রায় একান্ত উপাস্য।
- **বনিবিবি :** বনরাজ্যের ও ব্যাঘ্রকুলের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, হিন্দু-মুসলমান সকলেরই উপাস্য। বিশেষ করে সুন্দরবনে যাতায়াতকারীদের দেবী হলেন তিনি।
- **বনদুর্গা :** উত্তরবঙ্গে পূজিত হন। শস্য দেবী বিশ্বাসে শ্যাওড়া গাছ প্রতীকে পুজো করা হয়।
- **বাবাঠাকুর পঞ্চানন্দ :** 'বাবাঠাকুর'—'পঞ্চানন্দ'—'পঞ্চানন', প্রভৃতি একই নামে আলোচ্য দেবতাকে অভিহিত করা হয়।

অনুমান করা যেতে পারে যে, এই লৌকিক দেবতার 'বাবাঠাকুর' নামটিই আদিকালের শুদ্ধ ভাষার নামগুলি পরবর্তী সময়ে ব্রাহ্মণ্য প্রভাবে হয়েছে। ইনি লৌকিকদেবতা হলেও আঞ্চলিক নন, এঁর পূজা-পার্বণ বাংলার বিভিন্ন জেলায় এবং বর্তমানে বর্ণ-হিন্দু সমাজেও

প্রায় শাস্ত্রীয় দেবতার মর্যাদায় ও বিধানে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে এবং ব্রাহ্মণ পৌরাহিত্য করেন। তবে অনেক ক্ষেত্রে পঞ্চানন্দের পুজোয় নাথযোগীদের পৌরাহিত্য করতে দেখা যায়। সে সকল ক্ষেত্রে শাস্ত্রীয় বিধান পালিত হয় না। কলকাতা, হাওড়া প্রভৃতি শহরেও পঞ্চানন্দের পুজো হয়। ইনি শিশুরক্ষক দেবতা বলেই অধিকখ্যাত। মহাদেবের সঙ্গে পঞ্চানন্দের আকৃতিগত এবং বেশভূষার সাদৃশ্য দেখা যায়, কিন্তু এই দেবতার গাত্রবর্ণ-লাল এবং মুখের ভাব উগ্র। পঞ্চানন্দের বহু বাহন যথা—বামন, গোভূত, মামদো, হরিণ, বৃষ, ভল্লুক, বৃশ্চিক প্রভৃতি। পঞ্চানন্দের অনুচর রূপে দুটি বীভৎস আকৃতির পরিচয় দেখা যায়, তারা 'পেঁচ খেঁচ' না ধনু-টঙ্কার' বলে পরিচিত। পঞ্চানন্দের মুণ্ডমূর্তি ও ঘট প্রতীক হিসেবে পূজিত হয়। এঁর বিশেষ পুজোয় ছাগবলি আবশ্যিক লোকায়ত বিধান।

যে সকল নারীর গর্ভস্থ সন্তান নষ্ট হয়ে যায়, যার সন্তান জন্মানোর কিছু দিনের মধ্যে মারা যায় বা শিশু-সন্তান ধনুষ্টকার বা পেচয় পাওয়া কি পুঁয়ে পাওয়া অর্থাৎ রিকেট রোগে আক্রান্ত হয়, সেই সন্তানদের মা পঞ্চানন্দের একান্তভাবে শরণাপন্ন হন বা সন্তানকে পঞ্চানন্দের অভিভাবক করে দেন বা উৎসর্গ করেন। একে বলে পঞ্চানন্দের 'দোরধরা' সন্তানটির পরিচয় হয় পঞ্চানন্দের 'দোরধরা-সন্তান'। সন্তানটির নাম ছয় পঞ্চানন্দচরণ বা পঞ্চানন্দ দাস প্রভৃতি পঞ্চানন্দ যুক্ত। থানের পুরোহিত শিশুর পায়ে রক্ষাকবচ হিসেবে একটি লৌহ বলয় 'ডাডুকা' পরিয়ে দেয়। শিশুটি বিশেষ কাল পর্যন্ত ওই বলয়টি পরে থাকে ও মাথার চুল কাটে না।

পঞ্চানন্দকে পৌরাণিক আভিজাত্য প্রদানের চেষ্টায় এর ব্রাহ্মণ পুরোহিতরা প্রচার করেন—কোনও রমণীর গর্ভে শিবের ঔরসে পঞ্চানন্দের জন্ম। এই প্রচারটির মধ্যে পঞ্চানন্দের স্বরূপ বিষয়ে গবেষকরা কিছু তথ্য পেতে পারেন। ইনি একটি বটুক ভৈরব বলেও পঞ্চানন্দের পরিচয় আছে। নাথ যোগীরা ধারণা করেন—ধর্মঠাকুর ও পঞ্চানন্দ অভিন্ন। কোনো কোনো গবেষক মন্তব্য করেছেন—পঞ্চানন্দ মিশ্র দেবতা, শিব ও আর্যেতর কোনও আদিম জাতির রক্ত-মূর্তিবিশিষ্ট দেবতার সমাহার, অথবা আর্য-স্বীকৃতির পূর্বকালের শিব বা রুদ্র-দেবতার একটি অভিনব সংস্করণ। পল্লিবিশেষ পঞ্চানন্দ বৃক্ষাধিষ্ঠাতা ভৈরু বা ক্ষেত্রপাল বিশ্বাসেও পূজিত হন। কোনো কোনো স্থানে ইনি শ্মশান দেবতা বলে খ্যাত। পঞ্চানন্দের দানব বলে খ্যাতি বা অখ্যাতি আছে। উপাস্যের প্রতি দানব ধারণা আদিম যুগীয়। এই দিক দিয়ে বিচার বিশ্লেষণ করলে ধরা যায় পঞ্চানন্দ দেবতা তখন কি নাম ছিল জানা যায় না, আদিম যুগে পরিকল্পিত। ভক্তদের বিশ্বাস পঞ্চানন্দ আরোগ্য দেবতা।

প্রসঙ্গত, একটি অল্পখ্যাত লৌকিক দেবতার উল্লেখ করছি—ইনি মাকাল বা মাকাল ঠাকুর নামে পরিচিত। কোনো কোনো স্থানে ইনি দেবী বলেও পূজিত হন। বর্তমানেও এঁর কোনো মূর্তি নেই, দুটি বা তার অধিক সংখ্যক ক্ষুদ্রাকৃতি মাটির স্তূপ প্রতীকে পুজো হয়। জেলে মালোদের একান্ত দেবতা। পুজোয় পৌরাহিত্য তারাই করে। সম্পূর্ণ লোকায়ত বিধানে মাকাল পূজিত হন। পুজোর নৈবেদ্য হিসেবে দেওয়া হয়—গাঁজা, ঘুগনি ও মাছ। পশুবলির রীতিও আছে। পুজোর নির্দিষ্ট স্থান নেই। তবে জলাশয়ের তীরে স্থাপন করা আবশ্যিক বিধান। মাকাল দেবতাটি অপ্রধান হলেও গবেষণাকারীদের নিকট এঁর প্রতীক ও পূজাচার মূল্যবান বলে মনে হবে।

রূপকথা চর্চায় সমস্যা ও বাংলা রূপকথার প্রাচীনত্ব

অরুণকুমার রায়

ভারততত্ত্বের অন্যান্য বিভাগের ন্যায় একশো বছরের অধিকাকাল পূর্বে জার্মানদেশে যে ভারতীয় পুরাকাহিনি (Myths) গবেষণার সূত্রপাত হয়েছিল এই শতাব্দীর বর্তমান দশকে সেই দেশেরই সহায়তায় বাংলার রূপকথার (Marchen) প্রথম বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের প্রয়াস। যে বিশ্বের সমক্ষে আত্মপ্রকাশ করতে পেরেছে সেইজন্য সেই দেশ ও জাতির প্রতি যেমন আমরা কৃতজ্ঞ, তেমনি গৌরাবান্বিতও বটে। গত শতাব্দীর জার্মান পণ্ডিতদের কঠিন ও জটিল একক প্রয়াসকে সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করেও আমাদের দ্বারা সম্পন্ন। বাংলা রূপকথার এই গবেষণাকে আরও অধিক গুরুত্ব দিয়ে থাকি এই কারণে যে, এ কারোর একক প্রয়াসের ফল নয়। জার্মানি ও বাংলার শতাধিক তরুণ ও প্রবীণ মানুষের দশ বছরের অধিককালের যৌথ-উদ্যোগের এ এক নিঃস্বার্থ ফসল।

প্রায় সাড়ে তিনশত বৎসর পূর্বে আধুনিক অর্থে পুরাকাহিনি তথা লোকায়নের (Folklore) চর্চা ইংরেজ যুক্তিবাদী দার্শনিক ফ্রান্সিস বেকনের (Francis Bacon, 1561-1626) দ্বারা শুরু হলেও এর উৎস-অনুসন্ধানের জন্য 'প্রাচ্যের দিকে মুখ ফেরাও' এই আওয়াজ প্রথম তুলেছিলেন জার্মান পণ্ডিত ক্রুজার (Creuzer : Symbolik und Mythologie, Leipzig, 1810-1812)—

> This secret wisdom passed from the Orient to Greece and became the kernel of all myths, which therefore contain the wisdom of antiquity in all allegorical form'—tr. literally.

ক্রুজারের এই যুগান্তকারী ইঙ্গিত পূর্ণায়ত হলো সমসাময়িক আর এক জার্মান মনীষীর অবদানে। পুরাকাহিনিচর্চা তখন জটিল আবর্তে দিশেহারা। এই বিভাগে সঠিক বৈজ্ঞানিক পদক্ষেপ তখন প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। জট খুলে দিলেন কে. ও. মুলার (K.O. Muller, 1797-1840) তাঁর বিখ্যাত 'Prolegomena zu einer wissenschaft licher Mythologie', 1825 খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত গ্রন্থের শিরোনামের ইংরেজি হবে 'Preliminary Remarks on a Scientific Mythology'। মুলার বললেন, পুরাকাহিনি তথা লোকায়নচর্চা একপেশে দৃষ্টিকোণ থেকে করা চলে না। এর বিচার-বিশ্লেষণ করতে হবে নানাদিক থেকে। তবেই এর জটিলতা উন্মোচিত হবে। আধুনিক অর্থে কে. ও. মুলারকেই প্রথম বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিসম্পন্ন লোকায়নিক বলা চলে। এই মুলারের নির্দেশ অনুসরণ করেই পরবর্তীকালে লোকায়নচর্চায় ভাষাতাত্ত্বিক, নৃতাত্ত্বিক, পুরাতাত্ত্বিক প্রভৃতি বিদ্যাপীঠের (Schools) উদ্ভব হয়।

সকলেরই জানা আছে যে, ভারতবিদ্যায় ভাষাতাত্ত্বিক পণ্ডিতমন্ডলী এক সময়ে বিপুল প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। এই প্রভাব বিস্তারের বীজ নিহিত ছিল ফ্রান্জ বপ এর (Franz Bopp. 1791-1867) তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের ভিত্তিতে ইন্ডো-জার্মানিক ভাষাসমূহের সম্পর্ক-নির্ধারণের সূত্র আবিষ্কারের মধ্যে। ভারতীয় পুরাকাহিনি তথা লোকায়ন-চর্চায়ও বপের অনুসারীরা গত শতাব্দীর শেষ দশক পর্যন্ত নানা দিক থেকে আঘাতপ্রাপ্ত হলেও প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বহু দেশে তাঁদের প্রভাব অক্ষুণ্ণ রাখতে সমর্থ হয়েছিলেন। এক্ষেত্রে যাঁর নাম সর্বাগ্রে উচ্চারিত হয় তিনি নাগরিকত্বের দিক থেকে জার্মান না হলেও বংশ এবং শিক্ষা-দীক্ষায় জার্মান। লোকায়ন-চর্চার ভাষাতাত্ত্বিক বিদ্যাপীঠের এই অনন্য প্রতিভার অধিকারী হলেন ম্যাক্স-মুলার (Max Muller, 1823-1900)। মাত্র তেইশ বছর বয়সে মুলার জার্মানি ত্যাগ করে অক্সফোর্ডে আসেন ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির অধীনে ভারতীয় ধর্মগ্রন্থগুলি তর্জমা করার জন্যে। দেশে তিনি আর ফিরে যাননি। ব্রিটিশ নাগরিকত্ব গ্রহণ করে বাকি জীবন ইংরেজিতেই তিনি ভারততত্ত্বের বিভিন্ন বিষয়ে রচনা প্রকাশ করে গেছেন। লোকায়নচর্চার ইতিহাসে ম্যাক্স মুলারের সবচেয়ে বড়ো অবদান হলো, তিনিই প্রথম ভারতীয় ও গ্রিক পুরাকাহিনির মধ্যে সম্পর্ক-বিশ্লেষণে ভাষাতত্ত্বের সহায়তা গ্রহণ করেছিলেন। এদেশে ম্যাক্স মুলার 'জার্মান পন্ডিত' আখ্যা পেলেও বর্তমানের দুই জার্মানিতেই তিনি 'বৃটিশ পন্ডিত' রূপে পরিচিত। ম্যাক্স মুলারের প্রভাব খোদ জার্মানিতেও বেশ কিছু পড়েছিল। একটা জার্মান ভাষাতাত্ত্বিক বিদ্যাপীঠও গড়ে ওঠে তখন। এই বিদ্যাপীঠের শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা ছিলেন মান্‌হারডট (Mannhardt)। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, মৃত্যুর কয়েক বছর পূর্বে মান্‌হার্‌ডট 'Antike wald-und Feldkulte', 1877 (ইংরেজি তর্জমা করলে হবে 'Antique wood and Fieldcult') নামে একটি গ্রন্থপ্রকাশ করে পুরাকাহিনি ও লোকায়নচর্চায় মুলারীয় ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের অসারতা প্রমাণ করলেন। ইতিপূর্বে নৃতাত্ত্বিক, পুরাতাত্ত্বিক ও ইতিহাসের পন্ডিতমণ্ডলী মুলারীয় ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের উপর যে আঘাত হানছিলেন মান্‌হার্‌ডট এসে তাকে আরও জোরদার করলেন। এমনিভাবেই একদিন লোকায়নচর্চায় ভাষাতাত্ত্বিক ব্যাখ্যাতাদের কবর রচনা হল।

ভারতীয় চিরায়ত সাহিত্যের সাক্ষ্যপ্রমাণাদিকে ভিত্তি করে একশত বৎসর পূর্বে লোকায়নচর্চার যে ভাষাতাত্ত্বিক নিরিখ সৃষ্টি হয়েছিল পৃথিবীব্যাপী পন্ডিতমণ্ডলী তা চিরতরে বর্জন করলেন। নতুন জমানায় কেবল বিশ্লেষণী মানদণ্ডই পরিবর্তিত হয়নি, গবেষণার উপকরণেরও তারতম্য হয়েছে। একশত বৎসর পূর্বে গবেষণার প্রধান উপকরণ ছিল চিরায়ত লেখ্য-সাহিত্য, আর এই বিশাল দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সংগৃহীত মৌখিক লোককাহিনিই লোকায়নচর্চার মুখ্য উপজীব্য। প্রাচীন পান্ডিত্যের ধারকদের অনেকেই এগুলিকে ইংরাজিনবীশ আয়া ও পাদ্রীদের ইউরোপ থেকে আমদানী করা পরী-কাহিনি (Fairy Tales) দ্বারা প্রভাবিত স্বকপোলল্পিত কাহিনি বলে মনে করতেন। ইংরেজ ও ফরাসি পন্ডিতমণ্ডলী সাম্রাজ্যবাদী-দৃষ্টিভঙ্গিতে আচ্ছন্ন ছিলেন ধরে নিলেও জার্মান মনীষীরাও এই বিভ্রান্তির বাইরে ছিলেন বলা চলে না। ১৮৯৩ সালে ইয়াকোব সংকলিত 'ভারতীয় রূপকথা' গ্রন্থের সমালোচনা করতে গিয়ে পন্ডিতপ্রবর ওয়েবার (Weber) সংকলককে স্টোক্‌স, ফ্রেরে, কিংসকোট, স্টিল-টেম্পল, ক্যাম্পবেল, ডেম্‌স ও নোলেস্‌ প্রমুখ লোকায়নিকদের 'সন্দেহজনক' (!) সংকলনগুলিকে

নির্বিচারে গ্রহণ করে ‘ভারতীয়’ আখ্যা দেওয়ার জন্য দোষারোপ করেন। এই কাহিনিগুলিকে আদৌ ভারতীয় বলা চলে কিনা ভেবার স্পষ্টভাবেই সে বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেন। অনুরূপ সিদ্ধান্ত সম্প্রতি জিপসী-লোককাহিনি সংকলন করতে গিয়েও পাওয়া গেছে। সকলেই জানেন, ইউরোপের সব দেশে বহুকাল থেকেই জিপসী বা রোমানীরা দলবদ্ধভাবে বাস করছে। এদের কথ্যভাষা রোমানি নিয়ে গবেষণা করে পণ্ডিতমণ্ডলী একমত হয়েছেন যে, এদের আদি নিবাস ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল। জনৈক যুগোস্নাভ্ জিপসী লোকায়নবিদের সারাজীবনব্যাপী সংগৃহীত চার বাজার লোককাহিনি সম্পাদনা করতে গিয়ে অধ্যাপক ড. মোডে দেখে বিস্মিত হয়েছেন যে যুগোশ্লাভ, রুমানীয়, হাজেরীয়, চেকবুলগার এমনকি ইংরেজ লোকয়বিদ জ্যাকবও সিদ্ধান্ত করেছেন যে জিপসীদের নিজস্ব কোনো লোকসাহিত্য নেই, যে সব দেশে এরা দলবদ্ধভাবে বাস করে সেখানকার মৌখিক কাহিনিই এরা আত্মসাৎ ক’রে নিয়েছে। কিন্তু ভারততত্ত্ববিদ ড. মোডে আবিষ্কার করেছেন যে এগুলির মূল প্রোথিত রয়েছে পাঞ্জাব, গুজরাট, রাজস্থান অঞ্চলের প্রাচীন লোককাহিনির মধ্যে। এদেরই মুখে শুনে শুনে রুমানীয়, বুলগারীয়, যুগোশ্লাভ, হাজেরীয় চেক গ্রামীণ মানুষেরা পরবর্তীকালে নিজস্ব লোককাহিনি সৃষ্টি করেছে। এমন কি গ্রিম ভ্রাতৃদ্বয় সংগৃহীত বিশ্ববিখ্যাত জার্মান রূপকথা সংকলনের কাহিনিও এর ব্যতিক্রম না। অবশ্য এর দ্বারা আবার এই সিদ্ধান্ত করাও যুক্তিযুক্ত হবে না যে এইসব দেশগুলির নিজস্ব কোন লোকসাহিত্য নেই।

আপাতদৃষ্টিতে দেখলে তদানীন্তন পণ্ডিতমণ্ডলী কোনো ক্রমেই ভুল করেননি। কারণ ভারতীয় মৌখিক রূপকথার যে কোনো নির্ভরযোগ্য সংগ্রহ পড়লেই গ্রিসের রূপকথা ও ইউরোপের অন্যান্য অনেক লোককাহিনির আশ্চর্য এক সাদৃশ্য সকলেরই নজরে আসবে। সরাসরি ইউরোপ থেকে আমদানির সম্ভাবনা সর্বদা বিদ্যমান থাকলেও এ সমস্ত সাদৃশ্যের অধিকাংশের ব্যাখ্যার জন্য প্রয়োজন প্রতিটি রূপকথার প্রকৃতি ও ইতিহাসের বিস্তৃত ও নিপুণ আলোচনা, সে-যুগে যা একেবারেই অসম্ভব ছিল। অধুনা আমরা অবহিত হয়েছি যে এক-এক ধরনের (Type) রূপকথা-মাত্রেরই নিজস্ব একটা ইতিহাস আছে। যদিও সে ইতিহাসের পুঙ্খানুপুঙ্খ পরিচয় কোনক্রমেই আমাদের জানা নেই। দীর্ঘদিন মুখে মুখে রয়েছে এবং ইতিপূর্বে লিপিবদ্ধ হয়নি বলেই এসব মৌখিক-রূপকথাগুলিকে সাম্প্রতিক বলতে হবে, এ চিন্তা সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক। বরং এমন এক পুরনো মৌখিক ঐতিহ্যধারায় যাতে এরা ভারত ইতিহাসের প্রাচীন যুগের লিপিবদ্ধ রূপকথা অপেক্ষাও প্রাচীনত্বের পর্যায়ে পড়ে, সে কথা সুস্পষ্টভাবে উপলব্ধি করা দরকার। প্রাচীন যুগের লিপিবদ্ধ রূপকথাগুলিও, তা জাতক বা তার অনেক পরের কথাসরিৎসাগর যা থেকেই নেওয়া হোক না কেন, তারাও নিশ্চয়ই পূর্বতন কোনও মৌখিক রূপকথার উপকরণের ভাণ্ডার থেকেই সংগৃহীত হয়ে থাকবে। কাজেই আমাদের বক্তব্য আপাতদৃষ্টিতে কোনও কোনও পণ্ডিতব্যক্তির কাছে গা-জুরি মনে হতেও পারে। স্বভাবতই তাঁদের মনে প্রশ্ন উঠতে পারে, পঞ্চাশ কি একশত বৎসর পূর্বের সংগ্রাহকের লিপিবদ্ধ বাংলা বা ভারতের অন্যান্য রাজ্যের রূপকথাগুলি কি করে নিঃসন্দেহে ঐতিহাসিক সাক্ষ্য প্রমাণাদিতে প্রতিপন্ন দু’হাজার বছরের প্রাচীন জাতকের ন্যায় রূপকথাসমূহ থেকেই প্রাচীনতর হতে পারে?

এখানেই আমরা লোকায়নের উপকরণসমূহের জটিলতর সমস্যার সম্মুখীন হয়ে থাকি। কেবলমাত্র সমসাময়িক সাক্ষ্যপ্রমাণাদির উপর নির্ভর করে এসব কাঁচামালের পর্যালোচনা চলে না। এদের ইতিহাস অনুশীলনের সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধ হ'ল হাঁড়ি-কলসী-হাতিয়ার ইত্যাদি পুরাতাত্ত্বিক বস্তুর ন্যায় এরা কখনও বাস্তবরূপ পরিগ্রহ করে অবস্থান করে না। কাজেই প্রাচীনতম ইতিহাস থেকে এদের কেবল পরোক্ষভাবেই জানা যেতে পারে। আর জানা যায় ঐতিহাসিক উপকরণসমূহের উপর এদের সুস্পষ্ট প্রভাব বিচার করে। অর্থাৎ একটা বিশেষ যুগের উচ্চতর সংস্কৃতির নব নব রূপায়ণের মধ্যে থেকেই সেই দেশের অতীত লোকায়নের উপকরণসমূহ অনুসন্ধান করে নিতে হয়। সেই জন্যেই আধুনিক লোকায়নচর্চায় পুরাতত্ত্ব বিভাগ অন্তর্ভুক্ত চারুকলা-সমালোচনা পদ্ধতি একটি বিশেষ ভূমিকা পালন করছে।

সুদূর পুরাকালে কয়েকজন রাজাও অভিজাতের নামে সঙ্গেই পরিচিত বলে যে সে-যুগের অগণিত অজ্ঞাতনামা জনসাধারণের কোনও অস্তিত্বই ছিল না একথা যেমন বলা চলে না, তেমনি অতীত যুগের লোকসংস্কৃতি সম্পর্কে আমাদের অজ্ঞাতকে মোটেই তার অনস্তিত্বের প্রমাণরূপে উল্লেখ করা যায় না। ঐতিহাসিক ঘটনা ও উপকরণাদি সর্বদাই স্বাগত। কিন্তু ঐতিহাসিক উপকরণের পারম্পর্যতার ফাঁক থেকে কখনই এ-যুক্তি অবতারণা করা চলে না যে এমন যুগ থাকতে পারে যার কোন ইতিহাস নেই। তবে একটি বিষয়ে স্থির নিশ্চিত যে, এ-সব পারম্পর্যহীনতার ফাঁক পূরণের জন্য প্রচুর পরিশ্রম প্রয়োজন। আর সেইজন্য রূপকথার ইতিহাস আলোচনা খুবই আয়াসসাধ্য।

ইতিহাসের অতলস্পর্শিতার কথা ছেড়ে দিলেও, ভারতের ন্যায় এক বিরাট দেশের বিশাল ব্যাপ্তি ও বৈচিত্র্যের কথাও স্মরণ করা আবশ্যক। চিরায়ত ভারততত্ত্ব গবেষণায় স্থানীয় সাংস্কৃতিক ইতিহাস যে প্রভুত পরিমাণে উপেক্ষিত তার একটিমাত্র সহজ কারণই হল যে, যে-সব লেখ্য-সাহিত্যিক উপকরণের উপর এইসব গবেষণার সকল প্রয়াস নিবন্ধ ছিল তারা উচ্চতর সাংস্কৃতিক তলে স্থানীয় বৈশিষ্ট্যসমূহ হারিয়ে একটা পিণ্ডাকৃতি একীভূত রূপ গ্রহণ করেছিল। অথচ একটু গভীরে অনুপ্রবেশ করলেই বুঝতে অসুবিধে হবে না যে কি রাজনৈতিক কি সামাজিক কোনও ক্ষেত্রেই সারাভারত জুড়ে এই একীভূত রূপ সম্ভব নয়। উচ্চতর সংস্কৃতির এই যেখানে অবস্থা সেখানে লোকসংস্কৃতিকে চিনে নিতে আমাদের কোনও অসুবিধেই হয় না।

কেননা, লোকসংস্কৃতির অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে গভীর এক আঞ্চলিকতার স্পর্শ, এই আঞ্চলিকতা একাধারে যেমন এর বলিষ্ঠতার পরিচায়ক, তেমনি এর দুর্বলতার নিদর্শনও বটে। সকল লোকসংস্কৃতিই পরস্পরের সঙ্গো সাধারণভাবে সম্পর্কিত হলেও নির্দিষ্ট লোকসংস্কৃতির উৎকর্ষ নির্ভর করে তার আঞ্চলিকতার ছাপ। একটি নিটোল স্বাতন্ত্র্যবোধ এবং সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলির ক্ষেত্রে কোন কোনটির অগ্রাধিকারের উপর। লক্ষ করা গেছে যে, এই সমস্ত বৈশিষ্ট্য নিয়ে এক একটি লোকসংস্কৃতি যুগের পর যুগ একেবারে পাশের গ্রাম থেকেই স্বতন্ত্র এক অস্তিত্ব নিয়ে অবস্থান করে চলেছে। বাংলার বিভিন্ন জেলা বা অঞ্চলের পোড়ামাটির পুতুলের বৈচিত্র্যের দিকে তাকালেই এ পার্থক্য সহজেই ধরা পড়ে।

কিন্তু রূপকথার ক্ষেত্র একটু স্বতন্ত্র। ভারতের অধিকাংশ মৌখিক-রূপকথা কয়েকটি মাত্র গণ্ডিবদ্ধ অঞ্চল থেকেই সংগৃহীত, কিন্তু কাঠামো যা বিন্যাসে এদের অনেকগুলিতেই এমন

যথেষ্ট সুচারু বর্ণনা দেওয়া নেই যাতে এদের প্রত্যেকটির উৎসস্থান সম্বন্ধে স্পষ্ট কোনও ধারণা জন্মাতে পারে। এই জন্যেই শ্রীমতী স্টোক্‌স এর এমন গুরুত্বপূর্ণ রূপকথার সংকলনটি (Miss M. Stokes : 'Indian Fairy Tales. Ellis & white', London, 1880) পাঞ্জাবি লোককাহিনিরূপে পরিগণিত, অথচ মহান ফরাসি লোকয়নিক কস্‌ক্যাঁ ইতিমধ্যেই এদের অধিকাংশেরই বাঙালি চরিত্র আবিষ্কার করেছেন (M. Emanuel Cosquin : Contes populaires delorraine, Paris 1886, 1890)।

রূপকথার স্থান-কাল নির্ধারণের ক্ষেত্রে আর একটি সমস্যার সৃষ্টি করেছেন এবং করছেন শিশু সাহিত্যিক ও শিক্ষাবিদরা। শিশুদের শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে কিংবা নিছক মাধুর্য সৃষ্টির জন্য রূপকথা রচনা করতে গিয়ে এঁরা নিজেদের অজ্ঞাতেই এমন এক অপকর্ম করছেন যা চিরদিনের জন্য বহু মৌখিক-রূপকথাকে ইতিহাসের অতলে সমাহিত করে দিচ্ছে। এঁরা যতই সদুদ্দেশ্যে প্রণোদিত হন না কেন, ভারতের সকল অঞ্চল থেকে সংগৃহীত রূপকথা সঞ্চয় করে একটিকে অপরের সঙ্গে মিলিয়ে এবং ইচ্ছেমত সংশোধন করে তাদের সব স্থানীয় বৈশিষ্ট্য বিলোপের পর 'ভারতের রূপকথা' এই অতি সাধারণ শিরোনামার প্রকাশ করছেন। এ প্রসঙ্গে আরও একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য। এ দেশের বহু প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তি থেকে শুরু করে আজকের সাধারণ শিশু সাহিত্যিকেরা পর্যন্ত বহু বিদেশি রূপকথা উপকথাকে দেশীয় পোশাকে সাজিয়ে উপস্থিত করেছেন। সতর্কতার অভাবে এরা বাংলার সম্পদ বলে গৃহীতও হচ্ছে। দ্রষ্টব্য : 'ভুবনের মাসী', বর্ণ পরিচয় দ্বিতীয় ভাগ : ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, cf. The young Thief and his mother, Fable No. 44, The Fables of Aesop, Ed. by Joseph Jacobs. London 1925; হারাধনের দশটি ছেলে, হাসিখুশী ১ম ভাগ যোগীন্দ্রনাথ সরকার, cf. Ten little nigger, Negro song of USA; ঠাকুরমার ঝুলি : নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, দেবসাহিত্য কুটির cf. Grimms'Fairy Tales. এই সব বিকৃতির দরুণ আজ আর এইসব রূপকথার প্রথম মৌখিক প্রকাশের সূত্র উদ্ধার সহজসাধ্য নয়। মুখে মুখে বলা ভারতের মৌখিক রূপকথার বিশদ অনুশীলনের কাজে এরা আজ একেবারেই মূল্যহীন হয়ে পড়েছে। উদ্দেশ্যমূলকভাবেই আঞ্চলিক রূপ অস্পষ্ট করে এদের উপরে এমন এক সাধারণ ভারতীয় চরিত্র আরোপ করা হয়েছে যা কৃত্রিমভাবে সৃষ্ট হওয়ার পূর্বে বস্তুতই এইসব রূপকথায় ছিল না। এসব রূপকথাকে যত বিরাট শিল্পকৃতি বা শিক্ষার সহায়ক বলে মনে করা হোক না কেন, এগুলি নাড়াচাড়া করবার সময় গবেষকদের চরম সতর্কতা অবলম্বন আবশ্যক। গভীর মনোনিবেশ সহকারে এই পদ্ধতির অনুশীলন করলে দেখা যাবে যে, অতীত যুগে যেভাবে লোকায়নিক উপকরণসমূহের বিকৃতি করা হয়েছিল আজও সেই প্রক্রিয়া একই ধারায় চলেছে। উচ্চতর শিল্পকৃতি ও শিক্ষার উদ্দেশ্য সর্বদেশেই মানুষের উন্নত সমাজগুলি খাঁটি লোকসংস্কৃতিকে নতুন ছাঁচে ঢেলে সাজাবার চেষ্টা করে। কাজেই দেখা যায়, গবেষকদের যে কেবলমাত্র অতীতের উপকরণ নিয়েই বিব্রত হতে হয় তা নয়, সমকালীন উপকরণের প্রতিকূলতাও তাদের কম অতিক্রম করতে হয় না। এইসব বিভিন্ন কারণে ভারতের যে কোনো অঞ্চলের রূপকথার সঠিক ঐতিহাসিক সময়, ভৌগোলিক অবস্থান ও নৃতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ খুবই আয়াসসাধ্য। এইসব সীমাবদ্ধতা ও প্রতিকূল অবস্থার কথা মনে রেখেই আমাদের বাংলার রূপকথা (Bengalisch Marchen) অনুশীলনে অগ্রসর হতে হয়েছে।

বাংলার রূপকথার সার-সংক্ষেপ করতে গেলে প্রথমেই এর একটি বৈশিষ্ট্য প্রকট হয়ে ওঠে, ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের মৌখিক-রূপকথা এবং লেখা চিরায়ত সাহিত্য-সংগ্রহে জন্তু-কাহিনির (beast tales) যে অতুলনীয় সম্পদ বিদ্যমান এতে কিন্তু তার আপেক্ষিক অনটন লক্ষণীয়। আমাদের এই বক্তব্যকে যেন এই বলে ভুল করা না হয় যে বাংলার রূপকথায় কোনও জীবজন্তুর উল্লেখ নেই বা তারা সেখানে নগণ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছে। ব্যাপার মোটেই তা নয়। বরং বাংলা রূপকথায় জীবজন্তুরা এমন এক একটি গল্পের ধারায় (Tale Type) আত্মগত যেখানে মানুষ ও অপ্সরাগণ তাদের সঙ্গে সমভাবে কাহিনির মর্ম-বিন্দুতে অংশভাগী। ধারা-সংগ্রহের পরিভাষায় এর অর্থ হলো—অপেক্ষাকৃত কম বাংলা রূপকথাই প্রথম ৩০০টি ধারার মধ্যে পড়ে, এদের অধিকাংশেরই শুরু ৩০০ থেকে। এতে সহজেই প্রতীয়মান হয় যে, অধিকাংশ বাংলা লোক-কাহিনিই খাঁটি রূপকথার অন্তর্ভুক্ত (এখানে ধারা-সংখ্যার যে উল্লেখ করা হয়েছে তা Aarne/Thompson-কৃত 'The Types of the Folktale', Helsinki, 1964 অনুসারী)। ডরোথী এ. এল. স্টিভের একটি মন্তব্য এ ক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ। ১৯৩৫ সালে ইন্ডিয়ান কালচার পত্রিকায় প্রকাশিত একটি নিবন্ধে তিনি বলেছেন যে, পাশ্চাত্য জগতে ভারতের বিরাটতম দান হলো তার জীবজন্তুর কাহিনিগুলি। ভারতীয় ও ঈশপীয় ধারার জীবকথাগুলির মধ্যে পার্থক্য টেনে তিনি বলেছেন যে ঈশপীয় ধারায় জীবজন্তুরা জীবজন্তুর ভূমিকাই অনুসরণ করেছে। আর ভারতীয় ধারায় এরা মানুষের মতো আচরণ করেছে। ভারতীয় ধারা বলতে শ্রীমতী স্ট্রিডের কথার তাৎপর্য হলো, মানব-সম্পর্কের সামাজিক বিধানগুলি জীবজগতে আরোপিত হয়েছে, আর তার ফলে জীব-জীবনের প্রাকৃতিক পরিবেশে একটি ঐতিহাসিক ধারার মানবীয় পশ্চাদপট রচিত হয়েছে।

স্টিডের বক্তব্যের গভীরতাকে অস্বীকার না করেও একটি কথা বলা দরকার, ভারতীয় রূপকথাই যে এক্ষেত্রে একেবারে অনন্য তা কোনোক্রমে বলা চলে না। আফ্রিকান বা আদিম আমেরিকান রূপকথাগুলিতেও প্রায়ই জীবজন্তুকে মানুষের মতো কথা বলানো বা আচরণ করানো হয়েছে। কিন্তু এদের মধ্যে একটি বিরাট ও গভীর তাৎপর্যপূর্ণ পার্থক্য বিদ্যমান। ঐ ধারার দক্ষিণ-পূর্ব এশীয়, আফ্রিকান বা আমেরিকান রূপকথাগুলিতে যেখানে আদিম কৌম-সমাজের (Primaitive Tribal Society) ছাপ পাওয়া যায়, ভারতের রূপকথাগুলিতে সেখানে জীবজন্তুকে উন্নত শ্রেণি-সমাজে (Class Society) সংস্থাপন করা হয়েছে। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, এই ধারার ভারতীয় রূপকথাগুলি ইতিহাসের বিচারে পরবর্তীকালের। ডরোথি স্টিডের মতে, গ্রিক উপকথাগুলিতে জীবজন্তুরা যদি জীবজন্তুর মতই আচরণ করে তাহলে এই বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী সাধারণ সূত্রের ব্যতিক্রম বৈ আর কিছু নয়, যা আমরা ভারতীয় ও অভারতীয় সব রূপকথাতেই পেয়ে থাকি। এমন কি ভারতীয় চিরায়ত সাহিত্য-ধারাতেই যদি পুরণো লোকায়ত ধারার ন্যায় জীবজন্তুকে মানুষের সঙ্গে আত্মগত করার পথ বিসর্জন না দিতে পেরে থাকে তাহলে বুঝতে হবে যে, ভারতের উচ্চতর শিল্পকৃতির উপরে তার লোকসংস্কৃতির প্রভাব কি প্রচণ্ড।

যদি উল্লিখিত বিভিন্ন বিভাগের একটি তুলনামূলক ঐতিহাসিক পারম্পর্য বিচার করতে হয় তাহলে আমরা তাকে নিম্নলিখিত ছকে উপস্থাপিত করতে পারি। এই ছকটি আমার শিক্ষক প্রখ্যাত জার্মান পুরাতাত্ত্বিক ও লোকায়নিক অধ্যাপক ড. হাইন্‌শ মেডে-কৃত।

১. **প্রাচীনতম উপকথাগুচ্ছ :** কৌমধারার সমাজ প্রভাবিত জীবজন্তুর গল্প। এই বিভাগে পূর্বোল্লিখিত আফ্রিকান আমেরিকান জন্তুকাহিনি ছাড়াও কৌম ধারার ভারতীয় কাহিনিগুলিকেও অন্তর্ভুক্ত করা যায়।
২. **উন্নততর সমাজের উপকথা :** ভারতীয় মৌখিক রূপকথা। বাংলার রূপকথাগুলিকে এই বিভাগে ফেলা যায়। এখানে জীবজন্তুর জীবনে উন্নততর সমাজের চিত্রের প্রতিফলন স্পষ্ট।
৩. **ধর্মীয় ও নীতিকথা :** এই বিভাগ ভারতের অধিকাংশ লেখ্য সাহিত্যিক রূপকথা নিয়ে গঠিত। এরা সংস্কৃতিগতভাবে পরিমার্জিত এবং এক উন্নত সমাজের সামাজিক কাঠামোর রীতিনীতি ও ধর্মের অনুশাসনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়া। তবুও চতুর্থ বিভাগের চেয়ে প্রকৃত লোকশিল্পের সঙ্গে এদের ব্যবধান অনেক কম।
৪. **মনুষ্য সমাজ থেকে পৃথকীকৃত উপকথা :** প্রকৃতি রাজ্যের জন্তু জীবন থেকে বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে সম্পূর্ণ পৃথকীকৃত মানব সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে রচিত সর্বাপ্রেক্ষা উন্নত কাহিনিসমূহ। ঈশপ ইত্যাদির গল্পগুলি এই বিভাগের অন্তর্ভুক্ত।

জীবজন্তুর কাহিনিগুলি এ রকম চারটি বিভাগে বিভক্ত করলেও পরবর্তীকালের ইউরোপীয় রূপকথায় আমরা ভারতীয় (বিভাগ-২) এবং গ্রিক (বিভাগ) উভয় ধারার প্রভাব সম্বলিত দুইটি সমান্তরাল ঝোঁকই দেখতে পাই। জার্মান রাইনেক ফুক্স (Reineke Fuchs) উপকথাগুলিতে (শেয়ালের গল্প), বিশেষ করে গয়টের প্রতিভায় উদ্ভাসিত সংগ্রহে, আমরা এই দুই ধারার একটা অপূর্ব মিশ্রণও দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু এখানেও উন্নততর সমাজ-পরিচয় সম্বলিত ভারতের রূপকথা অধিক প্রেরণা জুগিয়েছে বলে মনে হয়। উপরিউক্ত আলোচনা থেকে দুটি সিদ্ধান্ত সহজেই করা যায়—

১. ভারতের মৌখিক রূপকথাগুলির আপেক্ষিক বয়স।
২. ইউরোপীয় রূপকথার উপর ভারতীয় রূপকথার প্রভাব।

ভারতের মাটিতে ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার যে ধারা সুদূর অতীতে চার হাজার বৎসর অবধি অনুসরণ করা যায় (অন্তত হরপ্পা যুগ অবধি) ইউরোপে একমাত্র গ্রিস ছাড়া আর কোথাও তার তুলনা মেলা ভার। কিন্তু সংস্কৃতির ক্ষেত্রে গ্রিসের সঙ্গে হরপ্পার যে আসমান জমিন ফারাক তাও আমাদের নজর এড়ায় না। সামাজিক উন্নতির শিখরে উঠে গ্রিস ক্রমেই লোকসংস্কৃতির পথ ছেড়ে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত পথে যাত্রা শুরু করে, কিন্তু ভারতে ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া লোক-সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত হয়ে আমাদের সাম্প্রতিক যুগ অবধি প্রসারিত। ভারতীয় মৌখিক রূপকথাগুলি একই সঙ্গে তাই এখানকার সাহিত্যিক রূপকথা সংগ্রহের তুলনায় প্রাচীনতর আবার তাদের পরবর্তীও বটে। চার হাজার বছর আগের সামাজিক পরিবর্তনসমূহ ভারতীয় রূপকথাকে সামাজিক অগ্রগতির এই বিশিষ্টতা দান করেছে, যা বাংলার রূপকথায় সবচেয়ে সার্থকভাবে পরিস্ফুট। এই বৈশিষ্ট্যের গুণেই বাংলার রূপকথায় সবচেয়ে সার্থকভাবে পরিস্ফুট। এই বৈশিষ্ট্যের গুণেই বাংলার রূপকথা এক গভীর বৈপ্লবিক মানবিকতায় ভরপুর হয়ে রয়েছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় যে, বহু পরবর্তীকালে পরিমার্জিত ও পাশ্চাত্যের (বিশেষত পারসিক ও কিয়দংশে গ্রিক) উন্নততর সমাজ-প্রভাবিত ভারতীয়

সাহিত্যিক-রূপকথার ধারাসমূহ একেবারে ভূমধ্যসাগরের তীর অবধি রপ্তানি হতে শুরু করে এবং ইউরোপ পরোক্ষভাবে ভারতীয় লোক-সংস্কৃতির প্রভাবাধীন হয়।

দীর্ঘকালব্যাপী একাদিক্রমে বৈদেশিক সংঘাতের ফলে ভারতের সাংস্কৃতিক উন্নয়ন বিশেষভাবে ব্যাহত হয়েছে, কিন্তু লোক-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ঠিক তদ্রুপ ঘটেনি। ভারতীয় সংস্কৃতিতে উত্থান ও অবরোহনের দৃষ্টান্ত যথেষ্ট থাকলেও ভারতের লোক-সংস্কৃতি চিরকালই বৈদেশিক প্রভাব-বিরোধী এক দৃঢ় ও স্থায়ী রূপ ধারণ করেছিল। এই বৈদেশিক প্রভাব-নিরোধের জন্য যে মূল্য ভারতকে দিতে হয়েছে তাকেই বিদেশি ইতিহাসবেত্তাগণ ভারতের ইতিহাস-বিরোধী মনোভাব বলে বিকৃত করেছেন। কিন্তু তাঁরা দেখতে পাননি যে, ইতিহাস থেকে এই পশ্চাদ্বর্তন বিদেশি সংঘাত ও প্রভাব থেকে একটি উন্নত সংস্কৃতির আত্মরক্ষার প্রচেষ্টা ব্যতীত আর কিছুই নয়। আর এই আত্মরক্ষা করতে পেরেছিল বলেই যুগে যুগে ভারতীয় ধারার রূপকথা তাদের অন্তর্নিহিত মানবতাবোধ ও বৈপ্লবিক চরিত্রের জন্য সারা বিশ্বে প্রাধান্য লাভ করতে পেরেছে। বিশ্বের বিভিন্ন ভূখণ্ডের মধ্যে সাংস্কৃতিক নিবিড়তা প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করেছে।

ভারতীয় রূপকথার এই বিশিষ্ট পরিবেশে বাংলা রূপকথার আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই নজরে আসে মানুষ, জীব-জন্তু ও অপ্সরাদের অবাধ রূপ পরিবর্তন (অথবা অর্ধ-মানব, অর্ধ-দেবতা রূপগ্রহণ)। প্রধানত রাক্ষস, ভূত, দেবলোকের রমণী বা অপ্সরা এবং দৈবশক্তিসম্পন্ন কয়েকটি পার্শ্বচরিত্রের বৃদ্ধ-বৃদ্ধা বাংলা রূপকথায় সর্বাপ্রেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে রয়েছে। এদের আবাস ও আচরণ সর্বদাই মানব সমাজের সঙ্গে তুলনীয়। একটা সূচির পার্থক্য বিভেদের প্রাচীর গেঁথে রেখেছে, মানব-জগতের নায়কগণ এদের অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হয়, তাদের আক্রমণ করে, আবার কোনও অভীপ্সিত কার্যে তাদের সাহায্যও লাভ করে থাকে। বাংলা রূপকথায় এই দুইটি স্বতন্ত্র জগতের অস্তিত্ব থাকলেও এদের সঙ্গে তুলনীয় কিংবা এদের কোনও একটি সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বিশুদ্ধ জন্তুজগতের অস্তিত্ব কোথাও পাওয়া যায় না। জীবজন্তুরা যে মানব জগতে ঘুরে বেড়ায় তা হয় মানুষের, নয় পরীর আকৃতিতে। তারা দেখা দেয় কোনো বিকলাঙ্গ মানুষ অথবা মানুষের অতি-পরিচিত কোনো একটি জীবের অবয়বে পরী হয়ে। এসব দেখে মনে হতে পারে যে-কোনো এক প্রাচীন ও স্বয়ংপ্রধান জীবজগৎ পরী ও দৈত্যদানোর জগতে ক্রমশ বিলীন হয়ে গেছে। ওই প্রথমোক্ত সমাজের যা কিছু ধ্বংসাবশেষ ছিল তা এই নূতন দৈত্য-দানোর জগতে কিংবা নিজেদের সঙ্গী মানুষের সঙ্গে মিশে গেছে।

এখানেও আবার বাংলা রূপকথাগুলির ঐতিহাসিক অবস্থানের নির্দেশ মেলে, এরা হলো আদিম কৌম-স্তর ও সুস্পষ্ট পৌরাণিক ও ধর্মীয় গণ্ডী দ্বারা সুনির্দিষ্ট পূর্ণবিকশিত শ্রেণিসমাজের মাধামাঝি সময়ের। একথাও বলা চলে যে বাংলার এইসব মৌখিক রূপকথা কতকটা সাবেকি ও অপ্রচলিত ধরণের, ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের রূপকথার সঙ্গে এখানেই এর মৌলিক পার্থক্য। এই সাবেকিয়ানার (archaic) পরিচয় পাওয়া যায় আর একটি বিষয় থেকে। লক্ষ করলেই দেখা যায় যে বাংলা রূপকথা একদিকে যেমন উচ্চতরশ্রেণির উন্নত সাহিত্যধারার প্রভাব থেকে অপেক্ষাকৃত মুক্ত, তেমনই অন্যদিকে তার চারিপাশের সাঁওতাল প্রভৃতি উপজাতিদের রূপকথা জগতের সঙ্গে গভীর শ্রেণিসম্পর্কে একাত্ম।

সাঁওতালদের কথা এসে পড়ায় একটি বিষয় স্পষ্ট হওয়া দরকার। সাঁওতালী ও বাংলা রূপকথার তুলনা করলে উভয়ের মধ্যে অনেক মিল নজরে পড়বে, কিন্তু সে সকলে মিলে দেখা যায় যে, বাংলা উদাহরণগুলি বুঝতে সুবিধে হয় বেশি এবং তাদের রচনা-শৈলী অনেক বেশি নিটোল। সাঁওতালী রূপকথাগুলি এদের দ্বারা যথেষ্ট প্রভাবিত, কিন্তু বিভিন্ন সামাজিক আচার-আচরণের জন্য এদের পক্ষে সম্ভবত বাংলা রূপকথা জগতের সূক্ষ্ম বিষয়বস্তুগুলি আত্মস্থ করা সম্ভব হয়নি। কেউ কেউ মনে করেন যে বাংলা রূপকথা ঐ সব পার্শ্ববর্তী রূপকথা থেকে উদ্ভূত, কিন্তু তা মোটেই সম্ভব নয়। বাংলার মৌখিকরূপ কথায় আদি শ্রেণিসমাজের গ্রামীণ পরিবেশের যে নিটোল ছবি পরিস্ফুট তার সঙ্গো বর্তমান কালের অতি অগ্রসর সাঁওতাল জীবনও খাপ খায় না। অতীতে এই উভয় জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পার্থক্য নিশ্চয়ই আরও বেশি ছিল।

কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে উভয়ের এই ঘনিষ্ঠতায় অন্য একটি ফললাভ হয়েছে মনে হয়। সুদূর অতীতে আদিম উপজাতীয় শিকারীদের জীবনে চারিপাশের গাছপালা ও জীবজন্তু যেমন মানস-গঠনে প্রভাব বিস্তার করেছিল ঠিক তেমনিভাবেই এইসব আদিম উপজাতীয় সমাজগুলি তৎকালীন গ্রামীণ বাসিন্দাদের কোনো কোনো দিক থেকে প্রভাবিত করে থাকতে পারে। বাংলা রূপকথার দৈত্য-দানব ও অপ্সরাজগতের ক্রমপরিবর্তনশীল ধারণার মূলে হয়তো তারা আদর্শের কাজ করেছিল। পার্শ্ববর্তী কৃষক প্রতিবেশীদের প্রতি এই সব উপজাতিদের নিয়ত পরিবর্তনশীল মৈত্রী বা বৈরীভাব প্রতিফলিত হয়ে থাকতে পারে বাংলার বিভিন্ন বিপরীতধর্মী মৌখিক রূপকথার ধারায়, যাতে কখনও রাক্ষসেরা হিংস্র হলেও বন্ধুরূপে চিত্রিত। আবার কখনও রক্তপিপাসু এমন ভয়াল ভয়ংকররূপে অঙ্কিত সে পশুশক্তি কিংবা চাতুর্যপূর্ণ কৌশল ছাড়া তাদের দমন করা যায় না। তবে মনে রাখা দরকার, এই জাতীয় প্রভাব সম্পর্কে যথেষ্ট গবেষণার পূর্বে শেষকথা বলা সম্ভব নয়।

বাংলা লোকনাট্যে জীবন পাঠ

মানিক সরকার

লোক সমাজের চিত্তরঞ্জন ও নৈতিক শিক্ষার জন্য উদ্ভূত এবং অনুষ্ঠিত নাটকীয় ক্রিয়াকলাপ লোকনাট্যের উৎসভূমি। পূর্বের শ্রেণিহীন, বর্ণহীন, সম্প্রদায়হীন সমাজই লোক সমাজ। এই সমাজে উৎপাদন ও তার বন্টনের প্রথা অনুসারে সমষ্টির ক্রিয়াকলাপ ও চেতনাই প্রধান ছিল।

'লোকনাট্য' বা 'ফোক ড্রামা' নাট্যশাস্ত্রের আলোচিত নাটক নয়। তাই শাস্ত্রীয় আলোকে লোকনাট্যের যথার্থ পরিচয় পাওয়া অসম্ভব।

লোকনাট্যে নাটকের পূর্ণাঙ্গতা নেই, কিন্তু নাটকের বিশিষ্ট লক্ষণগুলি বীজাকারে রয়েছে। এই বীজগুলিই সমাজ বিবর্তনের সঙ্গে সংগতি রেখে ক্রমবিকশিত রূপে নাটক হয়েছে। তাই নাটকের ভিত্তি লোকনাট্য।

লোকধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি এবং সামাজিক উৎসবাদিতে একটি অংশ প্রত্যক্ষভাবে যোগদান করে, প্রত্যক্ষ অংশ নেয়, অপর অংশ তাতে উপস্থিত থাকে, সেই ক্রিয়াকলাপ দেখে, অনুভব করে তারা পরোক্ষে অংশ নেয়। এই ক্রিয়াকলাপ নৃত্যে-গানে, কাহিনিতে, অঙ্গভঙ্গিতে একত্রিত হয়ে দৃশ্যাত্মক হয়ে ওঠে। এটাই লোকনাট্য। লোকনাট্য জাদুমূলক ক্রিয়াকলাপ ও অনুষ্ঠানের আদিম স্তর কোনো না কোনোভাবে অতিক্রম করে উদ্ভব হয়েছে। এর স্মৃতি লোকনাট্যে পাওয়া যায়।

লোকসাহিত্যের আলোচনা বাংলার ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্দ্ধে সূচিত হয়। বিংশ শতাব্দীতে এই আলোচনা আরও প্রসারিত হয়। লোকসাহিত্যের আলোচনা লোকসংস্কৃতিতে উন্নীত হয়। বর্তমানে একটি স্বতন্ত্র শাখারূপে লোকনাট্যের আলোচনা শুরু হয়েছে। বিচ্ছিন্ন এবং বিক্ষিপ্ত মন্তব্য প্রকাশের পরিবর্তে লোকনাট্যকে নিয়ে একটি সামগ্রিক মূল্যায়নের প্রয়াস চলেছে। এই 'মূল্যায়ন'-এর পটভূমিতে আমাদের এই আলোচনা আরম্ভ করা হচ্ছে।

বাংলায় 'লোকনাট্য' শব্দটি অর্বাচীন, কিন্তু 'নাটগীত' শব্দটি বেশ প্রাচীন। এখানে শতাব্দীর কবি দ্বিজ বংশীবদনের রচিত মনসামঙ্গলের কয়েকটি পঙ্‌ক্তি উল্লেখ করা যাক—

ইহা দেখি ভক্তিভাবে যত গোপগণ।
দীপ ধূপে বলিদানে করয়ে পূজন॥
নানামতে করে তথা বাদ্য নাট গীত।
হেন কালে এক কাজি আসি উপস্থিত॥

পুনরায় দেখা যায়, "জঙ্গালে নদীর কূলে মিলিয়া সব রাখাল/নাটগীত মহোচ্ছবি করি॥" এছাড়াও "নাটুয়ারা নাট করে গায়ানে গায় গীত" মধ্যযুগের বিশাল মঙ্গালকাব্যে বাংলা ইতিহাসের বহু সত্য লুকিয়ে আছে। মনসামঙ্গালের পূর্বোক্ত উদ্ধৃতির প্রথমটিতে দেখা যাচ্ছে, পুজো উপলক্ষ্যে মধ্যযুগের বাংলায় "নানামতে করে তথা বাদ্য নাটগীত।" আবার দ্বিতীয়টিতে আছে "জঙ্গালে নদীর কূলে। মিলিয়া সব রাখালে। নাটগীত মহোচ্ছব" করে। প্রথমটিতে গোপগণ এবং দ্বিতীয়টিতে রাখালগণ এই নাটমগীতের কুশিলব। তাই "দেবালই ছিল প্রথম রঙ্গালয়" —সর্বাংশে হয়তো সত্য নয়।

নাটগীত শব্দটি মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে বেশ প্রচলিত। নাট-গীতের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলা হয়েছে, "উৎসব উপলক্ষ্যে নৃত্যগীত অনুষ্ঠিত হইত বলিয়া সাধারণভাবে ইহাকে নাটগীত বলিত" মধ্যযুগে 'নৃত্য' এবং 'গীত' শব্দ দুটি অজ্ঞাত ছিল না। সেকালের কবিরা বহুস্থানে 'নৃত্য' এবং 'গীত' শব্দ ব্যবহার করেছেন। 'নাটগীত' এবং 'নৃত্যগীত' একই অর্থবহ হলে স্বতন্ত্রভাবে তাঁরা এ দুটি শব্দের ব্যবহার করতেন না। নাটগীত স্বতন্ত্র অর্থে ব্যবহার হতো। সম্ভবত যে নৃত্যগীতে নাটকীয়তা ছিল তাকেই 'নাটগীত' বলা হয়। মধ্যযুগের নাটগীতের ক্রমবিকাশেরও ইতিহাসে আছে। তাতে 'Magic Drama' অর্থাৎ জাদু-নাটকের স্মৃতি এখনও বহন করে চলেছে। লৌকিক ব্রতেও এর স্মৃতি এখনও আছে।

'নাট' কথাটির সঙ্গো কাহিনি, চরিত্র, অঙ্গাভঙ্গি এবং গান-নাচ-বাদ্যযন্ত্র, দর্শক প্রভৃতি সবই যুক্ত হয়ে পড়ে। তাই প্রাচীন বাংলার 'নাট-গীত'ই বাংলা লোকনাট্যের অন্যতম উৎসরূপেই বিবেচনা করা যেতে পারে।

লোকনাট্য নিয়ে সম্প্রতি বাংলাভাষায় আলোচনা আরম্ভ হয়েছে। কিছুকাল আগেও লোকসাহিত্যের ইতিহাসচর্চায় কিন্তু লোকনাট্যের স্বতন্ত্র শাখা হিসেবে বিশেষ কোনও স্থান ছিল না। লোকনাট্য নিয়ে বাংলাসাহিত্যের ইতিহাস বিশারদগণ একটি স্বতন্ত্র শাখা হিসাবে বিশেষ আলোচনা করেননি। এমনকি বাংলা নাট্য-সাহিত্যের ইতিহাসে লোকনাট্য তার সম্পূর্ণ মর্যাদা পায়নি। এই বিষয়ে লোকসংস্কৃতির গবেষকদের উপেক্ষা কম দুঃখজনক নয়। সম্প্রতি এই আলোচনার মধ্যে লোকনাট্যের সংজ্ঞাগত ব্যাখ্যায় একাধিক অভিমত প্রকাশ পেয়েছে। ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয়ের মতে—"গ্রামীণ সমাজে জনসাধারণের জীবন অবলম্বন করে যে নাটকধর্মী রচনা মুখে মুখে রচিত হয়ে মুখেমুখে প্রচারিত হয় তা-ই লোকনাট্য!" অপরমতে—

> লোকাশ্রিত কাহিনি, কাহিনি-আশ্রিত চরিত্র, চরিত্র অনুযায়ী উক্তি-প্রত্যুক্তি, সহজ, সরল বলিষ্ঠতার সঙ্গো লোকগীত, নৃত্য, স্বল্প সংলাপ এবং লৌকিক বাদ্যযন্ত্রের ঐকতানের মাধ্যমে ঋজুদৃঢ় ভাবভঙ্গীর দ্বারা লোকাকীর্ণ উন্মুক্ত আসরে অভিনয়ের সাহায্যে যা' প্রকাশ হয় তা-ই সাধারণ অর্থে লোকনাট্য (ফোক-ড্রামা)।

সংজ্ঞায়িত না করলেও বাংলার বিদগ্ধ-সমালোচক ড. সাধনকুমার ভট্টাচার্য মহাশয়, লোকসংস্কৃতিচর্চ্চার বিশিষ্ট ক্ষেত্র গবেষক শ্রী চিত্তরঞ্জন দেব প্রমুখ বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্তভাবে লোকনাট্য প্রসঙ্গো তাঁদের অভিমত প্রকাশ করছেন। ড. গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য একটি গবেষণামূলক গ্রন্থ লেখেন। রাজ্য সরকারের তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগের উদ্যোগে ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে বাংলা লোকসংস্কৃতির একটি পূর্ণাঙ্গা আলোচনাচক্রে লোকনাট্য বিষয়ক মূল্যবান

একটি প্রবন্ধ ড. অজিতকুমার ঘোষ পাঠ করেন। তিনি তাঁর প্রবেন্ধ লোকনাট্যের সাতটি সাধারণ লক্ষণ তুলে ধরেছেন—

১. লোকনাট্য সাধারণ লোকেদের দ্বারা সাধারণ লোকদের কাছেই পরিবেশিত হয়। এর রচয়িতা, শিল্পী গোষ্ঠী ও দর্শক সকলেই লোকায়ত স্তরের মানুষ।

২. শহর এবং বিদগ্ধ ও অভিজাত সমাজ থেকে দূরে গ্রামের মাটিতে মাঠ, ঘাট ও বারোয়ারীতলায় এই নাটকের উদ্ভব ও অভিনয় দেখা যায়।

৩. খোলা আকাশের নীচে মুক্ত ও অবারিত আঙিনায় লোকনাট্যের অভিনয় হয়...।

৪. লোকনাট্য নির্দিষ্ট শিল্পশাসনের মধ্যে আবদ্ধ থাকে না, তার আকার ও আয়তন নিত্য পরিবর্তনশীল, দর্শকদের রুচি ও চাহিদা অনুযায়ী তাতে নতুন নতুন উপাদান কেবলই প্রবেশ করতে থাকে।

৫. লোকনাট্যের বিষয়বস্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ধর্মমূলক। যেসব ক্ষেত্রে মানবিক বিষয়বস্তু গ্রহণ করা হয় সে সব জায়গাতেই ধর্মও নীতির সর্বজনমান্য আদর্শ জোরালোভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। লোকনাট্য চিরকাল লোকশিক্ষার বাহনরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। সনাতন ভাবধারা ও ঐতিহ্য লোকনাট্যের মাধ্যমে প্রচারিত হয়েছে।

৬. লোকনাট্যের মধ্যে সাধারণত সংলাপ অপেক্ষা সংগীতেরই প্রাধান্য।

৭. লোকনাট্যের অভিনয়ে আবৃত্তি ও সুরের প্রাধান্য আসা স্বাভাবিক, সূক্ষ্ম ভাবে অভিব্যক্তি অপেক্ষা জোরালো ও গম্ভীর কণ্ঠস্বরের প্রয়োজনই সেখানে বেশি। অতিশয়িতভাবে প্রকাশের জন্য সেই অভিনয়ে বহু জায়গায় মুখোস ব্যবহার হয় (পশ্চিমবঙ্গের লোকসংস্কৃতি তথ্যও জনসংখ্যা বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত, পৃ. ১২৯-৩০)

এই সাতটি সাধারণ লক্ষণের সঙ্গে আরও তিনটি লক্ষণ সংযোজন করায় প্রস্তাব করা হয়। যথা—

১. লোকনাট্যের একটি বিশিষ্ট অংশ লোকনৃত্য। অভিনেতাদের সাজসজ্জা অতি সাধারণ। লোকনাট্যে লৌকিক বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করা হয়।

২. ব্যঙ্গ, বিদ্রুপ, হাস্যকৌতুক (কখনও কখনও তা আদিরসাত্মক) প্রভৃতির আধিক্য রয়েছে, অর্থাৎ লোকনাট্যে হাসি-ঠাট্টা-তামাসা ইত্যাদির মাধ্যমে দর্শকদের রিলিফ দেওয়া হয়। কখনও আবার ব্যঙ্গের কষাঘাতে দর্শকদের পুলকিত করা হয়।

৩. লোকনাট্য প্রধানত অলিখিত। চরিত্রগুলি সংলাপের অনুশাসনের মধ্যে থাকে না। আসরের মধ্যে অনুষ্ঠান চলাকালে কী গানে কী সংলাপে নতুন নতুন বাক্যের নিত্য সংযোজন হয়ে থাকে। লেখনীর শাসন না থাকলেও লোকনাট্যের গান বা সংলাপ শৃঙ্খলাবিহীন ভাবে হয় না। একটা অলিখিত কিন্তু অভিজ্ঞতাজাত শৃঙ্খলা মেনে চলে। এই ধরনের স্বাভাবিক, সহজ শৃঙ্খলা আছে বলেই লোকনাট্য নির্দিষ্ট পরিণতির দিকে মন্থরগতিতে এগিয়ে চলে, দর্শকদের মনকেও টেনে রাখে। (বাংলা লোকনাট্যের ধারাও আলকাপ : মানিক সরকার, 'মূল্যায়ণ', ১০ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা)

লোকনাট্যকে একটি স্বতন্ত্র নাট্যশাখা হিসেবে বাংলাভাষায় উপস্থিত করবার আন্তরিক প্রয়াসের এটাই হলো সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

লোকনাট্য শুধু শ্রবনীয় নয়, দর্শনগ্রাহ্যও। মুদ্রণযন্ত্র আবির্ভাবের পূর্বে এর কাহিনি 'মুখে মুখে রচনা' এবং 'মুখে মুখে প্রচার' হলেও একে দর্শনীয় করে তুলতে হয়েছিল। দর্শনীয় না হলে লোকনাট্য হয় না। এখানেই লোকগীতের সঙ্গে লোকনাট্যের একটি বড়ো পার্থক্য। যদিও লোকনাট্য কখনই লোকগীতকে বর্জন করেনি। লোকনৃত্য দর্শনগ্রাহ্য। কিন্তু সকল লোকনৃত্যই লোকনাট্য নয়। বেশ কিছু লোকনৃত্য আবার লোকনাট্যের অন্তর্ভুক্ত হয়ে আছে। ছৌ-নৃত্য এর একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

লোকনাট্যের প্রাচীন রূপ পাওয়া অত্যন্ত দুষ্কর। বর্তমানে যা পাওয়া যাচ্ছে তার একটির অংশবিশেষ উপস্থিত করা যাক। নাম 'রসিয়া' পালা। রসিয়া বা রসিক গোয়ালা বংশজাত একজন যুবক। গ্রামের এক যুবতীকে সে ভালোবাসে। গ্রামের মাঠে-ঘাটে ঘুরে বেড়ায়; কখনো বাঁশি বাজায়। যুবতীকে দেখলেই সে প্রেম নিবেদন করে। কিন্তু যুবতী প্রেমিকের প্রেম নিবেদনকে বড়ো একটা গ্রাহ্য করে না। রসিয়ার প্রেমনিবেদনের চিত্র নিম্নরূপ—

রসিয়া—

শুনে আগে শুনগে আই
হামার ভাঙ্গা ঘরোৎ আলো করেক
        আর কী আসিব তুই?
তোক না দেখিয়া শুনে সে আই
বাউড়া হয়াছে পরাণ
পাছা পাড়্যা শাড়ী পরোৎ
তার খাচ্ছরৎ কি খুচ্ছরৎ কি চটক দেখতে মুই।
হামার কাছো আসি পরিত পাইত
হাটের বাছা বাছা শাড়ী
কানোৎ দিত সোনার মাকুড়ী।

যুবতী—

লজ্জা করিয়া ক্যামনে জানাই
        তোরকে রসিয়া।
লজ্জা সরম নাই কি তোর
        শুনিস না কি ওরে।
ঘরোৎ ত তোর নাই কি ভাঙা চটিখান
কানোৎ ক্যামনে দিব মাকুড়ী।
        হালগরু কিছুই নাই
        শেষেতে যায়া কি খাব?
নাই খাব পান গুড়া,
        ঘরোত যায় কি খাওয়াব।
এতই যদি হাউস থাকেরে
তিন কুড়ি পান দিয়া
        লজ্জা হরবে বেট্টা।

রসিয়া—

নাইবা থাকিলো টাকা পয়সা

তোক বানালু বাইন্যা
হামি যদু বর,
হামরা দু'জনে সকল সময়
নিজের হাতে কাম করিব
ভরিয়া তুলিব প্রাণের টানে
নাইবা থাকিলো টাকা কড়ি
হামি আছি আর আছে মোর যৈবন।
(সংগ্রাহক : চিত্তরঞ্জন দেব)

লেখার মাধ্যমে উপস্থাপিত এই দৃষ্টান্ত এবং 'রসিয়া' পালার মঞ্চস্থরূপ এক নয়। মঞ্চে পালার শেষ অংশে নায়িকার বিরহ নানাভাবে তীব্র করে তোলা হয়। পালায় গান হয়, বাজনা বাজে, নাচ হয়। আরও হয় ব্যঙ্গা-বিদ্রূপ, সংলাপও কিছু থাকে। সবটা মিলিয়েই হয় নাটকীয়তার সৃষ্টি।

লোকনাট্য শুধুমাত্র লোকরঞ্জনের জন্যে নয়। গণশিক্ষার বিষয়ও তার মধ্যে রয়েছে। লোকনাট্যে যুবক-যুবতীর প্রেম, শুধু প্রেমেই পূর্ণ নয়। লৌকিক প্রেমের পূর্ণতা ঘর বাঁধার সার্থকতায় মূর্ত হয়ে ওঠে। পূর্বোক্ত সেই ঘর বাঁধার মধ্যে বিপত্তি আছে, সমাজের বর্ণগত কু-সংস্কারের বিপত্তি। 'গোয়ালার ছৈলার' সঙ্গে যুবতী কী করে 'পীরিত' করবে? তাই বিচ্ছেদ আসে। সে বিচ্ছেদ কার্যত আমাদের সমাজের বর্ণবিদ্বেষগত কুসংস্কারকে আঘাত দেয়। বিচ্ছেদে বিহ্বল যুবতীর বেদনায় অতি সাধারণ দর্শকসমাজ বর্ণগত হীনমন্যতা ও বিদ্বেষকেই অভিশাপ দেয়।

লোকসাহিত্যের প্রভাবিত শিক্ষা 'অ', 'আ', 'ক', 'খ'-র মতো শিক্ষা নয়। এই শিক্ষা মনের, সমাজের—সমগ্রের। "সমাজশিক্ষার এমন জীবন্ত বাহন দুর্লভ। ছড়া, প্রবাদ-প্রবচন ও গানে বা লোক কথায় একদিকে যেমন চিত্তরঞ্জনের কাজ করে, অন্যদিকে আমাদের নৈতিক আদর্শ, সামাজিক ন্যায়বিচার, রাষ্ট্রনৈতিক ও আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে সচেতন করে তোলে।"

লোকনাট্য ও লোকশিক্ষায় বাহন হয়েছে—"চিত্তবৃত্তি সকলের প্রকৃত অবস্থা স্ব স্ব কার্য দক্ষতা, কর্তব্য কার্যে উৎসাহ, এ শিক্ষাই শিক্ষা।" (লোকশিক্ষা : বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বিবিধ প্রবন্ধ পৃ. ৩৯২)। শিক্ষা হিসেবে লোকনাট্যে পাপ-পুণ্যের বিষয়টি উত্থাপিত হয়। যে-কোনো অশুভ কাজই পাপ কাজ, সকল শুভকাজই পুণ্যের কাজ। এক্ষেত্রে পাপ-পুণ্যের বিচার একেবারেই পার্থিব। এতে অপার্থিব কিছু নেই। 'চোরচুরনী' পালায় চুরি, 'বনবিবি' পালায় দরিদ্র দুখের উপর ধনী মোনার অত্যাচার পাপ বলেই বিবেচিত হয়। দক্ষিণরায়ের হিংস্র কবল থেকে দুখেকে রক্ষা করাটাকে পুণ্যকাজ বলেই গণ্য হয়। আবার 'আলকাপে' স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়া একটা পাপ কাজ। 'গম্ভীরা গানে' অবাধ্য পুত্রের কার্যকলাপ পাপ রূপেই চিত্রিত হয়। লোকনাট্য কোথাও এই পাপ-এর গৌরব ঘোষণা করেনি, পুণ্যের জয় চেয়েছে।

লোকগীতের ন্যায় লোকনাট্যেও কয়েকটি প্রিয় চরিত্র আছে। যথা, রাম-সীতা, রাধাকৃষ্ণ, হর-পার্বতী প্রমুখ। মহাকাব্য বা পুরাণের কাহিনির বিশেষ অংশ নিয়ে লোকগীত আছে, আছে লোকনাট্যও। লোকনাট্য এই কাহিনি ও চরিত্রগুলির মাধ্যমে মানুষের চরিত্রের দৃঢ়তাকে বাড়ানোর চেষ্টা হয়েছে, শিক্ষা দেওয়া হয়েছে।

'আলকাপে' নারী ও পুরুষের উক্তি-প্রত্যুক্তির মধ্যে দিয়ে দাম্পত্য জীবনের মাধুর্যকে ফুটিয়ে তুলে সমাজবন্ধনের ভিত্তিমূল যে দাম্পত্য বন্ধনকেই দৃঢ় করে তোলার চেষ্টা হয়। 'আলকাপের' 'রঙ'-এ শেষ লাইনে স্ত্রীকে লক্ষ করে স্বামী বলে—

গুড় মিষ্টি, মধু মিষ্টি, হে কন্যা আরও মিষ্টি চিনি।
তার চেয়ে অধিক মিষ্টি তোমার হাতের পানি।
হে কন্যা তোমার হাতের পানি। (নিজস্ব সংগ্রহ)

পানির কোনও স্বাদ নাই। কিন্তু স্ত্রীর হাতের পানি স্বামীর কাছে গুড়, মধু ও চিনির চেয়েও মিষ্টি। মিষ্টি এখানে দাম্পত্য সম্পর্কটি। স্ত্রীর হাতের পানি সেই মধুর সম্পর্কের দ্যোতক। শুধু দাম্পত্য বা পারিবারিক নয়, সামাজিক সম্পর্ককে দৃঢ় করার জন্যও লোকনাট্য সম্প্রদায়গত সম্প্রীতি ও ঐক্যের মহৎ শিক্ষা দিয়ে থাকে। 'গম্ভীরা গানে' এর বহু দৃষ্টান্ত আছে, আছে 'আলকাপে'। গম্ভীরার কটি লাইন—

ওহে কাশীশ্বর,
আমরা সব হিন্দু মুসলমান,
মিলে হয়্যাছি সমান।
ওহে কাশীশ্বর।
মিলে হয়্যাছি সমান। (নিজস্ব সংগ্রহ)

লোকনাট্যের বড়ো শিক্ষা মর্ত্যপ্রীতি, জীবনপ্রীতি, কর্মপ্রীতি ও সমাজ-প্রীতি। তাই 'আলকাপ' লোকনাট্যের গানে শোনা যায়—

ও কৃষকদল,
এগিয়ে চল,
চল ভাই মাঠের কাজে।
মোদের দেহে আছে বল,
ক্ষেতে আছে জল,
ধর চেপে হাল সকাল-সাঁজে। (নিজস্ব সংগ্রহ)

শিক্ষার দুটি দিক—১. পুঁথিগত-শিক্ষা, ২. জীবনশিক্ষা। লোকনাট্যে পুঁথিগত শিক্ষার কোনও বিশেষ স্থান নেই। কিন্তু সেখানে মাটি মাখা জীবন ও জগতের পাঠ নেওয়ার স্থান যথেষ্ট। এখানেই তার মহত্ব।

পর্ব : ৩

➲ বাক্‌কেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতি

❑ লৌকিক ছড়া

‘ছড়া’ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ

প্রতিম দত্ত

রবীন্দ্রনাথ শুধু শিল্পী হিসেবেই নয়, একজন সংগঠক হিসেবেও বাংলা তথা বাঙালির ইতিহাসে বিশিষ্ট স্থান করে নিয়েছেন। সে শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠাই হোক, জমিদারি এলাকায় পল্লি উন্নয়ন কর্মসূচির রূপায়ণই হোক—সবেতেই তাঁর অনেককে দিয়ে কাজ করিয়ে নেওয়া বা নেতৃত্ব গুণের ছাপ রয়েছে। লোকসাহিত্যের প্রতি তাঁর আগ্রহ এবং লোকছড়া ইত্যাদি সংগ্রহের ক্ষেত্রেও তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। তিনি শুধু নিজে নন, যোগ্য লোকেদের ওপর দায়িত্ব অর্পণ করে এই সংগ্রহ কার্য চালিয়ে যাওয়ার উৎসাহ প্রদান করেছিলেন। নবীন প্রজন্মকে এই সংগ্রহকার্যে উদ্যোগী করতে বক্তৃতা দিয়েছেন। এক্ষেত্রে তিনি যেহেতু নিজেই সংগ্রাহক হিসেবে কাজ শুরু করেছেন, সেহেতু তাঁর আহ্বান অন্তত আরও গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠা স্বাভাবিক। এইজন্য বাঙালি আজও রবীন্দ্রনাথের কাছে ঋণী।

‘সাধনা’ পত্রিকায় ১৩০১ বঙ্গাব্দের আশ্বিন-কার্তিক সংখ্যায় ‘ছেলেভুলানো ছড়া’ প্রথম প্রকাশিত হয়। যদিও এটি প্রথমে ‘মেয়েলী ছড়া’ নামে মুদ্রিত হয়েছিল। এরপর ১৩০১ বঙ্গাব্দের মাঘ ও ১৩০২ বঙ্গাব্দের কার্তিক মাসে ‘সাহিত্য পরিষৎ’ পত্রিকায় ‘ছেলেভুলানো ছড়া-২’ প্রকাশিত হয়। ১৩০২ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ মাসে ‘সাধনা’ পত্রিকায় ‘কবিসংগীত’ প্রকাশিত হয়। ১৩০৫ বঙ্গাব্দে ‘ভারতী’তে ফাল্গুন-চৈত্র সংখ্যায় ‘গ্রাম্যসাহিত্য’ প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য এই প্রবন্ধগুলো পরবর্তীকালে ‘লোকসাহিত্য’ নামক গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয়।

এই ‘মেয়েলী ছড়া’গুলির বিশেষ সামাজিক ও ঐতিহাসিক গুরুত্ব রয়েছে। রবীন্দ্রনাথ নিজেও সে বিষয়ে সচেতন ছিলেন। তবু এই ছড়াগুলোর ‘সহজ স্বাভাবিক’ রসাবেদনকেই বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। ‘লোকসাহিত্য’ গ্রন্থের ‘ছেলেভুলানো ছড়া-১’ প্রবন্ধের সূচনাতেই রবীন্দ্রনাথ এ বিষয়ে তাঁর মনোভাব স্পস্ট করে ব্যক্ত করেছেন। এমনকি তথাকথিত সমালোচনার রীতি অনুযায়ী তাঁর এই সমালোচনা সকল সমালোচকদের সন্তুষ্ট করতে পারবে না—তাও তিনি উল্লেখ করেছেন। সমালোচনার ক্ষেত্রে প্রচলিত ‘বাঁধা ওজন’ ও ‘বাঁধি বোল’-এর পুনরাবৃত্তিতে তাঁর অরুচির কথাও তিনি উচ্চকণ্ঠেই বলেছেন। এখানেই সমালোচক রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গি অনেকটা উঠে আসে। তাঁর স্পস্ট ঘোষণা—

> কাব্যসমালোচকও যদি যুক্তি তর্ক এবং শ্রেণি-নির্ণয়ের দিক ছাড়িয়া দিয়া কাব্য পাঠজাত মনোভাব পাঠকগণকে উপহার দিতে উদ্যত হন তবে সেজন্য তাঁহাকে দোষী করা উচিত হয় না।[১]

রবীন্দ্রনাথ পূর্বোক্ত প্রবন্ধে যে ছড়াগুলো সম্পর্কে আলোচনা করেছিলেন, সেগুলি মূলত শিশু বা বালকদের 'ভোলানোর' বা মনোরঞ্জনের সামগ্রী। অর্থাৎ ছড়াগুলো যাদের জন্য সৃজিত হচ্ছে তাদেরকে কেন্দ্রে রেখেই রবীন্দ্রনাথ 'ছেলেভুলানো ছড়া' নামটি ব্যবহার করলেন। যদিও পূর্বে এর নামকরণ করেছিলেন 'মেয়েলী ছড়া'। কিন্তু এ যাবৎ যত ছড়া পাওয়া গেছে তা সবই যে শিশু মনোরঞ্জনের বিষয়কেন্দ্রিক তা-নয়। তাছাড়াও ব্রত-পার্বণ, সামাজিক অনুষ্ঠানেও ছড়ার প্রচলন ছিল। সেগুলো নিয়েও পরবর্তীকালে চর্চা হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ যে ছড়াগুলি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন, সেগুলো শিশুকালের সঙ্গো ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাই ছড়ার আলোচনাকে ব্যক্তি জীবনের স্মৃতি-বিবিক্ত করা সম্ভব নয় বলেই রবীন্দ্রনাথ মত প্রকাশ করেছেন। এই সাবজেক্টিভিটি আসলে ছড়ার তাৎপর্য উপলব্ধিতেই সাহায্য করবে। অর্থাৎ এই ব্যক্তিজীবনের স্মৃতি মিশিয়ে নিয়ে ছড়ার রসাস্বাদনের পক্ষপাতী তিনি। লক্ষণীয় সাবজেক্টিভিটিকে রবীন্দ্রনাথ এই ক্ষেত্রে ত্রুটি হিসেবে দেখেননি। তথাকথিত সমালোচকদের তা পছন্দ নাও হতে পারে। "বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদে এল বাণ" ছড়াটিকে তিনি ছেলেবেলার 'মোহমন্ত্র' হিসেবে উল্লেখ করেছেন। এই ছড়াটি তাঁর শিশুমনে কী প্রভাব ফেলেছিল, তা অনুপুঙ্খ বর্ণনা করেছেন 'ছেলেভুলানো ছড়া ১' প্রবন্ধে। ছড়াগুলোর মধ্যে রবীন্দ্রনাথ এক 'চিরত্ব' লক্ষ করেছেন। এর কারণও তিনি নির্দেশ করেছেন—

> এই নবীন চিরত্বের কারণ এই যে, শিশু প্রকৃতির সৃজন। কিন্ত বয়স্ক মানুষ বহুল পরিমাণে মানুষের নিজকৃত রচনা। তেমনি ছড়াগুলিও শিশুসাহিত্য; তাহারা মানব মনে আপনি জন্মিয়াছে।[২]

লক্ষণীয়, সচেতনভাবেই রবীন্দ্রনাথ ছড়াগুলোকে একটি বর্গের অন্তর্গত করলেন। ছড়াগুলো সৃজিত হয়েছে যাদের জন্য, তাদের প্রকৃতির সঙ্গো সাযুজ্য রেখেই যে সেই নির্মাণকৃতিটি ঘটেছে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। ছড়াগুলোর মধ্যে কার্য-কারণহীন একাধিক বিচ্ছিন্ন ঘটনার সমাবেশ থাকে। পরিণত মানব-মস্তিষ্ক তাতে সন্তুষ্ট হতে পারে না। তাতে যদিও তার রসাবেদনে একটুও ঘাটতি হয় না। এই প্রসঙ্গো রবীন্দ্রনাথ স্বপ্নের উদাহরণ টেনে আনেন। স্বপ্নাবস্থায় মানুষ যেমন—"চরমতম অসম্ভবকে অসংশয়ে" গ্রহণ করে, ঠিক তেমনই ছড়ার জগতকেও শিশুরা খুব সহজেই গ্রহণ করতে পারে। কারণ, তাঁর কথায় বালকেরা 'নিত্যস্বপ্নদর্শী'। তাই তাদের কাছেই ছড়ার প্রকৃত আদর। ছড়াগুলোর মধ্যে একটা চিত্রধর্ম বর্তমান। প্রত্যেকটি ছড়াই কিছু উজ্জ্বল ছবি ফুটিয়ে তোলে। রবীন্দ্রনাথের কথায়—"বালক যত সহজে ইচ্ছামাত্রই সৃজন করিতে পারে আমরা পারি না।"[৩] ছড়ায় যা পাওয়া গেলো তাকেই বালক মন নিজের সৃজন ক্ষমতা দিয়ে আরও পরিপুষ্ট করে তোলে। যেহেতু সে মানব সমাজের 'সম্ভাব্যতার সূত্র' এখনও আয়ত্ত করেনি। তাই এই কাজ তার কাছে কঠিন নয় বরং সহজ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথায়—"ছেলের কাছে অদ্ভুত কিছুই নাই; কারণ তাহার নিকট অসম্ভব কিছু নাই। সে এখনও জগতে সম্ভাব্যতার শেষ সীমাবর্তী প্রাচীরে গিয়া চারিদিক হইতে মাথা ঠুকিয়া ফিরিয়া আসে নাই।"[৪]

ছড়াগুলোকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মেঘের সঙ্গো তুলনা করেছেন। মেঘ ও ছড়ার চারটি সাধারণ ধর্ম তিনি পূর্বোক্ত প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন—১. উভয়ে পরিবর্তনশীল, ২. বিবিধ বর্ণে রঞ্জিত, ৩. বায়ুস্রোতে যদৃচ্ছাভাসমান ৪. "ছড়াও কলাবিচার শাস্ত্রের বাহির, মেঘবিজ্ঞানও শাস্ত্র নিয়মের

মধ্যে ভালো করিয়া ধরা দেয় নাই।" ছেলেভুলানো ছড়াগুলোর অর্থভার শূন্যতা এবং চিত্রধর্মের গুণেই শিশুমনকে বশ করে আসছে কোনও প্রাচীন সময় থেকে। সমালোচক রবীন্দ্রনাথ কবি রবীন্দ্রনাথের মতোই অসাধারণ উপমায় বক্তব্য বিষয়কে এভাবেই পাঠকের কাছে মূর্ত করে তোলেন। শিশুশস্য মেঘের জলে যেমন পরিপুষ্ট হয় তেমনই শিশুমন ছড়ায় নিস্নাত হয়। এরকম উপমা একজন কবির পক্ষেই দেওয়া সম্ভব।

রবীন্দ্রনাথ এই প্রবন্ধে ছড়াগুলোকে কলাবিচার শাস্ত্রের বাইরে রেখে মেঘের সঙ্গে তুলনা করে প্রবন্ধটি শেষ করেছেন। ঠিক সেই বক্তব্য থেকেই 'ছেলেভুলানো ছড়া' প্রবন্ধের আলোচনা শুরু হয়েছে। যেখানে তিনি এই ছড়াগুলির রসকে 'বাল্যরস' হিসেবে নামকরণ করেছেন। যা প্রাচীন অলংকারশাস্ত্রের নবরসের বহির্ভূত এবং একান্তই রাবীন্দ্রিক তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। যদিও এই প্রসঙ্গে গৌড়ীয় বৈষ্ণব রসশাস্ত্রের 'বাৎসল্য' রস-পর্যায়ের কথা আমাদের মনে আসে। যদিও 'বাৎসল্য' শব্দটি না প্রয়োগ করে 'বাল্য' শব্দটি প্রয়োগ করার মধ্যে দিয়ে হয়ত রবীন্দ্রনাথ দুটির স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করতে চেয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথায়—"ছেলেভুলানো ছড়ার মধ্যে একটি আদিম সৌকুমার্য আছে-সেই মাধুর্যটিকে বাল্যরস নাম দেওয়া যাইতে পারে। তাহা তীব্র নহে, গাঢ় নহে, তাহা অত্যন্ত স্নিগ্ধ সরস এবং যুক্তিসংগতিহীন।"[৫]

শুধু নামকরণেই তিনি থামেননি। এই রসের প্রকৃতিটিও তিনি সুস্পষ্ট করে উল্লেখ করেছেন— তিনটি নেতিবাচক ও দুটি ইতিবাচক ধর্মের দ্বারা। এই ছড়াগুলো তীব্র ও গাঢ় নয় অর্থাৎ এর অভিঘাত অন্যান্য কাব্য-কবিতার মতো নয়। এটা খুবই স্বাভাবিক কারণ ছড়াগুলোর একটি নির্দিষ্ট পাঠক শ্রেণি আছে। আবার এগুলি স্নিগ্ধ সরস অর্থাৎ এর মধ্যে জটিলতা মুক্ত অবাধ কল্পনাবিস্তারের সুযোগ রয়েছে। আর এই বৈশিষ্ট্যের গুণেই ছড়াগুলি—'যুক্তিসংগতিহীন' একাধিক ছবির সমাবেশ হয়ে উঠতে পারে। তিনি আরও বলেছেন—"এই রসের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়াই আমি বাংলাদেশের ছড়া সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম।"[৬] ছড়া সংগ্রহের ক্ষেত্রেও এর রসাবেদনই তাঁকে প্রাণিত করেছে। তাই তা'র সংগ্রহ কেবলমাত্র সঞ্চয় হয়ে থাকেনি। তিনি এই ছড়াগুলিকে বাংলাদেশের 'জাতীয় সম্পত্তি' বলে উল্লেখ করেছেন। সর্বপ্রথম তিনিই এই সম্পদগুলি সংগ্রহের ডাক দিয়েছিলেন—"ইহা আমাদের জাতীয় সম্পত্তি। অতএব জাতীয় পুরাতন সম্পত্তি সযত্নে সংগ্রহ করিয়া রাখিবার উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইয়াছে।"[৭] 'ছেলেভুলানো ছড়া : ২' প্রবন্ধে ১-৮১ পর্যন্ত ক্রমিক সংখ্যা চিহ্নিত ছড়া সংকলিত হয়েছে। ছড়ার পাঠভেদ সম্পর্কে এই প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ রয়েছে। ছড়ার ক্ষেত্রে অঞ্চলভেদে যে পাঠভেদ হয়, তার সব ক'টিই সংরক্ষণের পক্ষপাতী। কারণ, তাঁর মতে ছড়ার বিশুদ্ধ পাঠ বা আদিম পাঠ খোঁজার প্রয়োজন নেই। তাঁর মতে—

> ইহারা সজীব, ইহারা সচল; ইহারা দেশকালপাত্রবিশেষে প্রতিক্ষণে আপনাকে অবস্থার উপযোগী করিয়া তুলিতেছে। ছড়ার সেই নিয়ত পরিবর্তনশীল প্রকৃতিটি দেখাইতে গেলে তাহার ভিন্ন ভিন্ন পাঠ রক্ষা করা আবশ্যক।[৮]

'গ্রাম্যসাহিত্য' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

> ছড়াগুলির বিষয়কে মোটামুটি দুই ভাগে ভাগ করা যায়। হরগৌরী-বিষয়ক এবং কৃষ্ণরাধা-বিষয়ক। হরগৌরী-বিষয়ে বাঙালির ঘরের কথা এবং কৃষ্ণরাধা-বিষয়ে বাঙালির ভাবের কথা ব্যক্ত করিতেছে। একদিকে সামাজিক দাম্পত্য বন্ধন, আর-এক দিকে সমাজ বন্ধনের অতীত প্রেম।[৯]

ছেলেভুলানো ছড়ার থেকে এই দৈব চরিত্রের দাম্পত্য ও প্রেম বিষয়ক ছড়াগুলির প্রকৃতি যে আলাদা তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। রাধা-কৃষ্ণের প্রেমে যেমন সমাজের বাধা রয়েছে, তেমনই হরগৌরীর দাম্পত্য প্রেমের বাধা হিসেবে 'দারিদ্র্য', 'স্বামীর বার্ধক্য ও কুরূপতা'কে রবীন্দ্রনাথ চিহ্নিত করেছেন। কিন্তু হর-গৌরী এই প্রতিবন্ধকতা উত্তীর্ণ হয়ে দাম্পত্যের বিজয় ঘোষণা করেছে। রবীন্দ্রনাথের কথায়, "হরগৌরীর গান যেমন সমাজের গান, রাধাকৃষ্ণের গান তেমনি সৌন্দর্যের গান।"[১০] রাধা-কৃষ্ণের প্রেমে সামাজিক বাধা অনেক। সমাজবাধাকে সরিয়ে রাধাকৃষ্ণের প্রেম আসলে 'স্বাধীনতার গান'। এই প্রেমকে রবীন্দ্রনাথ "অন্ধ ইন্দ্রিয়ের উদভ্রান্ত উন্মত্ততা" হিসেবে দেখেননি। রাধাকৃষ্ণের পরকীয়া প্রেম সম্পর্কে তাঁর মূল্যবান পর্যবেক্ষণটিও লিপিবদ্ধ করেছেন—

> মানবপ্রকৃতিকে সমাজ একেবারে উন্মীলিত করিতে পারে না। মানবপ্রকৃতিকে অযথা পরিমাণে এবং সম্পূর্ণভাবে রোধ করাতেই সমাজের বিপদ। যে অবস্থায় যখন সেই রুদ্ধপ্রকৃতি কোন একটা উপায়ে বাহির হইবার পথ পায় তখনই বরঞ্চ বিপদের কতকটা লাঘব হয়। বৈষ্ণব কবিরা সেই বন্ধননাশী গভীর দুর্নিবার আবেগকে সৌন্দর্যক্ষেত্রে অধ্যাত্মক্ষেত্রে বহমান করিয়া তাহাকে অনেক পরিমাণে সংসার পথ হইতে মানস পথে বিক্ষিপ্ত করিয়া দিয়াছেন।[১১]

রাধা-কৃষ্ণ বিষয়ক এই রচনায় সমাজনীতি লঙ্ঘনের ফলে বাস্তব সমাজে "অহিতকর প্রভাব" সৃষ্টির যে অভিযোগ বা সম্ভাবনার কথা ওঠে তাও রবীন্দ্র যুক্তিতে খারিজ হয়ে যায়। বরং তা সমাজের ক্ষেত্রে মঙ্গলজনক বা হিতকরই সিদ্ধ হয়। রবীন্দ্রনাথের পর্যবেক্ষণ, এই রাধাকৃষ্ণের বন্ধনবিহীন প্রেম ভারতীয় সমাজব্যবস্থায় যে কতটা দুঃসাহসী তা আমরা 'চিরঅভ্যাসক্রমে' উপলব্ধি করতে পারি না। তিনি এই প্রসঙ্গে বলেছেন—

> আমাদের দেশে যেখানে, কর্মবিভাগ, শাস্ত্রশাসন এবং সামাজিক উচ্চনীচতার ভাব সাধারণের মনে এমন দৃঢ়বদ্ধমূল,সেখানে কৃষ্ণরাধার কাহিনিতে এই প্রকার আচারবিরুদ্ধ বন্ধনবিহীন ভাবের স্বাধীনতা যে কত বিস্ময়কর তাহা চিরঅভ্যাসক্রমে আমরা অনুভব করি না।[১২]

সুতরাং শুধু ছড়া প্রসঙ্গেই নয়, বৈষ্ণবসাহিত্য বা দর্শন সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গি জানতেও 'লোকসাহিত্য' গ্রন্থের এই প্রবন্ধগুলো বিশেষ সহায়ক। লক্ষণীয়, এই হর-গৌরী বা রাধা-কৃষ্ণকে বিষয় করে রচিত ছড়াগুলো প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে এর সামাজিক ও তাত্ত্বিক প্রসঙ্গটিকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন কবিগুরু। গঠন বা রচনা রীতি নয়। যেমন—হরগৌরী বিষয়ক কিছু ছড়ার গঠনশৈলী বা ছন্দ বা অন্তমিল ইত্যাদির ত্রুটিও তার লক্ষগোচর হয়েছে। তবু তিনি প্রত্যক্ষ চিত্রধর্মই যে ছড়াগুলোর শক্তির জায়গা তা স্পষ্ট করে বলেছেন। রাম-সীতার কথাকে কেন্দ্র করেও বাংলাদেশে ছড়া তৈরি হয়েছে। কিন্তু তুলনায় এই ধরনের ছড়ার সংখ্যা অনেক কম। এই প্রসঙ্গে তাঁর স্বতন্ত্র পর্যবেক্ষণ—

> রামায়ণকথার এক দিকে কর্তব্যের দুরূহ কাঠিন্য অপরদিকে ভাবের অপরিসীম মাধুর্য একত্র সম্মিলিত। তাহাতে দাম্পত্য, সৌভ্রাত্র, পিতৃভক্তি, প্রভুভক্তি, প্রজাবাৎসল্য প্রভৃতি মনুষ্যের যত প্রকার উচ্চ অঙ্গের হৃদয়বন্ধন আছে তাহার শ্রেষ্ঠ আদর্শ পরিস্ফুট হইয়াছে। সর্বতোভাবে মানুষকে মানুষ করিবার উপযোগী এমন শিক্ষা আর কোনো দেশে কোনো সাহিত্যে নাই।[১৩]

রামকথার ধর্মজ্ঞান বা বৃহৎ আদর্শের যে শিক্ষামূলক একটি ভূমিকা রয়েছে তা তিনি স্বীকার করেছেন। পারিবারিক বা সামাজিক সম্পর্কগুলোর আদর্শায়িত রূপ রামকথায় আছে। আজকেও

'রামরাজ্য', 'সীতার সতীত্ব', 'প্রভুভক্ত হনুমান' ইত্যাদি শব্দবন্ধগুলো বাঙালির কথায় আদর্শের অনুষঙ্গেই আসে। শুধু তাই নয় দাম্পত্যের ক্ষেত্রে সমালোচক রবীন্দ্রনাথ শিব-দুর্গার থেকে রাম-সীতাকেই এগিয়ে রেখেছেন—"রামসীতার দাম্পত্য আমাদের দেশপ্রচলিত হরগৌরীর দাম্পত্য অপেক্ষা বহুতর গুণে শ্রেষ্ঠ,উন্নত এবং বিশুদ্ধ; তাহা যেমন কঠোর গম্ভীর তেমনি স্নিগ্ধ কোমল।"[১৪] অর্থাৎ রামসীতার দাম্পত্য কঠোরতা-গাম্ভীর্যতা এবং স্নিগ্ধতা-কোমলতা দুই বিপরীতের আশ্চর্য সম্মিলনের দ্বারাই উন্নত ও বিশুদ্ধ হয়ে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছে। অথচ রামসীতার কথার উপর শিব-পার্বতী বা রাধা-কৃষ্ণের কথাই অন্তত বঙ্গদেশে বিজয়প্রাপ্ত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে তিনি আক্ষেপের সুরে বলেছেন—

> বাংলাদেশের মাটিতে সেই রামায়ণকথা হরগৌরী ও রাধাকৃষ্ণের কথার উপরে যে মাথা তুলিয়া উঠিতে পারে নাই তাহা আমাদের দেশের দুর্ভাগ্য। রামকে যাহারা যুদ্ধক্ষেত্রে ও কর্মক্ষেত্রে নরদেবতার আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে তাহাদের পৌরুষ কর্তব্যনিষ্ঠা ও ধর্মপরতার আদর্শ আমাদের অপেক্ষা উচ্চতর।[১৫]

এক্ষেত্রে 'যুদ্ধক্ষেত্র ও কর্মক্ষেত্র' আর 'কর্তব্যনিষ্ঠা ও ধর্মপরতা' শব্দগুলি প্রয়োগ করে তিনি নৈতিক আদর্শের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছেন। বাংলাদেশে যে ধরনের ছড়াগুলো প্রচলিত সেগুলির আদর্শ আর এই ছড়াগুলির আদর্শ আলাদা।

সুতরাং রবীন্দ্রনাথ এই ছড়াগুলি শুধু সংগ্রহ করেই এবং অন্যদের ছড়া সংগ্রহ করার জন্য উৎসাহিত করেই থামেন নি। এই ছড়া সম্পর্কে তাঁর স্বতন্ত্র পর্যবেক্ষণও ছিল। একজন নিষ্ঠাবান গবেষকের মতোই তিনি এই ছড়াগুলি সম্পর্কে ভাবনা-চিন্তা করেছেন। সর্বোপরি,ভবিষ্যতের গবেষকদের জন্য পথ-প্রস্তুত করে গেছেন তার সংগ্রহ ও সমালোচনার মধ্যে দিয়ে।

উৎসের সন্ধানে

১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : 'রবীন্দ্র-রচনাবলী' (৬ষ্ঠ খণ্ড), বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৩৭১, পৃ. ৫৭৮
২. তদেব : পৃ ৫৭৯
৩. তদেব : পৃ. ৫৮৯
৪. তদেব : পৃ. ৫৯১
৫. তদেব : পৃ. ৬০৯
৬. তদেব
৭. তদেব
৮. তদেব : পৃ. ৬০৯-৬১০
৯. তদেব : পৃ. ৬৪৩
১০. তদেব : পৃ. ৬৪৪
১১. তদেব : পৃ. ৬৪৭
১২. তদেব : পৃ. ৬৬১
১৩. তদেব : পৃ. ৬৬৩
১৪. তদেব
১৫. তদেব
১৬. তদেব

বাংলার লোকছড়া

অন্তরা মিত্র

লঘু চালের ছন্দোবন্ধ যে পদ্য রচনা স্মৃতি ও শ্রুতি বাহিত হয়ে লোকসমাজে সর্বত্র প্রচলিত হয়, তাই ছড়া। ছড়ার সংজ্ঞা নির্ধারণ করা কঠিন। জি.এ.গার্লিং সম্পাদিত Everyman's Encyclopedia (Vol. 9) গ্রন্থে বলা হয়—

> The verse generally consist of a rhyming couplet or a quartain... there is frequently a refrain accompanying the traditional musical settings.

ছড়া হলো সমষ্টিগত লোকমনের সৃষ্টি, সমাজের সাধারণ মানুষের আবেগ, কল্পনা, স্বপ্ন, স্মৃতি, অভিজ্ঞতার কথা পদ্যের ভাষায় ছন্দের বন্ধনে ক্ষুদ্র অবয়বে যে বাঙ্ময় রূপ লাভ করে তাই ছড়া। ছড়ার ব্যুৎপত্তি নিয়ে আমরা মোটামুটিভাবে যেসব মতামত এ যাবৎকাল পেয়েছি সেগুলি হলো এইরকম—

১. ছন্দ থেকে ছড়া শব্দটি এসেছে। ছন্দ শব্দের অপভ্রংশ রূপ হলো ছড়া।

২. কারো কারো মতে 'ছটা' শব্দ থেকে ছড়া শব্দটি উদ্ভুত। সেক্ষেত্রে ভাষাতাত্ত্বিক বিবর্তনটি এইরূপ—ছটা > ছডা > ছড়া

৩. আচার্য সুকুমার সেন মহাশয় মনে করেছেন কবিতাছত্র বা ছত্রের অংশ থেকে ছড়া। গ্রাম্য কবিতা, শ্লোক পরম্পরা, বিস্তৃত পদ্যবিশেষ, ছুটকো ছন্দময় রচনা।

ছড়ার মধ্যে একদিকে যেমন গ্রন্থনা থাকে অপরদিকে তেমনি থাকে অসংলগ্নতা। একটি উদাহরণ দিয়ে ব্যাপারটি স্পষ্ট করা যায়—

কাটবেড়ালি মদ্দা মাগী কাপড় কেচে দে।
হারদোচ খেলাতে ডুলকি কিনে দে॥
ডুলকির ভিতর পাকা পান।
ছি, হিঁদুর সোয়ামি মোচর্‌মান॥
এক-পাথর কলাপোড়া এক-পাথর ঝোল।
নাচে আমার খুকুমণি, বাজা তোরা ঢোল॥

উপরোক্ত ছড়া থেকে কাঠবেড়ালিকে কাপড় কেচে দেওয়ার অনুরোধটি অসম্ভব, অসংগত হাস্যরসের উদ্রেক করে। তারপরেই লোককবি গেঁথে নেন ডুলকি ভরা ধানের প্রসঙ্গ। তারপরেই আসছে জাতিবৈরিতা। একটির সঙ্গে একটির মিল নেই। তারপর এসেছে সাধারণ মানের খাদ্য কলাপোড়া আর ঝোলের প্রসঙ্গ। শেষ পঙ্‌ক্তিতে আকস্মিকভাবেই নৃত্যরত খুকুমণি তার সমস্ত মাধুর্য নিয়ে ধরা দিয়েছে। লোককবি যেন পথ চলতে চলতে দু'ধারের

বর্ণালী দৃশ্য ক্রমপুত্রঞ্জন করেছেন এক সূত্রে। আর ছড়ার বিক্ষিপ্ততা হলো ভাবের অসমবন্ধতা। আপাতদৃষ্টিতে ছড়ার মধ্যে পরিচিত জগতের বিভিন্ন চিত্রকল্পই প্রধান উপজীব্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। অথচ তা সত্ত্বেও, টুকরো-টুকরো চিত্রকল্পগুলি এমন একটা স্বাতন্ত্র্য নিয়ে আলাদা-আলাদা ভাবে থাকে যাতে সামগ্রিক কোনো বাক্-প্রতিমা গড়ে ওঠে না সেখানে। কোলাজ করা ছবিতে যেমন বিভিন্ন অংশের পরস্পর-নিরপেক্ষতা থাকলেও অনুভূতির ক্ষেত্রে একটা ভাবগত এককরূপে মনের কোনও না কোনও স্তরে সেগুলি দানা বেঁধে ওঠে, ছড়ার ক্ষেত্রেও ব্যাপারটা প্রায় সেইরকমই ঘটে। এইসব অসংলগ্নতা সত্ত্বেও ছড়াটির (সবারই জানা) মধ্যে সামগ্রিক একটা রসের উপলব্ধি যে ঘটবার প্রেক্ষিত আছে, তা অস্বীকার করা যায় না। এই অসংলগ্নতা এবং সামগ্রিকতার দ্বন্দ্ব-সমন্বয়ই হলো যে-কোনো 'খাঁটি' ছড়ার মূল জীবনীশক্তি। এই রসমাধুর্য প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ 'ছেলে ভুলানো ছড়া' প্রবন্ধে যথার্থই বলেছেন—

> আমাদের অলংকারশাস্ত্রে নয় রসের উল্লেখ আছে, কিন্তু ছেলেভুলানো ছড়ার মধ্যে যে রসটি পাওয়া যায়, তাহা শাস্ত্রোক্ত কোনো রসের অন্তর্গত নহে। সদ্যঃকর্ষণে মাটি হইতে যে সৌরভটি বাহির হয়, অথবা শিশুর নবনীতকোমল দেহের যে স্নেহোদ্‌বেলকর গন্ধ, তাহাকে পুষ্প চন্দন গোলাপ-জল আতর বা ধূপের সুগন্ধের সহিত এক শ্রেণিতে ভুক্ত করা যায় না। সমস্ত সুগন্ধের অপেক্ষা তাহার মধ্যে যেমন একটি অপূর্ব আদিমতা আছে, ছেলেভুলানো ছড়ার মধ্যে তেমনি একটি আদিম সৌকুমায় আছে, সেই মাধুর্যটিকে বাল্যরস নাম দেওয়া যাইতে পারে। তাহা তীব্র নহে, গাঢ় নহে, তারা অত্যন্ত স্নিগ্ধ সরস এবং যুক্তিসংগতিহীন।

বাংলা ছড়ার নিজস্ব কিছু আয়োজন আছে। পথের ধুলোমাটি থেকে আকাশের তারা-সমস্তই ছড়ার বর্ণিতব্য বিষয়। বাংলা ছড়ার গঠনেরও আছে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য সেগুলি সংক্ষেপে আলোচনা করা যেতে পারে—

১. আবাহন ও সম্বোধন : আয় চাঁদ মামা টিপ দিয়ে যা।

২. আত্মকথনরীতি : আমরা দুটি ভাই/শিবের গাজন গাই।

৩. তালিকা প্রদান : "যাদু এতো বড়ো রঙ্গ,/যাদু এতো বড়ো রঙ্গ।/চার কালো দেখাতে পার,/যাব তোমার সঙ্গ॥/কাক কালো, কোকিল কালো,/কালো ফিঙের বেশ।/তাহার অধিক কালো কন্যে,/ তোমার মাথার কেশ॥" (রবীন্দ্র-সংগ্রহ) এভাবে 'চার ধলো', 'চার রাঙা', 'চার তিতো', 'চার হিম' ভিন্ন ভিন্ন স্তবকে বিন্যস্ত হয়েছে। চার কালো, চার ধলো ইত্যাদির তুচ্ছ তালিকা আলদাভাবে বর্ণিত হয়েছে। পাঁচ প্রকার বস্তুর এরূপ তালিকা একই ঢঙে, একই আঙ্গিকে উলম্বভাবে বিন্যস্ত হয়েছে।

৪. স্বরসংগতি, সমীভবন, বর্ণলোপ ইত্যাদির প্রয়োগ—

- আয়রে আয় টিয়ে/নায়ে ভরা দিয়ে। (স্বরসংগতি)
- আশ্বিন যায় কাত্তিক আসে/মা লক্ষ্মী গভ্‌ভে বসে। (সমীভবন)
- অলি অলি বাদুরের ছা। (বর্ণলোপ)

৫. শব্দদ্বৈতের প্রয়োগ : "আদুর বাদুর চালতা চাদুর/সোনার কোটো রূপার খিল।"

৬. তৎসম শব্দের প্রয়োগ : "আইগো চিনতে পারো/গোটা দুই অন্ন বাড়ো।"

৭. ঘটমান বর্তমান ক্রিয়াপদের ব্যবহার : "মা আমার জটাধারী/ঘর নিকচ্ছেন,/বাপ আমার বুড়োশিব/নোকা সাজাচ্ছেন।"

৮. অলংকার প্রয়োগ এবং চিত্রধর্মীতা : অসংলগ্ন ছড়াগুলির মধ্যে দিয়েও একের পর এক বর্ণালী চিত্রকল্প ভেসে ওঠে যেমন—

আকাশ জুড়ে মেঘ করেছে, সুয্যি গেল পাটে
খুকু গেছে জল আনতে পদ্মদীঘির ঘাটে।
পদ্মদীঘির কালো জলে হরেক রকম ফুল
হাঁটুর নীচে দুলছে খুকুর গোছা ভরা চুল।

সেইরকমই বিভিন্ন অলংকারও ছড়ার নান্দনিক সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে—"বড় শাঁখাটি ছোট শাঁখাটি ঝাঁমুর ঝুমুর করে,/তিন কড়ায় খয়ের কিনে দুগগা হেন জলে।" 'ছড়ার ছবি' কাব্যের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন—

> ছড়ার ছন্দ প্রাকৃত ভাষার ঘরাও ছন্দ। এ ছন্দ মেয়েদের মেয়েলি আলাপ, ছেলেদের ছেলেমি প্রলাপের বাহনগিরি করে এসেছে। ভদ্র-সমাজে সভাযোগ্য হবার কোনো খেয়াল এর মধ্যে নেই। এর ভঙ্গিতে এর সজ্জায় কাব্য সৌন্দর্য সহজে প্রবেশ করে কিন্তু সে অজ্ঞাতসার। এই ছড়ার গভীর কথা হালকা চালে পায়ে নুপুর বাজিয়ে চলে, গাম্ভীর্যের গুমোর রাখে না।

সভ্যতার আদি যুগ থেকে, গ্রাম্য লোকসমাজে প্রচলিত ছড়া-গানগুলিই প্রাচীনতম বাংলা কাব্যের নিদর্শন। ছন্দের ও সুর তালের বিচারে সেগুলি যে অনেকাংশে তার আদিরূপ রক্ষা করে চলেছে। চার দলে যদি দিয়ে বিশেষ পর্ব-স্পন্দন সৃষ্টি করাই এ ছন্দের বৈশিষ্ট্য। প্রয়োজন মতো মুক্তদলের মাত্রা প্রসারণ ঘটে। ছড়ার ছন্দের মুক্তদলের উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

> যাঁরা অক্ষরে গণনা করে নিয়ম বাঁধেন তাঁদের জানিয়ে রাখা ভালো যে, স্বরবর্ণে টান দিয়ে মীড় দেবার জন্যেই প্রাকৃত বাংলা ছন্দে কবিরা বিনা দ্বিধায় ফাঁক রেখে দেন, সেই ফাঁকগুলো ছন্দেরই অঙ্গ, সেসব জায়গায় ছন্দের রেশ কিছু কাজ কববার অবকাশ পায়।... ছড়ায় প্রায় দেখা যায়, মাত্রার ঘনতা কোথাও কম, কোথাও বেশি। আবৃত্তিকারের উপর ছন্দ মিলিয়ে নেবার বরাত দেওয়া আছে। ছন্দের নিজের মধ্যে যে ঝোঁক আছে, তার তাড়ায় কণ্ঠ আপনি প্রয়োজন মতো স্বর বাড়ায় কমায়।

খাঁটি দেশজ উচ্চারণের লোকগীতি-ছন্দের ধারাপথে, লৌকিক দলবৃত্ত বাংলা কাব্যে এসেছে। সুর টেনে বা রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'মীড় টেনে' ফাঁক পূরণ করা, এ ছন্দের আসল বৈশিষ্ট্য। যেমন একটি দৃষ্টান্ত—"কি কথা/ব্যাঙের মাথা।/কি ব্যাঙ?/সরু ব্যাঙ,/কেমন সরু?/বামন গরু।" এটি চতুর্দল এক পার্বিক, উক্তি-প্রত্যুক্তিমূলক ছড়া, লাইন শেষে মিল। সব পর্ব যদিও দল সংখ্যার মাপে সমান নয়, কিন্তু ছয় কলার মাপে সমান। তাই ছন্দ কোথাও হেলে পড়েনি। এবারে ৩+৪ এবং ৪+৩ দল মাত্রার বুনুনিতে দুটি সাত দলমাত্রা পঙ্‌ক্তির দৃষ্টান্ত—

হেদে লো কলমিলতা
এতদিন ছিলি কোথা
এতদিন ছিলাম বনে
যে বনে বাগদি মল
আমারে যেতে হল,
চিড়ে দই খেতে হল

এখানেও কবি স্বচ্ছন্দে একটি মিলবিহীন লাইন মাঝে ঢুকিয়ে দিলেন। তাতে ছন্দ কিছুমাত্র টাল খেল না। এবার ৪+৪ দলবিন্যাসে দিপাক্ষিক আটমাত্রা লাইনের একটি দৃষ্টান্ত—

অন্নপূর্ণা দুধের সর।
কাল যাব গো পরের ঘর॥
পরের বেটা মারলে চড়।
তান্‌তে তান্‌তে খুড়োর ঘর॥
খুড়ো দিলে বুড়ো বর।
হেই খুড়ো তোর পায়ে পড়ি॥
থুয়ে আয় গো মায়ের বাড়ি।

এখানে টুকরো টুকরো, আপাত অসংলগ্ন, চর্তুদল পার্বিক চিত্রধর্মী শব্দের মাধ্যমে একটি অসহায়া বালিকার বেদনার কাহিনি চমৎকার দানা বেঁধে উঠেছে। কবির কথায়, এ যেন 'আস্ত জগতের ভাঙা টুকরো।'

'মাসি পিসি' শীর্ষক ছড়াটির চারটি কথান্তর দেখা যায়। 'পানকৌড়ি পানকৌড়ি ডাঙায় ওঠো' সে ছড়াটি দুটি রূপে পাওয়া যায়। 'খোকা যাবে নায়ে'র কথান্তর লভ্য 'খোকা যাবে নায়ে' ছড়ায়। আবার 'ছেলেভুলানো ছড়া'য় আলোচিত 'বৃষ্টি পড়ে টাপুর-টুপুর নদী এল বান' ছড়াটির কথান্তর পাই 'ছেলেভুলানো ছড়া : ২' প্রবন্ধের ছড়া সংগ্রহে সন্নিবিষ্ট 'সুড়সুড়ুনি গুড়গুড়ুনি নদী এল বান' ছড়াটিতে। ছেড়ার কথান্তরের কারণগুলি একে একে পর্যালোচনা করা যাক—

১. অঞ্চলভেদে পরিবর্তন : অতিপরিচিত একটি ছড়া—"খোকা ঘুমালো পাড়া জুড়োলো বর্গী এলো দেশে/বুলবুলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দেব কিসে?" পশ্চিমবঙ্গে প্রাপ্ত এই ছড়াটির কতগুলি কথান্তর পাওয়া যায় চট্টগ্রাম, পাবনা, রাজশাহী অঞ্চলে—"খোকা ঘুমাইল পাড়া জুড়াইল বরকি আইল দ্যাশে/টিয়া পাখি দান খায়্যাছে খাজনা দিমু কিসে?" বর্গীর আক্রমণ অষ্টাদশ শতাব্দীতে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। সেই বীভৎসতার রেশ পশ্চিমবঙ্গ থেকে প্রাপ্ত ছড়াটিতে ধরা পড়েছে। পূর্ববঙ্গে সেই আক্রমণের প্রকোপ পড়েনি। সেখানে বিপর্যয় ডেকে আনত বরকি নামক সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস। এছড়াও বুলবুলি অপেক্ষা টিয়া পূর্ববঙ্গে অধিক প্রচলিত পক্ষী, তাই তারা ছড়ায় স্থান করে নিয়েছে। উল্লেখ্য অঞ্চলভেদে ভয়ঙ্করত্ব এবং ক্ষতির কারণগুলির পরিবর্তন ঘটলেও বিপর্যয়ের মূল সুরটি অক্ষুণ্ণ আছে।

২. বৃত্তিজীবী সমাজভেদে পরিবর্তন : মৎসজীবী সমাজে প্রচলিত একটি ছড়া—"খোকা যাব মাছ ধরিতে, গায়ে নগিবে কাদা।/কলু বাড়ি গিয়ে তেল নেওগে, দাম দেবে তোমার দাদা।" এই ছড়াটিই পশুচারণজীবী সমাজে পরিবর্তিত হয়ে যায় এইভাবে—

খোকা যাবে মোষ চরাতে, খেয়ে যাবে কী।
আমার শিকের উপর গমের রুটি, তবলা-ভরা ঘি।।

অপেক্ষাকৃত উচ্চবিত্ত সমাজে খোকা শুধু বেড়াতেই বেরোয় কোনো কাজ করতে নয়—

খোকা যাবে রথে চড়ে, ব্যাঙ হবে সারথি
মাটির পুতুল নটর-পটর, পিঁপড়ে ধরে ছাতি

৩. জাতি-সম্প্রদায়ভেদে পরিবর্তন : "তালগাছ কাটুম বোসের বাটুম গৌরী হেন ঝি/তোর কপালে বুড়ো বর আমি করবো কি/উঙ্কা ভেঙে শঙ্কা দিলাম হাতে মদন কড়ি/বিয়ার বেলায় দেখে এলাম বুড়োর চাপ দাড়ি।" এই ছড়াটি মুসলমান সমাজে পরিবর্তিত হয়ে গেছে এইভাবে—"তালগাছ কাটি গুয়াকাছ কাটি শোনাই গুণের ঝি/তোর কপালে বুড়ো বর আমি করব কি।/টাকা দিলাম কড়ি দিলাম অগ্নি পাটের শাড়ি/আক্তোরকালে দেখে এলাম বুড়োর চাপ্লো দাড়ি।" অর্থাৎ এই দুটি ছড়াতে কন্যার দুর্ভাগ্যের রূপটি অপরিবর্তিত শুধু কথান্তর ঘটে গেছে।

৪. ছড়ার দৈর্ঘ্য পরিবর্তনের কারণে কথান্তর : বহুক্ষেত্রে বিশেষ কোনো লোকছড়ায় প্রচলিত পঙ্‌ক্তিগুলির সঙ্গো কালক্রমে নতুন পঙ্‌ক্তির ক্রমপুঞ্জন ঘটে, ফলে ঘটে কথান্তর। রবীন্দ্র সংগৃহীত একটি ছড়া—"কে রে, কে রে, কে রে—/তপ্ত দুধের চিনির পানা/মণ্ডা ফেলে দে রে॥" মনীষী আশুতোষ ভট্টাচার্য কর্তৃক সংগৃহীত ছড়াটিতে উপরোক্ত পঙ্‌ক্তিগুলির সঙ্গো আরও দুটো পঙ্‌ক্তি যুক্ত হয়ে গেছে—"মণ্ডা গলে গলে যায়/খোকন তুলে তুলে খায়।"

৫. কালগত ব্যবধানজনিত পরিবর্তন : কালের ব্যবধানে পরিচিত ছড়াগুলিতে বহু সময় আসে পরিবর্তন। ষোড়শ শতাব্দীর কবি মুকুন্দ চক্রবর্তীর 'চণ্ডীমঙ্গাল' কাব্যে শিশু শ্রীমন্তকে ঘুম পাড়াতে গিয়ে খুল্লনা কণ্ঠে যে ছড়াটি শোনা যায় তা হলো—

> আয় রে বাছা আয় রে আয়/কি লাগি কান্দ কি ধন চায়।/আনিব তুলিয়া গগন ফুল/এককে ফুলের লক্ষেক মূল।/সে ফুল গাঁথিয়া পরাব হার/সোনার বাছা না কান্দ আর।/গগন মণ্ডলে পাতিব ফান্দ/আনি দিব তোরে শরদ চান্দ।

ড. সুকুমার সেন মনে করেন মুকুন্দ চক্রবর্তী তাঁর সমসাময়িক লোকসমাজে প্রচলিত ঘুমপাড়ানি ছড়াকেই অল্পস্বল্প পরিবর্তনসহ তাঁর কাব্যে ব্যবহার করেছেন। 'সাহিত্য-পরিষৎ' পত্রিকার দ্বিতীয় বর্ষের তৃতীয় সংখ্যায় বাঁকুড়া জেলার লোকসমাজ থেকে সংগৃহীত এ ছড়ার কাল-পরিবর্তিত লৌকিক রূপটি মুদ্রিত হয়—

> আয় রে আয়/কি নেগে কাঁদিস রে বাছা কি ধন চাই।/খাওয়াইব খীরখণ্ড মাখাইব চুয়া/পাকা পান দিব সরেস গুয়া।/রাজার দুহিতা করাইব বিয়া/কুসুম কস্তুরী চন্দন দিয়া।

ড. সেনের মতে 'আধুনিক কালের নিরাভরণ সাজে' এ ছড়ার আর একটি রূপান্তর হলো—

> আয় আয় চাঁদ মামা টি দিয়ে যা
> চাঁদের কপালে চাঁদ টি দিয়ে যা।
> মাছ কুটলে মুড়ো দেবো
> ধান ভানলে কুঁড়ো দেবো।

এইভাবে কালান্তরে, স্থানান্তরে লোকছড়ার মধ্যে ঘটে যায় কথান্তর। বিপরীতক্রমে এমন কতগুলি ছড়ার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, যেগুলি অপরিবর্তনীয়। লোকসমাজের নানাবিধ বিশ্বাস-সংস্কার, ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া এইজাতীয় ছড়াগুলিকে ঘিরে জমাট বেঁধেছে। লোকজীবনের নিরাপত্তা, সুখ ও সমৃদ্ধি কামনাই ছড়াগুলির উদ্ভবের মূলে কার্যকর। এই জাতীয় ছড়া হতে পারে আনুষ্ঠানিক কিংবা অনানুষ্ঠানিক, হিতকর কিংবা অহিতকর। সাদৃশ্যমূলক এবং সংস্পর্শমূলক যাদুবিশ্বাস এই ছড়াগুলি উচ্চারণের সঙ্গো জড়িয়ে থাকে। যেমন—বৈশাখ মাসে পল্লি-বাংলায় অনুষ্ঠিত হয় পুণ্যিপুকুর ব্রত। উঠোনে নির্মিত পুকুরে, ফুল, চন্দন ও দুর্বা দিয়ে

বলা হয়—"এ পূজনে কী হয়/নির্ধনের ধন হয়।/সাবিত্রী-সমান হয়/স্বামীর আদরিনী হয়/পুত্র রেখে স্বামীর কোলে/মরণ যেন হয় গঙ্গাজলে।।" অর্থাৎ পিতা ও ভ্রাতার মঙ্গল, ধনলাভ, পুত্রলাভ, স্বামীর আদর-যত্ন-ভালোবাসা এবং সধবাকালীন মৃত্যু—এই কামনাগুলির প্রত্যেকটিই এই ব্রত পালন করলে পূরণ হবে বলে ব্রতিনীর বিশ্বাস।

বৈশাখ মাসের অশ্বত্থপাতা ব্রতের মন্ত্রমূলক ছড়াগুলিতেও যাদুবিশ্বাসের ছোঁয়া আছে। ব্রতের নিয়মানুসারে ব্রতিনীকে একটি কচি, একটি কাঁচা, একটি পাকা, একটি শুকনো এবং একটি ঝুরঝুরে অশ্বত্থ পাতা হাত দিয়ে মাথায় চেপে ধরে মন্ত্র পড়ে জলে ডুব দিতে হয়। পাঁচ প্রকার পাতার জন্য পাঁচটি ভিন্ন ভিন্ন মন্ত্র পড়ে ডুব দিতে হয়। পাঁচ প্রকার পাতার জন্য পাঁচটি ভিন্ন ব্রতিনী বলে থাকে—"কচি পাতা মাথায় দিলে/কচি ছেলে কোলে মেলে।/কাঁচা পাতা দিলে মাথে/সোনার রঙ মিলে তাতে।/পাকা পাতাটি মাথায় ধরে/পাকা চুলে সিঁদুর পরে।" অর্থাৎ ব্রতিনী বিশ্বাস করে যে, সে যেরূপ অশ্বত্থপাতা মাথায় দিয়েছে, সেরূপ ফল মিলবে। সুতরাং স্পষ্টতই এই মন্ত্রমূলক ছড়াগুলি সদৃশ জাদু বিশ্বাসের নিদর্শন।

এইভাবেই আনুষ্ঠানিক ছড়াগুলি সাধারণত হিতকর হলেও কখনও আক্রোশবশত অনিষ্টকারক হয়ে ওঠে। যেমন—পৌষ সংক্রান্তির দিন বাংলার ঘরে ঘরে পালিত হয় পিঠে তৈরির অনুষ্ঠান। কোনও পরিবারের পিঠে অনুষ্ঠান বরবাদ করতে হলে এই ছড়াটি আবৃত্তি করতে হয়—"আটারে করিলাম নাটা/পিঠেরে করিলাম ছাই/আর যদি পিঠে জোড়া লাগিস/তবে আল্লার দোহাই।/কার আজ্ঞা?/বুড়ো পীরের আজ্ঞা।" লোকায়ত সমাজ বিশ্বাস করে, কারও পিঠে করার সময় এই ছড়াটি মনে মনে আবৃত্তি করলে একটা পিঠেও ঠিকঠাক গড়ে তোলা যাবে না। সুতরাং সেই পরিবারের পিঠের অনুষ্ঠান নষ্ট হয়ে যাবে।

অনানুষ্ঠানিক ছড়াগুলিও হিতকর বা অহিতকারক উভয় প্রকারই হতে পারে। সাধারণত বৃষ্টি আবাহনমূলক, প্রাকৃতিক নানা দুর্যোগ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য, নানা প্রকার ব্যাধি নিবারণের জন্য হিতকার ছড়াগুলি ব্যবহৃত হয়। যেমন—শিলাবৃষ্টির হাত থেকে রক্ষা পেতে শিলারিগণ (যারা ঐন্দ্রজালিক মন্ত্রমূলক ছড়ার মাধ্যমে শিলাবৃষ্টি প্রতিরোধ করে শস্যকে ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করতে পারে বলে লোকসমাজ বিশ্বাস করে) শিঙায় ফুঁ দিয়ে ঐন্দ্রজালিক ছড়া আবৃত্তি করে—

> ইর কাছুম, বীর কাছুম, কাছুম যমদূত।/আন্ধা চোরা কাচ কাছুম চন্নী মার পুত॥/ভূত-পেরত যত পাই।/বুক চিরাইয়া রক্ত খাই॥/রাম চক্র বাণ।/ঠাণ্ডা জিল্‌কী বাণ॥/দেও, দান, বাণ।/কাট্যা করি খান খান॥/রামের আজ্ঞা গুরুর পায়।/রক্ষা কর কালিকা চণ্ডীর মায়॥/হক্‌লা এলাহা ইল্লাল্লাহ।/মুহাম্মাদুর রাসলুল্লাহ।।

এই ছড়াটি একটু বিশ্লেষণের দাবি রাখে—

প্রথমত : ছড়াটি অন্য ছড়ার তুলনায় আয়তনে বেশ দীর্ঘ এবং মন্ত্রমূলক গঠন-সমৃদ্ধ।

দ্বিতীয়ত : প্রাকৃতিক শক্তিকে নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য প্রলোভন প্রদর্শনের পরিবর্তে এখানে ভয় দেখানো হয়েছে।

তৃতীয়ত : শিলাবৃষ্টির কারণ হিসেবে একটি অশুভ অতিপ্রাকৃতিক শক্তির কল্পনা করা হয়েছে এবং তাকে যমদূতের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে, কারণ যম ও ক্ষতিকারক দেবতা বা মৃত্যুর দেবতা।

চতুর্থত : রাম, কালিকা, চণ্ডী প্রমুখ দেবদেবীর নাম স্মরণ করে এবং গুরুকে স্মরণ করে আত্মবিশ্বাস বাড়ানোর প্রচেষ্টা করা হয়েছে অতিপ্রাকৃত অশুভ শক্তির সাথে সংগ্রামের নিমিত্ত।

পঞ্চমত : সবচেয়ে আশ্চর্যজনক কথা হলো, ছড়াটিতে ধর্মীয় ভেদাভেদ ঘুচে গেছে। আসলে শিলাবৃষ্টি কি হিন্দু, কি মুসলিম—উভয়েরই শত্রু, তাই হিন্দু দেব-দেবীর নাম নেওয়ার পরে ছড়া একেবারে অন্তিমে 'কলেমা তৈয়ব' স্থান পেয়েছে।

দংশক প্রাণি থেকে আত্মরক্ষার জন্য আবৃত্তি করা হয় নিম্নের ছড়াটি—"বিছে, বিছে, কান কটারি।/চাল কলা দিয়ে নুন পুঁটুলি॥/হে বিছে তোর কুম্ভ রাশ।/মাকড় সম্পর্কে না আইস পাশ॥" তেমনই অনানুষ্ঠানিক ছড়াগুলির মধ্যে অন্বিষ্ট ভাবনার অভাব নেই। ব্যক্তিগত আক্রোশ, ঈর্ষা বা হিংসাবশত কোনো ব্যক্তি এই সমস্ত ছড়ার মাধ্যমে অন্য কারও ক্ষতি করে থাকে। লোকায়ত সমাজে প্রচলিত এমন একটি অভিশাপমূলক ছড়া হলো—"নাড়ি ঘড়ি বাইস—/এক সের চাইল তুই ছয় মাসে খাইস।" লোকায়ত সমাজ বিশ্বাস করে, যার উদ্দেশ্যে এই ছড়া আবৃত্তি করা হবে, সে অন্নকষ্টে ও অর্থকষ্টে ভুগবে। অহিতকারী মন্ত্রের গুণ সম্পৃক্ত অপর একটি ছড়ার উল্লেখ করা যেতে পারে—"উঠ্ ফোট্ চোট্ পাকিস্ না গলিস না/দোধল বাইন্দা উঠ।" এই মন্ত্রটি বললে নাকি শত্রুর ঘা বা ফোঁড়ার কোনোদিন নিরাময় হবে না এবং শত্রু খুব কষ্ট পাবে। তবুও বলা যায় সামগ্রিকভাবে মন্ত্রধর্মী ছড়াগুলি লোকসমাজে একটি সুরক্ষার ঘেরাটোপ তৈরি করে দিয়েছে। এবার অন্য প্রসঙ্গে আসা যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথ 'ছেলেভুলানো ছড়া' প্রবন্ধে বলেছিলেন—

> এই ছড়াগুলিকে একটি আস্ত জগতের ভাঙা টুকরো বলিয়া বোধ হয়। উহাদের মধ্যে বিচিত্র বিস্তৃত সুখ দুঃখ শতধাবিক্ষিপ্ত হইয়া রহিয়াছে। যেমন পুরাতন পৃথিবীর প্রাচীন সমুদ্রতীরে কদর্মতটের উপর বিলুপ্তবংশ সেকালের পাখিদের পতচিহ্ন পড়িয়া ছিল—অবশেষে কালক্রমে কঠিন চাপে সেই কর্দম, পদচিহ্নরেখা-সমেত, পথর হইয়া গিয়াছে।

সত্যিই সামাজিক কর্ম ও চিন্তাধারার নানা ঘাত-প্রতিঘাত প্রত্যক্ষ করা যায় ছড়ার মধ্যে। বহুবিবাহ, কুলীনপ্রথা ছিল একদা বাংলা সমাজের কলঙ্ক। 'শিবঠাকুরের বিয়ে হলো তিন কন্যে দান'—বুড়ো শিব ঠাকুরের চরণে একই সঙ্গে তিনটি কন্যাকে বৈবাহিক সূত্রে সমর্পণ, সমাজে নারীর অবমাননাকর অবস্থানকেই চিহ্নিত করেছে। তেমনি সেঁজুতি ব্রতে ঐকান্তিক কামনা মূর্তি ধরেছে ছড়ায়—'হাতা হাতা হাতা/খা সতীনের মাথা।'—বিবাহিত জীবন সপত্নীশূন্য নিষ্কন্টক করার আপ্রাণ প্রয়াস।

ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে তুর্কি-পাঠান-মোঘল শাসনকালে লোকায়ত বাঙালি হিন্দু সমাজের সঙ্গে মুসলমান ধর্মাবলম্বীদের পদে পদে সংঘাত বেঁধেছে। পঞ্চদশ শতাব্দীর কবি বিদ্যাপতি 'কীর্তিলতা' গ্রন্থে এই পারস্পরিক বিদ্বেষের আভাস দিয়েছেন—"হিন্দু তুরকে মিলন বাস।/একক ধর্মে অওকো উপহাস।/কত হুঁ মিলিমিস কতহুঁ ছেদ।" লোকছড়ার ছত্রে ছত্রে এই বিদ্বেষ বিষ ছড়িয়ে আছে—"আল্লা আল্লা বল ভাই আল্লা নাইখ ঘরে/সোনার টুপী মাথায় দিয়া বাগুন চুরি করে।" পাল্টা আক্রমণ এসেছে মুসলমান সমাজের পক্ষ থেকে—"হরি বড় দয়াময়/কথায় বটে, কাজে নয়।"

বঙ্গে মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠার পর রাজানুকুল্যে এবং ধর্ম প্রচারকদের প্রচেষ্টায় বিপুল সংখ্যক হিন্দু ও বৌদ্ধ, ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। ধর্মান্তরের এই প্রক্রিয়ার ফল, বহু হিন্দু-মহিলার মুসলমান স্বামী গ্রহণ। লোকমনের রক্ষণশীলতা কটাক্ষ ফেলেছে ছড়ায়—"ফুলকির ভিতর পাকা ধান/ছি হিন্দুর সোয়ত্তিম মোচ্‌রমান।" আবার বিপরীত ঘটনাও দুর্লক্ষ্য নয়। সেখানেও একই ব্যঙ্গোক্তি—"দিদিলো কইব কারে হায়,/খোকার বউ সাঁঝ দেখাতে/'চেরাগ বাতি' চায়।" রাজাদের আরক্ষবিভাগে যে ডোম সৈন্যের অবাধ প্রতিপত্তি ছিল তার নজির খেলাধুলার এই ছড়াটি—"আগডুম বাগডুম ঘোড়াডুম সাজে/ঢাক মৃদং ঝাঁঝর বাজে।/বাজতে বাজতে চলল ঢুলি।"

লোকবিদ আশুতোষ ভট্টাচার্য এই পংক্তিগুলির ব্যাখ্যা দিয়েছেন—'আগডুম' অর্থ অগ্রবতী গেম সৈন্যদল, 'বাগডুম' অর্থাৎ বাগ বা পার্শ্ববর্তী ডোম সৈন্যদল এবং 'ঘোড়াডুম' অর্থাৎ অশ্বারোহী ডোম সৈন্যদল।' (বাংলার লোকসাহিত্য) এই মন্তব্যের সমর্থন পাই মনীষী বিনয় ঘোষের পশ্চিবঙ্গের সংস্কৃতি গ্রন্থের ১ম খণ্ডে—'একদিন ডোম সৈন্যই বাংলার পশ্চিম সীমান্ত রক্ষা করিত। বিষ্ণুপুর রাজনগর প্রভৃতি স্থানের সামন্ত রাজাগণ ডোম সৈন্যদল রক্ষা করিতেন। মধ্যযুগের বাংলার লৌকিক সাহিত্য তাহাদের শৌর্য-বীর্যের কাহিনিতে পরিপূর্ণ।' অর্থাৎ উদ্ধৃত লোক ছড়াটি বিগত দিনের জন-সেনাবাহিনীর জাঁকজমকটিকেই তুলে ধরেছে।

১৫৩৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে মোটামুটি বাংলার মানুষ পোর্তুগিজদের সঙ্গে পরিচিত হতে শুরু করে। সে পরিচয় সুখকর নয়। পোর্তুগিজ জলদস্যুদের অত্যাচার বাংলার জনজীবনকে অতিষ্ট করে তুলেছিল। লোকছড়ায় তারই প্রতিক্রিয়া—"আইল রে ফিরিঙ্গি দল।/দেশটা গেল রসাতল।" হতভাগ্য সিরাজউদ্দৌলাও লোকমনের সহানুভূতি আদায় করেছেন—

> কি হলোরে জান/পলাশীর ময়দানে নবাব হারাল পরাণ।/তীর পড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি পড়ে বয়ে।/একলা মীরমদন সাহেব কত নিবে সয়ে।.../নবাব কান্দে সিপাই কান্দে আর কান্তে হাতী/কলকাতায় বসে কান্দে মোহনলালের পূতি।/দুধে ধোয়া কোম্পানির উড়িল নিশান।/মীরজাফরের দাগাবাজিতে গেল নবাবের প্রাণ।

১৭৭৫ খ্রিস্টাব্দের ২৩ জুন পলাশির রণাঙ্গানে প্রভুভক্ত মীরমদন ও মোহনলালের আমরণ সংগ্রাম, মীরজাফরের কলঙ্কিত দেশদ্রোহিতা এবং শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দৌলার পতনের ছবিগুলি উদ্ধৃত লৌকিক ছড়ায় বিবৃত।

ছড়ায় নীল বিদ্রোহের (১৮৫৯-৬০) চিত্রও দুর্লক্ষ্য নয়। অর্থকরী ফসল নীল এক সময় বাংলার কৃষকের পক্ষে অভিশাপ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বাধ্যতামূলক নীলচাষ আর বলপূর্বক ধর্মান্তরিতকরণ এই দুই অন্যায়ের বিরুদ্ধে ক্ষোভ আছড়ে পড়েছে প্রচলিত ছড়ায়—"ভাত মারলে নীল বাঁদরে/জাত মারলে পাদরী ধরে।"

এইভাবে সচল ছড়াগুলি আহরণ করেছে জীবনের তথ্য, যে জীবন ছড়িয়ে আছে ঘাটে মাঠে পথে প্রান্তরে, পল্লির শ্যামলিমা থেকে নাগরিক প্রাসাদে লোকছড়া তাকে পর্যবেক্ষণ করেছে যুগে যুগে। এই চলমানতাকে স্বীকৃতি দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ—'ইহারা অতীত কীর্তির ন্যায় মৃতভাবে রক্ষিত নহে। ইহারা সজীব, ইহারা সচল। ইহারা দেশকাল পাত্র বিশেষে প্রতিক্ষণে আপনাকে অবস্থার উপযোগী করিয়া তুলিতেছে।' এই সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার তাগিদেই বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রতিধ্বনি ওঠে ছড়ায়—"বীর বাঙালি অস্ত্র

ধর/বাংলাদেশকে স্বাধীন কর।" আবার ১৯৭১-এর ২৫ মার্চের নারকীয় হত্যাযজ্ঞের নায়ক টিক্কাখানও ধিক্কৃত হন ছড়ায়—"ইলিশ মাছের তিরিশ কাঁটা/বোয়াল মাছের দাড়ি।/টিক্কাখান ভিক্ষা করে/বাংলাদেশের বাড়ী।" রাশিয়ান লোকবিজ্ঞানী সকোলাভ এই কালচেতনাকে স্বীকৃতি দিয়েছেন Rassian Folklore গ্রন্থে—

> The development of the folk rhymes represents a most interesting process with complete meanderings and intertwinings reflecting with great fullness and diversity both the historical life with its social conflicts and the dialects of class conflict.

লৌকিক ছড়ার ভাব-ভাষা, রূপ-ছন্দের ঝংকারে আকৃষ্ট হয়ে আধুনিককালের অনেক কবি সাহিত্যিক অনেক ছড়া রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন। এগুলির মধ্যে প্রাচীনতম দৃষ্টান্তটি সম্ভবত ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে 'সখা পত্রিকা'য় প্রকাশিত প্রমদাচরণ সেনের ছড়াটি—

> আঃ ছেড়ে দাও না!/আঃ ছেড়ে দাও না কুকুরচন্দ্র মায়ের কাছে যাই/এখন কি আর খেলা করবার সময় আছে ভাই?/দেখছো না কি হাঁড়ি হাতে, চাল ধোয়া রয়েছে তাতে,/মা বলেছেন নিয়ে যেতে 'চাকর বাকর' নাই।

এই ধরনের ছড়াগুলি সাধারণত সচেতন প্রতিভার বুদ্ধিপ্রধান সৃষ্টি। বিষয়বস্তু ব্যাপক ও বৈচিত্র্যপূর্ণ। কখনও রাজনীতি, কখনও সমাজচেতনা, কখনও বা ব্যঙ্গাত্মক ভাব সাহিত্যিক ছড়াগুলির মধ্যে লক্ষ করা যায়। তবে উদ্ভটত্ব বহুক্ষেত্রেই ছড়াগুলির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে মিশে থাকে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'ছড়ার ছবি' কাব্যগ্রন্থের ভূমিকায় বলেছেন—"এর মধ্যে অপেক্ষাকৃত জটিল যদি কোনোটা থাকে তবে তার অর্থ হবে কিছু দুরূহ, তবু তার ধ্বনিতে থাকবে স্বর। ছেলেমেয়েরা অর্থ নিয়ে নালিশ করবে না, খেলা করবে ধ্বনি নিয়ে।"

রবীন্দ্রনাথের 'খাপছাড়া' কাব্যগ্রন্থের ৪৯ নং কবিতার উল্লেখ করিতেছি—"বরের বাপের বাড়ি/যেতেছে বৈবাহিক/সাথে সাথে ভাঁড় হাতে/চলেছে দই-বাহিক।" অথবা, "খবর পেলাম কলা/তাঞ্জামেতে চড়ে রাজা/গাঞ্জামেতে চলল!.../একটা ঘোড়া রইল বাকি,/তিনটে ঘোড়া মরল।/গরাণহাটায় পৌঁছে সেটা/মুটের ঘাড়ে চড়ল।" এদের মধ্যে বয়স্কের অনুভব, জননীর অন্তঃকরণ ও শিশুর বিস্ময় এই ত্রিধারাই বর্তমান। যোগীন্দ্রনাথ সরকারের ছড়ায় লৌকিক রং কিছু গাঢ়তর এবং তাঁর সহজ সরল আন্তরিকতায় একটি স্নেহ কোমলভাব বর্তমান। যেমন—বিখ্যাত 'মজার মুল্লুক' কবিতার—"এক যে আছে মজার দেশ সব রকমে ভালো/রাত্তিরেতে বেজায় রোদ দিনে চাঁদের আলো।—ইত্যাদি ছড়া।"

যোগীন্দ্রনাথ সরকার মৌখিক ছড়ার সংগ্রাহক এবং সাহিতিক ছড়ার রচয়িতা দুই-ই ছিলেন। আর ফলে তাঁর সংগ্রহে এবং রচনায় অনেক সময় একাকার হয়ে গিয়েছে। উদ্ভট বা আবোল তাবোল ছড়া রচনায় সুকুমার রায় যে আদর্শ সৃষ্টি করেছেন তা আজও অদ্বিতীয় হয়ে আছে—"কান করে কট্‌কট্‌, ফোড়া করে টনটন/ওরে রামা ছুটে আয়, নিয়ে আয় লণ্ঠন।" ভাষার কথারীতিকে আশ্রয় করে লৌকিক ছড়াগুলি তাদের দ্রুততা ও শ্বাসাঘাতকে মূর্ত করে তোলে, আবার জীবনের সঙ্গে সংগতি রেখে তা সহজে পাল্টেও যায়। সাহিত্যিক ছড়ায় কবিগণ কথ্যভাষাকে অবলম্বন করলেও তা অনেক ক্ষেত্রে পরিশীলিত ও মার্জিত বলে মনে হয়। আধুনিক সভ্যতার প্রভাবে লৌকিক ছড়ার গ্রাম্যভাব সাহিত্যিক ছড়াতে শিষ্টভাবের একটা আবেশ সৃষ্টি করে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিক থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত বাংলা লিখিত ছড়ার সৃষ্টিকর্তাদের মননে অনিবার্যভাবে যে সমাজ ও রাজনৈতিক সচেতনার প্রভাব বিদ্যমান তা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হওয়া তাঁদের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই তাঁরা জাতীয় ঐতিহ্যে ও সংস্কারের লৌকিক ধারাকে শ্রদ্ধার সঙ্গো স্মরণ করেও সাহিত্যিক ছড়ার ব্যঙ্গ, বিদ্রুপের কটুরস মিশিয়ে সমাজের কথা, রাজনীতির কথা শ্বাসাঘাত প্রধান ছন্দের মাত্রা ও পরের ভাঙা গড়ার পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে পরিবেশন করে চলেছেন। এমনিভাবে সাহিত্যিক ছড়া হয়তো অতীত আর ভবিষ্যতের মধ্যে যোগসূত্র রচনায় প্রয়াসী হয়। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের একটি ছড়ার কয়েকটি পঙ্‌ক্তির উল্লেখ করে দেখানো যায় কীভাবে তিনি রাজতন্ত্রের রূপান্তরের অনিবার্য রাজনৈতিক সচেতনতাকে বিদ্রূপ সহকারে পরিবেশন করেছেন—

এক যে ছিল রাজা
রাজত্বটা মস্ত,
উঠতে বললে উঠত লোকে
বসতে বললে বসত।
একদিন সেই রাজার
রাজ্য গেল উলটে,
শূলে চড়ার আগেই রাজা
গেলেন পটল তুলতে।...
সিংহাসনে চোখ পড়তেই
ওঠে সবাই আঁতকে,
রাজা না থাক, কিন্তু রাজার
গোঁফ যে আছে আটকে। (এক যে ছিল)

সামগ্রিক আলোচনায় এই তথ্যটি স্পষ্ট যে, লোকছড়ার প্রধান গুণ অপরিসীম শোষণ শক্তি। হালকা চালে দ্রুততার সঙ্গো ছড়াগুলি উচ্চারিত হলেও এদের পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা অসাধারণ। অসংলগ্ন আপাত অর্থহীনতার মধ্যে থেকেও একদিকে যেমন লোকমনের রসের খোরাক জোগায়, কল্পনার দ্বারা মনের মাটিকে উর্বর করে তেমনই খণ্ড বিক্ষিপ্ত তথ্য পরিবেশনের মাধ্যমে লোকসমাজের বিশ্বস্ত দলিল হয়ে ওঠে।

‘ঘুমপাড়ানি ছড়া’ থেকে ‘ঘুমতাড়ানী ছড়া’ : বাংলা ছড়ার বিবর্তনের ইতিহাস

অলোকদ্যুতি নন্দী

মৌখিক সাহিত্যের আদি উৎস কখনই নিরূপণ করা সম্ভবপর নয়। তাই ছড়ার উদ্ভবকাল সুনির্দিষ্টভাবে বলা যায় না। লোকসাহিত্য যেহেতু গোষ্ঠীগত রচনা, তাই ছড়ার আদি স্রষ্টাও অজ্ঞাত। পাশাপাশি বহু লোকজ ছড়ার রচনাকারের নামের হদিশও মেলে না। কিন্তু যা সমষ্টির সম্পদ, তার ব্যক্তি-স্রষ্টার পরিচয় গৌণ হওয়াটাই স্বাভাবিক। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যই প্রণিধানযোগ্য—“কোনওটির কোনও কালে কোনও রচয়িতা ছিল বলিয়া পরিচয় মাত্র নাই এবং কোন শকের কোন তারিখে কোনটা রচিত হইয়াছিল এমন প্রশ্নও কাহারও মনে উদয় হয় না।”[১] সেই প্রাচীন যুগ থেকে লোকের মুখে মুখে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে বহমান লৌকিক ছড়া। খেয়াল রাখতে হবে যে, বাংলা সাহিত্যে আমরা যাকে ‘অন্ধকার যুগ’ বলে চিহ্নিত করে থাকি অর্থাৎ সাহিত্যের বিস্তীর্ণ প্রান্তর তখন যে বন্ধ্যাভূমিতে পরিণত হয়েছিল, একথা সর্বৈব সত্য নয়। কারণ লোকসাহিত্যের ধারা কখনও থেমে থাকবার নয়। আসলে এই সময়পর্বে কৃষ্ণধামালির পাশাপাশি ছড়ার ধারাটিও যে নিরবচ্ছিন্নভাবে সচল ছিল, একথা সহজেই অনুমান করা যায়।

মধ্যযুগের সাহিত্যের মধ্যে মঙ্গলকাব্যের কয়েকটি পরিসরে কিন্তু ছড়া স্থান করে নিয়েছিল। যেমন ষোড়শ শতাব্দীতে রচিত কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে প্রথম লিখিত আকারে ঘুমপাড়ানি ছড়ার খোঁজ পাওয়া যায়, এমনটাই মন্তব্য করেছেন বিদগ্ধ পণ্ডিত আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয় তাঁর ‘বাংলা লোকসাহিত্য’ গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে। ছড়াটি হল নিম্নরূপ—“আয় আয়রে বাছা আয়।/কি লাগিয়া কান্দ বাছা, কি ধন চায়॥/তুলিয়া আনিব গগন-ফুল।/একেক ফুলের লক্ষেক মূল॥.../শ্রীমন্ত চাপে মোর সোনার নায়।/কুঙ্কুম কস্তুরী মাখাব গায়॥/কাটে নিদ্রা যাবে চামরের বায়।/অম্বিকা-মঙ্গাল মুকুন্দে গায়॥”[২]

মধ্যযুগ ধর্মবিশ্বাস-সংস্কার-অলৌকিকতায় যেভাবে আচ্ছন্ন ছিল, সেখানে স্বাভাবিক নিয়মেই সেই সময় যাদু-সম্পৃক্ত ছড়া গড়ে উঠেছিল। তবে তা শুধু মৌখিক স্তরেই সীমিত ছিল না। ঘুমপাড়ানি ছড়ার পাশাপাশি মধ্যযুগের সাহিত্যে ঐন্দ্রজালিক ছড়া উঠে আসতে দেখা যায় মনসামঙ্গল ও ধর্মমঙ্গল কাব্যের অবয়বে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে জীবন মৈত্রের ‘মনসামঙ্গল’ কাব্যে যে সাপে কামড়ের মন্ত্রটি শোনা যায়, সেটি এই যাদু-সম্পৃক্ত ছড়ার সার্থক উদাহরণ—“দোহাই ধর্মের বিষ পাঞ্জরে মিলাও।/হাড়ি-ঝীর আজকে আর সিদ্ধিগুরু পাও॥/অনাদ্যের দোহাই বিষ ক্ষয় হইয়া যাও।/ধর্মে দিলা তৈল ঈশ্বর জ্বালে বাতি॥/সিবের

হুঙ্কারে বিষ ঘটে হৈলা স্থিতি।"[৩] ঘনরাম চক্রবর্তীর 'ধর্মমঙ্গল' কাব্যের অন্তর্গত যাদু-বিশ্বাসের ছড়াটি ছিল এইরূপ—"জাগ্ জাগ্ জাগ্ মাটি কাজে লাগ মোর।/আগম জখিনা তন্ত্রে মন্ত্রে পড়ে মাটি।/বালিকা দেবীর আজ্ঞা লাগ্‌রে নিদুটি॥"[৪] সাহিত্যের সঙ্গে মধ্যযুগীয় বাংলা কাব্যসংগীতের ধারা অর্থাৎ কবিগান, তরজা, পাঁচালির একটি নিবিড় যোগ ছিল। পালার আসরে ছড়া বাঁধা বা রচনা করা এইসব সংগীত-সাহিত্যের বিশেষ দিক ছিল। বাদানুবাদের জন্য এ ছিল এক জনপ্রিয় ও বহুল প্রচলিত সাহিত্যিক অস্ত্র। এই ছড়া যেমন বাদানুবাদের সময় তাৎক্ষণিক প্রয়োজনে আসরেই বাঁধা হত, আবার সেগুলি পূর্ব থেকেই রচিত হতে পারত। তাই তরজাকারদের আগে থেকে লিখিত ছড়া আসরে নিয়ে আসবার সম্ভাবনা থেকে যায়। দৈনন্দিন জীবনের সাধারণ কথাবার্তায়, গানের ও সাহিত্যের আসরেও ছড়া ব্যবহৃত হত। আর এক্ষেত্রে নারী-পুরুষের কোনো ভেদ রক্ষিত হত না।

বাংলা ছড়াচর্চার ইতিহাসে উইলিয়াম কেরী প্রণীত 'ইতিহাসমালা' গ্রন্থটির বিশেষ ভূমিকা আছে। ১৮১২ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত এই গ্রন্থে সংকলিত—"মাছ আনিলা ছয় গণ্ডা/চিলে নিলে দুই গন্ডা।"[৫] ছড়াটিকে প্রথম সংকলিত ছড়ার মর্যাদা দেওয়া হয়। তবে এ কথা অনস্বীকার্য যে, বাংলা ছড়াচর্চার যথার্থ সূত্রপাত রবীন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করেই ঘটেছিল।

উনবিংশ শতাব্দীর পত্রপত্রিকায় বেশ কিছু মেয়েলি ব্রতের ছড়া উঠে আসতে দেখা যায়। 'নব্যভারত' পত্রিকার ১২৯১ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ সংখ্যায় (২য় খণ্ড, ৮ম সংখ্যা) 'সুন্দরবনের প্রজা' শীর্ষক রচনার 'দ্বিতীয় প্রস্তাবে' দেখানো হয়েছে, আশ্বিন মাসের শেষ দিনে সুন্দরবন অঞ্চলের কৃষিজীবী মানুষ ধান ক্ষেতে উপস্থিত হয়ে কীভাবে গাছকে লক্ষ্মী জ্ঞানে তার গর্ভে থোড় দেখে সাধ দেয়। এই প্রসঙ্গে যুবক ও বৃদ্ধদের সোলার ফুল, চালের গুঁড়ো এবং নল দিয়ে ধানের ক্ষেতের চতুর্দিকে ঘুরে ঘুরে চালের গুঁড়ো ছড়ানোর সময় বলা যে ছড়াটির অবতারণা করা হয়েছে, সেটি হল—"আশ্বিন যায় কার্তিক আ'সে,/মা নক্ষ্মী (লক্ষ্মী) গভ্‌ভে বসে,/ সাধ খাও বর দ্যাও—হে—/অপরের ধন নটী পটী,/আমার ধন বায়ান্ন পটী/মা নক্ষ্মী সাধ খাও—হে—"[৬] এখানে বলা হয়েছে যে, বালকরা এক একখানি কুলো এবং একটি করে লাঠি নিয়ে ছড়া কাটে। আবার অনেক সময় ছোটো ছোটো মেয়েরাও কুলো বাজায় আর ছড়া কাটে এইভাবে—"এ বাড়ীর পোকোড় মাকোড় আর বাড়ী যা/শুয়োল শেল মারে খায়ে দু-উর-হ।।[৭] এই বিশ্বাসের ফলে নাকি মশা-মাছির উপদ্রব কমে। তবে এখানে উল্লেখ্য যে, সুন্দরবন বলতে এখানে দক্ষিণ ২৪ পরগনার অন্তর্গত সুন্দরবনকে বোঝানো হয়নি, এই সুন্দরবন বলতে খুলনা জেলার সাতক্ষিরা ও খুলনা সাবডিভিশনের অন্তর্গত সুন্দরবনকে বোঝানো হয়েছে। সাধনা পত্রিকার ১৩০১ বঙ্গাব্দের মাঘ সংখ্যায় 'পৌষ সংক্রান্তি' শীর্ষক রচনায় কয়েকটি ছড়া উল্লেখ করা হয়েছিল। যেমন, পুকুর পূজা করার ছড়া, পৌষ সংক্রান্তির দিন 'পোষলা' করার জন্য ভিক্ষা গ্রহণের ছড়া প্রভৃতি। পুকুর পুজোর ছড়াটি ছিল এইরূপ—"হেলঞ্চ কল্‌মি লক্ লক্ করে—/তার উপরে পক্ষী চরে/রাজার বেটা পক্ষী মারে।"[৮] 'পোষলা' করার জন্য ভিক্ষা গ্রহণের ছড়াটি হলো—"যে দেবে ডালা ডালা/তার হবে সাত গোলা,/যে দেবে বাটা বাটা/তার হবে সাত বেটা/যে দেবে বাটি বাটি/ তার হবে সাত বেটি, /যে দেবে মুটো মুটো/তার হবে হাত ঠুঁটো।"[৯] বলাবাহুল্য যে, পরিবর্তিত সামাজিক অবস্থায় এই ছড়া এখন আবৃত্তি করলে ভিক্ষা লাভের কোনও সম্ভাবনাই থাকবে না। কারণ এযুগের

পারিবারিক ব্যবস্থায় ঢুকে পড়েছে জন্মনিয়ন্ত্রণ প্রসঙ্গ। তাই আজকের নরনারীদের অধিকাংশই কখনও যেচে এত সন্তানের জনক-জননী হতে চাইবে না। 'সাধনা' পত্রিকার এই সংখ্যায় পৌষ সংক্রান্তিতে আবৃত্তি করা একটি ছড়াও উল্লেখিত হয়েছে, যেখানে পৌষ মাসকে দীর্ঘস্থায়ী হওয়ার জন্যে আহ্বান জানিয়েছে দরিদ্র-সাধারণ মানুষ। কারণ পৌষ মাসে ঘরে ফসল উঠলে কৃষক ও অভাবী মানুষদের দুরবস্থা কিছুটা দূরীভূত হবে। ছড়াটি এইরূপ—"পৌষ মাস লক্ষ্মী মাস যেওনা/ভাতের হাঁড়িতে থাক পৌষ যেওনা/পোয়াল গাদায় থাক পৌষ যেওনা/পৌষ মাস লক্ষ্মী মাস যেওনা।"[১০] এইসময়েই সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার ১৩০১ সনের মাঘ সংখ্যায় রজনীকান্ত গুপ্তের হেঁচড়া পুজো সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে হেঁচড়া পুজোর একটি ছড়ার উল্লেখ পাওয়া যায়—"হেঁচড়া ঠাকরুণ লো ফ্যাঁচোড়া চুল।/তাতে কি শোভে লো গাঁদা ফুল।।/গাঁদা ফুলের দিলাম বিয়া/পাড়া পড়সী লো জয় জোকর দিয়া।।/জয় দিব না লো জোকার দিব।/সোনার যাদুধন কোলে তুলে নেব।।"[১১]

বাংলা সাহিত্যে শিশুভোলানো লোকছড়াকে রবীন্দ্রনাথই প্রথম কৌলিন্য প্রদান করেছিলেন। কিন্তু বাংলার এই জাতীয় ঐতিহ্যের অবহেলায়-অনাদরে ক্রমশ বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে যাওয়া দেখে তিনি যথেষ্ট বিচলিত হয়েছিলেন। ছড়ার অপরিসীম গুরুত্ব উপলব্ধি করে তিনি সর্বপ্রথম এগুলির সংগ্রহ ও সংরক্ষণকার্যে উদ্যোগী হলেন। শুধু একাই নন, একাজে তিনি আত্মীয়-পরিজন-বন্ধুবান্ধব এমনকি বাড়ির দাসীদেরও সাহায্য পেয়েছিলেন। তাঁর পাশাপাশি অবনীন্দ্রনাথও ছড়া সংগ্রহকার্যে এগিয়ে আসেন। সেই সময় রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ছড়ার ভিন্ন তাৎপর্য বিষয়ে তৎকালীন বিদ্বজ্জনদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছিলেন।

বাংলা ছড়াগ্রন্থ রচনায় প্রথম পথিকৃৎ হয়ে রয়েছেন শ্রী আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। ১৩০২ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত 'ছেলে ভুলানো ছড়া' গ্রন্থটিকে বাংলার প্রথম সংকলিত ছড়াগ্রন্থের মর্যাদা দিতে হয়। ছড়াসংগ্রহের ধারায় ১৩০৬ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত যোগীন্দ্রনাথ সরকারের 'খুকুমণির ছড়া' গ্রন্থটিরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। এই গ্রন্থের উজ্জ্বল ভূমিকাটি লিখেছিলেন রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী। এই ভূমিকাতেই 'শিশুসাহিত্য' শব্দটি বাংলা ভাষায় সর্বপ্রথম ব্যবহৃত হয়। এখানে প্রকাশিত একটি ছড়া হল—"ঘোড়ায় নাকি পাড়ে না ডিম/ওই দেখ তার বাসা/ডিমের উপর বসে ঘোড়া/তা দিচ্ছে খাসা।"[১২]

১৩০১ বঙ্গাব্দে 'সাধনা' পত্রিকার আশ্বিন-কার্তিক সংখ্যায় সর্বপ্রথম রবীন্দ্রনাথের 'মেয়েলি ছড়া' নামক প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়, যেটি পরবর্তীকালে ১৩১৪ বঙ্গাব্দে (১৯০৭ খ্রি.) পরিমার্জিত হয়ে 'ছেলেভুলানো ছড়া' নামে 'লোকসাহিত্য' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়। মাঘ ১৩০১ ও কার্তিক ১৩০২ বঙ্গাব্দের সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ছেলেভুলানো ছড়া' : ২ শীর্ষক আরেকটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এটি ১৩৪৫ বঙ্গাব্দে 'লোকসাহিত্য' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়। 'ছেলেভুলানো ছড়া' : ২ প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বতন্ত্রভাবে তাঁর সংগৃহীত সর্বমোট ৮১টি ছড়াকে 'ছড়াসংগ্রহ' শিরোনামে মুদ্রণ করেন। এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নারীর শিশু-পরিচর্যার কাজকে অনায়াসসাধ্য করে তোলার জন্য ছড়াকে মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করার কথা বললেন। ঘুমপাড়ানি ছড়া শুনতে শুনতে শিশুর বাহ্যচেতনা লোপ পায়। সব চাঞ্চল্য স্তব্ধ হয়ে এলে শিশু ঘুমের দেশে স্বপ্নের রাজ্যে পাড়ি দেয় এবং জননীও নিশ্চিন্ত হন। তবে এই প্রবন্ধের একটি বিশেষ দিক হল এখানে রবীন্দ্রনাথ ছড়াগুলিকে 'বাল্যকালের

মেঘদূত'[১৩] ও 'মানসিক মেঘরাজ্যের লীলা'[১৪] হিসেবে অভিহিত করেছেন। তিনি জানিয়েছেন—

> আমি ছড়াকে মেঘের সহিত তুলনা করিয়াছি। উভয়েই পরিবর্তনশীল বিবিধবর্ণে রঞ্জিত, বায়ুস্রোতে যদৃচ্ছাভাসমান। দেখিয়া মনে হয় নিরর্থক। ছড়াও কলাবিচার শাস্ত্রের বাহির, মেঘবিজ্ঞানও শাস্ত্রনিয়মের মধ্যে ভালো করিয়া ধরা দেয় নাই।...[১৫]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছড়াকে সংজ্ঞায়িত করেছেন "অসংগত অর্থহীন যদৃচ্ছাকৃত শ্লোক"[১৬] হিসেবে। তিনি ছড়ার মধ্যে চিত্রধর্মীতাকে আবিষ্কার করেছিলেন। তাঁর বিশ্লেষণী দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে পরোক্ষভাবে লোকসংস্কৃতি বিজ্ঞানের তাত্ত্বিক ভাবনার অনুসূত্র ফুটে উঠতে দেখা যায়।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ছেলে-ভুলানো ছড়া' শীর্ষক প্রবন্ধটিও সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এটি ১৩৩০ বঙ্গাব্দের 'ভারতী' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধে তিনি অতীত-বর্তমানের কালগত ভেদরেখা মুছে ফেলে এক শাশ্বত আবহমান কালের প্রেক্ষাপটে মায়ের ঘুমপাড়ানি ছড়ার মধ্য দিয়ে জাতির সামগ্রিক চেতনার পূর্ণ অবয়বটি প্রত্যক্ষ করতে চেয়েছেন। তাঁর কথায়—"এই ছড়াগুলির মধ্যে দিয়ে অতীতকালের জগৎটি একালে ধরা দেয় আমাদের মায়ের চোখের মধ্যে দিয়ে।... পুরো ছবি, ছেঁড়া ছবি, পুরো সুর, ভাঙা সুর।"[১৭]

পরবর্তীকালে, রবীন্দ্রনাথের পদাঙ্ক অনুসরণ করে আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, বসন্তরঞ্জন রায়, ড. বিজনবিহারী ভট্টাচার্য, আশুতোষ ভট্টাচার্য, ভবতারণ দত্ত প্রমুখ অনেকেই ছড়ার সংকলিত গ্রন্থ প্রকাশে উজ্জ্বল ভূমিকা গ্রহণ করেন। এছাড়া বিদ্যায়তনিক চর্চার দৃষ্টিকোণ থেকে বিদগ্ধজনেরা ছড়াচর্চায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন যাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্যরা হলেন আশুতোষ ভট্টাচার্য, নির্মলেন্দু ভৌমিক, দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার; ওপার বাংলার ওয়াকিল আহমেদ, আব্দুল করিম, মোহাম্মদ এনামুল হক প্রমুখ। বাংলা ছড়া চর্চার ক্ষেত্রে মহিলাদেরও অপরিসীম অবদানের কথা জানা যায়। এঁরা বাংলার মেয়েলি ব্রতের ছড়া সংকলন করেছেন, যদিও তাঁদের অবিশ্রিত ছড়ার কোনও সংকলন গ্রন্থ প্রকাশিত হয়নি। কিন্তু ছড়া সম্পর্কিত বেশ কয়েকটি প্রবন্ধ রচনার কৃতিত্ব তাঁরা দেখিয়েছেন। বিভিন্ন মেয়েলি ব্রতের বিবরণ দান প্রসঙ্গে তাঁরা সেখানে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ছড়া উল্লেখ করেছেন। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্যরা হলেন, শতদলবাসিনী বিশ্বাস জায়া, রেণুকাবালা দাসী, নিরুপমা দেবী প্রমুখ। তবে এঁরা কেউই ছেলে-মেয়েদের উদ্দেশ্যে রচিত শিশুভোলানো ছড়ার আলোচনায় আগ্রহ প্রকাশ করেননি।

ছড়া যে শুধুমাত্র শিশুমনোরঞ্জনের সামগ্রীই নয়, বরং তা বড়দের আস্বাদনযোগ্য বিষয়ও ধারণ করতে সক্ষম, তা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরই প্রথম আমাদের সামনে উন্মোচন করলেন। দৈনন্দিন যাপিত সমাজজীবনের নানা চালচিত্র ছড়ার হালকা অবয়বে অনিবার্যরূপেই চলে এসেছে। সাহিত্যের অন্যান্য প্রকরণের মতোই ছড়াও সমাজবাস্তবতার দলিল হয়ে উঠতে পারে আর এখানেই তার গুরুত্ব ও তাৎপর্য নিহিত। ঘুমপাড়ানি ছড়ার পাশাপাশি তাই পরবর্তীকালে যুগের প্রয়োজনে অনিবার্যভাবেই সৃষ্টি হয়েছে 'ঘুম তাড়ানী ছড়া' নামক আরেকটি নতুন ধারা। এই ধারার ছড়ার প্রবর্তন হয় শিশু-কিশোরদের দেশের প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে সচেতন করার উদ্দেশ্য নিয়ে। সুকান্ত ভট্টাচার্য, বিষ্ণু দে, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় ও জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র কতগুলি ছড়া রচনা করে সেগুলি সংকলিত করে 'ঘুম তাড়ানী ছড়া' নামে একখানি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করেন। পরবর্তীকালে ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দে তপন চক্রবর্তী রচিত 'ঘুম তাড়ানী ছড়া' নামক একটি গ্রন্থও আমাদের হাতে আসে। সেখানে ছড়ায় ছড়ায় শোনা যায়, নিরক্ষরতা ও শিশুশ্রমের

ভয়াল অভিশাপে যন্ত্রণাদগ্ধ শৈশবের আর্তক্রন্দন। যেমন—"ছেলেটার নাম ভোলা,/পিলেতে পেট ফোলা।/হাড় জিরজির দেহ,/করে না আদর কেহ।/সেই ছেলেটা হাটে,/ফাই ফরমাশ খাটে,/পড়তে যদি চায়,/কানমলাটি খায়।"[১৮] এরই পাশাপাশি সেখানে বৈষম্যহীন সমাজের একটাই যে ধর্ম, অর্থাৎ 'মানবধর্ম'—এই মূল্যবোধের পাঠদানও দেওয়া হচ্ছে—"মানুষের মাঝে কোনো/ভেদাভেদ নাইরে,/সাদা কালো ছোট বড়/সব এক ভাইরে।"[১৯] বলাই বাহুল্য এইসব ছড়ার সুর ও কথায় খোকার চোখের তন্দ্রা ছুটে যায়। আসলে এর মধ্য দিয়ে শিশুকে শৈশবের ঊষালগ্ন থেকেই সামাজিক বিষয়ে সচেতন করে তোলার আগাম প্রস্তুতি দেখা যাচ্ছে। কারণ এদের ওপরই নির্ভর করছে জাতির ভবিষ্যৎ। তাই সমাজগঠনে এ হেন প্রক্রিয়া নিঃসন্দেহে অপরিসীম গুরুত্বের দাবি রাখে।

তবে ঘুমতাড়ানী ছড়ার বীজ কিন্তু লুকিয়ে ছিল ঘুমপাড়ানি ছড়ার অবয়বেই। সেই মধ্যযুগেই ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল কাব্য'-এ আমরা দেখতে পাই, খেলতে খেলতেই উমার বিয়ে হয়ে যাওয়ার প্রসঙ্গ। তৎকালীন সমাজে এইভাবে বিয়ে-সংসার এসব কী বস্তু, সেটা বোঝার মতো পরিণত হওয়ার আগেই বালিকা কন্যাদের শ্বশুরবাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে। বাল্যবিবাহের এই অনুষঙ্গটি ছড়ার দর্পণে বারেবারে প্রতিফলিত হয়েছে। যেমন—"দোল দোল দুলুনি রাঙা মাথায় চিরুণি,/বর আসবে এক্ষুণি নিয়ে যাবে তক্ষুণি।"[২০] কিংবা আমাদের অতি পরিচিত সেই বাস্তবমুখী ছড়াটি—"যমুনাবতী সরস্বতী কাল যমুনার বিয়ে,/যমুনা যাবে শ্বশুরবাড়ী কাজিতলা দিয়ে।"[২১] তৎকালীন সমাজের কাছে একটি ভয়ংকর অভিশাপস্বরূপ ছিল 'গৌরীদানপ্রথা' ও 'কৌলিন্যপ্রথা'। ঘরের বালিকা কন্যাকে বৃদ্ধ কুলীন ব্রাহ্মণের হাতে সমর্পণের সামাজিক চিত্রটি যুগ যুগ ধরে সত্য। নিম্নোক্ত ছড়াটিতে আমরা সেই ছবিই ফুটে উঠতে দেখবো, যেখানে বালিকাবধূ খুড়োর ওপর দুর্জয় অভিমানে শাপ-শাপান্তর করে চলেছে। এর পিছনে আমাদের সমাজ-ইতিহাসের অনেকগুলি পাতা অশ্রুসিক্ত হয়ে আছে—

> অন্নপূর্ণা দুধের সর।/কাল যাব মা পরের ঘর।।/পরের বেটা মারবে চড়/কাঁদতে কাঁদতে খুড়োর ঘর/খুঁড়ো দিল বুড়ো বর,/হেই বুড়ো তুই ডুবে মর।[২২]

একদিকে কুমারী কন্যার অল্প বয়সে শ্বশুরবাড়ি গিয়ে ঘর-সংসার করার বাস্তব চিত্রটি যেমন ছড়ায় উঠে আসছে, অপরদিকে বালক-কিশোরদের এই বয়সে বীরত্ব প্রকাশ করার বাস্তব রূপটি ছড়ায় স্থান করে নিচ্ছে—"চি মারুম শিকলের গোটা,/হাতি মারুম মোটা মোটা।"[২৩] গ্রামবাংলার সাধারণ অনাড়ম্বর জীবন থেকে চিত্রকল্প উঠে এসেছে ছড়ার কায়ায়, তাই গামছা মাথায় দিয়ে রাখালের গরু চরানোর পরিচিত চিত্রটিও ছড়ার উপজীব্য হয়ে ওঠে—"এক যে রাখাল গোরু চরায় গামছা মাথায় দিয়ে/তার মাকে ধরে নিয়ে গেল বুড়ো বাঁদরে।/মাসি কাঁদে পিসি কাঁদে চালে আছে ঝিঙে/পুঁটি মাছটা গীত গায় নেউলে বাজায় শিঙে।"[২৪] এখানে মাসি-পিসির কান্নার সঙ্গে ঝিঙের অসংগতি ছড়াটিকে উৎকর্ষ দান করেছে। তবে এই ছড়ার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, ভারতীয় রসশাস্ত্রের অন্তর্গত যে নবরসের ধারণা রয়েছে, তার বেশ কয়েকটি এর মধ্যে পরিস্ফুট হয়েছে। যেমন—

১. গামছা মাথায় দিয়ে রাখালের গোরু চরানো = শান্ত রস

২. বুড়ো বাঁদরে মাকে ধরে নিয়ে যাওয়া = বীর রস ও ভয়ানক রস

৩. মাসি-পিসির কান্না = করুণ রস

৪. পুঁটি মাছের গান গাওয়া = অদ্ভুত রস

৫. নেউলের শিঙে বাজানো = হাস্য রস

আমরা জানি যে, বাঁকুড়া জেলায় বর্গীর হাঙ্গামা একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। ১৭৪২-১৭৫১ সময়পর্বে বর্গীর আক্রমণের সময় বাংলার মানুষ ভয়ংকর অত্যাচার ও লুঠতরাজের সম্মুখীন হয়েছিল। সাধারণ মানুষের ধন যথাসর্বস্ব লুঠ করে তারা মানুষকে সর্বস্বান্ত করে ছেড়েছিল। ফলত, তারা জমিদারের খাজনা মেটাতে অক্ষম হয়ে পড়েছিল। তাই এই ভয়ংকর বর্গীদের কথা কানে এলেই শিশু কান্না ভুলে মায়ের কোলে নিরাপদ আশ্রয় খোঁজে। এইভাবে ঘুমপাড়ানি ছড়ায় অনায়াসেই উঠে আসে সমাজ-ইতিহাসের বাস্তব চিত্র। ১৩০২ বঙ্গাব্দে বাঁকুড়া জেলার বেলেতোড় গ্রাম থেকে সংগৃহীত এই ছড়াটির সঙ্গে আমরা সকলেই ছোটো থেকে চিরপরিচিত—"ছেলে ঘুমাল পাড়া জুড়াল বর্গী এলো দেশে।/বুল্‌বুলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দেবো কিসে॥"[২৫] এই ছড়াটিই চট্টগ্রাম অঞ্চলে পাওয়া যায় একটু ভিন্ন রূপে—"মনি ঘুমাইল পাড়া জুড়াইল গরকী আইল দেশে।/গুলগুলিতে ধান খাইয়াছে খাজনা দিব কিসে॥"[২৬] আসলে ভৌগোলিক অবস্থান অনুযায়ী ছড়াটিতে চিত্রকল্প এসেছে এবং তার আঞ্চলিক প্রভাবে ভাষাতাত্ত্বিক পরিবর্তন ঘটেছে। তাই 'বর্গী' হয়ে গেছে 'গরকী', 'বুলবুলি' হয়েছে 'গুলগুলি'। 'গরকী' কথার অর্থ হল 'সামুদ্রিক ঝড়'। চট্টগ্রামের মানুষের এই সামুদ্রিক ঝড়ের দাপটে জনজীবন বিপর্যস্ত হওয়ার অতীত অভিজ্ঞতা রয়েছে, তা থেকেই ছড়ায় 'গরকী' শব্দটি অনায়াসে স্থান করে নিয়েছে।

বর্গীর আক্রমণের পাশাপাশি মধ্যযুগের অগ্র ও পার্শ্ববর্তী ডোমসেনার স্মৃতিও বাংলার মানুষের মনে সক্রিয় হয়ে আছে। সেই কথা অনায়াসে উঠে আসে আমাদের চিরচেনা এই ছড়াটির অবয়বে—"আগডুম বাগডুম ঘোড়াডুম সাজে/ঢাক মৃদং ঝাঁঝর বাজে।"[২৭] আমরা কম বেশি সকলেই ছোট থেকে 'এলাটিং বেলাটিং' ছড়াটির সঙ্গে সুপরিচিত। কিন্তু যদি আমরা এর পঙ্‌ক্তিগুলি ভালোভাবে খেয়াল করি, তাহলে বুঝতে পারবো এর মধ্যেও সমাজ-ইতিহাসের প্রচ্ছন্ন ছায়া লুকিয়ে রয়েছে—"এলাটিং বেলাটিং তেলাটিং সই লো/একটি খবর আইলো/কিসের খবর আইলো/রাজা একটি বালিকা চাইলো/কোন্ বালিকা চাইলো/অমুক বালিকা চাইলো।"[২৮]

উপরিউক্ত ছড়াটিতে রাজার একটি বালিকা চাওয়ার মধ্যেই সমাজ-ইতিহাসের সূত্রটি নিহিত আছে। এখানে 'রাজা' অর্থাৎ সমাজের প্রতিপত্তিশালী মানুষেরা, যারা নিজেদের ইচ্ছেমতো সাধারণ ঘরের যে কোনও বালিকাকে তুলে নিয়ে যাওয়ার জন্যে খবর পাঠাত বা পাইক পাঠানোর বন্দোবস্ত করত। এই নির্মম ছবিটিই এই ছড়ার আধারে বিধৃত হয়ে আছে। শিশুদের খেলার ছড়াতেও সমাজবাস্তবতার অনুষঙ্গ ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। যেমন—"ইকড়ি মিকড়ি চাম চিকড়ি/চামে কাটা মজুমদার/ধেয়ে এল দামুদর।"[২৯]—এই ছড়ায় ভয়ংকর দামোদরের সর্বগ্রাসী প্লাবনের ইতিহাস ধরা আছে। যদিও আধুনিককালের উন্নত প্রযুক্তিবিজ্ঞানের যুগে এখনকার মানুষের পক্ষে দামোদরের সেই ভয়ংকরতাকে উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। তবু কালের গতিকে উপেক্ষা করে দামোদর নদের এই আগ্রাসী চরিত্র ছড়ার ওপর ভর করে বয়ে চলবে কাল থেকে কালান্তরে। আধুনিক যুগের নবজাগরণের অন্যতম ফসল হল নগরসভ্যতা। লৌকিক ছড়ায় শহর কলকাতার নাগরিক জীবনযাপনের বিবিধ অনুষঙ্গের অবতারণা অনেককাল থেকেই হয়ে এসেছে। বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'কলকাতা প্রসঙ্গে

: ছড়া-গান-কবিতা' গ্রন্থে সেইরকমই কিছু ছড়ার হদিশ দিয়েছেন, যেমন—'ভাটের গান বা ছড়া', 'ঘেঁটুর ছড়া', 'বাঘনাচের ছড়া' 'লেটোর ছড়া' প্রভৃতি। সময়ের অগ্রগতির সঙ্গো সঙ্গো বাংলা ছড়া কেবলমাত্র লোকায়ত মানুষের সৃষ্টিতেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। নাগরিক সমাজের সৃষ্টিশীলতায় ছড়া অন্যতম উপজীব্য হয়ে উঠেছে। বহু কবি-প্রাবন্ধিক-লেখক ছড়াসাহিত্যে তাঁদের হাত পাকানোর জন্য কলম ধরেছেন। এরই পাশাপাশি কিছু মানুষ শুধু ছড়াসাহিত্যেই আজীবন তাঁদের সাধনা চালিয়ে গেছেন। এভাবে শুধু ছড়া লিখেই বিখ্যাত হয়েছেন অসংখ্য মানুষ।

বাংলা ছড়াসাহিত্যের বিবর্তনের ধারার দিকে ভালোভাবে খেয়াল করলে দেখা যায় যে, নানা বৈচিত্র্যের মিশেলে ছড়ার মধ্যে ক্রমশ বহুমুখী প্রবণতা ফুটে উঠেছে। ছড়ার সাধকেরা কখনও ছড়ার লৌকিক রূপটিকেই অবলম্বন করে থেকেছেন, আবার অনেকেই সচেতনভাবে তার থেকে বেরিয়ে এসে তাঁদের ছড়ায় নিয়ে এসেছেন নাগরিক পরিশীলিত ও পরিমার্জিত রূপ। সেক্ষেত্রে ছড়ার ভাষাতেও বদল লক্ষ করা হয়েছে, যুগের প্রেক্ষিতে ছড়ার ভাষায় শহুরে আধুনিকতার ছোঁয়া লেগেছে। ছড়ার বিষয় ভাবনাতেও বৈচিত্র্যের পাশাপাশি অনেক বাস্তবমুখী ও জীবনমুখী অনুষঙ্গ উঠে এসেছে। এছাড়া আঙ্গিক নির্মাণেও যেমন এসেছে অভিনবত্ব, ছন্দনির্মাণ নিয়েও চলেছে নানান পরীক্ষা-নিরীক্ষা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত ছড়া সম্পর্কিত তিনটি গ্রন্থ হলো—'খাপছাড়া', 'ছড়ার ছবি' ও 'ছড়া'। তিনি লোকায়ত ছড়ার জগৎ থেকে বেরিয়ে আসতে চেয়েছেন, তাই সেখানে চিরচেনা লৌকিক সুরটি অনুপস্থিত। পরিবর্তে সেখানে নিয়ে এলেন নাগরিক মনের উজ্জ্বল প্রকাশ। উদাহরণস্বরূপ তাঁর "খাপছাড়া" গ্রন্থের অন্তর্গত "দামোদর শেঠ" ছড়াটি দেখানো যেতে পারে—"অল্পেতে খুশি হবে দামোদর শেঠ কি/মুড়কির মোওয়া চাই, চাই ভাজা ভেটকি।/আনবে কটকি জুতো, মটকিতে ঘি এনো,/জলপাইগুড়ি থেকে এনো কই জিয়োনো।/চাঁদনিতে পাওয়া যাবে বোয়ালের পেট কি।"[৩০] তাঁর ছড়ার ভাষাও তাই অনেক বেশি পরিশীলিত। পাশাপাশি তাঁর ছড়ায় লক্ষ করা যায়, অভাবিত চমকপ্রদ মিলের বিচিত্র সমাহার।

যোগীন্দ্রনাথ সরকার শুধুমাত্র ছড়া সংকলন গ্রন্থ 'খুকুমণির ছড়া' প্রকাশ করেই ক্ষান্ত থাকেননি। তিনি নিজেও ছড়া রচনায় প্রবিষ্ট হয়েছিলেন। আসলে শিশুচিত্তরঞ্জনকেই জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সাধনা রূপে তিনি গ্রহণ করেছিলেন। ছড়ায় শুধুমাত্র হাস্যরস পরিবেশনই তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল না। লীলা মজুমদারের কথায়, "সৎ ও সত্যপ্রিয়, আনন্দময় ও বলিষ্ঠ ছেলেমেয়ে তৈরি করাই ছিল তাঁর আশা ও সাধনা।" তাঁর রচিত 'বীর শিশু' ছড়াটি এইরূপ—"আমরা যেমন বীর শিশু—/তেমন আর কে/ভয় ভাবনা কাকে বলে/কিছুই জানিনে!"[৩১]

বাংলা ছড়াসাহিত্যে সুকুমার রায়েরও প্রভূত অবদান রয়েছে। বিশেষ করে তাঁর 'আবোল তাবোল'-এর ছড়াগুলিতে তৎকালীন সময়ের সামাজিক প্রতিচ্ছবি প্রতিফলিত হয়েছে। সেখানে দেখা যায় আজগুবি, উদ্ভট জিনিসের ছড়াছড়ি; তবে এর আড়ালেই সুকুমার সাধারণ মানুষের প্রাত্যহিক জীবনযন্ত্রণার কথা নিয়ে এসেছেন, তেমনি তৎকালীন সমাজব্যবস্থাকে ব্যঙ্গের কশাঘাতে জর্জরিত করেছেন। তাই আপাতদৃষ্টিতে তাঁর রচনাকে ননসেন্স ভার্স মনে হলেও, তার আড়ালে থেকে যায় গভীর গোপন সেন্স। তাঁর 'আবোল তাবোল' গ্রন্থের অন্তর্গত 'একুশে আইন' শীর্ষক ছড়ায় দেশের আইনব্যবস্থার দুর্দশা দেখে তিনি লিখেছেন—

শিব ঠাকুরের আপন দেশে,/আইন কানুন সর্বনেশে!/কেউ যদি যায় পিছ্‌লে প'ড়ে/প্যায়দা এসে পাক্‌ড়ে ধরে,/কাজির কাছে হয় বিচার—/একুশ টাকা দণ্ড তার॥[৩২]

বাংলা ছড়া রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, যোগীন্দ্রনাথ সরকার, নজরুল, সুকুমার রায়ের কাল পেরিয়ে অন্নদাশঙ্করের কালে এসে পৌঁছেছে। তাঁর হাতে পড়ে বাংলা ছড়ায় নতুন মাত্রা যোগ হয়েছে, বাংলাদেশের সনাতন ছড়া যেন নতুনভাবে জেগে উঠেছে। তাঁর ছড়ায় দেশের সামাজিক-রাজনৈতিক প্রসঙ্গ বাস্তবসত্যে প্রকট হয়ে উঠেছে। এই প্রসঙ্গে তাঁর রচিত অতি পরিচিত ছড়া 'খুকু ও খোকা' ছড়াটি উল্লেখ করা যেতে পারে, যেখানে প্রথম খুকুর কণ্ঠে জোর শোনা গেল, যার দৌলতে সে বড়োদের কাজের প্রতি সরাসরি প্রশ্ন ছুঁড়ে দিতে পারলো—"তেলের শিশি ভাঙল বলে/খুকুর পরে রাগ করো/তোমরা যে সব বুড়ো খোকা/ভারত ভেঙে ভাগ করো!/তার বেলা।"[৩৩] লোকায়ত ছড়ার অকৃত্রিম সুরটি সযত্নে তিনি তাঁর ছড়ায় লালন করেছেন। তাঁর ছড়ার গ্রন্থগুলির নামকরণও করা হয়েছে বিভিন্ন লোকছড়া থেকে। যেমন, 'রাঙা ধানের খই', 'আতা গাছে তোতা', 'রাঙা মাথায় চিরুণি', 'সাত ভাই চম্পা', 'বিন্নি ধানের খই', 'দোল দোল দুলুনি' প্রভৃতি। শুধুমাত্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বা সুকুমার রায় নন, যোগীন্দ্রনাথ সংগৃহীত 'খুকুমণির ছড়া' তাঁর কাছে আদর্শ ছিল। তাঁর ছড়ায় যেমন সামজের প্রতি সচেতনতা, দায়বদ্ধতার ছাপ স্পষ্ট; তেমন এইসব কঠিন কথাও তিনি বলতে পারেন অতি সাবলীল শব্দবয়নের মাধ্যমে।

অন্নদাশঙ্কর রায়ের প্রায় সমসাময়িক সুনির্মল বসু, অখিল নিয়োগী, প্রেমেন্দ্র মিত্র, হরেন ঘটক, অজিত দত্ত, বুদ্ধদেব বসু, বনফুল, বিষ্ণু দে, অমিতাভ চৌধুরী—সকলেই কম বেশি ছড়াসাহিত্যে হাত পাঁকিয়েছেন। এঁদের মধ্যে সুনির্মল বসু তাঁর সহজ-সরল লেখা ও ছন্দের ওপর অসাধারণ দখলের জোরে ছড়াসাহিত্যে যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। শিশু-কিশোরদের কাছে একটি শিক্ষণীয় পাঠ দিতে রচিত তাঁর বিখ্যাত ছড়াটি হলো—"বিশ্বজোড়া পাঠশালা মোর,/সবার আমি ছাত্র,/নানান ভাবের নতুন জিনিস/শিখছি দিবারাত্র।"[৩৪]

লোকছড়ার ধারা থেকে একেবারেই বেরিয়ে এসেছেন এই সময়ের আরেকজন শক্তিশালী ছড়াকার অমিতাভ চৌধুরি। তাঁর ছড়া একেবারেই আধুনিক, নাগরিক-পরিশীলিত, অভিনব। শুধুমাত্র হাস্যরসাত্মক তা নয়, বেশ কিছু ছড়ার বিষয়ভাবনা যথেষ্ট গভীর, ক্ষুরধারসম্পন্ন। সেখানে কখনও উঠে এসেছে মহাভারতের প্রসঙ্গ, কখনও এসেছে স্বদেশের কথা। তাঁর রচনায় বিষয়বৈচিত্র্যের পাশাপাশি শব্দের ভাঙা-গড়া, ছন্দমিলে তাঁর অভিনবত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাই কনিষ্কের সঙ্গে মিল দিতে গিয়ে 'অন্যমনস্ক' হয়ে যায় 'অন্যমনিষ্ক'। এছাড়া মিলের প্রয়োজনে কখনও ইংরেজি শব্দও এসে হাজির হয়েছে। পেশায় সাংবাদিক হওয়ার দরুণ তাঁর ছড়ায় প্রায়শই সংবাদ স্বতন্ত্র মাত্রা নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। যে কোনও বিষয় নিয়ে চটজলদি মুখে মুখে ছড়া বানিয়ে ফেলা তাঁর প্রতিভার একটি বিশিষ্ট দিক। তাঁর মহাভারতের ছড়া—"দিল্লি থেকে খুবই কাছে, একটুখানি দূর/অনেক বছর আগে ছিল সেই হস্তিনাপুর।/ধনে মানে বিরাট রাজ্য চারদিকে নামডাক/সেইখানে বিচিত্রবীর্য রাজার বড়ো জাঁক।"[৩৫]

কবিদের মধ্যে অনেকেই ছড়া লিখেছেন, যেমন—সুকান্ত ভট্টাচার্য, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, শঙ্খ ঘোষ, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, পুর্ণেন্দু পত্রী, দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, রত্নেশ্বর হাজরা, অমিতাভ দাশগুপ্ত, গৌরাঙ্গ ভৌমিক, তারাপদ

রায়, সামসুল হক, শ্যামলকান্তি দাশ, মৃদুল দাশগুপ্ত, বরেন গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখরা ছড়ার জগতে খ্যাতি অর্জন করেছেন। নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর ছড়ায় তাঁর কবিসত্তার উজ্জ্বল উপস্থিতি চোখে পড়ে। তাঁর ছড়ার ভাষাও যথেষ্ট আধুনিক। 'ভয় করি না' ছড়ায় তিনি লিখেছেন—

> 'মরা গাঙে বান' আসে যেই/অমনি ভাসাই তরি,/তোমার কথা বাজলে কানে/কাকেই বা ভয় করি।/সঙ্গে তুমিই আছ কিনা/বিঘ্নবিপদ তাই মানি না,/যতই নিষেধ করুক সবাই/ আমরা বলি হেসে :/রাত পোহালেই পৌঁছে যাব/অসম্ভবের দেশে।[৩৬]

কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর মতোই সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের অনেক ছড়াও কবিতার কাছাকাছি হয়ে গিয়েছে। তবে তিনি নিজস্ব ঘরানায় বেশ কিছু ছড়াও লিখেছেন, যা গ্রন্থ আকারে প্রকাশ পেয়েছে, যেমন—'মিউ-এর জন্য ছড়ানো ছিটানো', এর প্রায় ছড়াই অর্থহীন শব্দের খেলা। তাঁর ছড়ার একটি নমুনা দেওয়া যেতে পারে—"এক যে ছিল রাজা—/রাজত্বটা মস্ত/উঠতে বললে উঠত লোকে/বসতে বললে বসত।"[৩৭] গতানুগতিক ধারা থেকে বেরিয়ে এসে শঙ্খ ঘোষের ছড়া মৌলিকতার আলোয় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। দৈনন্দিন বাস্তব জীবনের বিবিধ উপাদানের সন্নিবেশে তাঁর ছড়ায় যেমন এসেছে বৈচিত্র্যের বাহার, তেমনি আঙ্গিক নির্মাণেও তিনি যথেষ্ট পারদর্শিতা দেখিয়েছেন। তাঁর একটি মজার ছড়া 'মিস্'—

> বাইরে এত লম্ফঝম্প/ক্লাসে গেলেই চুপ/কে সেটা জানতে কি চাও/মিসেদের যা রূপ!/ ক্লাসে এসেই শুরু করেন/প্রকাণ্ড লাফঝাঁপ—/তাঁদের সামনে কথা বলব/ভাবলে—উরেঃ ব্বাপ্![৩৮]

শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের ছড়া প্রাচীন লোকছড়ার সুরই বহন করেছে। বিষয়গত অভিনবত্ব, কারুকার্য ও লৌকিক সুর তাঁর ছড়াগুলিকে মহার্ঘ করে তুলেছে। এই ছড়াগুলির কাব্যবোধ, ভাবনা, চিত্রকল্প বিচার করলে এগুলিকে বিশুদ্ধ ছড়া বলা যেতে পারে না, বরং শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের ভাষাতেই এগুলি 'পদ্য'। তাঁর ছড়াগ্রন্থ 'মিষ্টি কথায় বিষ্টিতে নয়' যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছে। সেখানে কাহিনির আদলে রচিত একটি ছড়া 'অথ নয়ন-কুসুম কথা'য় সমাজের দারিদ্র্য-পীড়িত মানুষের জীবনের করুণ রূপটি ফুটে উঠতে দেখতে যায়—"ভগবানের কাছে নালিশ করবে কতো/ঢিব-কপালে যা পেয়েছে যথেষ্ট তাই,/গতর ঠেলে বাঁচতে পারা অল্প তো না/পান্তা ভাতে নুন জোটে তো ওইটুকুই চাই।"[৩৯] বাংলা ছড়ায় যখন ক্রমশই বেড়েছে রকমারি পালিশ, চাকচিক্যের বাহার; তখন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের ছড়া একেবারেই সহজ-সরল, স্বতঃস্ফূর্ত, কারিকুরিহীন। তাঁর অনেক ছড়াতেই কাহিনি থাকে, যা অনায়াসেই ছোটদের মন আকর্ষণ করতে সমর্থ। এইভাবে অসাধারণ দক্ষতায় তিনি তাঁর স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠা করেছেন। তাঁর 'কায়দাটা শিখে নেবে' ছড়াটি দেখলে বোঝা যায়—"এক লাফে বোম্বাই পাঁচ লাফে লন্ডন/টাকাকড়ি নেই কিছু পকেটটা ঢন্‌ঢন্।/বিমানে ও জাহাজেতে যায় এত কাহারা/আমি ভাই চলে যাই তিন লাফে সাহারা।"[৪০]

পূর্ণেন্দু পত্রী তাঁর বহুমুখী প্রতিভার পাশাপাশি ছড়ার জগতেও অসাধারণ দক্ষতায় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। খাঁটি ছড়া বলতে যা বোঝায়, তা তিনি প্রচুর লিখেছেন। সেরকমই একটি দৃষ্টান্ত হলো তাঁর—'রাম রাবণের ছড়া'। এখানে টুকরো টুকরো ছড়ায় তিনি অসাধারণ দক্ষতায় নিয়ে এসেছেন রামায়ণের ঘটনাবলী, অজস্র শব্দ-চিত্র। তাঁর ছড়ার ভাষা যথেষ্ট ঝকঝকে, আধুনিক। তাঁর 'এক মুঠো অন্ন' ছড়াটি এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে—

একটি মুঠো অন্ন দে মা/একটি বাটি ফ্যান।/দেখবি তোকে রাজমহিষী/করবে ভগবান।/ইনফ্লেশনে ইনফ্লেশনে/আগুন লাগা পণ্য/সে সব কি মা আমার মতো/গরিব-দুখীর জন্য।[৪১]

বাংলা সাহিত্যে শুধু ছড়া লিখেই যাঁরা বিখ্যাত হয়েছেন, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্যরা হলেন ভবানীপ্রসাদ মজুমদার, সরল দে, কার্তিক ঘোষ, অশোককুমার মিত্র, রঞ্জন ভাদুড়ী, সুখেন্দু ভট্টাচার্য, অমরেন্দ্র চক্রবর্তী, রতনতনু ঘাটী প্রমুখজন। এঁদের ছড়ার মধ্যেও ঘুমতাড়ানী ছড়া রচনার একটি সচেতন প্রবণতা উঠে আসতে দেখা যায়। এইভাবে সেই সুদূর প্রাচীনযুগে লোকমুখে সৃষ্ট হয়ে ছড়া ক্রমশ আধুনিক যুগের সাহিত্যিকদের হাতে নবীনতর রূপ লাভ করে এগিয়ে গেছে। 'ঘুমপাড়ানি ছড়া' থেকে 'ঘুমতাড়ানী ছড়া'র এই সুদীর্ঘ যাত্রাপথে নানান বিবর্তনের মাধ্যমে ছড়ার সজীব গতিধারা প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষভাবে কাল থেকে কালান্তরে সমানভাবে বহমান থেকেছে।

উৎসের সন্ধানে

১. পার্থজিৎ সম্পাদিত গঙ্গোপাধ্যায় : 'ভূমিকা', একশো বছরের একশো ছড়া, সাহিত্য তীর্থ, কলকাতা, বইমেলা ১৪০৪, পৃ. ৮
২. দেবশ্রী পালিত : 'ছড়া : লোকায়ত জীবনের কারুভাষ', বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা ডিসেম্বর ২০১২, পৃ. ১৩০
৩. তদেব : পৃ. ১৩১
৪. তদেব
৫. সুকুমার সেন : 'শিশুবেদ', ভবতারণ দত্ত সংকলিত ও সম্পাদিত, বাংলার ছড়া, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০০৯, পৃ. ৯
৬. বরুণকুমার চক্রবর্তী : 'বাংলা ছড়া চর্চার ইতিহাস', চক্রবর্তী বরুণকুমার, বাংলা লোকসাহিত্য চর্চার ইতিহাস, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, সপ্তম পরিমার্জিত সংস্করণ, নভেম্বর ২০১২, পৃ. ৯১
৭. তদেব
৮. তদেব : পৃ. ৯২
৯. তদেব
১০. তদেব
১১. তদেব
১২. মজুমদার লীলা : 'যোগীন্দ্রনাথ সরকার', দত্ত চন্দনা সম্পাদিত, 'চিরকালের সেরা যোগীন্দ্রনাথ সরকার', শিশু সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, পঞ্চম মুদ্রণ, মে ২০১৭
১৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : 'মেয়েলি ছড়া', দাস অনাথনাথ ও রায় বিশ্বনাথ সংকলিত ও সম্পাদিত, ছেলেভুলানো ছড়া, আনন্দ, কলকাতা, চতুর্থ মুদ্রণ, চৈত্র ১৪২৩, পৃ. ২০৯
১৪. তদেব : পৃ. ২১১
১৫. তদেব : পৃ. ২২৯
১৬. তদেব : পৃ. ২০৪
১৭. অনাথনাথ দাস ও বিশ্বনাথ রায় : 'নিবেদন', দাস অনাথনাথ ও রায় বিশ্বনাথ সংকলিত ও সম্পাদিত, ছেলেভুলানো ছড়া, আনন্দ, কলকাতা, চতুর্থ মুদ্রণ, চৈত্র ১৪২৩, পৃ. ১০
১৮. তপন চক্রবর্তী : 'ঘুম তাড়ানি ছড়া', চিরায়ত প্রকাশন, কলকাতা, প্রথম পরিমার্জিত চিরায়ত সংস্করণ, জুলাই ২০০৯, পৃ. ১৯

১৯. তদেব : পৃ. ২০
২০. মিষ্টি ছড়া টাপুর টুপুর, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, জানুয়ারি ১৯৯৮, পৃ. ২০
২১. তদেব : পৃ. ১৫
২২. তদেব : পৃ. ১৬
২৩. বন্দনা ভট্টাচার্য : 'বাংলা লিখিত সাহিত্যে মৌখিকতার ভূমিকা', বাংলা মৌখিক সাহিত্যের রূপান্তর, মনীষা গ্রন্থালয় প্রা. লি., কলকাতা, পয়লা বৈশাখ ১৪২৪, পৃ. ১৩
২৪. সুকুমার সেন : 'শিশুবেদ', দত্ত ভবতারণ সংকলিত ও সম্পাদিত, বাংলার ছড়া, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০০৯, পৃ. ৫
২৫. মিষ্টি ছড়া টাপুর টুপুর : পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, জানুয়ারি ১৯৯৮, পৃ. ৩৬
২৬. পবিত্রকুমার মিস্ত্রী : 'ছড়া : সংজ্ঞা, স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য', চক্রবর্তী বরুণকুমার সম্পাদিত, বাংলা ছড়া পরিক্রমা, অক্ষর প্রকাশনী, কলকাতা, কলকাতা বইমেলা ২০১৪, পৃ. ১৫
২৭. মিষ্টি ছড়া টাপুর টুপুর : পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, জানুয়ারি ১৯৯৮, পৃ. ৫
২৮. সেনগুপ্ত পল্লব : 'লোকসাহিত্যের দিক্‌বলয়', সেনগুপ্ত পল্লব, লোকসংস্কৃতির সীমানা ও স্বরূপ, পুস্তক বিপণি, কলকাতা ৭০০০০৯, পরিশীলিত ও পরিবর্ধিত তৃতীয় সংস্করণ, জানুয়ারি ২০১০, পৃ. ২০২
২৯. মিষ্টি ছড়া টাপুর টুপুর, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, জানুয়ারি ১৯৯৮, পৃ. ২
৩০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : সঞ্চয়িতা, সাহিত্যম্, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, মাঘ ১৪১৫, পৃ. ৫৭৬
৩১. চন্দনা দত্ত সম্পাদিত : 'চিরকালের সেরা যোগীন্দ্রনাথ সরকার', শিশু সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, পঞ্চম মুদ্রণ, মে ২০১৭, পৃ. ১৭
৩২. সুকুমার রায় : 'আবোল তাবোল', সিগনেট প্রেস, কলকাতা, সপ্তম মুদ্রণ, জুলাই ২০১৮, পৃ. ৩২
৩৩. অন্নদাশঙ্কর রায় : 'ছড়া সমগ্র', বাণীশিল্প, কলকাতা, তৃতীয় মুদ্রণ, এপ্রিল ২০১৩, পৃ. ৪৯
৩৪. চন্দনা সম্পাদিত দত্ত : 'চিরকালের সেরা সুনির্মল বসু', শিশু সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, পঞ্চম মুদ্রণ, মে ২০১৭, পৃ. ১৮
৩৫. অমিতাভ চৌধুরি : 'ছড়া এবং ছড়া', পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, ফেব্রুয়ারি ২০০৪, পৃ. ১৩৭
৩৬. নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী : 'নতুন ছড়া', শিশু সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০১৪, পৃ. ৩২
৩৭. পার্থজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত : 'একশো বছরের একশো ছড়া', সাহিত্য তীর্থ, কলকাতা, বইমেলা ১৪০৪, পৃ. ৫৮
৩৮. কালিদাস ভদ্র সম্পাদিত : 'ছোটদের আবৃত্তির কবিতা', হোলিচাইল্ড পাবলিকেশন, কলকাতা, মেমারি বইমেলা ২০০৬, পৃ. ১২৭
৩৯. শক্তি চট্টোপাধ্যায় : 'মিষ্টি কথায়, বিষ্টিতে নয়', আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, শ্রাবণ ১৪২২, পৃ. ৭৯
৪০. পার্থজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত : 'একশো বছরের একশো ছড়া', সাহিত্য তীর্থ, কলকাতা, বইমেলা ১৪০৪, পৃ. ৮০
৪১. তদেব : পৃ. ৭৫

❑ **প্রবাদ-প্রবচন**

নিম্ন অসমের ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার চর অঞ্চলে প্রচলিত প্রবাদ

আনন্দ ঘোষ

অসম একটি নদীমাতৃক রাজ্য। বিশেষ করে অসমের বুকে প্রবাহিত ব্রহ্মপুত্রই অসমকে নদীমাতৃক বলে পর্যবসিত করেছে। নিম্ন অসমের এই ব্রহ্মপুত্র নদীর উপত্যকায় গড়ে উঠেছে বেশ কিছু চর অঞ্চল। বিশেষ করে বরপেটা, গোয়ালপাড়া ও ধুবড়ি জেলার এক বৃহৎ অঞ্চল জুড়ে রয়েছে চর অঞ্চল। এই চর অঞ্চলগুলোকে অসমে সাধারণত 'চর-চাপরি' নামে অভিহিত করা হয়। আসলে শব্দটি ভৌগোলিক স্থানবাচক দুটি শব্দ। 'চর' হলো চার পাশে জল দ্বারা আবৃত নদীর মাঝভাগের ছোটো স্থলভাগ। সাগর মহাসাগরের ক্ষেত্রে এই ধরনের স্থলভাগকে দ্বীপ (Island) বলা হয়। কিন্তু নদীর ক্ষেত্রে চারদিকে জলদ্বারা আবৃত স্থলভাগকে নদীদ্বীপ বা 'চর' বলে। কখনও কোনও চর স্থায়ী রূপ পেলে তাকে স্থানীয় ভাষায় 'চাপরি' বলা হয়। আবার কখনও কখনও কোনও চর নদীর পার সংলগ্ন ভূ-খণ্ডের সঙ্গে একত্রিত হয়ে স্থায়ী রূপ পেলে তাকেও 'চাপরি' বলা হয়। সম্প্রতি অসমের চর অঞ্চলে মোট ২০৮১টি গ্রামে ১৬ লক্ষাধিক লোক বসবাস করছে।[১]

ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার চর অঞ্চলে বসবাসকারী প্রায় ৯০ শতাংশ মানুষই মুসলিম সম্প্রদায়ভুক্ত। এদের অধিকাংশই এসেছে পূর্ববঙ্গের (বর্তমান বাংলাদেশ) ময়মনসিংহ জেলা থেকে। ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার অনেক আগে থেকেই এদের আগমন ঘটেছে অসমের বিভিন্ন জেলাতে। বিশেষকরে কৃষিকাজের সুবিধার জন্যই চরবাসীদের আনা হয়েছিল অসমে। যেহেতু চর অঞ্চলগুলো ছিল কৃষিকার্যের জন্যে উপযোগী, তাই তাদের স্থান দেওয়া হয়েছিল চর অঞ্চলে। এদের মাতৃভাষা বাংলা। গৃহজীবনের বার্তালাপ এরা বাংলা ভাষাতেই করে। কিন্তু নিম্ন অসমের বিশেষ করে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় বসবাসকারী চরবাসীরা অসমিয়া ভাষাকে মাতৃভাষা হিসেবে গ্রহণ করেছে। এমনকি এরা বাল্যকাল থেকে সকলে অসমিয়া মাধ্যমেই পড়াশোনা করে। কিন্তু যেহেতু এদের মাতৃভাষা বাংলা তাই মৌখিক সাহিত্যচর্চা এরা বাংলা ভাষাতেই করে থাকে।

লোকসাহিত্যের দুটি ভাগ রয়েছে—একটি লিখিত অন্যটি অলিখিত বা মৌখিক। লোকসাহিত্যের মৌখিক রূপের ধারাটি পুরুষানুক্রমে চলতে থাকে। তবে স্থান পরিবর্তন হলে মৌখিক সাহিত্যেরও পরিবর্তন দেখা যায়। আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে, নিম্ন অসমের ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার চরবাসীরা এসেছে মূলত পূর্ববঙ্গ থেকে। তাই পরবর্তীকালে তাদের মৌখিক সাহিত্যচর্চায় পূর্ববঙ্গের ঐ নির্দিষ্ট অঞ্চলের লোক-সাহিত্যের প্রভাব থাকাই স্বাভাবিক। এছাড়া অসমে বসবাস করার ফলে এদের সংস্কৃতিতে অসমিয়া সংস্কৃতিরও অনেক

উপাদান সংমিশ্রিত হয়েছে। ফলে তাদের মৌখিক সাহিত্যে একটি মিশ্র রূপ আমরা লক্ষ করে থাকি। এখানে আমরা শুধু চর অঞ্চলে প্রচলিত মৌখিক সাহিত্যের প্রবাদ নিয়ে আলোচনার প্রয়াস করব।

❖ **অধ্যয়নের পদ্ধতি** : আমাদের এই গবেষণা পত্রটি প্রস্তুতকালে ক্ষেত্র অধ্যয়নকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন গ্রন্থ, পত্র-পত্রিকা, সরকারি নথি-পত্র ইত্যাদির সাহায্য গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া নিম্ন অসমের বিভিন্ন চর অঞ্চল ভ্রমণ করে এবং সেখানকার বিভিন্ন ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎকার ও প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে এই গবেষণা পত্রটি প্রস্তুত করা হয়েছে। এছাড়া চরবাসীরা প্রবাদগুলি যেভাবে উচ্চারণ করে থাকে ঠিক সেভাবেই লেখা হয়েছে।

❖ **প্রবাদের সংজ্ঞা ও উৎপত্তি** : প্রবাদের সংজ্ঞা সম্পর্কে বিশিষ্ট লোকসাহিত্যবিদ শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন—"প্রবাদ বা প্রবচন জাতির সুদীর্ঘ ব্যবহারিক অভিজ্ঞতার সংক্ষিপ্ততম রসাভিব্যক্তি; বিভিন্নমুখী ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের বহু পরীক্ষিত উপদেশ ও নীতি প্রচার করাই ইহার লক্ষ্য—রূপক ও বক্রোক্তি প্রধানত ইহার অবলম্বন।"[২] প্রবাদের মাধ্যমে একটি জাতির সভ্যতা ও সংস্কৃতির ইতিহাসকে সহজেই আবিষ্কার করা যায়। সেজন্যই পাশ্চাত্য মনীষী বাকন বলেছেন—"The genious, wit and spirit of a nation are discovered by their proverbs."[৩] প্রবাদ অলিখিত এবং রচয়িতার নাম অজ্ঞাত। মানবজীবনের কতকগুলি মৌলিক বিষয় নিয়ে প্রবাদ রচিত হয়। সুতরাং যতদিন সেই বিষয়গুলো সমাজ জীবনে বর্তমান থাকে ততদিন সেই বিশেষ সমাজে বিশেষ প্রবাদটি প্রচলিত থাকে।

❖ **ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার চর অঞ্চলে প্রচলিত প্রবাদ** : নিম্ন অসমের ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার চর অঞ্চলে প্রবাদগুলোর মধ্যে রয়েছে মানুষ, প্রকৃতি, রিপুজনিত বিষয়, খাদ্যাভাস, দৈনন্দিন ক্রিয়াকর্ম, নৌকা, নদী, পশু-পাখি, কীট-পতঙ্গ ইত্যাদি। চরবাসীদের মধ্যে প্রচলিত প্রবাদগুলোর দুটো ভাগ রয়েছে—মৌলিক প্রবাদ ও গতানুগতিক প্রবাদ। মৌলিক প্রবাদগুলো এই অঞ্চলের মানুষের নিজস্ব সৃষ্টি, আর গতানুগতিক প্রবাদগুলো পূর্ব প্রচলিত। এবার আমরা চরবাসীদের নিজস্ব সৃষ্টি মৌলিক কিছু প্রবাদ সম্বন্ধে আলোচনা করব—

১. "খেড়ের চাল খড়ির বেড়া/ঐডাই হইল চর পাড়া।/কাইসার ঘর কাইসার বেড়া/ঐডাই হইছে মিঞা পাড়া।"[৪] এই প্রবাদটি থেকেই চরবাসীদের জীবন-যাপন পদ্ধতি কিছুটা অনুমান করা যায়। চরবাসীরা অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল এবং বঞ্চিত। তাই তাদের ঘরগুলি অতিসাধারণভাবে 'ছন' বা 'খড়' দিয়ে তৈরি। ঘরের বেড়াগুলি পাটখড়ি দিয়ে নির্মাণ করে। সব চরবাসীদের ঘর একইভাবে তৈরি বলে দূর থেকে তাদের পাড়াটিকে সহজেই চেনা যায়।

২. "বিপদে পরলে কাঁকড়া বৈরী/কাঁকড়া বলে ঘাড়ে চরি।"[৫] এই প্রবাদটির অর্থ হলো—কোনো লোক যদি বিপদে পড়ে তাহলে অতি নগণ্য ব্যক্তিও তার শত্রু পক্ষ নেয়। চর অঞ্চলে যেহেতু খাল বিল প্রচুর তাই এখানে কাঁকড়ার প্রসঙ্গ এনে প্রবাদটি তৈরি করা হয়েছে।

৩. "এতোদিন পাললাম বগীলা ওঠে ঠোটে খিলাইয়া/যাও বগলী এখন তুমি গুয়ার দোষ দিয়া।"[৬] এই প্রবাদটির বাক্যার্থ হলো যে গ্রীষ্মকালে নদী নালায় পর্যাপ্ত পরিমাণে জল থাকে না। তাই বকের খাদ্য জোগাড় করা কষ্টকর হয়। ঠিক সেই সময় কোন একজন ব্যক্তি একটি বক এনে প্রতিপালন করে। যখন গ্রীষ্ম কাল শেষ হয়ে যায় তখন সেই বকটি ব্যক্তিকেই বিভিন্ন দোষারোপ করে চলে যায়। এর নিহিতার্থ হলো বিপদের সময় কাউকে সাহায্য করলে পরিণামে মিথ্যা অপবাদ নিতে

হয়। অর্থাৎ বিপদ কেটে গেলে সেই ব্যক্তি অকৃতজ্ঞ হয়। এই প্রবাদটির 'বগীলা' শব্দটি অসমিয়া ভাষা থেকে এসেছে। অসমিয়া ভাষাতে বককে 'বগীলা' বলে।

৪. "কচুর মতো কচু হইলে অল্প জলে সিজে/মানুষের মতো মানুষ হইলে অল্প কথায় বুজে।"[৭] এই প্রবাদটির অর্থ ভালো কচু অল্প জ্বাল করার পরেই সিদ্ধ হয়ে যায়। ঠিক তেমনি মানুষও ভালো হলে অর্থাৎ বুদ্ধি থাকলে অল্প কথাতেই বুঝতে পারে। এই প্রবাদটির দ্বারা মানব সমাজের গুণী ব্যক্তি এবং গুণহীন ব্যক্তিকে বোঝানো হয়েছে। এখানে 'সিজে' শব্দের অর্থ সিদ্ধ হওয়া এবং 'বুজে' শব্দটির অর্থ বুঝতে পারা বা বোঝা।

৫. "মজা মারে ফোজা ভাই/হুদা হুদি নাও বাই।"[৮] প্রবাদটির অর্থ হলো কোনো ব্যক্তি দিন-রাতে পরিশ্রমের পর কোনো কাজ সম্পূর্ণ করে কিন্তু তার কর্মের ফল ভোগ করতে পারে না, ফল ভোগ করে অন্য ব্যক্তিরা। চর অঞ্চলে এই প্রবাদটির বহুল প্রচার রয়েছে। কারণ চরের দরিদ্র কৃষকেরা রাতদিন পরিশ্রম করে ফসল ফলায় কিন্তু দেওয়ানী ও মাতব্বরেরাই পরিশ্রম না করেই ফসলের ভাগ নেয়। এই প্রবাদটির সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের 'কেহ মরে বিল সেচে, কেহ খায় কই' প্রবাদটির মিল খুঁজে পাওয়া যায়।

৬. "টেহায় করে কাম/মিছা মরদার নাম।"[৯] এই প্রবাদটি বরপেটা জেলার চর অঞ্চলে বহুল প্রচলিত। এর অর্থ হলো টাকা হলে মানুষ যে কোনো কাজ করতে পারে। টাকা ছাড়া কোনও কাজই সম্ভব নয়। অর্থাৎ টাকা দিয়েই কাজ হয়, মানুষ শুধু উপলক্ষ্য। এখানে অর্থের মহিমাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। চর অঞ্চলে টাকাকে 'টেহা' বা 'টেকা' বলে।

৭. "যার মরণ যেনে, নাও ভাড়া কইরা যায় হেনে।"[১০] প্রবাদটির অর্থ হলো মানুষের মৃত্যু পূর্ব নির্ধারিত। পৃথিবীর কোনও মানুষই মৃত্যু কীভাবে হবে তা বলতে পারে না। কারও অসুখ হয়ে চিকিৎসালয়ে মৃত্যু হতে পারে, আবার কারও বাস, রেল, এরোপ্লেন, নৌকা ইত্যাদি যাত্রাকালে দুর্ঘটনায় মৃত্যু হতে পারে। আসল কথা মৃত্যু অনিবার্য থাকলে যে-কোনো সময় যে-কোনো ভাবে তা হতে পারে। এখানে 'যেনে' অর্থ যেখানে, 'হেনে' অর্থ সেখানে। এইগুলো চর অঞ্চলের প্রচলিত শব্দ।

৮. "যে পাখি ভুরে উঠে/পোকা মাকর তারই জোটে।"[১১] প্রবাদটির মূল অর্থ হলো যে ব্যক্তি অধিক পরিশ্রম করতে পারে সে ততোধিক ভালো ফল লাভ করতে পারে। পরিশ্রম বা কর্ম কখনও বিফলে যায় না। সমাজে বা সংসারে যে বেশি কষ্ট করতে পারে সেই বেশি সুখ শান্তি লাভ করতে পারে। এই প্রবাদ বাক্যটি কয়েকটি অর্থে ব্যবহার করা হয়। ছাত্র-ছাত্রীদের জন্যে এটি বিশেষভাবে প্রযোজ্য। ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠলে আমাদের মগজ সতেজ থাকে। সেই সময় পড়াশোনা করলে তা সহজে স্মৃতিতে থাকে। প্রবাদটির অন্য আর একটি অর্থ হলো—রাতে কীট-পতঙ্গ খাদ্যের অন্বেষণে ঘুরতে থাকে। ভোরবেলা যদি কোনো পাখি খাদ্যের সন্ধানে আসে তবে তার ভাগ্যে খাদ্য মিলবেই। চরবাসীরা ভোরকে 'ভুর' উচ্চারণ করে।

৯. "না পাইলে গোসাই চেঙপুড়া খায়।"[১২] অর্থাৎ প্রবাদটির মূল অর্থ হলো চর অঞ্চলের মুসলিম জনগোষ্ঠী পির, গোঁসাইদের খুব শ্রদ্ধা করে। পির বা গোঁসাই যদি কারও ঘরে আসে তাহলে তাকে অতি শ্রদ্ধার সঙ্গে আপ্যায়ণ করা হয়। কিন্তু শিষ্য দরিদ্র হলে তাকে মাছ, মাংস, দই, দুধ ইত্যাদি দিয়ে সেবা করতে পারে না। তখন পিরকে যা দিয়ে ভাত দেবে তাই খেতে হবে। পরিস্থিতি সাপেক্ষে এই প্রবাদটির মূল অর্থ হলো শিষ্য বড়ো মাছ বা মাংসের পরিবর্তে ছোটো মাছের ঝোল এমনকি চ্যাং মাছও পীর গোঁসাইকে দিতে পারে। পীর গোঁসাইও তখন এগুলো বাধ্য হয়ে খেয়ে নেন। এই প্রবাদটিতে আসলে বিপদের সময় অবস্থার সঙ্গে খাপ খেয়ে চলার কথা বলা হয়েছে। এই প্রবাদটি আরও একভাবে প্রচলিত আছে—"ঠেলায় পরলে বাঘে ঘাস খায়।"

১০. "যে বিলাইতে ইন্দুর মারব তার মুচ দেখলেই বুজা যায়।"[১৩] এই প্রবাদটির মূলভাব হলো ব্যক্তি বিশেষের ক্ষমতা তার নিজের মধ্যেই লক্ষ করা যায়। যে বেড়াল ইঁদুর মারবে তাঁর গোঁফ দেখলেই বোঝা যায়। এই প্রবাদটি অসমিয়া ভাষায় 'যি মূলা বাঢ়িব তার দুপাতে চিন' প্রবাদটির সঙ্গে মিল

রয়েছে। এই প্রবাদটি সাধারণত কেহ কাজে অবহেলা করলে কিংবা ছাত্র-ছাত্রীরা পড়াশোনায় অবহেলা করলে বড়োদের একথা বলতে শোনা যায়। চর অঞ্চলের মানুষেরা বিড়ালকে 'বিলাই' বলে।

১১. "হইব গেদা কইব বাবা/তখন ছাড়বো মনের জ্বালা।"[১৪] কোনও একটা কাজ শুরু না করেই তার ফল লাভের আশা করলে এই প্রবাদটি ব্যবহৃত হয়। নিঃসন্তান মানুষ সন্তান জন্মের আগেই সন্তানের বাবা সম্বোধন বা মনের জ্বালা দূর করার কথা যেভাবে ভাবতে পারে না, ঠিক সেইভাবেই কোনো কাজ শুরু না করে তার ফল লাভের আশা করা যায় না।

১২. "বাড়ির পাছে নিরানি/ঘনে ঘনে জিরানি।"[১৫] এই প্রবাদটির মূল অর্থ হলো সাধারণত বাড়ির পাশেই যদি কোনো শ্রমিক কাজ করে তাহলে তাকে ঘন ঘন জিরানি অর্থাৎ বিশ্রাম নিতে দেখা যায়। এই ধরনের শ্রমিকদের উদ্দেশ্য করে এই প্রবাদটি রচিত। এখানে—'নিরানি' অর্থাৎ খেতের আগাছা পরিস্কার করা, 'জিরানি' অর্থাৎ বিশ্রাম নেওয়া।

১৩. "কেচ কেচির সংসারে উন্নতি নাই।"[১৬] এই প্রবাদটির মূলভাব একটি সংসারে আনন্দের পরিবেশ তখনই হয় যখন সকলের মধ্যে মধুর সম্পর্ক থাকে। কিন্তু সব সময় যদি সংসারের সদস্যদের মধ্যে চিৎকার চেঁচামেচি থাকে তবে সংসারে উন্নতি হয় না। প্রতিবেশীরা এর নিন্দা করে। সেরকম পরিস্থিতিতে এই প্রবাদটি বলতে শোনা যায়।

১৪. "মেন মেনা কলসা লারে ঐ বাঘেই মানুষ ধরে।"[১৭] প্রবাদটির মূল অর্থ হলো অনেক আপাত শান্ত-শিষ্ট মানুষও যে দুস্ট প্রকৃতির থাকে—তা বোঝাতেই এই প্রবাদটি ব্যবহার করা হয়।

১৫. "বারো হাত বাঙ্গি তেরো হাত বিচি।"[১৮]—কোনো মানুষ যদি তার সাধ্যের বেশি কাজ করে তা হলে চর অঞ্চলের মানুষেরা এই প্রবাদটি ব্যবহার করে।

১৬. "চেংরার বুদ্ধি গলায় আর বুড়ার বুদ্ধি তলায়।"[১৯] এই প্রবাদটির অর্থ যুবক-যুবতীদের থেকে বয়স্করা সর্বক্ষেত্রেই অভিজ্ঞ। জীবনের অনেক ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে তারা বৃদ্ধ হয়েছেন। তাই বয়স্ক মানুষদের জীবনে অনেক অভিজ্ঞতা রয়েছে। খুব স্বাভাবিকভাবেই যুবক-যুবতীদের অভিজ্ঞতা অনেক কম। এই দুই অবস্থাকে বোঝাবার জন্যে উক্ত প্রবাদটি ব্যবহার করা হয়।

১৭. "আইজ বুজবি না বুজবি কাইল/পস্তাবি আর পারবি গাইল।"[২০] প্রবাদটির অর্থ হলো—কাউকে ভালো বুদ্ধি দিলে সে অনেক সময় ভাবে বুদ্ধিটা ভালো নয়, কিছুদিন পরে দেখা যায় যে, বুদ্ধিটা না শোনার ফলে তার ক্ষতিই হয়েছে। এই প্রবাদটি চর অঞ্চলের ছাত্র-ছাত্রীদের মা-বাবার মুখে শোনা যায়। ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশোনার কথা বললেও তারা পড়তে চায় না। তখন তাদের মা-বাবা এই প্রবাদটি বলে থাকেন। এখানে 'পস্তাবি আর পারবি গাইল' কথাটির অর্থ হলো নিজে পস্তানো এবং অন্যকে দোষারোপ করা।

১৮. "সারা পথ দৈরা-দৈরী/খেওয়া ঘাটে গরা গরি।"[২১] চর অঞ্চলের মানুষেরা সাধারণ হেঁটেই অনেক দূর যাতায়াত করে। বেশি দূরত্বের পথ হলে তারা খুব জোরে হাটে এবং কোথাও বিশ্রাম নেয়। কিন্তু চর অঞ্চল নদীকেন্দ্রিক। ফলে তাদের গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে নদী পার হতেই হয়। সে যতই দৌড়া-দৌড়ি করুক না কেন, নৌকায় তাকে পার হতেই হবে। নৌকার জন্যে তাকে ঘাট পারে অপেক্ষা করতে হয়। সব ঘাটেই নৌকার সংখ্যা খুবই সীমিত। একটি নৌকা যাওয়ার প্রায় ২ ঘন্টা পরে অন্যটি যায়। দীর্ঘ সময়ের অপেক্ষা বোঝাতেই 'খেওয়া ঘাটে গরা গরি' পঙ্‌ক্তিটি ব্যবহার করা হয়েছে।

১৯. "বেচা গরুর দাঁত দেহা।"[২২] প্রবাদটির বাচ্যার্থ হলো গোরু ক্রয় করার আগেই দাঁত দেখতে হয়। ক্রয় করার পর দাঁত দেখে লাভ নেই। অর্থাৎ একটি কাজ সম্পূর্ণ হয়ে যাওয়ার পর তার মধ্যে দোষ বের করে কোনো মূল্য নেই।

২০. "চুল নাই উকনে কামরায়।"[২৩] সাধারণত চুল থাকলেই উকুন হয়। কিন্তু যার চুল নেই তার উকুন হওয়ার প্রশ্নই নেই। অর্থাৎ, কেউ যদি উপার্জন না করেই খরচ করার কথা ভাবে তখন এই প্রবাদটি

বলা হয়। এছাড়াও চর অঞ্চলে আরও অনেক মৌলিক প্রবাদ প্রচলিত রয়েছে যেগুলির মধ্যে চরবাসীদের নিজস্ব ভাষা-সংস্কৃতির পরিচয় পাওয়া যায়।

এবার আমরা চরবাসীদের গতানুগতিক বা পূর্ব-প্রচলিত প্রবাদ সম্পর্কে আলোচনা করব। এই প্রবাদগুলি শুধু চর অঞ্চলেই নয় অন্যান্য অঞ্চলেও প্রচলিত আছে। চরবাসীরা পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে এসেছে তাই তাদের অনেক প্রবাদ পূর্ববঙ্গের প্রচলিত প্রবাদ। তবে অসমে আসার পর কিছু স্থানিক ও পারিভাষিক পরিবর্তন ঘটেছে—

১. আগের হাল জেনদিয়া যায়/পাছের হালো হেন দিয়া যায়।[২৪]
২. নদীর পানী ঘোলা ভালো/জাতের মেয়ে কালো ভালো।[২৫]
৩. দুস্ট লোকের মিষ্টি কথা ঘেইসা বসে কাছে/কথা দিয়া কথা নিয়া প্রাণে মারে শেষে।[২৬]
৪. ঠেলায় পরলে বাঘে ঘাস খায়।[২৭]
৫. চুন দিয়া মুখ পুড়ছে/দৈ দেইখ্যা ডর করে।[২৮]

এমন অনেক প্রবাদ রয়েছে যেগুলি শুধু চর অঞ্চলেই নয় অন্যান্য অঞ্চলেও এর প্রচলন রয়েছে।

চর অঞ্চলের জীবন নদীকেন্দ্রিক এবং নৌকার উপর নির্ভরশীল। সে জন্য এই অঞ্চলের লোকসাহিত্য নদীর মতোই প্রবহমান। এখানে প্রচলিত প্রবাদগুলিও যেন নদীর মতো গতিশীল। চর অঞ্চলে প্রচলিত প্রবাদগুলিতে নদী এক নতুন মাত্রা সংযোজন করেছে। এখানে প্রচলিত প্রবাদগুলি স্থানীয় ভাষা, উপভাষা, কৃষ্টি-সংস্কৃতি, সামাজিক ও কৃষি-জীবনের বিভিন্ন প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে। একই সঙ্গে প্রবাদগুলোতে চর অঞ্চলের মানুষের জীবন-যাত্রা, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, নিন্দা-বিদ্রুপ প্রভৃতির প্রতিফলন ঘটেছে। চর অঞ্চলে শিক্ষার হার খুবই কম তাই তাদের প্রবাদগুলিতে অনেক অশ্লীল শব্দও দেখা যায়। সব মিলিয়ে চর অঞ্চলের প্রবাদগুলি সেখানকার মানুষের এক জীবনের ধারাভাষ্য।

উৎসের সন্ধানে

১. প্রসূন বর্মন ও গোর্কী চক্রবর্তী সম্পাদিত : 'নাইনথ কলাম', দ্বাদশ সংখ্যা, বাসব রায়, মালিগাঁও, গুয়াহাটি, ২০১২, পৃ. ২৮
২. শ্রী আশুতোষ ভট্টচার্য : 'বাংলার লোকসাহিত্য', প্রথম খণ্ড, ৫ম সংস্করণ, এ মুখার্জী এন্ড কো. প্রা. লিমিটেড, ২০০৪, পৃ. ৫০০
৩. আশরফ সিদ্দিকি : 'লোকসাহিত্য', ১ম খণ্ড, পরিমার্জত সংস্করণ, গতিধারা, ঢাকা, বাংলাদেশ, ২০০৮, পৃ. ৩০
৪. হজরত আলী : 'পশ্চিম অসমর চরবাসীর ঘর বন্ধা প্রণালী আরু জন বিশ্বাস', পশ্চিম অসমর চর চাপরির লোকসংস্কৃতি, ড. উপেন্দ্রজিৎ শর্মা সম্পাদিত, ১ম প্রকাশ, অসম সাহিত্য সভা, যোরহাট, ২০১১, পৃ. ১৪৯
৫. আব্দুর রহিম : 'পশ্চিম অসমর চর চাপরির প্রচলিত সাঁথর আরু ফোকরা যোজনা', পশ্চিম অসমর চর চাপরির লোকসংস্কৃতি, ড. উপেন্দ্রজিৎ শর্মা সম্পাদিত, ১ম প্রকাশ, অসম সাহিত্য সভা, যোরহাট, ২০১১, পৃ. ১২২
৬. তদেব : পৃ. ১২২
৭. তদেব : পৃ. ১২২

৮. তদেব : পৃ. ১২২
৯. তদেব : পৃ. ১২৬
১০. নিজস্ব সংগ্রহ, অসমের বরপেটা জেলার মন্দিয়া অঞ্চল, সহায় করেছেন আনোয়ার হোসেইন।
১১. তদেব
১২. নিজস্ব সংগ্রহ, অসমের বরপেটা জেলার আলোপতি চর অঞ্চল, সহায় করেছেন হবিবুর রহমান।
১৩. তদেব
১৪. নিজস্ব সংগ্রহ, অসমের বরপেটা জেলার মাজর চর অঞ্চল, সহায় করেছেন গহের আলী মণ্ডল।
১৫. তদেব
১৬. নিজস্ব সংগ্রহ, অসমের বরপেটা জেলার আলোপতি চর অঞ্চল, সহায় করেছেন হবিবুর রহমান।
১৭. হবিবুর রহমান : 'বৃহত্তর অসমিয়া জাতি গঠনত চর চাপরিবাসীর অবদান', অসম সাহিত্য সভা, ১ম প্রকাশ, যোরহাট, ২০১৪, পৃ: ১১৫
১৮. তদেব : পৃ. ১১৫
১৯. তদেব : পৃ. ১১৫
২০. উৎস-৪, পৃ. ১২৩
২১. তদেব : পৃ. ১২৭
২২. তদেব : পৃ. ১২৭
২৩. নিজস্ব সংগ্রহ, অসমের বরপেটা জেলার মন্দিয়া অঞ্চল, সহায় করেছেন আনোয়ার হোসেইন।
২৪. তদেব
২৫. তদেব
২৬. তদেব
২৭. উৎস-৪, পৃ. ১২৩
২৮. তদেব : পৃ. ১২৩

সাগর দ্বীপের প্রচলিত প্রবাদ

বিনয় পাত্র

কায়ত সংস্কৃতিকে বর্তমান সাহিত্য ব্রাত্য করে রাখে না। সসম্মানে অধিকার দেয় অন্দরমহলে প্রবেশের। লোকায়ত জীবনের মধ্যেই থাকে সাহিত্যের ভিন্ন উপাদান, প্রবাদ হল অন্যতম। প্রবাদের মধ্যে থেকে পাওয়া যায় একটি জাতির সামগ্রিক জীবন চর্যার পরিচয়। সেদিক থেকে প্রবাদকে বলা যেতে পারে জনমানসের সারাৎসার।

পশ্চিমবঙ্গের তথা ভারতবর্ষের সীমান্তরেখায় সাগরদ্বীপের অবস্থান। গাঙ্গেয় ব-দ্বীপ অঞ্চলের উর্বর কৃষিজমিকে ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে এই দ্বীপের জনজীবন। ৪৩টি গ্রামসহ এই দ্বীপের আয়তন প্রায় ২২৪.৩ বর্গ কিলোমিটার। অতি ঘন জনবসতিপূর্ণ এই দ্বীপে প্রায় দেড় লক্ষ মানুষের বাসস্থান গড়ে উঠেছে। মকর সংক্রান্তির পুণ্য লগ্নে কপিলমুনির পূত স্পর্শের জন্য সারা ভারতবর্ষের অগুণতি মানুষ ভিড় জমায় এই দ্বীপে। ভারতবর্ষের মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন সাগরদ্বীপ সামাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যে সমগ্র ভারতবর্ষ তথা সুন্দরবন এলাকার মধ্যেও স্বতন্ত্রতার দাবি রাখে। কলকাতা থেকে এই দ্বীপের দূরত্ব প্রায় ১০০ কিলোমিটার হওয়া স্বত্ত্বেও শিক্ষার সামগ্রিক মানোন্নয়নে বিশেষ সফলতা অর্জন করেছে। ১৮টি উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়, ১টি মহাবিদ্যালয়, ৩টি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, ১টি আই. টি. আই. ও বেশকিছু প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে এখানে। তবে স্বাস্থ্য ব্যবস্থার বেহাল দশার কারণে সাধারণ মানুষকে প্রতিনিয়ত যন্ত্রণার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। একটিমাত্র অনাধুনিক গ্রামীণ হাসপাতালের উপর নির্ভর করে থাকতে বাধ্য হয় সমগ্র দ্বীপের মানুষজন।

অন্যদিকে, লোকায়ত সংস্কৃতির নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য নিয়ে তার দিনযাপন। মুচি, ডোম, পৌণ্ড্র, ক্যাওড়া, আদিবাসী, মুসলিম, খ্রিস্টান বিভিন্ন শ্রেণির ও ধর্মের মানুষ জীবনাচরণে, কথনশৈলিতে এক স্বতন্ত্র স্বর নির্মাণ করে চলেছে। তাঁদের বাক্‌ভঙ্গিমার যে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায় তার মধ্যে প্রবাদের বহুল ব্যবহার অন্যতম। বস্তুতপক্ষে, অঞ্চল বিশেষে জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রা, সমাজ-অভিজ্ঞতা ও মানবিকতার কিছু না কিছু স্বাতন্ত্র্য দেখা যায় এবং তার প্রতিফলন ঘটে বস্তু-উপকরণ, ভাব-ভাষা ও জীবনাচারের বহু বিচিত্র ধারায়। সাগরদ্বীপ অঞ্চলের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। এখানকার লোকসংস্কৃতিও সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র রূপে গড়ে উঠেছে। এই অঞ্চলে লোক, লোকায়ত জীবন-জীবিকাকে কেন্দ্র করে লোকসংস্কৃতির বিশেষ অঙ্গরূপে অসংখ্য প্রবাদের ও নতুন প্রবাদের সৃষ্টি হয়েছে। লোকায়ত জীবনের যাপন প্রক্রিয়ার সঙ্গে সম্পৃক্ত সাহিত্যের বিভিন্ন উপাদান, 'প্রবাদ' হলো তার অন্যতম। প্রসঙ্গত

বলে রাখা প্রয়োজন, 'সাগরদ্বীপের প্রবাদ', বা 'সুন্দরবনের প্রবাদ', কিংবা 'দক্ষিণ ২৪ পরগণার প্রবাদ' এই ধরণের চিন্তনগুলি সম্পূর্ণ ভুল। ভৌগোলিক সীমার দ্বারা কখনোই প্রবাদকে চিহ্নিত করা যায় না। যেকোনো প্রবাদের সঠিক উৎসস্থল অনুসন্ধান দুঃসাধ্য না হলেও খুবই কঠিন। দেখা গেছে, একই প্রবাদ পশ্চিমবঙ্গের ভিন্ন ভিন্ন দুটি প্রান্তের মানুষ তাদের নিজেদের কথাবার্তায় ব্যবহার করে থাকেন। সেক্ষেত্রে হয়তো আঞ্চলিক শব্দের পরিবর্তন ঘটে এবং সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু প্রবাদের গূঢ় অর্থ অপরিবর্তিত থেকে যায়। তাই, আমার মতে, বর্তমান সাগরদ্বীপ অঞ্চলে ব্যবহৃত প্রবাদগুলিকে কখনোই সাগরদ্বীপের ভৌগোলিক সীমারেখা দিয়ে বাঁধা যাবে না। একথা স্মরণে রেখে, সাগরদ্বীপের বিভিন্ন গ্রামে গিয়ে ক্ষেত্রসমীক্ষার মাধ্যমে সংগৃহীত প্রবাদগুলিকে আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যের প্রেক্ষিতে বর্গীকরণ ও আলোচনা করার চেষ্টা করেছি।

১. সামাজিক চরিত্র বা সমাজ জীবন বিষয়ক প্রবাদ

- **কেউ মরে বিল ছেঁচে, কেউ খায় কই।**

বর্তমান সমাজে প্রকৃত মানীর মান ব্যক্ত হয় না। যারা জ্ঞানী-গুণী তাঁরা তাঁদের প্রাপ্য সম্মান থেকে বেশিরভাগ সময়েই বঞ্চিত হয়। প্রকৃতপক্ষে গুণের অধিকারী নয় যেসকল ব্যক্তি, বর্তমান সমাজে তারাই বেশি সম্মানীত হন। আসল নকলে পরিণত হয়, আর নকল আসলে। যে ব্যক্তি কাজ করে সমাজ তাকে কাজের স্বীকৃতি দেয় না। যে ফাঁকি দেয়, কাজ করে না, সমাজের চোখে সেই প্রকৃত সমাজসেবীর শিরোপা পায়। প্রবাদটিতে আমরা দেখতে পাই, যে ব্যক্তি কষ্ট করে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে বিল ছেঁচলো, কাদামাটি ঘাঁটলো, তার কপালে কই মাছ দূর অস্ত, কোনো মাছই জুটলো না। উপাদেয় কই মাছ জুটলো তারই যে বিলের জল ছেঁচা তো দূরের কথা, বিলের ত্রি-সীমানাতেই আসেনি। প্রাত্যহিক বাস্তব জীবন-যাপনে এই প্রবাদটির ব্যবহারিক মূল্য অপরিসীম।

- **খেয়ে যায় নিয়ে যায় আর যায় চেয়ে**
  কে যায় কে যায় বাঙালির মেয়ে।

বাঙালি মেয়েরা যখন শ্বশুরবাড়ি থেকে তার বাপের বাড়িতে আসে, তখন বাবার বাড়িতে ভালো-মন্দ খাবার খায় এবং শ্বশুরবাড়ি ফিরে যাওয়ার সময় বাপের বাড়ির বাগানের কিছু শাক-সব্জি নিয়ে যায়। বাবাকে এ কথাও বলে যায়, কিছুদিন পরে যেন বাগানের অন্যান্য শাক-সব্জি তাকে দিয়ে আসে। বাবার দিয়ে মন ভরে না, মেয়েও গ্রহণে অনিচ্ছুক নয়। প্রবাদটির মধ্য দিয়ে পিতা ও কন্যার স্নেহ-ভালোবাসার অপূর্ব ছবি ফুটে উঠেছে। পাশাপাশি আমরা বাংলার চিরায়ত সংস্কৃতিকেও এই প্রবাদের মাধ্যমে দেখতে পাই।

- **যে আইল চষিয়া সে রইল বসিয়া, লাড়া কাটাকে ভাত দে আইসিয়া।**

প্রকৃত কাজের ব্যক্তি প্রশংসাকে উপেক্ষা করে প্রতিনিয়ত কাজ করে চলে। প্রচারের আলো থেকে সে শত হাত দূরে থাকতে চায়। কিন্তু সমাজে অলস, অকর্মণ্য, বাউণ্ডুলে এমন কয়েকজন মানুষ আছে যারা কাজ না করেও নিজেদেরকে প্রচারের আলোয় তুলে ধরে এবং প্রশংসা দাবি করে। প্রাত্যহিক জীবন-যাপনে প্রবাদটির ব্যবহারিক মূল্য অপরিসীম।

- **আশা দিল ভরসা দিল জমিন দিবে রুইয়া**
  আষাঢ় মাস আইলে পরে ঘরে রইবে শুইয়া।

সমাজে এক শ্রেণির মানুষ আছে যারা কথা দিয়েও কথার যথার্থ মর্যাদা কোনোদিনই রাখে না। ধান চাষের মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজের সময়েও এরা ঘরে শুয়ে থাকে। সবার কাছে বিশ্বাসঘাতক প্রতিপন্ন হওয়া সত্ত্বেও এই শ্রেণির লোকেরা বেহায়া, নির্লজ্জের মতো সমাজে মাথা উঁচু করে কথা বলে। তারা মনে করে এতেই তাদের জীবনের আনন্দ। সাগরদ্বীপের মানুষের বাস্তব জীবনাভিজ্ঞতার ফসল এই প্রবাদ।

২. পারিবারিক সম্পর্ক আশ্রিত প্রবাদ

- **তোমার আছে আমার আছে আইস দুভাই খাই**
  তোমার নেই আমার আছে কিসের পেলের ভাই।

কথায় আছে তোমার আছে তো আমার আছে, তোমার নেই তো আমারও নেই। অর্থাৎ বন্ধুত্ব, অভ্যর্থনা, আপ্যায়ন সবই সমমানের ব্যক্তি বা সমমানের পরিবারের মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী হয়। মানুষের বা কোনো পরিবারের যখন আর্থিক অবস্থা ভালো হয়, তখন তাদের চারিদিকে অনেক তোষামোদকারী বন্ধু জড়ো হয়। পরিবারের দুরবস্থার দিনে সকলে নিজেদেরকে সরিয়ে নেয়। সমাজে দীন ক্ষুধার্তকে কেউ খেতে দেয় না। যার আছে, যে খেতে চায় না, তাকেই খাওয়ানোর জন্য সবাই ব্যস্ত থাকে। এক কথায় গরিবের বন্ধু কেউ-ই হতে চায় না। বরং সমাজ-সংসার তাদেরকে ঘৃণার চোখে দেখে। তাই সমকক্ষ অনুযায়ী আত্মীয় করতে হয়। সমকক্ষ ছাড়া বন্ধুত্ব স্থায়ী হয় না। প্রবাদটির শব্দচয়ন ও কাব্যিক সৌন্দর্য আমাদের মুগ্ধ করে।

- **কানের ভাতার কান খড়ি-গো, হ্যাসের ভাতার দড়ি**
  মায়ার ভাতার পুরুষ যেমন, পুরুষের ভাতার কড়ি।

'ভাতার' অর্থে এখানে একমাত্র অবলম্বন বা সহায়ককে বোঝানো হয়েছে, যা না থাকলে মূল বস্তুটির অস্তিত্বের সংকট দেখা যায়। কান যখন চুলকায় তখন খুব প্রয়োজন হয় কান-খুড়কা বা কানে দেওয়া কাঠি। হ্যাসের একমাত্র অবলম্বন দড়ি। দড়ি দিয়ে একটি সুনির্দিষ্ট পদ্ধতিতে বুনন করা হয় বলে তার অস্তিত্ব টিকে থাকে। আবার নারীর জীবন-যৌবন, স্বমহিমায় বেঁচে থাকার অধিকার প্রভৃতি নির্ভর করে তার স্বামীর অস্তিত্বের উপর। তেমনি পুরুষের অস্তিত্বও নির্ভর করছে তার আয়ের উপর। পুরুষের নিজস্ব আয় না থাকলে সে অস্তিত্বের সংকটে পড়ে। পরিবারের সুখ বিঘ্নিত হয়। প্রবাদটিতে অপূর্ব ছন্দ সুষমার প্রকাশ ঘটেছে।

- **আইসে কুটুম যায় উপাসি, সেই কুটুমকে ভালোবাসি।**

যে প্রতিনিয়ত তার নিকট আত্মীয়ের বাড়িতে এসে ভালো-মন্দ, অসুখ-বিসুখে খোঁজ-খবর নেয়, বিপদের দিনে পাশে এসে দাঁড়ায়, বিনিময়ে সুখের দিনে কোনো কিছু প্রত্যাশা বা দাবি করে না, তাকে সবাই পছন্দ করে ও ভালোবাসে। অর্থাৎ স্বার্থহীন ও পরোপকারী মানুষকেই সবাই সম্মান সমাদর করে থাকে। মানুষের একেবারে মনের কথা সুন্দরভাবে এই প্রবাদে উঠে এসেছে।

● পা-র উপরে পা কেন—এক জায়গায় আছি
হাগতে হাগতে শাক তুলুটু কেনি আলাদা হইছি।

প্রবাদটির উপরিতলে একান্নবর্তী পরিবারের ছবি থাকলেও অন্তঃস্থলে এক গূঢ় ব্যঞ্জনা রয়েছে। সম্মিলিত প্রচেষ্টায় কোনো কাজ করার সময় মানুষ আত্মকেন্দ্রিক হয়ে ওঠে। নিজের সর্বস্ব উজাড় করে দিয়ে কাজ করে না। সীমায়িত করে ফেলে তার চারিদিকের গণ্ডিকে। দুবর্লতার ভান করে হীন মানসিকতার পরিচয় দেয়। সেখানে একক ব্যক্তি নিজের কাজের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ শক্তির পরিচয় রেখে নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেও কাজ শেষ করে ফেলে। এক্ষেত্রে আত্মসচেতনতা বোধ কাজ করে। অর্থাৎ পরিবারের বা সমাজের যেকোনো কাজের ক্ষেত্রে যেখানে দশজন মিলেমিশে কাজ করার প্রয়োজন হয়, সেখানে মানুষ পুরোপুরি নিঃস্বার্থ হয়ে উঠতে পারে না।

৩. লোককাহিনি, উপদেশ, পরামর্শ, সতর্কীকরণ সম্বলিত প্রবাদ

● মা ঘরণি, ঘন লেজুড় লাড়ে, উঁচার জল খালকে গড়ে।

এটি একটি লোকশিক্ষামূলক কাহিনিভিত্তিক প্রবাদ। এর সাহিত্যিক মূল্য ও ব্যবহারিক মূল্য অপরিসীম। এখানে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উল্লেখ রয়েছে—

১. বংশমর্যাদা দেখে আত্মীয়তার সম্পর্ক গড়ে তোলা উচিত। মা যদি ভদ্র-সভ্য হয়, সত্যিকারের গৃহিণী হয়, তার মেয়েও ভালো হতে বাধ্য। আর মা যদি উগ্র, ঝগড়াটে, অসামাজিক হয়, তাহলে তার মেয়ের মধ্যেও সেই গুণ কিছুটা হলেও প্রকাশিত হবে। সেকারণে ছেলের বিয়ের পূর্বে মেয়ের মামা বংশ ও মায়ের স্বভাবচরিত্র জানা অত্যন্ত জরুরি।

২. যে গোরু ঘন ঘন লেজ নাড়ে, গায়ে হাত দিলে লেজ ঝামটা দেয়, সেই বলদ খুব ছটফটে ও চনমনে হয়। এই বলদ হাল-লাঙ্গলের কাজ খুবই ভালো করতে পারে। চাষের জন্য গরু কেনার সময় এই বৈশিষ্ট্যগুলি ভালো করে পর্যবেক্ষণ করে তবেই গোরু কেনা উচিত।

৩. যে জমির উপর দিয়ে উঁচু জায়গার সমস্ত জল গড়িয়ে যায়, সেই জমি খুব উর্বর ও ধান চাষের পক্ষে উপযোগী হয়। কারণ উঁচু জায়গা থেকে নিচের দিকে জল নেমে আসার সময় জলের স্রোতে মাটির কণা ও পলির কণা ভেসে আসে এবং তা নিচু জায়গায় সঞ্চিত হয়ে একটি পলির স্তর সৃষ্টি করে। এই স্তর আসলে পলি-দোঁয়াশ মাটির যা খুব উর্বর। পলি-দোঁয়াশ যুক্ত উর্বর মাটিতে ধানের ফলন ও উৎপাদন দুই-ই বেশি হয়।

● এটা নেই তো ওটা নেই, ওটা নেই তো সেটা নেই।

এই প্রবাদটির মধ্যেও একটি কাহিনি রয়েছে। বাবা তার মেয়ের বিয়ের ব্যাপারে কথা বলার জন্য ছেলের বাড়িতে উপস্থিত হয়েছেন। খাওয়ার সময় তিনি লক্ষ করেন ছেলের বাড়িতে বিড়াল নেই। বিষয়টি পাশে খেতে বসা একজনকে বললে ওই ব্যক্তি উদ্ধৃত প্রবাদটি ব্যক্ত করেন।

এটা = বিড়াল (বিড়ালের খাবার হলো ইঁদুর, তা ছেলের বাড়িতে নেই)

ওটা = ইঁদুর (ইঁদুরের খাবার হলো ধান-চাল, তা ছেলের বাড়িতে নেই)
সেটা = ধান-চাল (সুতরাং, ছেলের বাড়িতে ধান-চালের অভাব আছে)
(বিড়াল > ইঁদুর > ধান-চাল)

মেয়ের বাবা আসল রহস্য বুঝতে পেরে সেই বাড়িতে তার কন্যাকে সম্প্রদান করেনি। লোককাহিনির পাশাপাশি প্রবাদটিতে লোকশিক্ষাও রয়েছে। একটি পরিবারের অর্থনৈতিক ভিত্তি কতটা সুদৃঢ়, তা জানা গেল গৃহপালিত পশুর মধ্যে দিয়ে।

৪. মানুষের চরিত্র সম্পর্কিত প্রবাদ

- **মুয়ে খাঁদির বেয়া নেই, তার দু-পায়ে আলতা।**

প্রতিটি মানুষের একটা নিজস্ব স্টাইল রয়েছে। এই স্টাইল বা শৈলীর মধ্যে দিয়ে মানুষের স্বতন্ত্রতার পরিচয় পাওয়া যায়। বাহাদুরি দেখানো, সবার কাছে নিজেকে বড়ো করে মেলে ধরবার প্রচেস্টা মানুষের চিরন্তন প্রবৃত্তি। এই বাসনাকে চরিতার্থ করতে গিয়ে মানুষ তার নিজের ওজন, সীমাবদ্ধতাকে ভুলে যায়। ফলে সে তখন সমাজের চোখে হাসি-ঠাট্টা, ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ ও সমালোচনার পাত্র হয়ে ওঠে।

- **উদ খাইতে খুদ নেই, কলমি শাকের জিরা।**

প্রতিটি মানুষের উচিত তার নিজস্ব আয়ের অনুপাতে ব্যয় করা। তা না করে কেউ যদি আয়ের অধিক ব্যয় করতে থাকে, তাহলে তার পক্ষে সংসার চালানো মুশকিল হয়ে পড়ে। সমাজে এক শ্রেণির ঠাঁটবহুল মানুষ আছে যারা আর্থিক দিক থেকে দরিদ্র হলেও বাইরে বাইরে আভিজাত্যের রঙিন আবরণে নিজেদেরকে আবৃত রাখতে এবং লোককে দেখাতে খুব ভালোবাসে। যে ক্ষমতা বহির্ভূত কাজ করে, সেই ব্যক্তি সমাজের চোখে পরিহাসের পাত্র হয়ে ওঠে।

৫. কৃষিকেন্দ্রিক প্রবাদ

- **এক আনার তরে টাকাটা হারিলি, বৌ আনি হারিলি পো**
  ঠিক দুফোর বেলা মইটা জুড়িকি, চাষের হারিলি জো।

সময়ের কাজ সময়ে করা উচিত। নির্দিস্ট সময়ের কাজ নির্দিস্ট সময়ে না করলে, ওই কাজের জন্য নতুন করে আর সময় পাওয়া যাবে না। ফলে একটুখানি অলসতার জন্য অনেকসময় মানুষকে বড় ধরনের ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়। যেমন, এক টাকায় এক আনা কম থাকলে তাকে এক আনা বলা যায় না। উপযুক্ত বয়সে বিয়ে না করলে সময় মতো সন্তান লাভ অসম্ভব। আর সময় মতো যদি কেউ চাষের কাজ না করে, তাহলে তার উৎকৃস্ট ফসলের আশা না করাই ভালো।

সাগরদ্বীপ অঞ্চলে এমনই শত শত মুক্তোর মতো প্রবাদ লোকসমাজে মৌখিক ধারায় প্রচলিত রয়েছে। এইগুলির সংগ্রহ এবং সংকলন লোকসংস্কৃতিবিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। সাগরদ্বীপের বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত লোকসমাজ, নিত্যযাত্রী, মহিলা প্রমুখরা যেখানে জমায়েত হয় এবং নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা, হাস্যরসিকতা, গল্প-গুজব করে, সেখানে তারা কথার ফাঁকে ফাঁকে বক্তব্য বিষয়কে আরো পুস্ট ও শক্তিশালী করে পরিবেশন করার সময় স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রবাদ ব্যবহার করে। প্রবাদগুলোর গঠন বৈচিত্র্য বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ,

অধিকাংশ প্রবাদের মধ্যে অন্ত্যমিল বর্তমান। গদ্যপ্রবাহ আদৌ নেই বললেই চলে। আবার প্রকাশ ভঙ্গিমার মধ্যে রয়েছে রূপক, শ্লেষ-বক্রোক্তি, ব্যজস্তুতি ইত্যাদি অলংকারের সার্থক প্রয়োগ। এর ভাষা সাগরদ্বীপের লোকভাষা। এর সমাজ সাগরদ্বীপের লোকায়ত সমাজ। এগুলি সাগরদ্বীপের লোকসমাজ দ্বারা সৃষ্ট, স্বীকৃত ও সম্প্রসারিত। সচেতন প্রচেষ্টা ব্যতীত প্রচলিত প্রতিটি প্রবাদই সামাজিক, ধর্ম-সংস্কার, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, মনস্তাত্ত্বিক, দার্শনিক ও নান্দনিক দিক দিয়ে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। প্রবাদগুলির মাধ্যমে সাগরদ্বীপ অঞ্চলের লোকসমাজের সামগ্রিক পরিচয় পাওয়া যায় যা সাহিত্য, ইতিহাস ও সমাজবিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এগুলি লোকসাহিত্যের অমোঘ আকর, যে আকর সতত সংরক্ষণ করা আমাদের নৈতিক ও জাতীয় কর্তব্য। সংগৃহীত আরো কিছু প্রবাদের উল্লেখ এখানে করা হলো—

- ছিলেন গো কাঠুরার ঝি, রাজা আনল বলে মুড়ি ভুজা কুন গাছে ফলে।
- কথায় মরল রাজার ঝি, শুঁট পিপুল তার করবে কী।
- এক কে পারেনি আর কে ধায়, হাগতে পারেনি দাঁত কড়মসি খায়।
- গা লড়েনি বন্দুক ঘাড়ে, শুইয়া পড়িয়া আওয়াজ করে।
- আড়ে নেই ফাঁড়ে আছে, লম্বায় নেই চওড়ায় আছে।
- শান্ত গাইর বাছুর মরা।
- গা-র গন্ধে ভুত পালি যায়, মাথায় শিমুল ফুল।
- আছে গরু না বয়ে হাল, তার দুঃখ চিরকাল।
- ঘটে নাই ইন্দি, ভজেরে গোবিন্দি।
- তল বালা খসুছি উপর বালা হাসুছি।
- ঘ্যানঘেনে জ্বরে আর প্যানপেনে ভাতারে, আর কিছু না পারে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মারে।
- তিন মাথার বুদ্ধি লুবু, মাঝু পুকুরের জল খাবু, বাড়িতে হাট বুসিবু, প্রতি খাবোলে মাছের মাথা খাবু।

❑ **তথ্যদাতা**—১. চিত্তরঞ্জন পাত্র ২. ভাগ্যধর বারিক ৩. শক্তিশীলা পাত্র ৪. শ্রীপতি মণ্ডল ৫. অন্নপূর্ণা দাস ৬. গুরুপদ বেরা।

গ্রন্থপঞ্জি

- ‘আকাদেমি বানান অভিধান’, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, জানুয়ারি ২০০৯
- শ্রীসুশীল কুমার দে : ‘বাংলা প্রবাদ’, ১ম সংস্করণ, কলিকাতা, রঞ্জন পাবলিশিং হাউস, আশ্বিন ১৩৫২

WEBSITE

- Sundarban Wikipedia
- Sagar Island Wikipedia

শাশুড়ি-বধূ সম্পর্কিত লোকপ্রবাদ : প্রসঙ্গ বরাক উপত্যকা

বুবুল শর্মা

লোকসাহিত্যের নিরক্ষর মানুষরা অবসর বিনোদনের উপায় হিসেবে উদ্ভাবন করেছিল ছড়া, প্রবাদ-প্রবচন, ধাঁধা, লোকগান ইত্যাদি। স্বভাব কবিত্ব, সহজ-সরল মনের প্রকাশ এবং অনাড়ম্বর ভাবই ছিল মুখ্য, কৃত্রিম মায়াজাল কিংবা চমৎকারিত্ব সৃষ্টির প্রয়াস সেখানে অনুপস্থিত। মেয়েলি পরিসরে রচিত প্রবাদে সংসার জীবনের স্মৃতিকথা থেকে উঠে আসা সমকালের সমাজ ও নারী জাতি সম্পর্কিত নানা তথ্য যেভাবে উঠে আসে, ঠিক তেমনি পারিবারিক জীবন প্রবাহের মধ্যে আবর্তিত প্রবাদ-প্রবচনের মধ্য দিয়ে নারী মনস্তত্ত্বের প্রকাশও আমরা লক্ষ করতে পারি।

বরাক উপত্যকার বাঙালি সমাজ পুরুষপ্রধান। তাই সমাজ-সংসার নিয়ন্ত্রণের ভার পুরুষের হাতেই থাকে। পুরুষের থেকে নারীরা একধাপ পিছিয়ে। সামাজিক ও পারিবারিক জীবনে নারীর অধিকার সীমিত এবং নানা শর্তসাপেক্ষে সীমাবদ্ধ। বাঙালি রমণীর বিবাহিত জীবনে স্বামীর বাড়ির নতুন পরিবেশে পরিবারের সবার সঙ্গে মানিয়ে চলতে সময়ের প্রয়োজন হয়। তখন থেকেই তাকে নানা বিরূপ পরিস্থিতির শিকার হতে হয়। বরাক উপত্যকায় প্রচলিত প্রবাদ-প্রবচনে নারীর প্রতি চরম অবহেলা আর অবজ্ঞাই প্রকাশ পেয়েছে। বরাক উপত্যকায় প্রচলিত প্রবাদগুলি অধিকাংশই বাংলাদেশ থেকে এসেছে। এই অঞ্চলের অসংখ্য প্রবাদে সমাজ জীবনের যে চিত্র ফুটে উঠেছে তা একান্তই বাস্তব এবং তার মধ্যে গভীর সত্য প্রকাশ পেয়েছে। বরাক উপত্যকার লোক প্রবাদে নারীদের সংকীর্ণ মনের প্রকাশ, প্রতিবেশিনীর উপর হিংসা, নববধূর প্রতি উপেক্ষা, সতীনের প্রতি হিংস্রভাব, ঘর জামাইয়ের প্রতি অশ্রদ্ধা, বিবাহিত পুত্রের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি, আবার স্নেহপ্রবণ মনেরও পরিচয় পাওয়া যায়। আসলে প্রবাদের সত্য আপেক্ষিক, চিরন্তন নয়, তথাপি প্রবাদ বাস্তব ও প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতায় সরস বুদ্ধির প্রকাশ।

প্রবাদের মুখ্য উদ্দেশ্য ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ নয়, সুস্থ-সুন্দর সাংসারিক জীবন-যাপনের জন্য সাধারণ মানুষকে জ্ঞান দান বা উপদেশ দেওয়া। প্রবাদে যেভাবে ঘৃণা ও নিন্দা প্রকাশ পেয়েছে, ঠিক তেমনি প্রশংসা করার মনোভাবও প্রকাশ হতে দেখা যায়। বস্তুত, প্রবাদের অন্তরালে প্রচ্ছন্ন থাকে মানব জীবন ও তার ইতিহাস। বরাক উপত্যকার সিলেটি ভাষা গোষ্ঠীর মানুষরা এই ধরনের প্রবাদের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত। বর্তমান সময়ে প্রবাদের প্রচলন অনেকটা কমে গেলেও, কথাপ্রসঙ্গে অনেকের মুখ থেকে কিছু না কিছু প্রবাদের ব্যবহার লক্ষ করা যায়।

প্রবাদ সমাজ জীবনের নানা খুঁটিনাটি বিষয় এমনকি মেয়েলি বা রান্নাঘরের কথাকেও উপেক্ষা করে না। নারীর জবানিতে ফুটে ওঠা প্রবাদগুলিতে নারী মানসিকতাই পরিস্ফুট। লেখ্য সাহিত্যের মার্জিত প্রবাদের প্রচলন বরাক উপত্যকায় খুবই অল্প। বরাক উপত্যকার সমাজ জীবনে প্রাত্যহিক কথোপকথনে প্রবাদের ব্যবহার লক্ষনীয়, যেমন—কোনো সামাজিক বৈঠক, বিচার সভা, প্রাত্যহিক আলাপচারিতা, ঝগড়া-কলহের বাক্যবাণে, কনিষ্ঠদের উপদেশ বা জ্ঞান দানে, পরামর্শ দানের নানা ছুতোয় প্রবাদের ব্যবহার ইত্যাদি এই অঞ্চলে নিত্যদিনের ব্যাপার। এই উপত্যকায় প্রচলিত প্রবাদের প্রাথমিক রূপ গ্রাম্য ভাষায় এখনও ব্যবহৃত হচ্ছে। লোকায়ত জীবনের নানা ঘটনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, জীবনধারণ শৈলী, রসবোধ সময়ের সঙ্গো পরিবর্তিত সমাজের নানা চিত্র বরাক উপত্যকার প্রবাদে ধরা পড়ে। আমরা বরাক উপত্যকায় শাশুড়ি-বধূ সংক্রান্ত প্রবাদের কিছু নমুনা নিম্নে দেওয়া হলো।

২

১. অলক্ষি যেবায় জাইন
উপ্তা বাতাসের লগ পাইন।
অর্থ : অলক্ষী যেদিকে যান, উল্টো বাতাসের সঙ্গ পাওয়া
প্রসঙ্গা-কথা : হতভাগা নারীর কপালে নানা দুর্গতি কোথাও তার শান্তি নেই।

২. আওলা বেটির বাওলা কীর্তন।
অর্থ : ভাবুক মহিলার বাউল কীর্তন
প্রসঙ্গা-কথা : আবেগবশত কোনও নারী গান কীর্তন শুরু করলে অনেক সময় এই ধরনের মন্তব্য শুনতে হয়।

৩. এয়ো কপালো সিন্দুর দেখে
রাড়ির কপাল চুলকায়।
অর্থ : সধবার কপালে সিঁদুর দেখে বিধবার কপাল চুলকানো
প্রসঙ্গা-কথা : সধবার কপালে সিঁদুর দেখে বিধবার মর্মবেদনা।

৪. আইলে সুন্দর কিয়ারি আর
চুলে সুন্দর ঝিয়ারি।
অর্থ : কৃষিকাজের জমির আল সৌন্দর্য, আর রমণীর সৌন্দর্য চুলে
প্রসঙ্গা-কথা : কৃষকের হাল চাষের জমি যেমন আল দিয়ে বেঁধে সুন্দর করা হয়, তেমনি রমণীর সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায় সুবিন্যস্ত চুলের পারিপাট্যে।

৫. এড়ি অন্তে রাড়ি ভালা
পাক অন্তে পানি ভালা।
অর্থ : সধবা থেকে বিধবা ভালো, কাদা থেকে জল ভালো
প্রসঙ্গা কথা : স্বামী পরিত্যক্ত নারী থেকে বিধবা নারীর স্বভাব বৈচিত্র্য প্রতিফলিত করতে এই প্রবাদের ব্যবহার।

৬. একলা ঘরের বউ
খাইতে বড় সুখ

মারতে আইলে ধরতে নাই
ওউই বড় দুখ।

অর্থ : একা ঘরের বধূ খুব সুখে খায়, মারতে এলে ধরতে নেই, এটাই বড় দুঃখ

প্রসঙ্গা-কথা : নিঃসঙ্গা জীবন যাপনের করুণ চিত্র।

৭. গাই ভালা তো বাছুর ভালা
দুধ ভালা তো ঘি
নিতি নিতি নাইওর নিয়া
নষ্ট করলায় ঝি।

অর্থ : গাভী ভালো হলে বাছুর ভালো হবে, দুধ ভালো তাহলে ঘি ভালো হবে, নিত্য যদি মেয়ে বাবার বাড়ি যায়, তাহলে নষ্ট হবে।

প্রসঙ্গা-কথা : গাভীর গঠন প্রকৃতির সঙ্গো বাছুরের সম্পর্ক আর, গাভীর দুধ ভালো হলে উত্তম ঘি প্রস্তুত হবে। অপরদিকে মেয়ে যদি ঘন ঘন বাপের বাড়ি যায় তাহলে সে নষ্ট হবে।

৮. গাউ নষ্ট বাদে
পা নষ্ট খাদে
বউ নষ্ট নাইয়র দিলে
পুড়ি নষ্ট পাড়া বেড়ানিত দিলে।

অর্থ : গ্রাম নষ্ট খারাপ মানুষে, পা নষ্ট হয় খাদে পড়লে, বধূ নষ্ট হয় নাইওর দিলে, কন্যা নষ্ট হয় ঘুরতে দিলে।

প্রসঙ্গা কথা : এই প্রবাদের সাহায্যে বোঝানো হচ্ছে কিভাবে সামাজিক শৃঙ্খলা বজায় রাখতে হয়।

৯. যারে কিলায় না হাইয়ে
তারে কিলায় ভূতে।

অর্থ : স্বামী শাসন করে না স্ত্রীকে, তাকে শাসন করে ভূতে।

প্রসঙ্গা কথা : স্বামী শাসন করেন না বলে এই উক্তি।

১০. যেমন মা তেমন ঝি
তার তনে বড় নাতিনটি।

অর্থ : যেমন মা তেমন ঝি, তারথেকে বড় নাতিন।

প্রসঙ্গা-কথা : এখানে দিদিমার চাইতে নাতিনটি আরো জাদরেল।

১১. যার লাগি যার মজে মন
বিষ্ঠা আয় চন্দন।

অর্থ : যেখানে যার মন, সেখানে নোংরাও চন্দন হয়ে যায়।

প্রসঙ্গা-কথা : মনের মিল।

১২. তিনদিনর বউয়ে তিন কাম করে
আকতা পানিদি লাউ গাছ মারে।

অর্থ : নববধূ কাজ জানে না তাই, হঠাৎ জল দিয়ে লাউ গাছ মারে।

প্রসঙ্গা-কথা : নববিবাহিত বধুকে দিয়ে কাজ করানোর প্রয়াস। এখানে অনভিজ্ঞতা জনিত কারণে কাজে বিভ্রাট ঘটে।

১৩. তিন বিষ্ঠার বেটি

অর্থ : মল।

প্রসঙ্গা কথা : অতি নগণ্য।

১৪. দুস্ট লোকের মিস্ট কথা
লম্বা ঘোমটার নারী
পেনার তলর শীতল পানি
তিনউ মন্দকারি।

অর্থ : দুস্ট মানুষের মিস্টি কথা, লম্বা ঘোমটায় নারী, কচুরিপানার নিচের ঠান্ডাজল, তিনটিই মন্দ।

প্রসঙ্গা-কথা : এখানে বাইরের বূপ দেখে না ভোলার ইঙ্গিত প্রকাশ পেয়েছে।

১৫. পরর বাড়ির সাদি
নাচিয়া মরে হারামজাদি।

প্রসঙ্গা কথা : প্রতিবেশীর বাড়িতে বিয়ের আয়োজনে রমণীর আনন্দ প্রকাশেও বাধাদান।

১৬. বেটিন জাত অজবুত
পানি দেখলে আয় মুত।

অর্থ : রমণীরা এতোটাই বোকা যে জল দেখলে প্রস্রাব এসে যায়)

প্রসঙ্গা-কথা : মেয়েদের ভয়-বিহ্বল চিত্রের প্রকাশ।

১৭. ভাই হউর দেখলে গোয়া গাছেও মাথা নোয়ায়।

অর্থ : ভাসুরকে দেখলে সুপারি গাছেও মাথা নোয়ায়।

প্রসঙ্গা-কথা : ভাসুরকে সমীহ করে চলার জন্য এই প্রবাদ।

১৮. মাতিলে মায় মাইর খায়
না মাতিলে বাপে কুত্তা খায়।

অর্থ : কথা বললে নির্যাতন, না বললে বাবা কুকুর খাবে।

প্রসঙ্গা কথা : চূড়ান্ত নির্যাতন।

১৯. মা ঝি যেন
বউর ভাত নাই ইন।

অর্থ : মা-মেয়ে যেখানে, সেখানেই বধুর ভাত নেই।

প্রসঙ্গা-কথা : শাশুড়ি, ননদ যেখানে বর্তমান সেখানে শ্বশুরবাড়িতে নববধূর জীবন নির্বিঘ্ন নয়, এখানে শ্বশুরবাড়িতে নির্যাতিতা বধূর মনোবেদনা প্রকাশ পায়।

২০. মায় ডাকিলে জুয়াপ নাই
তাই ডাকিলে উবাও আই।

অর্থ : মায়ের ডাক শুনে পুত্রের কোনও উত্তর নেই কিন্তু, স্ত্রী ডাকলে দাঁড়াও আসি

প্রসঙ্গা-কথা : মায়ের কথায় গুরুত্ব নেই কিন্তু, স্ত্রীর কথায় অধিক গুরুত্ব প্রকাশ।

২১. গাঙ্গো দিয়া বইয়া যায় একছড়ি কলা
হড়ি বউয়ে ঝগড়া করইন কার কেমন গলা।
অর্থ : নদী দিয়ে ভেসে চলে এক ছড়ি কলা, শাশুড়ি-বউ ঝগড়া করে কার কেমন গলা।
প্রসঙ্গা-কথা : শাশুড়ি বধু সংক্রান্ত প্রবাদে আমরা লক্ষ করি, প্রায় সব সময়ই তাদের মধ্যে একটা কটু সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। একে অপরের প্রতি দোষারোপ করতেই যেন অভ্যস্ত।

২২. মাউগর বাড়ুয়া
অর্থ : স্ত্রীর কথায় চলে।
প্রসঙ্গা-কথা : স্ত্রীর কথার অবাধ্য হয় না।

২৩. সারাদিন এলেমেলে
হাই আইতে বারা বানে দুম্বা ফালে।
অর্থ : সারাদিন ঘুরাঘুরি, স্বামী যখন ঘরে আসে তখন স্ত্রী ধান বানতে থাকে লাফিয়ে লাফিয়ে।
প্রসঙ্গা কথা : বধূ সারাদিন কোনও কাজকর্ম করেনি, কিন্তু স্বামী আসতেই ধান ভাঙতে শুরু করেছে।

২৪. হড়িয়ে বউয়ে যখন করইন ক্যারেংকাল
আরি পরিয়ে হুনিয়া কইন
ওউ লাগসে করতাল।
অর্থ : শাশুড়ি বধূ যখন ঝগড়া করে তখন, পাড়া-প্রতিবেশী তা শুনে বলে এখন লাগছে করতাল।
প্রসঙ্গা কথা : শাশুড়ি পুত্রবধূর কোন্দল পড়শীদের আমুদের বিষয় হয়ে দাঁড়ায়।

২৫. হড়ি নাই ঘর
বউ সাইর।
অর্থ : শাশুড়ি ঘরে না থাকলে পুত্রবধূ সেয়ানা।
প্রসঙ্গা কথা : শাশুড়িবিহীন পরিবারে বধূ প্রধান হলে তা অন্যের মাথা ব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

২৬. হাইর কড়িদিয়া ভাইর নাম
ভাই আইতে নাইয়র যাইন।
অর্থ : স্বামীর টাকায় ভাইয়ের নাম, ভাই এলে বাবার বাড়ি যান।
প্রসঙ্গা কথা : শাশুড়ি কর্তৃক বধুর সমালোচনা।

২৭. কার হকদায় খাও বান্দি
ঠাকুর চিন না।
অর্থ : কার টাকায় তুমি খাও, তাকে তুমি চেনো না।
প্রসঙ্গা-কথা : বধূ শাশুড়ির কাছে যে গোলাম সেটার উদাহরণ।

২৮. ধব ধবাইয়া আটে বেটিয়ে
চুখ পাকাইয়া চায়
মুলুকর আগে রান্ধে বেটিয়ে
হাইর আগে খায়।
অর্থ : ডুমডুম শব্দ করে হাঁটা, বড় বড় চোখ দিয়ে তাকায়, সবার আগেই রান্না করে, স্বামীর আগে খায়।
প্রসঙ্গা কথা : বধূর চলন-ধরন শাশুড়ির কাছে ভালো লাগে না।

২৯. ঝি জব্দ কিলে, বউ জব্দ হিলে
আরি পরি জব্দ হইন চউখঅ আঙ্গুল দিলে।
অর্থ : কন্যা জব্দ কিলে, বউ জব্দ শিলে, পাড়া-প্রতিবেশী জব্দ হন চোখে আঙুল দিলে।
প্রসঙ্গা কথা : প্রবাদটিতে মেয়ে ও বধূকে যে ভাবে জব্দ করার কথা বলা হয়েছে তা আসলে অত্যাচার হিসেবে ধরা যেতে পারে।

৩০. হাইর ভাত খাইন আর লাঙর গীত গাইন।
অর্থ : স্বামীর ভাত খেয়ে প্রেমিকের গুনগান।
প্রসঙ্গা-কথা : অকৃতজ্ঞ নারী।

৩১. পুত নিল বউয়ে
ঝি নিল জামাইয়ে
মুই অইলু বান্দি
রান্দি আর কান্দি।
অর্থ : পুত্র নিল বৌয়ে, মেয়ে নিল জামাইয়ে, আমি এখন বান্দি, রান্না করি আর কান্না করি।
প্রসঙ্গা-কথা : বৃদ্ধ শাশুড়ি মা'য়ের মানসিক যন্ত্রণা, একাকীত্বের করুণ চিত্র।

৩২. উঠ কপালি চিরল দাঁতি লম্বা মাথার কেশ
এই কন্যা বিয়া করলে ভরমায় নানান দেশ।
অর্থ : উঁচু কপাল, চিকন লম্বা দাঁত, লম্বা মাথার চুল, এই কন্যা বিয়ে করলে ভুগতে হবে।
প্রসঙ্গা কথা : সমাজ জীবনে নারীর চেহারার উপর নির্ভর করে তাদের বিবাহিত জীবন সুখী হবে কিনা

৩৩. লাকড়িয়ে ভাঙ্গো চুলার মুখ
হড়িয়ে ভাঙ্গো বউর মুখ।
অর্থ : কাঠ-কয়লা চুলার মুখ ভাঙ্গো, শাশুড়ি ভাঙ্গো বধূর মুখ।
প্রসঙ্গা কথা : শাশুড়ি বধূর ঝগড়া শেষ পর্যন্ত চূড়ান্ত পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছায়।

শাশুড়ি-বধূ সংক্রান্ত হাজার হাজার প্রবাদ এখনও বরাক উপত্যকায় প্রচলিত। এইসব প্রবাদের মধ্যে দিয়ে আমরা পারিবারিক জীবনের নানাদিক পেয়ে যাই এবং নারী চরিত্র বিশেষের মনস্তত্ত্বেরও পরিচয় লাভ করি। নারী যে পিতৃগৃহে জন্ম থেকে বড় হয়েছে, সেখানে

নাইওর যেতে মন চাইলেও স্বামীর আচরণে বা শাশুড়ির বাক্যবাণে তার আবেদন নাকচ হয়ে যায়। এই মেয়ে একদিন 'মা' হয়, নিজের জীবনের দুঃখ-দুর্ভাগ্যের সঙ্গে তার পরিচয় হয়, সেই জন্য নিজের মেয়ের বিবাহিত জীবনে সে তার মতো দেখতে চায় না। বাঙালি নারী সংক্রান্ত প্রবাদের সিংহভাগ জুড়ে থাকে শাশুড়ি-বধূ, বরাক উপত্যকায়ও তার ব্যতিক্রম নয়। আমরা লক্ষ করেছি, শাশুড়ির তীক্ষ্ণ বাক্যবাণে জর্জরিত নববধূ, প্রত্যেক সমস্যার ক্ষেত্রে নিজের ভাগ্যকে দোষারোপ করেছে। গৃহের সীমানার মধ্যে আবদ্ধ থেকে গৃহলক্ষ্মী হয়ে সেবাপরায়ণতাকেই জীবনধর্ম বলে জেনেছে। নারীর কাছে স্বামীই সর্বশ্রেষ্ঠ আশ্রয়স্থল, স্বামীহীন সংসারে নারী কান্ডারীবিহীন, সে দুঃখ করে বলে, 'খড়ালি বিহনে নাও ঘুরে ঘাটে ঘাটে' (অর্থাৎ কাণ্ডারীবিহীন)।

অন্যদিকে, বধূ যত সুন্দরী ও সর্বগুণসম্পন্ন হোক না কেন শাশুড়ির দৃষ্টিতে নববধূর কাজ-কর্ম, হাঁটা-চলা ইত্যাদি ঘৃণিত ও নিন্দিত। অকারণ তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের মধ্যে দিয়ে তার জীবন অতিবাহিত করতে হয়। এর মাঝে যদি শাশুড়ির নিজের মেয়েকে পেয়ে যান তাহলে বধূর আর দুঃখের সীমা থাকে না। যে বধূ সমস্ত জীবন ধরে শাশুড়ি কাছ থেকে প্রশংসা আদায় করতে পারেনি, সে এই নির্যাতন থেকে মুক্তি কামনা করে। জীবনের নানা চড়াই-উতরাই পেরিয়ে একদিন সেও শাশুড়ি হয়, সংসারে সে স্থায়ী আসন দখল করে নেয়। নিজে আজ শাশুড়ি হয়েছে, তিল-তিল করে সঞ্চিত ঘৃণা, অশ্রদ্ধা ও প্রতিশোধ স্পৃহা জাগ্রত হয় তার মনে। তখন সে তীক্ষ্ণ বাক্যবাণে বৃদ্ধ শাশুড়িকে ঘায়েল করতেও পিছপা হয় না।

* 'খালায় নালায় আইল পানি
গঙ্গা ভাগীরথী
বুড়া হইলা ধুড়া অইলা
তাইন অইলা সতী। এই কথা শুনে বৃদ্ধ শাশুড়ি দুঃখ করে বলেন—

* হড়ি মারি বউ আগে
ই বউ পাইছলাম কপালর আগে।"

অথবা

* সুখ করগো পুতর বউ, খোদায় তোমায় দিছে
আমারও এমন দিন আছিল, খোদায় কাড়ি নিছে।"

এই কথাগুলির মধ্যে এক প্রতীকী ব্যঞ্জনার সৃষ্টি হয়।

পারিবারিক জীবনে মায়ের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ, 'মা' স্নেহ-মমতার উৎস ও সংসারের বন্ধন। মা হলেন সন্তানগত প্রাণ। সংসারে স্বার্থশূন্য কপটতাহীন আন্তরিক স্নেহ, মায়া-মমতা একমাত্র মায়ের কাছ থেকেই প্রত্যাশা করা যায়। বধূ ও শাশুড়ি হিসেবে নারীকে যতটা অবজ্ঞা-অবহেলার শিকার হতে হয়েছে, ততটা 'মা' হিসেবে কষ্ট সহ্য করতে হয়নি। নারী মনের দুঃখের কথা প্রবাদ-প্রবচনে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপের আড়ালেই বিশেষভাবে প্রকাশিত। নারী জাতি ও কন্যা সন্তানের প্রতি সমাজ-সংসারে বিরূপ মনোভাব লক্ষ করা যায়। প্রবাদের মাধ্যমে নারী তার আচার-আচরণ, মানসিকতা, জীবনবোধ, দৃষ্টিভঙ্গিকে তুলে ধরেছে। শ্বশুরবাড়ির শত লাঞ্ছণার মধ্যেও নারীর কাছে পরম প্রার্থিত শ্বশুরবাড়ি। প্রবাদ-প্রবচনের মধ্যেই ফুটে ওঠে নারীর অন্তর জীবনের অকপট পরিচয়। নারী প্রতিবাদ করতে শেখেনি, অথচ স্ত্রী হিসেবে

সংসারে তারও একটা নির্দিষ্ট স্থান আছে। তারও নানা স্বপ্ন থাকে, ইচ্ছা থাকে, সে চায় ভালোবাসা, সে চায় সংসারের সচ্ছলতা। অনেক সময় আনন্দের স্রোতে তারা চলে যায় কল্পনার রাজ্যে, নিজের বঞ্চিত জীবনের ইচ্ছাপূরণের তাগিদে তারা স্বপ্ন দেখে একটা সুখী জীবনের। সংসার সমুদ্রে অতৃপ্ত মনোবাসনার মধ্যেও তারা সুখে-দুঃখে জীবন অতিবাহিত করে। নারী মনস্তত্ত্বের একটি হাতিয়ার প্রবাদ, সমাজের বহুবিস্তৃত আচরণ, অবচেতন মনের বহু আশা-আকাঙ্ক্ষা আত্মপ্রকাশ করে প্রবাদের মাধ্যমে। বরাক উপত্যকার সমাজজীবনকে জানতে হলে লোকপ্রবাদগুলি বিশেষভাবে সহায়ক। শাশুড়ি-বধূ সংক্রান্ত প্রবাদগুলি ব্যবহারিক জীবনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত। তাছাড়া, বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ দিয়ে বরাক উপত্যকার শাশুড়ি-বধূ সংক্রান্ত প্রবাদগুলো বিশ্লেষণ করলে অনেক অজানা তথ্যের সন্ধান লাভ করাও সম্ভব।

❑ বারোমাস্যা

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে বারোমাস্যা : লোকায়ত জীবন প্রসঙ্গে

পবিত্র বিশ্বাস

সাহিত্য ও সমাজ একে অপরের পরিপূরক। তাই সাহিত্যমাত্রেই কোনো না কোনোভাবে মানুষের জীবনচিত্র রয়েছে। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের এক অতি মূল্যবান সম্পদ হলো মঙ্গলকাব্য। মঙ্গলকাব্যের 'মঙ্গল' নামের মধ্যেই আখ্যানকাব্যের সুদূরপ্রসারী চিন্তাধারা, কাব্যধর্মিতা সবই প্রকাশ পায়। বাংলা সাহিত্যে মঙ্গলকাব্যগুলি ছিল বাঙালি কবিদের মৌলিক সৃষ্টি এবং বাংলার মাটির ফসল। সেকালে এ কাব্যগুলির জনপ্রিয়তা এতই ছিল যে, অশিক্ষিত নিরক্ষর বিশাল জনসমাজের প্রাণের ক্ষুধা মেটাতে এ-সাহিত্যের জুড়ি ছিল না। সুদীর্ঘ ছয়শত বছরব্যাপী মঙ্গলকাব্যের ধারা ব্যাপকভাবে আমাদের দেশে প্রচলিত ছিল—

> খ্রিস্টিয় ত্রয়োদশ শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া অষ্টাদশ শতাব্দীতে কবি ভারতচন্দ্রের কাল পর্যন্ত বঙ্গসাহিত্যে যে বিশেষ একশ্রেণির ধর্মবিষয়ক আখ্যানকাব্য প্রচলিত ছিল, তাহাই বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে মঙ্গলকাব্য নামে পরিচিত।[১]

অবশ্য এর আগেও বঙ্গদেশে ব্রতকথা ও জনশ্রুতিমূলক ছোটো ছোটো কিংবদন্তীর আকারে মৌখিকভাবে মঙ্গলকাব্যের অত্যন্ত অপরিণত একটি রূপ সমাজে প্রচলিত ছিল। ক্রমশ সেগুলিই দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়ে পল্লিগ্রামের বিশেষ করে নারীসমাজে প্রচলিত গ্রামদেবতা বিষয়ক গল্প ও ছড়া, পরে পুজোর সময়ে কিছুক্ষণ পাঠ করার মতো কথা-কবিতায় পরিণত হয়েছিল। সেইসময় এগুলি 'পাঁচালী' নামেই প্রসিদ্ধ ছিল। এই পাঁচালী পরে শ্রোতাদের চাহিদা অনুযায়ী ক্রমশ প্রলম্বিত হয়ে পরিণত মঙ্গলকাব্যের রূপ পরিগ্রহ করে। সাধারণের বোধগম্য সহজ-সরল ভাষায় এই কাব্য রচিত হয়েছে।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য প্রধানত তিনটি ধারায় প্রবাহিত—আখ্যানকাব্য, গীতিকবিতা ও অনুবাদকাব্যের ধারা। আমাদের পরিচিত মঙ্গলকাব্যগুলি আখ্যানকাব্য ধারার অন্তর্গত। লৌকিক জনজীবনের আখ্যানই এই কাব্যগুলিতে প্রতিফলিত। দেবতার কথা এখানে থাকলেও মানবজীবন কাহিনিই এর মুখ্য বিষয়। এর অন্তরে যে-সকল দেবতার অধিষ্ঠান, তারা সকলেই বাংলার পল্লির সার্বজনীন দেবতা। তবে মঙ্গলকাব্যের প্রথানুযায়ী, প্রত্যেক মঙ্গলকাব্যেই সকল দেববন্দনা ও প্রায় সকল দেবতার প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করা হয়েছে। গঠন বৈশিষ্ট্যের দিক থেকেও সব মঙ্গলকাব্যে একই ধারা লক্ষ করা গেছে। আসলে, বেশিরভাগ মঙ্গলকাব্যে পুজো প্রচার হয়, এবং সেই পুজো প্রচারের দায়িত্ব থাকে দেবীর কোনো ভক্তের, যিনি আগে স্বর্গের অধিবাসী ছিলেন। সেই ভক্তের মাধ্যমে মর্ত্যে পূজা প্রচারের জন্য উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে

তাকে সামান্য অপরাধে শাপ দিয়ে মর্ত্যে মানুষরূপে জন্মগ্রহণ করতে বাধ্য করতেন। পরে মর্ত্যধামে দেবীর পুজোর প্রচার কার্য সমাধা হলে শাপমুক্ত হয়ে তিনি পুনরায় স্বর্গে ফিরে যান। এই কারণে মঙ্গালকাব্যের খানিকটা অংশে দেবকাহিনি এবং বাকি অংশে নরখণ্ডের মধ্যে দিয়ে বাস্তবরস সম্পৃক্ত সত্যকাহিনি উদ্ভাসিত হয়েছে। সাধারণ মানুষের কাছে নরখণ্ডের জনপ্রিয়তা অপরিসীম। এই অংশে লোকায়ত জীবনের বর্ণনা প্রসঙ্গো এসেছে বারোমাস্যা, নারীগণের পতিনিন্দা, নায়ককর্তৃক চৌতিশা স্তব, কাঁচুলী নির্মাণ, রন্ধন প্রণালী ইত্যাদি যা নরখণ্ডের অপরিহার্য আঙ্গিকগত উপাদান সমূহে পরিণত হয়েছে। আলোচ্য প্রবন্ধের অগ্রগতিতে আমরা মঙ্গালকাব্যে বর্ণিত বারোমাস্যার লোকায়ত প্রেক্ষাপটে নারী জীবনের গোপন গভীর নারী মনস্তত্ত্বের সন্ধানে অগ্রসর হব।

বৈচিত্র্যপূর্ণ প্রাকৃতিক পরিবেশে বৈশাখ থেকে চৈত্র মাস পর্যন্ত বারো মাসের সুখ-দুঃখের উপমা-স্বাচ্ছন্দ্য-অস্বাচ্ছন্দ্য কাব্যময় বর্ণনাই বারোমাস্যা নামে পরিচিত। লোকসাহিত্যের প্রবহমান পথ ধরে বিবর্তিত উন্নয়নশীল সাহিত্য যা ভাষা ছন্দে সুসজ্জিত হয়ে শিষ্ট মার্জিত সাহিত্যের দোরগোড়ায় এসে পৌঁছেছে, সেই সব সাহিত্যের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো বারোমাস্যা। বারোমাস্যাও পাঁচালীর ঢঙে এবং লোকসংগীতের মতো সুর সহযোগে গীত হতো। মনে হয়, মহিলা সমাজেই প্রথম বারোমাস্যার প্রচলন হয়েছিল। তবে বারোমাস্যার সূচনা কবে হয়েছিল, এর উৎস কোথায় এসব প্রশ্ন ওঠা যথেষ্ট যুক্তিসঙ্গাত। বিভিন্ন সূত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বলা যায়, রামাই পণ্ডিতের 'শূন্যপুরাণ'-এ প্রথম 'বারোমাস্যা'র বর্ণনা পাওয়া যায়। পরবর্তীকালে 'রামায়ণ'-এ সীতার বারোমাসী, বৈষ্ণব কবিতায় রাধিকার বারোমাসী, চৈতন্য জীবনচরিতে বিষ্ণুপ্রিয়ার বারোমাসী, মৈমনসিংহ গীতিকায় মলুয়ার বারোমাসী ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে বারোমাস্যার যে একটা ধারা প্রচলিত ছিল তা জানা যায়। তবে মঙ্গালকাব্যের প্রত্যেক বারোমাস্যা বৈচিত্র্যের ভিত্তিতে স্বতন্ত্রতার দাবি রেখেছে। পাশাপাশি, বারোমাস্যাকে আশ্রয় করেই বাংলা ও বাঙালির একান্ত ব্যক্তিগত ও সামাজিক সুখ-দুঃখের অনুভূতি প্রকাশ পেয়েছে।

বিষয়ভেদে বারোমাস্যাগুলিকে মোটামুটি চার ভাগে ভাগ করা যায়—

১. ব্যবহারিক
২. আখ্যানমূলক
৩. পারিবারিক তথা ব্যক্তিগত এবং
৪. প্রেমমূলক

এছাড়া আরও অনেক উপবিভাগ হয়তো সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে পাওয়া যেতে পারে। তবে এসব ব্যতিরেকে বারোমাস্যার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো—লোকায়ত জীবনের প্রেক্ষাপটে প্রকৃতি নির্ভরতা। কবিরা নায়িকার বারোমাস্যা বর্ণনা করতে গিয়ে প্রকৃতির অনুষঙ্গোই তাদের সুখ-দুঃখের কথা তুলে ধরেছেন। শুধু তাই নয়, প্রকৃতির সাথে সাযুজ্য রেখে নারীমনের নানা চিন্তা, তাদের অনুভূতি, দৈহিক কামনা-বাসনার নানাবিধ চিত্রও বেশি করে আলোচনা করেছেন কবিরা। প্রকৃতি ও নারীর মেলবন্ধনে নারীই হয়ে উঠেছে বারোমাস্যার ধারক ও বাহক।

মঙ্গালকাব্যের বারোমাস্যার মধ্যে কখনো দেখা গেছে উপেক্ষিতা রমণীর দিনযাপনের বেদনাময় কাহিনি। কিন্তু সবক্ষেত্রেই যে দুঃখ-দারিদ্র্য ও বেদনার বর্ণনায় শুধু যন্ত্রণার কাতরতা

আছে তা নয়, কোনও কোনও বর্ণনার গভীরে প্রোথিত আছে নায়িকার সুখী মনোভাবেরও স্পষ্ট অনুভূতি। বিশেষ করে সপত্নীকে দূর করার জন্যই যেন প্রকৃতির পটভূমিকায় প্রতি মাসের দুঃখের চিত্র বর্ণিত হয়েছে। এর মধ্যে মিশে আছে নারীমনের স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য। মঙ্গলকাব্যের বারোমাস্যাগুলি বিভিন্ন ঋতুতে নারীদের দিনযাপনের বর্ণনা ও জীবনরস উপলব্ধির স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ। নারীমনের কামনা-বাসনা ও মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব-সংঘাত রূপ পেয়েছে এই বারোমাস্যার মধ্যে।

মঙ্গলকাব্যে বিশেষ করে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের কাব্যেই বারোমাস্যার বৈচিত্র্যময় রূপ প্রকাশিত। কবিকঙ্কণ মূলত জীবনরসের কবি। তিনি জীবনকে খুব ভালোবাসতেন এবং সমাজের সর্বস্তরের মানুষের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণেও সক্ষম। আমাদের আলোচ্য বারোমাস্যাতে নারীর সমস্যাগুলিকে তিনি নিপুণ পরিহাস রসিকতায় এবং বিশ্লেষণী দৃষ্টিভঙ্গিতে উন্মোচিত করতে সক্ষম হয়েছেন। তিনি তাঁর কাব্য রচনাকালে সমসাময়িক সমাজের কৌলীন্য প্রথা, বহুবিবাহ প্রথা, সতীন সমস্যার মতো একাধিক সামাজিক কুপ্রথাকে খুব কাছ থেকে উপলব্ধি করেছিলেন। এই সব কুপ্রথা বা সংস্কারের জন্য নারী জাতি যন্ত্রণায় ক্ষতবিক্ষত হয়েছেন আর অগোচরে একাকিনী চোখের জল ফেলেছেন। আসলে এক পুরুষ ও বহু নারীর সংসারে নারীরা সবসময়ই অস্তিত্ব সংকটে ভুগত এবং তা থেকে উদ্ভূত সমস্যাই নারীদেরকে প্রতিনিয়ত জর্জরিত করে তুলত। ফলে তাদের মনোভাবে ঈর্ষা ও অধিকারহীনতা বিশেষ করে সপত্নী ঈর্ষা সর্বদাই ক্রিয়াশীল ছিল। বলাবাহুল্য, লোকায়ত সমাজজীবনের মধ্য দিয়ে সমাজ-সমস্যার এহেন চিত্র কবিকঙ্কণের নিপুণ কাব্যসাধনায় অসাধারণ হয়ে উঠেছে।

কবিকঙ্কণের 'অভয়ামঙ্গল' কাব্যে তিনটি বারোমাস্যা আছে ফুল্লরা, খুল্লনা ও সুশীলার বারোমাস্যা। তিন নায়িকা নিজেরাই তাদের সুখ-দুঃখের কথা বারোমাস্যার মধ্য দিয়ে পরিবেশন করেছেন। তবে নায়িকাদের বারোমাস্যার বর্ণনা সূত্রে তাদের বারোমাস্যাকে আবার দুটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে একরাশ দুঃখের ডালিতে পরিপূর্ণ ফুল্লরা ও খুল্লনার বারোমাস্যা এবং সুখের আনন্দদায়ক পরিবেশে সুশীলার বারোমাস্যা। প্রাজ্ঞ সমালোচকের দৃষ্টিতে—

> নায়িকার বারোমাস্যা তৎকালীন লোকজীবনের দুঃখ-সুখের চালচিত্র, এর সঙ্গে মিলে মিশে রয়েছে নারীমনের কামনা-বাসনা। ঋতুবৈচিত্র্যের সঙ্গে নারীদের সুখ-দুঃখের ইতিহাসকে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে দেবওয়ার ক্ষেত্রে কবিদের কৃতিত্ব বারোমাস্যার বর্ণনার ক্ষেত্রে যথেষ্ট।[২]

একথা সত্য, সমগ্র মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে বাস্তবধর্মী জীবনরসে পরিপূর্ণ রচনা হলো কবি কঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর 'চণ্ডীমঙ্গাল' কাব্য। এই কাব্যে 'ফুল্লরার বারমাস্যা' অংশে কবি দেখিয়েছেন বাঙালি জীবনের দুঃখ-দারিদ্র্যকে। কাহিনি প্রসঙ্গে যোড়শী রমণীরূপী দেবী চণ্ডিকা ফুল্লরা-কালকেতুর গৃহে এসেছেন দুঃখ-দারিদ্র্য দূর করতে এবং তাদের দ্বারা মর্ত্যে পুজো পাওয়ার আশায়। কিন্তু দেবীর দ্ব্যর্থবোধক ভাষায় আত্মপরিচয় দান মূর্খ ফুল্লরা বুঝতে না পেরে সপত্নী ভয়ে ভীত হয়ে নিজের দুঃখ বর্ণনা করে দেবীকে বিতাড়িত করতে চেয়েছে। কারণ ফুল্লরার জীবনে দুঃখ ছিল, কিন্তু সেই দুঃখের জন্য আপন ভাগ্য ছাড়া কাউকে দোষারোপ করেনি। তাই এসব মেনে নিয়েও হঠাৎ করে উড়ে এসে জুড়ে বসা অবাঞ্ছিত নারীটিকে তার সংসারে স্থান দিতে চায়নি। উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে বারোমাসের দুঃখ-দুর্দশার কথা বলে

নিজের ভাগ্যবিড়ম্বিত জীবনের বেদনাঘন দিকটি সতীনরূপী চণ্ডীর কাছে তুলে ধরেছে। ফলত এখানে যে দুঃখের বর্ণনা আছে, তার মধ্যে ঈর্ষা ও ছলনা আছে। তাই ফুল্লরার দুঃখ থাকলেও তা তাকে পীড়া দেয় না। পাঠক সহজেই তা বুঝতে পারে।

ফুল্লরা যেখানে বাস করে সেই ঘরটি তালপাতায় ছাওয়া, ভাঙা কুঁড়ে ঘর কালবৈশাখীর ঝড়ে ভগ্নপ্রায়। বৈশাখের দাবদাহে কোথাও কোনো গাছ নেই, একটু স্বস্তি পাবে পশরা রেখে যে একটু জিরোবে অথচ মাংস বিক্রি করতে না পারলে ক্ষুধার্ত অবস্থায় দিন কাটাতে হবে। জ্যৈষ্ঠের প্রচণ্ড সূর্যতাপে শরীর যেন পুড়ে ছাই হয়ে যায়। তৃষ্ণায় গলা শুকিয়ে গেলেও পশরা রেখে একটু জল খাবার উপায় নেই তার। তাই তার আক্ষেপ—

পাপিষ্ঠ জৈষ্ঠ্য মাস পাপিষ্ঠ জৈষ্ঠ্য মাস।
বেঙচের ফল খায়্যা করি উপবাস॥[৩]

কিম্বা,
মাংসের পসরা লয়্যা বুলি ঘরে ঘরে।
কিছু খুদ-কুড়া মিলে উদর না পূরে॥[৪]

এত দুঃখে সান্ত্বনা পেতে ফুল্লরা বাবা-মাকে দোষ দেয়। তাই প্রতিনিয়ত দুঃখকষ্ট যার নিত্যসঙ্গী, সেই ফুল্লরা তার সংসারে আগত বাইরের স্ত্রী লোকটিকে নানাভাবে তার জীবনে অনুপ্রবেশে বাধা দেয়। কারণ, এত দুঃখ সয়ে থাকতে পারবে না ভেবে আগত রমণীর প্রতি তার উপদেশ—

শুন মোর বাণী রামা শুন মোর বাণী।
কোন সুখে মোর সাথে হইবে ব্যাধিনী॥[৫]

এমনকি, যে মধু মাসে বনিতা ও পুরুষ মদনের শরে জর্জরিত থাকে, সেই মধুমাসে 'ফুল্লরার অঙ্গ পোড়ে উদর-দহনে'[৬]। তাই চৈত্রের খরায় অভাগী ফুল্লরাকে একমাত্র সম্বল খাওয়ার পাত্রটিও বন্ধক দিতে হয়। বারোমাস্যা বর্ণনা করতে করতে ফুল্লরা এবার কান্নায় ভেঙে পড়ল

দুঃখ কর অবধান দুঃখ কর অবধান।
আমানি খাবার গর্ত দেখ বিদ্যমান॥[৭]

আসলে, অভাগিনী ফুল্লরা এতদিন সব দুঃখ সহ্য করেছে। কারণ স্বামীর প্রতি তার নিঃসপত্ন অধিকার। প্রেমের রাজ্যে সে সাম্রাজ্ঞী, স্বামীর গর্বে গরবিনী হয়েও সে এতদিন সব জ্বালা-যন্ত্রণা দুঃখ-কষ্টকে সহ্য করে এসেছে কিন্তু তার এই প্রেমে যখন অন্য কেউ হস্তক্ষেপ করতে এসেছে তখন সে আর স্থির থাকতে পারল না। ফুল্লরা অভিমানের সুরে কালকেতুকে বলে—

পিপীড়ের পাখা উঠে মরিবার তরে।
কাহার ষোড়শী কন্যা আনিয়াছ ঘরে॥[৮]

এটা হওয়াই স্বাভাবিক। সমাজে নারীরা সব সহ্য করতে পারে কিন্তু তার অধিকারে যদি অন্য কোনো নারী এসে ভাগ বসায়, সেক্ষেত্রে শুধু অভিমান কেন, তাকে তাড়াতে সতী-সাধ্বী নারী যাবতীয় অস্ত্র প্রয়োগ করে। ফুল্লরাও এখানে তাই করেছে। বারোমাস্যার মধ্য দিয়ে প্রাকৃতিক পরিবেশকে অবলম্বন করে লোকায়ত সমাজের আঙিনায় তার দুঃখের পশরা সাজিয়েছে। তবে এতে ফুল্লরার অভাব অনটনের কথা বর্ণিত থাকলেও ফুল্লরার দুঃখবোধ নেই। বাইরে থেকে তাকে দুঃখী বলে মনে হলেও এটি তার ছলনা। দুঃখের কথা উল্লেখ

করে সে ষোড়শী রমণীকে তার জীবন থেকে তাড়াতে চায়। তাই ফুল্লরার বারোমাস্যা ছলনার নেপথ্যে বাস্তব জীবনরসের আধার। 'খুল্লনার বারমাস্যা' ফুল্লরার থেকে ছিল অনেকটাই স্বতন্ত্র। পাঠকের কাছে খুল্লনার বারোমাস্যা ছিল অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী। কারণ সপত্নীর কাছে নির্যাতিতা খুল্লনার যন্ত্রণা কোথায় যেন হৃদয়কে স্পর্শ করে যায়। বনে বনে ছাগল চরানো খুল্লনার বারোমাসের খেদ স্বগতোক্তিতে প্রকাশিত হয়েছে। তবে এই প্রকাশ স্বতঃস্ফূর্ত ও মনস্তত্ত্বসম্মত। খুল্লনার দুঃখ ভাগ করার মতো আপনজন কেউ ছিল না। স্বামী-পিতা-মাতা-সতীন সকলের কাছেই সে ছিল অপাঙ্‌ক্তেয়। তাই নিজের কথা তার নিজের কাছেই থাকে। প্রকাশের সুযোগ পায় না। তবে এই বর্ণনার মধ্যেও কোথায় যেন আশার ক্ষীণরেখা প্রচ্ছন্ন থাকে। তার মনে হয় স্বামী ফিরে এলে সব দুঃখের অবসান হবে। কার্যত তাই হয়েছে। ধনপতি সিংহল থেকে ফিরে খুল্লনার দুর্দশা দেখে লজ্জিত হয়েছে।

বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে ছাগল চরাতে খুল্লনার খুব কষ্ট—'অগ্নিসম পোড়ে অঙ্গ রবির প্রকাশে।'[৯] আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে চারিদিকে অবিরাম বর্ষণের কারণে ছাগল চরানোর কোনো জায়গা খুঁজে পায় না—'ছাগল চরাইত্যে নাঞি পরিসর স্থল'।[১০] এভাবে ভাদ্রের পর উৎসবের মাস আশ্বিন এসে হাজির হয়। এ সময়ে প্রিয়জনের সান্নিধ্য কামনা করে। খুল্লনাও স্বামীর আগমনের প্রত্যাশায় দিন গোনে, কিন্তু আশা নিরাশায় পর্যবসিত হয়। এরপর আসে শীত যা খুল্লনার কাছে অত্যন্ত পীড়াদায়ক—

নিকেতন পরাননাথ কৈলে বসবাস।
আইল কার্তিক মাস হিমের প্রকাশ॥[১১]

এইভাবে খুল্লনার অব্যক্ত আত্মকথন হয়ে ওঠে যন্ত্রণাকাতর গোপন হৃদয়ের স্বতঃস্ফূর্ত আর্তি যা প্রতিফলিত হয়েছে খুল্লনার বারোমাস্যার অংশে। অন্যদিকে সুশীলার বারোমাস্যা একটু অন্য ধরনের, অনেকটা সাজানো। কারণ সুশীলা বুদ্ধিমতী নারীর মতোই স্বামীকে সিংহলের সুখ-ঐশ্বর্যের কথা বলে তাকে সিংহল থেকে যাওয়ার জন্য বলেছে এই বারোমাস্যার মধ্যে। উজানী নগর যে স্বামীর পক্ষে ভালো হবে না তা সুশীলার কথায় প্রকাশ পেয়েছে—

সুখে গোঙাইব হিম সুখে গোঙাইব হিম।
উজানি নগর জেন বাসিবে নিম॥[১২]

তাই শ্রীমন্তকে প্রলুব্ধ করে সুশীলা বলেছে—

মাঘ মাসে প্রভাতে করিয়া স্নানদান।
সুপাঠক আন্যা দিব সুনিবে পুরাণ॥
মিষ্ট অন্ন পায়স জোগাব দিসিদিস।
আনন্দে করিবে মাঘ মাসে নিরামীষ।।[১৩]

আবার ফাল্গুন মাসে কিভাবে দোল খেলা হবে, সখীদের নিয়ে নাট্যগীত করবে তার বিবরণ দিয়ে শ্রীমন্তকেও থাকার অনুরোধ জানিয়েছে সুশীলা—

মালতি মল্লিকা চাঁপা বিছায় শয়নে।
মধুমাসে গোঙাইব মুদিত রাত্রিদিনে॥[১৪]

কিন্তু শ্রীমন্ত সুশীলার এইসব অনুরোধে সাড়া না দিয়ে প্রত্যুত্তরে জানিয়েছে—"সর্ব উপভোগ মোর মায়ের চরণ।"[১৫]

এভাবেই বারোমাস্যাগুলি যেন লোকজীবন কাব্য হয়ে উঠেছে। সমকালীনতাকে আশ্রয় করে যুগাশ্রয়ী সমাজ-সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ ঘটেছে সাহিত্যে। মঙ্গলকাব্যের কবিগণ যে সমাজে সমাজ-সচেতন ছিলেন, তাঁরা যে জীবনরসিক ছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় এই বারোমাস্যার অসাধারণ বর্ণনার মধ্য দিয়ে। কবিকঙ্কণও নিপুণ শিল্পীর সহজাত উপলব্ধি ও সহমর্মিতা দিয়ে নারীমনের অব্যক্ত যন্ত্রণাকে কখনো সপত্নী সমস্যা, কখনো বারোমাস্যার মতো প্রথানুযায়ী বর্ণনার মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। তাই বারোমাস্যাগুলিতে একদিকে কবিমনের বাস্তব অভিজ্ঞতা, সহানুভূতির যেমন প্রকাশ পাওয়া যায় তেমনি অন্যদিকে লোকায়ত সমাজ পরিবেশে নারীমনের কামনা-বাসনার গভীর গোপন পরিচয় পাঠকদের কাছে উন্মুক্ত হয়। সাহিত্যিকের দৃষ্টিভঙ্গিতে তাই বলা যায়—

> মঙ্গলকাব্যের বারমাস্যা আসলে উপেক্ষিতা রমণীর কিংবা ভাবী বিপদ আশঙ্কায় কোনো রমণীর ভাবী সুখ সম্ভোগের রোজনামচা। এই বিষয়টি মঙ্গলকাব্যের প্রথাসিদ্ধ ঘটনা সন্দেহ নেই কিন্তু এর মধ্যে মিশে গেছে নারীমনের স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য।[১৬]

উৎসের সন্ধানে

১. আশুতোষ ভট্টাচার্য : 'বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস', পরিবর্তিত ষষ্ঠ সংস্করণ, ১৯৭৫, পৃ. ১১
২. দেবেশ কুমার আচার্য : 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস' (আদি ও মধ্য যুগ), পরিমার্জিত তৃতীয় সংস্করণ : জুন, ২০১৩, ইউনাইটেড বুক এজেন্সি, কলকাতা, পৃ. ৭৪১
৩. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিশ্বপতি চৌধুরী সম্পাদিত : 'কবিকঙ্কণ-চণ্ডী', কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, পুনর্মুদ্রিত সংস্করণ : ২৩৬৯ B.T. October, ১৯৯৬, পৃ. ২৫৮
৪. তদেব : পৃ. ২৫৮
৫. তদেব : পৃ. ২৬১
৬. তদেব : পৃ. ২৬২
৭. তদেব : পৃ. ২৬২
৮. তদেব : পৃ. ২৬৪
৯. সুকুমার সেন : 'চণ্ডীমঙ্গল' (বণিক খণ্ড), সাহিত্য অকাদেমি, প্রথম প্রকাশ-বৈশাখ ১৩৬২, কলিকাতা, পৃ. ১৩৮
১০. তদেব : পৃ. ১৩৮
১১. তদেব : পৃ. ১৩৯
১২. তদেব : পৃ. ২৮৫
১৩. তদেব : পৃ. ২৮৫
১৪. তদেব : পৃ. ২৮৫
১৫. তদেব : পৃ. ২৮৫
১৬. দেবেশ কুমার আচার্য : 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস' (আদি ও মধ্য যুগ), পরিমার্জিত তৃতীয় সংস্করণ : জুন, ২০১৩, ইউনাইটেড বুক এজেন্সি, কলকাতা, পৃ. ৭৪২

❑ লোককথা

‘ফর্মুলা টেল’ বা সূত্রমূলক লোককথা : একটি গঠনগত সমীক্ষা

সুদীপ্ত চৌধুরী

‘লোককথা’ বা ‘Folktale’—এই শব্দটির অর্থের ভাবগত বিস্তৃতি এমনই যে, এর উচ্চারণে গদ্যে রচিত বিবৃতিমূলক যেকোনো কাহিনিকেই বোঝানো যেতে পারে। কিন্তু শুধুই তার পরিপ্রেক্ষিতে লোককথার সামগ্রিক বিচার-বিশ্লেষণকে কেন্দ্রীভূত করতে গেলে; এর সঠিক শ্রেণিকরণের প্রশ্নে নানা সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে। কারণ শুধুমাত্র সাহিত্যাংশের বিচারে লোককথাকে রূপকথা, পশুকথা, কিংবদন্তি, মিথকথা ইত্যাদি বর্গে ভাগ করে নিলে, সে বিশ্লেষণ হয়ে দাঁড়ায় বড়োই একরৈখিক; যা লোককথার মতো এক বিশ্বজনীন বিষয়ের পর্যালোচনার ক্ষেত্রে ঠিক সমীচীন নয়। অন্যদিকে শৈলীবিজ্ঞানের আলোকেও এর শ্রেণিবিভাগ করা মুশকিল। কারণ যেহেতু লোককথার একটি প্রধান ধর্মই হলো মৌখিকরূপে বাহিত হওয়া; তাই তার শৈলী কথকের বলার শৈলীর ওপর অনেকটাই নির্ভর করে। একজন কথক তার শ্রোতার মর্জি-চাহিদার ওপর নির্ভর করে শুধু কাহিনির বিষয়বস্তুকেই নির্বাচন করেন না; বরং তার উপস্থাপন শৈলীকেও নির্ধারণ করে থাকেন।

অন্যদিকে আবার কথকের নিজস্ব আর্থ-সামাজিক জীবনের ওপর নির্ভর করে থাকে তার যে নিজস্ব বাকশৈলী ও ভাষাবিন্যাস শৈলী, তাও শৈলীবিজ্ঞানের আলোকে লোককথার শ্রেণিবিভাগকে প্রভাবিত করতে পারে। ফলে সে শ্রেণিবিভাগ ঠিক পক্ষপাতহীন হতে পারে না। এইসব দিক বিচার করে আমাদের মনে হয় যে লোককথার শ্রেণিবিভাগের প্রশ্নে একমাত্র গঠনগত দিক থেকে (Structural Pattern) তার বিশ্লেষণ করাটাই হয়তো শ্রেয়। কেননা, গঠনশীলতার তারতম্যের কারণে গড়ে ওঠা লোককথার ভিন্ন ভিন্ন form বা প্রকারের ওপর নির্ভর করে তার বিভিন্ন রূপের সম্যক শ্রেণিকরণ নির্ণয়ের কাজটাই এখনও পর্যন্ত সবচেয়ে বৈজ্ঞানিক বলে মনে করা হয়। সেই সুবাদে লোকসংস্কৃতিচর্চার বিদ্যায়তনিক জগতে লোককথার শ্রেণিবিভাগের ক্ষেত্রে তার যে ঐতিহ্যগত (Traditional) সুনির্দিষ্ট কাঠামো বৈশিষ্ট্য (Structural Pattern) পরিলক্ষিত হয়, তাতে লোককথাকে নিম্নোক্ত তিনটি প্রধান ভাগে ভাগ করা হয়েছে—

১. সরল কথা/কাহিনি (Simple Tale)
২. জটিল কথা/কাহিনি (Complex Tale)
৩. সূত্রমূলক কথা/কাহিনি (Formula Tale)

লোককথাকে এই যে তিনটি প্রধান ভাগে ভাগ করা হয়েছে; তার প্রতিটি বর্গে যে-সব

লোককথা তাদের গঠন অনুযায়ী স্থান পেতে পারে, তাদের বিস্তারিত পরিচিতি একটি সম্পূর্ণ রেখাচিত্র মারফৎ নিম্নে তুলে ধরার চেষ্টা করা হলো—

লোককথা/Folktale

- সরল কথা / Simple Tale
  - পশুকথা / Animal Tale
  - নীতিকথা / Fables
  - মিথকথা / Myth
  - কিংবদন্তি / Legend
  - বীরকথা / Hero Tale
  - কৌতুককথা / Jest & Anecdotes
  - ভূত-প্রেত-ডাইনির কথা / Tales of Ghost, Witch
  - ব্রতকথা
- জটিল কথা / Complex Tale
  - রূপকথা / Märchen
  - ঘর-গৃহস্থালির কথা / Household Tale
  - রোমাঞ্চ কথা / Novellenmärchen
- সূত্রমূলককথা / Formula Tale
  - ক্রমপুঞ্জিত লোককথা / Cumulative Tale
  - পরিকথা / Fairy Tale
  - শিকলি কাহিনি / Chain Tale
  - অন্তহীন কথা / Endless Tale
  - বৃত্তাকার লোককথা / Circular Tale
  - ধাঁধামূলক কথা / Enigma
  - আজগুবি কথা / Tales of lying
  - Catch Tale

প্রসঙ্গাত উল্লেখ্য যে, লোককথার প্রথম দুটি বর্গের অন্তর্গত লোককথাসমূহের সম্পর্কে যেহেতু বঙ্গাবিদ্যায়তনিক ক্ষেত্রে একাধিক আলোচনাসুলভ এবং আমাদের বর্তমান এই প্রবন্ধের কেন্দ্রীয় বিষয় সূত্রমূলক কথা/কাহিনি (Formula Tale), তাই এরপর শুধু সেই বিষয়টিকেই বিশদে পর্যালোচনা করা হবে। আন্তর্জাতিক টাইপ ইনডেক্স সূচিতে, T2000—T2399 সংখ্যক টাইপের মধ্যে সূত্রমূলক লোককথা বা Formula Tale—গুলিকে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। স্বনামধন্য লোককথাবিদ স্টিথ থম্পসন এই শ্রেণির লোককথার সংজ্ঞা নিরূপণ করেছেন—

> The central situation is simple but the formal handling of it assumes a certain complexity and the actors are almost indifferently animal or person. Such stories we call formula tale.[১]

এই ধরনের লোককথার মূল আখ্যানভাগের ক্রমাগ্রসরতা আলাদা অভিনিবেশ দাবি করে। কারণ অন্যান্য লোককথার ন্যায় এগুলি কাহিনি অনুসারী নয় বরং যে ভঙ্গিতে (Form) তা বিবৃত হচ্ছে তার ওপর নির্ভরশীল অর্থাৎ একটা সাধারণ আখ্যানকে কেন্দ্রে রেখে যে গল্পের সূচনা (এটিই থম্পসন কথিত ‘simple central situation’) তার ক্রমাগ্রসরতার বিবর্তন পথ, একেবারেই সে গল্পের বিবৃতিধর্মীতার (কথকের) ওপর নির্ভরশীল। আর এই

সুযোগেই এ ধরনের কাহিনিতে তৈরি হয় থম্পসন কথিত ‘certain complexity’ ফলত এই শ্রেণির লোককথাগুলির মূল আবেদন রসের কাছে নয় বরং শ্রোতার বুদ্ধিমত্তার কাছে। তাই দেখা যায় যে এই ধরনের লোককথা বহুক্ষেত্রেই লোকক্রীড়ার সামগ্রী হয়ে ওঠে। লিন্ডা ডেঘ এই বর্গের লোককথাগুলির বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে আমাদের জানিয়েছেন—

> This group includes playful, witty, gamelike forms with a brief narrative core. The single motif can be used for the introduction and the conclusion of a complex tale, for children’s entertainment, or for a humorous trick of refusal to tell a tale.[২]

● **ক্রমপুঞ্জিত লোককথা (Cumulative Tale) :** এই ধরনের সূত্রমূলক লোককথায় মূল আখ্যান অংশের একটি ঘটনার সঙ্গে পরবর্তী ঘটনাসমূহ একটি সুনির্দিষ্টক্রমে পরস্পর আবদ্ধ। আর এই ঘটনাক্রম পরম্পরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কিছু পুনরাবৃত্তিমূলক বাক্যের দ্বারা তৈরি করা হয়। বাংলায় এই ধরনের কাহিনির সার্থক নজিরটি মেলে উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী সংগৃহীত “টুনটুনির বই”-এর ‘চড়াই আর কাকের কথা’ নামক লোককথাটিতে। এখানে কাকের, চড়াইকে হত্যা করার প্রচেষ্টায় পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন চরিত্রের সাহায্য প্রার্থনার বিষয়টি লক্ষ করলে দেখা যায়, এক একটি চরিত্র এই কাজে কাককে সাহায্য করার জন্য যে এক-একটি শর্ত দেয় সেই সাপেক্ষে বাড়তে থাকে চরিত্র সংখ্যা ও গল্পের কলেবর। কাকের বিভিন্ন চরিত্রের কাছে পর্যায়ক্রমে সাহায্য প্রার্থনার বিষয়টি এভাবে রেখাচিত্রের সাহায্যে দেখানো যায়—

কাক ⟶ গঙ্গার কাছে ⟶ কুমোরের কাছে ⟶ মোষের কাছে ⟶ কুকুরের কাছে
↓
গৃহস্থের কাছে ⟵ কামারের কাছে ⟵ মাঠের কাছে ⟵ গাইয়ের কাছে

অন্যদিকে, কাককে সাহায্যের পূর্বে অন্যান্য চরিত্রেরা যে-সব জিনিস আনার শর্ত দিয়েছে তার মধ্যেও একটা পর্যায়ক্রমিক নীতি লক্ষ করা যায়। বস্তুত এই শর্তগুলি না চাপলে কাহিনিও যেমন এগোত না তেমনই আবার শর্তগুলির পর্যায়ক্রমিক বিশিষ্ট তাই, পরবর্তী নির্দিষ্ট চরিত্রগুলির আগমনকে ঘনিয়ে তুলেছে। সেই নিরিখে আমরা সেই শর্তগুলিরও একটি পর্যায়ক্রমিক মানচিত্র তুলে ধরতে পারি—

কাককে দেওয়া শর্তসমূহ

১ম শর্ত : ঘটি ⟶ ২য় শর্ত : মাটি ⟶ ৩য় শর্ত : মোষের শিং
↓
৭ম শর্ত : কাস্তে ⟵ ৬ষ্ঠ শর্ত : ঘাস ⟵ ৫ম শর্ত : দুধ ⟵ ৪র্থ শর্ত : মোষের মৃত্যু
↓
৮ম শর্ত : আগুন।

এছাড়াও ওই একই গ্রন্থের অন্তর্গত ‘টুনটুনির আর নাপিতের কথা’ গল্পটিতে টুনটুনির নাপিতকে জব্দ করার ক্ষেত্রে অন্যান্য চরিত্রদের সাহায্যের পর্যায়ক্রমিক বিন্যাসকেও এই পর্যায়ে ফেলা যায়—“হাতি বলে সাগর শুষি।/সাগর বলে, আগুন নেবাই।/আগুন বলে, লাঠি পোড়াই।/লাঠি বলে বিড়াল ঠেঙাই।/বিড়াল বলে, ইঁদুর মারি।/ইঁদুর বলে, রাজার ভুঁড়ি কাটি।/রাজা বলে, নাপতে বেটার মাথা কাটি।”[৩] আর এর মাধ্যমে টুনটুনির কার্য উদ্ধার

হয় অর্থাৎ নাপিত অবশেষে তার ফোঁড়া কাটতে রাজি হয়। সুতরাং এই যে সর্বশেষ ঘটনা, যার মাধ্যমে টুনটুনির কার্য উদ্ধার হলো সেটির ওপর গুরুত্ব রেখেই বাকি কাহিনিটি সাজানো—এটাও এই ধরনের লোককথার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্যই। এ প্রসঙ্গে স্টিথ থম্পসন জানিয়েছেন—

> There has been a series of events bound together by one slender thread and the interest has usually been a conversation containing an increasing number of details. The cumulative tale reaches its most interesting development, however, when there is not merely an addition with each episode but when every episode is dependent upon the last.[৪]

পাশ্চাত্যে এই ধরনের কাহিনির আদর্শ উদাহরণ হলো—'The old woman and her pig'[৫] যেখানে দেখা যায় একটি বুড়ি বাজার থেকে একটি শূকর ছানা কিনে ফিরছিল কিন্তু পথের মাঝে একটি বেড়া ছিল (পাঠান্তরে সিঁড়ি)। বুড়ি তখন শূকরটিকে লাফ দিয়ে সেটি পার হয়ে যেতে বলে কিন্তু শূকর রাজি হয় না, এদিকে বেলা বয়ে রাত হয়ে আসছে। তখন বুড়ি একটি কুকুরের কাছে গিয়ে শূকরটিকে কামড়াতে বলে যাতে শূকরটি লাফ দিয়ে বেড়াটি পার হয়ে যায়। কিন্তু কুকুরটি সে কাজ করতে রাজি হয় না। বুড়ি তখন রেগে লাঠির কাছে গিয়ে কুকুরকে পেটাতে বলে যাতে সে শূকরকে কামড়াতে রাজি হয়। লাঠিও রাজি না হলে বুড়ি আগুনকে গিয়ে লাঠি পুড়িয়ে দিতে বলে। আগুন রাজি না হলে সে জলের কাছে গিয়ে আগুন নিভিয়ে দিতে বলে। জল রাজি না হলে সে ষাঁড়ের কাছে গিয়ে জল খেয়ে নিতে বলে। ষাঁড় রাজি না হলে সে কসাই-এর কাছে গিয়ে ষাঁড়কে হত্যা করতে বলে। কসাই গররাজি হলে সে তখন দড়িকে বলে কসাইকে ফাঁস লাগিয়ে হত্যা করতে। অতঃপর দড়িও রাজি না হলে বুড়ি তখন ইঁদুরকে অনুরোধ করে দড়িকে দাঁতে কেটে ফেলার জন্য। ইঁদুর রাজি না হলে বুড়ি বেড়ালকে বলে ইঁদুরকে খেয়ে নিতে, বেড়াল তখন বলে যে বুড়ি আগে তাকে গোরুর দুধ এনে দিক তারপর সে বুড়ির কাজ করে দেবে। বুড়ি তখন গোরুর কাছে গিয়ে দুধ চায় তখন গোরু বলে যে খড়ের গাদা থেকে খাওয়ার জন্য খড় এনে দিতে। বুড়ি তা এনে দিলে গোরু তাকে দুধ দেয়। ব্যস এখান থেকেই শুরু হয় কাহিনির 'রিভার্স অ্যাকশান'। রেখাচিত্রের সাহায্যে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলা যেতে পারে—

গোরু বুড়িকে দুধ দিল

↓

দুধ খেয়ে বিড়াল ইঁদুরকে খেতে গেল

↓

ভয় পেয়ে ইঁদুর দড়ি কাটতে গেল

↓

ভয় পেয়ে দড়ি কসাইকে ফাঁস লাগাতে গেল

↓

ভয় পেয়ে কসাই ষাঁড়কে হত্যা করতে যায়

↓

ভয় পেয়ে ষাঁড় জল গলাধঃকরণ করতে পেল

↓

ভয় পেয়ে জল আগুন নেভাতে চলল

↓

ভয় পেয়ে আগুন লাঠি পোড়াতে গেল

↓

ভয় পেয়ে লাঠি কুকুরে পেটাতে উদ্যত হলো

↓

ভয় পেয়ে কুকুর শূকরটিকে কামড়াতে তেড়ে গেল

↓

ভয় পেয়ে শূকরটি লাফ দিয়ে বেড়াটি পার হলো

↓

এর ফলে বুড়ির কার্যসিদ্ধি হলো অর্থাৎ সে বাড়ি ফিরতে পারল

এই কাহিনির শেষাংশ অর্থাৎ বুড়ির বাড়ি ফেরাটিই মূল ব্যাপার আর তার জন্যই এতসব কান্ড! প্রত্যেকটি ঘটনাই একে অন্যের সঙ্গো পর্যায়ক্রমে ধারাবাহিকভাবে যুক্ত। প্রথমটি ঘনিয়ে তুলেছে দ্বিতীয় ঘটনা/চরিত্রের আগমনকে। এখানেই এই কাহিনির প্রধান ক্রমপুঞ্জিকতা।

● **শিকল কাহিনি (Chain Tale) :** লোককথার এই বিশেষ প্রকরণটির আসলে ক্রমপুঞ্জিত লোককথার সঙ্গো সাদৃশ্য অত্যন্ত প্রকট। অথবা বলা যায় যে, সেই সমস্ত ক্রমপুঞ্জিত লোককথাকেই Chain Tale—এই বিশেষ নামে অভিহিত করা যায়; যেগুলির গড়ন কিছু সংখ্যা, বস্তু অথবা কোনো ধারাবাহিক গাণিতিক পদ্ধতির একটি সুনির্দিষ্ট ক্রম (series) অনুসরণ করে। SDFML-এ বলা হয়েছে—

> Folk tale based on a characteristic series of numbers, object, characters, days of the week, events etc., in specific relation. Cumulative tales are chain tales but there are many distinctive chain tales which are not cumulative.[৬]

এই শ্রেণির কাহিনির আদর্শ উদাহরণ হলো, দাবার আবিষ্কর্তাকে পুরস্কার দেওয়া সংক্রান্ত প্রচলিত লোককাহিনিটি। দাবার আবিষ্কর্তা দাবি করে যে তাকে দাবার প্রত্যেকটি ছকের বর্গমূলের সমান গমের দানা দিতে হবে। অর্থাৎ প্রথম ছকের জন্য ১টি, দ্বিতীয় ছকের জন্য প্রথম ছকের গমের দানার বর্গের অনুপাতে ২টি, তৃতীয় ছকের জন্য ৪টি, চতুর্থের জন্য ১৬টি ইত্যাদি। এভাবে এমন এক সংখ্যা দাঁড়ায় যা রাজার পক্ষে দান করাও অসম্ভব হয়ে পড়ে।

● **অন্তহীন কথা (Endless Tale) :** এই শ্রেণির লোককথার কোনো সুনির্দিষ্ট সমাপ্তিবিন্দু নেই। এর আখ্যান কাঠামো সরল এবং গতিময় হলেও কাহিনি অংশ কিছুদূর অগ্রসর হয়ে একই স্থানে থেমে যায় এবং তারপর থেকে একই ধরনের বিষয় অথবা তথ্যাদির পুনরাবৃত্তি হতে থাকে যতক্ষণ না পর্যন্ত শ্রোতার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটছে। স্টিথ থম্পসন এ প্রসঙ্গো বলেছেন—

> There are usually quite simple in pattern. A situation is afforded in which a particular task must be repeated an indefinite number of times. Thousands of sheep, for example, must be put over a stream one at a time and the narrator proceeds inexorably with his literal repetitions of the performance until his listeners can stand it no longer.[৭]

প্রাসঙ্গিকভাবে মনে পড়ে যায় বাংলার প্রচলিত সেই বিশাল বটগাছ ও তার শাখা-প্রশাখায় বসবাসকারী হাজার হাজার টিয়ার প্রতিদিন প্রভাতে উড়ে যাওয়া সংক্রান্ত লোককথাটি। কথক লোককথাটি শুরু করেন এইভাবে এক প্রাচীন, বিশাল বটগাছে অনেক টিয়া বাস করে। সকাল হলে তারা একটি একটি করে ফুড়ুৎ করে উড়ে যায়। এরপর থেকে শ্রোতা যতবারই জিজ্ঞাসা করে 'তারপর' কথক ততবারই বলেন 'তারপর উড়ল পরের টিয়া ফুড়ুৎ' এইভাবে এই একই কথার পুনরাবৃত্তি চলতে থাকে যতক্ষণ না পর্যন্ত শ্রোতার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটছে। প্রসঙ্গত বলা যায় ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য তাঁর 'বাংলার লোক-সাহিত্য' (চতুর্থ খণ্ড/লোককথা) নামক গ্রন্থে এই ধরনের কথার উদাহরণ স্বরূপ 'যে গল্পের শেষ নেই'[৮] নামে যে লোককথাটি সংকলন করেছেন তাতে দেখা যায় যে রাজকন্যা সূর্যমণি তার প্রেমিক কামদেবকে বহু বাধা-বিপত্তি পেরিয়ে লাভ করে। তাদের বীরবর নামক একটি সন্তানও হয়। কিন্তু সেই শিশুপুত্রকে নিয়ে কলার ভেলা করে তারা যাত্রা করলে একটি ইঁদুর এসে সেই ভেলা কেটে দেয় ও তারা তিনজন স্রোতের টানে তিনদিকে ভেসে চলেই যায়... চলেই যায়...

● **বৃত্তাকার লোককথা (Circular Tale/ Round Tale/ Prose Round) :** এই শ্রেণির লোককথা আদপে Endless Tale-এরই এক বিশেষ প্রকারভেদ। এখানে কাহিনি কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর হঠাৎই এমন পরিস্থিতির সূত্রপাত হয় যে গল্পটি আবার নতুন করে শুরু করতে হয় এবং এ প্রক্রিয়া বারংবার চলতেই থাকে। এর উদাহরণ প্রসঙ্গে SDFML জানাচ্ছে—

> Typical of these is the tale that begins, "It was a dark and stormy night. The robbers were sitting around the fire"—one of their absent members ridded up on horseback– dismounts and joins them at the fire. "Tell us a story." Says one of the robbers to the new comer and again it begins, "It was a dark and stormy night. The robbers were sitting around their fire".[৯]

প্রসঙ্গত বলা যায় যে, এইরকম পুনরাবৃত্তিময়তা লোকসাহিত্যের যে-কোনো উপাদানেরই একটি সাধারণ লক্ষণ। আর এর সবচেয়ে বেশি প্রমাণ মেলে বিভিন্ন লোকসংগীত ও গীতিকাগুলির পর্যবেক্ষণে। সেখানে এই ধরনের Circular বা Round অবস্থায় কাহিনির ঘূর্ণন অত্যন্ত সহজলভ্য।

● **ধাঁধামূলক কাহিনি (Enigma Tale) :** এই জাতীয় লোককথার গঠনটি কাহিনির অন্তিম চরণে এসে এক প্রহেলিকাময় অবস্থায় কথক হঠাৎ তার কাহিনি থামিয়ে শ্রোতাকে সেই কাহিনি সংক্রান্ত বা ওই প্রহেলিকাময় অবস্থা সংক্রান্ত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন। শ্রোতারা সেই ধাঁধার জাল কেটে সঠিক উত্তর দিয়ে কাহিনিকে সম্পূর্ণ করেন। এই শ্রেণির কাহিনিকে কেউ কেউ ইংরেজি Enigma-র সমগোত্রীয় বলেছেন। এই Enigma-র মূল বৈশিষ্ট্য হলো—

> Enigmas are generally employed in Indian Folklore to measure the intelligence of the person interrogated and this intelligence test is used for a variety of purpose.[১০]

অর্থাৎ এই ধরনের লোককথার মাধ্যমে মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ ঘটে তাই অনেক ক্ষেত্রেই শিশুদের অঙ্ক শেখানোর জন্য এদের ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

● **আজগুবি লোককথা/উদ্ভট লোককথা (Tales of lying) :** সাধারণভাবে যে-কোনো সংস্কৃতিবলয়ে প্রচলিত লোককথাসমূহের ভিতর এমনকিছু উপাদান-ঘটনা-বর্ণনা থাকে যা,

আপাতদৃষ্টিতে অবিশ্বাস্য বা উদ্ভট বলে মনে হয়। কিন্তু তার নৃতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে সেসবের প্রতীকের বা রূপকের সাহায্যে আসলে যে সত্য বা বাস্তবতা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে তা স্পষ্ট বোঝা যায়। কিন্তু এরই পাশাপাশি এমন কিছু লোককথাও পাওয়া যায় যে তার মূল ভিত্তিটাই মিথ্যা, উদ্ভট বর্ণনা/অবিশ্বাস্য আজগুবি তথ্য পরিবেশনে ব্যয়িত হয়। আসলে এক্ষেত্রে লাগামবিহীন কল্পনাকে, গল্পের চৌহদ্দিতে পরিবেশন করা হয়। এই ধরনের কাহিনির চরিত্র মানুষ বা পশুপাখি উভয়েই হতে পারে। সাধারণত কোনো চরিত্রকে উদ্ভটভাবে বোকা বানানো হয়ে থাকে। এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে যায় 'সাত মার পালোয়ান', 'মুখে মারি আর ঠুকে মারি' কাহিনিগুলির কথা। এসব গল্পের এক চুমুকে সমগ্র পুকুরের জল পান করে ফেলা, চাষির কোঁচড়ে ৭০০টি মোষের সহাবস্থান অথবা পালোয়ানের তালগাছ ও বটগাছ দিয়ে দাঁতন করার বৃত্তান্ত ইত্যাদি আজগুবি প্রসঙ্গ এ বিষয়ক সার্থক নিদর্শন।

● **Catch Tale** : পাশ্চাত্যে শিশুদের মধ্যে প্রচলিত এই ধরনের লোককথা, সাধারণত তাদের খেলা করার অন্যতম পন্থা। এই গল্প এমনভাবে বলা হয় যাতে শ্রোতারা শেষ পর্যন্ত একটি প্রশ্নের সম্মুখীন হয়, প্রশ্নটি ধাঁধামূলক। উত্তর দিতে না পারলে উত্তরদাতাকে নিয়ে মজা করা হয়। লিন্ডা ডেঘ এ সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছেন—

> The Catch Tale is a traditional child teaser that forces the listener to interject a question that is rebuffed by an obvious or a ridiculous answer.[১১]

সুতরাং এতক্ষণের অলোচনা থেকে স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছে যে, শুধুমাত্র সাহিত্যগত অথবা শৈলীতত্ত্বের দিক থেকে বিচার করলে এই ধরনের লোককথাসমূহকে সম্যক বিশ্লেষণ করা সম্ভব নয়। আর এখানেই লগ্ন হয়ে আছে লোককথাকে বিচার-বিশ্লেষণ তাৎপর্যটি।

উৎসের সন্ধানে

১. Stith Thompson : 'The Folktale' reprinted, New York, University of California Press, 1980, P. 229
২. Linda Degh : ''Folk Narrative'', R.M. Dorson (Ed.), 'Folklore and Folklife : An Introduction', USA, The University of Chicago Press, 1982, Pp. 71, 72
৩. উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী : 'উপেন্দ্রকিশোর রচনাবলী' (প্রথম খণ্ড), প্রথম তুলি-কলম সংস্করণ, কলকাতা, পৃ. ৩২২
৪. Stith Thompson : ibid. P. ২৩২
৫. Joseph Jacobs : 'English Fairy Tales', First Publish, London, David Nutt, 1890, P. 20-23
৬. Maria Leach (Ed.), 'Standard Dictionary of Folklore, Mythology and Legend', (Vol. 1), New York, Funks & Wagnalls, 1972, P. 207
৭. Stith Thompson : ibid, P. 229
৮. আশুতোষ ভট্টাচার্য : 'বাংলার লোকসাহিত্য' (চতুর্থ খণ্ড), প্রথম সংস্করণ, ক্যালকাটা বুক হাউস, কলিকাতা, ১৯৬৬, পৃ.৬০৯
৯. Maria Leach (Ed.), ibid, p. 345
১০. (উদ্ধৃত) অন্তরা মিত্র : 'জাতীয়তাবাদী পদ্ধতিতে বাংলা লোককথার বিচার বিশ্লেষণ', প্রথম প্রকাশ, পুস্তক বিপণি, পৃ.৬২
১১. Linda Degh : 'Folk Narrative', Alan Dundes (Ed.), ibid, P. 72

লোককথা, মিথকথা ও সাহিত্যে তারকেশ্বর মন্দির প্রতিষ্ঠা কাল

সৌমেন মণ্ডল

পশ্চিমবঙ্গের হুগলি জেলার চন্দননগর মহকুমার অন্তর্গত তারকেশ্বরে অবমিত তারকেশ্বর মঠ পূর্ব ভারতের অন্যতম পবিত্র শৈবতীর্থ বলে জনমানসে সমাদৃত[১]। উৎপত্তিকাল[২] থেকে শুরু করে তারকেশ্বর মঠ ও মন্দিরকে কেন্দ্র করে বহু সংখ্যক তীর্থযাত্রীদের আগমন এর আঞ্চলিক চরিত্রকে অতিক্রম করে আন্তর্জাতিক রূপ দান করেছে। তথাপি দিগন্ত বিস্তৃত মহিমা শ্রী তারকনাথের বর্তমান তীর্থ কত সাল থেকে বাংলা তথা ভারতের যাত্রীগণকে আকর্ষণ করেছে, তা ঐতিহাসিকদের কাছে ততটা আকর্ষনীয় হয়ে উঠতে পারেনি।

প্রকৃতপক্ষে তারকেশ্বর মঠ ও মন্দির সম্পর্কে রচিত গ্রন্থের[৩] সংখ্যা নেহাত নগণ্য নয়। যদিও এই সমস্ত গ্রন্থের মূল উপজীব্য বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে অলৌকিকতা, মাহাত্ম্য, মিথ, তারকেশ্বর মঠ ও মন্দিরের জনপ্রিয়তা অর্জনের কারণ ইত্যাদি ইত্যাদি। তারকেশ্বর মন্দিরের প্রাচীনত্ব নির্ণয়ে তাদের সকলেই নীরব। এক্ষেত্রে অপর্যাপ্ত ঐতিহাসিক তথ্য সম্ভবত তাদের দূরে সরিয়ে রাখতে বাধ্য করেছে। আলোচ্য নিবন্ধখানি এই শূন্যস্থান পূরণের এক বিনম্র প্রয়াস। পাঠককুলের উদ্দেশ্যে জানিয়ে রাখা ভালো যে, অনাদিলিঙ্গ[৪] তারকেশ্বরের উৎপত্তি-সময় নির্ণয় এই অধমের উদ্দেশ্য নয়, বরং তারকেশ্বর মন্দির প্রতিষ্ঠার সময়কাল নির্ধারণ করাই এই প্রাবন্ধিকের উদ্দেশ্য।

প্রকৃত উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে গেলে প্রাবন্ধিককে একাধিকবার হোঁচট খেতে হয়। কারণ এ ব্যাপারে লেখ্যাগারের উপাদান একেবারেই নীরব। পুরাণে বিভিন্ন তীর্থস্থানের কথা থাকলেও তারকেশ্বর সেখানে অনুপস্থিত। তারকেশ্বর মঠে একদা সংরক্ষিত তথ্যরাজি, যা এ ব্যাপারে আলোকপাত করতে পারত, তা আজ অজ্ঞাত কারণে ধ্বংসপ্রাপ্ত। স্বভাবতই তৎকালীন সময়ের সাহিত্যসম্ভারের মধ্যেই আমাদের তথ্যসূত্রে হদিশ পাওয়া সম্ভব। পাশাপাশি, ক্ষেত্রসমীক্ষা, বয়স্ক ব্যক্তিদের সাক্ষাৎকার, বিভিন্ন পুস্তিকা এবং গ্রন্থাগারগুলিতে সংরক্ষিত গৌণ সূত্রের উপর আলোচ্য নিবন্ধ রচনার ক্ষেত্রে একান্তভাবেই নির্ভর করতে হয়।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, পুরাণ বা তন্ত্রাদিতে তারকেশ্বরের উল্লেখ নেই। রেনেলের ১৭৭৯-১৭৮১ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত বঙ্গদেশের মানচিত্রে তারকেশ্বরের অস্তিত্ব নেই[৫]। ১৮৩০-১৮৪৫ খ্রিস্টাব্দে সরকারি জরিপে 'তারেশ্বরী' নামে একটি স্থান দৃষ্ট হয়[৬]। সমসাময়িককালে তারকেশ্বর ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় বসবাসকারী সাহিত্য রচয়িতাদের মধ্যে অন্যতম সহদেব চক্রবর্তী[৭] (জন্ম হুগলীর রাধানগরে)-র 'ধর্মমঙ্গল' থেকে জানা যায়

যে—"মনে হয় মৃত্যুঞ্জয় একচল্লিশ সালে/বৃষধ্বজ বেশে ছিলেন শ্রীবিল্বের মূলে।" অর্থাৎ গ্রন্থ রচনা সম্ভবত ১১৪১ থেকে ১১৯৩ বঙ্গাব্দের মধ্যে। সুতরাং হতে পারে ১১৪১, ১০৪১, ৯৪১ বঙ্গাব্দের বা তারও পূর্ববর্তী কোনও সময়ের ঘটনা এটি। কিন্তু অন্যান্য তথ্যসূত্রে তা সমর্থিত হয় না। ষষ্ঠদশ শতকের অপর একজন বাঙালি লেখক মুকুন্দরাম চক্রবর্তী[৮] (১৫৫৩-১৬০০)-র 'চণ্ডীমঙ্গল'-এ বাংলার সমস্ত পবিত্র তীর্থস্থানের কথা উল্লেখ করা হলেও ব্যতিক্রম তারকেশ্বর। অবশ্য প্রফুল্ল চক্রবর্তীর সিদ্ধান্ত—

> If the temple of Taraknath existed prior to or even during this period, it is highly improbable that it would escape the notice of the poet. Therefore it may be presumed that either the deity was not widely popular at that time or did not appear at all.[৯]

কেদারনাথ সরকার[১০] 'তারকমঙ্গাল'-এর সূচনায় তারকেশ্বর মন্দিরের উৎপত্তি সাল হিসেবে ৭৮৫ বঙ্গাব্দ বা ১৩৭৮ খ্রিষ্টাব্দকে চিহ্নিত করেছেন যা মহামান্য কোর্ট-এর বিচারে সমর্থিত হয় না। রামকৃষ্ণ রায়ের[১১] 'শিবায়ন' (রচনাকাল আনুমানিক ১৬২৫ খ্রিস্টাব্দ) লিখিত আছে—'তারকেশ্বর তখনও পর্বত গহ্বরে জনসাধারণের দুষ্প্রাপ্যস্থানে অবস্থিত ছিল'। এই অঞ্চলে পর্বত লক্ষণীয় নয়, সম্ভবত অপেক্ষাকৃত উঁচু ঢিবি যুক্ত স্থান ছিল।

'স্বদেশপত্র'[১২] নামক সাপ্তাহিক পত্রিকায় দশনামী সম্প্রদায়ের গিরিধারীদের অন্তর্ভুক্ত সন্ন্যাসী ত্রিকূট গিরিকে তারকেশ্বর মঠের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে, যিনি তারপুর নামক স্থানে বসবাস করতেন। যদিও পরবর্তীতে তারপুর পরিচিতি লাভ করেছে 'তারকেশ্বর' বা 'তারেশ্বর'[১৩] নামে-এমন অভিমত অনেকেই প্রকাশ করে থাকেন। কিন্তু আলোচ্য পত্রিকা তারকেশ্বর মন্দিরের প্রতিষ্ঠাকাল বিষয়ে নীরবতা বজায় রেখেছে। যদিও ধর্মগুরু ধর্মানন্দ মহাভারতী জনপ্রিয় সাপ্তাহিক পত্রিকা 'স্বদেশ'[১৪]-এ উল্লেখ করেছেন যে, ত্রিকূট গিরি ৯২৬ থেকে ৯৩৯ খ্রিস্টাব্দ-এর মধ্যে তারকেশ্বরে বসবাস করতেন এবং তিনি মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কিন্তু এই অভিমতকে মেনে নিলে মন্দির প্রতিষ্ঠার সময়কাল ৭০০ বৎসর পিছিয়ে যায়। পন্ডিত শ্রীকুমার দেব স্মৃতিতীর্থ কাব্যভূষণ[১৫] মনে করেন যে, ত্রিকূট গিরির হাত ধরে মন্দির প্রতিষ্ঠা হয় এবং তাঁর মৃত্যুর পর ওই অঞ্চল জঙ্গালাবৃত হয়ে পড়ে। পরবর্তীতে তারকেশ্বর মঠের ও মন্দিরের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা ভারমল্ল-এর হাত ধরে বন পরিষ্কার হয় ও মন্দির খ্যাতি লাভ করে।

তারকেশ্বর মঠ ও মন্দিরের সঙ্গে সম্পর্কিত চারজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব ও তাদের সময়কাল ও অবদান আলোচনা করলে বিষয়টি পরিস্ফুট হয়। তাঁরা হলেন—১. রাজা ভারমল্ল ও তাঁর বংশ, ২. বালিগড়ী পরগনার ছেত্রী জমিদার রাজা বিষ্ণুদাসের গো-রক্ষক মুকুন্দ ঘোষ, ৩. তারকেশ্বর মঠের প্রথমে মোহন্ত মায়াগিরি ধূপান এবং ৪. তারকেশ্বর মন্দিরের প্রথম পুরোহিত চতুর্ভুজ গাঙ্গুলি। একথা বলা হয়ে থাকে যে, তারকেশ্বর ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকা যেমন গড়বেতা, হুমগড় প্রভৃতি স্থান তারকেশ্বর মঠের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা ভারমল্লের অধীনে ছিল। এই স্থানগুলি একদা বিষ্ণুপুরের স্বাধীন মল্লবংশীয় রাজাদের অধিকারভুক্ত ছিল। তাঁরা ৬৯৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৮০৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এগারোশ বছরেরও বেশি নিরবিচ্ছিন্নভাবে রাজত্ব করেন[১৬]। শেষ রাজা ছিলেন চৈতন্য সিংহ। এই রাজপরিবারের সন্তানদের মধ্যে অনেকেই বিভিন্নস্থানে গিয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য স্থাপন করেন। বিষ্ণুপুর রাজাদের প্রথম হতে ৫০তম

পুরুষ অর্থাৎ ৬৯৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৬২০ পর্যন্ত উপাধি ছিল 'মল্ল', যথা আদিমল্ল, জয়মল্ল, জগৎমল্ল, হাম্বীরমল্ল প্রভৃতি। তাই কোনও কোনও মতে, ভারমল্লকে বিষ্ণুপুর মল্লরাজাদের সম্পর্কিত বলে অনুমান করেন[১৭]। 'দশনামী সম্প্রদায়ের কথা' গ্রন্থেও উল্লেখ করা হয়েছে—"স্থাপিল প্রধান গদী শ্রীতারকেশ্বরে।/মল্লের ভূভাগ রাজ্য খণ্ড খণ্ড করে॥"[১৮] অর্থাৎ তারকেশ্বর মঠের প্রতিষ্ঠা ১৬২০ খ্রিস্টাব্দ বা পূর্ববর্তী কোনও সময়ে। 'এক্সপ্রেস'[১৯] নামক মাসিক পত্রিকায় দেখা যায় ভারমল্ল নামে এক ক্ষত্রিয় রাজা উজ্জয়িনীর কুল জাতীয় কোনও রাজপুত বংশে জন্ম গ্রহণ করেন। ইনি হুমায়নের বেতনভুক একদল ফৌজ নিয়ে বেরার থেকে রওনা হন। ১৫৩৯ খ্রিস্টাব্দে চৌসার যুদ্ধে শের খানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে হুমায়ন পরাজিত হলে ভারমল্লের অধীনস্ত সেনাদল ভেঙ্গে যায় ও সৈন্যগণ বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে। যদিও এমন কোনও ভারমল্লের পরিচয় আমরা পাই না। আবার বলা হয়ে থাকে যে, ভুরিশ্রেষ্ঠ রাজা সদানন্দ রায় হুমায়নের রাজত্বকালে শিয়াখেলা থেকে পশ্চিমে উদয়নারায়ণপুর এবং উত্তরে তারকেশ্বর থেকে দক্ষিণে আমতা (হাওড়া) পর্যন্ত আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন[২০]। পণ্ডিত শ্রীরাজকুমার দেব স্মৃতিতীর্থ কাব্যভূষণ-এর মতে, কেশব হাজারী টোডরমলের (আকবরের সভাসদ) সঙ্গচ্যুত হয়ে বর্তমান কৃষ্ণনগরে সপরিবারে এসে বসবাস করেন। কেশব হাজারীর পুত্র বিষ্ণুদাস রামনগরে বাসভবন নির্মাণ করেন, পরে রামনগরের অধিকার ভারমল্লকে অর্পণ করে পিত্রাধিকৃত ভূমি বাহিরগড়ায় বসবাস করেন।

বলা হয়ে থাকে যে, মোগল সম্রাট আকবরের আদেশে কেশব হাজারী উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ থেকে বঙ্গে আগমন করেন ও অনেক ক্ষুদ্র রাজা ও জমিদারকে বাহুবলে বশ করে সমান্তরাল প্রশাসন গড়ে তুলেছিলেন[২১]। কিন্তু বঙ্গদেশে মুঘল নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয় ১৫৭৬ সালে। সুতরাং ১৫৭৬ থেকে ১৬০৬ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে এই নির্দেশনামা জারি হয়েছিল অনুমিত হয়। কিন্তু এমন কোনও নির্দেশনামার পরিচয় পাওয়া যায় না। দ্বিতীয়ত, কেশব হাজারী কেন পুরাতন স্থান পরিত্যাগ করে নতুন আবাসস্থল গড়ে তুলেছিলেন এবং তৃতীয়ত, কেশব হাজারীর দুই পুত্র বিষ্ণু দাস ও ভারমল্ল মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাহলে প্রমাণিত হয় তা ১৭০৬-এর আগে তা সম্ভব ছিল না। কারণ অনুমিত হয় দুজনের রাজত্বকাল আনুমানিক ১০০ (৫০+৫০) বছর। 'List of Ancient Monuments in Bengal'[২২] গ্রন্থে লিখিত আছে যে, খ্রিস্টিয় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে অযোধ্যা প্রদেশ অন্তর্গত জৌনপুর জেলার ডোভী পরগনার গোমতী তীরস্থ হরিহরপুর নামক স্থানে রাজা বিষ্ণুদাস বসবাস করতেন। তিনি মুসলমানদের আধিপত্য অস্বীকার করে পাঁচশত অনুচর ও একশত কান্যকুব্জীয় ব্রাহ্মণসহ হুগলি জেলার হরিপালের নিকট রামনগরে এসে বসবাস করেন। কিন্তু প্রশ্ন হলো, এক মুসলমান নবাবের আধিপত্য অস্বীকার করে বাংলার আর এক মুসলমান নবাবের অধীনে বসবাসের কারণ কী এক্ষেত্রে সুধীর মিত্রের ব্যাখ্যা কাশীর রাজা বলবন্ত সিংহের সঙ্গে সংঘর্ষের জন্যই রাজা বিষ্ণুদাস দেশত্যাগ করেন[২৩]। এক্ষেত্রে অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধের কোনও বছর সুনিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া মুশকিল। যদিও স্বামী বিষ্ণু শিবানন্দ গিরির মতানুসারে[২৪] ১৭৩৯/৪০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ এই সংকট ও অভিবাসন ঘটেছিল এবং বিষ্ণুদাস রামনগরে উপনীত হন।

সুপরিচিত লেখক ও গবেষক সুধীর কুমার মিত্র দেখিয়েছেন যে, ১৭১০ থেকে ১৭২৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে যেকোনো সময় এটি ঘটেছিল[২৫]। তাঁর মতে, তৎকালীন সময়ে বাংলার নবাব মুর্শিদকুলী খান (১৭১৭-১৭২৭) চাষবাসের জন্য ১৫০০ বিঘা জমিও দান করেছিলেন। কিন্তু প্রশ্ন হলো কেশব হাজারী ও তাঁর দুই পুত্র বিষ্ণুদাস এবং ভারমল্ল ওই সময়কালে বঙ্গদেশে এসেছিলেন তার কোনও সঠিক প্রমাণ নেই। আবার যদি ১৭৩৯/১৭৪০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ তাঁরা এসে থাকেন তাহলে তা ঘটেছিল আলীবর্দি খান(১৭৪০-১৭৫৬)-এর আমলে। ভ্রান্ত ব্যাখ্যা ও পরস্পরবিরোধী চিত্র থেকে এখানেও কোনও সুনিশ্চিত সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভবপর নয়।

কিংবদন্তি অনুসারে, বর্ধমানের জমিদার জগৎরাম পুত্র কীর্তিচন্দ্র রায় রাজা ভারমল্লের রাজ্য আক্রমণ করেন। যুদ্ধে রাজা ভারমল্ল নিহত হয়। জানা যায়, ১৭০২ খ্রিস্টাব্দে জমিদার জগৎরাম আততায়ীর হাতে নিহত হলে তাঁর পুত্র কীর্তিচন্দ্র জমিদারিতে প্রতিষ্ঠিত হন এবং ১৭৪০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ক্ষমতায় থাকেন। তাই অনেকে মনে করেন যে, ভারমল্ল ১৭৪০ খ্রিস্টাব্দের অনেক আগেই বঙ্গদেশে এসে তারকেশ্বর মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন[২৬]।

মুকুন্দ ঘোষ ছিলেন রাজা বিষ্ণু দাসের গো-রক্ষক যিনি বাবা তারকনাথের প্রথম সেবায়েত হিসেবে নিযুক্ত হয়েছিলেন। মুকুন্দ ঘোষের কন্যার বিবাহ হয় তারকেশ্বরের নিকটবর্তী গুরিয়া গ্রামে। মুকুন্দ ঘোষের দৌহিত্র বংশলতা থেকে মন্দির প্রতিষ্ঠার সময়কাল নির্ধারণের প্রচেষ্টা নেওয়া যেতে পারে, যা হল এইরূপ[২৭]—মুকুন্দ ঘোষ → বসন্ত ঘোষ → তপস্বীরাম → বৈদ্যনাথ → শম্ভুনাথ → তিনকড়ি → রাজকুমার → অনাথনাথ → নিতাই → গদাধর → সনাতন। সাধারণত ২৫ বছরে এক পুরুষ ধরা হলে এখন থেকে কমবেশি (১৫×১১=২৭৫) বা তিনশত বছর পূর্বে অর্থাৎ খ্রিষ্টিয় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে তিনি ছিলেন বলে ধরা যেতে পারে। তারকেশ্বর মন্দির প্রতিষ্ঠায় মায়াগিরি ধূপানের ভূমিকা যথেষ্ট। অনেকে মায়াগিরি ধূপানকে মঠের প্রথম মোহন্ত বলে মনে করেন। অনেকে আবার জগন্নাথ গিরির সঙ্গে তাঁকে অভিন্ন বলে মনে করেন[২৮]। জানা যায়, তিনি বহুবিধ অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। অধিক পরিমাণে ধূপান করতেন বলে জনমানসে এই অভিধা পান[২৯]। ৮৫৫ সম্বৎ-এ অর্থাৎ ৭৯৯ খ্রিষ্টাব্দে তিনি বঙ্গদেশে এসে ২০ বছর অতিবাহিত করেন। কিন্তু প্রচলিত কিংবদন্তী কালপর্বকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। কারণ মায়াগিরি ধূপান ও রাজা ভারমল্লের মধ্যে ৯০০ বছরের ব্যবধান ছিল। প্রশ্ন জাগে তাদের মধ্যে সাক্ষাৎ কিভাবে সম্ভব যদিও প্রচলিত কিংবদন্তী হলো মায়াগিরি মঠের প্রথম মোহন্ত রাজা ভারমল্লের দ্বারা নিযুক্ত হয়েছিলেন[৩০]। হাওড়া জেলার শিংটি নিবাসী জন্মান্ধ চতুর্ভুজ গাঙ্গুলি তারকেশ্বর মঠের প্রথম পুরোহিত ছিলেন। তাঁর বংশতালিকা নিম্নে প্রদত্ত হলো[৩১]—

চতুর্ভুজ গাঙ্গুলি → নিমাইচরণ → রামকানাই → রামধন →

রাজকুমার

শ্যামাচরণ বরদাপ্রসাদ অন্নদা প্রমদা নৃত্যলাল

↓ ↓

বিজয় মনসাচরণ শীতলচরণ

বামাপদ সিদ্ধেশ্বর

উপরোক্ত বংশলতা থেকে কমবেশি তিনশ বছর পূর্বে অর্থাৎ খ্রিস্টিয় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে চতুর্ভুর্জ গাঙ্গুলি বিদ্যমান ছিলেন বলে জানা যায়। ৭৮৫ খ্রিস্টাব্দের ১০ চৈত্র (২১ মার্চ, ১৩৭৯ খ্রিস্টাব্দ) রাজা ভারমল্ল মায়াগিরি ধূপানকে মোহন্ত নিযুক্ত করে দেবসেবার জন্য যে সনদ দান করেন তার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য তারিখ হল ১১৬২ বঙ্গাব্দের ২৬ চৈত্র, ২১ চৈত্র, ১১৬৯ বঙ্গাব্দের ১২ ভাদ্র[৩২]। এর থেকে প্রমাণিত হয় যে, তারকেশ্বর মঠের আবির্ভাব ঘটেছিল ১১৬২ থেকে ১১৬৯ বঙ্গাব্দ বা ১৭৫৬ থেকে ১৭৬৩ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে। যদিও এই সনদ এবং ছাড়পত্র মোহন্ত মোহন গিরির বর্ধমান দেওয়ানী আদালতে Resumption suit—এ পেশ করলে তৎকালীন বিচারক মিঃ উইলিয়াম টেলর ১৮ই জানুয়ারি ১৮৩৮ খ্রিস্টাব্দে প্রদত্ত রায়ে বলেন ‘এই সনদ গ্রহণযোগ্য নয়’। বিচারকের ধারণা এই সনদ ২৫০ বছরের অধিক প্রাচীন নয়[৩৩]।

মাননীয় জেলা জজ (হুগলি) মি. কে. সি. নাগ টি. এস. ২৮/১৯২২ খ্রিষ্টাব্দে সি. পি. সি. সেকশন ৯২ মামলায় ৬ নভেম্বর ১৯২৯ প্রদত্ত রায়ে এই সনদ সম্বন্ধে বলেন—“Grave reasons for doubting the genuineness of the document– put reasons for that, it can’t be relied upon”[৩৪] এই মামলা কলকাতা হাইকোর্টে আপিল হলে (এফ. এ. নং ১/১৯৩০) মাননীয় বিচারপতি ৬ জুলাই ১৯৩৪ এবং ২৪ আগস্ট ১৯৩৪ তারিখে প্রদত্ত রায়ে একই মত প্রকাশ করেন[৩৫]।

তারকনাথ মন্দিরের অভ্যন্তরে একটি পাথরে ‘শুভমস্ত শকাব্দ ১৫৪৩’ (অর্থাৎ ১৬২৯ খ্রিষ্টাব্দ) উৎকীর্ণ আছে[৩৬]। যদিও মঠের প্রাক্তন মোহন্ত শ্রী শ্রী দণ্ডীস্বামী হৃষিকেশ আশ্রম মনে করেন উক্ত ‘১৫৪৩” শকাব্দের ‘৫’ সংখ্যাটি অস্পষ্ট। এটিকে ‘৬’ ধরা উচিত (অর্থাৎ ১৭২১ খ্রিষ্টাব্দ)। তাঁর মতে, এই সালেই মন্দির নির্মিত হয়েছে বলে ধরা যেতে পারে[৩৭]।

উপরোক্ত আলোচনার নিরিখে বলা চলে যে, তারকেশ্বর মন্দির প্রতিষ্ঠার সঠিক সময়কাল নির্ধারণ করা কষ্টসাধ্য কারণ তথ্যসূত্রে বিভিন্নতা। তারকেশ্বর মন্দিরের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা, তাঁদের অভিবাসন ও স্থানান্তর, জমিদারদের দেবসেবার উদ্দেশ্যে জমি দান-সমস্ত কিছুই অনেকাংশে এবং অনেকক্ষেত্রে অনুমাননির্ভর। তবে এটিও সত্য যে, তারকেশ্বর মন্দিরের প্রতিষ্ঠা ও জনপ্রিয়তা সমতালে অগ্রসর হয়নি। সম্ভবত তারকেশ্বর মন্দিরের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পেয়েছিল কয়েকজন যোগী মহাপুরুষ, মোহন্ত ও রাজাদের ব্যক্তিগত উৎসাহ ও উদ্যোগে এবং তা ঘটেছিল সপ্তদশ শতকের শেষ ও অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধে। অনাদি ও অনন্ত শিবলিঙ্গের অবস্থান সেখানে থাকলেও তা জনগণের অগোচরে ছিল। শ্রী দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য যথার্থই লিখেছেন যে, জলাভূমি ও উলু ঘাসের দ্বারা মন্দির ঘেরা ছিল[৩৮]। স্বভাবতই সাধারণ মানুষের দৃষ্টির অগোচরে ছিল, যদিও জনপ্রিয়তা পায় বেশ কিছু অলৌকিক ঘটনার মাধ্যমে। এক্ষেত্রে অবশ্য অলৌকিক ও অতীন্দ্রিয় ক্ষমতাবলে যোগী ও মোহন্তরা মন্দির ও মঠকে নিজেদের আশ্রয়স্থল হিসেবে গড়ে তুলেছিলেন।

উৎসের সন্ধানে

১. অমিয় কুমার ব্যানার্জী (এডিটেড) : ওয়েস্ট বেঙ্গাল ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারস, হুগলি, কলকাতা, ১৯৭২, পৃ. ৫

২. উৎপত্তিকাল নিয়ে বিতর্ক লক্ষ করা যায়। মহামান্য হাইকোর্ট মন্দির প্রতিষ্ঠা বছর হিসেবে ১৭২৯ খ্রিষ্টাব্দকে চিহ্নিত করেছে। দেখুন—জাজমেন্ট অব দ্য ক্যালকাটা হাইকোর্ট ইন এফ. এ. নং ১ অব ১৯৩০, ডেটেড ০৬.০৭.১৯৩৪ এবং ২৪.০৮.১৯৩৪

৩. উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলি হলো—প্রফুল্ল চক্রবর্তীর সোশ্যাল প্রোফাইল অফ তারকেশ্বর (কলকাতা, ১৯৮৪), সুধীর কুমার মিত্রের হুগলি জেলার ইতিহাস ও বঙ্গসমাজ (দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১৩) দীনেশ ভট্টাচার্য্য ও আশুতোষ ভট্টাচার্যর শিবায়ন (কলকাতা, ১৩৬৩ বঙ্গাব্দ), হংসনারায়ন ভট্টাচার্য্যের হিন্দুদের দেবদেবী- উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ (কলকাতা, ১৯৭৮) সতীশচন্দ্র গিরির তারকেশ্বর শিবতত্ত্ব (তারকেশ্বর, ১৯২২) প্রভৃতি।

৪. প্রকৃতপক্ষে লিঙ্গ দু-ধরনের-কামাদ লিঙ্গ (kamada-linga) অর্থাৎ ইচ্ছা পূরনের (kama শব্দের অর্থ wish এবং da শব্দের অর্থ giving) এবং অন্যটি মুক্তিদায়ী লিঙ্গ (liberation)। তারকেশ্বর শিবের ক্ষেত্রে প্রথমটির ধারণা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।

৫. সুধীর কুমার মিত্র : 'হুগলি জেলার ইতিহাস ও বঙ্গসমাজ', দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১৩, পৃ. ৬৭১

৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৭১

৭. তাঁর রচিত গ্রন্থগুলি 'অনিলপুরাণ' নামেও পরিচিত। রচনার সঠিক সময়কাল সম্পর্কে জানা না গেলেও অনুমিত হয় যে, ১১৪১ থেকে ১১৯৩ বঙ্গাব্দ (১৭৩৪-১৭৮৭ খ্রিস্টাব্দ) এর মধ্যে রচিত হয়েছিল। প্রকৃত পুঁথিখানি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারা সংরক্ষিত।

৮. তাঁর রচিত গ্রন্থখানি 'অভয়ামঙ্গাল' নামেও পরিচিত। অনুমিত হয় যে, ১৫৯০/১৫৯১ বঙ্গাব্দে এটি রচিত হয়েছিল। ১৯২০-১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ এর একটি সংস্করণ প্রকাশ করে। ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় কলকাতার প্রকাশনা বিভাগ এর একটি সংস্করণ প্রকাশ করে।

৯. প্রফুল্ল চক্রবর্তীর সোশ্যাল প্রোফাইল অফ তারকেশ্বর, কলকাতা, ১৯৮৪, পৃ. ১৬

১০. কেদারনাথ সরকার : 'তারকমঙ্গাল', কলকাতা

১১. গ্রন্থখানি রচিত হয়েছিল ১৬৮৪ অব্দে। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের হাত ধরে প্রকাশিত হয় ১১৩৩ বঙ্গাব্দে।

১২. স্বদেশপত্র, সাপ্তাহিক পত্রিকা, কলকাতা, ১৩১৪ বঙ্গাব্দ।

১৩. শ্রী সতীশচন্দ্র গিরি : 'তারকেশ্বর শিবতত্ত্ব', তারকেশ্বর, ১৯২২, পৃ. ৬

১৪. স্বদেশ, ২০ বৈশাখ, ১৩১৪ বঙ্গাব্দ।

১৫. রাজকুমার দেব স্মৃতিতীর্থ কাব্যভূষণ, তারকেশ্বর তথ্য, কলকাতা, ১৩১৬ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৪

১৬. শ্রী সতীশচন্দ্র গিরি : পূর্বোক্ত

১৭. শ্রী অমিয়কুমার চট্টোপাধ্যায় : 'ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে বাবা তারকনাথ', তারকেশ্বর, ২০০৫, পৃ. ১৪

১৮. অজানা, দশনামী সম্প্রদায়ের কথা, তারিখবিহীন।

১৯. এক্সপ্রেস, মাসিক পত্রিকা, ১৯০৮

২০. স্বামী অচ্যুতানন্দ :' হুগলীর সাদাকালী দেবী রাজবল্লভী', শারদীয়া নবকল্লোল, ১৪১০ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৩-৪

২১. গোষ্ঠবিহারী ধর : ত্রিতীর্থ, কলকাতা, ১৯১৬, পৃ. ৯৬

২২. লিস্ট অব অ্যানসিয়েন্ট মনুমেন্টস ইন বেঙ্গল, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৮৯৬।

২৩. সুধীর কুমার মিত্র : 'হুগলি জেলার ইতিহাস ও বঙ্গসমাজ', দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১৩, পৃ. ৬৭৫

২৪. স্বামী বিষ্ণুশিবানন্দ গিরি : 'তারকেশ্বর মঠ ও সাধু ভারমল্ল', জায়গা ও তারিখবিহীন।

২৫. সুধীর কুমার মিত্র : 'হুগলি জেলার ইতিহাস ও বঙ্গসমাজ', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১৩, পৃ. ৬৭৪

২৬. শ্রী অনুকুল চন্দ্র সেন ও শ্রী নারায়ণ চৌধুরী : 'বর্ধমান পরিচিতি', কলকাতা, ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৩৮-৩৯

২৭. রাজকুমার বেদ স্মৃতিতীর্থ কাব্যভূষণ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৪, এই বংশতালিকা মুকুন্দ ঘোষের পরিবার সনাতন ঘোষ কর্তৃত ১৪১১ বঙ্গাব্দে উক্ত লেখককে প্রদত্ত।

২৮. প্রমথনাথ স্যানাল : 'তারকেশ্বর', ঢাকা, ১৯৩৬

২৯. প্রফুল্ল চক্রবর্তী : পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭

৩০. শ্রী যাদবেন্দ্রনাথ রায় : 'বাবা তারকনাথ' (পত্রিকা), দ্বিতীয় বর্ষ, সংখ্যা-১২, তারকেশ্বর, ১৩৮৯ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৩১১

৩১. রাজকুমার বেদ স্মৃতিতীর্থ কাব্যভূষণ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৩

৩২. প্রফুল্ল চক্রবর্তী, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫

৩৩. শ্রী অমিয় কুমার চট্টোপাধ্যায় : 'ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে বাবা তারকনাথ', তারকেশ্বর, ২০০৫, পৃ. ২৯

৩৪. জাজমেন্ট অব মি. কে. সি. নাগ, ডিস্ট্রিক্ট জাজ অব হুগলী, ইন দ্য টি. এস. নং ২৮ অব ১৯২২, ডেটেড ০৬.১১.১৯২৯

৩৫. জাজমেন্ট অব দ্য ক্যালকাটা হাইকোর্ট ইন এফ. এ. নং ১ অব ১৯৩০, ডেটেড-০৬.০৭.১৯৩৪ এবং ২৪.০৮.১৯৩৪।

৩৬. প্রাবন্ধিক, ক্ষেত্র সমীক্ষায় প্রাপ্ত, তারিখ : ১৩.০৯.২০১৪

৩৭. শ্রী যাদবেন্দ্রনাথ রায় : পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১০। আরো বিস্তৃতির জন্য-শ্রী অমিয় কুমার চট্টোপাধ্যায়, ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে বাবা তারকনাথ, তারকেশ্বর, ২০০৫।

৩৮. শ্রী দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, মাসিক বসুমতি, ভাদ্র, কলকাতা, ১৩৬২ বঙ্গাব্দ, ৩৪তম বর্ষ, পৃ. ৮০০-৮০১।

মন্দির 'মিথ', লোককথা ও আঞ্চলিক সংস্কৃতি : তারকেশ্বর

জয়দীপ ঘোষ

ভারতবর্ষের বিভিন্ন মন্দির ও তীর্থস্থানের সঙ্গো জড়িয়ে আছে দীর্ঘদিনের প্রচলিত লোকবিশ্বাস যা ধর্মীয় আবেগকে বাড়িয়ে তলে। পশ্চিমবঙ্গোর হুগলি জেলায় হিন্দুদের প্রধান শৈব তীর্থস্থান তারকেশ্বরও ব্যতিক্রম নয়। তারকেশ্বর তীর্থকে কেন্দ্র করে রয়েছে নানা ধরনের 'মিথ' ও লোককথা। তারকেশ্বর তীর্থস্থানটি গড়ে উঠেছে একটি শিবমন্দিরকে কেন্দ্র করে। বর্তমানে এটি চন্দননগর মহকুমার মধ্যে ২২°৫৩' উত্তর এবং দ্রাঘিমাংশ ৮৮°২' পূর্বে অবস্থিত।[১] আলোচ্য প্রবন্ধে মন্দির 'মিথ' ও লোককাহিনি আলোচনা করার মধ্য দিয়ে কতগুলি বিষয়কে তুলে ধরতে চেষ্টা করেছি—মন্দির 'মিথ'গুলি কখন ও কীভাবে সৃষ্টি হয়েছে আঞ্চলিক সমাজগঠনে ও আঞ্চলিক সংস্কৃতিতে 'মিথ' ও লোককথা কীভাবে প্রভাব ফেলেছে সর্বোপরি তারকেশ্বর নামক একটি ক্ষুদ্র জনপদকে তীর্থস্থানে পরিণত করতে এবং জনবহুল শহর হিসাবে গড়ে তুলতে 'মিথ' গুলো কতটা সহায়ক হয়েছে?

কোনো নির্দিষ্ট অঞ্চলের লোক সম্প্রদায়ের ধর্মীয়, সামাজিক বিশ্বাস, আচার-আচরণ, জীবন প্রণালী ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে সেখানকার লোকসংস্কৃতি। এটা সম্পূর্ণই তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি। দীর্ঘকাল ধরে গড়ে ওঠা এই সংস্কৃতি তাদের প্রকৃত পরিচয় বহন করে। 'মিথ', রূপকথা, বীরকাহিনি, লোকসংগীত, লোকনৃত্য, লোকনাট্য, লোকধর্ম, লোকরন্ধন, লোক স্থাপত্য, লোক প্রবাদ, লোক ঔষধ, লোক ধাঁধা, ব্রত-পার্বণ ইত্যাদি সবই লোক সংস্কৃতির অঙ্গ। লোকসংস্কৃতিকে আধুনিককালে বলা হয় 'লোকসংস্কৃতি বিজ্ঞান'। সময়ের উপযোগী করে বিজ্ঞানকে যেমন প্রয়োগ করা হয়; তেমনই কালের গতির সঙ্গো লোক সংস্কৃতির গতিও ধাবমান থাকে।[২]

তারকেশ্বর 'মিথ' ও লোককথা আলোচনার পূর্বে 'মিথ' বলতে কী বোঝায় তা জানা প্রয়োজন। সাধারণত 'মিথ' বলতে বোঝায় এমন এক ধরনের গল্প বিশেষকে যা ব্যক্তি, বিষয় বা ঘটনার সম্পর্কে কালানুক্রমিকভাবে চলে আসছে এবং যেগুলিকে একসময়ে কিছু নির্দিষ্ট সংস্কৃতি সম্পন্ন মানুষ সত্য বলে মনে করত।[৩] অধিকাংশ 'মিথ'ই ধর্মের সঙ্গো সম্পর্কিত বা ধর্মীয় সংস্কারের সঙ্গো সংযুক্ত। 'মিথ' রচনার পিছনে ক্রিয়াশীল ছিল আদিম মানব সমাজের সংস্কার ও প্রত্যয়। 'মিথ' ছিল নির্দিষ্ট সংখ্যক মানুষের কাছে সত্য ইতিহাস, সমাজের প্রাণ ও নিঃশ্বাস বায়ু স্বরূপ।[৪] প্রাচীন গ্রিক 'Mythos' শব্দটির অর্থ ছিল 'কথা' (word), অর্থাৎ যে-কোনো কথাকেই 'মিথ' বোঝাত।[৫] তবে প্রাচীন গ্রীক এবং অন্যদেশের অনুসঙ্গ বিচার

করলে দেখা যায় যে- কোনো 'কথা'ই 'মিথ' এর অংশ নয়। বিশ্বসৃষ্টি এবং প্রলয়ের রহস্য, ভুমির উর্বরতা, জাদু, জন্ম-মৃত্যু এবং পুনর্জন্ম বিষয়ক প্রশ্ন, অলৌকিক কাহিনি প্রভৃতি'ই হলো 'মিথ' এর উপজীব্য বিষয়। মানব জীবনের অনেক অভিজ্ঞতা 'মিথ'এ পরিণত হয়, যখন তার সঙ্গো ঈশ্বরিক বা অলৌকিক ঘটনা সংযুক্ত হয়।[৬] 'মিথ'-এর সঙ্গো লোকগল্প এবং অন্যজাতীয় কাহিনির পার্থক্য হলো—'মিথ' এর মধ্যে যেভাবে আদিম তথা আবহমান জীবনের ধর্মীয় ও অলৌকিক রস সংকেতযুক্ত ঘটনাধারা রয়েছে; লোকগল্প বা অন্য ধরনের কাহিনিতে সেই ধরনের নেই।[৭] মানব চিন্তাভাবনার বিকাশের একটি নির্দিষ্ট স্তরে 'মিথ' এর উৎপত্তি। অনেকসময় গান বা গাথা হিসেবেও 'মিথ' প্রকাশ পায়। 'মিথ' গড়ে ওঠে প্রকৃতি সংক্রান্ত ঘটনা, বিশ্বাস, প্রথা ও ধর্ম কেন্দ্র করে। ধর্মের সঙ্গো 'মিথ'-এর সম্পর্ক রয়েছে। দৈবশক্তি বা অন্য কোনো অলৌকিক ক্ষমতার প্রকৃতি ও চরিত্র বিশ্লেষণের মাধ্যমে 'মিথ' মানুষকে ধর্মের সঙ্গো সার্বিক সম্পর্ক বজায় রাখতে সাহায্য করে।[৮]

'মিথ'-এর উৎপত্তি সম্পর্কে বিভিন্ন তত্ত্ব অবতারণা করা হয়। খাদ্য-বাসস্থানের চাহিদা এবং বিভিন্ন নতুন উপাদান সম্পর্কে জানার ইচ্ছাকে পরিপূর্ণ করার জন্য শিক্ষক, দার্শনিক, ভবিষ্যৎ বক্তা, ঋষিরা 'মিথ' এর অবতারণা করতেন।[৯] সূর্য, চন্দ্র ও অন্যান্য জিনিসকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন 'মিথ' গড়ে উঠত, কারণ এইগুলিকে ঈশ্বরিক ক্ষমতাসম্পন্ন বলে মনে করা হতো। আবার অনেক 'মিথ' গড়ে উঠত ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন ও তার ব্যাখ্যাকে কেন্দ্র করে।[১০] তারকেশ্বর সংক্রান্ত 'মিথ'গুলো প্রধানত মন্দির সংক্রান্ত। মন্দিরের উদ্ভব ও তারকনাথকে কেন্দ্র করে যুক্ত হয়েছে বিভিন্ন অলৌকিক কাহিনি। এর পিছনে সবচেয়ে বড়ো কারণ হলো মন্দিরের প্রচার বৃদ্ধি। তারকেশ্বরের বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানের সঙ্গো 'মিথ'কে সংযুক্ত করা হয়, যাতে তীর্থযাত্রীদের আগমন বৃদ্ধি পায়।

তারকেশ্বরের মন্দির সংক্রান্ত 'মিথ' উদ্ভবের ক্ষেত্রে আর্থ-সামাজিক উপাদান কাজ করেছে। মন্দিরের সঙ্গো যুক্ত মোহন্ত, পুরোহিত, ফুল-বিক্রেতা প্রমুখেরা ধর্মের সাথে যুক্ত ঠিকই; কিন্তু তাঁরা একটি আর্থ-সামাজিক শ্রেণিতেও অবস্থান করেন। অর্থনৈতিক দিক দিয়ে তাঁরা সমাজের একটি বৃহত্তর শ্রেণির উপর নির্ভরশীল। এঁরা অনেক সময় নিজেদের দেবতার অংশ হিসেবে প্রচার করেন। সমাজে একটা বৃহত্তর ভক্তগোষ্ঠী তৈরির জন্য এবং নিজেদের উচ্চ সম্মানে টিকিয়ে রাখার জন্য তাঁরা অনেকক্ষেত্রে 'মিথ' প্রচার করে থাকেন। সাধারণ মানুষ সহজেই 'মিথ' শুনে আকৃষ্ট হন, কারন মানুষ এমন একটা সত্তা, যার মধ্যে একই সঙ্গো যুক্তি এবং আবেগ কাজ করে। মানুষ যখন নিরাপত্তার অভাব বোধ করে, তখন অনেক সময় ভাগ্যবাদী হয়ে যান। মানুষ ফললাভের প্রত্যাশী। যিনি একবার ফল পেয়েছেন তিনই মাহাত্ম্য ও 'মিথ' প্রচার করেন। 'মিথ' প্রচারের ক্ষেত্রে ফললাভের জোর যতটা, ফলহীনতার জোর কিন্তু অনেক কম। অর্থহীনতা, সামাজিক সম্মানহীনতা, স্বাস্থ্যহীনতা, নিরাপত্তাহীনতা প্রভৃতির জন্য মানুষ নিজেকে দুর্বল বোধ করেন। এই দুর্বলতার মানুষকে 'মিথ' গ্রহণের উপযুক্ত বাতাবরন তৈরি করে দেয়। তারকেশ্বর 'মিথ'-এর কাহিনিগুলো সাধারণ মানুষের মানসিকতার সঙ্গো মিশে গিয়েছিল, তাই মানুষ সহজেই যেমন আকৃষ্ট হয়েছিল, তেমনই 'মিথ' এর গ্রহণযোগ্যতাও সাধারণ মানুষের কাছে বৃদ্ধি পেয়েছিল।

তারকেশ্বরে মন্দিরের উদ্ভব এবং তারকনাথকে কেন্দ্র করে যুক্ত হয়েছে বিভিন্ন অলৌকিক কাহিনি, তারকেস্বরের 'মিথ'গুলির জন্ম হয়নি; এগুলিকে নির্মাণ করা হয়েছে।

❖ **মন্দিরের উৎপত্তি সংক্রান্ত 'মিথ' :** তারকেশ্বরের মন্দিরের উদ্ভব সম্পর্কে 'মিথ' প্রচলিত আছে। খ্রিস্টীয় অষ্টাদশ শতকের প্রথমদিকে ক্ষত্রিয় বংশীয় কেশব হাজারীর দুইপুত্র ভারামল্ল ও বিষ্ণুদাস অযোধ্যা প্রদেশের জৌনপুর জেলার হরিহরপুর নামক স্থান থেকে বর্তমান তারকেশ্বর থেকে তিন মাইল দূরে রামনগর নামক স্থানে এসে বসবাস শুরু করেন।[১১] বিষ্ণুদাসের মুকুন্দঘোষ নামে একজন গোরক্ষক ছিলেন। তিনি তাঁর যাবতীয় গোরুর রক্ষণাবেক্ষণ করতেন। মুকুন্দঘোষ একদিন লক্ষ করলেন কপিলা নামক একটি গোরু একটি শিলাখণ্ডের ওপর দুধ ঢেলে দিচ্ছে। এই অলৌকিক ঘটনার কথা বিষ্ণুদাস জানতে পারলে ঐ শিলাকে তুলে এনে রামনগরে প্রতিষ্ঠার আয়োজন করেন কিন্তু বিষ্ণুদাস স্বপ্নাদেশে জানতে পারেন এটি সামান্য শিলা নয়—এটি তারকনাথ, অনাদি স্বয়ম্ভু শিবলিঙ্গ, সুতারাং উভয় ভ্রাতা শিলাটিকে তোলবার চেস্টা না করে এস্থানেই তারকনাথ মন্দির নির্মাণ করে দেন।[১২]

❖ **'মিথ' এর ব্যাখ্যা :** শিবলিঙ্গের মস্তকে গাভির দুগ্ধশূন্য করে ফিরে আসার ঘটনা শুধু তারকেশ্বর নয়, ভারতের অন্যত্রও শিবলিঙ্গের আবিস্কার প্রসঙ্গে এই ধরনের 'মিথ' শোনা যায়। এই আখ্যানটি সুস্পস্ট ভাবে কোনো স্থানীয় কৌম দেবতার শিবত্বপ্রাপ্তির ইঙ্গিত দেয়। পুরাণ শিব আর লোকায়ত শিবের এরকম একাকার হওয়ার কাহিনি ভারতের অন্যত্রও লক্ষ্য করা যায়।[১৩] দেবতাকে জনপ্রিয় করতে এসব কাহিনির প্রাসঙ্গিকতা সুদূরপ্রসারী। গাভি থেকে প্রাপ্ত অন্যতম একটি উপাদান হল দুধ যা শিবের উপাসনার জন্য প্রয়োজন হয়। এই 'মিথ' দ্বারা বোঝানো হয় তারকেশ্বরের শিবলিঙ্গ কোন মনুষ্য পদক্ষেপের দ্বারা সৃষ্টি নয়—ঈশ্বর কর্তৃক অনুপ্রাণিত। শিবলিঙ্গ আবিষ্কৃত হয়েছে শিবেরই অন্যতম বাহন গরু দ্বারা। মানুষ পরে দৃশ্যটা দেখেছে এবং শিব মাহাত্ম্য অনুভব করেছেন। সুতরাং ভারামল্লের ইচ্ছানুযায়ী শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত হয়নি, অর্থাৎ এটি ছিল স্বয়ম্ভু-লিঙ্গ।

❖ **তারকনাথ সংক্রান্ত 'মিথ' :** ভারতবর্ষের যে সমস্ত জায়গায় দৈবশক্তির প্রত্যক্ষ আদেশ বা লীলা দেখা যায় বলে হিন্দু ধর্ম বিশ্বাসী জনগণ মনে করেন তারকেশ্বর তাঁর অন্যতম। তারকেশ্বর সম্পর্কে অনেক অলৌকিক কাহিনি প্রচলিত আছে—

১. অলৌকিক শক্তি : তারকেশ্বর সম্পর্কিত প্রথম অলৌকিক কাহিনিটি হলো তারকেশ্বরের প্রথম সেবকের। সেবকের নাম চতুর্ভুজ গাঙ্গুলি। ইনি ছিলেন জন্মান্ধ। রাজা ভারামল্ল স্বপ্নে এই ব্রাহ্মণের সন্ধান পেয়েছিলেন। ভারামল্ল এঁকে সেবকের কাজে নিয়জিত করার কথা ভাবেন। সেবক অন্ধ ছিলেন বলে এই দায়িত্ব পালন বিষয়ে চিন্তিত ছিলেন। সেবক স্বপ্নে দেখেন মন্দিরের পশ্চিমে দুধপুকুরে স্নান করলে দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাবেন এবং যথারীতি দুধপুকুরে স্নান করে দৃষ্টিশক্তি ফিরে পান।[১৪]

২. অন্ধের দৃষ্টিদান : ১৩১৬ বঙ্গাব্দের ২২ জ্যৈষ্ঠ এক শিব ভক্ত মানুষ অন্ধ শিশুকে নিয়ে হাওড়া জেলা থেকে তারকেশ্বরে এসেছিলেন। তিনি তিনরাত্রি উপবাস করে তারকনাথের কাছে ধর্ণা দেন। ধর্ণা চলাকালীন দেবতার তরফ থকে আদেশ দেওয়া হয়েছিল চরণামৃতের কুণ্ড থেকে চরণামৃত নিয়ে অন্ধ শিশুর চোখে লাগালে শিশু চোখ ফিরে পাবে। তারকনাথের অশেষ কৃপার ফলে অসম্ভব জিনিস সম্ভব হয় এবং শিশুটি দৃষ্টিশক্তি ফিরে পায়।[১৫]

৩. বোবা শিশুর কথা বলা : ১৩২৯ বঙ্গাব্দে সুদুর গোহালা গ্রাম থেকে এক শিবভক্ত পিতা তাঁর শিশুকে নিয়ে তারকেশ্বরে ধর্ণা দিতে আসেন। জনশ্রুতি আছে তারকেশ্বরে আসার আগে গ্রাম ও শহরের বিভিন্ন চিকিৎসক কে দেখিয়ে কোন উপকার পাননি। তিনদিন তিনরাত্রি উপবাসে থাকার পর গভীর রাতে তারকনাথ আদেশ দেন ব্রাহ্মণের পদরজ ধারণ কর। দেবাদেশ সত্য হয় এবং বোবা শিশু কথা বলতে সক্ষম হয়।[১৬]

৪. হিন্দু-মুসলিম সকলকে সেবাদান : একজন মুসলমান ব্যক্তি তাঁর মৃতবৎসা গাভীর দোষ দূরীকরণের জন্য তারকনাথের কাছে মানত করেছিলেন। তাঁর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয় এবং তিনি মাটির ভাঁড়ে দুধ নিয়ে তারকনাথের উদ্দেশে উৎসর্গের জন্য তারকেশ্বরে আসেন। কিন্তু যবনপৃষ্ট দুধ চলবে না বলে পুরোহিতগণ তাকে তাড়িয়ে দেন। মুসলিম ব্যক্তিটি তখন দূরে গিয়ে ক্রন্দন করতে থাকেন। তারকনাথ তখন তাকে সন্ন্যাসমূর্তি ধারণ করে এক বেলগাছের তলায় ভোগের সোনার বাটিতে করে মুসলিম ব্যক্তির কাছ থেকে দগ্ধ পান করেন। ভোগের সময় পুরোহিতগণ সোনার বাটিটি না পেয়ে চতুর্দিকে খোঁজ করলে মুসলিম ব্যক্তিটির হাতে সেই বাটিটি দেখতে পান এবং তাঁর কাছ থেকে দুগ্ধপানের অলৌকিক কাহিনি শুনে সকলে ভুল বুঝতে পারেন এবং তারকনাথের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন।[১৭]

৫. পাটকাঠিতে গঙ্গাজল আনয়ন : অম্লকুল রোগগ্রস্থ স্বামীর রোগমুক্তির জন্য একজন স্ত্রীলোক তারকনাথের কাছে ধর্ণা দেন। ধর্ণা দেবার সময় তিনি মানত করেন স্বামী রোগমুক্ত হলে স্বামীর সঙ্গে তিনি শেওড়াফুলি নিমাইতীর্থ ঘাট থেকে পদব্রজে গঙ্গাজল এনে শিবপুজো করবেন। তারকনাথ সন্তুস্ট হয়ে তাঁর স্বামীকে রোগমুক্ত করেন। কিন্তু আরোগ্যলাভ করলেও স্ত্রীলোকটির স্বামী এই অলৌকিক ঘটনা বিশ্বাস করেননি। শেষে স্ত্রীর অনুরোধে জল আনতে সক্ষম হলেও তিনি বললেন পাটকাঠি দ্বারা নির্মিত বাঁকে সুতা বেঁধে দু'কলসি নির্বিঘ্নে তারকেশ্বরে নিয়ে যেতে পারলে তারকনাথের অলৌকিক ক্ষমতা মেনে নেবেন। স্বামী জল আনতে সক্ষম হলেও নাস্তিকের জল তারকনাথ গ্রহণ করেননি। তারকনাথের আদেশে সেই জল শিবগঙ্গায় (দুধপুকুর) দেওয়া হয়।[১৮]

৬. তারকনাথের স্বপ্নাদেশ : একজন উদর রোগে কাতর ব্যক্তি তারকেশ্বরে ধর্ণা দিতে আসেন এবং ধর্ণা শেষে তারকনাথের কৃপা লাভ করেন। তারকনাথ স্বপ্নে ব্যক্তিটিকে আদেশ দেন—'পথে এক কুকুর বেগুনি খাচ্ছে, যদি তুই খেতে পারিস, তবে রোগমুক্তি হবে'। লোকটি স্বপ্নাদেশ পাওয়া মাত্র কুকুরের মুখ থেকে বেগুনি কেড়ে নিয়ে ভক্ষণ করেন এবং রোগমুক্ত হয়ে ঘরে ফেরেন।[১৯]

৭. মাংসপিণ্ড শিশুর উদ্ধার : ৩০ ফাল্গুন (এই 'মিথ'টিতে সাল অনুপস্থিত) বরুণহাট গ্রাম থেকে এক মাংসপিণ্ড পুত্রসহ পিতা এবং মাংসপিণ্ড শিশুটির কাকা রামকৃষ্ণদাস তারকেশ্বরে ধর্ণা দিতে আসেন। চারদিন ধর্ণা দেওয়ার পর তারকনাথ তাঁর ওপর দয়া প্রদর্শন করেন। যাইহোক তারকনাথের কৃপায় মাংসপিণ্ড শিশুটি হাড়গোড় পায় এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পেয়ে সুস্থ হয়ে ওঠে।[২০]

৮. রেলবন্ধ ও দস্যুদমন : তারকনাথ ভক্তকে রক্ষা করতে সর্বদা দয়াবান থাকেন। তাঁর কাছে রাজা-প্রজা সকলেই সমান। তারকনাথের কাছে এক ভক্ত মানত করেছিলেন শেওড়াফুলির নিমাইতীর্থ ঘাট থেকে দণ্ডি দিয়ে তারকেশ্বরের পুজো করবেন। ভক্ত স্নান সেরে

দণ্ডি শুরু করেন; কিন্তু রেলক্রসিং-এ ভক্তের দুদিকে ট্রেন এসে যায়, ভক্ত তখন নিরুপায় হয়ে তারকনাথের কাছে প্রাণ ভিক্ষা করেন, তারকনাথের দয়ায় ভক্তের দু'দিকেই ট্রেন আটকে যায় এবং ভক্তের প্রাণ রক্ষা পায়। ট্রেনে অবস্থানরত এক ইংরেজ বিস্ময়ে চারদিকে দেখেন এবং ট্রেনের ধারে দণ্ডায়মান এক সন্ন্যাসীর নিকট সকল বিবরণ শুনে মুগ্ধ হন এবং ইংরেজ ব্যক্তিটি পরে মন্দিরে পুজো দিয়ে যান।[২১] এক ব্যক্তি অপরাহ্নে কিছু অর্থ নিয়ে মন্দিরে যাচ্ছিলেন পুজো দেওয়ার জন্য। কিন্তু ক্রমশ সন্ধ্যা নামলে দস্যুগণ তাকে ঘিরে ধরে। তখন ব্যক্তিটি তারকনাথের নিকট প্রান ভিক্ষা করেন। এরূপ অবস্থায় তারকনাথ অসীম কৃপা প্রদর্শন করেন। ভক্তের কণ্ঠে তারকনাথ আবির্ভূত হয়ে তাঁর আখ্যান শোনান। দস্যুরা ভয়ে পলায়ন করেন এবং ভক্ত যথা সময়ে মন্দিরে উপস্থিত হন।[২২]

৯. অহৈতুকী কৃপা : একদা জনৈকা সম্ভ্রান্ত বংশীয় রমণী বংশে কোনো উত্তরাধিকার না থাকায় বিধিমতে নানা প্রকার যাগযজ্ঞ করে হতাশ হন এবং সবশেষে তারকনাথের কাছে ধর্ণা দেন। তারকনাথ স্বপ্নাদেশ দেন, 'তুমি মন্দিরের উত্তরদিকে যে কুণ্ড দেখিতে পাইবে, তন্মধ্যে যে বস্তু প্রাপ্ত হইবে, তাহা ভক্ষণ করিলে আশা পূর্ণ হইবে।' রমণীটি দেখলেন সেই নির্দিষ্ট স্থানে একটি পচা গলিত মৃত বৃশ্চিকদেহ ব্যতীত অপর কোন বস্তু নেই। তিনি ভক্তি সহকারে এটি গ্রহণ করেন এবং দুধপুকুরে স্নান করে যখন সেটি ভক্ষণ করতে উদ্যত হলেন, তখন দেখলেন উক্ত বস্তুটি সুস্বাদু মিষ্টান্নে পরিণত হয়েছে। তারকনাথের কৃপায় তিনি পুত্রসন্তান লাভ করেন এবং ওই পুত্র জনসমাজে 'পরীক্ষিত' নামে পরিচিত হন।[২৩]

এছারাও তারকনাথকে কেন্দ্র করে আরও অনেক 'মিথ' ছড়িয়ে আছে। তারকেশ্বর সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের গান প্রচলিত আছে যার মাধ্যমে দেব মাহাত্ম্যকে তুলে ধরা হয়। যেমন— তারকেশ্বরের শতনামে বলা হয়েছে—

রাঢ়েতে তারকেশ্বর তারকনাথ নাম
রোগমুক্তি পায় পুজি পূর্ণ মনস্কাম॥[২৪]

তারকনাথ সংক্রান্ত 'মিথ'গুলিকে প্রধানত চারটি শ্রেণিতে ভাগ করা যেতে পারে। প্রথমত, একটি 'মিথ' গড়ে উঠেছে মন্দিরের উদ্ভব সংক্রান্ত বিষয়কে কেন্দ্র করে। দ্বিতীয়ত, অধিকাংশ মিথ ভক্তর আরোগ্য কামনাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে (১নং থেকে ৬নং 'মিথ')। তৃতীয়ত, কিছু 'মিথ' গড়ে উঠেছে ভক্তের মানত রক্ষাকে কেন্দ্র করে (যেমন ৭ ও ৯নং 'মিথ')। চতুর্থত, আবার কিছু 'মিথ' গড়ে উঠেছে ভক্তের প্রাণ বা জীবনরক্ষাকে কেন্দ্র করে (যেমন ৮নং 'মিথ')। তারকেশ্বরের মন্দির সংলগ্ন যে 'দুধপুকুর' রয়েছে, তাকে কেন্দ্র করে রয়েছে নানা ধরনের 'মিথ'। কথিত আছে 'দুধপুকুরে' স্নান করে তারকনাথের পুজো দিলে ভক্তের সকল মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়।[২৫] স্বভাবতই এখানে স্নান করা বা এখানকার জল চরণামৃত হিসেবে সেবন করার চল রয়েছে দীর্ঘদিন থেকেই।

এখন প্রশ্ন হলো কবে থেকে মাহাত্ম্য প্রচার শুরু হল এর সৃষ্টিকর্তা কারা? কবে থেকে মাহাত্ম্য প্রচার শুরু হল তা নির্ণয় করা যথেস্ট কঠিন, কারণ এ বিষয় কোনো সুনির্দিষ্ট লিখিত তথ্য নেই। তবে বিভিন্ন পুস্তিকায় মাহাত্ম্য লিখিত আকারে প্রকাশ পেয়েছে। পুস্তিকা এবং যে গ্রন্থ গুলিতে 'মিথ' পাওয়া যায় সেগুলি উনিশ শতকের আগে কখনই প্রকাশিত হয়নি। উনিশ শতকের শেষ দিকে তারকেশ্বরের মোহান্তদের মধ্যে নৈতিক অধঃপতন শুরু হয়।

তারকেশ্বরের মোহন্ত মাধবগিরি এলোকেশী নামক এক মহিলার সতীত্বনাশের অপরাধে কারাদণ্ড ভোগ করেন।[২৬] এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রচিত হয় বিভিন্ন লোককথা, প্রহসন ও গান। যেমন—

মন্দ কাজ ঢাকা দেখ, কখনো না রয়।
অবিশ্যি প্রকাশ হবে জেন গো নিশ্চয়।[২৭]

এছাড়া এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন লোকশিল্পীরা আঁকেন পটচিত্র। খোলা চুলের এলোকেশীর মধ্যে এঁরা ঐশ্বরিক শক্তিকে দেখতে পান এবং কালীর সঙ্গে তুলনা করেন।[২৮] এই ঘটনাটি উনিশ শতকের সমগ্র বাংলাকে আলোড়িত করে। মোহান্তর অন্যায় ও সত্যাচারের বিরুদ্ধে তারকেশ্বরে শুরু হয় সত্যাগ্রহ আন্দোলন।[২৯] তারকেশ্বরের গৌরব ফিরিয়ে আনার জন্য সম্ভবত এই সময় অনেক 'মিথ' ও মাহাত্ম্যের অবতাড়না করা হয়। তাই বলা যেতে পারে মন্দির সৃষ্টির পরেই সব 'মিথ ও গান' একসঙ্গে সৃষ্টি হয়নি। সময় মতো এগিয়েছে, সৃষ্টি হয়েছে নতুন নতুন 'মিথ'।

'মিথ' গুলির সৃষ্টিকর্তা কারা তা সঠিকভাবে বলা কঠিন, তবে অনুমান করা যেতে পারে পুরোহিত ও মন্দিরের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের কাছ থেকেই 'মিথ'গুলো প্রচারিত হত। এছাড়া মন্দিরের সঙ্গে যুক্ত আছে শতাধিক দালাল। এঁরাও দেব মহাত্ম্য প্রচার করে থাকেন। এক্ষেত্রে অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য কাজ করে। বেশি সংখ্যক যাত্রীকে আকৃষ্ট করতে পারলে তাদের অর্থাগম বেশি হয়।

তারকেশ্বরের 'মিথ'গুলি আঞ্চলিক সমাজ সংস্কৃতিতে যেমন প্রভাব ফেলেছে; তেমনই ক্ষুদ্র এই জনপদটিকে তীর্থস্থানে পরিণত করতেও সহায়তা করেছে। 'মিথ' প্রচারের মধ্যে দিয়ে ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়েছে তীর্থযাত্রীর সংখ্যা। বিপুল সংখ্যক তীর্থযাত্রীদের কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে বিভিন্ন শিল্প ও বাজার অর্থনীতি। বাঁক ও শিকে শিল্প (মন্দিরে জল বহনের জন্য ব্যবহৃত হয়) স্থানীয় লোক শিল্প হিসেবে গড়ে উঠেছে। বাজার অর্থনীতি গড়ে ওঠায় পার্শ্ববর্তী অঞ্চল থেকে এখানে বহুলোকের অভিবাসন ঘটেছে। সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে বৃদ্ধি পেয়েছে জনসংখ্যা। স্বভাবতই ক্ষুদ্র গ্রামীণ জনপদটি পরিণত হয়েছে শহরকেন্দ্রিক তীর্থস্থানে। তীর্থস্থানকে কেন্দ্র করে আঞ্চলিক সমাজ গঠনে এসেছে পরিবর্তন। সমাজের উপরের সারিতে সম্মানজনক স্থানে অবস্থান করেন মোহন্ত ও পুরোহিতরা। মধ্যবর্তী স্থানে রয়েছেন ব্যাবসায়ী, চাকুরীজীবী প্রমুখ সাধারণ মানুষ এবং নীচের সারিতে রয়েছে বৃহত্তর ভক্তগোষ্ঠী। মন্দিরে পালিত বিভিন্ন অনুষ্ঠান যেমন নামকরণ, চুলদান, বৈশাখী মেলা, শ্রাবণী মেলা, গাজন প্রভৃতি হয়ে উঠেছে সেখানকার আঞ্চলিক লোক সংস্কৃতির অঙ্গ। আধুনিককালের সমাজ-সচেতনতা, বিজ্ঞান মনস্কতা, সংস্কারমুখী মানসিকতা বিভিন্ন ধর্মকেন্দ্রিক অনুষ্ঠানে ও উৎসবের নৈতিক মানোন্নয়ন ঘটালেও তারকেশ্বরের আঞ্চলিক সংস্কৃতিতে 'মিথ', লোককথা, লোক উৎসবগুলির যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে।

উৎসের সন্ধানে

১. সুধীর কুমার মিত্র : 'হুগলী জেলার ইতিহাস ও বঙ্গসমাজ', ২য় খণ্ড, মণ্ডল বুক হাউস, কলকাতা, ১৯৬২, পৃ. ১১০৯

২. রামশঙ্কর চৌধুরী : 'আসানসোলের লোক সংস্কৃতি', নন্দদুলাল আচার্য সম্পাদিত, 'আসানসোলের ইতিহাস ও সংস্কৃতি', মিত্রম, কলকাতা, ২০১৪, পৃ. ২৭৮
৩. M.H. Abrams : 'A Glossary of Literary Terms', Harcourt College Publishers, 2001. P. 170
৪. কমলেশ চট্টোপাধ্যায় : 'বাংলা সাহিত্যে মিথের ব্যবহার', মডার্ণ বুক এজেন্সি প্রা. লি., কলকাতা, ১৯৮০, পৃ. ১৫
৫. তদেব : পৃ. ১৫-১৬
৬. Alfred Hillebrandt : 'Vedic Mythology', Vol-1, Motilal Banarsidass, Delhi, 1999, P. 2
৭. কমলেশ চট্টোপাধ্যায় : পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩
৮. Encyclopeadia of Religion and Ethics, Vol-9, T. and T. Clark, New York, 1980, p. 118
৯. M. R. Thakur : Myth, Rituals, Beliefs in Himachal Pradesh, Indus Publishing Co., New Delhi, 1997, P. 38
১০. D. D. Kosambi : 'Myth and Reality : Studies in the formation of Indian Culture', Popular Prakahan, Bombay, 1983, P. 1
১১. L.S.S.O' Malley : 'West Bengal District Gazetteers', Hooghly, Bengal Secretariat Book Depot, Kolkata, 1912, p. 332
১২. সুধীর কুমার মিত্র : পূর্বোক্ত, পৃ. ১১১২-১১১৩
১৩. সংবাদ প্রতিদিন (রবিবার ক্রোড়পত্র) : ২৯ জুলাই, ২০০৭
১৪. সুবোধ কুমার মিত্র : 'তীর্থ পরিচয়', নবপত্র প্রকাশন, কলকাতা, ১৩৬২, পৃ. ৬২
১৫. সুকুমার চট্টোপাধ্যায় (সংকলিত), তারকনাথের আদি মাহাত্ম্য ও পাঁচালি, তারকনাথ পুস্তকালয়, হুগলি, ২০০৬, পৃ. ২৯-৩০
১৬. তদেব : পৃ. ৩০
১৭. তদেব : পৃ. ৩০
১৮. শ্রী শ্রী তারকনাথ লীলা : মঠ কর্তৃক প্রকাশিত, ২০০১, পৃ. ৪
১৯. সুকুমার চট্টোপাধ্যায় : পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১
২০. তদেব : পৃ. ৬-৭
২১. তদেব : পৃ. ৬-৭
২২. গোষ্ঠ বিহারী ধর : 'ত্রি-তীর্থ', দ্য বেঙ্গাল মেডিকেল লাইব্রেরী, কলকাতা, ১৯১৬, পৃ. ৯০
২৩. তদেব : পৃ. ৯৩
২৪. তদেব : পৃ. ৯০-৯৩
২৫. মৌখিক সাক্ষাৎকার : অচিন্ত গোপ, তীর্থযাত্রী, হুগলি, তারিখ ২০.০৫.২০২০
২৬. সুধীর কুমার মিত্র : পূর্বোক্ত, পৃ. ১১১৯
২৭. ড. জয়ন্ত গোস্বামী : সমাজচিত্রে উনিশ শতকের বাংলা প্রহসন, সাহিত্যশ্রী, কলকাতা, ১৩৮১, পৃ. ২৫৭
২৮. শ্রীপান, মোহন্ত-এলোকেশী সম্বাদ, আনন্দ, কলকাতা, ২০০৫, পৃ. ৫১
২৯. সুধীর কুমার মিত্র, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১২০

লোককথায় নারী : লোকজ জীবনের অন্তরঙ্গ সম্পর্ক

শামস আলদীন

লোকসাহিত্য ব্যক্তি ও সমষ্টির সমবেত সৃষ্টি; ব্যক্তির মনে যে ভাবের উদয় হয়, তার অসম্পূর্ণ রূপায়ণকেই সমষ্টি নিজের আদর্শে সম্পূর্ণ করে নেয়। দিব্যজ্যোতি মজুমদার লোককথা সম্পর্কে বলেন—

> রাজনৈতিক কারণে বাংলা ভাষাভাষী এলাকা আজ দ্বি-খণ্ডিত। বাংলার একটি অংশ আজ স্বতন্ত্র স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র। কিন্তু ভাষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে আমরা একই ঐতিহ্য বহন করে চলেছি। তাই লোকসংস্কৃতির আলোচনা কখনই খণ্ডিত বাংলাকে নিয়ে সম্পূর্ণতা লাভ করতে পারে না।... লোকসমাজের মন রাষ্ট্রনৈতিক বিভাজনকে কখনই স্বীকার করে না। সেই হিসেবে লোকসংস্কৃতির আলোচনা একসঙ্গে উভয় বাংলাকে নিয়েই করতে হবে।[১]

তিনি বাংলার লোককথাকে নিম্নোক্ত সাতটি ভাগে বিন্যস্ত করেছেন—"১. পশুকথা ২. রূপকথা ৩. পরিকথা ৪. কিংবদন্তী ৫. ব্রতকথা ৬. লোকপুরাণ ও ৭. গীতিকার অন্তর্ভুক্ত কাহিনী।"[২] বাস্তবতার সংশ্লিষ্টতা ছাপিয়ে মহৎ হয়ে ওঠে না কোনো শিল্পই। আর সাহিত্য যেখানে জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ততা থেকেই উদ্ভূত, তার কথা বলাই বাহুল্য। অতি জনপ্রিয় শিশুসাহিত্য এবং রূপকথার ঠাকুরমার ঝুলিও এর ব্যতিক্রম নয়। উপরন্তু আঁতুরঘর নির্মিত হয়েছে সমাজের বৃহৎ জনগোষ্ঠীর ছায়ায়। তাই ঠাকুরমার ঝুলিতে মানুষের ও সমাজের রূপায়ণ অবিসংবাদিতভাবেই বাস্তবতাকে ধারণ করে। ঘরে-বাইরে নারীর বিভিন্ন রূপকেই তুলে ধরা হয়েছে এই রূপকথায়।

লোককলার একাধিক শাখা বেয়ে আমরা খুঁজে পাই রূপকথার অস্তিত্ব। 'ফেয়ারী' অর্থে পরি 'সুন্দরী রমণী' পাখির মতো দুটি ডানা সম্বলিত। আমাদের রূপকথায় কদাচিৎ পরির সন্ধান মেলে। সাদা যাদু এবং কালো যাদু এর মতো দুস্ট পরি ও ভালো পরি এই দুটি স্পষ্ট বিভাজন আছে। তবে সংখ্যাধিক্যে ভাল পরিরা এগিয়ে। এরা ক্লিস্ট, নির্যাতিত, ন্যায্য প্রাপ্য থেকে বঞ্চিতদের সহায়তা করে। অসহায় মানুষের প্রতি আনুকূল্য প্রদর্শন করে।[৩] রূপকথার শুরুতেই দেখি, রাজা বিষণ্ন। কেননা, তিনি সন্তানহীন। রাজবাড়ির নিম্নপদের কর্মীরাও রাজার মুখ সকালে দেখে না, কেননা আঁটকুড়ো রাজার মুখ দেখলে সারাটা দিন খারাপ যাবে। মর্যাদাহত রাজা সিদ্ধান্ত নেন, তিনি বনবাসী হবেন, রাজত্বে আর তাঁর কাজ নেই। কিন্তু সত্য সত্যই আর তাঁর রাজত্ব ত্যাগ করা হয়ে ওঠে না; কেননা ইতিমধ্যে কোনও সন্ন্যাসীর আবির্ভাব ঘটে যায়, যিনি রাজাকে আশ্বস্ত করেন তাঁর সন্তানলাভের ব্যাপারে। সন্ন্যাসী রাজার হাতে তুলে দেন একটি শিকড় বা একটি ফল কিংবা একটি পাখি। সন্ন্যাসীর পরামর্শ মতো রানিদের

সেই শিকড় বা ফল কিংবা পাখির মাংস খাওয়ানো হয়, তাঁরা সন্তানসম্ভবা হন। রাজার মনষ্কামনা চরিতার্থতা লাভ করে।[৪] সন্তানহীন রাজার সন্তানের জন্য ব্যাকুলতা সত্য, সত্য সন্ন্যাসী প্রদত্ত ফল বা শিকড় রানিদের মধ্যে সমানভাবে বণ্টন না করা, বিশেষত ছোটো রানিকে বঞ্চিত করার উদ্যোগ বা অভিসন্ধি তাও সত্য। কেননা মানুষ সাধারণত পরশ্রীকাতর, আত্মকেন্দ্রিক ও স্বার্থপর হয়।[৫]

লোকজ জীবনের সঙ্গে নারীর রয়েছে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক। লোকজ জীবনের দৈনন্দিন নানা আচারের সঙ্গে নারী ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এজন্য লোককথায় নারী নানাভাবে এসেছে—

> ১. শোষিত ছোটোরানি, ২. অত্যাচারী বড়ো রানি, ৩. নিষ্ঠুর বিধাতা, ৪. উপকারী পাখি, ৫. ঘুমন্ত রাজকন্যা, ৬. সোনার কাঠি রূপার কাঠি, ৭. অর্ধেক রাজত্ব ও রাজকন্যা, ৮. দাসীর বেশে রানি, ৯. রানির বেশে রাক্ষসী, ১০. অর্থলোভী স্ত্রী, ১১. প্রতিবাদী নারী।

বাঙালির হাসির গল্প জসীমউদ্দীনের অন্যতম লোককথার সংকলন। তিনি এখানে আমাদের আবহমান বাঙালি সমাজে নারীর সহজ সরল রূপটি যেমন তুলে ধরেছেন তেমনিভাবে আবহমানকাল ধরে অবহেলিত নারীর নানা রূপকেও তুলে ধরেছেন। প্রত্যেকটি গল্পে কোনও না কোনো প্রসঙ্গে নারী এসেছে। এতে ফুটে উঠেছে নারী জীবনের নানা হাহাকার, না পাওয়ার বেদনা, অল্পতে তুষ্ট থাকার প্রসঙ্গ প্রভৃতি বিষয়।

'গোপ্যার বউ' গল্পে দেখা যায় যে, গোপ্যা নামক এক ব্যক্তি ছিল; যার কাজ ছিল আজগুবি আজগুবি গল্প তৈরি করা। এজন্য তাকে নিয়ে লোকে হাসি তামাশা করলেও সে কিছু মনে করতো না। কিন্তু তার স্ত্রী তো কোনো অন্যায় করেনি। তারপরও স্বামীর আজগুবি গল্পের টিটকারির ভার তাকে নিতে হয়। লোকের জ্বালায় অতিষ্ট হয়ে গোপ্যার বউ স্বামীকে বলে যে, 'এই যে পাড়ায় পাড়ায় মিছা আজগুবি গল্প বানাইয়া বানাইয়া বলিয়া বেড়াও, লোকের টিটকারিতে ত আমি ঝালাপালা হইয়া পড়িলাম। আমাকে যে দেখে সে-ই বলে, ওই গোপ্যার বউ আসিল।'[৬] এখানে লক্ষণীয় বিষয় যে, গল্পের নাম 'গোপ্যার বউ' এবং গল্পের কোথাও গোপ্যার বউয়ের আসল নাম নাই। তার পরিচয়ই হলো গোপ্যার বউ। এখানে সমাজের পুরুষতান্ত্রিক মনোভাব খুব ভালোভাবে ফুটে উঠেছে। সমাজে একজন নারীর বিভিন্ন পরিচয় থাকলেও পুরুষের কিন্তু একটা নির্দিষ্ট পরিচয় আছে। একজন নারী ছোটোকালে অমুকের মেয়ে, বিয়ে হলে অমুকের বউ, আর বুড়ি হলে অমুকের মা। এসব পরিচয়ের আড়ালে তার আসল পরিচয় আর থাকে না। 'গোপ্যার বউ' নামক গল্পেও আমরা এই ধরনের মনোভাব দেখি।

আবার প্রতিবাদী নারী চরিত্রের দেখাও লোককথাগুলোতে দেখতে পাওয়া যায়। তেমনি একটি গল্প 'আয়না'। এই গল্পে আয়নাকে কেন্দ্র করে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয় তা আমাদেরকে প্রতিবাদী নারী চরিত্রের মুখোমুখি দাঁড় করায়। লক্ষণীয় বিষয় যে, তৎকালীন সময়ে নারী তার স্বামীকে মারার জন্য ঝাঁটা নিয়ে প্রস্তুত থাকা দূরের কথা স্বামীর নামটাও পর্যন্ত মুখে আনে না। অথচ এই গল্পে স্বামীকে সতীন নিয়ে আসার জন্য স্ত্রী মারার জন্য প্রস্তুতি নিয়ে থাকে। 'আয়না' গল্পের কাহিনি গড়ে উঠেছে সেই সময়কে কেন্দ্র করে যখন আমাদের দেশে কোনো আয়নার প্রচলন ছিল না। মাঝে মাঝে কাবুলিওয়ালারা এগুলো

বিক্রি করতে নিয়ে আসতো। কিন্তু তা সাধারণ জনগণের জানার পরিধির মধ্যে ছিলো না। তাই আয়না সম্পর্কে অধিকাংশ মানুষেরই জ্ঞান ছিল না। কৃষকের ছেলে মাঠে ধান কাটতে গিয়ে আয়নাটা পায়। ভালো করে পরিষ্কার করে দেখে যে আয়নায় তার পিতার মুখ দেখা যায়। পিতা দীর্ঘদিন মারা গেছে এবং এতদিনে পুত্রের মুখের চেহারা পিতার মতো হয়েছে। এর আগে সে কখনো আয়না দেখেনি। সে নিজের ছবিকে পিতা মনে করে আয়নাটাকে যত্ন করে রাখে। অন্যদিকে তার স্ত্রী সন্দেহের বশবর্তী হয়ে যখনই দেখে যে আয়নাতে একটি মেয়ের ছবি দেখা যাচ্ছে তখন সে তাকে তার সতীন মনে করে। এবং সে স্বামীকে শাস্তি দেওয়ার জন্য ঝাঁটা হাতে ফুলতে থাকে—"আসুক আগে মিনসে বাড়ি। আজ দেখাইব এর মজা!" একটি ঝাঁটা হাতে লইয়া বউ রাগে ফুলিতে লাগিল; আর যে যে কড়া কথা সোয়ামিকে শুনাইবে, মনে মনে আওড়াইয়া তাহাতে শান দিতে লাগিল।[৭]

স্বামী বাড়িতে ফিরলে তাকে নানা গালিগালাজ করতে থাকে এবং চিৎকার করে বলে, "ওরে গোলাম, তোর এই কাজ একটা কাকে বিবাহ করিয়া আনিয়াছিস" এই বলিয়া আয়নাখানা চাষীর সামনে ছুড়িয়া মারিল।"[৮] চাষি যতই আয়নার মধ্যে তার পিতা থাকার কথা বলে সে ততই রেগে যায়। এক পর্যায়ে সে রেগে গিয়ে বলে, "ওরে গোলাম! ওরে সফর! তবু বলিস তোর বাজান! তোর বাজানের কি গলায় হাসলি, নাকে নথ আর কপালে টিপ আছে নাকি।"[৯] আয়নার ব্যবহারজনিত পরিচয় না থাকার ফলে আয়নায় প্রতিফলিত নিজেদের মুখ অন্য কারও বলে মনে করাতে এখানে হাসির উদ্রেক ঘটেছে এবং ফলত চাষি ও চাষি বৌ-এর মধ্যে অযথা ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়। এই একটা নিছক আয়নাকেই কেন্দ্র করে।[১০]

'নাপিত-ব্রাহ্মণ' গল্পে দুই মেয়েকে এক ছেলের সঙ্গে বিয়ের উল্লেখ দেখা যায়। ছেলেটি আবার ভণ্ড ব্রাহ্মণ। আগে নাপিত ছিল। ব্রাহ্মণের পেছন পেছন ঘুরে সে অনেক মন্ত্র শিখেছে। এখন নিজেই ভিন দেশে গিয়ে পুরোহিতের কাজ শুরু করে দিয়েছে। যে কোন ছলনা বা কপটতা দুর্গতির কারণ হয়ে উঠতে পারে। এ গল্প তারই প্রমাণ।[১১] সুব্রত চক্রবর্তী এই প্রসঙ্গে বলেন—"এই গল্পে তাঁতশিল্পের করুণ অবস্থায় তাঁতিরা যে ক্ষতিগ্রস্ত তা তুলে ধরা হয়েছে। আবার অপরদিকে অতিরিক্ত জেদ মানুষকে যে কোনো বিপাকে ফেলে সেটাও স্পষ্ট হয়ে ওঠে।"[১২] "বাঙালি নাকি করুণরসের ভক্ত। কাঁদতে পেলে সে আর কিছু চায় না। কান্নায় বুক ভাসাতে তার জুড়ি মেলা ভার। কিন্তু বাঙালি যে হাসতেও পারে, হাস্যরসেও তার আসক্তি এসব গল্পই তার প্রমাণ। প্রসন্নতা এবং জীবনাসক্তি ব্যতিরেকে পবিত্র হাস্যরস সৃষ্টি হওয়া সম্ভব নয়।"[১৩] আর এসবের মধ্যে ছড়িয়ে আছে নারী জীবনের নানা চালচিত্রের বর্ণনা।

'ঠাকুরমার ঝুলি' বাংলা লোককথার উল্লেখযোগ্য সংযোজন। এখানে নারীকে আমাদের আবহমানকালের সমাজজীবনের প্রেক্ষিতেই দেখা হয়েছে। নারীর শত্রু নারী তা এই গল্পগ্রন্থের বিভিন্ন গল্পে তুলে ধরা হয়েছে। এই দিকটা আমাদের আবহমানকালের সমাজজীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। 'কলাবতী রাজকন্যা' গল্পে সেরকম একটি চিত্র দেখতে পাই যেখানে নিঃসন্তান রাজার স্ত্রীগণ ব্রাহ্মণের দেওয়া ওষুধ খেয়ে সন্তান জন্ম দিলেও দুই রানি ওষুধের ভাগ না পেয়ে পানি দিয়ে চেটে খাওয়ার ফলে পেঁচা আর বানর জন্ম দেওয়ার কাহিনি দেখি।

এখানে সতীনে সতীনে চিরাচরিত যে ঈর্ষা সেই কাহিনিই তুলে ধরা হয়েছে—

> বড় রানির কথাই সত্য, ন-রানির পেটে এক পেঁচা, আর ছোটো রানির পেটে এক বানর হইল।... যাইতে যাইতে বুদ্ধু পাতাল-পুরীতে গিয়া দেখিল, এক মস্ত সুড়ঙ্গ। বুদ্ধু সুড়ঙ্গ দিয়া, নামিল। সুড়ঙ্গ পার হইয়া বুদ্ধু দেখিল, এক যে রাজপুরী। যেন ইন্দ্রপুরীর মত! কিন্তু সে রাজ্যে মানুষ নাই, জন নাই, কেবল এক একশ বচ্ছুরের বুড়ি বসিয়া একটি ছোট কাঁথা সেলাই করিতেছে। বুড়ি বুদ্ধুকে দেখিয়াই হাতের কাঁথা বুদ্ধুর গায়ে ছুঁড়িয়া মারিল। অমনি হাজার হাজার সিপাই আসিয়া বুদ্ধুকে বাঁধিয়া-ছাদিয়া রাজপুরীর মধ্যে লইয়া গেল। নিয়া গিয়া, সিপাইরা, এক অন্ধকুঠুরীর মধ্যে "বুদ্ধু ভাই, বুদ্ধু ভাই, আয় ভাই" বলে অনেক লোক বুদ্ধুকে ঘিরে ধরল। বুদ্ধু দেখিল, রাজপুর আর মাল্লারা, মাঝিরা।... বুদ্ধু বলিল, বটে! তা, আচ্ছা।[১৪]

পেঁচা আর বানর জন্ম দেওয়ার কারণে দুই স্ত্রীকে রাজদরবার থেকে বের করে দেওয়া হয়। তাদেরকে চিড়িয়াখানার বাঁদী আর ঘুঁটে কুড়ানি দাসীর কাজ করতে হয়। এভাবে তারা বাস করতে থাকে। তারা দুই ভাই তাদের দুই মাকে খুব যত্ন করতে থাকে। এত কষ্টের মধ্যেও সন্তান নিয়ে তারা সুখে বাস করতে থাকে। ভাগ্যের কী নির্মম পরিহাস এক সময় যারা দরবারে রাজরানির মতো ছিল, আজ তাদের এই অবস্থার জন্য দায়ী সতীনে সতীনে দ্বন্দ্ব। ভুতুমের মা চিড়িয়াখানার বাঁদী, বুদ্ধুর মা ঘুঁটে-কুড়ানি দাসী। কোনোদিন খাইতে পায়, কোনোদিন পায় না। বুদ্ধু দুই মায়ের জন্য বন জঙ্গাল হইতে কত রকমের ফল আনে। ভুতুম ঠোঁটে করিয়া দুই মায়ের পান খাইবার সুপারি আনে। এই রকম করিয়া ভুতুম, ভুতুমের মা, বুদ্ধু, বুদ্ধুর মা'র দিন যায়।[১৫]

এই গল্পে বাঙালি নারীর কাজ ভাগ করে নেওয়ার দৃশ্যকে খুব সুন্দরভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। এই দৃশ্য আমাদের একান্নবর্তী পরিবারের কথা মনে করিয়ে দেয়। বিশেষ করে আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয় যেসব পরিবারের সতীনের সংসার তাদের কাজকে স্বামী ভাগ করে দেয়। এই গল্পও তার থেকে ব্যতিক্রম নয়—

> রানিরা মনের আনন্দে তাড়াতাড়ি স্নান করিয়া আসিয়া, কাপড়-চোপড় ছাড়িয়া, গা-মাথা শুকাইয়া, সকলে পাকশালে গেলেন। আজ বড় রানি ভাত রাঁধিবেন, মেজরানি তরকারি কাটিবেন, সেজরানি ব্যঞ্জন রাঁধিবেন, ন-রানি জল তুলিবেন, কনে রানি যোগান দেবেন, দুয়োরানি বাটনা বাটিবেন, আর ছোটরানি মাছ কুটিবেন। পাঁচ রানি পাকশালে রহিলেন, ন-রানি কুয়োর পাড়ে গেলেন, ছোটোরানি পাঁশগাদার পাশে মাছ কুটিতে বসিলেন।[১৬]

এ প্রসঙ্গে মো. শহীদুর রহমান বলেন—গ্রামের সংগতি সম্পন্ন গৃহস্থরাই তাদের সম্পত্তি রক্ষা ও সম্পদ আহরণের কাজে যোগান দেওয়ার জন্যই মূলত একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করতো এবং স্ত্রীদের সংসারের এক একটি দায়িত্ব এক এক স্ত্রীকে প্রদান করতো। তাহলে বোঝাই যাচ্ছে, মানুষ যখন শিকার সভ্যতা পেরিয়ে কৃষিসভ্যতায় পদার্পণ করে স্থায়ী বসবাসের জন্য গৃহী হয়েছে, তখনই তাদের কাজকর্ম এবং সম্পদ রক্ষার্থে জনবলের প্রয়োজন হচ্ছে। আর এই জনবল বাড়াতে তাদের একাধিক বিয়ে করার প্রয়োজন হচ্ছে। অবশ্য সমাজে বহুবিবাহের নানাবিধ কারণের মধ্যে এটি একটি। তবে একাধিক বিয়ে-সাদিতে সতীনে সতীনে মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্বও সৃষ্টি হয়। অনেক সময় এ দ্বন্দ্ব প্রতিহিংসায় রূপান্তরিত হয়ে হত্যাযজ্ঞের কারণ হয়েও

দেখা দেয়। এ কাহিনিতে হত্যাযজ্ঞ সৃষ্টি না হলেও ন-রানি ও ছোটোরানিকে সতীনের প্রতিহিংসার শিকার হতে হয়েছে এবং সন্ন্যাসীর অলৌকিক ঔষধে বানর ও পেঁচা জন্মদানের কারণে সংসারচ্যুত ও চিড়িয়াখানার বাঁদী-দাসী হয়ে সমাজের নির্যাতিত নিম্নশ্রেণিভুক্ত মানুষে পরিণত হতে হয়েছে। ভূতুমের 'মা' ন-রানি হয়েছে চিড়িয়াখানার বাঁদী, আর বুদ্ধুর মা ছোটোরানি হয়েছে ঘুঁটে কুড়ানি এবং এভাবেই সমাজে পতিত হয়ে তাদের পেশাও নির্ধারিত হয়ে গেল নিম্নশ্রেণির।[১৭]

রানির ছেলেরা কলাবতী রাজকন্যাকে আনতে যাবে। এজন্য যে আচার পালন করা হয় তা এখনো আমাদের বাঙালি সমাজে কোনও কোনও ক্ষেত্রে বিদ্যমান। ধান, দূর্বার ব্যবহার বাঙালি জীবনের অনুষঙ্গ। বাঙালি নারীরা সন্তানের মঙ্গল কামনা করে ধান, দূর্বা ব্যবহার করে থাকেন। তেমনি একটি দৃশ্য দেখা যায় 'কলাবতী রাজকন্যা' গল্পে। "রানিরা ধান-দূর্বা দিয়ে, পঞ্চদীপ সাজিয়ে, শাঁখ শঙ্খ বাজিয়ে কলাবতী রাজকন্যাকে বরণ করে ঘরে তুললেন।"[১৮]

'ঘুমন্তপুরী' গল্পে ঘুমন্ত রাজপুরীর জেগে ওঠার যে কাহিনি বর্ণনা করা হয়েছে তাতে রাক্ষসের ছদ্মাবরণ বর্ণিত হলেও আসলে আমাদের আবহমান বাঙালি জীবনের চিত্রই যেন বর্ণিত হয়েছে। আমাদের চোখে রাজকন্যা যেমন হয় ঠিক তেমনিভাবে তাকে তুলে ধরা হয়েছে। রাজ পরিবেশের যে বর্ণনা করা হয়েছে তা আমাদের চির পরিচিত পরিবেশকে স্মরণ করিয়ে দেয়। বাঁদী, দাসী প্রভৃতি চরিত্রগুলো রাজদরবারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। এই গল্পে আমরা সেই রকম কিছু চিত্র দেখি। চারিদিকে ফুল-বৃষ্টি, চারিদিকে চন্দন-বৃষ্টি, ফুল ফোটে, খৈ ছোটে, রাজপুরীর হাজার ঢোলে ডুম-ডুম কাটি পড়ল। তখন, শতে শতে বাঁদী দাসী বাটনা বাটে, হাজারে হাজারে ধাই দাসী কুটনা কোটে; দুয়ারে দুয়ারে মঙ্গল ঘড়া পাঁচ পল্লব ফুলের তোড়া, আলপনা বিলিপন, এঁয়োর ঝাঁক পাঠ পিঁড়ি আসন ঘিরে, বেজে ওঠে শাঁখ। "সেকি শোভা! রাজপুরীর চারচত্বর দলবল ঝলমল। আঙিনায় আঙিনায় হুলুধ্বনি, রাজভাণ্ডারে ছড়াছড়ি; জনজনতার হুড়াহুড়ি এতদিনের ঘুমন্ত রাজপুরী দাপে কাঁপে, আনন্দে তোলপাড়।"[১৯]

'কাঞ্চনমালা' গল্পটি ভিন্ন ধরনের স্বাদ নিয়ে আসে। রাখাল আর রাজপুত্রের মধ্যে বন্ধুত্বের সূত্র ধরে গল্পের কাহিনি সামনের দিকে অগ্রসর হয়। বাঙালি নারীর লোকশিল্পের প্রতি যে আকর্ষণ, সেই দিকটি এই গল্পে যেমন ফুটে ওঠে তেমনিভাবে এখানে উঠে এসেছে নানা জাতের পিঠা তৈরির কথা। কিন্তু এই পিঠা তৈরিতে বৈচিত্র্য দেখা যায়। যে প্রকৃত রানি সে ভালো ভালো পিঠা তৈরি করে। অন্যদিকে যে রানিকে দাসী বানিয়ে নিজে রানি সেজে বসে আছে, তার পিঠা সমাজের নিচুশ্রেণির মানুষের তৈরি পিঠা। এর ফলে আমরা দুই শ্রেণির বাঙালি সমাজের পরিচয় পাই। আর এভাবে ঘটনার আসল রহস্য উন্মোচিত হয়। রাজপুরীতে গিয়ে মানুষ রানিকে বলল, "রানিমা, রানিমা, আজ পিট-কুড়নির ব্রত, রাজ্যে পিঠা বিলাতে হয়।"

> রানি আহ্লাদে আটখান হইয়া বলিলেন, "তা কেন, হইল হইল দাসী,' দাসীও আজ পিটা করুক।" তখন রানি আর দাসী দুইজনেই পিটা করিতে গেলেন।... মানুষ বুঝিল যে, কে রাণী আর কে দাসী।[২০]

'সাত ভাই চম্পা' গল্পটিতে অলৌকিক কাহিনি বর্ণিত হলেও এর মাধ্যমে বাঙালি নারীর দুঃখ-কষ্টকে খুব সুন্দরভাবে তুলে ধরা হয়েছে। রাজার সাত রানির মধ্যে সাতটি রানির নানা

চরিত্রের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। কোনও রানি অহংকারী, কোনও রানি ঈর্ষাপরায়ণ এসব নানামাত্রিক বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হয়েছে। আর এভাবে আমাদের বাঙালি নারী সমাজের চিত্রই যেন উঠে এসেছে।

নিঃসন্তান রাজা ছোটো রানির গর্ভে সন্তান এসেছে জেনে তাকে আলাদাভাবে যত্ন নিতে শুরু করলেন। কিন্তু অন্য রানিদের প্ররোচনায় ছোটো রানিকে উপস্থাপন করা হলো ব্যাঙ আর ইঁদুরের জন্মদাত্রী হিসেবে। আর তার গর্ভে জন্ম নেওয়া সন্তানগুলোকে মাটিতে পুঁতে ফেলা হল। অবশেষে গল্পের শেষে এসে সন্তানগুলোকে পুঁতে ফেলার স্থান হতে যে ফুল জন্মে সেটা আনতে গিয়ে আসল রহস্য উন্মোচিত হয়। রাজা অন্য রানিদের তাড়িয়ে দিয়ে ছোটোরানি এবং তার সন্তানদের নিয়ে সুখে বাস করতে শুরু করে।

ছোটোরানির হাতে পায়ে গোবর, পরনে ছেঁড়া কাপড়, তাই নিয়ে তিনি ফুল তুলতে গেলেন। অমনি সুর সুর করে চাঁপারা আকাশ থেকে নেমে আসল। পারুল ফুলটি গিয়ে তাদের সঙ্গো মিশল। ফুলের মধ্যে থেকে সুন্দর সুন্দর চাঁদের মতো সাত রাজপুত্র এক রাজকন্যা "মা মা" বলে ডেকে, ঝুপ ঝুপ করে ঘুঁটে কুড়ানি দাসী ছোটোরানির কোলে-কাঁখে ঝাঁপিয়ে পড়ল। সকলে অবাক! রাজার চোখ দিয়ে ঝর ঝর করে জল গড়িয়ে গেল। বড়োরানিরা ভয়ে কাঁপতে লাগল। রাজা তখনি বড়োরানিদেরকে হেঁটে কাঁটা, উপরে কাঁটা দিয়ে পুঁতে ফেলতে আজ্ঞা দিয়ে সাত রাজপুত্র, পারুল মেয়ে আর ছোটোরানিকে নিয়ে রাজপুরীতে গেলেন।[২১]

সতীন কেবল সতীনের ছেলেকে সহ্য করতে পারে না এমন নয়। বরং সতীনের ছেলের অমঙ্গল কামনায় নানা ধরনের আচারের প্রচলন গল্পগুলোর মাধ্যমে জানতে পারি। ঠিক তেমনিভাবে আমাদের গ্রামীণ জীবনেও এর প্রচলন দেখা যায়। সতীনের ছেলেকে নানাভাবে ক্ষতি করার জন্য কবিরাজের দ্বারস্থ হতে দেখি। এ যেন আমাদের আবহমানকালের বাঙালি নারীর রূপ। তেমনি একটি চিত্র আমরা 'শীত বসন্ত' গল্পে দেখতে পাই। মূলত এখানে হিংসা-ঈর্ষার বশবর্তী হয়ে তন্ত্রমন্ত্রের আশ্রয় নেওয়াকে মুখ্য করে তুলে ধরা হয়েছে।[২২]

তিনরাত যেতে যেতে সুয়োরানির পাপে রাজার সিংহাসন কেঁপে উঠল। অল্প দিন যেতে না যেতে রাজার রাজ্য গেল, রাজপাট গেল। সকল হারিয়ে, খুইয়ে, রাজা আর সুয়োরানির মুখ দেখলেন না; রাজা বনবাসে গেলেন। সুয়োরানির যেখানে যায়, সেখানেই সবাই তাকে তাচ্ছিল্যের সঙ্গো দেখে ও বিতাড়িত করে। ফলে দেখা যায়, তিন ছেলে নিয়ে সুয়োরানি চোখের জলে ভেসে পথে পথে ঘুরতে থাকে।[২৩] গল্পের শেষ দৃশ্যে এসে দেখি সুয়োরানির ঈর্ষায় টিয়া পাখি হয়ে যাওয়ার ফলে শীত বসন্তের মা আসল রূপে ফিরে আসে। তখন স্নেহময়ী মা তার সন্তানদের নাম ধরে ডাকে। সন্তানরা মায়ের কাছে ফিরে যায়। সুয়োরানির তিন সন্তান এবং রাজাও ফিরে আসে। তাদের এই মিলনমেলা গল্পে এভাবে বর্ণিত হয়েছে—স্বর্গের দেবীর চোখ ছলছল, রাজকন্যাকে চুমু খেয়ে চোখের জলে ভেসে স্বর্গের দেবী ডাকলেন, "আমার শীত বসন্ত কৈ রে!" রাজ সিংহাসন ফেলে শীত উঠে দেখে মা সামনে দাঁড়িয়ে; অনুরূপে বসন্ত উঠে দেখে, সামনে মা! সুয়োরানির ছেলেরা দেখে—এই তাঁদের দুয়ো মা। সকলে দ্রুত ছুটে আসে। তখন রাজপুরীর সকলে একদিকে চোখের জল

মোছে, আর একদিকে পুরী জুড়ে বাদ্য বাজে। শীত বসন্ত বলে, "আহা, এ সময় বাবা আসতেন, সুয়ো-মা থাকতেন!"[২৪] এখানে একটা বিষয় লক্ষণীয় যে, সতীনে সতীনে যত দ্বন্দ্বই থাক না কেন সতীনের ছেলেদের মধ্যে কোনো দ্বন্দ্বই নেই। কাহিনির শেষেও আমরা এই দিকটা লক্ষ করি। এগুলো মূলত আমাদের বাঙালি জীবনের অনুষঙ্গ।

'কিরণমালা' গল্পে সতীন না হলেও আপন বোন বোনকে ঈর্ষা করে সতীনের মতো আচরণ শুরু করে। এর মাধ্যমে একটি বিশেষ দিক প্রতিফলিত হয় যে, সমাজে নারী নারীর ভালো সহ্য করতে পারে না। ফলে বোনের প্রতিহিংসায় ক্ষতবিক্ষত হয়ে ছোটোবোন মানবেতর জীবনযাপন করতে বাধ্য হয়। "হিংসুটে দুই বোন মনের সুখে হেসে গলে, পানের পিক ফেলে, নিজের নিজের বাড়ি যায়। রাজ্যের লোকেরা ডাকিনী রানিকে উল্টো গাধায় উঠিয়ে, মাথা মুড়িয়ে, ঘোল ঢেলে রাজ্যের বাইরে বের করে দেয়।"[২৫] বড়ো বোনদের কারণে ছোটোবোনকে ডাকিনী মনে করে তার ওপর নেমে আসে নির্মম নির্যাতন। কুকুর ছানা, বিড়াল ছানা ও কাঠের পুতুল জন্ম দেওয়ার কারণে তাকে এই অত্যাচার সহ্য করতে হয়।

'নীলকমল ও লালকমল' নামক গল্পে রাজার স্ত্রীকে রাক্ষসী হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে। আসলে এই রাক্ষস বলতে গল্পে খারাপ চরিত্রের নারীকে মনে করা হয়েছে। অপরদিকে রাক্ষসের মাংস খাওয়ার প্রসঙ্গেও নানা ব্যাখ্যা দাঁড় করানো যায়। এই মাংস খাওয়ার প্রতীকি অর্থও থাকতে পারে। আবার এই মাংস খাওয়াকে আমাদের ক্যানিবাল সংস্কৃতির অংশ মনে করা যেতে পারে। বরুণকুমার চক্রবর্তী বিষয়টাকে এভাবে তুলে ধরেছেন—আপাত অর্থে রাক্ষস চরিত্রটি অসম্ভব বলে মনে হবে; কিন্তু এটি মোটেই অবাস্তব চরিত্র নয়। নৃতাত্ত্বিকেরা যাকে cannibal বলেন, এটি হলো তাই। 'The ogre is nothing but the dead, who has been variously imagined by different people.' পৃথিবীর বুকে নরমাংস আহারকারী, সভ্যতার দিক থেকে পিছিয়ে থাকা আদিবাসীদের সন্ধান আজ আর মিলবে না। রূপকথার রাক্ষস তার রূপ পরিবর্তনে পটু শুধু তাই নয়, তার প্রাণ থাকে এমন সুরক্ষিত, যা সহজে বিনাশ হবার নয়।[২৬] তবে মো. শহীদুর রহমান বিষয়টাকে এভাবে দেখেছেন—

> গল্পে খোক্কসের শাখা কাহিনিটিও আজগুবি। কিন্তু তার মধ্যেও সভ্য সমাজের উপর রাক্ষস সদৃশ বিজিত আগ্রাসী মানুষের বর্বরতা পরিদৃষ্ট হয়। কিন্তু সভ্যতা সমন্বিত হয়ে এগিয়ে চলছে বলে রাক্ষসের সন্তান নীলৎপল ও মানুষের সন্তান লাল কমলের মধ্যে ভাইয়ের সম্পর্ক সুদৃঢ় হয়েছে। উপরন্তু এখানে বিজাতীয় সভ্যতার অনগ্রসরতা প্রমাণিত হয়েছে এবং বাঙালি সভ্যতা গ্রহণ-বর্জন নীতিতে চিরন্তন গতিশীলতা রক্ষা করেছে।[২৭]

'সোনার কাঠি রূপার কাঠি' গল্পে আমরা দেখি রাজ্যের সকলকে রাক্ষসেরা খেয়ে ফেললেও রাজকন্যাকে তারা আদর-যত্নে রেখেছে। কিন্তু তাকে বিশ্বাস করতে পারে না বলে সোনার কাঠি আর রূপার কাঠির সাহায্যে তাকে একবার জীবিত করে আর একবার মৃত করে। তারপরও তার প্রতি ভালোবাসার কারণে তাকে খায়নি। সেই রাজ্যে রাজপুত্র গিয়ে তাকে জীবিত করলে সে রাজপুত্রকে বলেছে—

> এই পুরী আমার বাপের; রাক্ষসেরা আমার বাপ-মা রাজ-রাজত্ব খেয়েছে, কেবল আমাকে রেখেছে। যদি আমি পালিয়ে যাই সেইজন্য বাইরে যাইবার সময় রাক্ষসেরা সোনার কাটি রূপোর কাটি দিয়ে আমাকে মেরে রেখে যায়।[২৮]

'সুখু আর দুখু' গল্পের কাহিনিতে দেখি তাঁতি এবং তাঁতির বউয়ের জীবনের নানা অনুষঙ্গ। তাঁতীর দুই স্ত্রী এবং দুই স্ত্রীরই একটি করে কন্যা আছে। তাঁতি বড়ো স্ত্রীর কন্যা সুখুকে বেশি আদর করত এবং ছোটো স্ত্রীর কন্যা দুখুকে আদর করত না। পিতার আদর পেয়ে সুখু মনের সুখে সংসারের কোনো কাজ না করেই থাকত। অন্যদিকে দুখু আর দুখুর মা সংসারের এত কাজ করে বিনিময়ে একটু ভাত আর গঞ্জনা পেতে থাকে। অন্যান্য গল্পগুলোর সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যাবে যে, এই গল্পটা একটু ভিন্ন ধরনের। সাধারণত সংসারের ছোটো স্ত্রী এবং তার সন্তানেরা বেশি আদর পেয়ে থাকে। কিন্তু এই গল্পে তার ব্যতিক্রম ঘটেছে। আমাদের সমাজজীবনেও এই ধরনের ব্যতিক্রমী ঘটনা মাঝে মাঝে দেখা যায়। গল্পে সেই দিকের প্রতি ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে স্বামী মারা যাওয়ার পর বড়ো স্ত্রী স্বামীর সব সম্পত্তি হাত করে নিয়ে আরামে আয়েশে ভালোমন্দ খাওয়া শুরু করে। ছোটো স্ত্রীর আগের মতোই পরিশ্রম করে কোনোরকমে দিন চলে যাচ্ছিল। তাঁতি মরে গেলে বড় বউয়ের আচরণকে গল্পে এভাবে তুলে ধরা হয়েছে—"তাঁতি মরে গেলে। বড়ো তাঁতি বউ তাঁতির কড়ি পাতি যা' ছিল সব লুকিয়ে ফেলে, আপন মেয়ে নিয়ে, দুখু আর দুখুর মাকে আলাদা করে দেয়।"[২৯]

বাঙালির সুতো কেটে নিজস্ব পোশাক তৈরি করার ইতিহাস অনেক প্রাচীন। সেই প্রাচীনকাল থেকেই বাঙালি নিজের প্রয়োজনে নিজের প্রয়োজনীয় বস্ত্র তৈরি করেছে। এছাড়া সেই বস্ত্র আমদানি করার রেকর্ডও আছে। সেই রকম একটি দৃশ্য এই গল্পে বুড়ির সুতো কাটার মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে। "বাড়ীতে আর কেউ নেই; ফিটফাট ঘর দোর, ঝক ঝক আঙিনা কেবল দাওয়ার উপরে এক বুড়ী বসে বসে সুতো কাটছে, সেই পলকে পলকে জোড়ায় জোড়ায় শাড়ি হচ্ছে।"[৩০]

'দেড় আঙ্গুলে' গল্পে কাঠুরিয়ার জীবনের গল্প আলোচনা করা হয়েছে। সন্তানের জন্য দেবতার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন আচার পালনের ইতিহাস বাঙালির চিরদিনের। সেই দিকের প্রতিই এই গল্পে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। কাঠুরিয়ার বউয়ের আচারব্রতকে গল্পে এভাবে তুলে ধরা হয়েছে—"কাঠুরিয়া বউ আচারনিয়ম ব্রত উপোস করে, মা-ষষ্ঠীর-তলায় হত্যা দেয়। 'জন্মে জন্মে, কত পাপই অর্জে ছিলাম মা, কাচ্চা হক বাচ্চা হক অভাগীর কোলে একটা কিছু দে মা, ভিটে বাতির নিদর্শন থাক।"[৩১]

সেই লোকবিশ্বাস শেষপর্যন্ত স্বপ্নের মাধ্যমে সত্যতায় পরিণত হয়। গল্পে দেখা যায় মা-ষষ্ঠী সত্যি সত্যিই একরাতে স্বপ্নে দেখা দিলেন। দেখা দিয়ে বললেন—"উঠলো উঠ, তেল সিঁদুরে নাবি ধুবি, শশা পাবি শশা খাবি। কোলে পাবি সোনার পুত বুকজুড়ানো মাণিকটুক।"[৩২] আবার অলৌকিকভাবে কখনো কোনও ব্রাহ্মণ, পুরোহিত অথবা কবিরাজের দেখা পাওয়া যায়। এই গল্পেও দেখা যায় যে, একশো বছরের এক বুড়ি কাঠুরিয়ার বউকে একটি মন্ত্রপড়া শশা খেতে দেয়। এই শশা খেলে তার গর্ভে সন্তান আসবে। শশা দিয়ে বুড়ি বলে—"এই নে বাছা, এইটে নিয়ে বউকে দিস, কিছু যেন ফেলেনা, সাতদিন পরে যেন খায়, চাঁদপানা টলটল হাতী হেন ছেলেটা কোলজোড়া-ঘর আলো করবে।"[৩৩] এই ধরনের বিশ্বাস আমাদের বাঙালি জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে মিশে আছে।

'মধুমালা' গল্পে আমরা একটি রাজকীয় পরিবেশের পরিচয় পাই। রাজা সন্তানহীন আঁটকুড়ে। আমাদের সমাজে আঁটকুড়ে মানুষের যত সম্পদই থাক না কেন কেউ তাকে পছন্দ

করে না। এমনকি কেউ সকালে ঘুম থেকে উঠে তার দর্শন প্রত্যাশা করে না। কারণ তার মুখ দেখলে তার সারাদিনটাই অমঙ্গালে কাটবে। এ নিয়ে রাজার চিন্তার শেষ নেই। বরুণকুমার চক্রবর্তী বিষয়টাকে এভাবে তুলে ধরেছেন—

> রূপকথার শুরুতেই দেখি রাজা বিষণ্ণ কেননা তিনি সন্তানহীন। রাজবাড়ির নিম্নপদের কর্মীরাও রাজার মুখ সকালে দেখে না, কেননা আঁটকুড়ো রাজার মুখ দেখলে সারাটা দিন খারাপ যাবে। মর্যাদাহত রাজা সিদ্ধান্ত নেন, তিনি বনবাসী হবেন, রাজত্বে আর তাঁর কাজ নেই। কিন্তু সত্য সত্যই আর তাঁর রাজত্ব ত্যাগ করা হয়ে ওঠে না; কেননা ইতিমধ্যে কোনো সন্ন্যাসীর আবির্ভাব ঘটে যায়, যিনি রাজাকে আশ্বস্ত করেন তাঁর সন্তানলাভের ব্যাপারে। সন্ন্যাসী রাজার হাতে তুলে দেন একটি শিকড় বা একটি ফল কিংবা একটি পাখি। সন্ন্যাসীর পরামর্শ মতো রানিদের সেই শিকড় বা ফল কিংবা পাখির মাংস খাওয়ানো হয়, তাঁরা সন্তানসম্ভবা হন। রাজার মনস্কামনা চরিতার্থতা লাভ করে।[৩৪]

কাহিনিতে দেখি একসময় মধুমালার সঙ্গো মদনকুমারের পরিচয় হয়। পরিচয়ের সূত্রে প্রণয় এবং সেই প্রণয় শেষ পর্যন্ত পরিণয়ে গড়ায়। তাদের পরিণয়কে গল্পে এভাবে তুলে ধরা হয়েছে—দু'জনে হেসে উঠলেন।

তখন মধুমালা বললেন, "দেখ কুমার, সমুদ্রের গাড়ি সোনারপুরী, সাত-ছত্রিশ-তের কুঠরীপার বিধাতা তোমাকে মিলিয়েছেন, তখন রাজপুত্র! তুমি ভিন্ন আর আমার স্বামী নাই। এই হাতের অঙ্গুরী তুমি পর, তোমার অঙ্গুরী আমাকে দাও।" কন্যা-কুমার উঠে দাঁড়ালেন; দু'জনার অঙ্গুরী দু'জনে নিলেন ঘুমের চোখে শুক শারী 'উল' বলে উঠল! মদন বললেন—"রাজকন্যা, অঙ্গুরী যদি নিলে, তোমার গায়ের চাদর আমাকে দাও, আমার চাদর তুমি নাও।"[৩৫] মালা বিনিময়ের মাধ্যমে গান্ধর্ব মতে বিয়ের দৃশ্য আমরা এই গল্পে দেখি। মধুমালা স্বামীকে বরণডালা দিয়ে আনন্দিত চিত্তে বরণ করে নিলো। গল্পে এভাবে তুলে ধরা হয়েছে—অমৃত-নয়নী রাজকন্যা চন্দ্রকলা, আশে পাশে ধাই দাসী, বরণ ডালা ফুলের মালা নিয়েছিলেন। "মধুমালা, মধুমালা' শুনে দিক উজ্জ্বল করে এসে মদনকুমারের গলায় মালা পরিয়ে দিলেন। বললেন, "বাবা! আজ হইতে তোমার দায় গেল, আমি যাঁর আমি তাঁর হলম; ধন যৌতুক তোমার জামাইকে কি দিবে, সাজিয়ে দাও।[৩৬]

'পুষ্পমালা' গল্পের কাহিনিতে রাজা, রাজকন্যা ও কোটালের কথা বর্ণিত হয়েছে। নিঃসন্তান রাজা ও আঁটকুড়ে কোটালের কাহিনিকে উপজীব্য করেই মূলত এর কাহিনি আবর্তিত হয়েছে। দুইজনের স্ত্রীই একদিন তিন সত্য করে যে যদি আমার ঘরে ছেলে আর তোর ঘরে মেয়ে হয় তবে দুজনের সঙ্গো বিয়ে দেব। কিন্তু একথা শুনে কোটালের স্ত্রী ভয় পেয়ে গেল। রানির শক্ত করে ধরাতে সেও তিন সত্য করলো। লেখক বিষয়টাকে এভাবে তুলে ধরেছেন—

> তখন রানি কোটালিনী, দুইজনে স্নান করিয়া, তিন সত্য শপথ করিয়া, দুই ঘাটের দুই পদ্মফুল ছিঁড়িয়া ভাসাইয়া দিলেন। ঢেউয়ে দুই পদ্ম গিয়া একত্র হইল। দুইজনে উলু দিয়া উঠিলেন। যে যা'র ঘরে গেলেন। এ কথা আর কেহই জানিল না।[৩৭]

বাঙালি নারীর তেজদীপ্ততার পরিচয় পুষ্পমালা চরিত্রের মধ্যে লক্ষ করা যায়। পুষ্পমালা সহজ, সরল অবলা বাঙালি নারীকে পাশ কাটিয়ে নিজের স্বতন্ত্র জগত তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে। সে ডাকাতদের সঙ্গো কৌশলে যুদ্ধ করেছে। ডাকাতদের সঙ্গো যুদ্ধের বর্ণনায় গল্পে

বলা হয়েছে—"অনিচ্ছায় কন্যা নামলেন। অমনি পিছন থেকে লাফ দিয়ে তরোয়াল নিয়ে এক কোপে কুমারের মাথা কেটে ফেলে ঘোড়ার উপর ঘেসেড়া বসল।"[৩৮]

প্রকৃতির সঙ্গো নারীর রয়েছে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। প্রকৃতিই যেন নারীকে এত সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছে। প্রকৃতির সঙ্গো নারীর সম্পর্ক বোঝাতে গিয়ে গল্পে বলা হয়েছে—পুষ্প কাঁদেন, নদীর জল কাঁদে, বনের পশুপাখি বনতরু; কাঁদে পাথর পাষাণ ফাটে! কান্নায় বনপুরী ছেয়ে দিন গেল, ভীষণ-আঁধার রাত এল। সেই আঁধার রাতে, শিব-পার্বতী কৈলাশে যান। আকাশের তারা, পাতালের বালু গণিতে গণিতে দুই দেবতা চলিয়াছেন। পার্বতী বলেন, "দেবতা কার যেন রোদন শুনি!" যার দুঃখ তার, ওসবে আমাদের কাজ কি-চল।" পার্বতী বলেন—"না না দেবতা। কোন অভাগী পতিহারা, কোন জননী পুত্রছাড়া, তা না দেখলে প্রাণ মানে না।"[৩৯]

এভাবে নানা গল্পে আমরা একে অপরের ক্ষতি করার নানা দৃষ্টান্ত দেখি। এর পেছনে অবশ্য অনেকগুলো কারণ কাজ করে। আর প্রতিশোধ নিতে গিয়ে তারা নানামাত্রিক ব্যবস্থার সাহায্য গ্রহণ করে থাকে। শহীদুর রহমান বিষয়টাকে এভাবে দেখেন—

> পৃথিবীতে কোনো কোনো মানুষ আপন ঈর্ষায় অপরের ক্ষতি সাধন করে থাকে। তারা অনেক সময় প্রত্যক্ষ প্রতিশোধ না নিয়ে পরোক্ষভাবে যাদুমন্ত্রের সাহায্যে অপরের অনিষ্ট করে। বাঙালি সমাজেও এমন প্রবণতা লক্ষণীয়। তবে অনুভূত হয় যে, বাঙালি সমাজে এসব এসেছে বহু গোষ্ঠী-সম্প্রদায়ের রক্তমিশ্রণের ফলে। বাংলাদেশের বিভিন্ন গোষ্ঠী-সম্প্রদায় একত্রে মিলিত হবার ফলে তাদের পরিচর্যিত সংস্কার-সংস্কৃতির অনেককিছুই ঐতিহ্যগতভাবে সমন্বিত ও প্রচলিত হয়েছে এ সমাজে।[৪০]

সতী নারীর গুণগান সেই সৃষ্টির শুরু থেকেই করে আসা হচ্ছে। নারী যদি সতী থাকে তাহলে তার উপরে কোনো তন্ত্রমন্ত্রই প্রভাব ফেলতে পারে না। গল্পে সেরকমই ইঙ্গিত দিয়ে বলা হয়েছে—"সতীর তেজ, পুষ্পের কিছু হইল না; পলকে চন্দন মস্ত-দাড়ী ছাগল হইয়া মালিনীর পিছু নিলেন!"[৪১]

'মালঞ্চমালা' গল্পে দেখি জ্যোতিষ গণনার উপর নির্ভরশীলতার চিত্র। এটিও বাঙালি নারী-পুরুষ সকলের মজ্জাগত বিশ্বাস। এ থেকে নারী পুরুষ কেউই বেরিয়ে আসতে পারেনি। এবং এই কাজ করতে গিয়ে অনেক সময় এমন অবিশ্বাস্য কিছু করা হয় যা বর্তমান সময়ে হাসির উদ্রেক করে। কিন্তু সমকালীন সময়ের প্রেক্ষাপটে বিষয়গুলো একেবারেই প্রাসঙ্গিক। সেরকম একটি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে এই গল্পে; যেখানে বারো বছরের মেয়ের সঙ্গো সাতদিনের ছেলের বিয়ের কথা বলা হয়—

> ব্রাহ্মণ রাজপুত্রের মুখ দেখলেন, হাত দেখলেন, কপালের রেখা দেখলেন। দেখে বললেন, "মহারাজ! এ আয়ু তবেই খণ্ডিবে-বারো বৎসরের কন্যার সঙ্গো যদি এই সাতদিনের ছেলের বিবাহ দিতে পারেন। মহারাজ আমি চললাম।[৪২]

লক্ষণীয় বিষয় যে এসব গল্পে কেবল পুত্রের বয়স কম থাকে। আর কন্যার বয়স বারো বছর দেখানো হয়। এর পেছনে অন্যতম কারণ একজন বারো বছর বয়সের কন্যা সাত দিনের পুত্রকে মাতৃস্নেহে বড় করে তুলতে পারবেন। কিন্তু যদি এর উল্টো হয় তবে কন্যার মৃত্যু অবধারিত।

বাংলা লোককথা বাঙালি নিত্যদিনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার নির্যাস। আর এই অভিজ্ঞতা যাকে কেন্দ্র করে বারবার আবর্তিত হয়েছে তিনি হলেন নারী। কারণ নারীই প্রথম এগুলো সৃষ্ট করেছেন এবং বংশ পরম্পরায় কোনোপ্রকার পৃষ্ঠপোষকতা বা লাভের আশা ছাড়াই এর অস্তিত্ব রক্ষা করে চলেছেন। এগুলো যেহেতু আমাদের সমাজ জীবনের নানা অনুষঙ্গকে উপজীব্য করে রচিত, তাই নারীও এগুলোকে দেখে এসেছে নিজেদের চোখের পরিবর্তে পুরুষের দেখিয়ে দেওয়া চোখ দিয়ে। তাই এসব লোককথায় আমরা সেসব নারীকেই বেশির ভাগ দেখি যারা আমাদের চিরায়ত বাঙালি সংস্কৃতির ধারক ও বাহক। তাই লোককথায় নারী প্রসঙ্গটি খুবই প্রাসঙ্গিক রূপ লাভ করেছে।

উৎসের সন্ধানে

১. দিব্যজ্যোতি মজুমদার : 'বাংলা লোককথার বিভিন্ন ভাগ এবং টাইপ ও মোটিফ ইনডেক্স', বাংলা লোককথার টাইপ ও মোটিফ ইনডেক্স, গাংচিল, কলকাতা, ২০১২, পৃ. ৮১
২. প্রাগুক্ত : পৃ. ৮১
৩. বরুণকুমার চক্রবর্তী : 'রূপকথার প্রসঙ্গ', লোককথার সাতকাহন, বরুণকুমার চক্রবর্তী সম্পাদিত, অর্পণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স, কলকাতা, ২০১১, পৃ. ১১
৪. প্রাগুক্ত : পৃ. ১৩
৫. প্রাগুক্ত : পৃ. ১২
৬. জসীমউদ্দীন : 'গোপ্যার বউ', বাঙালীর হাসির গল্প, পলাশ প্রকাশনী, ঢাকা, পৃ. ৩
৭. জসীমউদ্দীন : 'আয়না', বাঙালীর হাসির গল্প, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭
৮. প্রাগুক্ত : পৃ. ৭
৯. প্রাগুক্ত : পৃ. ৮
১০. সুব্রত চক্রবর্তী : 'লৌকিক হাসির গল্প', লোককথার সাতকাহন, বরুণকুমার চক্রবর্তী সম্পাদিত, পূর্বোক্ত : পৃ. ৬১
১১. প্রাগুক্ত : পৃ. ৬৬
১২. প্রাগুক্ত : পৃ. ৬২
১৩. প্রাগুক্ত : পৃ. ৬৯
১৪. দক্ষিণারঞ্জন মিত্র-মজুমদার : 'কলাবতী রাজকন্যা', ঠাকুরমার ঝুলি, ষষ্ঠচত্বারিংশৎ সংস্করণ, মিত্র ও ঘোষ পাবলিকেশন্স, কলকাতা, পৃ. ৩২
১৫. প্রাগুক্ত : পৃ. ৩২
১৬. প্রাগুক্ত : পৃ. ৩০
১৭. মো. শহীদুর রহমান : 'বাংলা লোককথায় পেশা সমাজ ও সংস্কৃতির স্বরূপ', সমাচার, ঢাকা, ২০১৪, পৃ. ২৩
১৮. প্রাগুক্ত : পৃ. ৪৮
১৯. দক্ষিণারঞ্জন মিত্র-মজুমদার : 'ঘুমন্তপুরী', ঠাকুরমার ঝুলি, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬০
২০. তদেব : 'কাঞ্চনমালা', ঠাকুরমার ঝুলি, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৫
২১. তদেব : 'সাতভাইচম্পা', ঠাকুরমার ঝুলি, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৩
২২. তদেব : 'শীত বসন্ত', ঠাকুরমার ঝুলি, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৫

২৩. প্রাগুক্ত : পৃ. ৮২
২৪. প্রাগুক্ত : পৃ. ৯৪
২৫. দক্ষিণারঞ্জন মিত্র-মজুমদার : 'কিরণমালা', ঠাকুরমার ঝুলি, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৬
২৬. বরুণকুমার চক্রবর্তী : 'লোককথার সাতকাহন', অর্পণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স, কলকাতা, ২০১১, পৃ. ১৪
২৭. মো. শহীদুর রহমান : 'বাংলা লোককথায় পেশা সমাজ ও সংস্কৃতির স্বরূপ', সমাচার, ঢাকা, ২০১৪, পৃ. ৩৮
২৮. দক্ষিণারঞ্জন মিত্র-মজুমদার : 'সোনার কাঠি রূপার কাঠি', ঠাকুরমার ঝুলি, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮৮
২৯. দক্ষিণারঞ্জন মিত্র-মজুমদার : 'সুখু আর দুখু', ঠাকুরমার ঝুলি, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮৮
৩০. প্রাগুক্ত : পৃ. ১৮৮-৮৯
৩১. দক্ষিণারঞ্জন মিত্র-মজুমদার : 'দেড় আঙ্গুলে', ঠাকুরমার ঝুলি, পূর্বোক্ত, পৃ. ২০৮
৩২. প্রাগুক্ত : পৃ. ২০৮-০৯
৩৩. প্রাগুক্ত : পৃ. ২০৯
৩৪. বরুণকুমার চক্রবর্তী : 'লোককথার সাতকাহন', অর্পণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স, কলকাতা, ২০১১, পৃ. ১৩
৩৫. দক্ষিণারঞ্জন মিত্র-মজুমদার : 'মধুমালা', ঠাকুরদাদার ঝুলি, সপ্তদশ সংস্করণ, মিত্র ও ঘোষ পাবলিকেশন্স, ১৩৩৮, কলকাতা, পৃ. ৬৯
৩৬. প্রাগুক্ত : পৃ. ৮৪
৩৭. প্রাগুক্ত : পৃ. ১০৪
৩৮. দক্ষিণারঞ্জন মিত্র-মজুমদার : 'পুষ্পমালা', ঠাকুরদাদার ঝুলি, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩০
৩৯. প্রাগুক্ত : পৃ. ১৩৩
৪০. মো. শহীদুর রহমান : 'বাংলা লোককথায় পেশা সমাজ ও সংস্কৃতির স্বরূপ', সমাচার, ঢাকা, ২০১৪, পৃ. ৬৯
৪১. দক্ষিণারঞ্জন মিত্র-মজুমদার : 'পুষ্পমালা', ঠাকুরদাদার ঝুলি, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৭
৪২. দক্ষিণারঞ্জন মিত্র-মজুমদার : 'মালঞ্চমালা', ঠাকুরদাদার ঝুলি, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৩

মুর্শিদাবাদের সংগৃহীত লোককথা : বিষয়ভাবনার বৈচিত্র্য ও মূল্যায়ন

জুনেজার ইসলাম

পল্লির নিরক্ষর জনগোষ্ঠীর শ্রুতি পরম্পরায় মুখনিঃসৃত সাহিত্য সৃষ্টি হলো 'লোকসাহিত্য', যা কোনও এক ব্যক্তির সৃষ্টি নয়; আমজনতার স্মৃতিবাহিত পরম্পরাগত ঐতিহ্যের ফসল। এই মৌখিক ধারাটির সমৃদ্ধ রত্নভাণ্ডার হলো 'লোককথা'। ড. দিব্যজ্যোতি মজুমদার তাঁর 'লোককথার ঐতিহ্য' গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন—"পৃথিবীর প্রাচীন কাব্যগুলির প্রত্যেকটিরই আদি উৎস হলো লোককাহিনি।"[১] বহুচর্চিত প্রাচীন এই 'লোককথা'র প্রতিশব্দ নিয়ে পণ্ডিতমহলে সামান্য মতপার্থক্য রয়েছে। যেমন—ড. ময়হারুল ইসলামের মতে—'লোকগল্প' বা 'লোককাহিনি', মহম্মদ আব্দুল হাফিজের মতে—'লোককাহিনি', ড. আশুতোষ, ভট্টাচার্যের মতে—'লোককথা' বা সংক্ষেপে 'কথা', ড. আশরাফ সিদ্দিকীর মতে—'লোককথা' বা 'লোককাহিনি', ড. এনামুল হকের মতে—'লোককথা' প্রভৃতি। এখানেও লোকসংস্কৃতির মতো 'FOLK'-এর বাংলা অর্থ 'লোক'কে অপরিবর্তিত রেখে TALE-এর অর্থের সামান্য পরিবর্তন হয়েছে। তবে পরিবর্তন যাইহোক না কেন, 'FOLK TALE'-এর বাংলা প্রতিশব্দ হিসেবে 'লোককথা' যে সর্বাধিক প্রচারিত ও প্রচলিত, একথা অস্বীকার করার কোনো কারণ দেখি না। আব্দুল খালেক তাঁর 'ফোকটেল : বঙ্গীয় প্রতিশব্দ : উদ্ভব ইতিহাস' প্রবন্ধে মন্তব্য করেছেন—

> বরং লিখিত কথাসাহিত্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই আমরা বাংলা কথাসাহিত্যের মৌখিক ধারার নাম দিতে পারি 'লোককথা'। বস্তুত বাংলা লোককথা ইংরেজি ফোক্‌টেলের সার্থক প্রতিশব্দ বলে ধরে নেওয়া যায়।[২]

এখন প্রশ্ন হলো, 'লোককথা' বলতে আমরা কী বুঝি? এখানে 'লোক' শব্দটি সম্পর্কে সঠিক ধারণা থাকলেই আমরা লোককথা'র মোটামুটি একটা সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে পারব। 'লোক' বলতে আমরা মূলত পল্লির সংখ্যাগরিষ্ঠ নিরক্ষর মানুষদের বুঝি, যারা একইরকম ভৌগোলিক পরিবেশে বসবাস করে। এই গ্রামীণ খেটে খাওয়া মানুষদের আজন্ম লালিত যে মুখনিঃসৃত গল্প, তাকেই 'লোককথা' বলে চিহ্নিত করতে পারি। ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য 'লোককথা'র এমনই সংজ্ঞার কথা বলেছেন। ড. বরুণকুমার চক্রবর্তী সম্পাদিত 'বঙ্গীয় 'লোকসংস্কৃতিকোষ' গ্রন্থে প্রখ্যাত লোকসংস্কৃতিবিদ ড. ওয়াকিল আহমেদ লোককথার সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে গিয়ে বলেছেন—"পুরুষ পরম্পরায় মুখে মুখে প্রচলিত ও গদ্যে বর্ণিত জনশ্রুতিমূলক গল্পকে লোককথা বা লোককাহিনি (FOLK TALE) বলা হয়।"[২৩]

ইউরোপীয়দের উৎসাহে এদেশের 'লোককথা' সংগ্রহ অবশ্য শুরু হয়েছিল উনিশ শতকেই।

বাংলা 'লোককথা' সংগ্রহে প্রথম উদ্যোগ নিয়েছিলেন উইলিয়াম কেরি (১৭৬১-১৮৩৪ খ্রি.) তাঁর অন্যতম 'লোককথা' সংকলন গ্রন্থ হলো 'ইতিহাস মালা' (১৮১২ খ্রি.)। একই বছর জার্মান থেকে দুই ভাই জেকব ল্যুডউইগ কার্ল গ্রীম (১৭৮৫-১৮৬৩ খ্রি.) ও উইলহেল্ম কার্ল গ্রীম (১৭৮৬-১৮৫৯ খ্রি.) জার্মান ভাষায় লোককথার অমর গ্রন্থ 'Kinderund Haus Marchen' (ইংরেজিতে 'Grimm's Fairy Tale') প্রকাশ করেন। তবে একথা সত্য যে, রেভারেন্ড লালবিহারী দে'র Folktales of Bengal' (১৮৮৩ খ্রি.) প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গো সঙ্গো বাংলা 'লোককথা'র ঐশ্বর্য বাঙালির গোচরে আসে। এরপর আস্তে আস্তে বাংলা সংগৃহীত বাংলা 'লোককথাগুলি' গুণিজনদের দ্বারা প্রকাশিত হতে থাকে। উল্লেখযোগ্য লোককাহিনি বিষয়ক গ্রন্থগুলি হলো—দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের (১৮৭৭-১৯৫৭ খ্রি.) 'ঠাকুরমার ঝুলি' (১৯০৭), 'ঠাকুরদার ঝুলি' (১৯১০), 'দাদামশাইয়ের থলে', ঠানদিদির থলে' (১৯১১) প্রভৃতি। এছাড়াও গুরুত্বপূর্ণ আরও দুখানি গ্রন্থ হলো—উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর 'টুনটুনির বই' (১৯১০) এবং আশুতোষ ভট্টাচার্যের 'বাংলার লোকসাহিত্য' গ্রন্থের প্রথম খন্ডের (১৯৫৪) চতুর্থ অধ্যায় 'কথা'। সাম্প্রতিককালে 'লোককথা'র সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের কাজ ব্যাপকভাবে বেড়ে চলেছে। যেমন—মহাশ্বেতা দেবীর 'ভারতের লোককথা' (১৯৯৮), প্রবীর সরকারের 'রাঙা মাটির লোককথা পুরুলিয়া' (২০১২), মন্টু বিশ্বাসের 'সুন্দরবনের লোককথা' (২০১২), সৌগত চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'লোককথার বর্ণমালা' (২০১৪) প্রভৃতি।

মুর্শিদাবাদের সংগৃহীত 'লোককথা'র মূল্যায়নই বর্তমান আলোচনার মূল অভিপ্রায়। মুর্শিদাবাদ অতিপ্রাচীন জনপদ এবং স্বনামেই পশ্চিমবঙ্গের একটি জেলা হিসেবে পরিচিত। এই জেলাকে প্রায় সমানভাগে বিভক্ত করেছে ভাগীরথী নদী। জেলার পূর্বে বাগড়ী, পশ্চিমে রাঢ়। রাঢ়ে হিন্দু আদিবাসীর সংখ্যা বেশি এবং বাগড়ীতে মুসলিমদের প্রাধান্য। মোট জনসংখ্যার ৮৭১/২ শতাংশ মানুষ গ্রামে বাস করেন। ছোটো বড়ো নদীবিধৌত এই জেলা আজও কৃষিনির্ভর। আর এই কৃষিনির্ভর মুর্শিদাবাদের পল্লিসমাজই হলো 'লোককথা'র আঁতুড় ঘর।

❑ **লোককথায় শ্রেণিবৈষম্য :** বাংলা 'লোককথা'য় বহুবিচিত্র জীবনবোধের রূপ লক্ষ করা যায়। তার মধ্যে অন্যতম রূপ হলো শ্রেণিবৈষম্য। দুর্বলের প্রতি সবলের শোষণ-অত্যাচার-অবিচারের মর্মস্পর্শী আলেখ্য বাংলা তথা সারা বিশ্বব্যাপী অসংখ্য 'লোককথা'য় মূর্ত হয়ে উঠেছে। গল্পকথক আশ্চর্য দক্ষতার সঙ্গো লোকগল্পগুলিকে এমনভাবে উপস্থাপন করেন, যা সত্যিই বেদনাদায়ক শ্রেণিবৈষম্যের এক আশ্চর্য দলিল। মুর্শিদাবাদের 'লোককথা'-তে এই ধরনের শ্রেণিবৈষম্যের চিত্র লক্ষণীয়। মুর্শিদাবাদ জেলা থেকে সংগৃহীত একটি 'লোককথা' আমাদের এই বক্তব্যকে সমর্থন করবে। কাহিনিটি গল্পকথকের উপস্থাপনায় নিঃসন্দেহে আকর্ষণীয়—এক বিলে বাস করত একটি ছোট্ট মাছ। সেই বিলের আশেপাশেই বাস করত এক মস্ত বড়ো মাছরাঙা। তার এই মাছটিকে গিলে খাওয়ার খুব ইচ্ছা হলো। তাই সবসময় সে সুযোগ খুঁজতো। একদিন মাছটি জলের উপর চড়তে এসেছিল। সুযোগ বুঝে মাছরাঙা তাকে ছোঁ মেরে নিয়ে চলে গেল। যেতে যেতে মাছরাঙার মুখ থেকে মাছটি ফসকে গিয়ে ঝপাৎ করে এক নদীর ধারে পড়ল। এই নদীর ধারে মোষের পায়ের দাগের গর্তে কিছুটা জল জমে ছিল। সেখানেই মাছটি পড়ল লুকিয়ে। মাছরাঙা তাকে খুঁজে না পেয়ে সেখান থেকে চলে গেল।

এক বামুন ঠাকুর নদীতে স্নান করতে এসে এই মাছটিকে দেখতে পেল। সে মাছটিকে বাড়িতে নিয়ে এসে তার বউকে কেটে রান্না করতে বলল। বামুন ঠাকুরের বউ স্বামীর আদেশে মাছটিকে ছাই মাখিয়ে পাখনাগুলো কাটতে যাবে এমনসময় একটি চিল মাছটিকে ছোঁ মেরে নিয়ে চলে গেল। কিন্তু চিলও তার মুখে বেশিক্ষণ রাখতে পারল না। মাছটি মুখ থেকে ফসকে একটি পুকুরের ধারে গিয়ে পড়ল। এই পুকুরের পাশেই বাস করত এক কাক ও এক কোলাব্যাঙ। মাছটিকে তারা দুজনেই লক্ষ করছিল। কাক তাকে জিজ্ঞাসা করল—"ও মাছ ভাই, এখানে তুমি এলে কীভাবে?" এই কথার উত্তরে ভয়ে ভয়ে কাক ও ব্যাঙের প্রশংসা করে মাছটি বলল—"কাক করলা পাখি।/মুখখানা দেখি চন্দ্রমুখী।।/রাজার তুল্য কোলাব্যাঙ।/ঠাকুরুনের হাতে ফসকালো ঠ্যাং।।/ছায়ে কান-নাককাটা।/ত্রিভুবন দেখালো চিল বেটা।।"

একথা বলে মাছটি পুকুরের জলে গিয়ে পড়ল, যেখানে ছিল এক বিরাট সর্দার। তিনি এখানে আসার কারণ জানতে চাইলে মাছটি সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করে। বর্ণনা শুনে সর্দারের মায়া হলো বটে, কিন্তু তার জায়গা হলো জলের একেবারে তলায়। সেখানেই সুখে-দুখে দিন কাটতে লাগল। (গল্পকথক—আব্দুল আহাদ, সংগ্রহ স্থান : পাঁচগ্রাম, মুর্শিদাবাদ)

ঐতিহাসিক বস্তুবাদী পদ্ধতিতে বিচার করলে দেখা যায় লোককথাটির মধ্যে শোষণের চিত্র রয়েছে। মাছ এখানে দুর্বল নিম্নবিত্ত সমাজের প্রতিভূ। মাছরাঙা, বামুন ঠাকুর, কাক, চিল, কোলাব্যাঙ ও মাছের সর্দার সবল-শক্তিশালী উচ্চবিত্ত সমাজের প্রতিভূ। শোষকশ্রেণির হাত থেকে শোষিত শেণির বাঁচার লড়াই যুগ যুগ ধরেই চলে আসছে। মাছের মধ্যে সেই লড়াইয়ের ছবিই দেখা যায়। এ যেন সামন্ত প্রভুদের জাঁতাকলে প্রজাদের ধরা পড়ার গোপন ইতিহাস। এখানেই স্মরণে আসে মার্কসের শ্রেণিসংগ্রামের কথা। অত্যাচারী শাসকের হাত থেকে বাঁচার জন্যে অত্যাচারিতরা কীভাবে তোষামোদ করতে বাধ্য হতো তার ইঙ্গিত এই গল্পে আছে। তাই কুৎসিত কাক ও কোলাব্যাঙ এখানে মাছের বর্ণনায় হয়ে উঠেছে চন্দ্রমুখী ও রাজা। শেষ অবধি সর্দারের নির্দেশে জলের তলায় মাছের থেকে যাওয়া ব্যক্তি স্বাধীনতা হরণের বিষয়টিকেই চিত্রিত করে।

সমাজের এসব শোষণের কাহিনি গল্পকথকেরা কখনও রূপকের আশ্রয়ে, কখনও সরাসরি শ্রোতাদের কাছে উপস্থাপনে অভ্যস্ত ছিলেন। 'বাংলা লোককথার টাইপ ও মোটিফ ইনডেক্স' গ্রন্থে ড. দিব্যজ্যোতি মজুমদারের মন্তব্য নিঃসন্দেহে তাৎপর্যপূর্ণ—

> লোকসমাজে আবছা আলো-আধারে বসে গ্রামীণ গোষ্ঠীভুক্ত মানুষ মৌখিক সাহিত্যের মধ্যে দিয়ে কিংবা উৎসবে গানের কলির সুরে তাদের মনের ভাব সহজে প্রকাশ করেছে। এগুলি শুধুই আনন্দে প্রকাশ নয়।... যুগ যুগ ধরে অত্যাচারের জোয়াল বইতে তারা বাধ্য হলেও এই শোষণের হৃদয়ফাটা যন্ত্রণাকে প্রকাশ করেছে লোকসাহিত্যে, বিশেষ করে লোককথা ও লোকসংগীতে।[৪]

ইতালির মার্কসবাদী দার্শনিক আন্তেনিও গ্রামশি 'কারাগারের নোটবই' (Prisoner's Notebook) গ্রন্থে শ্রমিকশ্রেণি (Proletariet) ও মালিকশ্রেণি বা বুর্জোয়া শ্রেণির (Antenio Gramei) (১৮৯১-১৯৩৭) যে পার্থক্য করেছেন, শোষণের যে ছবি দেখিয়েছেন—তা শুধুমাত্র মুর্শিদাবাদের লোককথায় নয়, সমগ্র বিশ্বের অসংখ্য লোকগল্পের উপজীব্য বিষয়।

❑ **লোককথায় হাস্যরস :** মুর্শিদাবাদের লোককথায় শ্রেণিবৈষম্যের বেদনাদায়ক কাহিনিই শুধু নয়, আছে রঙ্গরসপূর্ণ লোককথার জাদুস্পর্শ। মুর্শিদাবাদের শেষপ্রান্তে অর্থাৎ তখনকার পূর্বপাকিস্তানের বেড়া ঘেঁষে ছিল চাষের জমি। চাষার ছেলে একদিন সেখানে চাষ করছিল। ঠিক তার পাশ দিয়ে জমিদার দলবল নিয়ে যাবার সময় তার কাছে এক গাঁয়ের নাম জানতে চান। চাষার ছেলে কানে ভালো না শোনায় উত্তর দিল—"আমার দুটো গোরু। একটা আমি নিজে কিনেছি আর একটা আমার শ্বশুর আমাকে দিয়েছে।" জমিদার সঠিক উত্তর না পেয়ে রেগে গিয়ে তাকে দু-ঘা দিলেন। চাষার ছেলে মার খেয়ে বাড়ি ফিরে তার বউকে খুব মারল এবং বলল—"তোর বাপ আমাকে ওই গোরুটা চুরি করে এনে দিয়েছিল।" মার খেয়ে বউ শাশুড়ির কাছে গিয়ে বলল—"শুনছেন মা! আমি তো আপনার ছেলেকে বাসি ভাতে নুন দিয়েছি। কিন্তু আমাকে মারল কেন?" শাশুড়ি বউমার কথা শুনতে না পেয়ে ভাবল বউ তার কাজে খুঁত ধরছে। সে রেগে গিয়ে স্বামীর কাছে গিয়ে বলল—"আমি তাঁতে সুতো সরু করি আর মোটা করি তাতে তোমার বউমার কী?" চাষাও গিন্নির কথা বুঝতে না পেরে ভাবল সে তার চাষের কাজে খুঁৎ ধরল। সে তার মেয়েকে গিয়ে বলল—"বুঝলি খুকি সারাজীবন চাষের কাজ করলাম, কেউ খুঁৎ ধরতে পারেনি, আর তোর মা বলে কিনা আমি চাষ করতে জানি না।" মেয়ে উঠোন ঝাঁট দিচ্ছিল, সে বাবার কথা শুনতে না পেয়ে রেগে গিয়ে মাকে বলল—"আমি তো প্রতিদিন উঠোন ঝাঁট দিই। তবে আজ কেন বাবা আমার উঠোন ঝাঁট দেওয়ার খুঁৎ ধরছে।"

এই পরিবারের সকলেই কালা। আর এর আসল কারণ আষাঢ় মাসের ভরদুপুরে প্রবল বজ্রপাত। ছড়ায় তাই বলে—"লাগলে কানে তালা।/লোকে বলে 'কালা'।" (গল্পকথক আব্দুর রজ্জাক, সংগ্রহ স্থান : ঘোষপাড়া, মুর্শিদাবাদ) পল্লির সহজ-সরল-নিরক্ষর জনসমাজ এই ধরনের গল্প শুনে হাসির খোরাক জোগায়। কিন্তু খুব বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিতে শুনলে দেখা যায় এই পরিবারের যন্ত্রণা কত মারাত্মক। অসংগতি হাস্যরসের অন্যতম শর্ত হলেও এমন অনেক ব্যতিক্রমী অসংগতি আছে যা যন্ত্রণাদায়ক। এই গল্পে হাস্যরসের অন্তর্মূলে এমনই চরম ট্রাজেডির ছবি ধরা পড়েছে।

❑ **লোককথা ও মন সমীক্ষণ :** অস্ট্রিয়ার মনোবিজ্ঞানী সিগমুন্ড ফ্রয়েড লোককথায় মনোসমীক্ষাগত পদ্ধতির প্রথম প্রয়োগ করেন। তিনি প্রথম পুরাকাহিনি 'ঈডিপাস'কে মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা করেন। ১৯০০ সালে প্রকাশিত 'দ্য ইন্টারপ্রিটেশন অব ড্রিমস্' গ্রন্থে এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। এই পদ্ধতিকে আরও ব্যাপ্তি দান করেন কার্ল আব্রাহাম, কার্ল গুস্তাভ য়ুং প্রমুখ। যদিও লোককথায় এই পদ্ধতির বিচার-বিশ্লেষণকে প্রাজ্ঞজনেরা তেমন গুরুত্ব দিতে আগ্রহী নন। ড. দিব্যজ্যোতি মজুমদারের কথায়—

> মনোবিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণ নিশ্চয়ই জরুরি কিন্তু লোককথার উৎস সন্ধানে এই পদ্ধতিকে লোকসংস্কৃতিবিদেরা মেনে নেননি। তাঁদের মতে, এসব আরোপিত কষ্টকল্পিত ধারণা। সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানীরা এই পদ্ধতিকে কল্পনা বিলাস আখ্যা দিয়েছেন।[৫]

ড. মজুমদারের এই উক্তি পুরোপুরি গ্রহণযোগ্য নয়। 'লোককথা'য় মনস্তত্ত্বের আলোচনা দেশে-বিদেশে যথেষ্ট সম্মানিত ও সমর্থিত। মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে মুর্শিদাবাদের একটি 'লোককথা'কে পর্যালোচনা করা যায়—

> এক ছিল গোয়ালা। সে বিয়ে করেছিল পাশের গাঁয়ের এক সুন্দরী মেয়েকে। এত সুন্দর বউ গাঁয়ের আর কারও ছিল না। তাই গাঁয়ের কিছু লোক গোয়ালার প্রতি খুব হিংসা করতে লাগল। গাঁয়ের লোকের অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে সে এক ফাঁকা মাঠে গিয়ে বাসা বাঁধল। এক বছর পর তার বউ-এর একটি সন্তান হলো।

এদিকে গোয়ালার বউ বিয়ের পর থেকেই পরপুরুষের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল। সে যে খুব শয়তান ছিল তা গোয়ালা জানতে পারলেও লোকলজ্জার ভয়ে কিছু বলতে পারেনি। একদিন গোয়ালার বউ-এর মনে সন্দেহ হলো। সে ভাবল, তার স্বামী হয়তো সবই জেনে গেছে। তাই স্বামীর সামনে সে নিজেকে সতী প্রমাণ করার জন্য নানারকম কৌশল অবলম্বন করতে লাগল।

এক গভীর রাতে গোয়ালা কাজ করে বাড়ি ফিরল। বাড়িতে এসেই সে অদ্ভুত কাণ্ড দেখতে পেল। সে দেখল, তার সন্তানকে দড়ি দিয়ে বেঁধে রেখেছে। কারণ জানতে চাইলে তার বউ বলল—"আমার সন্তান দুধ পান করতে চাইছিল। তাই আমি তার হাত বেঁধে রেখেছি। কারণ, স্তনে হাত দেওয়ার অধিকার একমাত্র তোমারই আছে আমার সন্তানেরও নেই।" এই কথা শুনে তো গোয়ালা অবাক। সে ভাবলো, পেটের সন্তানকে এত্ত বড়ো কথা তাই সে এক মুহূর্ত বাড়িতে রইল না। সে দূরদেশে গিয়ে এক রাজার বাড়িতে আশ্রয় নিল। রাজার বাড়িতে অনেক গোরু দেখাশোনাই ছিল গোয়ালার কাজ। কিন্তু এখানেও তার মন টেকে না। শুধু বউয়ের কথা মনে পড়ে। একদিন রাতে গোয়ালা তার বউকে স্বপ্নে ঝাঁপ দিতে দেখে ভয়ে শিউরে উঠেছিল। তা সত্ত্বেও সে বাড়ি ফিরল না, রাজার বাড়িতেই দিন কাটাতে লাগল। রাজার ছিল শখের এক বাগান। রাজা ও রানিমা রোজ আসত এই বাগানে। একদিন রাজা বাগান থেকে একটি ফুল তুলে রানিমাকে ছুঁড়ে মারতে অজ্ঞান হয়ে গেল। কোনো রকমে মাথায় জল ঢেলে জ্ঞান ফেরানো হলো বটে, কিন্তু এরপর থেকেই রানিমা অসুস্থ হয়ে পড়ল। এদিকে রাজামশাই রাজ্যে ঢ্যাঁড়া পিটিয়ে বললেন—"আমার বউকে যে সারাতে পারবে আমি তাকে অর্ধেক সম্পদ দান করব।" এই কথা শুনে বহু বদ্যি, কবিরাজ এসেও রানিমার অসুখ সারাতে পারল না। রাজামশাই বড়ো চিন্তায় পড়ে গেলেন।

রাজামশাইয়ের বাড়িতে প্রায়ই এক বিশ্বাসী বৈষ্ণবধারী বামুন আসতো। কিন্তু বামুন যে ভণ্ড তা একমাত্র গোয়ালাই জানত। সে যে প্রতিদিন রানিমার ঘরে যেত তাও তার অজানা ছিল না। একদিন গভীর রাতে রানিমাকে লাঠি দিয়ে মারতেও দেখেছিল গোয়ালা। রানিমার এই মহাশয়তানি সহ্য করতে না পেরে গোয়ালা রাজমশাইকে অসুখ সারানোর প্রতিশ্রুতি দিল। তারপর গোয়ালা সকলের সামনে রানিমাকে উদ্দেশ্য করে বলল—

> সতী সাজতে গিয়ে ঢের দেরি,/হস্ত বেঁধে দুগ্ধ দেয় গোয়ালের নারী।/আর ওই ভণ্ড বামুন বৈষ্ণবধারী,/তলে আসে তলে যায় সুড়ঙ্গের পথ।/বুলের বাড়িতে কিছু হয় না,/রানি মা ফুলের বাড়িতে কাত।

গোয়ালের কথা শুনে রানিমা ভয়ে সব বলে দিল এবং সঙ্গে সঙ্গে সুস্থও হলো। গোয়ালা অর্ধেক সম্পদ পেয়ে তার পরিবার নিয়ে এসে সুখে বাস করতে লাগল। আর লোকলজ্জার ভয়ে রাজাও রানি-মাকে বিদায় করল না, একসঙ্গেই থাকতে লাগল। (গল্পকথক আব্দুল সেখ, সংগ্রহ স্থান : কল্যাণপুর, মুর্শিদাবাদ) এখানে গোয়ালা প্রথমে তার স্ত্রীর প্রতি

অনিন্দ্যসুন্দর আত্মিক ভালোবাসা প্রকাশ করেছে। গ্রামের লোকের অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে গোয়ালা তার স্ত্রীকে নির্জন ফাঁকা মাঠে নিয়ে গিয়ে বনবাস করেছে। অর্থাৎ নির্জন প্রান্তর গোয়ালার জীবনে শাস্তি নয় শাস্তিস্বরূপ। এখানেই তার মানসিক বিষাদ প্রচ্ছন্ন আছে সন্দেহ নেই। এদিকে গোয়ালা স্বামীর কাছে নিজেকে সতী প্রমাণ করার জন্য সন্তানের হাত বেঁধে দুধ পান করায়। তার এই ভয়াবহ কুৎসিত কৌশল একদিকে যেমন সন্তানের প্রতি অবহেলার প্রকাশ পায়, অন্যদিকে তেমনি চরম যৌনচেতনার ভয়ংকর রূপও উন্মোচিত হয়। নানারকম কৌশল অবলম্বন করে স্বামীর কাছে নিজেকে সতী প্রমাণ করা এবং একই সঙ্গে পরপুরুষের সঙ্গে যৌনসুখ মেটানোর বাসনা—এসবই যেন তাঁর বিকৃত মস্তিষ্কের ক্রিয়া। আবার তার স্ত্রীকে স্বপ্নে আগুনে ঝাঁপ দিতে দেখে ভয়ে বুক কেঁপে ওঠার মধ্যেও গোয়ালার সূক্ষ্ম যৌনচেতনাকে জাগ্রত করে।

❑ **নীতিকথাধর্মী লোককথা :** মুর্শিদাবাদের আপাত নিরক্ষর পল্লিমানুষ তাদের গভীর অন্তর্প্রজ্ঞায় নীতিশাস্ত্রের প্রতিটি অভয়বাণীকে আত্মস্থ করেছিলেন, যার প্রমাণ বহুলোককথায় বিদ্যমান। ড. আশুতোষ ভট্টাচার্যের মন্তব্য যথার্থই যুক্তিগ্রাহ্য—

> যে সকল Animal tale বা উপকথার সঙ্গে একটি নীতি বা উপদেশ সংযুক্ত থাকে, তাহাদিগকে ইংরেজিতে Fable বলা হয়। বাংলায় উহা উপকথার একটি শাখা বলিয়া নির্দেশ করিয়া নীতিকথার সংজ্ঞা দেওয়া যাইতে পারে। ইংরেজিতে 'Aesop's Fable' সংস্কৃত সাহিত্যের 'পঞ্চতন্ত্র' ও 'হিতোপদেশ' ইহাদের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।[৬]

বর্তমান বিশ্বে ঈশপের নীতিকথাই অধিক জনপ্রিয়। নীতিকথায় পশু-পাখি, জীবজন্তুদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মুর্শিদাবাদ জেলায় এই জাতীয় বহু নীতিকথা আছে। এখানে একটি নীতিকথাধর্মী লোকগল্প উল্লেখ করা হলো—একটি ব্যাঙের বউ বাস করত নদীর ধারে। তারা দুজনেই ছিল খুব অহংকারী। তারা যখন ঘুমিয়ে ছিল সেই সময় এক মস্ত হাতি প্রায় তাদের গায়ের উপর দিয়ে চলে গেল। ব্যাঙের বউ রেগে গিয়ে হাতিকে বলল—

> উঁচু নাকি (উঁচু নাক) কুলো কানি (কুলোর মতো কান)
> ল্যাবধা ল্যাবধা পা (মোটা মোটা পা)
> সে যদি চেতন (জেগে) থাকত;
> তোমার অবস্থা কি হত?

ব্যাঙের বউয়ের একথা শুনে হাতিটি হাসতে হাসতে সেখান থেকে চলে গেল। এদিকে ব্যাঙ কিন্তু সব শুনতে পেয়েছিল। হাতির ভয়ে সে কোনো কথা বলেনি। হাতি চলে যাওয়ার পর সে তার বউকে বলল—"তোর কথায় আমি ভারি আনন্দ পেয়েছি। তবে পুরো কথাটা শুনতে পাইনি, তাই কথাটা আর একবার বল তো?" ব্যাঙের বউ তার স্বামীর পৌরুষের কথা একবার নয় বারবার বলতে লাগল। ব্যাঙ তার বউয়ের কথা শুনে আস্তে আস্তে ফুলতে লাগল। ফুলতে ফুলতে একসময় সে গেল ফেটে। অবশেষে ব্যাঙ মারা গেল। তখন ব্যাঙের বউ কাঁদতে কাঁদতে বলল—"ওগো স্বামী! তোমার মৃত্যুর জন্য আমি দায়ী।" স্বামীহারা হয়ে সে ওই জায়গা ছেড়ে পালিয়ে গেল। কিছুদিন পরে হাতিটি আবার এলো ওই পথ দিয়ে। সে ব্যাঙটিকে মরে পড়ে থাকতে দেখে মনে মনে বলল—"অহংকার করলে।/ তাই তুমি মরলে॥" (গল্পকথক মহঃ কামরুজ্জামান, সংগ্রহ স্থান : সেখপাড়া, মুর্শিদাবাদ)

অহংকারের পতনই সংগৃহীত লোকগল্পের মূল বিষয়। রামায়ণ, মহাভারত, হিতোপদেশ, পঞ্চতন্ত্র প্রভৃতি গ্রন্থে এই ধরনের বহু নীতিকথা ছড়িয়ে রয়েছে। আশুতোষ ভট্টাচার্য তাঁর 'বাংলার লোকসংস্কৃতি' গ্রন্থে বলেছেন—"লোককথার বিষয়বস্তু যাই হোক না কেন এর আবেদন সর্বজনীন।"[৭] একথা আংশিক স্বীকার্য যে, কৃষিকেন্দ্রিক জেলায় জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলো প্রবেশ করার ফলে লোকগল্পগুলি প্রায় বিলুপ্তির পথে। অনিবার্যভাবেই এখানে দেখা দিয়েছে আধুনিকতার আগ্রাসন। শিশুচিত্তে ঠাকুমা, দিদিমা, মাসি-পিসির কাছে গল্প শোনার আগ্রহ নিশ্চিহ্ন। আধুনিকতার নির্মম অভিঘাতকে অস্বীকার করা চলে না—এই সত্য স্বীকার করেই হতাশার মধ্যে আশা এবং প্রাপ্তির আলোকচিহ্নকে পাথেয় করাই সমুচিত। পরিশেষে বলতে পারি, যন্ত্রনির্ভরতা ও কৃষিনির্ভরতাকে আশ্রয় করেই সুপ্রাচীন ঐতিহ্যমণ্ডিত মুর্শিদাবাদে লোককথা'র রত্নভাণ্ডারটি যে, লোকসংস্কৃতিপ্রেমী গবেষকদের মূল্যবান আলোচনা ও বিশ্লেষণে পরিপুষ্ট হয়ে উঠবে, এই প্রত্যাশাই সমীচীন।

উৎসের সন্ধানে

১. দিব্যজ্যোতি মজুমদার : 'লোককথার ঐতিহ্য', প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, পুস্তক বিপণি, ১৯৮৬ খ্রি., পৃ. ১-৩
২. আব্দুল খালেক : 'ফোকটেল : বঙ্গীয় প্রতিশব্দ', সৌগত চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'লোককথার বর্ণমালা', প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ২০১৪ খ্রি., পৃ. ১২
৩. ওয়াকিল আহমেদ : 'বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতি কোষ', বরুণকুমার চক্রবর্তী সম্পাদিত, পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ, কলকাতা, অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স, ২০০৪ খ্রি., পৃ. ৪৯৪
৪. দিব্যজ্যোতি মজুমদার : 'বাংলা লোককথার টাইপ ও মোটিফ ইনডেক্স', তৃতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ, কলকাতা, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, ২০০৫ খ্রি., পৃ. ৩৭
৫. তদেব : পৃ. ৩৫
৬. আশুতোষ ভট্টাচার্য : 'বাংলার লোকসাহিত্য', এ মুখার্জি অ্যান্ড কোম্পানি প্রা.লি., পঞ্চম সংস্করণ (১ম খণ্ড), কলকাতা, ২০০৪ খ্রি., পৃ. ৪০
৭. আশুতোষ ভট্টাচার্য : 'বাংলার লোকসংস্কৃতি', ন্যাশানাল বুক ট্রাস্ট ইন্ডিয়া, সপ্তম পুনর্মুদ্রণ, কলকাতা, ২০১৪ খ্রি., পৃ. ১০০

❑ রূপকথা

রূপকথায় চেনা মানুষদের জানা মানসিকতার খোঁজ

দিতিপ্রিয়া দাশগুপ্ত

গল্প শোনা বা গল্প বলা মানুষের চিরন্তন ভালোলাগার বিষয়। যেদিন থেকে মানুষ জোট বাঁধতে শুরু করেছে, সেদিন থেকে গল্প বলার প্রবণতাতেই শুরু হয়েছিল গুহাচিত্র খোদাইয়ের কার্যক্রম। এরপর মানবসভ্যতায় ভাষার উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গেই শুরু মুখে মুখে গল্প বলার সূচনা। নব্য-প্রস্তর যুগে যাযাবর জীবনের অবসানে কৃষিকর্মের সূত্রপাতের ফলে মানুষের জীবনে এলো অবসরের অধ্যায় এবং সেই অবসর কাটানোর অভিপ্রায়ে বসল গল্পের আসর। গল্পের আসরে চললো আত্মরক্ষার সমাধান সূত্রের খোঁজ। মানুষ আশ্রয় নিলো দুই শক্তির—

১. অপদেবতা—যাঁরা মানুষের সমস্ত রকম সমস্যার উৎস।

২. দেবতা—যাঁদের সাহায্যে সকল সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।

সভ্যতার চাকা এগোনোর সঙ্গে সঙ্গে এই সমস্ত দেবতা ও অপদেবতার প্রাধান্য কমতে লাগলো। তাঁরা প্রবেশ করলেন মানুষের নিত্যদিনকার চেনা পরিচিত গণ্ডীর মধ্যে। তাঁদের শক্তিমত্তা ও অমানুষিক আচরণ তথা ক্রিয়াকলাপ আরোপিত হতে লাগলো মনুষ্যকুলের উপরে। আবার অনেকক্ষেত্রে দেবদেবীদের আচরণ হতে লাগলো মনুষ্যোচিত—এই সমস্ত কাহিনি নিয়ে সাহিত্যে জন্ম নিলো লোককথার। ইতিমধ্যে সমাজব্যবস্থায় ঘটে গেছে দুটি বিশাল পরিবর্তন। গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষ ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের প্রাধান্য খর্ব করে নিজ নিয়তির দায়ভার তুলে দিয়েছে রাজন্যতন্ত্রের উপর। এর প্রভাব স্বভাবতই পড়লো সাহিত্যে। সাহিত্যও ধর্মের চোখরাঙানিকে উপেক্ষা করে অনায়াসে স্থান দিল রাজকাহিনিকে। গবেষণায় দেখা গেছে, এই সময় থেকেই রূপকথার গল্পগুলি মানুষের মনে ভিড় জমাতে শুরু করেছিল।

রূপকথা বিষয়ে একটি সিদ্ধান্ত সর্বজন অনুমোদিত—শিশুদের উপযোগী করে তাদের কল্পনাবিলাসের কথা মাথায় রেখে রূপকথাগুলি বলা হয়ে থাকে। এই মতের সপক্ষেই আমরা বলতে পারি, নিছকই শিশুদের গল্প শোনানোর মনোভাব থেকে রূপকথাগুলির জন্ম হলেও শিশুদের শিক্ষণীয় কিছু বিষয় অবশ্যই গুরুজনেরা তাদের এই গল্পগুলির মাধ্যমে শেখানোর চেষ্টা করেন। সেই শিক্ষা কখনোই প্রথাগত শিক্ষা নয়; সেই শিক্ষা জীবনের পাঠশিক্ষা, সমাজ পরিবার প্রতিবেশকে বোঝার ও সেই অনুযায়ী জীবনের পরবর্তী ধাপে নিজেদের মানিয়ে নেওয়ার জন্য গল্পের আড়ালে শিশুদের মনে সমাজ-পরিবার-অর্থনীতির কাঠামো সম্পর্কে সচেতন করার প্রয়াস। রূপকথার কল্পনাবিলাসের ব্যাখ্যায় শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন—

> রূপকথা কতকগুলি অসম্ভব বাহ্য ঘটনার ছদ্মবেশ পরিয়া আমাদের মনের সহিত ইহার প্রকৃত

> ঐক্যের কথা গোপন রাখিতে চেস্টা করে।... পৃথিবীর চিরপরিচিত মূর্তিগুলিই একটু অতিরঞ্জনের রাগে রঞ্জিত হইয়া, কল্পনার দ্বারা সামান্যমাত্র রূপান্তরিত হইয়া রূপকথার রাজ্যের অলিতে-গলিতে ঘুরিয়া বেড়ায়।[১]

তাই রূপকথার গল্পগুলির পর্যালোচনা করলে খুব সহজেই আমরা এর চরিত্র ও ঘটনাগুলির সাথে নিজেদের একাত্ম করতে পারি। শোষক ও শোষিতের লড়াইয়ে শোষিত শ্রেণির জয় ও তাদের আত্মপ্রতিষ্ঠা—রূপকথা বিষয়ে একটি পরিচিত ব্যাখ্যা। সেক্ষেত্রে রাক্ষস তথা বিরুদ্ধ শক্তি শোষকশ্রেণির প্রতিনিধি, রাজপুত্র শোষিত সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি এবং রাজকন্যাকে কল্পনা করা হয় সুখ-শান্তি-স্বস্তি- নিরাপত্তা-আনন্দ হিসেবে; যার অধিকার লাভের জন্যও দুই পক্ষের দ্বন্দ্ব। এই লড়াইয়ে শেষ পর্যন্ত অপশক্তি তথা শোষককে পরাজিত করে নিজের অধিকার অর্থাৎ রাজকন্যাকে করায়ত্ত করেন রাজপুত্র, যিনি আপামর সাধারণ মানুষের প্রতীক। আবার সুয়োরাণী-দুয়োরাণীর গল্পকেও এই ছকে ফেলে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে; যেখানে অত্যাচারিত ভালো রানি এবং তাদের সন্তানেরা সেই সর্বহারাদের প্রতিনিধি, বিনা দোষে এবং বিনা বিচারে যাদের বারংবার শাস্তি পেতে হয় সিংহাসনে আসীন রাজা এবং তারই নেক নজরে থাকা পারিষদদের প্ররোচনায়। যাকে বলা যেতেই পারে—

> The term fairy tale is of bourgeois coinage and indicates the advent of a new literary form which appropriates elements of folklore to address and criticize the aspirations and needs of an emerging bourgeois audience.[২]

সব দেশেরই প্রচলিত এই রাজনৈতিক-গণতান্ত্রিক দ্বান্দ্বিক ধারণা থেকে বেরিয়ে এসে এই একই চরিত্রদের আমরা কল্পনা করতে পারি একটু অন্যরকম ভাবে। যেখানে রূপকথার চরিত্ররা আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে দেখা মানুষ এবং পরিস্থিতিকে ইঙ্গিত করে।

রূপকথার গল্পের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য সজীব-নির্জীব নির্বিশেষে সকলের মধ্যে প্রাণের সঞ্চার। আর এই উপাদানের আধিক্যের জন্যই আমরা রূপকথাকে শিশুসাহিত্য এবং অবাস্তব ফ্যান্টাসির কোঠায় ফেলে রাখি। এই বিষয়টির ব্যাখ্যায় আমরা সাধারণত বলে থাকি—

> আদিম মানুষের সর্বপ্রাণবাদী সংস্কার, অর্থাৎ অচেতন বস্তুর মধ্যে প্রাণসত্তার কল্পনাই লোককথার মধ্যে কথা বলা গাছ, সজীব পর্বত, জাদুক্ষমতা সম্পন্ন বিভিন্ন ধরনের বস্তু ইত্যাদির অবতারণা করেছে পৃথিবীর সমস্ত দেশে।... দৈত্য, রাক্ষস, পরি, ডাইনি ইত্যাদির কল্পনাও মূলত আদিম জাদুশক্তিনির্ভর বিশ্বাসেরই প্রতিফলন।[৩]

যেহেতু লোককথা মাত্রেই সমাজের নিম্নস্তর বা অন্তপুরের থেকে প্রাথমিকভাবে জন্মগ্রহণ করে; রূপকথাও তার ব্যতিক্রম নয়। যাঁদের সমাজের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার কোনো উপায় থাকেনা, তাঁরা নিজেদের না-পাওয়াগুলিকে পূর্ণ করতে চান এই রূপকথার মধ্য দিয়ে। কিন্তু এই পরিকল্পনা কেবলমাত্র অপূর্ণ চাহিদাকে পূরণ করার বাসনাই নয়, সত্যিকে তথা বাস্তবকে প্রকাশ করার এক অভিনব পন্থা। এইক্ষেত্রে মনুষ্যেতর জীব বা গাছ-পাহাড়-নদীর মনুষ্যোচিত আচরণগুলির সাথে আমাদের চেনা পরিবেশ এবং আচার-ব্যবহার অনেকাংশেই মিলে যায়। এই বিষয়টিকেই আমরা সাহিত্যতত্ত্বের পরিভাষায় বলে থাকি—রূপকথা ম্যাজিক রিয়ালিজম বা জাদু বাস্তবতায় পরিপূর্ণ। আসলে জাদু বাস্তবতার ব্যাখ্যায় যে সমস্ত বিষয় উঠে আসে তার মধ্যে একটি অবশ্যই—

> দেউড়ির পাহারাদারকে পেরিয়ে যে-রকম মুক্ত রাজপথে বেরিয়ে আসতে পারে না কয়েদখানার বাসিন্দারা। কিংবা পাহারাদারকে ফাঁকি দিয়ে কয়েদিরা যদি একান্তই বেরিয়ে আসতে চায়, তাহলে তাদের পক্ষে ছদ্মবেশ পরবার দরকার। আমাদের মনের বেলাতেও ওইরকম সজ্ঞান সমাজ-বোধের পাহারাদারি পেরিয়ে নির্জ্ঞানের কথা যদি সজ্ঞানের স্তরে উঠে আসতে চায় তাহলে ছদ্মবেশ ছাড়া গতি নেই।[৪]

রূপকথার অবাস্তবতা প্রকৃতপক্ষে এই ছদ্মবেশ ছাড়া আর কিছুই নয়। রূপকথার নির্মাণের অন্তরালে পরিণত মনের চেতন-অবচেতনের দ্বন্দ্ব এবং দ্বন্দ্বমুক্তিই লুকিয়ে রয়েছে। আর এই মুখোশকে শিশুমনের কথা মাথায় রেখে গড়ে তোলা হয়েছে রাজপুত্র-রাজকন্যা-রাক্ষসী-পশু-পাখির আদলে। প্রায় প্রতিটি রূপকথাতেই ব্যাঙ্গামা-ব্যাঙ্গামী অথবা শুক-সারী এই ধরনের পক্ষী-দম্পতি চরিত্র দেখতে পায়, যার ব্যাঙ্গামা বা শুক অর্থাৎ পুরুষ পাখিটি সর্বজ্ঞ, ভবিষ্যত দ্রষ্টা; তারা তাদের স্ত্রীর সাথে কথোপকথন সূত্রে রাজপুত্র-রাজকন্যাকে আসন্ন বিপদের সম্পর্কে জানিয়ে দেন এবং সেই বিপদ থেকে মুক্তির উপায়ও বলে দেন। আমাদের পরিবারের প্রবীণ অভিজ্ঞ মানুষেরা যেভাবে পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত করেন ব্যাঙ্গামা-ব্যাঙ্গামী বা শুক-শারি চরিত্রগুলিও সেই আদলে তৈরি; যাঁদের এই দীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতা আমাদের চলার পথের সহায়ক। আবার বেশকিছু রূপকথায় গাছ রাজপুত্র-রাজকন্যাকে আশ্রয় দেয়, ফলস্বরূপ বন্যজন্তু এবং রাক্ষসী সুলভ বিরুদ্ধ শক্তিগুলি দ্বারা সে আক্রান্ত ও আহত হয়ে থাকে। মনুষ্যসুলভ এই গাছগুলিও আমাদের পরিবারের সেই বয়োজ্যেষ্ঠদেরই ইঙ্গিত করে যাঁরা বাইরের সমস্ত বিপদের মোকাবিলা করে আমাদের রক্ষা করেন এবং তাঁদের আশ্রয়ে পরিবারের অন্যান্যরা শান্তিতে জীবনযাপন করে।

আবার রূপকথার গল্পের অতিপরিচিত আখ্যান ঘুমন্ত রাজকন্যাকে রাক্ষসপুরী থেকে রাজপুত্রের উদ্ধার বা জয় করা। বিভিন্ন গবেষণায় এই ঘুমন্ত রাজকন্যাকে নারীর কুমারী দশা এবং রাজপুত্র দ্বারা উদ্ধারকে নারীত্বে উত্তরণ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এই গবেষণার প্রেক্ষিতে রূপকথার গল্পগুলি স্মরণ করে আমরা বলতেই পারি, রূপসী ঘুমন্ত রাজকন্যাকে ঘিরে থাকে নানা প্রলোভন (সোনার পাখি, হীরের ফুল, রূপার গাছ ইত্যাদি) এবং অসুন্দরের প্রতীক রাক্ষসেরা। বুড়ি রাক্ষসী সেখানে রক্ষণশীলতার প্রতীক। রাক্ষসীর জীবন এক জলাশয়ের অন্ধকার গভীরে সুদৃশ্য বাক্সে কোনো পতঙ্গের মধ্যে রক্ষিত রয়েছে; সেখান থেকে বিস্তর কঠিন রাস্তা পেরিয়ে সেই পতঙ্গকে হত্যা করলে রাজকুমারীকে উদ্ধার করা সম্ভব এবং তবেই রাজকুমারী পাবে তার স্বাধীনতা তথা ইপ্সিত ভবিষ্যৎ। অর্থাৎ, নারীর স্বাধীনতা লাভের জন্য সমাজের গোঁড়ামি, রক্ষণশীলতা, সমস্ত রকম অপ্রাসঙ্গিক বিধিনিষেধকে, বলা ভালো সমাজকে অন্ধকার থেকে মুক্ত করতে হলে যে বিষম বাঁধা পার করতে হবে এই গল্পগুলি তারই রূপকে লেখা—এমন বলা বোধ করি অত্যুক্তি নয়। এক্ষেত্রে জলাশয়ের গভীর অন্ধকারকে আমাদের মনের অন্ধকারসত্তার সাথেও তুলনা করা যেতে পারে। আমাদের মনকে নিষ্কলুষ করতে মনেরই গভীরে প্রবেশ করে সেই ঋণাত্মক ভাবনাগুলিকে সমূলে উৎখাত করতে হবে। রূপকথার আদি উৎস খুঁজতে গিয়ে আমরা বলে থাকি, গল্পগুলি আমাদের পরিবারের অন্দরমহল থেকে প্রচলিত হয়ে চলছে। অর্থাৎ আমাদের পরিবারের ঠাকুমা-দিদিমা-মা, এককথায় বাড়ির মহিলামহল শিশুদের এইসমস্ত গল্প শোনাতেন। সেক্ষেত্রে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক,

রূপকথার গল্পগুলির প্রচার ও প্রসারে পুরুষসমাজের কোনোরকম অবদান নেই কি বাঙলা লোকসাহিত্যের এক প্রধানতম স্তম্ভ, যিনি আবার বিভিন্ন রূপকথার সংগ্রাহক, তিনিও অনায়াসে বলে থাকেন—

> সন্ধ্যার সময় শিশুরা যখন আহার না করিয়াই ঘুমাইয়া পড়িতে চায়, তখন পূর্ববঙ্গের কোনো কোনো অঞ্চলের স্নেহরূপিনী মহিলাগণ এই গল্পগুলি বলিয়া তাহাদের জাগাইয়া রাখে।[৫]

কিন্তু একটু লক্ষ করলেই দেখা যাবে রূপকথার গল্পের ছক প্রায় একই রকম হলেও এর একটি নারী ভাষ্য ও একটি পুরুষ ভাষ্য রয়েছে। মোটের উপর রূপকথাকে আমরা দুইটি ভাগে ভাগ করতে পারি—

১. রাজপুত্র-রাজকন্যা শীর্ষক আখ্যান : এই ধরনের গল্পে দেখা যায় রাজপুত্র বিভিন্ন দুঃসাহসিক অভিযানের মধ্যে দিয়ে রাক্ষসী তথা অপশক্তির হাত থেকে রাজকন্যাকে উদ্ধার করে আনে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে রাজকন্যার রাজ্যের অর্ধাংশের মালিকানা পায়, কখনও আবার রাজকন্যাকে বিয়ে করে নিজের রাজ্যে নিয়ে আসে। এইসব গল্পে মূলত রাজপুত্রই সমস্ত কাহিনির চালক। বিপরীত পক্ষে অবস্থান করে রাক্ষস-রাক্ষসী-ডাইনী প্রভৃতি অশুভশক্তির নিয়ন্ত্রকেরা। রাজকন্যার ভূমিকা এইসব গল্পে নিছকই পুতুলের মতো।

২. রানিদের আখ্যান : এই গল্পে রূপকথার দুয়োরানি ও সুয়োরানির মধ্যেকার দ্বন্দ্ব প্রকাশিত। দুষ্ট রানির চক্রান্তে কোনোরকম বিচার না হয়েই রাজার আদেশে দুয়োরানিকে নির্বাসিত হতে হয়, কিংবা শাস্তি পেতে হয়। অবশেষে সন্তানদের সাহায্যে রাজার সামনে সত্যের প্রকাশ এবং সুয়োরাণীর কঠিন শাস্তির ঘোষণা। এই সমস্ত গল্পে রাজা চরিত্রটি একেবারেই নিষ্ক্রিয়, তিনি প্রথমাবস্থায় সুয়োরাণীর এবং শেষভাগে দুয়োরানির সন্তানদের কথা অনুযায়ী হুকুম তামিল করেন মাত্র।

এই দুই আখ্যানের বিশ্লেষণ করলে বোঝা যাচ্ছে, একপ্রকার গল্পে পুরুষ প্রাধান্য, উপর প্রকারে নারী ও তা সন্তানদের। সুতরাং, এই বিষয়টি স্পষ্ট যে প্রথম পর্বের গল্পগুলি পুরুষ কর্তৃক প্রচলিত নিজেদের শৌর্য ও ক্ষমতার আখ্যান হিসেবে। অপরপক্ষে দ্বিতীয় পর্বের গল্পগুলি নারীরা নিজেদের সাংসারিক জীবনের অসহায়তা এবং সন্তানদের সহায়তায় মুক্তির স্বপ্নে বিভোর হয়ে প্রচলন করেছিলেন। আবার অনেক রূপকথাতেই এই দুই আখ্যানের সহাবস্থান নজরে পড়ে। অবশ্য এই দুই আখ্যানেরই মূল উদ্দেশ্য মেয়েদের এই শিক্ষা লাভ—পরিস্থিতিকে মানিয়ে প্রতিবাদহীন হয়ে বাঁচতে শিখলে একদিন ফললাভ হবেই। অন্যদিকে পুরুষদের কর্ম জয় করা; তা রাজ্যই হোক কিংবা রাজকন্যা। পুরুষদের কর্তব্য নারীদের প্রতিকূল পরিস্থিতি থেকে রক্ষা করা—সেই পাঠও রূপকথার গল্পগুলি দিয়ে থাকে।

এখানেই শেষ নয়। রানিদের আখ্যানগুলি আবার দুই রকম—বড়োরানি রাক্ষসী বা দুস্ট; সেক্ষেত্রে বুঝতে হবে গল্পটি পরিবারের কনিষ্ঠ বউয়ের জবানীতে বলা, যে পরিবারের বড়োদের দ্বারা প্রতিনিয়ত অত্যাচারিত হয়ে চলেছে। অন্যটি ছোটোরানি খল; সেক্ষেত্রে ধরে নেওয়া যেতে পারে গল্পগুলি পরিবারের বড়ো বউয়ের কাহিনি, যেখানে পরিবারে নতুন সদস্যদের আগমনে সে তার পূর্ববর্তী জায়গা হারিয়েছে। তবে রূপকথাগুলির নিবিড় পাঠে দেখা যায়, বড়োরানিই সাধারণত খলচরিত্রের হয়ে থাকে। বিষয়টিকে এইভাবে ব্যাখ্যা করা যেতেই পারে—নিশ্চয় রাজা রাজপুত্র থাকাকালীন তাকে জয় করে এনেছিলেন কোনো স্বয়ম্বর

সভা (যদিও রূপকথার গল্পে প্রথাগত স্বয়ম্বর সভার উল্লেখ থাকে না) অথবা রাক্ষসপুরী থেকে। তারপর তাদের রাজকীয় বিয়ে এবং "সকলে মিলে সুখে-শান্তিতে বাস করিতে লাগিল"। কিন্তু রাজা আবার কোন রাজকন্যা জয় করে আনলেন কিংবা কোনো নারীর রূপের মোহে তাকে বিয়ে করলেন। স্বাভাবিকভাবেই ছোটোরানির সঙ্গে দিনের অধিকাংশ সময় কাটতে লাগলো। নতুনের এত সম্মান পুরাতনের ঈর্ষার কারণ হয়ে দাঁড়ালো। নিজের অধিকার পুনরায় ফিরে পেতে সে আশ্রয় নিল ছলনার। এইভাবেই সংসারের গল্পকে শিশুদের মনোরঞ্জনের উপাদান করতে প্রয়োজন পড়লো অবাস্তব চরিত্রদের, যারা প্রকৃতপক্ষে আমাদেরই লোক, আমাদেরই পরিচিত। নারীরাই নারীদের সমস্যা ও অত্যাচারের মূলে—রানিদের আচার-আচরণ এই কথারই প্রমাণ দেয়। আর পুরুষেরা নিজেদের নির্দোষ প্রমাণ করতে নারীকে যেভাবে প্রতিনিয়ত কাঠগোড়ায় দাঁড় করায় তারই নিদর্শন রূপকথার রাক্ষসী চরিত্রগুলি। মনে রাখা প্রয়োজন রূপকথায় রাক্ষসের তুলনায় রাক্ষসীর সংখ্যা আশ্চর্য রকমের বেশি, রাক্ষসদের দেখা মেলে না বললেই চলে। তা বয়স্ক রাক্ষসী হোক কিংবা রূপের দ্বারা প্রলোভিত করার মূর্তি যুবতি সুন্দরীর ছদ্মবেশধারী রাক্ষসীই হোক—

> Women who have ambition, who show a desire for control and status, must attempt to secure their standing by misleading others. They can find agency only through fraud and manipulation.[৬]

এই পাঠও বোধকরি রূপকথা দিয়ে থাকে ব্যঙ্গের মাধ্যমে। এইভাবে রূপকথাগুলির নিবিড় পাঠে আমরা আমাদের পরিচিত জগতের সন্ধান খুব সহজেই পেতে পারি। নিছকই শিশুদের মন ভোলানোর কাহিনি হিসেবে নয়, রূপকথাকে আমাদের জানতে হবে আমাদের সমাজ, আমাদের প্রতিবেশ, আমাদের মানসগঠনকে চেনার সাহিত্যিক নিদর্শন হিসেবে। তাহলেই আমরা বুঝতে পারব, রূপকথা প্রকৃতপক্ষে সমাজ পরিবর্তনের দাবি করে। রূপকথা প্রশ্ন করে সমাজকে, তার সীমাবদ্ধতাকে, তার গোঁড়ামিকে, তার পক্ষপাত দুষ্ট বিচার ব্যবস্থাকে, সর্বোপরি ক্ষমতার দম্ভকে। রূপকথার এই ধর্ম অন্য কোনো সাহিত্যের শাখায় এত তীব্রভাবে খুঁজে পাওয়া মুশকিল।

উৎসের সন্ধানে

১. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : 'বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা', সরস্বতী লাইব্রেরী, ১ম সংস্করণ, ১৩৫৩, পৃ. ৪
২. Jack Zipes : 'Breaking the Magic Spell : Radical Theories of Folk and Fairy Tales', The University Press of Kentucky, 2nd edition, 2002, P. 122
৩. পল্লব সেনগুপ্ত : 'লোকসংস্কৃতির সীমানা ও স্বরূপ', পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ডিসেম্বর ১৯৯৫, পৃ. ১৫৯
৪. দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় : 'ফ্রয়েড প্রসঙ্গে', অনুষ্টুপ, কলকাতা, এপ্রিল ২০১৭, পৃ. ১৫-১৬
৫. বরুণকুমার চক্রবর্তী সম্পাদিত : 'বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতিকোষ', অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স, কলকাতা, ১৯৯৫, পৃ. ৪৯
৬. Jerilyn Fisher and Ellen Sibler s. : 'Good and Bad Beyond Belief', Teaching Gender Lesson through Fairy Tales and Feminist Theory, The Feminist Press, City University of New York. vol. 28, no 3\4, Fall-Winter 2000

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর-এর ‘ক্ষীরের পুতুল’—একটি লোকায়ত রূপকথা

পিউ চক্রবর্তী

লোকসংস্কৃতি ধারার সবচেয়ে জনপ্রিয় আঙ্গিক হলো লোককথা। কোন্ আদিমকালে কোন্ মানবসমাজে লোককথার সৃষ্টি হয়েছিল তা জানা যায় না। মানুষ গোষ্ঠীবদ্ধ হয়েছে, চাষ করেছে, শিকার করেছে, মুখে মুখে লোককথার জন্ম দিয়েছে। আবহমান কাল ধরে লোককথা বাহিত হয়ে আসছে মানব-ইতিহাসের স্তরে-স্তরে। মানব-জাতির মনের পূর্ণ প্রতিফলন ঘটেছে লোককথায়। গল্পকথার এই দিকটি সম্পর্কে অবন ঠাকুর মোটেই উদাসীন ছিলেন না। তাই যখন তিনি গল্প লিখতে শুরু করলেন, গল্পের নাম দিলেন ‘ক্ষীরের পুতুল’। কতকাল ধরে দিদিমা-ঠাকুমারা নাতি-নাতনিদের কানে-কানে এই গল্প বলে ঘুম পাড়িয়েছেন তার ইয়াত্তা নেই। এমনই মোহ এই লোককথাগুলির যে, ছেলেবেলাকার রূপকথা-শোনা কান তাঁকে শেষ জীবন পর্যন্ত আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। রূপকথার যে মৌলিক আবেদন মানবিক ও ইচ্ছাপূরণের মানসিকতায় পূর্ণ যা তাকে সকল জনগোষ্ঠীতে সবচেয়ে জনপ্রিয় লোককথায় পরিণত করেছে- ‘ক্ষীরের পুতুল’-এর গল্পে তার আদল খুঁজে পাওয়া যায়।

ছেলেবেলা থেকেই অবনীন্দ্রনাথের মনটা ছিল ভীষণরকম ভাবুক। যা কিছু দেখতেন, যা কিছু ভাবতেন সবই তাঁর মনে ছবি হয়ে উঠত, আর তাঁর কথার মধ্যে ফুটে উঠত সেই ছবির ব্যঞ্জনা। তাঁর ছেলেবেলার স্মৃতিকথা তো সবটাই যেন ছায়াছবি। কতগুলি ছবি একেবারে বাস্তব আর কতকগুলিতে মিশে আছে সব তাঁর বালক মনের কল্পনা। জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে সেই দিন-বদলের পালা, কত উৎসব-আলোর রাত, কত সুখদুঃখের মেলা- ছেলেবেলার সেই দিনগুলিতে, চোখে ভাসে সাবেক কালের রূপ, দাসীদের ‘পিদিম’ জ্বালানো, গল্পবলা রাত—

> সেই ঘরের এককোণে বসে রূপকথা বলে একটা দাসী-দাসীটার চেয়ে তার রূপকথাকে বেশি মনে পড়ে। এই দাসীটা ছিলো আমার ছোটো বোনের। সে বলে তার দাসীর নাম ছিলো মঞ্জরী। আর দোয়ারি চাকর এই কবিত্বপূর্ণ মঞ্জরী নামটির নাকের ডগাটা বঁটির ঘায়ে উড়িয়ে দিয়েছিলো তাও বলে সে; কিন্তু আমি দেখি মঞ্জরী শুধু একটা গড়-পড়া নাক ভাঙা নাম, বসে আছে একটা লাল চামড়ার তোরঙ্গ ঠেস দিয়ে দুই পা ছড়িয়ে, তোরঙ্গটার সকল গায়ে পিতলের পেরেক মালার মতো করে আংটা। মঞ্জরী ঝিমোচ্ছে আর কথা বলছে। ‘এক ছিলো টুনটুনি—সে নিমগাছে বাসা না বেঁধে রাজবাড়ির ছাতের আলসেতে থাকে, আর রাজপুততুরের তোশক থেকে তুলো চুরি করে ছোট্ট একটি বাসা বাঁধে।’[১]

কত বড়ো শিল্পীর মন; জ্বলে ওঠে কল্পনার আলো, স্মৃতি হয়ে ওঠে ছবি, ছবি হয়ে ওঠে কথা, কথা হয়ে ওঠে হাজার বাতির অপরূপ রূপকথা। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'সহজ কথা যায় না লেখা সহজে।' 'ক্ষীরের পুতুল' তো আগাগোড়াই সহজ করে লেখা রূপকথা।

লোকথার মধ্যে রূপকথা অত্যন্ত প্রাচীন এবং ঐতিহ্যময়। অন্যান্য লোকধারার মতোই মৌখিক ঐতিহ্যের পথ বেয়ে এক পুরুষ থেকে অন্য পুরুষে রূপকথা প্রবহমান। তাই এতে কথান্তরতাও প্রচুর। কেননা, কথক কাহিনি বলার সময়ে নিজের মনের মাধুরী ও কল্পনা মিশিয়ে নতুন গল্পাংশ সৃষ্টি করেন—

> It is handed down from one person to another and there is no virtue of originality. The tale is heard and is repeated as it is remembered, with or without additions or changes made by the new teller.[২]

লোককথার এই বৈশিষ্ট্যটি সবচেয়ে বেশি আনন্দের যে, একজন কথকের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকে কাহিনিতে সংযোজন ও বিস্তৃতি ঘটানোর।

এক রাজার দুই রানি। রাজা দ্বিতীয়বার দ্বার পরিগ্রহের পর প্রথমা স্ত্রীর প্রতি দায়বদ্ধতা থেকে বিস্মৃত হন। পরিণামে বড়ো রানির জীবন যন্ত্রণাময় হয়ে ওঠে। ছোটরানির প্রতি সমস্ত ভালোবাসা উজাড় করে দেন রাজা 'আর দুওরানি-বড়রানি, তাঁর বড়ো অনাদর, অযত্ন। রাজা বিষ নয়নে দেখেন। একখানি ঘর দিয়েছেন—ভাঙাচোরা, এক দাসী দিয়েছেন—বোবা-কালা। পরতে দিয়েছেন জীর্ণ শাড়ি, শুতে দিয়েছেন—ছেঁড়া কাঁথা।'[৩]

নেতিবাচকতা ও প্রতিকূলতা নিয়েই আমাদের জীবন। কিন্তু বাস্তবে তো আমরা এসব থেকে রেহাই পেতে চাই, মুক্তি চাই। মানুষ তাই আশ্রয় নিয়েছে কল্পনার, যার পরিণতি রূপ পেয়েছে রূপকথায়—যেখানে শেষপর্যন্ত সব মুশকিলের আসান ঘটেছে, অপারগ মানুষ ভরসা করেছে অলৌকিকত্ব ও যাদুশক্তির উপর। সে যুক্তি দিয়ে বিশ্বাস করে যদি সৎ থাকা যায়, কারো ক্ষতি না করে কর্তব্যপালন করা যায় তবে ন্যায় মিলবেই। বাস্তবে তা যে সবসময় ঘটে এমন নয়। তাই মানুষ তার আশাপূরণ করেছে রূপকথার মধ্য দিয়ে। রূপকথা হল আশাপূরণের আখ্যান। ইচ্ছাপূরণের গল্প। সকল প্রতিকুলতাকে জয় করার নির্ঘোষ ঘোষণা। গল্পে দুখিনী বড়োরানির যন্ত্রণার মুক্তি ঘটবে রূপকথার ইতিবাচক শক্তির হাত ধরে।

বড়োরানির প্রতি অবহেলা-অনাচার। রাজা যাবেন দেশ-বিদেশ বেড়াতে, তার আগে ছোটোরানিকে প্রতিশ্রুতি দিলেন তার মনোমত উপহার আনার। বিদায়কালে, জাহাজে চড়ার আগে স্মরণে এল দুওরানির কথা। সে যে এত দুখিনী, রাজার তার কথা মনেও পড়ে না। বড়োরানি কী বা চাইবেন রাজার কাছে! বহুদিন যিনি স্বামী-সোহাগ বঞ্চিতা, অনাদরে যার দিন কাটে—সে স্বামীর থেকে বহুমূল্য সামগ্রী চাইতে পারে না—"সুওরানী—ছোটোরানি, রাজার আদরিনী, রাজা তারই কথা ভাবেন। আর বড়োরানি রাজার জন্যে পাগল, তাঁর কথা সমগ্র যাত্রাপথে একবার মনেও পড়ে না।"[৪]

সুওরানির আবদারের সমস্ত জিনিস-মানিকের চুড়ি, সোনার মল, মুক্তোর মালা, সাধের শাড়ি নিয়ে দেশে ফিরে এসে রাজার মনে পড়ল বড়োরানির কথা। রাজার আদেশে রাজমন্ত্রী যাদুকরের দেশের এক বণিকের জাহাজ থেকে কানা-কড়ি দিয়ে কিনে আনলেন সেই জিনিস। বহু দেশ ঘুরে, বহু সন্ধানের পর, আহ্লাদিত মনে, ছোটোরানির কথামতো রাজা যে সকল

জিনিস নিয়ে এসেছিলেন, তার মধ্যে কোনোটি রানির হলো না। সোনার চুড়ি রানির হাতে বড়ো হলো, সোনার মল রানির পায়ে আলগা হলো, মুক্তোর মালায় রানির গলার মাংস কেটে গেলো রানি ব্যথা পেলেন। রেশমের নীল শাড়ি রানির অঙ্গে হাতে-বহরে কম পড়ল, ছোটোরানির চোখে জল এলো। বড়োরানির কথামতো রাজা নিয়ে এলেন এক বানর। মজার কথা, সেই বাঁদরছানা কথা বলতে পারে। রাজার পায়ে প্রণাম ঠুকে সে বললে—বড়ো ভাগ্যবতী-পুণ্যবতী না হলে দেবকন্যের হাতে বোনা, নাগকন্যের হাতে গাঁথা, মায়া রাজ্যের এই মায়া-গহনা, মায়া-শাড়ি পরতে পারে না। এইসকল শাড়ি-গহনা রাজার ছেলের বৌ-এর জন্য তোলা থাক। রাজা যে এখনও নিঃসন্তান। ছোটোরানির জন্য নতুন শাড়ি-গহনা বুনতে আদেশ দেন রাজমন্ত্রীকে। আর রাজা গেলেন বাঁদর-কোলে নিয়ে বড়োরানির কাছে। বড়োরানির ভাঙা ঘরে ছেঁড়া কাঁথা, ছোটোরানির সোনার ঘরের সোনার সিংহাসনের চেয়ে লক্ষ গুণে ভালো। বড়োরানির ভাঙা ঘরে আদর আছে, যত্ন আছে, দুটো মিষ্টি কথা আছে, ছোটো-র কাছে তা নেই।

রাজা বড়োরানির কাছে চুপিসারে আসেন, ভয় পান ছোটোরানিকে। ছোটোরানি জানতে পারলে বিষ খাওয়াতে পারে দুজনকে। অথচ সেই রানির জন্যে যত্ন করে আনা শাড়ি-গহনা তিনি পায়ে ঠেলেছেন বলে রাজা সত্যিই দুঃখ পান। অবাক হন দেখে, কত অবহেলায় আনা উপহার স্বরূপ বানরটিকে বড়োরানি সাদরে গ্রহণ করলেন।

ছোটোরানি থাকেন সাতমহলে, সাতশো দাসীর সঙ্গে, আর কুঁড়ে ঘরে বাঁদর ছানা লালন করতে-করতে বড়োরানির বছর-মাস-দিন পেরিয়ে গেলো। দুখিনী বড়োরানি-দুখিনীই রয়ে গেলো। বানরকে কোলে নিয়ে ছোটোরানির সাতমহল বাড়ি, সাতখানা ফুলের বাগানের দিকে চেয়ে কাঁদেন। বানর যখনই দেখে বড়োরানিকে কাঁদতে দেখে। 'একদিন বানর বললে—হ্যাঁ মা, তুই কাঁদিস কেন তোর কিসের দুঃখ রাজবাড়ির দিকে চেয়ে চেয়ে কেন কাঁদিস, মা ওখানে তোর কে আছে'[৫] বড়োরানি উত্তর করলেন, ছোটোরানি-সুওরানি ভাগ্যবলে এখন যা ভোগ করছেন-সে সবই একদিন বড়োরানির ছিল। দুওরানি রাজার মেয়ে ছিলেন, রাজার বৌ হলেন, সাতশো দাসী-সাতমহল বাড়ি পেলেন, মনের মতো রাজস্বামীও পেয়েছিলেন। একমাত্র দুঃখ বলতে ছিল যে, রাজার কোলে সোনারচাঁদ রাজপুত্র দিতে পারেননি। কিন্তু ছোটোরানি যাদু জানে। সেই যাদুবলে রাজাকে বশ করেছেন, বড়োরানির সোনার সংসার গ্রাস করে তাকে পথের কাঙালিনী দুখিনী বানিয়েছে। রাজাও হয়তো জানেন ছোটোরানির কুকর্মের কথা, তার যাদুবিদ্যার কথা, তাই ভয় পান ছোটোরানিকে। ভালবাসতে চান—সুখ ঐশ্বর্যে ভরিয়ে দিয়েছেন যে ছোটোরানিকে তার কাছ থেকে পরিবর্তে শান্তির সাহচর্য পান না তিনি। এদিকে দুখিনী বড়োরানি রাজার দুঃখে, সাতমহলা বাড়ির দুখে, সোনার সংসারের দুঃখে চোখের জলে ভাসেন।

যাদুশক্তি কেবল মানুষের কল্যাণকর্মেই নিয়োজিত হয়নি, তার ক্ষতিকারক কাজেও ব্যবহৃত হয়েছে। তবে তুলনামূলকভাবে যাদুশক্তি যতো না মানুষের অকল্যাণে ব্যবহৃত হয়েছে, তার থেকে বেশি হয়েছে মানুষের কল্যাণে, বিশেষত নির্যাতিত মানুষের আনুকূল্যে। মানুষ নিজের দূর্বলতাকে অতিক্রম করার জন্য যাদুশক্তির প্রকাশ ঘটিয়েছে রূপকথাগুলিতে সহায়ক শক্তি রূপে। 'ক্ষীরের পুতুল' গল্পে ছোটোরানি সেই প্রতিকূল যাদুশক্তি আর বানর হলো জয়সূচক

অনুকূল শক্তির নিয়ন্তা। মা-এর দুঃখে বানর প্রতিশ্রুতি দিল—'মা, তুই কাঁদিসনে। আমি তোর দুঃখ ঘোচাবো, তোর সাতমহল বাড়ি দেবো, সাতখানা মালঞ্চ দেবো, সাতশো দাসী ফিরে দেবো, তোকে সোনার মন্দিরে রাজার পাশে রানি করে কোলে নিতে সোনারচাঁদ ছেলে দেবো তবে আমার নাম বাঁদর।'[৬]

ভোর না হতে হতেই বানর রাজাকে গিয়ে সুখবর দিয়েছে যে বড়রানির ছেলে হবে। নিঃসন্তান রাজা এই খবর পেয়ে যারপর নাই খুশি হয়ে বানরকে নিজের গলার গজমোতি হার উপহার দিয়েছেন। এদিকে বড়োরানি চিন্তায় পড়লেন যে তিনি ছেলে কোথায় পাবেন, কিন্তু বানরের কথায় চুপ থাকলেন।

সতীনের প্রতি বিদ্বেষ রূপকথায় স্বাভাবিক ঘটনা। বড়োরানির ছেলে হবে শুনে ছোটোরানি ঈর্ষাকাতর হলেন। যে রানিকে তিনি রাজার চোখের বালিতে পরিণত করেছিলেন, সন্তান হওয়ার সংবাদে পুনরায় তাকে রাজার প্রিয় হয়ে উঠতে দেখে ছোটোরানির হিংসা হলো। আর বড়োরানির যদি ছেলে হয় তাহলে রাজসিংহাসন সেই পাবে—একথা ভেবে সুওরানির কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়ল।

সুওরানি এদিকে 'মনের কথা', প্রাণের বন্ধু—ডাকিনী ব্রাহ্মণকে ডাকলো বড়োরানিকে বিষ খাওয়াবে বলে। বিষ দিয়ে ছোটোরানি নানা মিষ্টি গড়লেন—মুগের নাড়ু, ক্ষীরের ছাঁচ, মতিচুর মেঠাই। বিষের মিষ্টি খেয়ে—'রানি অজ্ঞান, অসাড়! বানর সোনার প্রতিমা বড়োরানিকে সোনার খাটে শুইয়ে দিয়ে ওষুধের সন্ধানে ছুটে গেল। বন থেকে কে জানে কি লতাপাতা, কোন গাছের কি শিকড় এনে নতুন শিলে বেটে বড়োরানিকে খাওয়াতে লাগল।'[৭]

রাজা খবর পেয়ে দৌড়ে এলেন। বানরের ওষুধে রানিমা ভালো হল। বড়োরানির চিন্তায় রাজা নিজেই রইলেন তার পাহারায়। অবশেষে বানর এসে রাজাকে খবর দিল ছেলে হয়েছে, কিন্তু বানর শর্ত করলো, ছেলের বিয়ে না দিয়ে রাজা তার মুখ দেখতে পারবেন না। এভাবে দশ বছর কাটার পর রাজা ছেলের মুখ দেখতে চাইলেন। তখন 'বানর বললে—মহারাজ আগে ছেলের বৌ ঠিক কর, তারপর তার বিয়ে দাও, তারপর মুখ দেখো! এখন ছেলে দেখলে অন্ধ হবে।'[৮]

রাজামশাই পাটলী দেশের রাজকন্যার সঙ্গো ছেলের বিয়ে ঠিক করলেন। এদিকে বড়োরানি কেঁদে মরছেন এই ভেবে যে, ছেলে কোথায় পাবেন। এতদিন রাজাকে ভুলিয়ে রেখেছেন এবার বুঝি সব মিথ্যে ধরা পড়ে যায়। সেইবেলা—"বানর এসে বললে—মা গো মা ওঠ চেলীর জোড়, মাথার টোপর আন ক্ষীরের ছেলে গড়ে দে, বর সাজিয়ে বিয়ে দিয়ে আনি।"[৯] বানর বর ও বরযাত্রী নিয়ে চলল—"ষোলো জন কাহার বরের পালকি কাঁধে তুললে। বানর মাথায় পাগড়ি, কোমরে চাদর বেঁধে, নিশেন উড়িয়ে, ঢাক বাজিয়ে, আলো জ্বালিয়ে, ক্ষীরের পুতুলের বিয়ে দিতে গেল।"[১০] রাজামশাই একদিন আগেই চলে গেছেন বেহাই-বাড়ি।

পথে দিগনগরে দিঘির ধারে ভোর হলো। এতটা পথ পাড়ি দিতে সবাই হাঁপিয়ে গিয়ে দিঘির ধারে তাঁবু ফেলল বিশ্রাম নিতে। দিঘির ধারে ষষ্ঠীতলায় বরের পালকি নামিয়ে বানর কাহারদের ছুটি দিলে, মন্ত্রীকে ডেকে বললে, বরের মুখ যেন কেউ না দেখে। বরের পালকির আশেপাশে কারোর আশার অনুমতি ছিল না। ওইখানে বটতলায় ছিল ষষ্ঠীঠাকুরণের বাস।

সেইদিন 'গাঁয়ের বৌ-ঝি ষষ্ঠীঠাকুরনের পুজো দিতে এলে, রাজার পাহারা হাঁকিয়ে দিলে।'[১১] এদিকে সারাদিন পুজো না পেয়ে ষষ্ঠীঠাকুরন খিদের জ্বালায় কাতর। তিনি ঘুমপাড়ানি মাসি-পিসিকে স্মরণ করলেন। এই মাসি-পিসির আশ্চর্য ক্ষমতা আছে ঘুম পাড়ানোর। 'ঠাকুরন বললেন—বাছারা, এতখানি বেলা হলো এখনও ভোগ পাইনি। তোরা একটি কাজ কর, দেশের যে যেখানে আছে ঘুম পাড়িয়ে দে, আমি ডুলির ভিতর ক্ষীরের পুতুলটি খেয়ে আসি।

ষষ্ঠীঠাকুরনের কথায় মাসি-পিসি মায়া করলে, দেশের লোক ঘুমিয়ে পড়ল। মাঠের মাঝে রাখাল, ঘরের মাঝে খোকা, খোকার পাশে খোকার মা, খেলাঘরে খোকার দিদি ঘুমিয়ে পড়ল। রাজার মন্ত্রী হুঁকোর নল মুখে ঘুমিয়ে পড়লেন, গাঁয়ের গুরু বেত হাতে ঢুলে পড়লেন। দিগনগরে দিনে-দুপুরে রাত এল। মাসি-পিসি সবার চোখে ঘুম দিলেন।'[১২] কিন্তু রাস্তার শেয়াল-কুকুর, রাজার হাতি-ঘোড়া, বনের পাখি, রানির বানর, আর জেগে রইল ষষ্ঠীর দাস যত বেড়াল আছে, সব। ষষ্ঠীরঠাকুরন ডুলি খুলে ক্ষীরের ছেলে খেলেন বেড়াল আর মাসি-পিসিকে ভাগ দিয়ে। এবার যখন খাওয়ার পালা সাঙ্গ করে তাড়াতাড়ি মুখ মুছে ঠাকুরন কাঠামোর ভিতর ঢুকতে যাবেন, 'বানর গাছ থেকে লাফিয়ে পড়ে বললে- ঠাকুরন, পালাও কোথা, আগে ক্ষীরের ছেলে দিয়ে যাও! চুরি করে ক্ষীর খাওয়া ধরা পড়েছে, দেশ-বিদেশে কলঙ্ক রটাব।'[১৩] বানরের হাতে ধরা পড়ে গিয়ে, ঠাকুরন লজ্জায়-ভয়ে একাকার হয়ে, কলঙ্কের ভয়ে, বানরকে দিব্যচক্ষু দিয়ে বটতলা থেকে পছন্দমতো ছেলে নিয়ে নিতে বললেন।

বানর ষষ্ঠীতলার ছেলের রাজ্য থেকে একখানি সোনার চাঁদ ছেলে নিতেই ষষ্ঠীতলা সেই স্বপ্নের দেশে মিলিয়ে গেল। অবশেষে পাটলি দেশে বানর পালকি করে বর নিয়ে এল। রাজা ছেলের বিয়ে দিয়ে পরদিন বৌ নিয়ে, ছেলে নিয়ে দেশে ফিরলেন। বড়োরানি পাটের শাড়ি পরে বৌ-বেটা বরণ করলেন। রাজা এসে ছেলেকে যৌতুকে রাজ্য দিলেন, সেই রাজ্যে বানরকে মন্ত্রী করে দিলেন।

রূপকথায় কখনোই বিয়োগান্তক পরিণতি হয় না। অশুভ শক্তিসমূহকে পরাজিত করে শুভ ও পবিত্র শক্তির প্রতিষ্ঠা হয়। মাঝখানে আসে অসংখ্য বাধাবিপত্তি। কিন্তু গল্পের নিয়ন্ত্রক বানরের উদ্দেশ্য যেখানে সৎ, অনাচারের হাত থেকে শুভ শক্তিকে উদ্ধার করাই যখন ব্রত তখন সমস্ত প্রতিকূলতা অতিক্রম করে সে অশুভ শক্তিকে পরাভূত করেছে। তাই গল্পের শেষে 'হিংসেয় ছোটরানি বুক ফেটে মরে গেল।'

রূপকথায় অনেক আদর্শ হৃদয়বান চরিত্রের সন্ধান পাওয়া যায়। বিপন্নকে উদ্ধার করে এরা সমাজ ও ব্যক্তি মানুষকে রক্ষা করে। এইসব গুণের পূজারি হল লোকসমাজ, তাই আদর্শ চরিত্রের চিত্র এঁকে তারা তৃপ্তি বোধ করে। এখানেও সমগ্র গল্পঘটনায় বানর মূল নিয়ন্ত্রক তথা জয়সূচক চরিত্রে উন্নীত হয়েছে।

রূপকথার গল্প সমাজবিচ্ছিন্ন কখনই না। এর মধ্যে আমাদের সামাজিক-অর্থনৈতিক-নৈতিক জীবন প্রতিফলিত হয়, জীবনের না মেটা আশা-আকাঙ্ক্ষার গল্প থাকে এতে। যেমন, 'ক্ষীরের পুতুল'-এর কাহিনিতে দেখতে পাই, এক রাজার দুই রানি, অর্থাৎ সমাজে বহুবিবাহ ছিল। নারীমনের সুপ্ত কামনা-বাসনার প্রতিফলন ঘটেছে গল্পে। নারী চিরকাল স্বামীর ভালোবাসা চেয়েছে, সুন্দর সন্তান কামনা করেছে। সে এই বিষয়টি পায়নি যখন, জীবনের ব্যর্থতা তাকে

জর্জরিত করেছে। স্বামী যখন দ্বিতীয় তৃতীয় একাধিকবার বিবাহ করেছে, তখন প্রথমা স্ত্রীকে সতীন নিয়ে ঘর করতে হয়েছে। সুয়োরানি স্বামী-সোহাগিনী হলে বড়োরানি হয়েছে বঞ্চিত, লাঞ্ছিত। সতীনের প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ পেয়েছে নানা স্থানে। বড়োরানির ছেলে হবে শুনে ছোটোরানি ঈর্ষাকাতর হয়েছেন। দেখা গিয়েছে, পরিণামে বিষ খাইয়েছেন বড়োরানিকে। গল্পে বাল্যবিবাহের প্রসঙ্গও আছে, দশ বছর বয়সে রাজার ছেলের বিয়ে হয়। পরিশেষে বলা যায় বাস্তব জীবনেও আমরা যেমন দুষ্টের দমন করে শিষ্টের পালন করতে চাই, রূপকথাতেও অন্যায়কারী শেষে দণ্ডিত হয়।

শিশুসাহিত্য রূপেই বিবেচিত হয়ে আসছে রূপকথা। শিশুদের আগ্রহ দেখে মনে হয়, রূপকথার গল্প হয়তো শিশুদের কারণে যুগ যুগ ধরে বেঁচে আছে। শিশুরা যেমন সহজ-সরল, সব কিছুকেই সত্য বলে মনে করে, রূপকথাতেও তারই হদিশ মেলে। সে তার কল্পনালোকের সন্ধান পায়। তাই 'ক্ষীরের পুতুল'-এ কথা বলা বানর দেখে কোনো সমস্যা হয় না। শিশু মনোরঞ্জনের জন্যই চিত্রময় গদ্য ভাষার ব্যবহার করেছেন। যে ছড়াগুলি এতদিন ছড়াই ছিল, অবনীন্দ্রনাথ তাকে বাংলা সাহিত্যে প্রথম রূপকথার শরীরে সংযোজিত করে দিয়েছেন।

'ক্ষীরের পুতুল' বাংলাদেশের অতি পরিচিত এক রূপকথা। রূপকথার পরিচিত আঙ্গিক মেনেই এই গল্পেও রাজা-রানির কোনো নাম নেই, এমনকি রাজ্যের নামও অনুল্লেখিত। অবনীন্দ্রনাথ 'ক্ষীরের পুতুল'-এ যে গল্পের অবতারণা করেছেন, সে গল্পের খানিকটা আমরা 'ঠাকুমার ঝুলি'-র 'কলাবতী রাজকন্যা' বা উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর লেখা 'বানর রাজপুত্র' গল্পে পেয়েছি (গল্প দুটিতেই নিঃসন্তান রাজা এবং তার সাত রানি, দুঃখিনী রানি, কথা বলা বানর—যার আচার-আচরণ পুরোপুরি মানবচরিত্রের মতো ইত্যাদি সাদৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়)। বলাবাহুল্য, শুধু কাঠামোটুকুই। কিন্তু কাহিনির মধ্যে নতুনত্ব না থাকলেও বলার ভঙ্গির মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে অবনীন্দ্রনাথের স্বকীয়তা। এত সুন্দর রূপকথার গল্প, যার মধ্যে কোনো জটিলতা নেই, পেলবতা মাখানো যার বর্ণনা, পাঠ করার পর যে পরিতৃপ্তি তা মনে হয় বাংলা সাহিত্যের আর কোনো রূপকথার গল্পে পাওয়া যায় না। অবনীন্দ্রনাথ রূপকথার সহজ-সরল লোকায়ত সুরটিকে 'ক্ষীরের পুতুল'-এ জীবন্ত করে তুলেছেন।

'ক্ষীরের পুতুল'-এ প্রধানতম চরিত্র বাঁদর—তাহলে কী একে পশুকথা বলা যায়—লোককথার মধ্যে সবচেয়ে আদি সৃষ্টি পশুকথার। হবে নাই বা কেন! আদিমকালে দেবতারাও পশুর আকৃতিতে পুজো পেয়েছেন। লোককথার মধ্যে সবচেয়ে বেশি ও মুখ্য স্থান জুড়ে রয়েছে পশু, পাখি, কীটপতঙ্গ এবং এদের ঘিরে তৈরি হয় পশুকথার কাহিনি। কিন্তু কাহিনিতে পশু পাখির চরিত্র থাকলেই যে সেগুলো পশুকথা হবে তা নয়। যেমন রূপকথা কিংবা নীতিকথায় পশু-পাখি থাকে, সেগুলো পশুকথার অন্তর্ভুক্ত হবে না। মূল চরিত্র হবে পশু-পাখি এবং তাদের ঘিরেই আবর্তিত হবে লৌকিক কাহিনি—তবেই তাকে পশুকথার আখ্যা দেওয়া যাবে। তেমন ভাবেই 'ক্ষীরের পুতুল'-এ বাঁদর একজন সহযোগী চরিত্র হিসেবে কাহিনিকে এগিয়ে নিয়ে গেছে। সে কাহিনির হোতা বটে, কিন্তু মুখ্য সে কখনোই নয়।

লোকসাহিত্য ও সংস্কৃতি হলো লোকসমাজের সামগ্রিক সৃষ্টি। একক ব্যক্তি দ্বারা এর সৃষ্টি হলেও সংহত সমাজ যখন সেটাকে গ্রহণ করে মৌখিক ঐতিহ্যের মধ্যে লালন করে, তখনই তা লোকসাহিত্য হয়ে ওঠে। তাই এগুলো পুরোপুরি সংহত সমাজের নিজস্ব বস্তু।

অবনীন্দ্রনাথের ‘ক্ষীরের পুতুল’ প্রসঙ্গো বলা যায়-এর গল্প লোকসমাজ আহরিত হলেও, এটি তাঁর নিজস্ব সৃষ্টি, তাই কোনওভাবে একে লৌকিক আখ্যা দেওয়া উচিত না।

তথ্যের সন্ধানে

১. অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর : ‘আপন কথা’, সিগনেট প্রেস, কলকাতা প্রথম সংস্করণ, আষাঢ় ১৩৫৩, পৃ. ৪৯
২. Funks & Waywalls : ‘The Standard Dictionary Of Folklore Mythology and Legend’, New York, 1949 pages 408-409
৩. অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর : ‘ক্ষীরের পুতুল’, আনন্দ,কলকাতা, প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি ১৯৮৬, পৃ. ৫
৪. তদেব : পৃ. ১০
৫. তদেব : পৃ. ২১
৬. তদেব : পৃ. ২২
৭. তদেব : পৃ. ৩৮
৮. তদেব : পৃ. ৪১
৯. তদেব : পৃ. ৪২
১০. তদেব : পৃ. ৪৩
১১. তদেব : পৃ. ৪৪
১২. তদেব : পৃ. ৪৬
১৩. তদেব : পৃ. ৪৭

তথ্যের সন্ধানে

১. দিব্যজ্যোতি মজুমদার : ‘লোককথার লিখিত ঐতিহ্য’, গাঙচিল, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ আগস্ট ১৯৯৯
২. বরুণকুমার চক্রবর্তী সম্পাদিত : ‘লোককথার সাতকাহন’, অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ সেপ্টেম্বর ২০০০
৩. সেরা রূপকথার গল্প : নির্মল বুক এজেন্সী, কলকাতা, প্রকাশকাল শিশু দিবস, কলকাতা বইমেলা, ২০০০

বাংলা কথাসাহিত্যে রূপকথা : নির্বাচিত ছোটোগল্প অবলম্বনে কিছু কথা

দেবলীনা চৌধুরী

> বাগ্‌দিপাড়ায় বাগ্‌দিদের ছেলে বিছানায় শুয়েছিল। সেখান দিয়ে এল ঘুমপাড়ানি মাসি-পিসি, আঁচল ভরা ঘুম নিয়ে; ঘুম থেকে উঠে খোকা বেরোল বেড়ু করতে নৌকায়। সে মলমলের থান পরল, গায়ে দিল সোনার চাদর, পায়ে দিল লালা জুতুয়া। ঘরে ছিল কুনো বেড়াল, কোমর বাঁধল সে খোকার সঙ্গে যাবার জন্য। তাই দেখে ল্যাজঝোলা টিয়াপাখিও উড়ল তাদের সঙ্গে সঙ্গে।[১]

কী অদ্ভুত সুন্দর একটি ছবি। সুখলতা রাওয়ের উপরিউক্ত গল্পে রূপকথার গল্পের মতোই ছোটোবেলার ছড়ার দেশে ফিরে যাওয়া যায় যেন। ঠিক এর পরের ছবিতেই দেখা যায় নদীর ঘাটে একটি নৌকো বাঁধা রয়েছে। বেড়াল আর খোকা—দুজনেই যখন সেই নৌকোতে উঠতে যাবে, ঠিক সেই সময়ই শিবঠাকুর এলেন। তিনি খোকাকে 'খোকাভাই' সম্বোধন করে নদী পার করে দেওয়ার অনুরোধ জানালেন। এই অংশেই এসেছে যমুনাবতী-সরস্বতীর কথা। তাঁদের বিয়ে উপলক্ষ্যে শিবঠাকুরকে মা তলব করেছেন। অতএব তাঁকে যেতেই হবে ওপারে। এই অংশের চরিত্র নির্বাচনে রবীন্দ্রনাথের 'লোকসাহিত্য' প্রবন্ধের কথা মনে পড়ে পাঠকের। এদিকে বিয়ের খোকাও বেশ আগ্রহী।

এর আগে টাপুর-টুপুর বৃষ্টির মধ্যে খোকার 'শিবদাদার' বিয়ে হয়েছিল তিনকন্যের সাথে, সেই বিয়ে দেখা হয়নি খোকার। অতএব সেই তিন বউকেও দেখার প্রবল ইচ্ছে তার। শিবদাদাও জানালেন, সেই বউরাও সকলেই বাড়িতেই আছে দিব্যি। অতএব নৌকো দিল ছেড়ে। কুনো বেড়াল দাঁড় বাইতে লাগল সেখানে আর টিয়া ধরল হাল। এই গল্পে আরও পাওয়া যায় হরগৌরীর মাঠ কিংবা তিরপূর্ণীর ঘাটের কথা। এছাড়াও আছে ডিমের গল্প। যে ডিম ফুটলে বেরোয় শিং-ওলা মাথা, যা দেখে খোকা বলে ওঠে 'হাট্টিমাটিম টিম্'। 'কমলাপুলির টিয়ে'-র কথাও আসে এখানে। গল্পের কাহিনি যত এগোয়, ততই লোককথার নতুন পুরোনো নানা ছড়া আর তাদের গল্প নতুনভাবে ধরা পড়ে পাঠকের সামনে। আর এইভাবেই রূপকথা আর ছড়ার অপূর্ব সংমিশ্রণ গল্পটিতে এক নতুন মাত্রা যোগ করে।

আর একটি গল্প 'শঙ্খমালা'। সেখানে আছে সমুদ্রের কথা, যে সমুদ্রের নীচে রয়েছে রাজার বাড়ি। প্রবাল ঝিনুক দিয়ে গড়া রাজার প্রকাণ্ড প্রাসাদ। অনেক লোকজন রয়েছে সেখানে। রাজার মাথায় সোনার মুকুট, সাত-লহরী হার, পায়ে রয়েছে হীরের মল। রাজার ছোট্টো মেয়ে শঙ্খমালা, মা-বাবার আদরে মানুষ হয়ে উঠছে সে। গায়ের রং তার শঙ্খের মতোই

সাদা। অপূর্ব সেই ডিটেইলিংইয়ের পরতে পরতে উন্মোচিত হয় রূপকথার নানা মোটিফ। লেখিকার অন্য একটি গল্পে আসা যাক এবার। আনন্দ ও নিরানন্দ দেশের গল্প পাশাপাশি উঠে এসেছে এখানে। আনন্দের দেশে রয়েছে মস্ত খেলার মাঠ। কত রকমের ফুল, তার পাশে পাশে বাহারি প্রজাপতি উড়ে বেড়ায় সেখানে। গাছে গাছে পাখিরা গান গেয়ে বেড়ায়। পানু, ভানু, নানু, বিনি, মিনি—এইসব বাচ্চারা সকলে মিলে খেলে বেড়ায় সেখানে। আনন্দের দেশে ছেলেমেয়েরা আনন্দ করে বই পড়ে। রাজার বাড়িতে তাদের নেমন্তন্ন করা হয়। রাজা সেখানে তাদের সকলকে খেলনা উপহার দেন। নিরানন্দের দেশে এসব কিছুই নেই। ওই দেশের রাজাকে, সেখানকার দেশকে আসলে জটাই বুড়ি জাদুমন্ত্রে বশ করেছে। এই গল্পে রূপকথার মোটিফ হিসেবে পরী এসেছে, এসেছে জাদুমন্ত্রের কথা। যে জাদুর কিংবা তন্ত্রমন্ত্রের সঙ্গে লোকসাহিত্যের অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক। আছে নানা ছড়া। তার মধ্যে পরিচিত 'রামগরুড়ের ছানা' যেমন আছে, তেমনই রয়েছে নতুন সব ছড়া। যেমন—

> ঢপর ঢপ ঢপর ঢপ হো-!/আমোবাগানে বসল মেলা গো।/আজব মেলা, মজার মেলা,/ছেলেমেয়ের সখের মেলা;/নাগরদোলা, বাজার হাট,/রঙ বেরঙের দোকানপাট,/ খেলনা চুড়ি, ঢাউস ঘুড়ি,/খাবারগুলি জটাই-বুড়ি;/দেখবে যদি দেখতে এস গো।/ঢপর ঢপ ঢপর ঢপ হো-![২]

একই সংকলনের অন্য আর একটি গল্প—'মায়াদুর্গ'। পাহাড়ের পায়ের কাছেই রতনদের বাড়ি। একদিন নিজের একটি পোষা ছাগলছানা খুঁজতে খুঁজতে রতন পাহাড়ের ওপরে উঠে পড়ে। সেখানেই রয়েছে সেই মায়াদুর্গ। এই দুর্গের ভেতরে আবার পরিদের রাজ্য। সাধারণত রূপকথায় পরিরাই মানুষকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসে। এখানে কিন্তু উল্টো ব্যাপার ঘটল। এই পরির দল রতনের কাছেই সাহায্যের আবেদন জানাল। কী সেই আবেদন? প্রতি পূর্ণিমা রাতে তারা আকাশ থেকে পৃথিবীতে নেমে এসে পৃথিবীর বাগানে খেলে বেড়াতো সকলে। এরকমই একদিন মায়াদুর্গের বাগানে নেমে এসেছিল তারা। কিন্তু এই বাগান যে একজন বাজিকরের—একথা তারা জানত না সেখান থেকেই ঘটল বিপত্তি। বাজিকরের কাজে ব্যাঘাত ঘটায় সে পরিদের রাজার হাত পা শিকলে বেঁধে তাঁকে আটকে রেখে দিল। পরিদের শত অনুরোধেও সে রাজাকে মুক্তি দিল না। বরং আরোপ করল কিছু শর্ত। এই শর্ত পূরণেই রতনের সাহায্য চায় পরিরা। সেই আবেদনে কি সাড়া দিতে পারবে রতন? এইসব প্রশ্নের উত্তরই লুকিয়ে রয়েছে এই গল্পে।

বাংলা সাহিত্যে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনার সঙ্গে রূপকথার সম্পর্ক বেশ ঘনিষ্ঠ। ছোটো থেকেই তিনি অসম্ভব ভালো গল্প বলতে পারতেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বয়ং এই কারণে তাঁকে গল্প লেখার জন্যে ছোটো থেকেই উৎসাহিত করেছিলেন। সেই থেকে তাঁর গল্প লেখার শুরু। একনাগাড়ে লিখে শেষ করলেন 'শকুন্তলা'। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু সেটি পাঠের পর কোনো সংশোধন করলেন না। এই ব্যাপারটি অবনীন্দ্রনাথকে লেখক হিসেবে আরও অনুপ্রাণিত করল। তিনি বুঝতে পারলেন, তাঁরও বাংলা লেখার ক্ষমতা রয়েছে। সেই ভাবনা থেকে তিনি পরপর লিখে ফেললেন—'ক্ষীরের পুতুল', 'রাজকাহিনি' প্রভৃতি গ্রন্থ। সাহিত্যের অনুভূতি এবং চিত্রকরের দৃষ্টি—এই দুটি বিষয় মিলিয়ে মিশিয়ে অবনীন্দ্রনাথের রূপকথার জগৎ প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। তাঁর অননুকরণীয় ভাষায় তিনি গল্প শুনিয়েছেন। সেই ভাষা পড়তে পড়তে যেন

আমাদের চোখের সামনেও ফুটে উঠেছে সাত সমুদ্র তেরো নদীর ওপারের এক ছবি। তাঁর 'রাজকাহিনী', 'ভূতপত্রীর দেশ', 'বুড়ো আংলা' প্রভৃতি গ্রন্থে ধ্বনির তরঙ্গে টুকরো টুকরো ছবির বিন্যাস চমকপ্রদ। স্বয়ং প্রমথনাথ বিশী বলেছেন যে, গীতিস্পন্দপ্রধান গদ্যে গল্প বলা চলে এবং সেই গল্পই হলো রূপকথার গল্প। অন্য গল্প এবং রূপকথার গল্পের মধ্যে প্রধান পার্থক্য হলো, অন্যান্য গল্পের মতো রূপকথায় রিয়্যালিজম্ বা বাস্তবতার স্থান সেভাবে নেই। যে কথা আসলে প্রমাণযোগ্য নয়, অনুমানই হলো যার একমাত্র সম্বল, সেসব নিয়ে তর্ক-বিতর্ক কিংবা চিন্তা করা চলে না; কেবল সুরের মধ্যে দিয়েই সেসব প্রকাশযোগ্য। সেইজন্য রূপকথার প্রধান সম্বল গীতিস্পন্দপ্রধান ভাষা। সেই হিসেবে অবনীন্দ্রনাথের সব কথাই রূপকথা। তাঁর 'ক্ষীরের পুতুল' তো আসলেই একটি রূপকথার গল্প। অন্যদিকে 'রাজকাহিনী'-র কাহিনি ঐতিহাসিক হলেও লেখক এখানে রূপকথার দৃষ্টিভঙ্গিতে পুরো বিষয়টি দেখেছেন। ফলে কাছের জিনিসও তথ্য বর্জন করে দূরের কল্পনার বিষয় হয়ে উঠেছে।

রূপকথার 'রূপ' শব্দটির একটি বিশেষ ইঙ্গিত রয়েছে যা কিন্তু উপকথায় নেই। রূপকথায় কাহিনির বিস্তার ঘটার সঙ্গে সঙ্গে চোখের সামনে একটা রূপের সৃষ্টি হয়। প্রমথনাথ বিশীর মতে, এই রূপসৃষ্টির সার্থকতার জন্যই এর নাম রূপকথা। অন্য সাহিত্যের সঙ্গে এখানেই তার প্রধান পার্থক্য। কারণ রূপকথার প্রধান লক্ষণই হল রূপসৃষ্টি। এছাড়াও দেশ ও কালের সীমা ছাড়িয়ে রূপকথার রাজ্যের বিস্তার। এটিও তার অন্যতম লক্ষণ। এই কারণেই রূপকথার গল্পে অদ্ভুত বা অবাস্তব ভাবনার সৃষ্টি হয় অতি সহজেই। অবনীন্দ্রনাথের রচনার মধ্যে এই সবকিছু লক্ষণের দেখা পাওয়া যায়। রাজস্থানের বীরপুরুষ ও অন্যান্য চরিত্রেরা ইতিহাসের এক বিশেষ সময়ের প্রতীক। কিন্তু 'রাজকাহিনী'-র জগতে যখন তাঁরা প্রবেশ করেছেন তখন তাঁরা দেশ-কালকে উত্তীর্ণ করে রূপকথার মানুষ হয়ে উঠেছেন। তখন তাঁদের বয়সের প্রশ্ন আর পাঠকের মনে জাগে না। এই গ্রন্থের প্রতিটি গল্পে তিনি একটি ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন। যেমন, 'শিলাদিত্য' গল্পটিতে সূর্যপূজারী ব্রাহ্মণ এবং পাঠকের সঙ্গে লেখক সুভাগা চরিত্রটির পরিচয় করান এভাবে—"সহসা সন্ধ্যার সমস্ত অন্ধকার ভেদ করে পৃথিবীর পশ্চিম পার থেকে একবিন্দু সূর্যের আলো সেই দুঃখিনী বালিকার মুখখানিতে এসে পড়ল।"[৩] আলো এবং অন্ধকারকে এখানে পাশাপাশি রেখে এক অপূর্ব ছবির সৃষ্টি করা হয়েছে এখানে। অথবা সুভাগা এবং সূর্যের মিলন দৃশ্যটিকেও লেখক এখানে ভাষা দিয়ে এইভাবে সাজিয়েছেন—"সূর্যদেবের আলো ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে এলো, একটুখানি রাঙা আভা সধবার সিঁদুরের মতো সুভাগার সিঁথি আলো করে রইল।"[৪] 'পুষ্পবতী' গল্পেও দেখা যায়, রানির শিল্পকর্মের অসাধারণ বর্ণনা। রানি সোনার সূঁচ আর সোনার সুতো দিয়ে সবুজ রেশমের মধ্যে সবুজ ঘোড়ায় চড়া সূর্যের মূর্তি ফুটিয়ে তুলছেন। অপূর্ব সেই চিত্র। আবার এই গ্রন্থের 'পদ্মিনী' গল্পেও রানির রূপের অপূর্ব বর্ণনা মেলে—

> সেকি কালো চোখ! সে কি সুটানা ভুরু! পদ্মের মৃণালের মতো কেমন কোমল দুখানি হাত! বাঁকা মল পরা কি সুন্দর দুখানি রাঙা পা! ধানী রঙের পেশোয়াজে মুক্তোর ফুল, গোলাপী ওড়নায় সোনার পাড়, পান্নার চুড়ি, নীলার আংটি, হীরের চিক।[৫]

এই অপরূপ বর্ণনার মধ্যে দিয়ে রাজপুত ঘরানার ইতিহাস রূপকথার রসে জারিত হয়ে জীবন্ত হয়ে উঠেছে যেন! আবার আজগুবি বা অবাস্তব রসের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় 'ভূতপত্রীর

দেশ', 'বুড়ো আংলা', 'খাজাঞ্চির খাতা' কিংবা 'ক্ষীরের পুতুল' গ্রন্থে। 'ভূতপত্রীর দেশ' গল্পে সবকিছুই উল্টোভাবে উপস্থিত। সেখানে ওপরে উঠতে হলে নীচে নামতে হয়, চোখ মেলে ঘুমাতে হয়, আবার তাকিয়ে থাকলে তবেই ঘুম পায়। সে এক অদ্ভুত জগত বটে! লেখকের 'ক্ষীরের পুতুল' গ্রন্থেও সন্ধান মেলে এমনই এক জগতের। রাজা বাণিজ্য করতে গিয়ে মানিকের দেশ, সোনার দেশ কিংবা মুক্তোর দেশ থেকে সুয়োরানির জন্য নানা উপহার সংগ্রহ করেন। মুক্তোর রাজ্যের বর্ণনাতে পাওয়া যায়—

> সে দেশে রাজার বাগানে দুটি পায়রা। তাদের মুক্তোর পা, মানিকের ঠোঁট, পান্নার গাছে মুক্তোর ফল খেয়ে মুক্তোর ডিম পাড়ে। দেশের রানি সন্ধ্যাবেলা সেই মুক্তোর মালা গাঁথেন, রাতেরবেলায় খোঁপায় পড়েন, সকালবেলায় ফেলে দেন। দাসীরা সেই বাসি মুক্তোর হার এক জাহাজ রুপো নিয়ে বাজারে বেচে আসে।[৬]

কী অপূর্ব ছবি! প্রতিটা চরিত্র, প্রতিটা মোটিফ যেন নিজ নিজ স্বকীয়তায় উজ্জ্বল। দুয়োরানি, সুয়োরানি ছাড়াও এখানে এসেছে ডাকিনী ব্রাহ্মণী চরিত্র। ঠিক সুখলতা রাওয়ের গল্পের জটাই বুড়ির মতো সে। সেই খলচরিত্র ছোটোরানির পরামর্শে দুয়োরানির সর্বনাশ করতে উদ্যোগী। সেই বর্ণনাও অসাধারণ—

> ডাকিনী বিষের সন্ধানে গেলেন। বনে বনে খুঁজে-খুঁজে ভর-সন্ধ্যাবেলা ঝোপের আড়ালে ঘুমন্ত সাপকে মন্ত্রে বশ করে, তার মুখ থেকে কালকূট বিষ এনে দিল।... রানি দেখলেন, বুড়ি ব্রাহ্মণী বড় যত্ন করে, থালা সাজিয়ে সামগ্রী এনেছে।... রানি ক্ষীরের ছাঁচ ভেঙে খেলেন, জিভের স্বাদ গেল।... চোখে আঁধার দেখলেন,... সাপের বিষ মাথায় উঠল।[৭]

এরপর আবার সেই অবাস্তব ভাবনার অদ্ভুত এক জগত এসেছে ষষ্ঠীঠাকরুনের মতো চরিত্রে। ঘুমপাড়ানি মাসি-পিসিরাও গল্পে এসেছেন ক্রমে ক্রমে। জায়গার নামটিও রূপকথার পক্ষে একেবারে আদর্শ একটি নাম—'দিগ্‌নগর'। দুয়োরানির বানর ছেলে মা ষষ্ঠীর কৃপায় দিব্যচক্ষু লাভ করে যে জায়গাটি প্রত্যক্ষ করে, সেটি পাঠকের কল্পনার জগতকে আরও বহুদূরে প্রসারিত করে নিয়ে যায়। সেই স্বপ্নের দেশেই রয়েছে ন্যাজঝোলা টিয়ে পাখি, তেপান্তর মাঠ, সোনার ময়ূর। সেখানেই রয়েছে কমলাপুলির দেশ। যে দেশের কথা এর আগেও সুখলতা রাওয়ের গল্পের আলোচনায় উঠে এসেছে। এই সব দেশ, চরিত্র এবং ঘটনার কথা পাঠক বিভিন্ন সময়ে প্রচলিত ছড়া কিংবা গল্পের মধ্যে দিয়ে শুনে এসেছে। এটি সেই কল্পনারই রূপকথার রাজ্য যেন।

এখানেই অবনীন্দ্রনাথ লোকসাহিত্য এবং রূপকথাকে মিলেমিশে একাকার করে দিয়েছেন। কিন্তু কোথাও সেটিকে আরোপিত মনে হয়নি। ছড়ার জগতের মতোই এখানেও টাপুর-টুপুর বৃষ্টির সঙ্গে নদীতে বান এসেছে। এই জগতে শিবঠাকুর এবং তিন কন্যার দেখাও মিলেছে অনায়াসে। খোকাবাবুদের মাছ চিলে কেড়ে নিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কোলাব্যাঙেও ছিপ টেনে নিয়ে গেছে। খোকার মা খোকাকে নাচাতে নাচাতে ভোঁদড়কে ডেকেছেন। আর এভাবেই ছড়া এবং রূপকথার অবাস্তব জগত মিশে গেছে লেখকের লেখনিতে। এই গল্পের মুখ্য চরিত্র কথা বলা বানর। সে দুয়োরানিকে তাঁর প্রাপ্য সম্মান ফিরিয়ে দিয়ে সুয়োরানিকে পরোক্ষভাবে তাঁর কর্মফলের শাস্তি বিধান করেছে। কাহিনির শেষে এই রূপকথার মধ্য দিয়ে তাই ভালো-মন্দ, ভুল-ঠিক সম্পর্কিত একটি বার্তাও পাঠকের কাছে আসে। ফলে কোথাও যেন

এই রূপকথার মধ্যে উপকথারও একটি হালকা ছায়া দেখতে পাওয়া যায়। আর এভাবেই বাংলা ছোটোগল্পের রূপকথার জগত সুখলতা রাও এবং অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উজ্জ্বল স্বাক্ষর বহন করে নিয়ে চলে।

তথ্যের সন্ধানে

১. জয়িতা বাগচী সম্পাদিত : 'খোকা এল বেড়িয়ে', 'সুখলতা রাও রচনা সংগ্রহ ৩', প্রথম সংস্করণ, ২০০৪, থীমা এবং মানবীবিদ্যাচর্চা কেন্দ্র, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, পৃ. ৭৫
২. জয়িতা বাগচী সম্পাদিত : "আনন্দের দেশ", 'নানান গল্প', 'সুখলতা রাও রচনা সংগ্রহ ৩', প্রথম সংস্করণ, ২০০৪, থীমা, কলকাতা, পৃ. ৬
৩. অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর : 'রাজকাহিনী', 'অবনীন্দ্র রচনাবলী', দ্বিতীয় খন্ড, ২য় সংস্করণ, প্রকাশ ভবন, ১৯৮৭, পৃ. ১০১
৪. তদেব : পৃ. ৫৭
৫. তদেব : পৃ. ১০৮
৬. অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর : 'ক্ষীরের পুতুল', তৃতীয় মুদ্রণ, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৮৬, কলকাতা, পৃ. ১৩
৭. তদেব : পৃ. ৩৬-৩৭

গ্রন্থপঞ্জী

১. সত্যজিৎ চৌধুরী : 'অবনীন্দ্র নন্দনতত্ত্ব ও অন্যান্য প্রসঙ্গ', প্রথম সংস্করণ, কপোতাক্ষ, ২০০৪, কলকাতা
২. অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর : 'ক্ষীরের পুতুল', তৃতীয় মুদ্রণ, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৮৬, কলকাতা
৩. অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর : 'রাজকাহিনী', 'অবনীন্দ্র রচনাবলী', দ্বিতীয় খন্ড, ২য় সংস্করণ, প্রকাশ ভবন, কলকাতা, ১৯৮৭
৪. অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর : 'বুড়ো-আংলা', "অবনীন্দ্র রচনাবলী", তৃতীয় খন্ড, ১ম সংস্করণ, প্রকাশ ভবন, কলকাতা, ১৯৭৬,
৫. অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর : 'ভূত্পতরীর দেশ', 'অবনীন্দ্র রচনাবলী', দ্বিতীয় খণ্ড, ২য় সংস্করণ, প্রকাশ ভবন, ১৯৮৭, কলকাতা
৬. অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর : 'রবীন্দ্র রচনাবলী', ত্রয়োদশ খণ্ড, ১২৫-তম রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত সুলভ সংস্করণ, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৯১৩
৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : 'রবীন্দ্র রচনাবলী', নবম খণ্ড, ১২৫-তম রবীন্দ্রজন্মজয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত সুলভ সংস্করণ, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৯১১
৮. অনাথনাথ দাস ও বিশ্বনাথ রায় সম্পাদিত : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর সংগৃহীত "ছেলেভুলানো ছড়া", প্রথম সংস্করণ, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা.লি., কলকাতা, ১৪০২
৯. জয়িতা বাগচী সম্পাদিত : 'সুখলতা রাও রচনা সংগ্রহ ৩', প্রথম সংস্করণ, ২০০৪, থীমা এবং মানবীবিদ্যাচর্চা কেন্দ্র, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা
১০. সনৎকুমার মিত্র সম্পাদিত : 'রবীন্দ্রনাথ : লোকসংস্কৃতিচর্চার মুখবন্ধ বিশেষ সংখ্যা', তৃতীয় বর্ষ তৃতীয় সংখ্যা, (দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার : 'ঠাকুমার ঝুলি'), লোকসংস্কৃতি গবেষণা পরিষদ, বৈশাখ/আষাঢ় ১৩৯৯, পশ্চিমবঙ্গ
১১. পল্লব সেনগুপ্ত : 'লোকসংস্কৃতির সীমানা ও স্বরূপ', পরিশীলিত ও পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ, পুস্তক বিপণি, সেপ্টেম্বর, কলকাতা, ২০০২

❑ লোকসংগীত

টুসু গান ও নারী

মধুমিতা সরকার

সমাজ ও সভ্যতাকে গতিশীল করতে যুগে যুগে নারী পালন করে চলেছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। কিন্তু প্রায় সর্বক্ষেত্রেই সে তার যোগ্য সম্মান পায় না, যোগ্যতার স্বীকৃতি বা সঠিক পরিচিতি। জাগতিক নিয়মের স্বাভাবিক ছন্দে বয়ে চলা স্রোতস্বিনী নদীর মতো নারীর জীবন বয়ে যায় সমাজ গড়ে দেওয়া নিয়মের স্রোতে। পরিবর্তিত হয় সময়, ঘটে বাঁক বদল, রূপান্তরিত হয় নিয়ম-বিধি। কিন্তু নিষ্কৃতি পায় না নারী। সব দেশে, সব সমাজে, সব সময়েই পুরুষের সঙ্গে নারীর পার্থক্য থাকে স্পষ্ট। পুরুষের পাওয়ার ভাগ্য অনেক প্রসারিত, নারীর দেওয়ার ভাগ্য। পুরুষের জীবনে থাকে নানা রকম স্বপ্ন, আর নারীর জীবনের স্বপ্ন যেন একটাই-ঘর বাঁধা ও তাকে রক্ষা করা। তাই তো নানা কাজের পরেও তারা সংসারের বিভিন্ন কাজ করে নিষ্ঠার সঙ্গে ঘর সাজায়, সংসার ও প্রিয়জনদের মঙ্গলকামনায় পালন করে নানা ব্রত-পার্বণ, পূজা, আরাধনা করে। অভিজাত সংস্কৃতি বা শাস্ত্রীয় ধর্মের মধ্যে দিয়ে পালিত পুজো-পার্বণ নানা নিয়ম বিধির শৃঙ্খলে আবদ্ধ। কখনও বা পুরোহিতের নিয়ন্ত্রণাধীন হয়ে চলে, নারী সেখানে নিমিত্ত মাত্র। তবে লোকধর্ম ও লোকসংস্কৃতির মধ্যে দিয়ে পালিত ব্রত-পূজা-আরাধনা নিয়ম-বিধির নিগড়ে আবদ্ধ না থেকে ঘটায় সহজ সরল আন্তরিকতার প্রকাশ, হৃদয়ের স্বতঃস্ফূর্ত অভিব্যক্তি। এ যেন নগর জীবনের সমান্তরাল বয়ে চলা এক প্রতিবাদী প্রবাহ। টুসু পরব ও টুসু গানও এর অন্তর্গত। টুসু গান বাংলার লোকজীবনের এমন এক পরবের সঙ্গে যুক্ত, যে পরবে নিয়ম বিধি সমস্তই মেয়েদের দ্বারা সংঘটিত হয়। পুরো পৌষ মাস জুড়ে চলা টুসু পরবের মূল অঙ্গ টুসু গান। টুসু পরবের সমস্ত কিছুতে মেয়েদের প্রাধান্যের সঙ্গে সঙ্গে এই পরবের গানগুলোও সাধারণত মেয়েদের দ্বারা রচিত হয়।

পৌষ মাসের প্রথম দিন থেকে পৌষ সংক্রান্তি পর্যন্ত চলা টুসু পরব কোনও ধর্মের অনুশাসনে বন্ধ নয়, কোনও শাস্ত্রীয় আচারের সীমায়ও সীমিত নয়। এ পরব এমন এক উপজাতিক ঐতিহ্য যার সঙ্গে জড়িয়ে আছে লোকজীবন, লোকসংস্কৃতি ও লোকবিশ্বাস। জনমানসের অনাবিল আনন্দের অভিব্যক্তি হলো টুসু। এর উৎস-সূত্রপাত নিয়ে রয়েছে নানা মতভেদ। সেই বিতর্কে না গিয়ে বিভিন্ন গবেষকদের অনুসন্ধানী মতকে শ্রদ্ধা জানিয়ে বলা যায় যে, নানা ভাষা-মত-জাতির সহাবস্থান ভারতবর্ষে। টুসু পরব একাধারে লোকায়ত সমাজ, অস্ট্রিক ও হিন্দু-ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির সম্মিলিত এক রূপ। মূলত কৃষি উৎসব ও এর সঙ্গে মেয়েদের স্বামী-সতীত্ব-ভালোবাসার উৎসব টুসু। অগ্রহায়ণ সংক্রান্তির পরদিন অর্থাৎ পৌষ মাসের প্রথম দিন টুসু প্রতিষ্ঠা বা টুসু পাতার মধ্যে দিয়ে শুরু হয় টুসু পরব, চলে টানা একমাস এবং

এর সমাপ্তি ঘটে পৌষ সংক্রান্তির দিন পুকুর-নদী বা অন্য কোনো জলাশয়ে টুসু বিসর্জন দিয়ে। মূলত মহিলাদের দ্বারা চালিত এই পরবের প্রধান অঙ্গ হলো টুসু গান। গানই এই পরবের প্রাণ, গানের মধ্যে দিয়েই হয় উৎসবের আহ্বান-আয়োজন ও বিসর্জন। টুসু মূলত উদযাপিত হয় পুরুলিয়া, বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর—প্রধানত এই তিন জেলাতে। এছাড়া বীরভূম, ছোটোনাগপুরের মালভূমি, ঝাড়খণ্ডের কিছু অংশে, সুন্দরবন সংলগ্ন উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনার কিছু অঞ্চলে ইত্যাদি স্থানে টুসু পরব পালিত হয় উৎসাহের সঙ্গে। এই পরবের পুরোটাতেই নারীর প্রাধান্য—পরবের কেন্দ্রে রয়েছেন একজন নারী, এই পরব পালিত হয় নারীর দ্বারা। খুব স্বাভাবিক ভাবেই তাই এই পরবের প্রধান অঙ্গ টুসু গানের মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত হয় নারী-হৃদয়ের নানা অভিব্যক্তি-যন্ত্রণা।

রাঢ় অঞ্চলের গ্রাম জীবনের প্রাণস্পন্দনের স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত লোকসংগীত টুসুগান টুসু পরবের প্রধান অঙ্গ। এই পরবের উৎস বিষয়ে মতভেদ যতই থাকুক না কেন এ কথা সবাই স্বীকার করে নিয়েছেন যে, এর কেন্দ্রে রয়েছেন একজন রূপবতী-গুণবতী নারী। বিভিন্ন অঞ্চলভেদে অবশ্য এই নারীর জীবন কাহিনিতে পার্থক্য রয়েছে, যা এই পরবের উৎসের কাহিনি হিসেবে প্রচলিত। সেই পার্থক্যের বিতর্কে না গিয়ে এ কথা বলা যায় যে, সমস্ত কাহিনিতেই এই বিষয়টি স্পষ্ট যে, রূপবতী-গুণবতী এক নারী ভালোবাসা ও আত্মসম্মান রক্ষার জন্য যে আত্মত্যাগ ও আত্মবিসর্জন করেছিলেন, তাই তাঁকে দেবীতে উত্তীর্ণ করেছে। তবে টুসু লোকায়ত দেবী হলেও তাঁর দৈবী রূপের পরিবর্তে মানবী রূপই অনেক বেশি উজ্জ্বল। তাঁকে কামনাপূরণের দেবী হিসেবে না দেখে দেখা হয় সমাজেরই একজন অন্তরঙ্গা নারী রূপে—এটি আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ করে, যিনি নারীকুলের সর্বস্তরে ছড়িয়ে পড়েন বাস্তবতার হাত ধরে—

১. আমার টুসু একটা বিটি।
মানবাজারে শ্বশুর ঘর॥
কলসির উপর পালকি দিয়ে গো।
পালাই আইল বাপের ঘর॥
পালাই আলি ভালই করলি।
থাকবি বিটি দিন ধইরে॥
জামাই আইলে ঝগড়া কইরব গো।
কমরে গামছা বাঁইধে।
জামাই বইলে মাইনব নাই॥

২. আমাদের টুসু এক মাসের মতন।
তোখে কী দিয়ে বুঝাব ধন॥
আমাদের টুসু এক মাসের মতন।
ওকে বইল না শ্বশুর ঘর যাতে॥
ওযে পাবেক নাই ডাইল খাতে।
আমাদের টুসু একমাসের মতন॥
উকি পাবেক আর এমন যতন।
আমাদের টুসু এক মাসের মতন॥

৩. আমার টুসু চাল বাঁইটেছে।
পিঠা খাবেক বইলে॥
তোদের টুসু ছুঁড়বি বঠে।
আন দুয়ারে চাল মাগে॥

৪. খঁপার উপর জবা ফুলটি
কি সুন্দর সাজে ধনী
টুসু মায়ের ফুলকাটা বেণী
আমার দেখে জুড়ায় মনখানিগো
টুসু মায়ের ফুলকাটা বেণী

৫. আমার টুস মুড়ি ভাজে চুড়ি ঝলমল করে লো,
উয়ার টুসু অভিমানী আঁচল পেতে মাগে লো,
আর বুড়া চলতে নারে পথরে,
চাপায়ে দেব টেকসি মোটরে।

টুসু দেবীকে অবলম্বন করে লোক-মানসের নানা অভিব্যক্তি ফুটে ওঠে টুসু গানের মধ্যে দিয়ে। একান্ত ঘরোয়া ভাবনামূলক এই সমস্ত গানের মধ্যে দিয়ে টুসু দেবী না থেকে সহজেই হয়ে ওঠেন একান্ত আপনজন। ফলে টুসু গানগুলি ধর্মীয় সংগীত না হয়ে হয়ে ওঠে লোকসমাজের মানস-দর্পণ। পৌষ মাসের শুরু থেকে টানা একমাস ধরে চলা টুসু পরবে আনন্দের অস্তিত্ব স্তিমিত হয় পৌষ সংক্রান্তিতে টুসু বিসর্জনের সঙ্গে—এ সময় কণ্ঠে তাই ধ্বনিত হয় বেদনার সুর—

তিরিশ দিন রাখিলাম মাগো।
তিরিশটি ফুল দিয়ে গো॥
আর রাখিতে পারি না মা।
মকর আইল বাদি গো॥
টুসু যাবে ই বছরের মতন।
তোমরা হের সবে চাঁদ বদন॥

টুসু মেয়েদের দ্বারা আয়োজিত, অংশগ্রহণকারী প্রায় সকলেই মহিলা এবং গানগুলিও বেশিরভাগই মহিলা দ্বারা রচিত ঘরোয়া গান। কর্মমুখর ও গতানুগতিক জীবনের দৈনন্দিনতা সংসারে মেয়েদের জীবনে সাময়িক অব্যহতি ও বৈচিত্র্য এনে দেয় টুসু পরব ও টুসু গান। পৌষের প্রথম দিন টুসু প্রতিষ্ঠা করা হয় মেয়েদের দ্বারা। এরপর সারাদিন সংসারের নানা কাজ সম্পন্ন করে মেয়েরা সন্ধ্যাবেলায় চিড়েভাজা, চালভাজা ইত্যাদি ভোগ হিসেবে দিয়ে টুসু পুজো করে এবং দাওয়ায় বসে সমবেতভাবে টুসুগান গাইতে থাকে, যে গানের মধ্যে দিয়ে চলে টুসু বন্দনা ও জাগরণ—

সাধের টুসু এসো
আলস আঘন মাস ফুরায়ে গেল।
টুসুর আগমন শুনে
আনন্দে সব মাতিল।
ঘরে ঘরে মেয়ে পুরুষ পূজিতে বসিল।

কোনও পুরোহিতের পৌরহিত্য ছাড়া টানা এক মাস ধরে টুসু পরব চলে পুরুষবর্জিত হয়েই, তবে কখনো কখনো পুরুষের অংশগ্রহণ চোখে পড়ে, বিশেষ করে ভাসানের সময়। টুসুর আরাধনা চলার পাশাপাশি এই সমস্ত গানে দেখা যায় নানা বিষয়। যেমন সাংসারিক শিক্ষা বা বাস্তব জ্ঞানের প্রসঙ্গ উঠে আসে—

ভালোবাসা লয়রে মন
শেষে কানতে হয় যাবৎজীবন॥
ভাব শিকায়ে কুল ঘুচায়ে
কাঁদায় গো সারাজীবন।

এরই পাশাপাশি দেখা যায় নারীর দৈনন্দিন জীবনের নানা প্রসঙ্গ—প্রেম, দুঃখ, কষ্ট-যন্ত্রণা উঠে আসে এই গনের মধ্য দিয়ে—

❑ প্রেম-বিরহের প্রকাশ—

১. সোত কইরেছি এক গলা জলে,
তোকে ছাইড়ব না জীবন গেলে

২. আমার টুসু মান করেছে—মানে গেছে সারা রাত,
খোল টুসু মানের কপাট, আসছে তোমার প্রাণনাথ,
বেলা বারোটা বাজি গেল, তেলের বাটি-সাবান কই এল

❑ দৈনন্দিন জীবনের কথা—

১. চল টুসু চল জল আনিগা হীরা কচার জোড় ধারে

২. কে বলে রে কে বলে রে, আমার টুসু কালো রে,
বিষ্টুপুরী হলুদ এনে, গা করিব আলো রে।

❑ কুমারী হৃদয়ের প্রসন্ন কামনা টুসুর নামে ব্যক্ত হওয়া—

একলা ঘরে টুসুর মন কেমন করে
যেন শোল মাছে উফাল মারে।

❑ সতীন জ্বালা ও বিদ্বেষ প্রকাশ—

১. দু বুনে সতীন হব
সাকা সিন্দুর ভাগ করে লিব
আধলি বয়স বড়হা বরে

২. পিঁয়াজ কেটে রসুন লাগাব, তোদের বাবুগিরি ঘোচাব
আইল সতীন মারবি নাকি,
তোর মাইর খেয়ে যাব
তোর দুয়ারে বেচা গাইড়ে
তোকে বলিদান দিবে

❑ বৃদ্ধ স্বামীর জন্য যুবতী স্ত্রীর লজ্জা—

একশ টাকায় দিলি বাবা মা
দেখে দিলি বুড়ো বড়
বুড়োর সাথে যেতে হবে

নদীর ধারে ধারে গো
নদী দিককার লোকে বলে মা
এইটা তোমার কে বটে
লজ্জার কথা ঠাকুরদাদার ভাই বটে।

- বৃদ্ধ স্বামীর মৃত্যুতে দিশেহারা যুবতী নারীর বৈধব্যের হাহাকার—

ই বৎসর পোষ মাসের জাড়ে
বুড়ো মরল হে, কুঁকড়ে
ও বুড়া মরল, কিছুই বলল নাই
বুড়া আমার বিধান করল নাই
মরল বুড়া কিছুই বলল নাই।

- শ্বশুর বাড়ির যন্ত্রণার প্রকাশ—

কালটা ছুঁড়া মচমচা দাড়ি
আমি দাড়ি দেখে দৌড়মারি
আমি পায়রা খোপে ঢুকব না
শ্বশুর বাড়ি আমি যাব নাই

ইত্যাদি টুসুগানের ভিতর দিয়ে আরও কতো বিষয় যে এলোমেলো হয়ে প্রকাশ পায় তার সংখ্যা গণনা করা কঠিন। আসলে টুসু উৎসব কোনও শাস্ত্রীয় বা ধর্মীয় অনুষ্ঠান নয় বলে এর সংগীতে গার্হস্থ্য জীবনের নানা কথা প্রকাশ পায়। যারা এই গান গায় তা তাদেরই বাস্তব জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাজাত, তাই তো এ গান এতো আন্তরিক যার দৃষ্টান্ত মেলা ভার। এ গান নারী মনের পুরুষোচিত কৃত্রিম জীবনকথা নয়, এ গান নারী কর্তৃক নারী জীবনের আন্তরিক স্বীকারোক্তি যা অতিরঞ্জন দ্বারা কৃত্রিম নয়।

নারীর জগৎ অন্তঃপুরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, পুরুষের মতো বহির্জগৎকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয় না। বাইরের জগতের সঙ্গো যোগাযোগ করতে হলেও নারীকে পুরুষের সহায়তা নিতে হয়। অত্যাচারিতা হলে তারা তাকে আপন ভাগ্যের দোষ মনে করে। শাস্ত্রানুমোদিত পুজো-অর্চনায় নারীর ভূমিকা গৌণ, সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রেই তা লক্ষিত হয়—পুজোর আয়োজন করে দেওয়া বা নির্বিঘ্নে পুজো সম্পন্ন করার জন্য সহায়ক রূপে নানা কাজে নারীর সীমাবদ্ধতা। তাই বলা যায় যে, পুরুষতান্ত্রিক এই সমাজ ব্যবস্থার নিয়ম-নীতির বিরুদ্ধাচারণ করে যেন প্রতিবাদ স্বরূপই টুসু পরব উদযাপন করা হয় টুসুগানের মধ্যে দিয়ে। এই পরবের সমস্তই মেয়েদের দ্বারা সংঘটিত—টুসু পাতা থেকে শুরু করে বিসর্জন—চৌডালা বানানো গীতের মাধ্যমে সন্ধ্যাকালীন পুজো ইত্যাদি সমস্তটাই। টুসুর প্রতীক সাদামাটা, অঞ্চল বিশেষ ভিন্ন মাটির সরা-রং-সিঁন্দুর-গোবর-তুষ-ঘট ইত্যাদি দ্বারা বিভিন্ন অঞ্চলে টুসুর প্রতীক বিভিন্ন ভাবে গড়ে ওঠে। আবার কখনো মূর্তি পুজো হলে সেই মূর্তি গড়ে তোলে মেয়েরা পুতুলের মতো করে। টুসু গানগুলোতে সুরের বৈচিত্র্য তেমনি পাওয়া যায় না—গান ও ছড়ার মাঝামাঝি একটা রূপ পাওয়া যায় টুসুগানে। প্রথাগত তালিম না থাকায় মেয়েদের দ্বারা গীতও অনেক ক্ষেত্রে রচিত, এ সমস্ত গানে সুর-স্বর ও তালের নিখুঁত পরিপাট্য না থাকাটাই স্বাভাবিক। গানগুলো গাওয়া হয় সহজ-সরল প্রাণের আবেগে। বাদ্যযন্ত্রের বাহুল্যও তেমন দেখা যায়

না। মেয়েদের দ্বারা আয়োজিত-পালিত টুসু পরব সহজ-সরল নারী হৃদয়ের আন্তরিকতায় পূর্ণ। যে নারী তার অস্তিত্ব রক্ষার জন্য সর্বতোভাবে পুরুষের উপর নির্ভরশীল, সেই নারী টুসু পরবে পুরুষের অধিকারকে খর্ব করেছে। পুরুষের একছত্র আধিপত্যের স্থানে নিজেদের অধিকারকে প্রতিষ্ঠা দিয়ে পুরুষশাসিত সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে যেন নারী প্রতিবাদ ঘটিয়েছে। মেয়ে হয়ে কেউ জন্মায় না, জন্মানোর পরে সমাজের সযত্ন প্রয়াসে একজন শিশু মেয়ে হয়ে ওঠে। পারিবারিক ও সামাজিক স্থায়িত্বের দোহাই দিয়ে নারীর কাজকে পুরুষের অধীন স্থাপন করা হয়। পরিস্থিতি বর্তমানে অনেকটা বদলালেও, মেয়েরা লেখাপড়া-কাজকর্ম ইত্যাদিতে এগিয়ে গেলেও এক অদৃশ্য লক্ষ্মণরেখা তাদের ঘিরে থাকে সর্বদা। সেই স্থলে পুরুষের সহায়তা ছাড়া নারীর একমাস ধরে পরব পালন সত্যিই ভাবনাকে নতুন দিশা দেয়। তবে বর্তমানে টুসু গানের বাণিজ্যিকরণের হাত ধরে পুরুষ প্রাধান্য ঘটে নারীর অধিকার এই পরব থেকে খর্ব হচ্ছে। এ যেন বৃহত্তর আঙিনা থেকে ক্ষুদ্রায়তন জমিতে সীমাবদ্ধ করার প্রয়াস টুসু পরব ও গানে মেয়েদের ভূমিকাকে। তবে এই পরবের মধ্যে দিয়ে নারীর স্বাধীনতা-অধিকার একমাস ধরে সাময়িকভাবে হলেও প্রতিষ্ঠা পায়। এমন কি পুরোহিতের অংশগ্রহণও এতে থাকে না। অবদমিত নারীর নিজেকে অধিকার প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা এই পরবের হাত ধরে যেন রূপ পায়।

তথ্যের সন্ধানে

১. ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য : 'বাংলার লোকসাহিত্য', তৃতীয় খণ্ড, ক্যালকাটা বুক হাউস, প্রথম প্রকাশ ১৯৫৪
২. ছন্দা ঘোষাল : 'টুসু কথা', বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ১৪১২
৩. ড. দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায় : 'টুসু ও ভাদু : তুলনা ও বিশ্লেষণ', বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ২০১২
৪. বরুণকুমার চক্রবর্তী : 'লোকসাংস্কৃতির সুলুক সন্ধানে', পুস্তক বিপণি, জুন ২০১০

ভাদুগান : উৎস ও বিবর্তন

অমিত মণ্ডল

ও ভাদুরাণী জগৎজননী
এসেছো শরৎকালে গো
ও ভাদুমণি চরণ দুখানি
পূজিব মনের সাধে গো

রাঢ় বাংলার মানুষের ভাদুকে নিয়ে তাদের হৃদয়ের সারৎসার ঝরে পড়ে ভাদুগানে। ভাদুগান মূলত রাঢ় বাংলার গান। গ্রাম বহুল রাজ্য ভারতবর্ষ তথা পশ্চিমবঙ্গ। জনসংখ্যার সিংহভাগ মানুষই গ্রামে বসবাস করেন। বাঙালি সংস্কৃতির ধারক-বাহক এই গ্রামবাংলার মানুষজন। শহরের জীবন যেখানে আড়ম্বরপ্রিয়তায় ঢাকা, সেখানে গ্রামবাংলার মানুষজন খোলামেলা, তাদের কোনো রাখঢাক নেই। তাই তাদের জীবনযাত্রা কপটতাহীন খোলামেলা। সেই উদার পরিবেশে তাদের সজীব করে রাখে অনাদিকাল বংশ পরম্পরায় প্রচলিত উৎসব, অনুষ্ঠান, পরব-সংস্কৃতি ইত্যাদি। ভাদুগান রাঢ়ের গ্রাম বাংলার মানুষের জীবনভূমিতে অচ্ছেদ্য অংশ। শরৎকালের ভাদ্রমাসে অনুষ্ঠিত এই ভাদু পরব, যেখানে জড়িয়ে রাঢ় বাংলার মানুষের আবেগ-প্রাণ।

সাহিত্য-সংস্কৃতির সাধারণত দুটি ধারা—একটি শিক্ষাগত ধারা, অপরটি লৌকিক। লৌকিক ধারার বাহক সাধারণ মানুষ—যা তাদের মুখে মুখে রচিত, প্রচারিত ও বাহিত হয়। লোকসাধারণ এই ধারার বাহক বলে এই ধারার অপর নাম Folklore বা লোকসাহিত্য। বাংলার লোকসংস্কৃতির বহু ধারা, অঞ্চল বিশেষে সেগুলি প্রসিদ্ধিলাভ করেছে। কৃষিজীবী, শ্রমজীবী মানুষেরা সারাদিন পরিশ্রমের পর তাদের বেঁচে থাকার আনন্দের উপকরণ করে তোলে—বোলান, বাউল গান, কবি গান, রামায়ণ গান, ছৌ-নাচ, ঝুমুর নাচ ইত্যাদিকে। লোকসংস্কৃতির একটি বিশেষ শাখা এই ভাদুগান। লোক শব্দের অর্থ 'জন' বা 'মানুষ'; আর রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—'সভ্যতা বৃক্ষের একটি পুষ্পিত শাখার নাম সংস্কৃতি।' লোকসংস্কৃতির বৃত্তে ভাদুগান হলো মানুষের উৎসব—লোকউৎসব। আনন্দই এই উৎসবের মূল কথা।

ভাদ্র মাসে অনুষ্ঠিত এই ভাদু পুজো, যা পূর্বে ছিল ভাদুব্রত। আমরা জানি, কোনো কিছু কামনা করে যা পালন করা হয় তাই ব্রত। ভাদু ব্রত ছিল কুমারী মেয়েদের হৃদয়ের গান। ভাদু ব্রতকথা ছিল ধান ওঠাকে কেন্দ্র করে। তখন এই ভাদু ভাদুলক্ষ্মী হিসেবে পূজিত হতো। ভাদ্র মাসে মাঠের কিছুটা স্থান পরিষ্কার করে ভাদ্রলক্ষ্মীর পুজো বা ভাদুপুজো হতো। 'ভাদু'

মানে লক্ষ্মী। যেহেতু লক্ষ্মী বিভিন্ন সময়ে পূজিত হয়, তাই ভাদ্রমাসের লক্ষ্মীকে পৃথকভাবে চিহ্নিতকরণের জন্য ভাদু পুজো প্রচলিত ছিল। শুধুমাত্র ধানকে উপকরণ হিসাবে ব্যবহার করে এক লক্ষ্মীমূর্তিকে পরিধানে কাপড় পরিয়ে এই পুজোর প্রচলন ছিল। পরবর্তী সময়পর্বে এই ব্রতকথার সূত্রে এসেছে পেঁচা-পেঁচির নাম। ভাদ্রলক্ষ্মীর সঙ্গে স্থান পেয়েছে পেঁচাও।

বিবর্তনের সময়পথে ভাদু কথায় ব্রতকথার আদলটি রূপান্তরিত হয়েছে। রাঢ় বাংলার মানুষ ভাদুকে আরও আপন করে নিয়েছে। ভাদু হয়ে উঠেছে ঘরের মেয়ে। এর কারণ ভাদুকে কেন্দ্র করে জড়িয়ে আছে কিছু কিংবদন্তী, কিছু ইতিহাস। বর্তমান সময়ে লক্ষ্মীদেবীর পুজো হলেও ভাদুমূর্তির কোনো পুজো পাঠ হয় না। শুধু গান গাওয়া হয় ও গান বাঁধা হয়। ভাদ্র মাসের সন্ধ্যার দিকে একদল মানুষ ভাদুগান করতে করতে উপস্থিত হয়। সঙ্গে থাকে মূল গায়েন ও দোহারের দল। অল্পবয়স্ক একজন অথবা দুজন মেয়ে সেই গানের সঙ্গে তালে তালে নেচে চলে। আর ভাদুমূর্তিকে গ্রামের বধূরা সিঁথিতে ও পায়ে সিঁদুর দিয়ে ঘরের মেয়ে করে নেয়। আশুতোষ ভট্টাচার্যের ভাষায় ভাদুগান কুমারী হৃদয়ের গান। তিনি লিখেছেন—

> ভাদ্রমাসের সমস্ত রাত্রি জাগিয়া এই অঞ্চলের সকল শ্রেণিরই প্রধানত কুমারী মেয়েরা ভাদু নামক দেবীর প্রতিমা সম্মুখে রাখিয়া এই লোকসংগীত গাহিয়া থাকে। এই সংগীতের ভিতর দিয়া ভাদ্রের ভরা প্রকৃতির পটভূমিকায় কুমারী হৃদয়ের বিচিত্র সুখ দুঃখের অনুভূতি ব্যক্ত হয়।[১]

সবশেষে গায়েন দল ফিরে যাওয়ার সময় চাল, আলু, দক্ষিণা হিসেবে টাকা নেয়। সনৎ বাউলের ভাদুগানে রয়েছে তারই পরিচয়—

> গাহিতে তব গান করেছি বাসনা
> আশান্বিত জনে করো না বঞ্চনা।
> দ্বারে দ্বারে ঘুরি তোমারি কথকতা
> ভিক্ষা দাও বলে দাও গো।

ভাদুগানের উৎস অনুসন্ধান করতে গিয়ে দেখা যায় সেখানে ছড়িয়ে আছে নানা কাহিনি, কিংবদন্তী। অবশ্য বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকার ড. সুকুমার সেন মনে করেছেন—"ভাদ্র মাসের উৎসব ইন্দ্রপূজার সঙ্গে অথবা বাস্তুপূজার সঙ্গে মিলে গিয়ে ভাদু পরবের উৎপত্তি হয়েছে।"[২] ভাদুর সঙ্গে জড়িত এই কৃষিসংস্কৃতির পরিচয় পেতে গিয়ে আমরা দেখতে পাই পুরুলিয়ার অধিবাসীদের চাষকৃত ফসল 'ভাদুই'—যা পঞ্চশস্যের সমষ্টি। এগুলি হলো—ধান, বিড়িকলাই, রামকলাই, ভুট্টা, মারোয়া। বাঙালি জীবনেও ভাদ্র মাসে সরাতে 'শোষ' বা শস্যপাতা প্রথা প্রচলিত। যার সঙ্গে জড়িয়ে আছে 'ভাজো' নামক কৃষিসংস্কৃতির পরিচয়টি। যদিও 'ভাজো' ও 'ভাদু' এক নয়। পুরুলিয়ার পঞ্চকোট রাজপরিবারের কন্যা ভদ্রাবতীর কাহিনি ভাদুর গানে জড়িয়ে যাওয়ায় ব্রতকথার আদল থেকে ভাদু হয়ে উঠেছে মৃন্ময়ী। এই ভাদুমূর্তিকে পুজো করা হয় না—শুধু ভোগ নিবেদন ও সিঁদুর সিঁথি, পায়ে দিয়ে প্রণাম করা হয়।

ভাদুগানের আধুনিক রূপাবয়বে ছড়িয়ে আছে নানা কাহিনি। সেই কাহিনির উৎস সন্ধানে আমাদের ফিরে যেতে হয় পুরুলিয়ার কাশীপুর রাজবাড়িতে। সেখানে ভাদুর নাম ভদ্রাবতী। ভদ্রাবতী পুরুলিয়ার রঘুনাথগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত কাশীপুরের রাজা নীলমণি সিংদেওয়ের কন্যা। পঞ্চকোট রাজবংশের কন্যা ভদ্রেশ্বরী বেঁচেছিলেন সতেরো বছর। বিবাহের আগের

দিন অর্থাৎ গায়ে হলুদের দিন কোনো এক আকস্মিক কারণে ভদ্রাবতীর মৃত্যু ঘটে। তবে ভাদুর মৃত্যুর পিছনে প্রণয়ঘটিত কারণ উপস্থিত করা হয়। সেখানে ভাদুর অন্ত্যজশ্রেণির যুবককে ভালোবাসার কথা—পিতা না মেনে নেওয়ায় ভাদুর আত্মহত্যার কথা বলা হয়। আবার বলা হয়, ভাদুর বিবাহ ঠিক হয়েছিল বর্ধমানের রাজকুমারের সঙ্গে। বিবাহের দিন বরবেশে যাত্রাপথে রাজকুমারের মৃত্যু ঘটে লেঠেলদের হাতে। ভাদু এই খবর শুনে আত্মহত্যা করে। কন্যাকে হারিয়ে রাজা শোকাহত হয়ে পড়েন। এরপর প্রজাকুলের ইচ্ছায় পাত্র-মিত্র-মন্ত্রীদের সহযোগিতায় শুরু হয় ভাদুর স্মৃতির তর্পণ। সেই থেকে রাজানুগ্রহে ভাদু কাহিনি পেয়েছে নতুন ব্যঞ্জনা। প্রসঙ্গত স্মর্তব্য যে, চাঁদ সদাগর কর্তৃক মনসা পুজোর আগে অনার্য সম্প্রদায়ের মধ্যে মনসাপুজোর প্রচলন ছিল। 'চৈতন্যভাগবত'-এ আমরা তার প্রমাণ পেয়েছি। তেমনি ভাদুপুজোর প্রাচীনরূপটিও ছিল; কাশীপুরের রাজপরিবারের বদান্যতায় ভাদু গান পেয়েছে নতুন রূপ। রাঢ়ের বিভিন্ন জেলায় ভাদুগানের প্রচলন থাকলেও বীরভূমেই ভাদুগানের প্রসার সর্বাধিক।

লোকসংগীতের একটি বিশিষ্ট ধারা ভাদুগান। লোকসংগীতে থাকে একটা সার্বজনীন আবেদন। ভাদুগানের নৃত্য ও গীতের ছন্দ আকৃষ্ট করে সহজেই। তবে নৃত্য ও গীত পরিবেশনই ভাদুগানের মূল লক্ষ্য নয়, এর সঙ্গে জড়িয়ে থাকে আধুনিক সমাজমন। ভাদুর জন্মবৃত্তান্ত প্রসঙ্গটি উঠে এসেছে ভাদুশিল্পী সনৎ বাউলের লেখায়—

মানভূম জেলার কাশীপুরে
জন্মায় লো ভাদু রাজার ঘরে।
আনন্দে রাজার মন ভরিল
ভাদু এল শরৎকালে।

তবে ভাদুর অকালমৃত্যুর প্রসঙ্গ থাকায় ভাদু হয়ে উঠেছে কুমারী নারীর হৃদয়ের গান। ভাদুর হবু স্বামীর মৃত্যুতে লোকশিল্পী গান বাঁধলেন—

ওগো হলো না হলো ভাদুর বিয়ে হলো না,
ভাদুমণি তাই অভাগিনী বলে জীবন রাখবো না। (সনৎ বাউল)

আবার ভাদুগানে বৈষ্ণব পদাবলীর আবেগ আনার জন্য ভাদুশিল্পীরা ভাদুকে কৃষ্ণলীলার রাধার সাদৃশ্যে অঙ্কন করেছেন—

প্রাণ ভাদুরে বনের মাঝে নাম ধরিয়া বাঁশি বাজায় কে
বাঁশির সুরে আমি রইতে নারি ঘরেতে। (সনৎ বাউল)

এই ভাদুই হয়ে উঠেছে বাঙালি ঘরের ছোট্ট মেয়ে, ভাদুশিল্পী চন্দ্রশেখর মণ্ডলের কথায় উঠে এসেছে সেই প্রসঙ্গ—

আমার ভাদু ছোটো মেয়ে কাপড় পরতে জানে না
ভাদু গা দুলাতে জানে না।
আমার ভাদু ছোটো মেয়ে রান্না করতে জানে না,
মুড়ি ভাজতে জানে না।

ভাদুকে কেন্দ্র করে রচিত এই ভাদুগান। ভাদুকথাই সেখানে মুখ্য। কিন্তু সময়ের বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভাদুগান সমাজ মনকে আত্মীকরণ করেছে, কখনও সেখানে ফুটে উঠেছে কদর্য

দৃশ্যপট। ভাদুশিল্পী ক্ষুদিরাম লেখেন—

ভাদু কলিকালের কথা—শোনো বলি তা
মেয়েছেলে বেড়ায় কত হেলে দুলে—মাথায় কাপড়টা খুলে
তারা স্বাধীনে চলে।

কিংবা, লোকশিল্পী রঘুনাথ সময়ের প্রেক্ষিতে ভাদুকে নিয়ে গান বাঁধেন—

ও ভাদু চলনা, সিনেমা দেখিতে
যাব আমরা দু জনাতে।
চল ভাদু সিনেমা হলে
চলছে সেথায় অমিতাভ বচ্চনের শোলে।

এইসব ভাদুগানে ভাদুকে আধুনিকতার মোড়কে মুড়ে ফেলা হয়েছে। ভাদুগানকে কেন্দ্র করে তার বিভিন্ন রূপ আমরা পেয়েছি। কখনো সেই গানে মিশ্রিত হয়েছে ব্রতকথার সুর, পাঁচালির সুর, কখনওবা জনপ্রিয় হিন্দি বা বাংলা গানের সুর। তবে সময়ের বদলের সঙ্গো মানুষের রুচিরও বদল ঘটেছে। ভারতবর্ষের অধিকাংশ মানুষ কৃষিজীবী হলেও সেই কৃষিভিত্তিক সমাজ আর নেই। ভিন্ন ভিন্ন কর্মসংস্থানের পথে মানুষ। ফলে ভাদুগান কয়েকজনের কাছে নেশা হলেও পেশা হয়ে ওঠেনি। দিনের বদলের সঙ্গো লোকসংস্কৃতির এই বিশেষ ধারাটিও অবলুপ্তির পথে।

তথ্যের সন্ধানে

১. সহযোগিতায়
সনৎ বাউল : বীরভূম জেলার নানুর থানার অন্তর্গত কুরুম্ব ঘোষ গ্রামের অধিবাসী এই সনৎ বাউল। আসল নাম সনৎ লোহার। ছোটো থেকেই গানের প্রতি ভালোবাসা তার। বাউল গান বাঁধা ও সুর দেওয়া তার স্বভাবজাত। এলাকায় তিনি পরিচিত 'সনৎ বাউল' নামে। তবে শুধু বাউল গানই নয়, ভাদু গান রচনা ও তাতে সুর সংযোজন তার প্রতিভারই আরেকটি দিক। তাই তিনি একাধারে বাউল শিল্পী ও ভাদু শিল্পী। প্রবন্ধে উল্লিখিত গানগুলি তাঁর স্বরচিত এবং তাঁর প্রবন্ধে উল্লিখিত বিভিন্ন শিল্পীর ভাদুগানগুলি সনৎ বাউল সংগৃহীত পাণ্ডুলিপি থেকে নেওয়া হয়েছে। প্রবন্ধটির রচনায় ভাদু গান বিষয়ক বহু তথ্যের সন্ধান দিয়েছেন সনৎ বাউল।

১. আশুতোষ ভট্টাচার্য : 'বাংলার লোকসাহিত্য', ৩য় খণ্ড, ক্যালকাটা বুক হাউস, ১৯৯৬, পৃ. ১২
২. সুকুমার সেন : 'শেখ শুভদয়', ২০০২, পৃ. ২৩

মালদা জেলার গম্ভীরা চর্চা

রোকেয়া পারভীন

লোকসাহিত্য লোকসংস্কৃতির একটি জীবন্ত ধারা। এর মধ্যে জাতির আত্মার স্পন্দন শোনা যায়। তাই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একে 'জনপদের হৃদয় কলরব' বলে আখ্যায়িত করেছেন। বিশেষ প্রয়োজনে ও সৃষ্টির আনন্দে গোষ্ঠীসমাজ প্রাথমিক অবস্থায় যে মৌখিক সাহিত্যের জন্ম দেয়, তা ব্যাপক অর্থে লোকসাহিত্য বলে পরিচিত। একক মানুষ এর সৃষ্টি করলেও সমগ্র সমাজ যখন এই সাহিত্যকে মেনে নেয়, তখনই তা বংশপরম্পরায় বয়ে চলে। সাধারণত অক্ষরজ্ঞানহীন পল্লিবাসীরা স্মৃতি ও শ্রুতির উপর নির্ভর করে এর লালন করে। সমষ্টির চর্চায় তা পুষ্টি ও পরিপক্কতা লাভ করায় লোকসাহিত্য সমষ্টির ঐতিহ্য, আবেগ, চিন্তা ও মূল্যবোধকে ধারণ করে। বিষয়, ভাষা ও রীতির ক্ষেত্রে প্রচলিত ধারাকেই অনুসরণ করা হয়। এই লোকসাহিত্যের অধিকাংশ শাখায় রচনাকারের নাম পাওয়া যায় না। তবে কিছু বিভাগে রচনাকারের নাম পাওয়া যায়। কল্পনাশক্তি, উদ্ভাবন, ক্ষমতা ও পরিশীলিত চিন্তার অভাব থাকলেও লোকসাহিত্যে শিল্পসৌন্দর্য, রস ও আনন্দবোধের অভাব থাকে না। লোকসাহিত্যকে প্রধানত লোকসংগীত, গীতিকা, লোককাহিনি, লোকনাট্য, ছড়া, মন্ত্র, ধাঁধা ও প্রবাদ এই আটটি শাখায় ভাগ করা যায়। আর লোকনাট্যের একটি শাখা হল গম্ভীরা। আমার আলোচ্য বিষয় মালদা জেলার গম্ভীরাচর্চা।

মালদা জেলার অন্যতম লোকসংস্কৃতি বা উৎসব গম্ভীরা; যা একান্তভাবেই মালদার এবং বর্তমানে এই জেলার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। গম্ভীরার ইতিহাস প্রায় দেড় হাজার বছরের পুরনো। অন্ত্যজ গ্রামীণ মানুষরা দারিদ্র্যকে জয় করে এই গান গায়। অনেকে আবার গম্ভীরাকে পালা বা গান হিসাবে মনে করে। তবে এই গানসহ সমস্ত আচার, অনুষ্ঠান, পুজোপার্বণ গম্ভীরা উৎসবেরই অঙ্গ। অনেক স্থানে এই গানের ভিন্নতা লক্ষ করা যায়।

তবে প্রাচীনকালে চণ্ডীমণ্ডপের ন্যায় গৃহকে গম্ভীরা বলা হতো। আর সেখানেই সমস্ত আচার, পুজো, উৎসব, নৃত্য করা হয় বলে এই উৎসবকে গম্ভীরা বলে অভিহিত করা হয়। তাই 'গম্ভীরা' শব্দের প্রকৃত অর্থ দেবদূত আরাধনা বা ধর্মসংক্রান্ত কোনো গৃহকেই বোঝায়। মালদা, রংপুর, দিনাজপুরে 'গম্ভীরা' শব্দের এই অর্থের প্রয়োগ দেখা যায়। রাঢ় অঞ্চলে যে গাজন উৎসব, তা মালদায় আদ্যের গম্ভীরা নামে পরিচিত হয়েছিল কিন্তু বর্তমানে তা গম্ভীরা নামে পরিচিত। গম্ভীরা উৎসব হর-পার্বতীর পূজানুষ্ঠান। সূর্যপুজো, ধর্মপুজো, শৈবপুজো-মহাদেবের মধ্যে দিয়ে তা শিবপুজোয় পরিণত হয়েছে। এ সম্পর্কে হরিদাস পালিত তাঁর

'আদ্যের গম্ভীরা' গ্রন্থে বলেছেন—

> গম্ভীরা যখন শিব-মন্দির ও দেবস্থান বুঝাইতেছে, তখন শিবাদির পূজা গম্ভীরাতেই হইত। শিবোৎসবাদি তথায় অনুষ্ঠিত হইত। এদেশের লোকে গম্ভীরায় শিবের পূজা করিত। কালক্রমে গম্ভীরার শিবোৎসব গম্ভীরা পূজা নামে প্রচলিত হইয়া পড়িয়াছে।[১]

গম্ভীরা মূলত রাজবংশী, চাঁই, কোচ, মাহালী সম্প্রদায়ের মধ্যেই বেশি জনপ্রিয়। প্রথম পর্যায়ে নিম্নবর্গের হিন্দুদের মধ্যে গম্ভীরার প্রচলন থাকলেও পরবর্তীতে উচ্চবর্ণের মধ্যেও প্রভাব বিস্তার করে। গম্ভীরা মূলত চৈত্র মাসে চারদিন ধরে হয়ে থাকে। তবে কোথাও কোথাও তিনদিন বা সাতদিনও হয়ে থাকে। চৈত্র মাস ছাড়াও বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে এমনকি শ্রাবণ মাসেও এই পুজো হয়। এই গম্ভীরা উৎসবের কয়েকটি পর্যায় লক্ষ করা যায়। এই উৎসব বা গান চড়ক পুজোর চারদিন আগে থেকে শুরু হয়। চৈত্র মাস যদি ত্রিশ দিনে হয় অর্থাৎ, সংক্রান্তি ত্রিশ তারিখে হইলে ২৬ তারিখে গম্ভীরার 'ঘটভরা', ২৭ 'ছোটতামাসা', ২৮ 'বড়তামাসা', ২৯ 'আহারা' এবং ৩০ চড়ক পূজা হয়ে থাকে।[২]

প্রথম দিন—ঘটভরা : এটি সাধারণত ছোটোতামাসার আগেরদিন করা হয়ে থাকে। তবে সব জায়গায় সেই নিয়ম অনুসরণ করা হয় না। অঞ্চল বিশেষে নিজেদের প্রথানুসারে কোথাও নয়দিন, আবার কোথাও তিনদিন আগে ঘট স্থাপন করা হয়। প্রধান ভক্ত তথা মূল সন্ন্যাসী গম্ভীরা পুজোর উপকরণ জোগাড়ে সাহায্য করেন এবং প্রথানুসারে নিয়ম পালন করেন। ঘট স্থাপনের দিন থেকে গম্ভীরা গৃহে প্রদীপ জ্বালানো হয়। এক-একটি গম্ভীরা এক একটি মণ্ডলের অধীনে থাকে। মণ্ডল ছাড়া কোনো গম্ভীরা দেখা যায় না। ভিন্ন ভিন্ন জাতির গম্ভীরার মণ্ডল বা মোড়ল থাকলেও সকল জাতির একটি আদি গম্ভীরা বর্তমান—যা ছত্রিশী গম্ভীরা নামে পরিচিত। এই গম্ভীরায় সব মণ্ডলের একজনমাত্র মূল মণ্ডল থাকেন। ঘট ভরার দিন মণ্ডলের নির্দেশে একটি সভা ডাকা হয় এবং সর্বসম্মতিক্রমে ঘট স্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। মণ্ডল সব শেষে অনুমতি প্রদান করলে সন্ধ্যার পর ব্রাহ্মণ চিরন্তন প্রথানুসারে ঢাক-বাদ্য সহকারে কাছে অবস্থিত কোনো নির্দিষ্ট জলাশয় থেকে ঘটে জল ভর্তি করে শাস্ত্রমতে গম্ভীরার গৃহে সেই ঘটস্থাপন করেন। এইদিন আর কোনও অনুষ্ঠান হয় না।

দ্বিতীয়দিন—ছোটোতামাসা : ছোটোতামাসার মধ্যে দিয়ে গম্ভীরার সূচনা হয়ে থাকে। সেই দিনই হর-পার্বতীর পুজো হয়। যারা শিবের কাছে মনোবাসনা পূরণের জন্য মানত করে, তারা 'ভক্ত' নামে পরিচিত। অধিকাংশ ক্ষেত্রে বালকরাই এই ভক্ত শ্রেণিভুক্ত হয়ে থাকে বলে তাদেরকে 'বালাভক্ত' বলে। ছোটোতামাসা ও বড়োতামাসার সন্ধ্যায় ভক্তরা গম্ভীরা মণ্ডপে উপস্থিত হয়ে প্রধান ভক্তের নির্দেশে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে থাকে এবং বন্দনার এক একটি অংশ উচ্চারণের সঙ্গো সঙ্গো দুই পা সামনে এগিয়ে আবার পেছনে ফিরে আসে। শিবগড়ার অনেক বন্দনা গাওয়া হয়। যেমন মালদার ধানতলার শিবগড়ার বন্দনা—

> কোথা হইতে আইলেন গোঁসাই, কোথায় তোমার স্থিতি।
> আহার নাই, পানি নাই আস নিতি নিতি॥
> জল নাই, স্থল নাই সকল শূন্যাকার।
> কর্পূরেতে ভর কর পবন আহার॥[৩]

অঞ্চলভেদে কোথাও আবার উপবাসী ভক্তগণ কাঁটার বিছানা করে তাতে গড়াগড়ি দিলে মুখ্য বন্দনা গায়ক শিবগড়ার বন্দনা গায়। বন্দনার কিছুটা অংশ বলা হলে মণ্ডপে উপস্থিত সকলে সমস্বরে 'শিবনাথ কি মহেশ' বলে ওঠে। গম্ভীরা প্রাঙ্গাণে গড়াগড়ির মধ্য দিয়ে ভক্তগড়া অনুষ্ঠানটি সম্পূর্ণ হয়। আবার অনেক বন্দনার মধ্যে ধর্ম নিরঞ্জনের সৃষ্টি প্রকরণের উল্লেখ পাওয়া যায়। মালদার কাশিমপুরের কাছে মণ্ডলবংশীয় মিছুলাল দাসের বন্দনায় তা স্পষ্ট-

ধবল বরণ প্রভু ধবল বসন।
ধবল খাটে বসে আছেন ধর্মনিরঞ্জন।...
জন্ম হইল ধর্ম গোঁসাই গুনে অনুপমা।
পৃথিবী সৃজিঞা তেঁহো রাখিবে মহিমা॥
মুখের অমৃত ধর্মরে খসিঞা পড়িল।
হস্তপদ পৃথিবীতে জল উপাজিল॥[৫]

ছোটোতামাসার দিন রাত্রিবেলায় নাচ-গান-মুখানৃত্য হয়। একক ও সমবেত উভয় নৃত্য প্রদর্শিত হয়। এই মুখানৃত্য আজও গম্ভীরার উৎসব অনুষ্ঠানে সমানভাবে জনপ্রিয়। পুরাতন মালদায় এর প্রচলন সব থেকে বেশি।

তৃতীয়দিন—বড়োতামাসা : এইদিনে হর-পার্বতীর পূজা হয়। দুপুরের পর বালক-যুবক-বৃদ্ধ সকল ভক্তগণ বাদ্যের সহযোগে শোভাযাত্রা করে এক গম্ভীরা থেকে অন্য গম্ভীরায় গমন করে। ভক্তগণের মধ্যে ভূত, প্রেত, প্রেতিনী, বাজিকর, বাজিকরের স্ত্রী, রামাত, তুবড়ীওয়ালা, সাঁওতাল প্রভৃতি ছদ্মবেশ ধারণ করে। দিন অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পর সন্ধ্যায় 'হনুমান মুখা' অনুষ্ঠান হয়। একজন ব্যক্তি হনুমান সাজে এবং দুইজন ব্যক্তি একই বস্ত্র ধারণ করে দাঁড়িয়ে থাকে। পরে হনুমানের লেজে আগুন দেওয়া হয়। হনুমান পর্বের পর বালাভক্তরা 'শিবনাথ কি মহেশ' বলতে বলতে বাদ্য সহকারে কণ্টকী গাছের নরম পাতা, সিদ্ধি গাছের সঙ্গো একটি তাড়া বেঁধে বুকে ধারণ করে নির্দিষ্ট জলাশয়ে স্নান করে গম্ভীরা মণ্ডপে ফিরে আসে এবং বুকে ধারণ করা কাঁটা গুচ্ছ গম্ভীরা প্রাঙ্গাণে এসে রক্ষা করে। ব্রাহ্মণ পুরোহিতের আশীর্বাদে সেই কাঁটাগুচ্ছ ফুল ভক্তরা হাতে নিয়ে শিবকে প্রণাম করে শিব-গম্ভীরা প্রাঙ্গাণে রক্ষা করে। রাত্রি ৯টা থেকে ভূত, প্রেত, রাম, লক্ষ্মণ, শিব-দুর্গা, বুড়াবুড়ির নৃত্য, ঘোড়া নাচ, চালি নাচা, কার্তিক নাচা, পরি নাচা ইত্যাদি আরম্ভ হয়। ক্রমে ক্রমে বিবিধ শিবনিন্দা স্তুতি প্রভৃতি দ্বারা শিবের গীত হয়। এমনকি সমাজের অপকর্মের দিকও তুলে ধরা হয়।তারপর ভোর হওয়ার আগে 'মশান নাচ' হয়। মশান বিচিত্র সাজে সজ্জিত হয়ে নানা অঙ্গাভঙ্গি করে নাচতে থাকে এবং অপর ব্যক্তিগণ ধুনাচিতে ধূনো দিয়ে সেই ধুঁয়া মশানের সামনে ধরে তাকে সান্ত্বনা করে। এই প্রকারের শান্তিক্রিয়া গম্ভীরা মণ্ডপে কালী প্রভৃতি নৃত্যকালেও অনুষ্ঠিত হয়। তারপর সকলে সকাল ৮-৯ পর্যন্ত গম্ভীরা থেকে গম্ভীরান্তরে নৃত্য করে শেষে একসঙ্গো নদীতে স্নান করে বাড়ি ফিরে যায়।

চতুর্থদিন—আহার, বোলবাহি : আহারায় হয় মশান নাচ। জেলে, সাঁওতাল, রাজবংশীরা এই নাচ করে। অপদেবতার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য এই নাচ—যাতে মহামারির কবলে পড়তে না হয়। এইদিনে গম্ভীরার একপাশে একটি কাঁচা বাঁশ বা কঞ্চি পুঁতে তাতে কলার মোচা ও আম প্রভৃতি বেঁধে পূজা করার মধ্যে দিয়ে আহারা পুজো সম্পূর্ণ হয়। তারপর

দিনের তৃতীয় প্রহরে শোভাযাত্রা বের হয়। গম্ভীরা উৎসবের একেবারে শেষলগ্নে যে সংগীত অনুষ্ঠান হয়, তার নাম বোলবাহি। এই গান গম্ভীরা প্রাঙ্গণে গাওয়া হয় বলে এটি গম্ভীরা নামে পরিচিত।

গম্ভীরার গান মূলত মৌখিক ধারার গান। এর কোনো লিখিত দলিল পাওয়া যায় না। মূলত সমসাময়িক ঘটনাকে কেন্দ্র করে এই গম্ভীরা গান বাঁধা হয় এবং তার মধ্যে সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের অন্ধকারময় ক্ষেত্রগুলিকে তুলে ধরা হয়। এই গান ব্যঙ্গ-কৌতুক, হাস্যরসের মধ্যে দিয়ে পরিবেশিত হয়ে সমাজকে সঠিক পথে আনার চেষ্টা করে। শিবকে কোনো উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন দলের প্রতিনিধি মনে করে নিম্নবর্গীয়রা নিজেদের অভাব, অভিযোগ জানায় এবং সুরাহার দাবি করে। সমাজের মানুষের দৈন্য অবস্থা, অত্যাচারী রাজশক্তি বা রাষ্ট্রের ক্ষমতায় বসে থাকা ব্যক্তিদের কথা, তাদের প্রতি ব্যঙ্গ এবং সমাজের অকল্যাণকারী নানা চরিত্রকে তুলে ধরাই এই গানের উদ্দেশ্য। যেমন—

চাচা জান বাঁচা দায় হল, বানে শহর যায় ভ্যায়সা।
কত উকিল মোক্তার হাকিম ডাক্তার হাগছে দুয়ারে বইস্যা।[৫]

এই গানের মধ্য দিয়ে দেখানো হয়েছে, গ্রামের সাধারণ গরিব মানুষরা সারাবছর ধরেই দুঃখ-কষ্ট ভোগ করে। দুঃখই যেন তাদের জীবনের নিয়তি। ফলে দুঃখকে তারা সঙ্গী করেই লড়াই করে বেঁচে থাকে। কিন্তু প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে বসবাসকারী শহরের বাবুরাও রেহাই পাননি। গানের এই চিত্র তুলে ধরার মধ্যে দিয়ে বাবুদের নিয়ে মশকরা করা হয়েছে। গরিবদের দুর্দশার চিত্র দেখা যায় আরেকটি গানে—

শুন হে ভোলা নানা,
দেশবাসী তালকানা।
ছাই পড়িল মোদের ভাতে,
শিব হে এবার যেতে হবে,
মৃত্যুর পথে।[৬]

সুবিধাভোগী রাজনৈতিক ব্যক্তিদের আদর্শহীনতা, স্বার্থপরতা, নীচ মানসিকতারও পরিচয় পাওয়া যায় এই গম্ভীরা গানের মধ্যে দিয়ে। এতে সামাজিক মানুষ অনেকটা সচেতন হয়ে নিজেদের অধিকার আদায়ে সক্ষম হয়। সেই ভণ্ড, আদর্শহীন রাজনৈতিক ব্যক্তিদের চিত্র—

হামি করি ছাতা পার্টি,
বর্তমানে সবচেয়ে খাঁটি।
যেদিকে জলের ছাঁট,
ঘুরাই ছাতার বাঁট।
এটায় হামার রাজনীতি।[৭]

এছাড়াও অনেক গান রয়েছে—যেখানে প্রাক-স্বাধীনতা পর্বের অনেক চিত্র, দুর্দশা, ইংরেজদের অত্যাচার, বিশ্বযুদ্ধ মানুষের দুরাবস্থা ইত্যাদি সমসাময়িক জীবনের যন্ত্রণাকে তুলে ধরা হয়।

গম্ভীরা কেবল উৎসব নয়, সমাজের সংস্কারক, চালক ও রক্ষক। সমাজের মঙ্গল সাধনায় ব্রতী হয়ে শিল্পীরা নিজেদের মধ্যেও এক গঠনমূলক শিক্ষা লাভ করে। ব্যক্তিগতভাবে সকল

মানুষ স্বতন্ত্র হলেও সামাজিক জীব হিসাবে এক মেলবন্ধনের সুর বিরাজ করে। কারও আত্মপাপ গম্ভীরা নীরবে সহ্য করে না। গানের মধ্য দিয়ে তা জনসমক্ষে হাজির করে। গম্ভীরায় রাজনীতি বিদ্যমান। উৎসবকর্ম পরিচালনার জন্য অনেক কর্মবীরের আবির্ভাব হয় এবং দলপতির অধীনে থেকে সুষ্ঠভাবে কাজ সমাধা করে। এই গম্ভীরার মাধ্যমেই মাঙ্গলিক পদ্ধতির প্রচলন ও পঞ্চায়তি প্রথার বিকাশ হয়েছে বলে মনে হয়। এই গানে ধর্মীয় বিষয়টিও বিশেষভাবে প্রতিফলিত। আর এই সবের মধ্যে দিয়ে সাহিত্য পুষ্টিলাভ করে। গ্রাম্য অশিক্ষিত কবিদের হৃদয় থেকে গানগুলি নিঃসৃত হয়ে জনগণের হৃদয়কে প্রেম, ভক্তি ও কবিত্বের স্রোতে মগ্ন করে। এপ্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকারের উক্তি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য—

> ভারতচন্দ্র, চণ্ডীদাস, জয়দেবের রচনা কৌশল, বাক্যবিন্যাস, ভাবুকতা এখনও গম্ভীরায় গীত কর্তাদের মধ্যে অনেক সময় লক্ষিত হয়। তাঁহাদেরকে বুঝতে হবে যে গম্ভীরায় কেবল এক পাড়ায় তিনদিন আমোদ প্রমোদ হয় তা নয়, এখানে একটা বাঙালি জাতির কাজ হয়। বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য, বাঙালি চিন্তাশক্তি, বাঙালি সভ্যতা, বাঙালি আদর্শ প্রস্তুত করবার একটা প্রধান উপায় মালদহের গম্ভীরা।[৮]

তথ্যের সন্ধানে

১. ড. ফনী পাল সম্পাদিত : 'হরিদাস পালিত', আদ্যের গম্ভীরা, বলাকা, কলকাতা, সংশোধিত তৃতীয় সংস্করণ ২০১৩, পৃ. ৩১
২. তদেব : পৃ. ৩৭
৩. তদেব : পৃ. ৩৭
৪. তদেব : পৃ. ৪৮
৫. প্রদ্যোত ঘোষ : রচয়িতা ও শিল্পী, লোকসংস্কৃতি : গম্ভীরা, কলকাতা, ১৯৮২, পৃ. ৯৯
৬. তদেব : পৃ. ৯৯
৭. বিপ্লব চক্রবর্তী : 'মালদা জেলার থিয়েটারচর্চায় গম্ভীরা', তবু প্রয়াস, নদীয়া, আগস্ট ২০১৮, পৃ. ১৫
৮. ড. ফনী পাল সম্পাদনা : 'হরিদাস পালিত', আদ্যের গম্ভীরা, বলাকা, কলকাতা, সংশোধিত তৃতীয় সংস্করণ ২০১৩, পৃ. ৮৩

মালদহের গম্ভীরা এবং স্বদেশি আন্দোলন

সমিত সাহা

সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে বিভিন্ন আঞ্চলিক লোকসংস্কৃতির প্রচলন থাকলেও উত্তরবঙ্গের 'ভাওয়াইয়া', দক্ষিণবঙ্গের 'ঝুমুর', এবং গাঙ্গেয়-মধ্য-বঙ্গে 'গম্ভীরা' লোকসমাজে সর্বাধিক জনপ্রিয়তা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। বলাবাহুল্য এই তিনটি লোকসংস্কৃতির মধ্যে সাম্প্রতিককালে সর্বাধিক চর্চিত বিষয় হলো মালদহের গম্ভীরা। মালদহ, মুর্শিদাবাদ, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর, বর্ধমান, বাঁকুড়া, বীরভূম, হুগলি, নদীয়া, উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ-পরগনা এবং পূর্ববঙ্গের রাজশাহী, পাবনা এবং ফরিদপুর-জেলা তথা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিস্তীর্ণ বাঙালি সমাজে বহুল প্রচলিত সাংস্কৃতিক শিল্পের ধারা এই গম্ভীরা।

সুপ্রাচীন কাল থেকেই ভারতীয় সমাজ-ধর্ম-রাজনীতি ও অর্থনৈতিক জীবনে গম্ভীরা সংগীত বিভিন্ন ভাবধারার সংস্পর্শে এসে পরিবর্তনের মাধ্যমে ভারতীয় সংস্কৃতিতে সফলতার সঙ্গে আত্ম-স্বকীয়-বিশেষত্ব বজায় রেখেছে। প্রাচীন যুগে সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধ-শৈব-বৈষ্ণব সংস্কৃতির সংমিশ্রণে গম্ভীরা সংস্কৃতি ভিন্ন ভিন্ন পরম্পরাচার্যে ভিন্ন ভিন্ন রূপে আত্মপ্রকাশ করতে থাকে। মধ্যযুগে রাজনৈতিক কারণে হিন্দু সংস্কৃতি ও সভ্যতা বাধাপ্রাপ্ত হওয়ায় নিম্নশ্রেণি এবং নতুন নতুন জাতি গম্ভীরাকে প্রধানত ধর্মীয় চরিত্র থেকে সামাজিক উৎসবের ধারায় অঙ্গীভূত করে। ঔপনিবেশিক শাসনামলে গম্ভীরা উচ্চ-নীচ, সভ্য-অসভ্য, শিক্ষিত-অর্ধশিক্ষিত বা অশিক্ষিত বাঙালি সমাজের ধর্ম ও সামাজিক গণ্ডি অতিক্রম করে আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনকে পরিব্যাপ্ত করতে সমর্থ হয়। আলোচ্য প্রবন্ধে মূলত মালদহ জেলার গম্ভীরা লোকউৎসবের মাধ্যমে ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে ভারতবাসীর জাতীয়তাবাদী ভাবধারার যে বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল সে প্রসঙ্গে আলোকপাত করা হয়েছে।

'গম্ভীরা' একটি অতি প্রাচীন শব্দ। ড. আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতে, অস্ট্রিক শব্দজাত 'গম্ভীরা' শব্দটি 'গামার' নামক কাঠ বিশেষ থেকে এসেছে। এই কাঠ ধর্মঠাকুর বা সূর্য দেবতার আসন হিসাবে দীর্ঘদিন থেকে ব্যবহার হয়ে এসেছে। এ কাঠের আসন সূর্য মন্দিরে ব্যবহৃত হতো, পরবর্তীতে শব্দটি শৈবধর্মের প্রভাবে রূপান্তরিত হয়ে শিবোৎসব রূপে ব্যবহৃত হতে থাকে।[২] শিব সংহিতায় উল্লেখ রয়েছে—"যুগাদিকৃত যুগবর্তো গম্ভীরো বৃষবাহন।" (শিবসংহিতা) অর্থাৎ যুগের সৃষ্টিকর্তা, যুগের বিবর্তনকারী দেবতা হল শিব, যার বাহন বৃষ। গম্ভীরা শব্দের উৎপত্তি ভগবান শিব থেকেই। বর্ধমান জেলার কুড়মুন ঈশানেশ্বর দেবের গাজনের বর্ণনায় উল্লেখ রয়েছে—"গম্ভীরে আছেন ভোলা মহেশ্বর/তাঁহার চরণে করি পঞ্চ প্রণাম।" এখানে

'গম্ভীর' শব্দটিকে দেবালয় হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। বৈষ্ণব সাহিত্যে গম্ভীরা শব্দটিকে ব্যবহার করা হয়েছে দেবগৃহ রূপে। গম্ভীরার আরেকটি প্রয়োগ জগন্নাথ দেবের শয়ন মন্দির অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে—"গম্ভীর গম্ভীরা কক্ষে অন্ধকার অতি/গম্ভীর কুহরে জ্বলে প্রদীপ সপ্ততি।"

লোকসংস্কৃতিকে কোনো ভূগোল বা ইতিহাসের চৌহদ্দির মধ্যে বেঁধে রাখা সম্ভব নয়। কারণ লোকসংস্কৃতি স্বচ্ছ জলকণার মতো। যে পাত্রে রাখা যায় সেই পাত্রেরই বর্ণ ধারণ করে। কালের পরিবর্তনে গম্ভীরা কোনো স্থান-কাল-পাত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি। গম্ভীরার ঐতিহাসিক বিশ্লেষণে মূলত তিনটি ধারায় ক্রমান্বয়িক রূপান্তর পরিলক্ষিত হয়। প্রথমে শিব বন্দনার মধ্যে ছিল গম্ভীরার বিস্তৃতি। পরবর্তীতে এর সঙ্গে নৃত্য, মুখোশ নৃত্য এবং শেষে সংগীতের অনুপ্রবেশ ঘটে। সামগ্রিকভাবে বলা যায় গম্ভীরা এক লোকাচার থেকে পরিবর্তিত হয়ে লোকউৎসবে পরিণত হয়েছে। মালদহ জেলার গম্ভীরা মূলত গ্রাম্যযাত্রা বা লোকনাট্যের আলোকে লোকসমাজে বহুকাল থেকেই সমাদৃত। আনুষ্ঠানিক গম্ভীরার চার দিনের অনুষ্ঠানসূচি—ঘট ভরা, ছোটো তামসা, বড়ো তামসা, আহার।

তামসাতে মুখোশ নৃত্য অনুষ্ঠিত হয়। চতুর্থ-দিনে সঙনৃত্যের শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। এতে বিভিন্ন সাজে বাঙালি সমাজের সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিচ্ছবি প্রদর্শিত হয়। শিব উৎসবকে কেন্দ্র করে মালদহ জেলার চৈত্রসংক্রান্তির শেষ চারটি দিনে অনুষ্ঠিত এই গম্ভীরা মূলত গাজন নামে সবচেয়ে বেশি পরিচিত। ছোটো ও বড়ো তামসাতে মুখোশ নৃত্য হয়ে থাকে এবং চতুর্থ দিনে গ্রামে সঙের মিছিল দেখা যায়। উনিশ শতকের সঙের মিছিল বা বিভিন্ন সাজে মুখোশ পরিহিত প্যারেড বা শোভাযাত্রায় নৃত্যগীতের দ্বারা বাঙালি সমাজের সামাজিক ও ধর্মীয় রূপের প্রতিচ্ছবি প্রদর্শিত হতে থাকে। ক্রমান্বয়ে উৎসব অনুষ্ঠান ছাড়াও বারোমাসই খুশি মতো গম্ভীরা গানের প্রচলন হয়। আনুষ্ঠানিক গম্ভীরার অংশ ছিল চতুরঙ্গ-শিব-বন্দনা, চার-ইয়ারী ও সালতামামি রিপোর্ট।

শিব উৎসবকে কেন্দ্র করে মালদহ জেলার চৈত্রসংক্রান্তির শেষ চারটি দিনে অনুষ্ঠিত গম্ভীরা মূলত গাজন নামেই সর্বাধিক পরিচিত। গম্ভীরা মণ্ডপে শিবনাম ছাড়াও সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি, ইতিহাস, পুরাণ প্রভৃতি বিষয়ে গম্ভীরাগান বা গীতিনাট্য পরিবেশিত হয়। আধুনিক যুগে শিব একটি প্রধান চরিত্র, বাংলাদেশে ভগবান শিব নানা বা মোড়লে রূপান্তরিত হয়েছেন। বিশ শতকের প্রথমার্ধে গম্ভীরা থেকে শিব মূর্তি পূজার প্রচলন প্রায় অবলুপ্ত হলেও প্রতীকী শিব পূজার প্রচলন প্রকট হতে থাকে। পরবর্তী সময়ে দুই বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহ ধ্বংসলীলার প্রেক্ষিতে সমাজ-মানসে পরিবর্তন আসে, গম্ভীরা গানেও পরিবর্তনের ছোঁয়া লাগে, গীতি-নাট্যের দ্বারা ব্রিটিশ সরকারের দুর্নীতির কথা জনসমক্ষে তুলে ধরে। ব্রিটিশ সরকারের বর্বর অত্যাচার; প্রতিরোধ ও প্রতিবাদের ভাষা হয়ে ওঠে গম্ভীরা। বর্ষ-পর্যালোচনার পরিবর্তে দৈনন্দিন জীবনযাত্রার বিবরণী হয়ে ওঠে গম্ভীরা। নির্দিষ্ট স্থান-কালের ঘটনা পরিধিকে অতিক্রম করে নিত্যদিনের উৎসব ও দৈনন্দিন জীবনযাত্রার অঙ্গে পরিণত হয়। সমাজের ভেতরের দুরাচার এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদের মাধ্যমে গম্ভীরা সমাজ সংস্কারকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়।

সাহিত্য, শিল্প ও সংস্কৃতি হলো সমাজের দর্পণ। আর ইতিহাস হল সমাজের ধারক ও বাহক। সমাজের দৈনন্দিন জীবনের চালচিত্র ইতিহাসের অন্যতম বিষয়বস্তু। মালদহের গম্ভীরা

ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাসের উত্থান-পতনকে যুগের পর যুগ লোকসমাজে পরিবেশনার মাধ্যমে নিম্নবর্গের রাজনৈতিক চেতনার বিকাশ ঘটাতে সফল হয়েছিল, যার প্রমাণ পাওয়া যায় বিভিন্ন ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনগুলিতে—মালদার সর্বশ্রেণির কৃষক, কামার, কুমোর প্রভৃতি শ্রেণির স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ। ভারতীয় সমাজের নিম্নবর্গের মানুষ গম্ভীরা সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে সমাজ জীবনের নানা সমস্যা যেমন অভাব-অনটন, সুখ-দুঃখ, সামাজিক দুর্দশা তথা সারা দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং অন্যান্য ঘটনাবলীর বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্য দেবাদিদেব মহাদেবের কাছে আবেদন জানান। ফলস্বরূপ অজ-পাড়াগাঁয়ের অশিক্ষিত নিরক্ষর লোকসমাজ সহজবোধ্য রঙ্গ-রস সমন্বিত, ব্যঙ্গ কৌতুক মিশ্রিত নৃত্য-গীত সহযোগে সমসাময়িক রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে অবগত হতে পারত।

আলোচ্য প্রবন্ধে মালদহের গম্ভীরার এমন কিছু কিছু প্রসঙ্গকে উত্থাপন করা হয়েছে, যেখানে দেখা গিয়েছে প্রাচীন রীতিনীতি ও সংস্কৃতিকে অব্যাহত রেখে গম্ভীরা গর্জে উঠেছে ব্রিটিশ অপশাসনের বিরুদ্ধে। মালদহের প্রবাদপ্রতিম সংগীতশিল্পী যোগেন্দ্রনাথ চৌধুরী শিব বন্দনায় গেয়েছেন—"সরলপ্রাণ ভারতবাসীরে গরল্লান তোরা/দুইশ বছর ধইরা কইরাছিস গোরু ছাগল ভেড়া/চালিয়ে নৃশংস অত্যাচার, শোষণ শাসন দলন সংহার/নিয়ে স্বার্থে বিদেশি সম্বন্ধী।"

১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে সিরাজের পরাজয় এর ফলে ভারতের ভাগ্য রবি পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়। ক্রমে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি, স্বত্ববিলোপ নীতি প্রয়োগের দ্বারা ভারতবাসী শৃঙ্খলার বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। কোম্পানির দমন-পীড়নের ফলে ভারতবাসীর দৈনন্দিন জীবন দুর্বিষহ হয়ে ওঠে। মালদহের গম্ভীরা ভারতবাসীর এই শোষিত হওয়ার চিত্রটি তাদের শৈল্পিক ভঙ্গিমায় জনসমক্ষে প্রচার করেছে—"দিনের দিন সব দিন ভারত হল পরাধীন/অন্ন অভাবে মোরা হয়ে গেলাম শীর্ণ/ভারতবাসী হলে চিন্তা জ্বরের জীর্ণ, দুঃখে পরিপূর্ণ/আর নাই পূর্ব গর্ব হয়ে সর্ব খর্ব/গর্ব চূর্ণ সবারে কইরাছে। পলাশির যুদ্ধ ও তার পরবর্তী সময়ে কোম্পানির অর্থ শোষণ যার জন্য ভারতের নিম্নবর্গের জনজীবন দুর্বিসহ হয়ে ওঠে। মিরজাফর কোম্পানিকে ১৭ কোটি ৭ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেয়। ক্লাইভ ব্যক্তিগতভাবে ২০ লক্ষ এবং ওয়াটস্ ১০ লক্ষ টাকা উপঢৌকন পায়। ফলে বাংলার রাজকোষ শূন্য হয়ে পড়ে।

ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের অপর এক কৃতিত্ব ছিল অবশিল্পায়ন এবং সম্পদের আর্থিক নিষ্ক্রমণ। এর ফলে ভারতে ব্রিটিশ পণ্যের আমদানি ব্যাপকহারে বৃদ্ধি পায় এবং ভারত থেকে বিপুল পরিমাণ অর্থ ইংল্যান্ডে চলে যেতে থাকে। এই সময়ে মূলত ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের বিপর্যয় ঘটে ১৮০০ সালে কলকাতা থেকে ব্রিটেনে ৩০,২৬,২৫৩ টি সুতি বস্ত্রের থান রপ্তানি করা হয়েছিল, ১৮৩০ সালে সেই পরিমাণ দাঁড়ায় ১,৯৫,৭২৫ টি থানে। ১৮২৮ সালে ব্রিটিশ ক্যালিকো কাপড়ের আমদানির পরিমাণ দাঁড়িয়েছিল ৩,৪৮,৪৩,১১০ গজ যেখানে ১৮১৪ সালে আমদানির পরিমাণ ছিল ৬,৮০.২৩৪ গজ। ভারতীয় পণ্যের ওপর উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবে শুল্কের হার বাড়িয়ে দেয়। এইভাবে দেখা যায় একদিকে ভারতের হস্তশিল্পের বিনাশ সাধন এবং ব্রিটিশ সরকারের নির্লজ্জ লুণ্ঠন ভারতের অর্থনীতিকে পঙ্গু করে দেয়। ভারতবাসীর

এই দুর্দশার চিত্র ফুটে ওঠে গম্ভীরা শিল্পীর গানে—"তুঙ্গা দ্বিপ হতে দাদা পঙ্গপাল এসে/দেশের সার শস্য নিয়ে গেল তাদের দেশে/ভাগ্যে খোসা মিলিল শেষে/রাজ্য শেষ তুঙ্গা রাজ আর কিসের মোদের লাজ/স্বরাজ লইব মনে জ্যাইনাছ/নানাবিধ ধনরত্ন দেশে যত ছিল/ জাদুকর জাতি সবে মন্ত্রে উড়াইলো/কেহ জানিতে নারিল।" একইভাবে মহঃ সুফি অপর একটি গম্ভীরা গানের উল্লেখ করেছেন—"ভারতের ধন করে হরণ লণ্ডন পূর্ণ হে,/বঙ্গালক্ষী ভারতমাতা/কাঁদছে নিয়ে সুত সুতা/মোরা কেমনে জীবন কাটি/পরাধীন সে-ও দেয়ালাই কাঠি।"

ড. দেবপ্রসাদ সাটিয়ার গম্ভীরা গানে ইংরেজদের নির্লজ্জ সম্পদ লুণ্ঠনের কুৎসিত রূপ ফুটে ওঠে—"আয়রে ভাইরে উন্নত শিরে আয় তোরা আয়/বাধিয়া বুকের বল সামনে হেটে চল/কাহাকেও নাহি যে ডরাই/আয়রে বীর ভয়ে মাথা নাহি করে হেট/দুর্ভিক্ষ-পীড়িত মার ক্ষুধার জ্বালায়/ঠকিয়ে হায় মদের সর্বস্ব নিল কেড়ে/করলে ভিখারি এখন কোথায় দাঁড়াই/লুটে ময়ূর সিংহাসন আরও কত গুপ্তধন/বিদেশি এই অত্যাচারে অতিষ্ঠ সবাই/মনের দুঃখ করিতে মোচন সবার কাছে করি নিবেদন/মিলিত হওয়া ছাড়া বাঁচার উপায় নাই।"

১৮৫৭ সালের সিপাহি বিদ্রোহের কারণ অনুসন্ধান করে মিরাট ডিভিশনের কমিশনার উইলিয়ামস মূলত ধর্মীয় কারণকেই চিহ্নিত করেছেন। এই সময় গুজব রটে এই কার্তুজে শুয়োর এবং গরুর চর্বি মেশানো রয়েছে। এনফিল্ড রাইফেলের কার্তুজ দাঁতে কেটে ব্যবহার করতে হতো। সিপাহিরা সংগত কারণেই মনে করেছিল তাদের ধর্ম বিনষ্ট করার উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ সরকার এই রাইফেল চালু করেছে। খবরটি খুব দ্রুততার সঙ্গে সমগ্র ভারতের সাথে সঙ্গে মালদহে পৌঁছায়। ১৮৫৭ সালের ২৯ মার্চ রবিবার ৩৪নং রেজিমেন্টের সৈন্যরা কার্তুজ ব্যবহারের প্রতিবাদ জানায় মেজর সার্জেন্টকে গুলি করে। বিচারে মঙ্গল পান্ডের ফাঁসি হয়। রানিগঞ্জের কয়েকটি জায়গায় অগ্নিসংযোগের ঘটনায় সিপাহিদের জড়িত থাকার কথা স্বীকার করে নেয় ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ। বাংলার সিপাহী বিদ্রোহের ঘটনাবলী মালদহের গঙ্গাধর মণ্ডলের গম্ভীরায় প্রকাশিত হয়—"বুঝি ফিরিঙ্গি দল এবার ভাইরে ধইরা নিল কাঁটা/সিপাহি সব মিল্ল্যা অদের কল্লে বলির পাঁঠা/গোরু আর শূয়রের চর্বি দিয়া করলে টোটা/হিন্দু আর মোসলেমের বুকে মাইরা দিল খোঁটা/জাতি ধর্ম নাই একফোঁটা/পরে দুই ভায়েত সল্লা কইরা তাদের মারছে স্যাঁটা/ব্যারাকপুর আর রানীগঞ্জে গ্যাল আগুন লাগাইগ্যা/ফিরিঙ্গিরা তল্পি ছাইর্যাড গেল কুণ্ঠে ভাইগ্যা/সিপাহিরা থাকলো সব রাগ্যা/গোটা ভারত উঠলো জাইগ্যা।" শেষ পর্যন্ত ১৮৫৮ সালে মহারানি ভিক্টোরিয়া ভারতের শাসন আইন প্রয়োগ করে ভারতের শাসনভার গ্রহণ করে।

১৯০৫ সালের ১৬ অক্টোবর বঙ্গাভঙ্গের দিন ধার্য হয়। বঙ্গাভঙ্গের মূল উদ্দেশ্য ছিল ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনকে আরও দীর্ঘস্থায়ী এবং মজবুত করা। যেহেতু তখন ভারতের রাজধানী ছিল কলকাতা তাই কলকাতার শাসনভার কমিয়ে পূর্ববঙ্গ ও অসমকে পৃথক করার কথা ঘোষণা করা হয়। গভীরভাবে পর্যালোচনা করলে দেখা যায় বাংলার জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে দমন করাই ছিল বঙ্গাভঙ্গের প্রধান উদ্দেশ্য। ১৯০৪ সালের ঢাকায় লর্ড কার্জনের ভাষণ প্রমাণ করে তিনি বাংলার হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে একটি বিভেদ প্রাচীর তৈরি করে ইংল্যান্ডের ভারত শাসনকে স্থায়িত্ব দান করতে চেয়েছিলেন। এই ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র

মালদহের গম্ভীরা সম্প্রদায়ের অগোচরে ছিল না। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অন্যান্য জাতীয়তাবাদীরা টাউনহলে সভা করেন এবং বিদেশি পণ্য এবং বিদেশি শাসন বর্জন আহ্বান করে স্বদেশি দ্রব্য উৎপাদন এবং স্বদেশি শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। এক্ষেত্রে গম্ভীরা শিল্পীদের বক্তব্য ছিল প্রণিধানযোগ্য—"ধরবো লাঠি, কাঁপাবো মাটি।"

বঙ্গভঙ্গ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিতে হিংসার বীজ বপন করেছিল সন্দেহ নেই। বঙ্গভঙ্গের যুগে কোনও এক গ্রামে মহরম এবং গম্ভীরা একই সময়ে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই সময় উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাঁধে সেসময় মুসলমান কবি শামীর খলিফা হিন্দু-মুসলিম মিলনের সংগীত রচনা করেন—"ওহে শিব নিরঞ্জন কুন ফ্যাসাদে ফেল্ল্যা তুমি হায়/দড়ি ছিঁড়া তাজিয়াতে কাজিয়া-লাগায়/এঠে হিন্দু মুসলমান ছিল এক আসনে থান/গলাগলি পীরিতি করতো গাইতো গম্ভীরা গান/এখন দেখছি ঢাক ভাঙ্গা আর তাজিয়া ভাঙ্গাতে ডিঙ্গা ডুবায়/ধর্মের যাই বলিহারি ধর্ম লইয়া চলছে কিসের এত্তো আড়াআড়ি/আল্লা ঢাকের বোলে চট্টি তোলে, আজানে কেস্ট পালায়।" গম্ভীরা শিল্পিরা ভারতবাসীকে আহ্বান জানিয়েছেন তারা যেন বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে গর্জে ওঠে। বঙ্গভঙ্গের ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র যে বাঙালি জাতিকে ধ্বংস করে দিতে পারে সেই সতর্কবাণীও তারা দিয়েছেন অতি সন্তর্পণে—"জাগ বাঙালি, ছাড় বাঙালি উইঠা কাচ্চি পাক্কি/ওরে বঙ্গভঙ্গ এক হয়ে যাক রেখে ধর্মসাক্ষী/নইলে বাঙ্গালির স্থান নাই, ভারত হোলি ছন্নছাড়া/তোরাই ভারত ভাগ্যাকাশে দিপ্তদিনমণি/স্বর্ণপ্রসু স্বর্ণভূমে তোরাই স্বর্ণরা/তোর বাপের ছেলে দাপে চলেক আবার উঠা দাঁড়া।"

বঙ্গভঙ্গের যুগে গম্ভীরাকে জাতীয় শিক্ষার অন্যতম মাধ্যম এবং প্রতিবাদের সর্বপ্রথম স্বীকৃতি দেন মনীষী বিনয় কুমার সরকার। গম্ভীরার মধ্যে তিনি ভারতীয় ঐতিহ্যের মূল ধারাকে লক্ষ করেছিলেন। তাঁর মতে গম্ভীরা হলো সেই মাধ্যম যার দ্বারা নিরক্ষর ও গরিব প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর নিকট যেকোনো কঠিন বার্তা পৌঁছানো সম্ভব। মালদহের গম্ভীরার গুরুত্ব উপলব্ধি করে তিনি এই সংস্কৃতি সংস্কারে মনোনিবেশ করেন। ১৯০৫ সালে বিশম্ভর গিরি মালদহে গম্ভীরার উন্নতিকল্পে গড়ে তোলেন 'মকদমপুর বোলবাহি সম্প্রদায়।"

১৯১৯ খ্রিস্টাব্দের জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের তীব্র প্রতিবাদ লক্ষ করা যায় গম্ভীরা সংগীতে। রাওলাট আইনের প্রতিবাদে জালিয়ানওয়ালাবাগের উদ্যানে একত্রিত নিরস্ত্র জনসাধারণের ওপর সংঘটিত হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে গম্ভীরা শিল্পীরা গর্জে ওঠেন—"কোনই দোষ করিনি মোরা অন্যায়-অত্যাচার/করিনি কারও প্রাণসংহার/বন্দি ভাবে জালিয়ান-ওয়ালাবাগে/আমরা আগুন দেইনি তোপ কামানে/পশুর কাজ করাও মানবগনে/আছে কি এই জনগণ তোমার লণ্ডনে।" এই হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ স্বরূপ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নাইট উপাধি ত্যাগ করেন। তিনি খুবই উৎফুল্লের সঙ্গে গেয়ে ওঠেন—"তার প্রতিভা দেখে ব্রিটিশ জাতি/দেন নাইট উপাধি আনন্দে মাতি/সেই উপাধি ছাড়েন মেরে লাথি।"

এভাবে দেখা যায় গম্ভীরা লোককথা জাতীয় আন্দোলনের প্রতীকে পরিণত হয়। দীর্ঘদিনের ইংরেজ শাসন ভারতবাসীকে ব্যতিব্যস্ত করে তোলে। সাম্প্রদায়িকতার বীজ যখন ভারতবর্ষকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়েছিল। সেই সময় গম্ভীরা জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে এক হওয়ার আহ্বান

জানিয়েছে শিবের কাছে প্রার্থনা করেছেন—“শিব মিটাও গণ্ডগোল লাগাও আজান ঢাক আর ঢোল/আল্লা আল্লা হরিহর ধর সবাই বোল।” ১৯৩২ সালে দিনাজপুরের উকিল ও সমাজসেবক কাশীশ্বর চক্রবর্তী এবং তার শিষ্য জিতুর নেতৃত্বে একদল আদিবাসী আদিনা মসজিদ দখল করে। তার কাছে মনে হয়েছিল আদিনা মসজিদ ভগবান শিব মন্দির। ইংরেজরা এই মন্দিরটিকে আদিবাসীদের দুর্ভেদ্য দুর্গ মনে করে সাঁওতালদের বিরুদ্ধে অভিযান চালায়। জিতুর অনুগামীরা জিতুকে তাদের মন্ত্রী বা ভগবান মনে করত। তার আদেশ মেনে ভারতের স্বাধীনতার কামনায় স্থানীয় জমিদার ও ইংরেজদের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠে। আধুনিক আগ্নেয়াস্ত্রের সঙ্গে সাবেকি তীর-ধনুকের লড়াইয়ে সাঁওতালরা পেরে ওঠে না। যুদ্ধে জিতু সহ বেশ কয়েকজন সাঁওতাল নিহত হয়। মালদহের এই সাঁওতাল বিদ্রোহের নাটকীয় সংলাপের বর্ণনা করেছেন গম্ভীরা শিল্পী মোহাম্মদ সুফি—“অনার্য জাতি এ সাঁওতাল/পাঁচুই খেয়ে হই মাতাল/আদিনাটি করতে এলাম দখল হে/গান্ধীর মোদের বুড়াটি, সেনাপতি ছোঁড়াটি/মন্ত্রী জিতু, এরা সবে প্রজাহে।”

ভারতবাসীর স্বাধীনতাকামী চিন্তাভাবনার কণ্ঠরোধ করার জন্য কংগ্রেস নেতাদের নির্বিচারে বন্দি করা হয়, এর প্রতিবাদ করতে পিছুপা হয়নি মালদহের গম্ভীরা। ১৯৪২-এর ভারত ছাড়ো আন্দোলন বন্ধ করার জন্য গান্ধিজি সহ সমস্ত নেতৃত্বদের গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। শিব বা নানারূপী ব্রিটিশ শাসককে তাদের হাতের শিঙ্গা ফেলে নিজ দেশ ইংল্যান্ডে ফিরে যেতে বলেছে নাতিরূপী ভারতবাসীর প্রতিনিধি। এও বলা হয়েছে ভারতবাসীরা স্বাধীনতা ছিনিয়ে নিতে পিছপা হবে না। কবির ভাষায়—“ও নানা, বিদায় নিয়ে সুমনে চলে যা ভবনে/ফেল শিঙ্গা যোগালয় হে/নইলে কাইরালিবে দুশমনে/ও তোর এই ধারা দেশকে কইর্যাল দিলি সারা/বিনা বিচারে কারাগারে গেল কংগ্রেস নেতারা/তুই নিজের দেশে গেলি ফেঁসে শ্যাসে মারা যবি পরানে।”

দীর্ঘদিনের পাশবিক অত্যাচারে ভারতবাসী ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে দেবাদিদেব মহাদেবের কাছে তারা ‘পূর্ণস্বাধীনতা’ প্রার্থনা করতে থাকে—“শিব হে স্বরাজ পেলে মণ্ডা দেব/ঘন দুধের বাটি দেব/নইলে কাঁচা কলা ও ভোলা ও ভোলা।” প্রাক্‌স্বাধীনতার যুগে গম্ভীরা কবি গিয়ে ওঠেন—“স্বরাজ যদি পাই হে ভোলা, খ্যাইতে দিবো আম আর কলা।” এরপর ভারতের স্বাধীনতা লাভ করতে আর বেশি দেরি হয়নি।

মালদহের বিভিন্ন প্রান্তের নিরক্ষর জনগণের মধ্যে ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাব জাগ্রত করেছিল গম্ভীরা লোকশিল্পীরা। তাই ব্রিটিশ সরকার কোনোদিনই এদের সুনজরে দেখেনি। ১৯২৮ সালে কলকাতার নিখিল ভারত কংগ্রেস সম্মেলনে গম্ভীরা পরিবেশন করতে গিয়েছিলেন মালদহের গোপাল দাস, মোহাম্মদ সুফী, সতীশ গুপ্ত এবং ধরণী ধর। সরকারি নির্দেশে তাদের প্রাপ্য পাওনা বন্ধ হয়। তাদের গম্ভীরা গানের খাতা সরকার বাজেয়াপ্ত করে। পোস্ট অফিসের চাকুরিরত মোহাম্মদ রফির গম্ভীরা চিরকালের জন্য নিষিদ্ধ হয়। ১৯৪৩-৪৪ সালে মালদহের তৎকালীন জেলাশাসক হ্যাচ-বার্নওয়েল গম্ভীরা নিষিদ্ধ করেন। কবি গোবিন্দলাল শেঠ, গোপীনাথ শেঠ, যোগেন্দ্রনাথ চৌধুরী প্রমুখ গ্রেপ্তার হন। পরবর্তীকালে জেলাশাসক এই নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করলে তারা পুনরায় গম্ভীরা শুরু করেন, রাজরোষ তাদের প্রতিবাদের কণ্ঠকে রোধ করতে পারেনি।

ধর্মকে কেন্দ্র করে গম্ভীরা সৃষ্টি হয়েছিল সত্য—কিন্তু কালক্রমে ধর্মকে অতিক্রম করে সমাজের ত্রুটি-বিচ্যুতি দেশের ক্ষয়ক্ষতি ও বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের পথ প্রদর্শন করে সমাজ সংস্কারকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। বাংলার প্রান্তিক নিরক্ষর জনগণের কাছে দেশের সমসাময়িক রাজনৈতিক পরিস্থিতির বিবরণ কৌতুক বা ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের দ্বারা পরিবেশনে লোকশিল্প হিসেবে গম্ভীরা যে সামাজিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে তা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। ধর্ম-সমাজ-রাজনৈতিক ক্ষেত্রে দেশের প্রান্তিক জনগণকে সচেতন করে তোলার ক্ষেত্রে তাদের অবদান অনস্বীকার্য। সশস্ত্র সংগ্রামে অংশ না নিয়েও প্রান্তিক অশিক্ষিত জনগণকে ব্রিটিশ বিরোধী গণ আন্দোলনে শামিল করায় গম্ভীরা নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

তথ্যের সন্ধানে

1. Haridas Palit : 'Aadyer Gambhira', (ed.), Phoni Paul, Kolkata, Balaka, 1912–2013, pp. 10-20, 13-978-81-922582-7-0.
2. Proddut Ghosh : 'Maldah Jelar Loksanskriti', (book auth.) Ajitesh Bhattacharya, Madhuparni, kolkata, Bhattacharya Brothers, 1985, pp. 53-60
3. Sachikanta Das : 'Maldah Charcha' (Vol. 2), (book auth.) Moloysankar Bhattacharya, Maldah Charcha (Vol.2), Maldah, Bangiyo Publishers and Book Sellars Association, 2012, pp. 191
4. Phoni Paul : 'Maldaher Loksahityer Bhumika', [book auth.] Ajitesh Bhattacharya, Madhuparni, Kolkata, Bhattacharya Brothers, 1985, pp. 61-64.
5. Pushpajit Ray : 'Gambhira Gan : Adirup Sandhane', (book auth) Abhijit Chowdhury, Gour Maldah Sambad, malda, Sarodia sonkha, 2009, pp. 13-17.
6. Gopal Laha : 'Bharatiyo Jatiyo Chetonar Bikashe Swadhinota-purbo Maldar Gambhira Gan o loknatyo', (book auth.) Abhijit Chowdhury, Laha, Gopal, Bharatiyo Jatiyo Chetonar Bikas Gour Malda Sambad, Malda, Sarodia sonkha, REG 66101/97, 2016, pp. 24-40, Malda, Sarodiya Sonkha, 2016, pp. 24-40
7. Sachikanta Das : 'Maldaher Gambhira', (book auth.), Malaysankar Bhattacharya, Maldah Charca (Vol. 1), Kolkata, Bangaio Prokashok O Pustok Bikreta Sobha, 2011, pp. 262-271
8. Sekhar Bandyopadhyaya : 'From Plassey to Partition-A History of Modern India', Kolkata, Orient Blackswan, 2004, pp. 43-45
9. Gopesh Roy : 'Gombhira Gan : Itihash Prosongo' (book auth), Ashutosh Barman, Uttarbangar Sahitya-Sanskrity, Maldah, Sanbedan, 2010, pp. 7-10
10. Siddharth Ray Guha : 'Aadhunik Bharotborsher Itihas', (1707-1964) Kolkata, Progressive, 1996, pp. 206–617
11. Ramesh Chandra Dutt : 'The Economic History of India', London : Venture Publication, 1904, pp. 129-142
12. Kamal Basak : 'Maldaher Sanskreeti Banglar Oitihya', Kolkata, Anima Publisher, 2015, pp. 69-73

বীরভূমের পটুয়া, পটশিল্প ও পটসংগীত : একটি সমীক্ষা

সেখ একরামুল হোসেন

ইংরেজি 'Folklore' বা লোকসংস্কৃতি কথাটি এসেছে 'Folk' ও 'Lore' এই শব্দ দুটি থেকে। 'Folk' শব্দের অর্থ 'লোক'। 'লোক' বলতে বোঝায় 'Group of people'। অর্থাৎ যে একদল মানুষ নির্দিষ্ট অঞ্চলে গোষ্ঠীবদ্ধভাবে বসবাস করেন, যাদের বৃত্তি বা পেশা, উৎসব-অনুষ্ঠান, বিশ্বাস-সংস্কার, রীতি-নীতি, আচার-আচরণ—একইরকম বা গভীর সাদৃশ্য আছে তারাই হচ্ছেন 'লোক' আর 'Lore' শব্দের অর্থ 'সংস্কৃতি'। সংস্কৃতি শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ। এককথায় এর সংজ্ঞা-স্বরূপ নিরূপণ করা অত্যন্ত দুরূহ। তবুও বলা চলে 'সংস্কৃতি' হলো 'সংস্কার বা ক্রিয়া' অর্থাৎ সাহিত্যে, শিল্পে, সংগীতে, চিত্রকলায়, ভাষায়, ভাস্কর্যে যেখানেই মানবচেতনা সুন্দররূপে প্রতিভাত হয়ে ওঠে তাই মূলত সংস্কৃতি। এককথায়, লোক সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত যে সংস্কৃতি, যা তাদের সামগ্রিক জীবনধারার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে সম্পৃক্ত তাই হলো লোকসংস্কৃতি।

এই লোকসংস্কৃতির নানান ব্যবহারিক ও প্রায়োগিক দিক লক্ষ করা যায়। এর উল্লেখযোগ্য দিকগুলো হলো—বিভিন্ন ব্রত, আলপনা, বিবাহাদি অনুষ্ঠান রীতি, কৃষি-শিল্পকেন্দ্রিক আচার-অনুষ্ঠান, চিত্রশিল্প প্রভৃতি। পটশিল্প এর অন্যতম এক নিদর্শন। পটশিল্প বাংলার লোকসংস্কৃতির অন্যতম এক অঙ্গ তথা বিশেষ এক প্রকারের লোকশিল্প। এই পেশার সঙ্গে যারা নিযুক্ত তারা 'পটুয়া' নামে পরিচিত।

আবহমান কাল ধরে গ্রাম বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে বেশ কিছু শিল্পমনস্ক মানুষজন তাদের নিজস্ব ভাবধারা, সৌন্দর্য, অভিরুচির মাধ্যমে নিজেদের শিল্পের জগৎকে গড়ে তুলেছিলেন এবং তার প্রসার ঘটিয়েছিলেন বিভিন্ন জায়গায়। নাম না জানা সেই সকল মানুষদের লৌকিক আধার, উপকরণ ও বিষয়গুলি নিয়ে গড়ে উঠেছিল তাদের শিল্পজগৎ। বাংলার পটুয়ারা এই শিল্পজগতেরই বাসিন্দা। এই পটুয়ারা কোথাও 'পোটো' আবার কোথাও 'পটচিত্রকর' নামেও সমধিক পরিচিত। 'পটুয়া' শব্দটি এসেছে মূলত 'পট্টিকার > পটকার > পটুয়া' এভাবে। পটুয়া সম্প্রদায়গণ জীবন-জীবিকার সন্ধানে বিভিন্ন লৌকিক বা পৌরাণিক ইত্যাদি বিষয়কে অবলম্বন করে নিজস্ব ভাব-ভাষা ও সৌকর্যে পটের ভূমি প্রস্তুত করে তার উপর চিত্র অঙ্কন করে গীতের আকারে বিভিন্ন স্থানে গিয়ে গিয়ে চিত্রসহযোগে পটসংগীতগুলি পরিবেশন করে থাকে। এভাবেই এই শিল্পকে কাজে লাগিয়ে পটুয়ারা তাদের রোজগার পথে নিয়োজিত হয়।

যার ভিত্তিতে এই পটুয়া সম্প্রদায়গণ গড়ে উঠেছিলেন সেই পট সম্পর্কে আলোকপাত

করলে দেখতে পাই, 'পট' এই শব্দটি এসেছে সংস্কৃত 'পট্ট' শব্দ থেকে। যার অর্থ কাপড় বা বস্ত্র। লেখা বা ছবি আঁকার কাজে ব্যবহৃত বস্ত্রখণ্ডকে পট বলা হয়। পটশিল্পের উদ্ভব ও বিকাশ ঘটেছিল বহু প্রাচীনকালে। বৈদিক যুগ থেকে শুরু করে বিভিন্ন পুরাণ, জীবনীকাব্য এমনকি মঙ্গালকাব্যেও এর সন্ধান মেলে। এছাড়াও পতঞ্জলির মহাভাষ্যে 'কংসবধ' পালায় এবং পাণিনীর 'অষ্টাধ্যায়ী'তে উল্লেখ পাওয়া যায়। কালিদাসের 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' নাটকে, বাণভট্টের 'হর্ষচরিত'-এ, ভবভূতির 'উত্তররামচরিত'-এ এই পটুয়াদের জনপ্রিয়তা ও গুপ্তচরবৃত্তির কথা জানতে পারা যায়। পটুয়া বা চিত্রকরবৃত্তি ছিল এক প্রাচীন বৃত্তি। পুরাকালে শাস্ত্রের বিধান মেনে শুভ্র পট্টবস্ত্র বা কাপড়ের উপর পটুয়ারা ছবি আঁকতেন। মূলত সমাজের নিম্নবর্গীয় সম্প্রদায়গণ এই পেশার সঙ্গে নিযুক্ত ছিলেন। অনেকক্ষেত্রেই পটশিল্পের প্রধান বিষয় রূপে মান্যতা পেত দেব-দেবীর নানা মাহাত্ম্যজ্ঞাপক চিত্র। তবে পটশিল্পের বিষয়রূপে দেবদেবীর চিত্র থাকলেও এই শিল্প লোকজশিল্প রূপেই খ্যাত।

পটশিল্পের নানা বিভাগ লক্ষিত হয়। আকৃতি ও বিষয়শৈলী অনুসারে পটের বিভিন্নতা দেখা যায়। আকৃতি অনুসারে পট মূলত দুই প্রকার। যথা—১. জড়ানো পট বা দীঘল পট ২. চৌকো পট। ক্ষেত্রসমীক্ষায় জানতে পারি, জড়ানো বা দীঘল পটগুলি লম্বায় ১৫০-২০০ সেমি এবং প্রস্থে ২৫-৩০ সেমি হয়ে থাকে। চৌকোপট বর্গাকার বা আয়তাকারের হয়ে থাকে। অন্যদিকে বিষয়শৈলী অনুসারে পট চার প্রকার হয়ে থাকে। যথা—

১. **যমপট :** এই পটের মাধ্যমে পাপ-পুণ্য, ধর্ম-অধর্ম, স্বর্গ-নরক ইত্যাদি বিষয়কে চিত্রের আকারে ফুটিয়ে তোলা হয়।
২. **গাজিপট :** মুসলিমধর্মের বীর যোদ্ধা ও গাজি বা পিরদের বীরত্ব ও তাঁদের অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ প্রদর্শিত হয়।
৩. **অবতার পট :** বিভিন্ন পুরাণ, মহাকাব্য ও মঙ্গালকাব্যের মহান চরিত্রবিষয়ক যে সকল পট তা প্রদর্শিত হয়।
৪. **আদিবাসী পট :** সাঁওতাল আদিবাসীদের জন্মবৃত্তান্ত, তাদের জীবনযাত্রা প্রভৃতি বিষয় এই পটে চিত্রের আকারে তুলে ধরা হয়।

অঞ্চলবিশেষে পটের নানা বিভাগ ও ধরন লক্ষিত হয়। যেমন—কালীঘাটের পট, বাঁকুড়া-বিষ্ণুপুরের পট, মেদিনীপুরের পট। এরই অন্যতম পটশিল্প হিসেবে পরিচিত বীরভূম জেলার পটশিল্প। এই জেলার লাভপুর থানার অন্তর্গত অন্যতম একটি গ্রাম হলো দাঁড়কা। এই গ্রামের পটশিল্পকে আজও সমুজ্জ্বল করে রেখেছেন এখানকার পটশিল্পী হয়রান পটুয়া মহাশয়। তাঁর কাছ থেকে জানতে পারি, তিনি মূলত জীবন ও জীবিকার নিরিখে এই পটকে

কেন্দ্র করে বিভিন্ন গ্রামে গ্রামে পটচিত্রভিত্তিক পটসংগীত গেয়ে থাকেন। তবে এর গুরুত্ব ক্রমশ ক্ষীণ হওয়ার জন্য এই শিল্পের পাশাপাশি তিনি চুড়ি আদি মনোহারির ব্যবসা করে গ্রামান্তরে ফেরি করে বেড়ান। তাঁর শিক্ষাগুরু ডালু পটুয়া মহাশয়। তিনি মূলত দীর্ঘ (২০-২২) বছর ধরে এই পেশার সঙ্গে নিজেকে নিযুক্ত রেখেছেন। তিনি নিম্নবিত্ত পরিবারের মানুষ। কষ্টের মধ্যে দিয়ে পটসংগীত দেখিয়ে সংসার নির্বাহ করেন। বর্তমানে পটসংগীতের অবস্থান বিলুপ্তির পথে। যান্ত্রিক সভ্যতার আগ্রাসনে পটসংগীত-এর আকর্ষণ তেমন নেই বললেই চলে। এই পটুয়ারা মূলত সমাজে অবহেলিত, লাঞ্ছিত, দলিত সম্প্রদায়ভুক্ত। সরকারি সুযোগ-সুবিধা থেকেও বঞ্চিত।

তাঁর কাছ থেকে পট সম্পর্কে যে তথ্য আমরা জানতে পেরেছি সেগুলো তুলে ধরার চেষ্টা করেছি মূলত এই নিবন্ধে। তাঁর কাছ থেকে বিভিন্ন আঙ্গিক ও বিষয় শৈলীগত পটের কথা জানতে পারি। যেমন—

১. **যমপট :** মৃত্যুর দেবতা যমরাজকে কেন্দ্র করে মানুষের দৈনিক আচার-আচরণ ও পাপ-পুণ্যের দিকগুলি বিবেচনা করে লোকশিক্ষা দেওয়ার জন্য পটচিত্র দেখিয়ে সংগীতের মাধ্যমে এই পট পরিবেশিত হয়। এই পটে চিত্রের আকারে বিষয়গুলি তুলে ধরা হয়।

২. **অবতার পট :** বিভিন্ন হিন্দু দেব-দেবী, পুরাণ ও মহাকাব্যের চরিত্রগুলিকে অবলম্বন করে এই পটগুলি পরিবেশিত হয়। এর মধ্যে অন্যতম হলো—নিমাই সন্ন্যাসী, সাবিত্রী-সত্যবান, বেহুলা-লক্ষ্মীন্দর ও রামায়ণের কাহিনি অবলম্বনে সিন্ধুমুনি পুত্র বধ ইত্যাদি। এই ধরনের পটগুলি জনসমক্ষে খুবই আকর্ষণীয়ভাবে পরিবেশিত হয়ে থাকে।

৩. **গোরুর পট :** হিন্দু সমাজে গোরুকে দেবতা রূপে মান্য করা হয় এবং তার পুজো করা হয়। এই বিষয়টিকে অবলম্বন করে গোরক্ষণাবেক্ষণ ও তার প্রতিপালনকে উপজীব্য করে গোরুর পট রচিত হয়ে থাকে।

৪. **সমসাময়িক বিষয় সংক্রান্ত পট :** বর্তমান সময় ও পরিস্থিতির সাপেক্ষে সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ইত্যাদি দিকগুলি তুলে ধরা হয়। এই পটগুলিতে মূলত ঘরজামাই হয়ে থাকার বিড়ম্বনা, তাদের কষ্ট-যন্ত্রণার কথা, মা-বাবাদের মানসিক দুঃখ, অর্থনৈতিক অস্বচ্ছলতা, বেকার সমস্যা, বিভিন্ন মহামারি, বন্যা ইত্যাদি বিষয়কে অবলম্বন করে এই পটগুলি পরিবেশন করে থাকেন।

তবে পটসংগীত শুরু করার পূর্বে দর্শকদের সামনে হাজির করতে পটের শুরুতে 'টেলার পট' (ছেলে ভোলানো নানা মজাদার চিত্র) দেখিয়ে থাকেন। পট প্রস্তুত প্রণালীটি অত্যন্ত শ্রমসাপেক্ষ এবং নিপুণ হস্তের কারুকার্যের ব্যবহার লক্ষিত হতে দেখা যায়।

প্রস্তুত প্রণালী

প্রথমে সাদা আর্ট পেপারে রং ও তুলি দিয়ে বিভিন্ন চিত্র এঁকে থাকেন। বিভিন্ন রঙের ব্যবহার ও উৎপাদন লোকজ রীতিতে হয়ে থাকে। রঙের ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক উপাদান ব্যবহৃত হয়। যেমন—হলুদ গুঁড়ো, জামের রস, চালতার বীজ, গিরিমাটি, পাকা পুঁইফল ও রস, ভুসাকালি প্রভৃতি। এইভাবে হলুদ, নীল, সবুজ, লাল, বেগুনী ইত্যাদি রং প্রস্তুত হয়। পেনসিল বা স্কেচে চিত্র আঁকার পর তা রং দিয়ে ভরাট করা হয়। এক্ষেত্রে বেল বা ময়দার আঠা তুঁতে মিশ্রিত করে প্রলেপ দেওয়া হয়, তাতে কাপড় বসানো হয়। এরপর সেগুলি রৌদ্রে শুকানো হয়। দুই প্রান্তে দুটি বাঁশ বা কাঠের গোলাকার দণ্ড প্রবেশ করিয়ে রোল করে রাখা হয়। কিছুক্ষেত্রে কাপড়ের উপর এলামাটি বা গোবরের প্রলেপ লাগিয়ে তার উপর পটচিত্রগুলি আঁকা হয়। সেগুলিতে পরে দীর্ঘস্থায়ীত্ব দান করা হয়।

এই গেল মোটামুটি পট নির্মাণ কাহিনি। এইভাবে এত কষ্ট করে পট অঙ্কনের মধ্য দিয়ে বাংলার লোককাহিনির ধারাকে বজায় রেখে নিজস্ব ভঙ্গিতে পটসংগীত পরিবেশিত করে থাকে। সামাজিক সংস্কারের মূল স্রোতকে বজায় রাখেন। এত কষ্টের মধ্যেও তাদের অবস্থার উন্নতি ঘটেনি, দারিদ্র্য তাদের নিত্যসঙ্গী। এ প্রসঙ্গে ড. আদিত্য মুখোপাধ্যায়ের মতটি প্রণিধানযোগ্য। তাঁর মতে—

> পটুয়া সম্প্রদায়টি হিন্দু-মুসলমান মিশ্র সংস্কৃতির বাহন হিসেবে সমাজে পরিচিতি লাভ করেছে। কেউ আবার বলে থাকেন বল্লাল সেনই চিত্রকরদের মুসলমান বানিয়েছেন। জন্মের ইতিহাস যেমন-ই হোক, পটুয়ারা যে লোক-শিক্ষক-শিল্পী এবং গায়ক তাতে কোন সংশয় নেই।[১]

পটুয়ারা পটচিত্রগুলি প্রস্তুতের পর সুর সহযোগে এগুলি গেয়ে থাকেন। তাই তারা শুধু সংগীত স্রষ্টাই নন, একইসঙ্গে গায়ক ও সুরকার। এই সংগীত মূলত আখ্যানমূলক গীতি। এই পটের গানগুলি লোকসমাজে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। পটের চিত্রে বাঙ্ময় ও পটুয়ার সংগীতে দর্শক-শ্রোতা মনমুগ্ধ হয়ে ওঠে। তারা আপ্লুত হন, একইসঙ্গে লোকশিক্ষাও জন্মায়। সংগীতের সুর খুবই উচ্চাঙ্গের ও স্বরের হয়ে থাকে। সংগীতের সহ অনুষঙ্গ হিসেবে বাঁশি ও ডুগডুগির বাদ্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে, যা দর্শক-শ্রোতা মনকে আকর্ষিত করে।

পটশিল্পীদের মতোই পটসংগীত নানা শ্রেণিতে বিভক্ত। তবে সব চিত্রই মূলত সংগীত সহযোগে লোকসমক্ষে তুলে ধরা হয়। ধর্মীয় বিষয় অবলম্বন করে দেবদেবীর মাহাত্ম্য প্রচারমূলক পটের সংখ্যাই সর্বাধিক জনপ্রিয়। পটসংগীত সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে গুরুসদয় দত্ত মহাশয় বলেছেন—

> বাংলার অধ্যাত্ম জীবনে সর্বাপেক্ষা গভীর স্তরের ভাবধারা ও রসধারা এই পটগীতিতে রূপায়ণ লাভ করেছে... সহজ অনাড়ম্বর ভাষায় ও ছন্দে। ইহা কোনো অভিজাত সমাজের ভাব বিলাস ব্যঞ্জক সাহিত্য নয়, জাতির সাধারণ প্রাণ যে অনাবিল ও বিলাস কলুষহীন ভাবধারার জীবন্ত

প্রবাহে ভরপুর ছিল, তাহার এবং বাঙ্গালী হিন্দুর গভীর অন্তশ্চরিত্রের ও ধর্ম বিশ্বাসের রসপূর্ণ অথচ সহজ স্বাভাবিক ও সরলতা মাখা রূপায়ণ।[২]

➲ ক্ষেত্রসমীক্ষায় প্রাপ্ত কিছু পটসংগীত এর নিদর্শন তুলে ধরছি—

১. গোবুর পট : আরে গরু নারো গরু চারো গরু বড় ধন।/আবার যারে ঘরে গরু নাই মা... ওগো মা বৃথা এ জীবন/আর শনি মঙ্গল বারে দিনে যে জন ওগো মা গোবর ও বিলায়/আবার তাহার ঘরে লক্ষ্মী ছেড়ে, ওগো মা অন্য ঘরে যায়/আর শনি মঙ্গলবারে দিনে যে জন ওগো মা মাছ পোড়া খায়/বছরে বছরে গোরুর পাল নষ্ট হয়।[৩]

গৃহস্থ ব্যক্তিবর্গদের দৈনন্দিন জীবনযাপনের বিধি, নিয়ম ও পালন এবং অর্থনৈতিক ও খাদ্যের চাহিদা মেটাতে গোরু পালন অন্যতম পেশা ছিল। তাই সেই গোরুর যথাযথ প্রতিপালন ও রক্ষণা-বেক্ষণ করা উচিত যা একান্নবর্তী পরিবারের সমস্ত বউরা সম্পাদন করেন। সেই নির্দেশ শ্বশুরমশাই বা বাড়ির কর্তারা দিতেন। আর এই কাজ যথার্থ সম্পাদিত না হলে যে কি ভয়ংকর পরিণতি নেমে আসতে পারে সেই বিপদসূচক দিকগুলি এই পটসংগীতে উদ্ভাসিত হতে শোনা যায়।

২. যমপট : ননী ওগো মা চুরি করে খাই/আর মস্ত সাঁড়াশি করে জিহ্বা টেনে লেয়/আর ভাঙারির চাল যে জন ভুল করে খায়/মস্তকেতে নিয়ে যেয়ে ঢেকিতে পার দেয়/নিজের পতি থাকতে যে জন পরের কাছে যায়/তাকে খরখরে খেজুর গাছে তুলে, তাহার ওগো মা অতি সাজা দেয়/আর হীরামণি বেশ্যা মাগো, অন্নদান-বস্ত্রদান সোনা দান করেছিল/তাই তাকে সোনার পুষ্পরথে স্বর্গে নিয়ে গেল/তাই, এক কটি চাল দেবেন মা, এক খোড়া মুড়ি/খেয়ে দেয়ে নাম করবো বীরভুমের দাঁড়কা আমার বাড়ি।।[৪]

এই গানে মানুষের অপকর্মের ফলশ্রুতি ধরা পড়ে। উক্ত সংগীতটিতে আমরা দেখি, চুরি করে খাওয়ার অপরাধে যমদূত মস্ত সাঁড়াশি নিয়ে জিহ্বা টেনে নেয়। তাছাড়াও নিজের পতি বা স্বামী থাকতেও পরপুরুষে আসক্ত হয় ও গমন করে তাদের শাস্তিস্বরূপ ধারালো খেজুর গাছে তুলে দেওয়া হয়। এছাড়াও দেখি অসৎকর্মের পরিবর্তে যদি ভালো কাজ করা যায় তাহলে তার পরিণতি শুভ বা মঙ্গলময় হয়। যেমন—হীরামণি একজন বেশ্যা হলেও তিনি প্রচুর দান-ধ্যান করেছিলেন তাই তাকে যমদূতেরা পুষ্পরূপ স্বর্গে নিয়ে গিয়েছিল। এই পটসংগীতের ভণিতা অংশে পটুয়ার বাড়ি ও গ্রামের কথা জানা যায়।

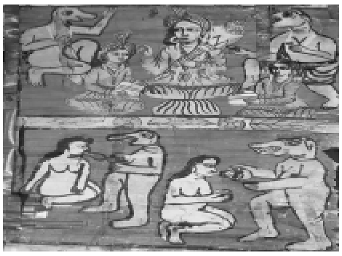

৩. চৈতন্যবিষয়ক পট সংগীত : ষোড়শ শতাব্দী মূলত বাংলা সাহিত্যে 'সুবর্ণযুগ'। এই শতাব্দীতে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনকে কেন্দ্র করে বাংলাসাহিত্যে ভক্তিরসের প্লাবন দেখা দিয়েছিল। বাংলার পটসংগীতে তাঁর প্রভাব লক্ষ করা যায়। বাংলার পটশিল্পীগণ তাঁর জীবনকে অবলম্বন করে নানা ধরনের পটসংগীত রচনা করেছেন। এগুলিকে মূলত চৈতন্য বিষয়ক পটসংগীত বলা হয়। এর মধ্যে আছে 'মহাপ্রভুর গৃহত্যাগ', 'বিষ্ণুপ্রিয়া ও শচীমাতার ক্রন্দন', 'নিমাইয়ের বাল্যজীবন'—এই সকল বিষয় নিয়ে পটচিত্র ও পটসংগীতগুলি জনমানসে আজও সমানভাবে গ্রহণযোগ্য। এমন একটি পট সংগীত হলো—

> নবদ্বীপের মাঝে ছিলেন জগাই আর মাধাই,/হরি ব'লে বাহু তুলে নাচে দুই ভাই।/নবদ্বীপ মাঝে ছিলেন শচী মাতা রানি;/তাঁহার গর্ভে জন্ম নিলেন নিমাই গুণমাণি।... হেলেদুলে সোনার নিমাই বাড়িতে লাগিল/দিনক্ষণ দেখে নিমাইকে পাঠশালাতে দিল;/সব ছেলের পড়া হইল নিমাইয়ের নাহি হইল,/রাগ ক'রে পণ্ডিতমশাই নিমাইকে মারিল।/কাঁদিতে কাঁদিতে নিমাই তমালতলে গেল,/ষড়ভূজ মূর্তিখানি নিমাই পন্ডিতকে দেখাইল।/গলায় বস্ত্র দিয়ে পণ্ডিত কহিছে বচন.../অপরাধ ক্ষমা করো ওগো শচীর নন্দন/রামরূপে ধনুধারী, কৃষ্ণ রূপে বাঁশি,/গৌরাঙ্গ রূপেতে নিমাই সেজেছেন সন্ন্যাসী।[৫]

উক্ত পটসংগীতটিতে নিমাই বা চৈতন্যদেবের জন্মবৃত্তান্ত বর্ণিত হয়েছে। তিনি নবদ্বীপে শচীমাতার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁকে ঘিরে সকলেই আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। ক্রমে নিমাইকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য পণ্ডিতের কাছে পাঠানো হয়। পণ্ডিত নিমাইকে পড়া না করার জন্য প্রহার করেন। পরে পণ্ডিত চৈতন্যের স্বরূপ জেনে গলবস্ত্র হয়ে চৈতন্যের কাছে ক্ষমা চান। আসলে চৈতন্যদেব ছিলেন রাম বা কৃষ্ণের অবতার এক মহাপুরুষ। সেই সুর এই পটসংগীতের মধ্যে ধ্বনিত হতে শোনা যায়।

এই পটশিল্প শুধুমাত্র বাংলার উল্লেখযোগ্য লোকশিল্পই নয়, একইসঙ্গে দেশ-কাল নিরপেক্ষভাবে সারা বিশ্বে এর জনপ্রিয়তা লক্ষিত হতে দেখা গেছে। ধর্মের প্রকৃত উদ্দেশ্য যে আদান-প্রদানের মাধ্যমে সুস্থ সংস্কৃতিকে বজায় রাখা সেই বাস্তব সত্যকেই পটশিল্প ও সংগীতের মাধ্যমে তুলে ধরে। এই পটুয়া সম্প্রদায়গণ নানা ধর্মীয়, পৌরাণিক বিষয়কে অবলম্বন করে ছবি এঁকে ও গান শুনিয়ে বাড়ি বাড়ি গিয়ে সামান্য কিছু উপার্জন করেন মাত্র। পটুয়াদের জীবনাচরণ এক মিশ্র সংস্কৃতির পরিচয়বাহী; তারা না হিন্দু, না মুসলমান। মূলত নীতি, সংস্কার, নান্দনিক বিকাশ সমস্ত উদ্দেশ্যকে ছাপিয়ে পটশিল্প ও পটুয়াসংগীত সাংস্কৃতিক ও সমন্বয় ভাবনার বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এসেছে। আবহমান কাল ধরে এই শিল্প বা

সংস্কৃতি মানবহৃদয়ে চিরন্তনত্বের দাবি রাখে। তবে উপযুক্ত সহযোগিতা ও অর্থনৈতিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়ার কারণে এই শিল্প ক্রমশ বিলুপ্তির পথকে প্রশস্ত করে তুলেছে। তাই সময় এসেছে বিষয়টি নিয়ে ভাববার ও সেদিকে হস্তক্ষেপ করবার—এই আশাবাদ পটুয়াদের কণ্ঠে ধ্বনিত হতে শোনা যায় বারংবার।

উৎসের সন্ধানে

১. আদিত্য মুখোপাধ্যায় : 'বাংলার লোকসংস্কৃতি', "পট ও পটুয়া", অমর ভারতী, ২০০৫, পৃ. ৯৭
২. গুরুসদয় দত্ত : 'পটুয়া সঙ্গীত', কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৩৯৩, পৃ. ১৮
৩. সাক্ষাৎকার : হয়রান পটুয়া, লিঙ্গ—পুরুষ, বয়স—৫০, গ্রাম—দাঁড়কা, থানা—লাভপুর, জেলা—বীরভূম, তথ্যসংগ্রহের তারিখ ২৯ জুন, ২০২০
৪. সাক্ষাৎকার : হয়রান পটুয়া, লিঙ্গা—পুরুষ, বয়স—৫০, গ্রাম—দাঁড়কা, থানা—লাভপুর, জেলা—বীরভূম, তথ্যসংগ্রহের তারিখ—২৯ জুন, ২০২০
৫. সাক্ষাৎকার : মিঠু পটুয়া, লিঙ্গা—পুরুষ, বয়স—৪০, গ্রাম—দাঁড়কা, থানা—লাভপুর, জেলা—বীরভূম, তথ্যসংগ্রহের তারিখ—১২ জুলাই, ২০২০

তথ্যের সন্ধানে

১. সেখ একরামুল হোসেন : 'ময়ূরাক্ষী তীরবর্তী অঞ্চলের লোকসংস্কৃতি', লোকভারতী পাবলিকেশন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : ৩০ নভেম্বর, ২০১৯
২. বরুণকুমার চক্রবর্তী : 'বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতি কোষ', দে বুক স্টোর, ২০১৬
৩. আদিত্য মুখোপাধ্যায় : 'বাংলার লোকসংস্কৃতি', অমর ভারতী, ২০০৫
৪. পল্লব সেনগুপ্ত : 'লোকসংস্কৃতির সীমানা ও স্বরূপ', পুস্তক বিপণি, কলকাতা
৫. চিত্তরঞ্জন মাইতি : 'পট, পটুয়া ও পটুয়া সংগীত', সাহিত্যলোক, জুন, ২০০১

‘কাঁদনাগীত’ প্রসঙ্গে

শান্তনু দলাই

বাংলায় প্রচলিত লোকগানের মধ্যে একটি ব্যতিক্রমী লোকগান ‘কাঁদনাগীত’। যন্ত্রানুসঙ্গ ব্যতীত একক বা দ্বিত্ব নারীকণ্ঠে গীত এই গান বহুকাল আগে থেকে লোকসমাজে প্রচলিত আছে এবং কালপরম্পরায় বহমান আছে। ‘কাঁদনাগীত’ আসলে কান্নার মাধ্যমে করুণ সুরে অতীতে ফেলে আসা স্মৃতিচিত্রের বিবৃতি। সুখস্মৃতির বিবরণ থাকলেও মূলত দুঃখের বর্ণনা এই গানের প্রধান উদ্দেশ্য। এই গানে স্বতঃস্ফূর্ত পাঠ (Text) সৃষ্টি হলেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে স্থায়ীপাঠ নারীমুখে মুখস্থ ও মনে আত্মস্থ হয়ে আছে। এমনকি কাঁদনাগীতের মুদ্রিত পুস্তিকাও পাওয়া গেছে। আলোচ্য নিবন্ধে এইরূপ অভিনব লোকগানের পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করব কাঁদনাগীতের মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলিকে।

কন্যা বিদায়ের সময় ওড়িশা এবং ওড়িশা প্রান্তবর্তী এলাকাগুলিতে নারীদের দ্বারা করুণ সুরের মাধ্যমে গীত হয়ে আসছে ‘কাঁদনাগীত’। শুধুমাত্র ওড়িশা কিংবা তৎসংলগ্ন মেদিনীপুর নয়, ঝাড়খণ্ড সীমান্তবর্তী বাংলায়ও এই কাঁদনাগীতের প্রচলন আছে। ক্ষেত্রসমীক্ষার দ্বারা আমরা সুবর্ণরেখার উভয় তটভূমি (বাংলা ও ওড়িশা) থেকে কাঁদনাগীতের সন্ধান ও সংগ্রহ করলেও পার্শ্ববর্তী ওড়িশা রাজ্য থেকে পশ্চিমবঙ্গে ও ঝাড়খণ্ডে আন্তর্প্রবিষ্ট হয়েছে। সংস্কৃতির এই সহিষ্ণুতার আদান-প্রদান এবং সীমান্ত-সংস্কৃতির চর্চাকে প্রান্তবঙ্গীয় আন্তঃপ্রবেশী লোকসংস্কৃতিচর্চা বলা হয়ে থাকে। বাংলা ও ওড়িশার আন্তর্প্রবিষ্ট লোকসংস্কৃতির একটি পরম্পরিত লোকগীতি হলো ‘কাঁদনাগীত’।

ওড়িশা থেকে বাংলায় আন্তর্প্রবেশের সূত্রে ভাষাগতভাবে বাংলা ও ওড়িয়ার যুগলবন্দী ঘটেছে। এর ফলে বাংলার উপভাষিক বৃত্তে ওড়িয়া ভাষার কাঁদনাগীত আন্তঃপ্রবিষ্ট হয়ে বাংলা উপভাষিক কাঠামোয় নিজেকে আত্মপ্রকাশ করেছে। যার ফলে দুই ভাষার মিশ্র বৈশিষ্ট্যে সৃষ্টি হয়েছে একটি মিশ্রভাষিক পাঠ (Text)। সুতরাং ঝাড়খণ্ডী উপভাষায় মিশ্রিত হলো ‘উত্তরা ওড়িয়া’ উপভাষা। তবে এই ভাষায় ওড়িয়া শব্দ অনেকটা জায়গা জুড়ে থাকলেও উক্ত এলাকার লোকভাষার বিমিশ্রণ লক্ষণীয়। বাংলা ভাষা-কাঠামোয় ওড়িয়া ভাষার আন্তর্প্রবেশের এইরূপ ঘটনাকে কেউ কেউ ‘ভাষিক-আন্তঃপ্রবেশ’ (Language Interpenetration) রূপে চিহ্নিত করেছেন।

বর্তমান প্রবন্ধে ক্ষেত্রসমীক্ষালব্ধ কাঁদনাগীতকে যেমন দৃষ্টান্তরূপে তুলে ধরা হবে, তেমনি অপরদিকে কাঁদনাগীতের তিনটি পুস্তিকার মুদ্রিতরূপের নিদর্শনকে তুলে ধরা হবে। প্রথমে ধারণা স্পষ্ট করে নিতে হবে যে, কাঁদনাগীত আসলে কান্না, নাকি গান। প্রথমত যদি গান

হয় তাহলে তার পাঠ বা Text তাল-সুর-লয়ের অনুসারী হবে এবং তা অনেকটা পরিকল্পিত। অন্যের মর্মস্থলে অনুপ্রবেশের আকাঙ্ক্ষা রাখবে। দ্বিতীয়ত, যদি এটি কান্না হয়, সুরকে আশ্রয় করে গানের ভঙ্গিতে কেন—এ প্রশ্ন আমাদেরকে ভাবিয়ে তোলে। নিঃশব্দে অশ্রুমোচন অনেকটা অব্যক্ত। তাই বেদনা উদ্রেককারী ভাষায় ফুটিয়ে তুলতে হয় ফেলে আসা স্মৃতিকে এবং ভাবী অনিশ্চয়তাকে। কাঁদনাগীত আসলে গাইতে গাইতে চোখ ভিজে আসে না, কাঁদতে কাঁদতে গলা চিরে গান চলে আসে। কান্না রূপান্তরিত হয় গানে, অশ্রু বেয়ে ফুটে ওঠে সুর। ফলে 'কাঁদনাগীত' শুধুমাত্র যে গান তা নয়, আসলে কান্না। স্বতঃস্ফূর্ত সুর, স্বতোৎসারিত ভাষা, তাৎক্ষণিক পাঠ (Text)-এ এটি লোকগানের বৈশিষ্ট্য নিয়ে জন্ম নেয়। সুতরাং লোকসাহিত্যের চর্চায় আমরা এই অভিনব সংস্কৃতিকে রূপগতভাবে গান ধরে নিয়ে কাঁদনাগীতের প্রসঙ্গে গভীরে প্রবেশ করতে পারি।

লোকসংস্কৃতির অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণে চারটি সীমা (boundary)-কে মাথায় রাখতে হয়, যথা—ক. ধারণাগত সীমা (Conceptual Boundary), খ. স্থানিক সীমা (Spatial Boundary), গ. সম্প্রদায়গত সীমা (Communal Boundary) এবং ঘ. কালিকসীমা (Time Boundary)। ধারণাগত সীমায় যদি আমরা কাঁদনাগীতকে ফেলে বিচার করি তাহলে কন্যা বিদায় কালে নারীদের অংশগ্রহণ, সহানুমর্মিতা প্রকাশ এবং অশ্রুমোচন আসলে একটি সামাজিক ও নৈতিক কর্তব্য বা মানবিক মূল্যবোধের প্রকাশ বলা চলে। কাঁদনাগীতির স্থানিক সীমা নির্ণয় করতে গেলে অবশ্যই গানটি একটি সাংস্কৃতিক অঞ্চল (Culture Area)-র মধ্যে প্রতিফলিত। সেদিক থেকে কাঁদনাগীত আসলে বাংলা ও ওড়িশার এমনকি ঝাড়খণ্ডের সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলিতেও প্রচলিত। আন্তর্প্রবেশী এই ওড়িয়া লোকগানের প্রবাহ সীমান্তবর্তী বাংলার মেদিনীপুর জেলার গোপীবল্লভপুর, নয়াগ্রাম, দাঁতন, মোহনপুর, এগরা, রামনগর প্রভৃতি এলাকায় যেমন প্রচলিত আছে ঠিক তেমনি ওড়িশার ময়ূরভঞ্জ, বালেশ্বর জেলার গ্রামাঞ্চলেও প্রচলিত আছে। অঞ্চলগুলি প্রশাসনিকভাবে দুটি ভিন্ন প্রদেশের হলেও এদের সাংস্কৃতিক রূপের মিল অনেক বেশি। সম্প্রদায়গতভাবে এই এলাকাগুলিকে পর্যবেক্ষণ করলে ধর্ম-ভাষা-জাতিগত সাদৃশ্য এবং রুজি-রোজগার বা পেশাগত মিল দেখতে পাই। সবশেষে সময়সীমার কথা বলতে গেলে কাঁদনাগীত বিশেষ কোনও পরবকেন্দ্রিক লোকগান নয়। বছরের যে-কোনো সময় এই গান গীত হয়। কারণ বিবাহ ও মৃত্যুর কাল কখন এসে পড়ে—আগে থেকে কেউ বলতে পারে না। জীবনের এই দ্বিবিধ পরিণতিতে মানুষ মানুষের পাশে থেকে সমব্যাথী হন। বিষয়বস্তুগত বিচারে 'কাঁদনাগীত' প্রধানত দুই ধরনের হয়, যথা—১. কন্যা বিদায়ের গান ও ২. মরণযাত্রার গান। সুতরাং কালগতভাবে দুটি সংকটকালই কাঁদনাগীতের উপযুক্ত সময়। আলোচ্য প্রবন্ধে সীমিত পরিসরের কারণে শুধুমাত্র কন্যা বিদায়ের গানকে পর্যালোচনা করার চেষ্টা করেছি।

কাঁদনাগীত মূলত লৌকিক ধারার গান হলেও এর মুদ্রিত রূপের প্রকাশ আমরা উদ্ধার করতে পেরেছি। দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত বাংলায় তথা মেদিনীপুরের ওড়িশা সন্নিহিত অঞ্চলগুলিতে প্রচলিত আছে কাঁথির নীহার প্রেস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত বেশ কয়েকটি কাঁদনাগীত বিষয়নির্ভর ছোটো ছোটো পুস্তিকা। লোকসংগীতের পরিবর্তনশীল পাঠ বা Text -কে স্মৃতি থেকে মুদ্রিত হরফে নিয়ে আসার মতো সংরক্ষণশীল চেতনা অ্যাকাডেমিক মানুষের

থাকে এটা আমরা জানি, কিন্তু অল্প শিক্ষিত সাধারণ লোককবিগণ যে প্রাতিষ্ঠানিক সহযোগিতা ছাড়া করে গেছেন তা সত্যিই অভিনব। এমনকি বিবাহানুষ্ঠানে ওড়িশা সীমান্তবর্তী বাংলায় এবং বাংলা সীমান্তবর্তী ওড়িশায় স্বল্প কবিত্বশক্তি সম্পন্ন শিক্ষিত ব্যক্তি নিজে নানা নীতিকথামূলক পদ রচনা করে নববধূকে উপহার দিতেন। আসলে স্মৃতি থেকে হাতড়ে অল্প শিক্ষিত কোনও কোনও লোককবি 'কাঁদনাগীত'কে লিখিত রূপে প্রকাশ করে সর্বজনীন লোকসাহিত্যকে ব্যক্তি-স্বাক্ষরে ফুটিয়ে তুলতেন। কাঁদনাগীতগুলি যাতে কালের অতল তলে তলিয়ে না যায় তার জন্য এই লোককবিগণ ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় এগিয়ে এসে নিজের প্রতিভার পরিচয় ও এই গানের স্থায়িত্বদানে প্রয়াসী হয়েছেন। ব্যক্তিপ্রতিভার স্পর্শে এই গানগুলির Text বা মূল পাঠের পরিবর্তন বা আংশিক পরিবর্তন হতে পারে হয়তো, কিন্তু কাঁদনাগীতির বিশেষ ছাঁচে এই গানগুলি নির্মিত হয়েছে। এই প্রবন্ধে আলোচনার জন্য চন্দ্রমোহন ধলের লেখা 'গেহ্লা ঝিঅ', অজ্ঞাত এক লোককবির লেখা 'সুনা ঝিঅ' এবং বনমালীর লেখা 'জেমা রোদন'—এই তিনটি কাঁদনাগীতকে নির্বাচন করা হয়েছে এবং এর সঙ্গে পর্যালোচিত হবে ক্ষেত্রসমীক্ষা নির্ভর নির্বাচিত কয়েকটি কাঁদনাগীতের তুল্যমূল্য পাঠ প্রসঙ্গ।

১. গেহ্লা ঝিঅ : চন্দ্রমোহন ধল

'গেহ্লা ঝিঅ' গানের কাহিনি অংশের মূল চরিত্র 'গেলী' নাম্নী এক আদরিণী কন্যা। বিবাহের পর প্রথম সে শ্বশুরালয়ে যাবে। তাকে বিদায়ের জন্য সকল আয়োজন সম্পূর্ণ। এমতাবস্থায় কন্যা ক্রমান্বয়ে বাবা, মা, দাদা, বৌদি, কাকা, কাকিমা, ঠাকুরমা, সেজ বোন—এদের কাছে গিয়ে নিজের ফেলে আসা শৈশবের স্মৃতিগুলি রোমন্থন করে কাঁদতে থাকে উচ্চকিত কণ্ঠে। প্রথমে মাকে জড়িয়ে ধরে বলে—

নিজ ন খাইত খুআউ থিল। মা'গো
যোল বর্ষ যাএ পাখে রখিল॥ ঐ
কিবা দোষ কলি তুম্ভ পয়র। ঐ
পঠাই দেউছ দূর দেশর॥
এহা যেবে মনে থিলা তুম্ভর। মা'গো
বেক মাড়ি থান্ত জন্ম কালর। ঐ

মেয়েটি বলতে চেয়েছে যে, নিজে না খেয়ে মা তাকে খাইয়েছে। অথচ আজ তাকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে। এই যদি মনে ছিল তাহলে গলায় পা তুলে জন্মের সময় কেন মেরে ফেলল না। বাবার কাছে গিয়ে মেয়েটি বলে—

পাকিলা কদলী ফেণিকি ফেণি। বাপা'গো
বাপ ঘর ঝিঅ মউড় মণি॥ ঐ
আলু পতর কি পান হোইব। ঐ
পর দেশরে কি মন রহিব॥ ঐ

অর্থাৎ কলা পাকলে বেশি দিন রাখা যায় না। যুবতী বিবাহযোগ্যা কন্যাকেও বাড়িতে রাখা যায় না। আলুর পাতা কখনও পান হতে পারে না তেমনি পরদেশে কখনও জন্মভূমির মতো শান্তি পাওয়া যায় না। স্মৃতি রোমন্থন বা দুঃখ বর্ণনার মধ্যে ফুটে উঠেছে অভিনব অলংকার। নববিবাহিত মেয়েকে বাপের বাড়ির পুকুরে ফোটা লাল শালুক ফুলের সঙ্গে উপমিত করা হয়েছে। উপমান (শালুক ফুল) কে দেখে উপমেয় (গেহ্লি) কে যেন মনে পড়বে

আর তৎক্ষনাৎ বাবা যেন গেহ্লিকে শ্বশুরবাড়ি থেকে ফিরিয়ে আনতে যান।

২. সুনা ঝিঅ : কবি পরিচিতি অনুপস্থিত

'সুনা ঝিঅ' নামক কাঁদনাগীতে সেইভাবে কোনও মূল কাহিনি নেই, যা আছে অতীতের স্মরণীয় কিছু ঘটনার আবেগঘন স্নেহবন্ধনের বিবরণ। শোভারানি নামক নববিবাহিতা মেয়েটি তার বাবা-মা, কাকা-কাকিমা, ঠাকুরমা, বোন এবং সঙ্গী-সাঙাতদের সঙ্গে ঘটে যাওয়া এবং মনে রাখার মতো ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন। এই স্মৃতিগুলি নারী জীবনের অতীত শৈশবকে নাড়া দিয়ে যায়। এই গানে বাবা-মা তার মেয়েকে শ্বশুরবাড়িতে মানিয়ে চলার মতো নীতিশিক্ষা প্রদান করেছেন। শ্বশুরবাড়ির নতুন পরিবেশে সবকিছু মানিয়ে চলতে হবে এবং শ্বশুর বাড়ির রীতি-নীতি তাকে আত্মস্থ করতে হবে, সংসারের মঙ্গলের জন্য ত্যাগ স্বীকার করতে হবে। গানের একটি জায়গায় মেয়েকে খাদ্যের বাদ-বিচার করতে নিষেধ করেছেন তাঁর মা—

মো 'সুনাঝিঅ' বলি বলিবে জন,
মুঢ়ী পখালি অবাবাসী তোরানি,
বাছিবু নাহি কেবে মো মো রানি,
যাহা পাইবু
পাদোদক পাইলে তাহা খাইবু।

নবযুগের ধর্ম বা আধুনিক কালের রীতি-নীতি শেখাতে মা কিন্তু ভুলে যাননি। স্বামী সহবাসের নিরাপদ সময়কাল গণনা করে মিলিত হওয়ার উপদেশ দিচ্ছেন মা। কারণ তার মেয়ে যাতে অবাঞ্ছিত গর্ভধারণ করে সমস্যায় না পড়ে সে বিষয়ে মা সচেতন করেছেন মেয়েকে। প্রতিটি কাজে স্বামীর সাথে যুক্তি করে সিদ্ধান্ত নিতে বলেছেন মা—

কান্ত আগমকাল রখিবু গণিরে।
করি পালন নবযুগ ধরম,
যুক্তি সিদ্ধান্তে কর প্রত্যেক কর্ম।

সুনাঝিঅ গানটিতে উপমা অলংকারের ব্যবহার বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে লক্ষ করা গেছে। দৃষ্টান্ত রূপে একটি পূর্ণোপমা অলংকারের নমুনা দেওয়া যায়—

বাড়ি কদলী পরা কাঁন্দিরে পচে, শোভারে
বাপ ঘরর ঝিঅ সভারে নাচে। ঐ

অর্থাৎ মেয়েদের শ্বশুরবাড়িতে থাকা ছাড়া আর কোন উপায় নেই। বাগানের কলা যেমন পাড়তে দেরি করলে কাঁদিতে পেকে পচে যায় ঠিক যুবতি মেয়েকে বাপের বাড়িতে ঠাঁই দিলে 'সভায় নাচে' অর্থাৎ চরিত্রভ্রষ্টা হয়।

৩. জেমা রোদন : বনমালী

'জেমা রোদন' গানটিতে পিতৃগৃহ থেকে বিদায় নিয়ে পতিগৃহে রওনা হওয়ার দৃশ্য ফুটে উঠেছে। জেমা প্রথমে মায়ের কাছ থেকে জানতে চেয়েছে—

মোতে জনম দেই দেউঅছ পঠাই
পর ঘরে দিন কাল কাটিবা পাঁই।
মাতা কি কর্ম কল মোতে বড়াই থিল
এতে দিনে তুম্ভ কোল ছড়াই দেল।

এইভাবে একে একে বাবা, দাদা, ভাই, বোন, কাকা, কাকিমা ও ঠাকুমা প্রত্যেকের কাছে অশ্রুবিগলিত নেত্রে জেমা তার ফেলে আসা শৈশবের স্মৃতিগুলি বলতে থাকে। অপরদিকে তার আপনজনেরা তাকে প্রবোধ দিতে থাকে। তার চোখের জল মুছে দিয়ে তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বিদায় জানাতে থাকে। খুড়িমা তাকে অনতিবিলম্বে 'ভাদ্র মাসের গম্ভা'য় ফিরিয়ে আনবে বলে কথা দেয়। ওড়িশা এবং ওড়িশার সন্নিহিত বাংলায় ভাদ্রমাসের গম্ভা পূর্ণিমায় মেয়ে-জামাইকে বাড়িতে এনে আদর-আপ্যায়ন করা হয়। অনেকটা বাংলার জামাইষষ্ঠীর মতো। এইরকম একটি সাংস্কৃতিক চিত্র ফুটে উঠেছে এই গান—

সত্য কহুছি জেমা ভাদ্র মাসর গম্ভা
তহিঁকি আসিব আউ নুহ বিমনা।

এ পর্যন্ত আমরা কাঁদনাগীতের মুদ্রিত রূপের পরিচয় দিলাম। প্রকৃতপক্ষে কাঁদনাগীত লোকগীতির শাখাভুক্ত মৌখিক ধারার সাহিত্য। পুরুষ কবি লোকরঞ্জনের জন্য স্মৃতি থেকে উদ্ধার করে তাকে লিপিরূপ দিলেন বটে কিন্তু কাঁদনাগীত পুরোপুরি মহিলাদের দ্বারা রচিত ও পরিবেশিত। মা-বাবা, ভাই-বোন, মাসি-পিসি এমনকি সখী-সাঙ্গাতদের উদ্দেশ্যে কাঁদনাগীত আছে। শুধু মেদিনীপুরে ওড়িশা নয়—"ওড়িশার লোকায়ত সমাজে এখনও কাঁদনাগীতের প্রচলন আছে। শ্রী চক্রধর মহাপাত্র তাঁর 'উৎকল গাঁউলি গীত' গ্রন্থে ওড়িশার কাঁদনাগীতি সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন।"[১]

কাঁদনাগীত মূলত ওড়িশার গ্রামীণ গীত। পশ্চিমবঙ্গের সীমানার মধ্যে যে কাঁদনাগীত পাওয়া যায় তার মধ্যে ওড়িয়া ভাষার সঙ্গে বাংলার আঞ্চলিক ভাষার লক্ষণ বা উপভাষিক লক্ষণ মিশ্রিত আছে—"তার ভাষা পুরোপুরি ওড়িয়া নয়—তা বাংলার আঞ্চলিক লক্ষণ মিশ্রিত ওড়িয়া। এ প্রসঙ্গে আরও উল্লেখ্য, যারা প্রাত্যহিক জীবনে আঞ্চলিক বাংলায় কথা বলে, তাঁরাই কাঁদনাগীত গায় মিশ্র ভাষায় এবং মিশ্র ভাষাতে গান রচনা করে।"[২] সুবর্ণরেখার পূর্ব তটবর্তী বাংলায় যে আঞ্চলিক ভাষা প্রচলিত আছে যা সুবর্ণরেখিক ভাষা রূপে পরিচিত সেই ভাষায় বেশ কয়েকটি প্রচলিত কাঁদনাগীত সংগ্রহ করে পুস্তিকা আকারে সম্পাদনা করেছেন বেবী সাউ। গানগুলি সংকলিত হয়েছে তাঁর 'কাঁদনাগীত : সংগ্রহ ও ইতিবৃত্ত' গ্রন্থে। এই গ্রন্থের কাঁদনাগীতিগুলি সুবর্ণরেখার তীরবর্তী গ্রামের ভাষায় গীত হয়। এই গানগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হলো—

উঠিলা সুয়ারি বসিলা নাই কাকীগো।
ঘুরি চাহিবাকু দিশিলা নাই কাকীগো।
গড়িয়া ভিতরে নড়িয়া গাছ কাকীগো।
নড়িয়া ধরিচে গুটি পঞ্চাশ কাকীগো।
এঠে খাইথাঙ গটা নাড়িয়া কাকীগো।
সেঠে কী খাইমু বাঁটা নাড়িয়া কাকীগো।

শ্বশুরবাড়ির শ্বাসরোধকারী পরিবেশে মেয়েটিকে কাটাতে হয়। সেই কষ্ট সহ্য করা আর যায় না— কাতরভাবে মেয়েটি বলেছে—"নদীর ধারে ধারে পাকা পনস মাগো/মোর শাশুঘরে কালা বংশ মাগো।" পূর্বে আলোচিত 'গেহ্লি ঝিঅ' শীর্ষক ওড়িয়া ভাষায় কাঁদনাগীতটিতে অনুরূপভাবে ধরা পড়ে শ্বশুরবাড়ির অত্যাচারের কথা। সেখানে দেখতে পাই জা-ননদের

মানসিক অত্যাচারের বর্ণনা, যেমন—

শারি যেসনে পিঞ্জরা ভিতরে। মাগো
বন্দী হোই থাএ কর্মদোষরে॥ ঐ
সেহি পরি মোতে বন্দী করিণ। ঐ
ননদ যাউলি থিবে জগিন॥ ঐ

অর্থাৎ শারি যেমন নিজের কর্মদোষে পিঞ্জরে বন্দি থাকে মেয়েটিকেও সেইভাবে জা-ননদের নজরদারিতে বন্দি থাকতে হয়। তার নিজের স্বাধীনতা বলে কিছুই থাকে না। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দেবশ্রী পালিত ২০১৪ সালে 'প্রান্তবঙ্গের আন্তর্প্রবেশী লোকসংস্কৃতি' শীর্ষক একটি গবেষণাপত্র উপস্থাপন করেন। এই গবেষণাপত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ে ক্ষেত্রসমীক্ষা নির্ভর অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে কাঁদনাগীত প্রসঙ্গে আলোকপাত করেছেন।

গানগুলির সাধারণ বৈশিষ্ট্য লক্ষ করলে দেখা যায় যে, এগুলি (ক) অশ্রুসজল (খ) একক বা দ্বিত্ব নারীকণ্ঠে গীত (গ) রাজনীতি ও ধর্মনিরপেক্ষ (ঘ) নীতি-উপদেশ মূলক ও (ঙ) যন্ত্রানুষঙ্গ বর্জিত লোকগান। এই গানগুলির (চ) নির্দিষ্ট পাঠ থাকলেও অনেক ক্ষেত্রে স্বতঃস্ফূর্তভাবে নতুন নতুন পাঠের সৃষ্টি হতে দেখা যায়। প্রথম দিকে কাঁদনাগীতগুলি নারী ও পুরুষ (বাবা, কাকা, দাদা) উভয়ে গাইলেও পরে এই গানগুলি শুধুমাত্র নারীরা পরিবেশন করে আসছেন। এই গানগুলি ধর্মনিরপেক্ষ হলেও (ছ) প্রথাকেন্দ্রিক—কারণ কন্যা বিদায়ের সময় কাঁদনাগীতি না উচ্চারিত হলে পিতৃগৃহে অমঙ্গল হয়। ফলে কন্যা বিদায়ের কালে মহিলারা কাঁদনাগীতে গলা মেলানোটাকে মানবিক, নৈতিক ও সামাজিক কর্তব্য বলে মনে করেন। সচরাচর মধ্যবয়স্কা তথা প্রৌঢ়ারা এই গানে গলা মেলান। গানগুলির বর্ণিত বিষয় ভিন্ন ভিন্ন হলেও সেগুলি (জ) আদল একই ছাঁচে ফেলা এবং উপস্থাপন ভঙ্গি অভিন্ন। (ঝ) খণ্ড খণ্ড স্মৃতিচিত্র গানগুলিতে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। গীতিকা বা বড় গানের মতো দীর্ঘ আখ্যানের ব্যবহার এখানে নেই।

এই সাহিত্যে নারীজীবনের অনিবার্য নিয়তির কথা বার বার ব্যক্ত হয়েছে। গুরুজনেরা কন্যার প্রতি নীতি-উপদেশ ও চরিত্র গঠনের শিক্ষা প্রদান করেছেন। সমাজচিত্র, পরিবার জীবন, কন্যাপণের প্রথা, বিবাহের রীতিনীতি বা প্রথা-পদ্ধতির চিত্র ফুটে ওঠে অনেক সময় এই গানগুলিতে। গঠনগত দিক থেকে এই 'কাঁদনাগীত'-এ ধুয়ো বা ধ্রুবপদ বিশিষ্ট পংক্তি লক্ষ করা গেছে। এখন এটি একক বা দ্বিত্বগীত হলেও আসলে এই গান এককালে একক গীতি ছিল না, একাধিক নারীর সমবেত গীত ছিল। মূলত নারীরা এই গানের অংশগ্রহণকারিণী। পরবর্তীকালে সমাজের আত্মিক বন্ধন শিথিল হওয়ায় ক্রমশ অংশগ্রহণকারিণীর সংখ্যা কমে একক বা দ্বিত্ব গীতে পরিণত হয়েছে। এই গানের কেন্দ্রে থাকে কন্যা। কন্যাকে ঘিরে মা, মাসি-পিসি, বোন, বৌদি, বান্ধবী ও অন্যান্য প্রতিবেশিনী সকলে এই গানে অংশগ্রহণ করেন। সুতরাং ধ্রুবপদের ব্যবহার বা ধুঁয়ো ধরার রীতিটি এই বিশেষ লোকগীতিতে প্রযোজ্য। এই গানের লয় প্রলম্বিত। করুণ সুরকে প্রবাহিত করে তোলবার ক্ষেত্রে গানের ধুয়ো কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করে। অনেক সময় একই শব্দবন্ধ বা পদাংশ চরণ থেকে অন্য চরণে উচ্চারিত হয়ে Parallalism বা সমান্তরলতা সৃষ্টি করে, যেমন—

আলু পতর কি পান সমান গো কাকা

মুহি তহর ঝিয় সমান গো ঐ
আলু পতর কি পান হইব গো ঐ
মুইকি তুমর ঝিয় হইমু গো কাকা

(বেবী সাউ প্রণীত 'কাঁদনাগীত : সংগ্রহ ও ইতিবৃত্ত' গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত)

এই সকল গীতির Text বা মূল পাঠটি অনেক ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট থাকে। আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশের মাধ্যমে নতুন Text-এর জন্ম হয়—

> মা, বাবা, মামা ইত্যাদি স্বজন আত্মীয়ের কাছে কি বলে কাঁদা হবে সে বিষয়ে নির্দিষ্ট পাঠ (Text) আছে এবং তার পাঠান্তরও পাওয়া যায়। এইসব গানগুলিতে নারীজীবনের দুঃখ-দুর্দশার কথা করুণ মর্মস্পর্শী ভাষায় ব্যক্ত হয়েছে।[৩]

কাঁদনাগীতের পরিবেশক যেহেতু একমাত্র নারী। তাই নারীর জীবনবৃত্তের স্মৃতিমেদুর খণ্ডচিত্র ছোটো ছোটো কোলাজের মতো ফুটে ওঠে এই গানে। গবেষক দেবশ্রী পালিত তাঁর 'প্রান্তবঙ্গের আন্তর্প্রবেশী লোক সংস্কৃতি' শীর্ষক গবেষণা পত্রের একটি জায়গায় লিখেছেন—

> পশ্চিম সীমান্তবঙ্গের কাঁদনাগীতিগুলির লিঙ্গগত প্রেক্ষিত (Gender Perspective) আলোচনা করলে দেখা যায়, এই টুকরো গীতিগুলি বাংলার এক বিশেষ অঞ্চলের সূত্র ধরে আপামর নারী সমাজের হৃদয় বেদনার অংশীদার সুতরাং, এইদিক থেকে দেখলে কাঁদনাগীতের যেমন আছে সার্বজনীন ও সর্বকালিক রূপ। তেমনি এই গীতগুলি আঞ্চলিক হয়েও, ভাববস্তুর দিক দিয়ে সার্বভৌমত্বের অধিকারী।[৪]

'সুনা ঝিঅ' নামক কাঁদনাগীতে বাবাকে জড়িয়ে মেয়েটি কাঁদতে থাকে এই বলে—

গড়িয়া
পুঅ জনম খ্যাতি দেশ দেশকু, বাপা গো
ঝিঅ জনম সিনা ঘর কণকু বাপা গো
এহা উচিৎ (পৃ. ১২)

অর্থাৎ পুত্রের খ্যাতি ও গুরুত্ব দেশ থেকে দেশান্তরে ছড়িয়ে পড়ে কিন্তু কন্যা সারাটি জীবন ঘরের কোণে বন্ধ থাকে—কিন্তু এই গানটিতে মেয়েটি তার বৈবাহিক জীবনের বন্দি দশা কিছুতেই মেনে নিতে পারবে না বলে তার বাবাকে জানিয়ে দেয়। মেয়েটি তার মাথার উপর চায় উন্মুক্ত আকাশ। তৎকালীন সমাজে বাবাকে পণ দিয়ে পাত্রকে কন্যার পাণিগ্রহণ করতে হতো। বরপণের মতো কন্যাপণ প্রদানের প্রথা শহর ও গ্রাম উভয় ক্ষেত্রেই ছিল। হতদরিদ্র পরিবারগুলিতে বিয়েকে কেন্দ্র করে টাকা-পয়সা বা সোনা-দানার বিনিময় হতো। এই পণের লোভে অনেক দুধের সন্তানকে 'বেচে দিত' পিতা। আমাদের সংগৃহীত 'গেহ্লা ঝিঅ' গানটিতে গেহ্লি নামের মেয়েটি এইরকম নিষ্ঠুর পণপ্রথার নিন্দা করেছে এইভাবে—

ডেঙ্গা তালগাছ বাটকু ছাই। মাগো—
যেতে কুট কলে মঝিয়া ভাই॥ ঐ
বাপা শোই থিলে উত্তর ঘর। ঐ
টঙ্কা পঁহুছিলা দাণ্ড দুয়ার॥ ঐ
যঁহু যঁহু টঙ্কা ধুব দিশিলা। ঐ
তঁহু তঁহু বাবার লোভ বসিলা। ঐ (পৃ. ১)

লম্বা তালগাছ যেমন পথের পথিককে ছায়া দেয়না ঠিক তেমন মাথার উপর বাবা-দাদার মতো বড়োরা জীবনে শান্তি দিতে পারেনা। মেজদা কূট-চক্রান্ত করে বরের কাছ থেকে পণ আদায় করে আনেন। উত্তর দিকের ঘরে বাবা শুয়েছিলেন। মেজদা তার কাছে টাকা পৌঁছে দিলে বাড়ির উঁচু দাওয়ায় বসে বাবা টাকা গুনে নেন এবং ধুতির কোঁচড়ে বেঁধে নেন। বাবার চোখে টাকাগুলি যতই চকচক করে ততই তার টাকার প্রতি লোভ বাড়ে। নারীর প্রতি পরিবারের পুরুষ তথা বাপ-দাদার এইরূপ নিষ্ঠুর ব্যবহারের কাঁদতে কাঁদতে প্রতিবাদ করেছে হতভাগিনী মেয়েটি। এছাড়া দেবশ্রী পালিতের গবেষণাপত্রে উল্লিখিত হয়েছে একটি কাঁদনাগীত। তাতেও প্রকাশ পেয়েছে কন্যাপণের একটি নিষ্ঠুর দৃশ্য—

আম্ব কষি কষি বউল কষি বহুরে
দান দেই থিলু সভারে বসি বহুরে
দান দেই কিরি কি পুণ্য কলু বহুরে
গাই বাছুরি কি বিকাই দেলু বহুরে
গাই বিকি দিলু গুহালে থাই বহুরে
মত্তে বিকি দিলু সভারে থাই বহুরে[৫]

গানটির মধ্যে ফুটে উঠেছে যেন মেয়েটি মানুষ নয়, সে গৃহপালিত পশু। বিয়ের নামে বসে কেনা-বেচার হাট। বিয়ের সভায় সবার সমক্ষে কন্যাপণ দিয়ে আদরে মেয়েকে বরের হাতে তুলে দিল বাবা। গৃহস্থ যেমন গোয়াল থেকে দর-দাম করে টাকা নিয়ে গৃহপালিত গোরুকে ব্যবসায়ীর হাতে তুলে দেয় ঠিক তেমনি। এই কাজে কি কোন পুণ্যার্জন হয়—এইরূপ প্রশ্ন রেখেছে মেয়েটি। কাঁদনাগীতির অধিকাংশ গানগুলির এক সাধারণ মর্মকথা খুঁজে পাওয়া যায় তা হলো—‘বিবাহ’ নামক প্রথাটি আসলে পুরুষের স্বার্থরক্ষার জন্য গড়ে তোলা হয়েছে। যন্ত্রণাময় স্বামীর ঘরতো পরেরই ঘর। সুতরাং পরহস্তে অর্পণ করে পরের ঘরে পাঠানো মানে যমের ঘরে পাঠানো। একটি গানে ফুটে উঠেছে সেই কথা—

পর ঘর নাঞি যমর ঘর বহুরে
বুঝি শুনি করি বিদায় কর বহুরে

গানগুলিতে ‘বিবাহ’ কন্যার কাছে কোনো অর্থই বহন করেনা বরং তার স্বাধীনতার ‘বোধ’-কে নষ্ট করে নিজের প্রাতিষ্ঠানিক কর্তৃত্ব কায়েম করতে চায়—অশিক্ষিত লোকায়ত নারী।”[৬] সুতরাং কান্নার ভাষায় প্রতিবাদতো আছেই—তবে মৃদুভাবে। কারণ স্বামীর ঘর আসলে যমের ঘর—এই ধারণা অধিকাংশ কাঁদনাগীতির লিখিত ও অলিখিত Text-এ খুঁজে পাওয়া গেছে। সুতরাং নারীর স্বাধিকার, ব্যক্তি স্বাধীনতা, মাথার উপর উন্মুক্ত আকাশের আকাঙ্খা যেমন কাঁদনাগীতির মর্মকথা ঠিক তেমনি নিষ্ঠুর কন্যাপণের তীব্র প্রতিবাদ উচ্চারিত হয়েছে কান্নার ভাষায়। এই কাঁদনাগীত ঠিক কোন সময়ে এবং কীভাবে গাওয়া হতো তা নির্দিষ্ট করে বলা যায় না। লোকসংগীতের অন্যান্য ধারার মতোই কোনও এক আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষিত থেকেই এই গানের জন্ম হওয়া স্বাভাবিক ঘটনা। এর উপস্থাপন যেহেতু Sudden situation বা তাৎক্ষণিকভাবে, ফলে একে লিপিরূপে ধরে রাখা অনেক কঠিন। “যার জন্ম তাৎক্ষণিক, আয়ুও সামান্যই। এই শোকপ্রকাশের ক্ষণটুকুই তার বিস্তার ও বৈভব।”[৭] তবে সমাজ জীবনের বাস্তব ঘটনাগুলি উঠে এসেছে এই গানগুলিতে। গৌরীদান ও বাল্যবিবাহের সময় থেকে এই

কাঁদনাগীতির প্রচলন হয়ে আসছে বলে আমার ধারণা। পরবর্তীকালে বেশি বয়সী মেয়েকে বিয়ে দেওয়া কিংবা ভালোবেসে বিয়ে করার কারণে লোকসমাজ থেকে কাঁদনাগীতের প্রচলন ধীরে ধীরে উঠে যায়। সম্পূর্ণ অজানা-অচেনা মানুষের সঙ্গে দুধের সন্তান ঘর করবে আর তার উপর শাশুড়ির শাসন ও গঞ্জনা সহ্য করে পরের ঘরে কীভাবে মানিয়ে চলবে—এই সংশয় ঘনীভূত হয়ে অশ্রু ও সুরে মাধ্যমে কাঁদনাগীত হয়ে ফুটে ওঠে। ফলে অন্যান্য লোকগীতির মতো এই লোকগীতে Stituation বা পরিস্থিতি নির্ভর আবেগমথিত কাব্যভাষার স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ লক্ষ করা যায়।

তবে আজকের দিনে—"কাঁদনাগীতগুলো বর্তমান বিলুপ্ত প্রায়। কারণ সে পরিবেশও আর নেই।"[৮] এ সম্পর্কে 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র একটি প্রতিবেদন—

> এক সময় দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত বাংলার ঘরে ঘরে কাঁদনাগান গাওয়া হতো। কিন্তু সময় বদলেছে। আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতির বদল হয়েছে। ধীরে ধীরে কমেছে কাঁদনা গান গাওয়ার প্রবণতা। এখন তো লোকসাহিত্যের এই ধারাটি শুকিয়ে যেতে বসেছে।[৯]

তবে কোনো সংস্কৃতি সম্পূর্ণ মৃত—এ কথা সমর্থনযোগ্য নয়। কেউ কেউ 'মৃতসংস্কৃতি'র ধারণা পোষণ করলেও আলফ্রেড লিউইস ক্রোবার প্রমুখ নৃবিজ্ঞানীগণ সংস্কৃতির লুপ্তপ্রায় দশা কিংবা পরিবর্তমানতার বৈশিষ্ট্যটিকে মেনে নিতে পারেননি। তাঁদের মতে, "সংস্কৃতি 'সুপার-অর্গানিক' (Super Organic) এবং 'সুপার ইন্ডিভিসুয়াল' (Super Individual)। সুতরাং কোনও সংস্কৃতিরই পুরোপুরি 'মৃত্যু' ঘটতে পারে—একথা ঠিক নয় সংস্কৃতি পরিবর্তিত হতে পারে।"[১০] সুতরাং 'মৃতপ্রায়' অবস্থা বলতে যে-কোনো ক্ষীয়মান সংস্কৃতির সুপ্তস্তর অর্থাৎ 'Latent Phase'-কে বোঝায়। কাঁদনাগীতের যে লুপ্তপ্রায় দশা তা আসলে সংস্কৃতির অবলীন স্তরে আচ্ছন্ন একটি রূপ। সে পুনরুজ্জীবনের আশা রাখে।

উৎসের সন্ধানে

১. বরুণকুমার চক্রবর্তী সম্পাদিত : 'বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতিকোষ', অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স, কলকাতা, ১৯৯৫, পৃ. ৭৭
২. তদেব : পৃ. ৭৭
৩. তদেব
৪. দেবশ্রী পালিত, প্রান্তবঙ্গের আন্তপ্রবেশী লোকসংস্কৃতি (গবেষণাপত্র), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, 'শোধগঙ্গা' আন্তর্জালিক উৎস থেকে সংগৃহীত, ২০১৪, পৃ. ৮২
৫. দেবশ্রী পালিত : পূর্বোক্ত গবেষণাপত্র, পৃ. ৮৪-৮৫
৬. তদেব : পৃ. ৮৩
৭. বেবী সাউ : 'কাঁদনাগীত : সংগ্রহ ও ইতিবৃত্ত', সৃষ্টিসুখ প্রকাশন, কলকাতা, ২০১৮, পশ্চাদ প্রচ্ছদপত্রে মুদ্রিত।
৮. সুব্রত মুখোপাধ্যায় : 'প্রত্যন্ত বাংলার বিস্মৃতপ্রায় কাঁদনাগীত (প্রবন্ধ), লোকশ্রুতি পত্রিকা, দ্বিতীয় সংখ্যা, কলকাতা, জুন ২০০৪, পৃ. ২০১-২০৫
৯. ফটিকচাঁদ ঘোষ : 'কড়চা, পূর্ব মেদিনীপুর', আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৬ জুন, ২০১৮, পৃ. ক ৪
১০. দেবশ্রী পালিত : পূর্বোক্ত গবেষণাপত্র, পৃ. ৮১

মধ্যসুবর্ণরেখার মাড়ো গান

লক্ষীন্দর পলোই

ঝাড়গ্রাম জেলার গোপীবল্লভপুর ১নং ব্লক, বেলেবাড়াব্লক, সাঁকরাইল ব্লক, নয়াগ্রাম ব্লক নিয়ে মধ্যসুবর্ণরেখার অবস্থান। সুবর্ণরৈখিক ভাষায় গাজনকে মাড়ো বলা হয় এবং চড়ককে বলা হয় উড়া। যে কারণে ইংরেজ সরকার গাজন ও চড়ক উৎসব বন্ধের আইন করলেও সুবর্ণরৈখিক ভাষার কারণে মধ্যসুবর্ণরেখার তীরবর্তী অঞ্চলে মাড়ো ও উড়া—দুই উৎসব বন্ধ হয়নি। ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজ সরকার বঙ্গো গাজন ও চড়ক উৎসব বন্ধের ঘোষণা করে। স্যার সোসল বিডন গাজন ও চড়ককে অমানুষিক প্রথা আখ্যা দিয়ে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। কারণ গাজন ও চড়ককে কেন্দ্র করে ভক্তরা পিঠে বড়শি ঢুকিয়ে বাঁশে যে ঘুরে থাকে তাতে প্রচুর ভক্ত মারা যায়। তাদের মতে জিভফোড়, রজনীফোড়, চাটুফোড়, ভুইসাঁপটা প্রভৃতি হল ধর্মের নামে হিংস্রতা। হিন্দুরা ঢাকঢোল বাজিয়ে উদ্দাম নৃত্য করে ভগবানকে ডাকে, আর খ্রিস্টান ধর্মে মোমবাতি জ্বালিয়ে নীরবতার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরকে ডাকা হয়। ইংরেজ সরকার হিন্দুদের এই উৎসবকে অপসংস্কৃতি বলে আখ্যা দেয়। ঐ একই সময়ে ১৮৬৫ খ্রি. লর্ড ডালহৌসি ইমানসিপেশান আইন জারি করে হিন্দুধর্ম থেকে ধর্মান্তরিত সাঁওতাল, মুন্ডা, লোধা, ওরাঁও প্রমুখদের সন্তান-সন্ততিদের পিতার সম্পত্তি উত্তরাধিকারী করেন। ফলে জঙ্গালমহলে প্রচুর সাঁওতাল, মুন্ডা, লোধা, ওরাঁও প্রমুখরা খ্রিস্টানধর্মে ধর্মান্তরিত হন। জঙ্গালমহলের রাজশক্তি উপজাতি সমাজকে খ্রিস্টানধর্মে ধর্মান্তরিত না হওয়ার আহ্বান জানান। বঙ্গো মুন্ডা-কোড়া, ভুঁইহার-ভুমিজ প্রমুখদের শ্মশানদেবতা ভৈরবপুজোর একটা ঐতিহ্য ছিল।

জঙ্গালমহলের রাজশক্তি সেই দেবতাকে হিন্দু-শিবদেবতায় রূপান্তরিত করেন। এর ফলে উপজাতি সমাজ প্রজননের দেবতারূপে শিবকে গ্রহণ করে। কেশয়াড়ির-মহাদেবঙ্কমন্দির, কপিলেশ্বর, কাশীশ্বর, গগনেশ্বর, দাঁতনের-শ্যামলেশ্বর, দেউলবাড়ের-রামেশ্বর, চন্দ্ররেখাগড়ের -সহস্রলিঙ্গা, চন্দ্রীর-চন্দনেশ্বর, চরচিতার-চোরেশ্বর, ভক্তাপাটের-শিলেটেশ্বর, কাশীডাঙার-কাশেশ্বর এসবই রাজশক্তির পৃষ্ঠপোষকতায় সর্বজনীন গণদেবতায় রূপান্তরিত হন। সাঁওতাল, মুন্ডা, লোধা, ওরাঁও, কোড়া, ভুঁইহার ভূমিজ্, দণ্ডমাঝি, সকলকেই মন্দিরে ভক্ত হওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়।

শিব আদিতে অনার্যদেবতা, বেদে তিনি শিশ্নদেবা, লিঙ্গারূপী ভৈরব, যৌনিপটের উপর স্থাপিত জনশক্তির দেবতা। দ্রাবিড়দের কাছে তিনি তিরুবয়র। গুপ্তযুগে তিনি বস্তুলিঙ্গা ও মুখলিঙ্গা রূপে পূজিত হন। যদিও জঙ্গালমহলে মুখলিঙ্গা নেই, তবে ঝাড়গ্রামের সাবিত্রীমন্দিরে

চতুর্মুখ লিঙ্গ আছেন। ইতিহাসে দেখা যায় সপ্তম শতকে গুপ্তসামন্ত নরেন্দ্রগুপ্ত (শশাঙ্ক) গৌড়ে স্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করে দণ্ডভুক্তি হয়ে ভুবনেশ্বর ও কঙ্গোদ জয় করেন। নরেন্দ্রগুপ্তই জঙ্গালমহলে শৈবধর্মের বিস্তার ঘটিয়ে রাজকীয় শিবপুজোর প্রচলন ঘটান। কটক ও বালেশ্বরের দত্তবংশ ও গঞ্জামের শৈলোদ্ভব বংশের রাজারা নরেন্দ্রগুপ্তের সামন্ত ছিলেন তারা জঙ্গালমহলে প্রচুর শিবমন্দির গড়ে তোলেন। ওড়িশার ভঞ্জরাজারা ভুঁইহার-ভূমিজ্ এর অংশ বলেও অনেকে মনে করেন। ভঞ্জরাজারা ছিলেন ভৌমকার, তারা ভৈরবের পুজো করতেন। তবে পরে ভঞ্জরাজাদের পরাজিত করে জঙ্গালমহলে কেশরী বংশের প্রতিষ্ঠা হয়, তবে এরাও শৈব ছিলেন। আবার কেশরীদের পরাজিত করে গঙ্গাবংশ রাজত্ব করেন। এঁরাও জঙ্গালমহলে শৈবধর্মের বিস্তার ঘটান। নয়াবসান, গোপীবল্লভপুর, নয়াগ্রাম্, জাহানপুর দীর্ঘদিন ভঞ্জরাজাদের অধীনে ছিল ফলে শৈবধর্মের ব্যাপক প্রসার লাভ করে। এর পর শাক্তের অত্যাচারে শ্যামানন্দ সপ্তদশ শতকের প্রথমার্ধে জঙ্গালমহলে বৈষ্ণবধর্মের প্রসার ঘটান। প্রাচীন মল্লরাজাদের বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষার চেষ্টা করেন। অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কারণে জমিদাররা বৈষ্ণবধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং মন্দির নির্মাণে জমি ও গ্রাম দান করেন। তবু জঙ্গালমহলের প্রত্যেকটি বর্ধিষ্ণু গ্রামে ২০০-এর বেশি শিবের মন্দির আছে এবং শিবপুজো ব্যাপক প্রচলিত।

চৈত্র, বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ—এই তিন মাস জঙ্গালমহলে গাজন ও চড়ক উৎসব পালিত হয়। ক্রমশ হিন্দুধর্মীরা মহড়া করে পৈতে এবং বেতগুচ্ছ ধারণ করে। এলাকার রাজা ও জমিদাররাও মাড়োতে উৎসাহ জোগান। ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজ সরকার বঙ্গে গাজন ও চড়ক উৎসব বন্ধের ঘোষণা করলে এলাকার রাজা ও জমিদাররা চিন্তায় পড়েন। দেশজুড়ে হিন্দু পুনরুত্থানবাদী আন্দোলন শুরু হয়। যদিও বিদ্যাসাগর ইংরেজদের এই আইনকে সমর্থন জানিয়ে ছিলেন। কারণ ১৮৫৫ সালে বহুলোকের স্বাক্ষর নিয়ে কৌলিন্যপ্রথা, বহুবিবাহ রদের জন্য তিনি আন্দোলন করেন। রাজনারায়ণ বসু নিম্নবর্ণের মানুষের মধ্যে সুরা পানের প্রবণতা লক্ষ করে ১৮৬১ সালে মেদিনীপুরে সুরাপান নিবারণী সভা প্রতিষ্ঠা করেন।

তবে মাড়ো নিয়ে প্রচলিত জনশ্রুতি, বেলিয়াবাড়া প্রহরাজের অধীনে থাকা ভক্তাপাট গ্রামে কেশরায় জিউ ও শিলেটেশ্বরের এর প্রাঙ্গণে ১৮৬৫ সালে প্রহরাজের ডাকে এবং সেই সময় বিদ্যাসাগর মশাই মহাপাল গ্রামে একটি ইংরেজি গ্রামীণ স্কুল প্রতিষ্ঠার জন্য আসেন। মহাপাল হয়ে পেটবিন্দীতে যাওয়ার সময় ভক্তাপাঠ গ্রামে প্রহরাজ মশায় তাঁকে কেশরায় জিউ ও শিলেটেশ্বর মন্দির পরিদর্শন করান। ভক্তদের সমাবেশকে কেন্দ্র করে এই গ্রামের নাম ভক্তাপাট হয়েছে। আগে এই গ্রামের নাম দেউলবাড় ছিল। ১৩ মৌজার ভক্ত সমাবেশ থেকে এই গ্রামের নাম ভক্তাপাট হয়েছে।[১] বৈষ্ণব ও শৈব দুই প্রভাবে ১৩ মৌজার ভক্ত সমাবেশকে কেন্দ্র করে ব্রিটিশ নিয়ম মেনে অহিংসভাবে মাড়ো উঠানোর কথা বলা হয়।

আবার আর একটি জনশ্রুতি এই সময় বেলেবাড়ার প্রহরাজ কালবৈশাখের বৃষ্টির কাদা মাড়াতে মাড়াতে গোরুর গাড়িতে করে দেউলবাড়ে আসেন এবং ১৩ মৌজা নিয়ে এক পাট এর আয়োজন করেন। সেই পাটের বা সভা থেকে মাড়ো উঠানোর কথা উঠে আসে। গোরুর গাড়ির মহড়া ধরে নাচতে নাচতে ভক্তরা আসেন, তাই মহড়া ধরা থেকে মাড়ো উঠানো ও মহড়ানাচ কথাটির উৎপত্তি। আবার পাট উৎসবকে কেন্দ্র করে দেউলবাড় গ্রামের নতুন

নাম ভক্তাপাট হয়েছে বলে অনেকে মনে করেন। গ্রামের বিভিন্ন জাতির মানুষ ভক্ত হওয়ার জন্য এগিয়ে আসেন। বিভিন্ন জাতি থেকে ১৩ জন শিবের ভক্ত স্থির হয়। সভাতে মাড়োয় অহিংসার বাতাবরণের জন্য জিবফোড়, রজনীফোড়, চাটুফোড়, ভুইসাঁপটা প্রভৃতি বিষয়গুলি থেকে দূরে থাকার কথা বলা হয়। পূর্বে মাড়োতে এগুলি নিষিদ্ধও ছিল যদিও আধুনিককালে এইগুলি আবার যুক্ত হয়।

আবার মাড়ো কথাটি নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন মত প্রচলিত। বেলিয়াবাড়ার কানপুর গ্রামের নীরদ বরণ বেরা বলেন-মাড়োতে মুখচালার ভূমিকা প্রধান। বাঁশের বেত দিয়ে তৈরি মুখচালাতেই ভক্তানাচ ও ভক্তাগান এবং নাচনি নাচের আসর বসে। সুবর্ণরৈখিক ভাষায় মুখকে মুহু বলে। তাই 'মুহুচা-আলা' বা 'মুখচালা' থেকে 'মাড়ো' কথাটি এসেছে বলে মনে করা হয়। আবার গোপীবল্লভপুরের বর্গীডাঙার আশিস দাস বলেন, নিয়ামাড়াকে কেন্দ্র করে মাড়ো আবর্তিত বলে এর নাম মাড়ো, কারণ মহাদেবের ভক্তা বা সন্ন্যাসীদের ১৫ দিনের সন্ন্যাস গ্রহণের পবিত্রতা রক্ষার অগ্নিপরীক্ষা হলো মাড়োর মূল অনুষ্ঠান। তাই অগ্নিকে সুবর্ণরৈখিক ভাষায় 'নিইআ' বলে, আর আগুনের উপর হেঁটে যাওয়াকে সুবর্ণরৈখিক ভাষায় 'মাড়া' বলে। তাই নিয়া মাড়া থেকে মাড়ো কথাটির উৎপত্তি বলে মনে করা হয়। হরিদাস পালিত বলেন—গাজনের আভিধানিক অর্থ শিবের উৎসব, সংস্কৃত গর্জন শব্দ থেকে গাজন শব্দের উৎপত্তি হয়েছে।[২] উৎকল ও মেদিনীপুরে এই উৎসবের নাম সাহী যাত্রা হয়েছ। বিনয় ঘোষ বলেন—'গর্জন' শব্দ থেকে 'গাজন' হয়েছে।[৩] শ্রীমণি বর্ধন বলেন—গাজন উৎসব জনসাধারণের উৎসব।[৪]

ভক্তাপাটের শিলেটেশ্বর-এর পূজারি ধীরেন আচার্য বলেন ভক্তানাচের মঞ্চ থেকে মাড়ো কথাটি এসেছে।[৫] সুধীর করণ তাঁর 'সীমান্ত বাংলার লোকযান' গ্রন্থে মুন্ডারী মান্ডা থেকে 'মাড়ো' কথাটি এসেছে বলে মনে করেন, তিনি বলেছেন সিংভূম রাঁচি অঞ্চলের হিন্দুধর্মী মুন্ডারা মান্ডাপরব পালন করে, সেই মান্ডার পরির্তিত রূপ হলো মাড়ো। মণ্ডপ শব্দ থেকে এর উদ্ভব।[৬] নৃতত্ত্ববিদ নির্মল কুমার বসু তাঁর 'হিন্দু সমাজের গড়ন' গ্রন্থে বলেন যে পরবে জঙ্গালমহলের মাড়োর মতো মান্ডাপরবে যোগদানকারীরা সাত্ত্বিকভাবে শুদ্ধাচার করে থাকেন। আর গাজন শব্দটি মাড়োর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। গাজনকে অনেকে গাজ্জন বা গার্জন বা গ্রামজনের বা গাঁ জনের বা গ্রামের মানুষের উৎসব বলেছেন।[৭] বিনয় ঘোষ 'পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি' গ্রন্থে গাঁ কথাটির উপর জোর দিয়েছেন।[৮] সুবর্ণরৈখিক ভাষায় গ্রামকে গাঁআ বলে।

যদিও মধ্যসুবর্ণরেখার তীরবর্তী অঞ্চলের মাড়োতে গাজন কথাটি ব্যবহার হয় না। চরচিতায় চোরেশ্বর মন্দিরে গাজনকে 'মেএল' বলে এবং মদন শোলের পরের দিন মাড়োর সন্ন্যাস বা ভক্তাদের নিয়ম ভঙ্গ বা পাট উপলক্ষ্যে সুবর্ণরেখার বালিতে যে জাত বা মেলা বসে তাকে বালিজাত বলে। সুবর্ণরৈখিক ভাষায় মেলাকে জাত বলে। কাশিডিঙার চড়ককে বলা হয় 'উড়া', বাঘেশ্বরের মাড়ো আবার 'নিয়ামাড়া', ভক্তাপাঠের শিলেটেশ্বরের মাড়ো 'পাট' হিসেবে বিখ্যাত।

মাড়োর প্রধান অঙ্গ বা শক্তি হলো কামিনা। কামিনা এখানে শিবশক্তি। পুরাণে শিব শূদ্রের দেবতা, বেদে শিব শিশ্নদেবা। বেদে শিবের কোনো স্থান নেই। তিনি লোধা বা কিরাতদের দ্বারা পূজিত হন। তাই কিরাতবেশী শিব আর ঘরণী শিবানী। লোধানী বা কামিনী অনার্য কন্যা ও শিবের পত্নী বলা হয়েছে। কামিনী দানব কন্যা ও ব্রাত্য দেবী। মাড়োতে কামিনীকে পার্বতীর

দাসী বলা হয়েছে। মহাদেবের রক্ষিতা রূপে দেখানো হয়েছে। কামিনী দুর্গার চুলবাঁধা, কাপড়কাচা প্রভৃতি করতেন কিন্তু কামিনীর প্রতি মহাদেবের নজর পড়ে। দুর্গা বুঝতে পেরে কামিনীকে হত্যা করে নেতনালায় ফেলে দেন। পরে মহাদেব কামিনীকে নেতনালায় খুঁজে পান। মহাদেব কামিনীর সৎকার করেন ১৩ দিনের এই ক্রিয়াকর্ম হলো মাড়ো।[৫] মাড়োতে শিব হলেন কৃষক। তিনি কৃষক ও প্রজননের প্রতীক রূপেই মাড়োতে আবির্ভূত হন। মাড়োতে শিব আবার গণদেবতা। কামিনী বা কামিনা ধর্মশক্তিরূপেই পূজাপ্রাপ্ত হন, ধর্মের গাজনে অপরিহার্য ছিল কামিনী। নানান বর্ণ ও উপবর্ণের মানুষ এই সার্বজনীন মাড়োতে যোগ দেন।

মধ্যসুবর্ণরেখা অববাহিকা অঞ্চলে ব্রাত্য অনার্যদের জাতে ওঠার নাম হলো মাড়ো। মাড়োতে আছে নিম্নবর্গের মানুষের কথা। মাড়ো হলো মহামিলন ও সর্বজনীনের প্রতীক। মহাদেব এখানে দেশের, দশের এবং গ্রাম ও মৌজার প্রতিভূ। তাই মাড়ো ওঠার পর শেষদিন মহামেল বা মিলনপ্রাঙ্গণে ভক্তারা পাটযাত্রায় মিলিত হন এবং হর হর মহাদেব বলতে বলতে মিলনক্ষেত্র বা বালিজাত করেন। অনেক সাঁওতাল সুবর্ণরেখাতে পূর্বপুরুষদের উদ্দেশ্যে হরিবোল ধ্বনি দিতে দিতে পিণ্ডদান বা দামোদর যাত্রা করেন।

মাড়োতে মহড়া বা মুহা নাচ হয়ে থাকে—গোরুর মাথার কঙ্কাল ও নর মানুষের কঙ্কাল নিয়ে এই নাচ বা মহড়া হতো বলে একে মুহা নাচ বা মহড়া নাচ বলে। ভক্ত সহযোগে নন্দী ও ভৃঙ্গিরা এই নাচ করতো বলে একে ভূতনাচও বলা হয়। তবে বর্তমানে শিবপুরাণের মহিষাসুরবধ, গণেশ-বন্দনা, ছৌ-নাচের পালা মহড়া করে দেখান। আবার কিছু লোকপালা চিল্কিগড় থেকে আসতো যেমন—হুলিয়া, নগরঝাটা, বাবুছো, গণকঠাকুর ও বুড়ি, ভালুক, কালিকাঠাকুর, জামডালি, ললিতাপালা, চড়িয়া চিড়িয়ানি, মনোহরপালা প্রভৃতি আসর বসতো, তবে সরাইকেল্লার ছৌ এবং পুরুলিয়ার ছৌ আধুনিক কালের রূপান্তর।

মধ্যসুবর্ণরেখার তীরবর্তী অঞ্চলের মাড়োর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো নাচনি নাচ। মাড়োতে নাচনি নাচ বাধ্যতামুলক। রংবাহা শাড়িতে নাচনি নাচ হয়। প্রচলিত জনশ্রুতি-পার্বতী শিবের ভক্তাদের ভক্তিপরীক্ষার জন্য রংবাহা শাড়ি পরে রান্না করে পদ্মপাতায় বসিয়ে খাওয়াচ্ছিলেন। ভক্তরা পার্বতীর রংবাহার শাড়ির ভিতরে তার শরীর দেখে ভক্তাদের ধাতু ক্ষয় হয়। তিনি তা মহাদেবকে জানান এই দেখুন আপনার ভক্তাদের ভক্তি। পার্বতী তাদের অভিশাপ দেন এবং ১৩ ভক্তাকে বলি দেওয়ার কথা বলেন। যদিও মহাদেব এই ধাতুকে পদ্মপাতার আঠা বলে উল্লেখ করেন। রঙবাহা শাড়ি থেকে কামিনীর নাচনি নাচের উৎপত্তি। মাড়োতে নাচনি ওড়িশা থেকে আসে। মাড়ো এই নাচনি পুরুলিয়ার নাচনি আলাদা। মাড়োর নাচনি নাচ এর গান ও নাচ আলাদা। নাচনি নাচের গান—

১. সুবর্ণরেখানদীতে ছাড়িনু ডঙা/পা খিয়া মুহু বড় রঙা।[৯]

২. চম্পাফুলমলিহার/কে দিল তোতে বাঁধি/কে দিলো গাঁথি লো কে দিল গাঁথি।[১০]

৩. কি সুন্দর নাচুঁই নানি নাচিছে/কেয়া ফুল তর মরো/দেখনা কেমন লাগিছে/নাচুঁই নানি নাচিছে।[১১]

মাড়োর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো মাড়োর গান এবং ভক্তানাচ ও ভক্তানাচের গান। প্রথমে ধর্মের ঢলুয়া ভাইরা আখড়া দেন। তারপর শুদ্ধ উত্তরী দিয়ে ভক্তারা বেতগুচ্ছ নিয়ে নাচ করেন। নাচনি প্রথমে ভক্তাদের সাথে ভক্তা গানে নেচে থাকেন, দূর-দূরান্ত থেকে

বিভিন্ন মৌজার হাউসি বা গাউকিরা ভক্তাগান করেন। যেমন—পাটভক্তা বলঅ মুই পাটের কহি নাম/রাধা চক্রে তুস্ট মুই কৃষ্নবলরাম'/বাজারে ঢলুয়া ভাই ঢোলে দিয়া কাঠি/তের ভক্তা নাচিকরি বসমতা যাউ পাঠি। এছাড়া মাড়োর গানগুলি হলো—

১. প্রশ্ন : কে তোমরা কোথা যাও তোমরা হাতে দেখি বেঙ্গা লাঠি যাবে কোথা কে? মাথাতে কিসের ফোঁটা গালে কিসের ডোর? তোমাকে মুক্তি দেখি যেন গোরু চোর। ইহার উত্তর দাদা বলে দিবে হেথা। না বলিলে শিবের স্থানে কাটা যাবে মাথা।[১২]

উত্তর : গিয়াছিলাম গঙ্গা স্থানে, শিরে চক্রপানি। হাতেতে বেতের বাড়ি, দিলেন শুলপানি। কপালে চন্দনের ফোঁটা, গালে উত্তরি ডোর। শিবের ভকতা আমরা, নই গোরু চোর। ইহার উত্তর দাদা বলে দিলাব হেথা। কেন দাদা শিবের স্থানে কাটা যাবে মাথা।

২. প্রশ্ন : কোথা হৈতে এলেন দাদা কাররে হাকও। উড়াইয়ে আলিম ছাতা চামর উদল। কোথা হৈতে এলেন দাদা দেখিতে ধবল পথের মধ্যে হয়ে গেছে সাততালে জল। নৌকা নাই ডিঙা নাই নাইক কর্ণ ধারা। কিরূপে সন্ন্যাসী দাদা হয়ে যাবে পারাই? ইহার উত্তর দাদা বলে দিবে হেথা। না বলিলে মুঘরেতে ছেঁচে দিব মাথা।[১৩]

উত্তর : ঘাট হৈতে এলাম মোরা হাকন্দ। উড়াইয়ে আলিম ছাতা উদন্ত। ঘাট হৈতে এলাম মোরা লখিতে ধবল। মধ্যে ডাক শুনি এলেন মহাদেবে। কর্ণধার হয়ে শিব বাইতে লাগিলেন। ভাবনদী পার করি একুলে উঠালেন। ইহার উত্তর দাদা বলে দিলাম হেথা। কেন দাদা মুঘরেতে ছেঁচে দিবে মাথা।

৩. প্রশ্ন: কোথা যাবেন বল দাদা হাকরি বারে? কুম্ভরানি পড়ে আছে সমুদ্রের তীরে। আলিম বেত ভক্ত সর্বজান অবহেলে গিলিয়া রবে জলের ভিতর। কিরূপে বাহি ভক্তি দাদা বল না উত্তর? ইহার উত্তর দাদা বলিবে আমারে। না বলিলে কাল সর্প ডংশিবে তোমারে।[১৪]

উত্তর : হাকন্দ করিতে যাবো আমরা সর্বজন। ত্রিশূল মেরে কুম্ভীরানীর বধিব জীবন। ত্রিশূল মেরে কুম্ভীরানির প্রাণ ফেটে যাবে। ঢাকে দিয়াত্তর নাচে ভগতা গাজন ভিতরে। ঊর্ধ্বমুখে ইহার উত্তর দাদা বলিলাম তোমারে। কেন দাদা কালসর্প ডংশিবে আমারে।

৪. প্রশ্ন : চলেছ ভকতাগণ হাতে লয়ে দণ্ড। কিরূপেতে জলে নামি করিবে হাকন্দ। দুরন্ত রাক্ষস আছে জলের ভিতর। দেব দানব ভয়ে কাঁপে নাম জলধর। ত্রিভুবন পিনিল বীর আপনারি বলে। তোমারে ধরিয়ে আন ডুবাইবে জলে। ফিরে যাও ভকতাগণ শিব মণ্ডো পেতে। কেন প্রাণ হারাইবে রাক্ষসের হাতে। ইহার উত্তর দাদা আমারে বলিবে। তবেত তোমরা জলে নামি হাকন্দ করিবে।[১৫]

উত্তর : কৈলাসেতে শিবের সনে হয়েছিল রণ। দুস্ট জলধর বেটা হয়েছে পতন। জলে কেহ দুস্ট নাই মিথ্যা কথা বল। মন আনন্দে জলে নামি হাকন্দ করি চল। ইহার উত্তর দাদা তোমারে বলিলাম। মন আনন্দে জলে নামি হাকন্দ করিলাম।

তবে মহাদেব যেহুতু এখানে চাষি এবং সর্বজনীন তাই ধর্মঠাকুরের ভক্তদের বিশেষ ভূমিকা থাকে। ডোম বা বাগদি রূপে পরিচিত ঢোল বাদক ও সানাইবাদকেরা এই সময় মন্দিরে ওঠার অনুমতি পান।

মাড়োর নিয়ম হলো মাড়োতে কামিনাঘটের ভূমিকা থাকে, চৈত্রমাসে সংক্রান্তির আগে কামিনাঘট তুলতে হয়। মাড়ো হোক বা না হোক কামিনাঘট তুলে রাখতেই হয়। এরপর

দেশনীতি বা মৌজাপ্রথা অনুসারে ১৩ মৌজার দেশমালিককে ডেকে আলোচনা সভা বসে মাড়ো ওঠার দিন স্থির হয়। জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে সবাই সর্বজনীন মাড়োতে যোগদান করে। প্রথমে ঢোলুয়া ঢাকে কাঠি পিটে ১৩ মৌজায় জানিয়ে দিয়ে আসে। তারপর মাড়ো ওঠানো হয়। মাড়োওঠার দিনকে সাধারণ উত্তরি বলে। এরপর ভক্তা কামান দিয়ে নদীতে স্নান করে। কামিনা ভক্তা (কামিনা বা শিবশক্তি) পাটভক্তা (প্রধানসন্ন্যাসী) ও দড়ুঁয়াভক্তা (ধুনুচিতে ধূনা দেওয়া) শিবগোত্র নিয়ে পৈতে পরে বেতগোছা ধারণ করেন। এরপর নদীতে বেতগোছা (বেতলকাঠি) রেখে মহাদেবের পিড় ও আলম (পতাকা) তৈরি করে চারদিক ঘুরে পুরোহিত মাড়ো তুলেন। এর পর হাঁকড় বা হাকন্দ (হাকন্দ নদীতে ১২ জন ভক্তার আত্মবিসর্জনকে নিয়ে পুরাণে হাকন্দ যাত্রার কথা আছে) বা হুঙ্কার দিতে দিতে গ্রাম প্রদক্ষিণ করেন। গ্রামের অন্যান্য দেবদেবীর পুজো দেওয়াকেও হাঁকড় বলে। অনেকে মঙ্গল কামনায় বাড়িতে ভক্তা ডেকে 'বেতদন্দ' বা আলিমপুজো' করান।

এই সময় নাচনি নিয়ে ভক্তারা ভিক্ষা করতে বের হন। এই দিন থেকে জাগরণ পড়ে যায়। ১৫ দিন গ্রামে নিরামষ ভোজন এবং হাল বা লাঙল দেওয়া বন্ধ থাকে। এর পর একে একে বাকি ভক্তারা যোগ দেন, দেউলভক্তা (হিসেব রক্ষক), ফুলভক্তা (ফুলতোলার দায়িত্বে), ভাণ্ডার ঘরিয়া (খাদ্যের দায়িত্বে), চন্দনপাত্র (চন্দন দেওয়া), ভোগপাত্র (প্রসাদ তৈরি) আলমস্বামী (পতাকা বহনকারী), পোড়াস্বামী (ধুনুচিতে অগ্নি দেওয়া) ছত্রস্বামী (শিবের ছাতা বহনকারী) মেলপাত্র (মহামেল বা পাটের দায়িত্ব) কোটাল পাত্র (ভক্তদের রক্ষক) এছাড়াও ঝাটিপাত্র, গোময় পাত্র, ধুতিপাত্র এবং মানত ভক্তা যোগ দেন। এরপর শুরু হয় 'শুদ্ধউত্তরি'। উত্তরির দিন থেকে শুরু হয় আগুনের উপর 'ভক্তাঝুলা' অনুষ্ঠান। আগুনের নালাতে ঝুলতে হয়-এর জন্য তৈরি হয় ঝুলনকাঠ। একে হিন্দোল কাঠ বলে। তারপর নাকধরে মন্দির প্রদক্ষিণ করতে হয় যাকে বলে 'হাঁটুহুঁটায়'। এই অনুষ্ঠান শুদ্ধ উত্তরি দিন থেকে মেল পর্যন্ত চলে।

এরপর হয় কামিনীর 'কাজঘর' বা 'মেলঘর'। এই দিন হর-পার্বতীর মানত করে ভক্তরা মহাদেবের মাথায় জল ঢালে। দুপুরবেলা ভুঁইশাপটা, জিবফোঁড়, রজনীফোঁড়, চাটুফোঁড়, প্রভৃতি কৃচ্ছ্রমূলক প্রথা ভক্তরা মানত ভক্তরা করে থাকেন। ভোর রাতে অন্য মৌজা থেকে জল ও মাটি নিয়ে 'গরিয়াভার' তোলা হয় এবং শস্যকামনায় চাষ-আবাদ ভালো হওয়ার জন্য মহাদেবের মাথায় দেওয়া হয়। মঙ্গল কামনায় সকালে মেয়েরা অইধা পড়ে। মাড়ো ওঠার ১১ দিনে পাট হয়। মাড়োর শেষ দিনকে পাট বলে। পাট হলো একধরনের গোরুরগাড়ির চাকা দিয়ে তৈরি রথ। নদী থেকে সমস্ত ভক্তা মাথা মুণ্ডন করে নতুন পোষাক পরে পাট ভক্তাকে সেই রথে চাপিয়ে নিয়ে পাট গান করতে করতে ১৩ মৌজা ঘুরিয়ে নিয়ে আসেন। পাট দিয়েই মাড়োর সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

উৎসের সন্ধানে

১. তথ্যদাতা : ধীরেন আচার্য, গ্রাম-ভক্তাপাট, পো-পেটবিন্দী, জেলা-ঝড়গ্রাম, জাতি-ব্রাহ্মণ, পেশা-পুরোহিত, বয়স-৬৫, তারিখ-১৫/৭/১৬। গ্রহীতা-লক্ষীন্দর পালোই, ঝাড়গ্রাম।

২. হরিদাস পালিত : 'আদ্যের গম্ভীরা', লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলিকাতা, পৃ. ৪৪

৩. বিনয় ঘোষ : 'পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি', চতুর্থ খণ্ড, প্রকাশভবন, কলিকাতা ২০০৮, পৃ. ৩২

৪. মনোজিৎ অধিকারী : 'গাজন', দে'জ পাবলিশিং, কলিকাতা ২০১৬ পৃ. ১৭

৫. উৎস-১

৬. সুধীর করণ : 'সীমান্ত বাংলার লোকযান' করুণা প্রকাশনী, কলিকাতা, ১৪০২ পৃ. ৪৯

৭. তদেব, প্রাগুক্ত

৮. তদেব, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫

৯. তথ্যদাতা-কানাই সিং, গ্রাম-ভক্তাপাট, পো-পেটবিন্দী, জেলা-ঝাড়গ্রাম জাতি-ভূমিজ, বয়স-৬৫, পেশা-কৃষক। তারিখ-১৫/৭/১৬। গ্রহীতা-লক্ষীন্দর পালোই, ঝাড়গ্রাম।

১০. তদেব

১১. তদেব

১২. তথ্যদাতা-জন খামরী, গ্রাম-মলাই, পো-পেটবিন্দী, জেলা-ঝাড়গ্রাম, জাতি-দণ্ডমাঝি, বয়স-৫৭, পেশা-শ্রমিক। তারিখ-২০/১/১৬। গ্রহীতা-লক্ষীন্দর পালোই, ঝাড়গ্রাম।

১৩. তদেব

১৪. তথ্যদাতা-সতীশ পাত্র, গ্রাম-আগড়বনী পো-মলিঞ্চা, জেলা-ঝাড়গ্রাম জাতি-সদগোপ, পেশা-কৃষক বয়স-৭০, তারিখ-১২/২/১৫ গ্রহীতা-লক্ষীন্দর পালোই, ঝাড়গ্রাম।

১৫. তদেব

❑ অন্যান্য লোকসংগীত

বাউলসম্রাট শাহ আবদুল করিম ও তাঁর গণসংগীত

শৌভিক পাল

কাঁটাতারের বেড়া দুই বাংলার সংস্কৃতির মধ্যেও যে অনেকখানি দূরত্ব তৈরি করেছে, তার প্রমাণ। পশ্চিমবঙ্গের অনেক সংস্কৃতিবান মানুষ বাংলাদেশের বাউলসম্রাট শাহ আবদুল করিমের নামের সঙ্গে পরিচিত নন। অথচ বাংলাদেশের কেবলমাত্র বাউল গানের জগতেই নয়, সে দেশের লোকসংগীত এবং প্রায় সমস্ত গণ আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত জনজাগরণের গানে এই সাধক শিল্পীর ভূমিকা অপরিসীম।

শাহ আবদুল করিম ১৯১৬ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি সিলেট জেলার অন্তর্গত সুনামগঞ্জের দিরাই থানার উজানধল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ছোটোবেলাতেই তিনি বাবাকে হারান। দারিদ্র্যের কারণে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা লাভ তাঁর হয়ে ওঠেনি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে শিক্ষানুরাগী তৈমুর চৌধুরীর বাড়িতে স্থাপিত নৈশ বিদ্যালয়ে কিছুকাল পড়াশোনা করেন। তারপর গুজব ওঠে যে, যারা স্কুলে পড়বে ব্রিটিশ তাদেরকে যুদ্ধ করতে নিয়ে যাবে। সেই ভয়ে সবার সঙ্গে তিনিও স্কুল যাওয়া বন্ধ করেন। সংসার চালানোর জন্য রাখালের চাকরিতে যোগ দেন। এই সময় থেকেই ধীরে ধীরে গানের জগতে প্রবেশ। ছোটোবেলায় তাঁর বাবার চাচা নসিব উল্লার কাছে একটি গান প্রায়ই শুনতেন—"ভাবিয়া দেখ মনে/মাটির সারিন্দারে বাজায় কোন জনে।" এই গান তাঁর মনে গভীরভাবে রেখাপাত করেছিল। মাঠে গোরু চড়ানোর সময় এই গান গুনগুন করতেন। নসিব উল্লা ছাড়াও শাহ আবদুল করিমের ওস্তাদ ছিলেন গ্রামের করমুদ্দিন, তারপর নেত্রকোনার সাধক বাউল রশিদউদ্দিনের কাছে কিছুকাল বাউল সংগীতে দীক্ষা নেন। এভাবেই একসময়ে গানের জগতে সম্পূর্ণ জড়িয়ে যান বাউল আবদুল করিম। তাদের বাড়ির উঠোনে গানের আসর বসত। সে সময় তাঁর ওস্তাদ ছিলেন মৌলা বক্স মুনশি এবং ওস্তাদ শাহ ইব্রাহিম মস্তান।

জীবনে অনেক সম্মান, সংবর্ধনা পাওয়া সত্ত্বেও শেষদিন পর্যন্ত তাঁকে দারিদ্র্য ও দুর্দশার মধ্যে কাটাতে হয়েছে। শেষ জীবনে বার্ধক্যভাতাটুকু ঠিক মতো পেতেন না। যে অভাব অনটনের পরিবেশের মধ্যে তাঁর পথ চলা শুরু হয়েছিল, কালনী নদীর তীরে দোচালা ভিটেতে এই স্বনামধন্য বাউলসম্রাটের অন্তিমকালের দিনগুলিও কেটেছে শুরুর দিনগুলোর মতোই কষ্টে। অথচ আশ্চর্যের বিষয় তাঁর গানগুলি গেয়ে কত গায়ক কত অর্থ উপার্জন করে লাখপতি হয়েছেন। আসলে গানকে কখনো পেশা হিসেবে নিয়ে তিনি বড়লোক হতে চাননি। তা যদি চাইতেন তাহলে প্রথম জীবনেই অনেক টাকা রোজগার করতে পারতেন। কিন্তু তাতে বাউলের

সংগীত সাধনা হতো না। গানের বিনিময়ে অন্য কিছুই চাননি, এ কথা গানেও জানিয়েছেন—"গান গাই আমার মনরে বুঝাই/মন থাকে পাগলপারা/আর কিছু চাইনা মনে গান ছাড়া।" প্রাপ্তির কথা জিজ্ঞেস করলে জানাতেন, মানুষের ভালোবাসাই তাঁর শ্রেষ্ঠ পাওনা। সুখের খবর জানতে চাইলে একটা খাঁটি কথা বলতেন, "সোনার চামচ মুখে লইয়া কেউ বাউল হইতে পারে না। দুঃখ-বিচ্ছেদ দিয়াই বাউলের জীবন গড়ে। কষ্ট দিনে দিনে বাড়ে, কমে না।" ("বাউল করিমের অপ্রকাশিত কথা", 'সাক্ষাৎকথায় শাহ আবদুল করিম')

২

বাউলসম্রাট শাহ আবদুল করিম বাউল গান ছাড়াও রচনা করেছেন মালজোড়া, বিচ্ছেদ, ধামাইল, জারি, সারি, দেহতত্ত্ব, মুর্শিদি, ভাটিয়ালি এবং তাঁর গানের একটা বড়ো অংশ জুড়ে আছে গণসংগীত। তাঁর গণসংগীতগুলিতে ফুটে উঠেছে সমাজ-বাস্তব জীবনের নানা চিত্র, বাংলাদেশের মানুষের দারিদ্র্য, শোষিত মানুষের প্রতিবাদ ও প্রত্যাশা ইত্যাদি সমাজজীবনের নানা কথা, যা একজন সমাজসচেতন, মানবপ্রেমী গণশিল্পীর পক্ষেই বলা সম্ভব। এখানেই তিনি অন্যান্য বাউল সাধকদের থেকে স্বতন্ত্র। অন্যান্য বাউল সাধকরা তাঁদের সাধনতত্ত্বে, সাধনসংগীতে মগ্ন থাকেন, তাঁরা বাস্তব সমাজ-সংসার সম্পর্কে অনেকটা উদাসীন। তাঁদের কণ্ঠে লোকসংগীত বিরল। শাহ আবদুল করিম তাঁদের মধ্যে এক উজ্জ্বল ব্যতিক্রম। তাঁর গণসংগীতগুলি বর্তমান আলোচনার লক্ষ্যবিন্দু।

আলোচনার গোড়াতে একটি বিতর্ক কিছুতেই এড়িয়ে যাওয়া চলে না যে, শাহ আবদুল করিমকে আমরা বাউল বলব, না লোকসংগীত শিল্পী বলব। এই বিতর্ক উত্থাপনের পিছনে যথেষ্ট কারণ রয়েছে। তাঁর গানের সংকলনগুলিতে গণসংগীতের পরিমাণ বেশি। তাঁর জনপ্রিয়তার মূলেও আছে এই গানগুলি। অপরদিকে প্রচলিত বাউল গানে যে সাধনকর্মের গূঢ় রহস্য, দেহতত্ত্বের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ থাকে, তা শাহ আবদুল করিমের গানে অনুপস্থিত। তাঁর গানেও আধ্যাত্মিকতা, দেহতত্ত্ব, ঈশ্বরতত্ত্বের কথা আছে, কিন্তু তত্ত্বের ভারে কখনও তা জর্জরিত হয়নি। লালন সাঁই, হাসন রাজা, পাগলা কানাই, দুদ্দু শাহ, পাঞ্জু শাহ, কুবির গোঁসাই-এঁদের আবার কখনোই লোকসংগীত শিল্পী বলা যায় না। কারণ এঁদের গানে মাঝে মাঝে মানুষের কথা থাকলেও জীবনের দারিদ্র্য, বঞ্চনা, শোষণ, প্রতিবাদের দিকগুলি সেখানে মুখ্য বিষয় হয়ে ওঠেনি।

এই প্রসঙ্গে বলে রাখা ভালো লালন ফকির, হাসন রাজা, কুবির গোঁসাই—এঁদের বাউল ধারার সঙ্গে শাহ আবদুল করিমের বাউল ধারার বিশেষ পার্থক্য রয়েছে। তাঁরা মূলত ছিলেন সংসারত্যাগী বাউল, শাহ আবদুল করিম ছিলেন সংসারী বাউল। তাঁদের সাধনকর্মের সঙ্গে তাঁর সরাসরি কোনো সংযোগ ছিল না। প্রচলিত বাউল ধারাকে অস্বীকার না করেও শাহ আবদুল করিম বাউল ধর্মকে এক অভিনব স্বাধীন দৃষ্টির জায়গা থেকে দেখেছিলেন। তাঁর কথায়—

> বাউল কারা? গেরুয়া পোশাক পড়ে যাযাবরের মতো ঘুরে বেড়ানোর নামই কি বাউল? হাতে একতারা নিয়ে ঘর-সংসার ত্যাগ করে বনে-জঙ্গালে ঘুরে বেড়ানোই কি বাউল হওয়ার পূর্বশর্ত?... আমার দৃষ্টিতে এ পৃথিবীর সবাই একেকজন বাউল। আর একজন বাউল মানেই একজন দার্শনিক। তার নিজস্ব চিন্তা-ভাবনা, স্বকীয়তা ও আলাদা বৈশিষ্ট্য থাকবে। আমি

> মনে-প্রাণে বিশ্বাস করি, সবার অন্তরেই একজন বাউল বসবাস করে। ("হাওরের আফাল আমাকে বাউল বানিয়েছে", 'সাক্ষাৎকথায় শাহ আবদুল করিম')

তাঁর এই স্বতন্ত্র ভাবনার স্তরে দাঁড়িয়ে তিনি বাউল গানকে ভালোবেসে যখন গান—"যা দিয়েছ তুমি আমায় কী দেব তার প্রতিদান/মন মজালে ওরে বাউলা গান।" এই গানে বাউল গানের প্রতি তাঁর গভীর ভালোবাসা ও আত্মসমর্পণ দেখে তাঁকে 'বাউল' বলতে আমাদের মনে কোনো দ্বিধা থাকে না। বাউলদের তত্ত্ব কথা না, আসলে বাউল গানকে ভালোবেসেই তিনি বাউল হয়েছিলেন। তাঁর অনেক গানের ভণিতায় নিজেকে 'বাউল আবদুল করিম' বলে অভিহিত করেছেন। কোনো তত্ত্ব-দর্শন নয়, তাঁকে বাউল হওয়ার প্রেরণা জুগিয়েছে কালনী নদী। তিনি নিজেই তা জানিয়েছেন—

> বাড়ির পাশ দিয়ে বহে যাওয়া কালনী নদীর প্রেমে পড়েই আমি বাউল হয়েছি। তাছাড়া হাওরের আফাল (ঢেউ) আমাকে বাউল বানিয়েছে। ভাটির অপরূপ রূপবৈচিত্র্য না থাকলে হয়তো আমি বাউল হতে পারতাম না। ("হাওরের আফাল আমাকে বাউল বানিয়েছে", 'সাক্ষাৎকথায় শাহ আবদুল করিম')।

তাই প্রথাগত ধারায় শাহ আবদুল করিমের বাউল সত্তাকে বিচার করলে চলবে না। তিনি স্বকীয় ধারায় এক স্বতন্ত্র বাউলপ্রাণ। উল্লিখিত গানটির শেষ স্তবকে করিম শাহ বলেছেন—

> তত্ত্বগান গেয়ে গেলেন যারা মরমী কবি/আমি তুলে ধরি দেশের দুঃখ-দুর্দশার ছবি/বিপন্ন মানুষের দাবি করিম চায় শান্তির বিধান/মন মজালে ওরে বাউলা গান/আমার মন মজালে ওরে বাউলা গান।

এ কথা তো কোনো বাউলের কথা নয়। একজন লোককবি, একজন গণসংগীত শিল্পীই এমন কথা বলতে পারেন। বাউলসম্রাট শাহ আবদুল করিম বাউল হিসেবে নাকি গণসংগীত শিল্পী হিসেবে জনমানসে অমর হয়ে থাকবেন তা কালের বিচার্য বিষয়, তবে একথা আমরা নিঃসন্দেহে বলতে পারি যে, বাউল সত্তা ও লোকগায়ক সত্তার অপূর্ব সমন্বয়ে সৃষ্ট এক বিস্ময় স্রষ্টার নাম শাহ আবদুল করিম।

৩

তিনি কেন গণসংগীত রচনা করেন, এর উত্তরে বলেন—"মানুষের খবর জানার জন্য। আমিও মানুষ আপনিও মানুষ। এ মানুষের খবর লওয়া মানুষের দরকার। আমি তো সাধারণ মানুষ-মানুষের খবর লইয়া আমি কিছু গান লিখছি।... মানুষ মানুষের কাছেই তো কিছু আশা করে।" ("দেহের মাঝেই সবকিছু আছে", 'সাক্ষাৎকথায় শাহ আবদুল করিম') অর্থাৎ একজন মানুষ হয়ে মানুষের খবর মানুষকে জানানোর জন্যে এবং মানুষের দাবিগুলোকে তুলে ধরার উদ্দেশ্যে তিনি গণসংগীতগুলি রচনা করেছেন। এই গানগুলির বিষয় বহুবিচিত্র দেশাত্মবোধক গান, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির গান, ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের গান, ভাষা আন্দোলনের গান, মুক্তি যুদ্ধের গান, স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনের গান ইত্যাদি আরও নানান বিষয় তাঁর গানে ফুটে ওঠে। ছোটোবেলা থেকে নিদারুণ দারিদ্র্য ও দুঃখ-কষ্টের মধ্যে বড়ো হয়েছেন। অনেক দিন তাঁর কেটেছে অনাহারে, অর্ধাহারে। ছোটোবেলার দুঃখের কাহিনি গানের মাধ্যমে বলেছেন—

> মনের দুঃখ কারে জানাই/দুঃখে আমার জীবন গড়া/তবু দুঃখরে ডরাই।/গরিব কুলে জন্ম

> আমার/আজো তা মনে পড়ে/ছোটবেলা বাস করিতাম/ছোট্ট এক কুঁড়ে ঘরে/দিন কাটিত আর্ধাহারে রোগে কোনো ওষুধ নাই।

বড়ো হয়ে বুঝলেন দারিদ্র্য, দুঃখ-কষ্টের অভিজ্ঞতা শুধু তার একার নয়, দেশের বেশিরভাগ সাধারণ মানুষেরও। মানবপ্রেমিক এই বাউল নিজের জীবন দিয়ে সাধারণ মানুষের দুর্দশা অনুভব করেছেন। সব গান যে তিনি সাধারণ মানুষকে সামনে রেখে লিখেছেন, তা নয়। অনেকসময় তিনি শুধু নিজের জীবনের দারিদ্র্য-কষ্ট থেকে আহৃত উপাদান নিয়ে গান বেঁধেছেন, শিল্পের সর্বজনীন হবার গুণে তাঁর গান হয়ে উঠেছে সাধারণ মানুষের। দেশের মানুষের বেদনায় বেদনাহত হয়ে তিনি বলেন—"এই দেশের দুর্দশার কথা/কইতে মনে লাগে ব্যথা/খোরাক বিনা যথাতথা/মানুষ মারা যায়।"

তিনি দেখেছেন বাংলাদেশের ভয়াবহ মন্বন্তর, উপলব্ধি করেছেন লক্ষ লক্ষ মানুষের অনাহারে থাকার যন্ত্রণা ও মৃত্যুকে। ধনী এবং দরিদ্রের বিপুল সামাজিক বৈষম্য আজীবন তাঁর মনে প্রশ্ন জাগিয়ে রেখেছিল। কিন্তু এ সমস্যা থেকে সমাজকে মুক্তি দেওয়ার শক্তি তো একজন বাউল সাধকের নেই। একজন বাউলের যিনি পরম আশ্রয়-ঈশ্বর, বাউলসম্রাট তাঁর কাছেই গেছেন, তবে দয়া চাইতে নয়, বিচার চাইতে। 'ফরিয়াদ' কবিতায় কাজী নজরুল ইসলাম যেভাবে ভগবানের কাছে জীবন-সমস্যার অভিযোগ ক'রে প্রতিকার চেয়ে বলেন—"এই ধরণীর ধূলি-মাখা তব অসহায় সন্তান/মাগে প্রতিকার, উত্তর দাও, আদি-পিতা ভগবান" ঠিক সেভাবেই শাহ আবদুল করিম ঈশ্বরকে জীবনের যন্ত্রণার কথা জানিয়ে যুক্তি দিয়ে প্রশ্ন করেন—

> জিজ্ঞাস করি তোমার কাছে বলো ওগো সাঁই/এ জীবনে যত দুঃখ কে দিয়াছে বলো তাই/দোষ করিলে বিচার আছে, সেই ব্যবস্থা রয়ে গেছে,/দয়া চাইনা তোমার কাছে, আমরা উচিত বিচার চাই।

এমনকি কখনো সামাজিক সংকট থেকে মুক্তির পথ খুঁজে না পেয়ে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে ঘোষণা করেন প্রতিবাদী অভিমান—

দয়াল বলে নাম যাই শুনা, কথায় কাজে মিল পড়ে না
তোমার মান তুমিই বুঝ না, আমরা তো মান দিতেই চাই।

এখানে লক্ষ করার মতো বিষয় একজন বাউল তাঁর সাঁইয়ের কাছে যাচ্ছেন আত্মমুক্তির বাসনা নিয়ে নয়, সামাজিক কষ্ট নিয়ে, তা থেকে মুক্তির আশায়, সমাধানের উপায় পেতে। আর শুধু বাউল কেন, যে কোনো সচেতন অনুভবী মানুষ যখন সমাজের নানা সংকট এবং সমস্যার ঘেরাটোপে পড়ে ক্রমশ অন্ধকারে ডুবতে থাকেন, এবং সেইসব সমস্যা সমাধানের চাবিকাঠি তাঁর হাতে নেই জেনেও ঘেরাটোপ থেকে বেরোতে পারেন না, তখন তাঁদেরও ঈশ্বরের কাছে যেতে হয়। বাউলের সুরে সুর মিলিয়ে বলতে হয়—"তুমি কি জানো রে বন্ধু/কি সুখে যায় দিন.../দিনে-দিনে সোনার অঙ্গ/আমার হইতেছে মলিন..." শাহ আবদুল করিম মানুষকে ভালোবেসেছিলেন গভীরভাবে। কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন—"মানুষের মধ্যেই স্রষ্টার অস্তিত্ব।" তাঁর হৃদয়ের এক অলিন্দে ঈশ্বর এবং অপর অলিন্দে ছিল মানুষ। মানুষকে ভালোবেসে প্রচলিত চাওয়ার বদল ঘটিয়ে তিনি বলতে পেরেছিলেন, "আমি বেহেস্ত চাই না, দোজখ চাই না, জীবিত অবস্থায় আমার ভাটি অঞ্চলের মানুষের সুখ দেখতে চাই।"

এ কেবল কথার কথা ছিল না। তাঁর এই ইচ্ছা কেবল চাওয়ার আকাঙ্ক্ষাতে ফুরিয়ে যায়নি। দুবেলা দুমুঠো খেয়ে বেঁচে থাকার জন্যে, গরিব-মেহনতি মানুষের সুখ-দুঃখ জনসমক্ষে তুলে ধরে সকলের বেঁচে থাকার আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার লক্ষে ১৯৯৭ সালে 'বাঁচতে চাই' নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। এই নিয়ে তিনি একটি গানও লিখেছিলেন—"আমরা সবাই মিলে বাঁচতে চাই/আমার মতো গরিব যারা /আমি তাহাদের গান গাই।"

শাহ আবদুল করিম একজন রাজনীতি সচেতন মানুষ ছিলেন। তিনি মনে করতেন শিল্পীর—"রাজনৈতিক সচেতনতা থাকা দরকার। কারণ তারা মানুষের মধ্যে এই উপদেশ দিয়া মানুষকে জাগ্রত করবে।" কিন্তু কোনো পার্টির রাজনীতিতে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন না। তাঁর মতে, একজন রাজনীতি সচেতন শিল্পীর বক্তব্য থাকা উচিত শোষিত মানুষের পক্ষে, শোষণের বিরুদ্ধে, অসত্যের বিরুদ্ধে। তিনি বলতেন, "আমি মূলত গণসংগীত শিল্পী।... আমি আমার গানে বলেছি—শোষণের বিরুদ্ধে আমি শোষিতের গান গাই/আপোষহীন সংগ্রাম করে বেঁচে থাকতে চাই।" দেশের প্রায় প্রতিটি রাজনৈতিক আন্দোলনে তিনি গণজোয়ার সৃষ্টিকারী গণসংগীত রচনা করেছেন।

১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারী নেত্রকোণায় একটি মঞ্চে যখন তিনি গান গাইছিলেন, তখন খবর আসে যে ঢাকায় ভাষার দাবি তোলা মিছিলের উপর গুলি বর্ষণ করা হয়েছে এবং অনেকেই মারা গেছেন। এই ঘটনার প্রতিবাদে তৎক্ষণাৎ মুখেমুখে গান গেয়ে করিম শাহ বাংলা ভাষা আদায়ের পক্ষে সওয়াল হন—

> মুখের বোল কাইরা নিবে/রাষ্ট্রভাষা উর্দু হবে/আমরা মায়ের ভাষায় কথা বলবো/প্রয়োজনে রক্ত দেবো/জীবন দিয়ে বাংলা রাখবো/ঢাকার বুকে রক্ত দিছে বাংলামায়ের সন্তান/আমরা রাখবো তাদের মান।।

পরবর্তীকালে ভাষা দিবসের শহীদ-বরকত, জব্বার, সালামদের স্মরণ করেছেন গানে—

> সালাম আমার শহীদ স্মরণে/দেশের দাবি নিয়া-দেশ প্রেমে মজিয়া/প্রাণ দিলেন যে সব বীর সন্তানে॥/ভাষার দাবি লইয়া, আপনহারা হইয়া.../স্মৃতি গেলেন রাখিয়া বাঙালির মনে/সালাম বরকত জব্বার, প্রিয় সন্তান বাংলার/ভুলিবার নয় ভুলিব কেমনে॥

মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে তিনি সরাসরি যুক্ত ছিলেন না, তবে এসময়ে অনেক ওজস্বী গান রচনা করে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেছেন, শক্তি জুগিয়েছেন মুক্তি যোদ্ধাদের। এরকমই একটি গান—

> বাঙালি যুবকের দল/চল মুক্তির সংগ্রামে চল/তোরাই দেশের সহায় সম্বল/পাছে হটার সময় নয়।/ধরো ধরো অস্ত্রো ধরো/বাংলা মোদের মুক্ত করো/মনের দুর্বলতা ছাড়ো/আমাদের জয় সুনিশ্চয়।

১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের পর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সুনামগঞ্জে আসেন। বালুর মঠে অনুষ্ঠিত জনসভায় শাহ আবদুল করিম এই গণসংগীতটি পরিবেশন করেন—"পূর্ণ চন্দ্রে উজ্জ্বল ধারা/চৌদিকে নক্ষত্র ঘেরা/জনগণের নয়নতারা/শেখ মুজিবুর রহমান/জাগোরে জাগোরে মজুর কৃষাণ॥" শাহ আবদুল করিম উপলব্ধি করেছিলেন যে একসময় বাংলাদেশে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ছিল, কিন্তু আজ তা পদে পদে ব্যাহত। ৪২'-এর দাঙ্গা দেখে আসা মানুষের কাছে এটা মনে হওয়া স্বাভাবিক নয় কি? একসময় তাঁদের গ্রামে হিন্দু বাড়ির নিমন্ত্রণে মুসলমানেরা গাইতে যেত। তাঁরা একসঙ্গে বাউল গান আর ঘাঁটু গান

গাইত। সে দিন আজ আর নেই। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বোধ থেকে অতীতের সঙ্গে বর্তমানের তুলনা করে গাইলেন অত্যন্ত জনপ্রিয় এই গান—

> আগে কি সুন্দর দিন কাটাইতাম/আমরা আগে কি সুন্দর দিন কাটাইতাম/গ্রামের নওজোয়ান হিন্দু-মুসলমান/মিলিয়া বাউলা গান আর ঘাঁটু গান গাইতাম।/হিন্দু বাড়িত যাত্রা গান হইত/নিমন্ত্রণ দিত আমরা যাইতাম/জারি গান, বাউলা গান আনন্দের তুফান/গাইয়া সারি গান নৌকা দৌড়াইতাম।...

বাস্তবিক, সাম্প্রদায়িক হিংসা তো আজও বাংলাদেশে তথা ভারতবর্ষেও নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। ইসলামিক জঙ্গি গোষ্ঠীর হাতে প্রাণ দিচ্ছে ফারহাদ হোসেন চৌধুরী, রূপালি বেগমের মতো সুফি সাধকরা। অপরদিকে বাড়ছে কট্টর হিন্দুত্ববাদ। সাম্প্রদায়িক হিংসা এখন শুধু ভিন্ন ধর্মের মধ্যেই নয়, নিজেদের ধর্মের মধ্যেও তা এক অসহিষ্ণু রূপ ধারণ করেছে। যে কারণে শ্রীজাত, মন্দাক্রান্তা, কমল হাসানের মতো কবি শিল্পীদের উপর নেমে আসছে ধর্মীয় অসহিষ্ণুতার নির্লজ্জ অন্ধ আঘাত। এই সংকট মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আমরাও সংশয়ে—"করি ভাবনা সেই দিন আর পাব নাহ/ছিল বাসনা সুখী হইতাম।"

৪

প্রাচীন আর আধুনিকের সীমারেখায় দাঁড়িয়ে রয়েছেন বাউলসম্রাট শাহ আবদুল করিম। যিনি একহাতে ধরেছেন ঈশ্বরকে, অন্যহাতে সমাজকে। যিনি একাধারে বাউল এবং গণসংগীত শিল্পী। তাঁর গান যেমন হৃদয়স্পর্শী, তাঁর মনন ও দর্শন বহুমুখী ভাবোদ্দীপক। প্রয়াত লোকসংগীতশিল্পী কালিকাপ্রসাদ ভট্টাচার্য শাহ আবদুল করিমকে নিজের মুর্শিদ (গুরু) বলে মানতেন। লক্ষণীয় যে একজন হিন্দু শিল্পীর কাছে গুরু হয়ে উঠছেন একজন মুসলমান শিল্পী। আসলে শিল্পীরা সমস্ত ধর্মীয় ভেদাভেদের ঊর্ধ্বে। তাঁদের বিচরণ যে অপরিসীম আনন্দের জগতে সেখানে নিরন্তর বেজে চলেছে সম্প্রীতির সুর। কালিকাপ্রসাদ ভট্টাচার্য করিম শাহের অনেক গান গেয়েছেন দোহারের অ্যালবামে, গানগুলিকে জনপ্রিয় করে তুলেছেন নাগরিক মানুষের কাছে। শাহ আবদুল করিম সম্পর্কে তিনি বলেছেন—"তাঁকে জানা আমাদের কখনও ফুরোবে না। আর ফুরোক এটা আমি চাই না।" শাহ আবদুল করিমকে জানা আমাদেরও অনেক বাকি থেকে গেল।

উৎসের সন্ধানে

১. শফিকুর রহমান চৌধুরী : "খ্যাতনামা লোকসংগীত শিল্পীদের জীবন তথ্য", বাংলাদেশের লোকসংগীত, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, পৃ. ১৮২-১৯৩

২. সুমনকুমার দাশ সম্পাদিত : সাক্ষাৎকথায় শাহ আবদুল করিম, ঢাকা : অন্বেষা প্রকাশন, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি বইমেলা ২০১০

তথ্যের সন্ধানে

১. বাউলসম্রাট শাহ আবদুল করিম-এর জীবন ও সংগীত নির্ভর প্রামাণ্য চলচ্চিত্র "ভাটির পুরুষ", শাকুর মজিদ পরিচালিত। (Baul Shah Abdul Karim-A documentary-https://m.youtube.com. posted : sep 12, 2013)

২. Musiana Talk/ Kalikaprasad Bhattacharya remembers "Baul Shah Abdul Karim" (https:/m.youtube.com. posted : Apr 16, 2015)

মালদা জেলার বাঙ্গাল সম্প্রদায়ের নির্বাচিত লোকগান একটি সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

মহ. মহিদুর রহমান

ভৌগোলিক বিচারে পশ্চিমবঙ্গের গৌরবময় মালদা জেলা মূলত তিনটি অংশে বিভক্ত—বরিন্দ, টাল ও দিয়াড়া। টাল অঞ্চলের অধিবাসী মূলত শেরশাবাদ, বাঙ্গাল (বাঙাল), হিন্দু জনজাতি, নস্য সেখ, পাঠান, সৈয়দ জনগোষ্ঠী, বাজিকর, বেদে, খরোয়া মুসলমান ইত্যাদি। বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে আছে কিছু ভোজপুরি, মারোয়াড়ি, আগরওয়ালা সম্প্রদায়। শেরশাবাদিয়া জনগোষ্ঠী মূলত আফগান দেশীয় পাঠান মুসলমান জনগোষ্ঠীর একটি বিশেষ ধারা মাত্র। আর নস্য সেখ মুসলমানরা ছিল মূলত হিন্দু ধর্মাবলম্বী রাজবংশী সম্প্রদায়ভুক্ত। উচ্চবিত্ত হিন্দুদের শাসন ও শোষণে অতিষ্ঠ হয়ে ইসলামধর্মে ধর্মান্তরিত হওয়ার কারণে তাদের জাতি নষ্ট হওয়াই 'নষ্ট' কথাটির অপভ্রংশে 'নস্য' নামে পরিচিতি লাভ করে। এছাড়া এরা 'বাঙ্গালভূম'-এর অধিবাসী হওয়াই এই রাজবংশীরা মালদা জেলায় 'বাঙ্গাল' বা 'বাঙাল' নামে পরিচিত। 'নস্য সেখ' উপাধিধারী বাঙাল মুসলমানদের বসবাস মালদা জেলার চাঁচল, ভেবা, থাহাঘাটি, গৌড়ীয়া, বাকিপুর, হাজাতপুর, কুশিদা, তুলসিহাটা, বাহারাবাদ ইত্যাদি স্থানে।

ক্ষেত্রসমীক্ষায় মালদা জেলার চাঁচল মহকুমার অন্তর্গত বালিডাঙ্গা, কনুয়া, চণ্ডীগাছি, নেহালপুর, হরিশচন্দ্রপুর, কলিগ্রাম, নয়া বসতপুর ইত্যাদি স্থানে মূলত বৃদ্ধা মহিলাদের স্মৃতি থেকে সংগৃহীত কিছু গান তুলে ধরা হলো। তাদের বিবাহের গানগুলি অনেকটাই বৈচিত্র্যপূর্ণ। তবে এই গীত বা গানগুলি মূলত বৃদ্ধা দাদি বা নানিরাই গেয়ে থাকে। সেই সঙ্গে তাদের কিছু আঞ্চলিক ভাষার লোকগান যা অন্যান্য সময় গাওয়া হয় তার কিছুটা আলোচনা করা হয়েছে।

বাঙ্গাল সম্প্রদায়ে বিবাহের সামাজিক রীতি তাদের নিজস্ব সংস্কৃতির অঙ্গ। বর-কনে দেখার পর বিবাহের দিন স্থির হয়। সেই বিবাহের সুনির্দিষ্ট দিনের প্রায় দশ পনের দিন আগে বর-কনে নিজের বাড়িতে থুবড়া খায়। 'থুবড়া' মূলত বর-কনের উদ্দেশ্যে একটি থালাতে ক্ষীর, কলা, মিষ্টি ও নানা ফলমূল সজ্জিত খাদ্য দ্রব্য। প্রথমে বর (পরনে নতুন লাট্টু লুঙ্গি ও নতুন গামছা) বা কনে (লালপাড়-যুক্ত হলুদ শাড়ি ও নতুন গামছা) নিজের বাড়িতে খেয়ে তার অবশিষ্ট তার দাদি নানি ভাবী দুলাভাই ও অন্যান্য নিকটাত্মীয় খায়। পরে নিজের নিজের আত্মীয় স্বজনদের বাড়িতে সেই থুবড়া খেয়ে আসে। উপঢৌকন হিসেবে পায় নতুন কাপড়-চোপড়।

বিবাহের দিন বর বা কনেকে হলুদ লাগানো হয়। আর উভয় পক্ষের বাড়ির লোকেরা গ্রাম থেকে সোনা কেটে আনে। ‘সোনা’ বলতে সুগন্ধি যুক্ত গাছ যা বিদির সময় বর বা কনেকে লাগানো হয়। ‘বিদি’ হলো বর বা কনেকে আঙিনায় পিড়ায় (কাঠের তক্তা যাতে ধান ঝাড়া হয়) পশ্চিম পূর্ব দিক মুখ করে বসানোর রীতি। এই ‘বিদি’ অনুষ্ঠিত হয় স্ত্রীলোকের দ্বারা। সেখানে পুরুষের প্রবেশ প্রায় নিষেধ। বিদির সময় সরিষার তেল দেওয়া হয়। বর বা কনের মাথায় সকলে হাত রেখে তেল ঢালতে থাকে। সেই সময় শুরু হয় গীত—“সোনার কটরা তেল রে/হলদি রূপার কটরা কাসাইরে।/বারে বারে মানা কোরনু/ওরে তেল না দিয়ো সরিষার তেল।”

এরপর আনন্দ উৎসবে হৈ-হট্টগোলের মধ্য দিয়ে রঙ্গ-তামাশা করে একে অপরের গায়ে রং মাখিয়ে দেয়। ক্ষেত্রসমীক্ষায় দেখেছি, শুভবিবাহ সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন হওয়ার জন্য মৌলানা ডেকে ‘মিলাদ’ (সুরা ফতেহা ও কালেমা পাঠ) করা হয়। এরপর বিবাহের আগের দিন সন্ধ্যার সময় ‘সোনা’ (সুগন্ধিযুক্ত শেকড়) কেটে যে শুকোতে দিয়েছিল তা নিয়ে বরের দাদি, নানি ভাবি, দিদিরা গীত গেয়ে গ্রামে যাদের বাড়িতে জাঁতা আছে তাদের বাড়ি যায়। তাদের সঙ্গে মাঝে মাঝে কয়েকজন পুরুষ সাধারণত হাতে ছাতা নিয়ে যায়। আর সে সময় যে গীত গাওয়া হয় তা জাঁতাওয়ালীকে কেন্দ্র করে—“জাঁতাওয়ালীর বাড়ি কালো বিলাই/ধান কুটে জাঁতাওয়ালী কোমর হিলাই।” এই কোমর হেলানো আসলে তার সম্পদ প্রাচুর্যের বিষয়কে বোঝানো হয়। সোনা পিষে আবার ফেরত আসে।

‘বিদি’ সাধারণত হয় একই দিনে দুবার দুপুর ও রাত্রে। এই বিদির সময় বিশেষত কনে কাঁদতে থাকে—হিন্দু সম্প্রদায়ের বিজয়ার মতো। বিবাহের দিন সকালবেলা বাজনা বাজিয়ে অন্য গ্রামের পুকুরে বেশ কয়েকজন নারী মাথায় কলসি করে সেই কলসিতে আমের পাতা ঢুকিয়ে জল ভরে। কলসিতে জল ভরে নিয়ে আসার এই পদ্ধতিকে বলা হয় ‘ফুলহর’। বিবাহের দিন ঠিক দুপুরে শুরু হয় বিদি। বিদি করার সময় বরের সামনে একটি কুলো রাখা হয়। এই কুলোতে রাখা থাকে একটি সরষের তেলযুক্ত মাটির প্রদীপ, এক ডজন কলা, হলুদের হাড়ি (সোনা মিশ্রিত) পান ও সুপুরি ইত্যাদি। এরপর গীত গেয়ে ঘুরতে ঘুরতে বিদি করে; তখন বরের গায়ে চাল ছিটাতে থাকে। সেইসময় বরের সামনে ছাতা নিয়ে তার নানা দুলাভাইয়েরা বসে থাকে। বরের নখ কাটার জন্য নাপিতকে ডেকে আনা হয়। নখ কাটার মুহূর্তে নাপিতকে নিয়ে শুরু হয় গীত। এই সকল ক্রিয়া সম্পাদনের পর বিদির কাজ সমাপ্ত হলে দুপুরে ভোজের বন্দোবস্ত করা হয়।

লক্ষণীয়, কোথাও কোথাও বর-কনের গায়ে হলুদ দেওয়ার সময় দাদি নানীসহ বয়স্করা ঢোল নিয়ে দুপুর বেলায় চৌকিতে বসে সমবেত সুরে গীত গাইতে থাকে। যেমন একটি গীত—“সোনা মুখও রে আপন দেশে/মোহক গেলরে থুবড়ার দেশে,/থুবড়ার মায়ের ভাঙ্গা টাটি/মোহক গেল বাহির ভীতি।” কখনো কখনো লঘু সুরে নানি বা দাদি হবু বউকে সচেতন করতে চায় এই গানে—“চারো ঘাট বেড়ায় ওগে বুবু/একো ঘাট লাহিস।/জামাই বাড়িকার শাড়িয়া গো বুবু/কোম্বর ভরে লইস।” বরের উদ্দেশ্যে বর পক্ষের দাদি নানিরা বিয়ে করতে যাওয়াকালীন সম্ভাবনা বাণী উচ্চারণ করে—“আগা পিছা আটখান গাড়ি/ভিড়ের মধ্যে

রাহানের গাড়ি/রাহান তুমি বাঁচাও গাড়ি/সাহানা আসবে তুমার বাড়ি/সাহানার চোখে নয়নের কাজল/রাহান দেখে হয়েছে পাগল।" পাত্র-পাত্রীর নাম পরিবর্তন করে এই গীত গাওয়া হয়। তবে লক্ষ করবার বিষয় গোরুর গাড়িতে বরযাত্রী ইত্যাদির আগমন সংস্কৃতি, যা আজকে অনেকটাই দুর্লভ। গ্রামগঞ্জে আজ প্রায় দেখা যায় না। এখন ট্যাক্সি, 'মালতি' (মারুতি) কার এর প্রচলনই বেশি। আর একটি গীত যেখানে আছে বরের যাত্রাকালীন সবুজঘন গ্রামীণ পরিবেশ রিম-ঝিম বৃষ্টির কথা। বয়স্কা দাদি নানিদের কণ্ঠে ভেসে আসে মায়াবী পরিবেশ—"ঝরি পড়ে রিমু ঝিমু রে,/কুহু করে শিসার ধারে রে/শিসার ধারে কামিন বাচ্চারা কোহকনা রে/বিছেয় বিছেয় সারের রাস্তা রে/আমার দেওয়া বানেয় সোহাগির হাতে রে/লিনু মোমের ছাতা রে।" অন্যদিকে কন্যা যখন মায়ের বাড়ি থেকে শ্বশুরবাড়িতে যাত্রা করে বা বিদায় হয় তখন বাবা-মা-ভাবির চোখে জল দেখে অস্থির হয়ে পড়ে। সকলের কান্নার রব দেখে আকাশ বাতাসও যেন বিষাদময় হয়ে ওঠে—

> ছোট থেকে পুষিলেন মায়গে, ইহ বেটি ভারিওরে/আঁচলায় মুছে বাবা আখের লয়।/এতো দিনতে পুষিলেন বাবাগে, ইহ বেটি ভারিওরে/গামছায় মুছে আখের লয়।/এখুন কেনে কানেছেন বাবাগে, দশপইচ বলাইতেরেও/গামছায় মুছে আখের লয়।/এতো দিনতে পুষিলেন ভাইগে, ইহ বহিন ভারিওরে/গামছায় মুছে আখের লয়।/এতো দিনতে পুষিলেন ভাউজগে, ইহ ননদ ভারিওরে/আঁচলায় মুছে আখের লয়।

বাঙালি সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাহের পরের দিন এক বিশেষ সংস্কৃতি লক্ষ করা যায়, যা অন্যান্য সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রায় দেখা যায় না। বিবাহের পরের দিন সকালে বরের বাড়িতে পাত্র-পাত্রীকে একসঙ্গে গোসল করানোর রীতি প্রচলিত। গোসল করার সময় ভাতের ফ্যান শরীরে সাবানের মতো লাগিয়ে দেওয়া হয়। গোসল শেষে পাত্র-পাত্রীর কনিষ্ঠ আঙুল ধরাধরি করে আঙিনার মধ্যে সাত পাক দেওয়া হয়। তারপর বরের জামাইদারা বরকে কোলে করে হাতে ছোট মাটির হাড়ি নিয়ে সাত পাক ঘুরে মাটিতে ফেলে দেয়। ফলে হাড়ি ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়। সেই টুকরো তার জামাইদারা গুনবে। যতগুলো টুকরো হবে ততজন সন্তান হবে বলে বিশ্বাস করে।

বিবাহপর্বকালীন এই সমস্ত গীত ছাড়াও বিবাহ-পরবর্তী জীবনের নানা সম্ভাব্য-অসম্ভাব্য বিষয় নিয়েও গীত দাদি নানিরা গাইতে থাকে। কখনো ব্যঙ্গ বিদ্রুপ, কখনো পরিহাসের ছলেই যেন অন্তরের অব্যক্ত কথা ব্যক্ত করে। তারই একটি গীত যেখানে বর সাইকেল না পেলে রাগ করবে। কিন্তু সে যাই করুক বেশি বাড়াবাড়ি করলে বরযাত্রীদের না খেয়েই যেতে হবে। সেকথাই এই গীতটিতে ব্যক্ত হয়েছে—

> ঘরের পাছাদিক ডালিমের গাছ মাগো/ডালিম ধরিছে লটকিপট মাগো/এক একটা ডালিম তুরিয়ে দিনকুর/মাগো মরিয়া আসিছে।/মকে কি ওগো মায়ও সারিবা এসেছি মকে/তোমার জামাই গসা করিয়ে মাগো/সাইকেল লিবার কানে।/হাতে ধরি মাগো পায়ে পরি মাগো/সাইকেল দিতে পারিব না।/ডেগের ভাতগুলি ডেগে থাকিল মাগো/বরযাত্রী পাঠালু ভুক্কা মাগো/বাড়িতে গিয়ে কিয়া বলি,/ বলি মাগো জনম ন্যাঙার বেটি।

আবার আর একটি গীতে দেখা যায়, বিবাহের শেষে বিদায় বেলায় বরপক্ষ তার পূর্ব স্বীকৃত পণ বুঝে নিতে চায়। দাদি নানীরা পণপ্রথাকে তাদের নিজস্ব ভঙ্গিতে গাইতে থাকে—

নীল কুহার তলে/পানি ঝিলমিল ঝরে,/ঐ ঠিনা সাহানার আব্বা/সাইকেল কবুল করে/সাইকেল দিবা চায়ালেন/সাইকেল দিবা চায়ালেন/দিবেন কতই কালে/ঐ ঠিনা সাহানার আব্বা/রেডিও কবুল করে।/রেডিও দিবা চায়ালেন/রেডিও দিবা চায়ালেন/দিবেন কতই কালে/ঐ ঠিনা সাহানার আব্বা/ঘড়ি কবুল করে।/ঘড়ি দিবা চায়ালেন/ঘড়ি দিবা চায়ালেন/দিবেন কতই কালে/ঐ ঠিনা সাহানার আব্বা/টিভি কবুল করে।/টিভি দিবা চায়ালেন/টিভি চায়ালেন/দিবেন কতই কালে/ঐ ঠিনা সাহানার আব্বা/সোনা কবুল করে।/সোনা দিবা চায়ালেন/সোনা দিবা চায়ালেন/দিবেন কতই কালে।

অর্থাৎ তৎকালীন মুসলিম সমাজব্যবস্থায় বিবাহের পণ হিসেবে সাইকেল, রেডিও, ঘড়ি, টিভি, গলার সোনার চেন ইত্যাদি প্রচলিত ছিল। কালের চলমান স্রোতে পণের উপাদান পরিবর্তন হয়েছে, এখন চলে মোটরসাইকেল, সঙ্গে লক্ষ টাকা, অবস্থা বুঝে চার চাকা গাড়ি। কন্যাপক্ষ মেয়ের যে কোনও উপায়ে বিয়ে দিতে সর্বস্ব খুইয়ে দিতেও রাজি হতো। তবে দিন যায় মাস যায়। রোজগেরে স্বামীর কর্মক্ষমতা নিয়ে প্রশ্ন যেমন উঠে তেমনি স্বামীর বিদেশ যাওয়াকেও খুব ভালো ভাবে নিতে পারে না স্ত্রী। স্ত্রীকে শ্বশুরবাড়িতে একা রেখে স্বামীর বিদেশ যাওয়ার ফলে শাশুড়ি ননদের জ্বালা-যন্ত্রণা, স্ত্রীর একাকীত্বের যন্ত্রণার কথাও উঠে আসে একটি গীতে—

শুনো স্বামী বলিয়ে আমি/বিদেশ খাটিতে যেও না/আহারে আমি রইব কুনঠিনা।/তোমার বইনির এতো জ্বালা/সইতে আমি পারি না/আহারে আমি রইব কুনঠিনা।/শুন কন্যা বলিয়ে আমি/আমার সঙ্গে চল না/আহারে আমি রইব রে কুনঠিনা।/তোমার মায়ের এতো জ্বালা/প্রাণে যে আর সহে না/আহারে আমি রইব যে কুনঠিনা।

গানগুলি বিয়ের সময়, বিশেষত বিবাহ-পূর্বদিনেই গাওয়া হয়। এই সম্প্রদায়ের বিবাহের গীতগুলি সুনির্দিষ্ট রীতিতে প্রায় গাওয়া হয় না। সমবেত নারী মহল কখনও কোরাসের ভঙ্গিতে কখনো দাদি বা নানি একক কণ্ঠে গাইতে থাকে। তারাই এই গীত বা গানগুলির ধারক ও বাহক। মেয়ের বিয়ে দিলে মায়ের দুঃখ চিরকালীন। আর যে বাড়িতে সে যাবে সেই শাশুড়ির আনন্দের সীমা নেই। কারণ নিজের সাংসারিক দায়-দায়িত্ব বউমার ঘাড়ে চাপিয়ে নিশ্চিন্ত মনে মজলিশ মারি করবে। আনন্দে পাড়া প্রতিবেশীর সঙ্গে গল্প গুজব করে গায়ে হাওয়া লাগাবে। গানটিতে কন্যার মায়ের সেই বেদনা জর্জর যন্ত্রণাই পরিস্ফুট।

বাঙালি সম্প্রদায়ের লোকগান সংগ্রহ করতে গিয়ে তাদের বিবাহগীতি, কাওয়ালি, মহরমের গান ছাড়াও আরও কিছু আঞ্চলিক ভাষার গান পেয়েছি। যেগুলির মধ্যে দিয়ে একটি বৃহত্তর মুসলিম সম্প্রদায়ের সামাজিক বাস্তবতা, তাদের জীবন প্রণালীর বহু বিচিত্র জীবন অভিজ্ঞতার অনেকটাই সন্ধান দেয়। তারই কয়েকটি প্রাসঙ্গিকভাবে আলোচনা করা হলো।

লক্ষণীয়, মালদা জেলার এই বাঙ্গাল বা নস্য সেখ মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষ কিন্তু নিম্নবিত্ত হিন্দু সম্প্রদায় থেকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। ফলে তাদের হিন্দুসংস্কৃতির কৃষ্টি কিন্তু অনেকটাই আজও তাদের মধ্যে প্রবহমান। সিঁথির সিঁদুর, রাত্রে বিবাহ পদ্ধতি, মাটির লাল কলসি মাথায় করে জল ভরতে যাওয়া, মাথায় ঘোমটা না দেওয়া, বাহ্যিক সৌন্দর্যের প্রতি বিশেষ পরিপাটি ইত্যাদি সংস্কৃতি এখনো মুছে যায়নি। দেখা যায়, একটি গানে সুনির্দিষ্ট অঞ্চলের কথা যেমন আছে, তেমনি আছে সিঁথির সিঁদুরের প্রসঙ্গ—

> বাবা বসিয়ে অসরায় ভাই বসিয়ে খলতায়/মায়োগে গজুয়া বসিয়ে বিচ এংনায়।/বাবা বসিয়ে শীতল পাটিত ভাই বসিয়ে চটিত/মায়োগে গজুয়া বসিয়ে ছিঁড়া পুটা পাটিত।/বাবা খালে দুধ রুটি ভাই খালে শাগ রুটি/মায়োগে গজুয়া খালে গেনায় সাত রুটি।/বাবা গেলে কুসিদার হাট ভাই গেলে সামসীর হাট/মায়োগে গজুয়া গেলে চাঁচলের হাট।/বাবা আনলে রসগোল্লা ভাই আনলে ছানার মাণ্ডা/মায়োগে গজুয়া আনলে সিঁথির সিঁদুর।

একসময় নিজেদের সম্প্রদায়ের মধ্যে কন্যা সম্প্রদান হলেও আজ নারী পুরুষের পূর্বরাগ অনুরাগের ফলে কিম্বা অর্থনৈতিক সচ্ছলতার দিকে তাকিয়ে তারা শেরশাবাদিয়া কিম্বা খোট্টাভাষীর মধ্যেও কন্যাদান করে থাকে। তবে অন্যান্য সম্প্রদায়ের মতো এই বাঙ্গাল সম্প্রদায়ের ভাষা সংস্কৃতি বৈচিত্র্যময়তার দাবি রাখে। আর একটি গীতে দেখা যায়, মুসলিম লোকগানে বিশেষত বাঙ্গাল সম্প্রদায়ের গীতে শিব-শঙ্করের কথা। 'শিবায়ন' কাব্যের শিবের কথা, তাঁর কৃষিসভ্যতার কথা। লাঙল বা হাল নিয়ে চাষ করার কথা এই গীতটিতে সুন্দরভাবে ধরা পড়েছে। গীতের মধ্যে কোথায় যেন সম্প্রীতির এক আবহ নির্মাণ করে তোলে—

> বাড়িতে আছ ওগো সাতি/তসিলদার তোর দাঁড়াইয়াছে কণ্ঠি/স্বামী নাই মোর ঘরে গিয়াছে পাথারে/হাল বাইতে শঙ্করে/চুলা ছেড়ে যাব কেমনে।

মাঠে কৃষিকাজ করতে যাওয়ার ফলে অনাহারে স্বামীর রাগের তীব্রতা চরম আকার ধারণ করে। বাড়িতে কেউ না থাকার ফলে তার খাওয়ার নিয়ে যাওয়ার লোক নেই। এদিকে স্ত্রী তার সাংসারিক কাজ নিয়ে হাঁপিয়ে ওঠে। বাড়িতে তাকে তৎক্ষণাৎ দেখতে না পাওয়ার ফলে স্ত্রীর প্রতি চলে ক্রোধের বর্ষণ—

> ভোরকে উঠে গেলেমতে শালি লাঙল বাহিবা/নেস্তার বেলা দেখতে দেখতে হয়ে গেল বেলা।/শালি তুই গেইলু কুন টোলা।/আমার মতন বাড়িয়া যাঁতা রাখবে কুন শালা/শালি তুই গেইলু কুন টোলা।

অর্থাৎ আমার বাড়িতে এতো বড়ো জাঁতা থাকতে সে গায়ে হাওয়া লাগাতে অন্যের বাড়ি গেছে জাঁতায় গম চাল পিষতে। সেই কোন ভোরে গেছি চাষ করতে আর এতো বেলা হয়ে গেল সে কোন টোলা অর্থাৎ পাড়ায় গেছে আসার নাম কথা নেই। 'শালি' বলে গালি দিয়ে স্বামী শুরু করে তার মনের যন্ত্রণার কথা। সমাজের আর একটি গান যেখানে গর্ভবতী নারী তার গর্ভকালীন সময়ে খিদের যন্ত্রণায় অনেক কিছুই খাওয়ার সাধ জাগে। কয়েকমাস পরে মাটির উনুনের পোড়া মাটি খাওয়ার ইচ্ছে জাগে। স্বামীর অবহেলা অনাদরের কথাই ব্যক্ত হয়েছে এই গানে।

অর্থনৈতিক সমস্যার কারণে আর্থিক অনটনের ফলে কর্মবিমুখ স্বামীর রোজগার নেই। ফলে স্ত্রী তার সাধের কথা কোন সময়ই ব্যক্ত করতে পারে না। অভাব-অনটন আর দারিদ্র্যতার মধ্যে তাই স্ত্রীর উনুনের পোড়া মাটি খাওয়ার ইচ্ছে জাগে। সামান্য কয়েকটি গানের কলি উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। কিন্তু সামান্য কয়েকটি গানের কলিতেই সেই অসাধারণ বক্তব্য সমাজের এক কঠিন বাস্তব চিত্রের অনুষঙ্গে ফুটে উঠেছে—"ও মোক সাধ খাবা মানাইলুরে/চাউল ভাজা সুয়াস কাটা।/একমাস দুমাস তিনমাস যায়/চুলহার মাটিলা খাবা মেনাইরে ভাই।" গ্রাম্য মুসলিম জনসমাজে বিশেষত একেবারে গ্রামীণ এলাকায় আজও খেটে খাওয়া মানুষের সংখ্যা প্রচুর। দুবেলা দুমুঠো খাওয়ার জোগান দিতেই তাদের এখনো হিমশিম খেতে হয়। মাঠে-ঘাটে

হাড় ভাঙ্গা খাটুনির পর আর তার রাগ সহ্য হয় না। এর মূলে আছে দারিদ্র্যতা, আর অশিক্ষা। যার কারণে স্ত্রীর প্রতি স্বামীর অত্যাচারের কথাও ব্যক্ত হয়েছে বহু লোকগানে। যে-কোনো বাঙ্গাল ভাষীর আঞ্চলিক গান যেখানে স্পষ্টতই ধরা পড়েছে স্ত্রীর প্রতি স্বামীর অত্যাচারের এক নির্মম রূপ। অসহায় গ্রাম্যনারী স্বামীর বাহুবন্ধনে নিরুপায়ের মতো ধরা দেয়। অভাবের তাড়নায় স্বভাবও নষ্ট হতে থাকে স্বামীর। চ্যাপ্টা বাতি দিয়ে স্ত্রীকে বেধড়ক মারার সময় পাশের কেউ ভয়ে তাকে থামাতে চায় না। আর প্রচণ্ড ক্রোধে গর্জন করার সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীর শাঁখা ভেঙ্গে মেরে তাকে রক্তাক্ত করে দেয়—

> গোলাম ড্যাঙইয়ালু রে/মোকে চ্যাপ্টা বাতি দিয়া/গা ফাটে মর রক্ত পড়ে/দর দর করিয়া।/গোলাম ড্যাঙআইলুরে রে/পাটিয়াল ড্যাঙইয়ালুরে।/মোক মারলু বেশ কাম করলু,/ হাতের ভাঙল শাঁখা/গোলাম হাতের ভাঙল শাঁখা ২...

স্বামীর প্রতি স্ত্রীর এই সুতীব্র প্রতিবাদ, অসহায়তা, নারী জীবনের মর্মবেদনা, আজও গ্রাম জীবনে সুস্পষ্ট। বুদ্ধিমতি নারী তার গানে এভাবেই পুরুষ-শাসিত সমাজে স্বামীর প্রতি প্রতিবাদী ভাবনা ব্যক্ত করে। ক্ষেত্রসমীক্ষায় মালদা জেলার বাঙালি মুসলিম সম্প্রদায়ের আরও বহু লোকগানের সন্ধান পাওয়া গেছে। মহরমের ঝাড়নি গান, পয়গম্বরের জন্মোৎসব বিষয়ক গান ইত্যাদি; কালের স্রোতে আধুনিক যন্ত্রসভ্যতার প্রভাবে যা ক্রমশ লুপ্ততার পথে। সেই লুপ্তপ্রায় লোকগান, যার মধ্যে দিয়ে একদিকে বিনোদনের স্বাদ যেমন পাওয়া যায়, তেমনি সংশ্লিষ্ট সমাজের সংস্কৃতি, তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থান, সমাজ বাস্তবতার বিশ্বস্ত দলিল হয়ে ওঠে।

ক্ষেত্র সমীক্ষা

১. লাকি বিবি, বয়স-৬০, পেশা-গৃহবধূ, চাঁচল, মালদা।
২. জমিরন নেশা, বয়স-৪০, পেশা-গৃহবধূ, ভেবা, চাঁচল, মালদা।
৩. রেজাউল ইসলাম, বয়স-৫৫, পেশা-লোকশিল্পী, নয়া বসতপুর, চাঁচল, মালদা।
৪. মহঃ মহসিন আলি, বয়স-৬৮, পেশা- শিক্ষক, নেজামিয়া মাদ্রাসা, দামাইপুর, চাঁচল মালদা।
৫. মহঃ হেলাল, বয়স-৫০, পেশা-লোকশিল্পী, মল্লিকপাড়া, স্বরূপগঞ্জ, চাঁচল, মালদা।
৬. মনয়ারা খাতুন, বয়স-৫৬, পেশা-গৃহবধূ, বালিডাঙ্গা, চাঁচল, মালদা।
৭. মরজিনা বিবি, বয়স-৫৫, পেশা-গৃহবধূ, চণ্ডীগাছি, নেহালপুর, চাঁচল, মালদা।
৮. সামিমা আকতার বানু, বয়স-৩০, পেশা-গৃহবধূ, দামাইপুর, মালতিপুর, মালদা।
৯. মৌসুমি পারভিন, বয়স-৩০, পেশা-গৃহবধূ, কনুয়া, চাঁচল, মালদা।
১০. সেখ রিপন, বয়স-২৮, পেশা-ছাত্র, চণ্ডীগাছি, চাঁচল, মালদা।

হুদুমদেও-এর গান ও পরিবেশ ভাবনা

গোবিন্দ্র বর্মন

মানব সভ্যতার সৃষ্টিলগ্ন থেকেই প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের একটা প্রতিদ্বন্দ্বিতার সূত্রপাত। সময় যত গড়িয়ে যাচ্ছে ততই তা ভয়ংকর আকার ধারণ করছে। আর আমরা যতই উন্নত-উন্নততর পাখায় ডানা মেলেছি, ততই পরবর্তী প্রজন্মকে বিপন্ন বিশ্বের অভিমুখে ঠেলে দিচ্ছি। অথচ পিছনে ফিরে দেখার অবকাশ পাচ্ছি না। আর তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে অষ্টাদশ শতাব্দীর বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে; যা ক্রমাগত বিষাক্ত করে তুলছে আমাদের প্রাণ-বায়ু, জল-জীবন, পায়ের তলার মাটি। বিশ্বায়নের জাঁতাকলে আমরা নিরন্তর প্রকৃতিকে ধ্বংস করছি। আজ প্রকৃতিকে বাঁচানোর তাগিদ থেকে প্রকৃতি-পুজোর বিভিন্ন মাধ্যমগুলি লোকসংস্কৃতির অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

প্রকৃতিতে যখন প্রতিকূলতা দেখা দেয়, তখন আপামর জনসাধারণ বিভিন্ন মাঙ্গালিক কাজে নিজেদের নিযুক্ত করেন। এই ধারা চলে এসেছে সুপ্রাচীন কাল থেকেই। বলতে গেলে বেদের যুগ থেকে মধ্যযুগের সাহিত্য হয়ে একবিংশ শতাব্দীতে থালা বাজানো, প্রদীপ জ্বালানো, টর্চ বা ফ্লাশ জ্বালানো পর্যন্ত এই ধারা বহমান। বেদের কথা নাই বা বললাম, মধ্যযুগের লিপিকরগণ প্রকৃতির প্রতিকূলতার সময় যেভাবে নিজেদের মাঙ্গালিক কাজে অংশগ্রহণ করেছেন, সেই প্রসঙ্গ তুলে ধরা যাক তাঁদেরই পুষ্পিকার উদ্ধৃতি দিয়ে—"সন ১৩১৬ সালে অকাল দুর্ভিক্ষ হেতু সেই সালেতে পুস্তক আরাম্ভন"[১] বুঝতে অসুবিধা হয় না দিনাজপুর জেলার বৈরঠ্যা গ্রাম-নিবাসী লিপিকর হরিমোহন স্বর্ণকার "অকাল দুর্ভিক্ষহেতু" মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের লিপিকর্মে আত্মনিয়োগ করেন। এই প্রসঙ্গে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬২৩৯, ৬২৪০ নং পুথির পুষ্পিকার কথাও বলা চলে। ভাগবতে লক্ষ করি, বৃষ্টির জন্য ইন্দ্রদেবতার পুজোর কথা। গোকুলে অনাবৃষ্টির জন্য নন্দসহ গোপগণ বৃষ্টির দেবতা ইন্দ্রের পুজোর আয়োজন করছেন—

নন্দ আদি গোপ যত একত্র হইঞা।
করিব ইন্দ্রের পূজাএকচিত্ত হঞা॥...
বিনিবৃষ্টে ঘাসনহেযুনদামোদর।
বৃষ্টির ইস্বরহয় দেবপুরন্দর॥[২]

বৃষ্টির জন্য ইন্দ্র, বরুণের পুজো সুপ্রাচীন কাল থেকেই দেখা যায়। আমাদের আলোচ্য জলমাঙ্গার গান বা হুদুমদেও'র গান সুখা বা অনাবৃষ্টি থেকে ধরিত্রীর বুকে বৃষ্টি নামিয়ে সুজলা-সুফলা-শস্য-শ্যামলা করে তোলার ব্রতগান। এই গানের উদ্ভব কবে হয়েছিল তা জানা

যায় না, তবে বহু বছর ধরে সংস্কৃতি পরম্পরায় কোচ-রাজবংশী সমাজের মধ্যে এই গানের ধারা প্রবাহমান। হুদুমদেও বাজল মাঙ্গারগান কোচ-রাজবংশী সমাজ-সংস্কৃতির এক সুপ্রাচীন ধারাকে বহন করে। এই সংস্কৃতিকে গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে এই জাতির নৃতাত্ত্বিক পরিচয়েরও হদিশ মেলে। বর্ষাকালে বৃষ্টি না হলে বা খরা দেখা দিলে কোচ-রাজবংশী সমাজের মহিলারা পৃথিবীতে বৃষ্টি আনয়নের জন্য হুদুমদেও'র পুজো করেন। হুদুমদেও'র পুজো গোটা উত্তরবঙ্গসহ আসাম, বাংলাদেশ, বিহারে কোচ-রাজবংশী অধ্যুষিত এলাকায় মহিলারা সুপ্রাচীন কাল থেকেই এই সংস্কৃতিকে লালন-পালন করছেন এবং এখনও করতে দেখা যায়। তবে স্থান বিশেষে এই পুজোর নাম, রীতি-নীতি, উপকরণ এবং গানের বিশেষ পার্থক্য লক্ষ করা যায়। কোচবিহার জেলায় হুদুমদেও; জলপাইগুড়ি জেলার কোথাও কোথাও জলভুকা; উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর; মালদহ জেলায় জলমাঙ্গার গান নামে পরিচিত। আসামে বিশেষত গোয়ালপাড়া জেলায় হুদুমদেও নামটি প্রচলিত। বলাবাহুল্য, যে এক একটি জেলার ভিতরেও স্থানবিশেষে নাম, গান, পুজোপদ্ধতির বিশেষ পার্থক্য লক্ষ করা যায়। সংস্কৃতির সংমিশ্রণের ফলে মুসলমান সমাজ ও আদিবাসী সমাজের মধ্যেও এই গানের প্রচার দেখা যায় বাংলাদেশ ও উত্তরবঙ্গের বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে।

হুদুমদেও বৃষ্টির দেবতা হিসেবে কল্পিত। সংস্কৃতি অতিপ্রাচীন বলে, পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন নাম প্রচলিত। সুতরাং নামের উৎস সম্পর্কেও নানা মুনির নানা মত। নির্মলেন্দু ভৌমিক লিখেছেন—"দেবতার নাম হইতে অনুষ্ঠানের নাম না হইয়া, অনুষ্ঠান হইতে দেবতার নাম হইয়াছে হুদুমা।" 'হুদুম' শব্দর অর্থ নির্ণয় করিতে পারলেই দেবতার নামের অর্থ খুঁজিয়া পাওয়া যায়। 'হুদুম' শব্দটি উলঙ্গ অর্থে 'উদুম' হইতে এসেছে বলে মনে হয়। জলপাইগুড়ি জেলার ধূপগুড়ি অঞ্চল 'উদুম', লিঙ্গ 'বাবেহায়া' অর্থে চলিত আছে। এই গান গাইবার সময় মেয়েরা একেবারে উলঙ্গ হয়ে থাকে। উলঙ্গ হয়ে যে গান গাওয়া হয়ে থাকে তা-ই হুমার গান এবং সেই দেবতার নাম 'হুদুমা'।[৩] আবার তিনি বলেন 'উদুম' শব্দটি গ্রামবাংলায় উলঙ্গ অর্থে প্রচলিত। তারপর হর্ষধ্বনির আগমনে 'উদুম' হয়েছে হুদুম বাহুদুমা। 'দেব' থেকে দেও' শব্দটিও ধ্বনিগত পরিবর্তনের কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন তিনি। উত্তরবঙ্গে কোচ-রাজবংশীদের মধ্যে ঝড়-বৃষ্টি সম্পর্কিত হুম, হুমা, হুমাই, হুড়কা প্রভৃতি শব্দগুলি প্রচলিত। এই হুমাই বাহুড়কা শব্দগুলি ভয়ার্থে ব্যবহৃত হয়। এর থেকেও হুদুম শব্দটি আসা অস্বাভাবিক নয়। আবার চলন্তিকা অভিধানে 'হুদ্দা' শব্দটি 'অধিকারের বা কার্যক্ষেত্রের সীমানা' অর্থে ব্যবহৃত। হুদুমদেও-কে যদি বৃষ্টির দেবতা হিসেবে গণ্য করা হয়, তাহলে 'হুদ্দা' থেকেও 'হুদুম' শব্দটি আসতে পারে অনুমান করা যায়।

বংশ-পরম্পরাগত ভাবে কৃষিজীবী নানা জাতি বা জনজাতির মানুষ ঋতুচক্রের সঙ্গে সঙ্গে কৃষিকেন্দ্রিক বিভিন্ন আচার উৎসব পালন করে। ফলে তাদের জীবনচর্চা, ধর্মবিশ্বাস ও লোকাচার গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে। সহজাত শ্রমজীবী কৃষক সমাজের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনীয় সম্পদ হলো শস্য আর সন্তান। এই শস্য ও সন্তান উৎপাদনের আকুল কামনা থেকে তাদের জীবনসংগ্রাম বহমান। কৃষিকর্মের সফলতা কামনা করে, বিরূপ প্রকৃতিকে জয় করার লক্ষ্যে বিভিন্ন দেবদেবী, অতীন্দ্রিয় দৈবশক্তি কামনা করে। সে দিক থেকে আমাদের আলোচ্য হুদুমদেও কৃষিকেন্দ্রিক সমাজব্যবস্থায় প্রকৃতি প্রশস্তিমূলক উৎসব।

কোচ-রাজবংশি কৃষক সমাজে মূলত মহিলারাই এই উৎসবের আয়োজন করে। খরা বা অনাবৃষ্টির সময় বাড়ি থেকে দূরে কোনো নির্জন মাঠে বা ক্ষেতের জমিতে দলবদ্ধভাবে মহিলারা এই উৎসবে মেতে ওঠেন। বিশ্বাস হুদুমদেও'কে সন্তুষ্ট করতে পারলে বৃষ্টি নামবে। এ সম্পর্কে W.W. Hunder তাঁর "Statistical Account of Bengal" গ্রন্থে বলেছেন—

> A singularrelic of old superstition is the worship of the God called Hudumdeo. The women of a village assemble together in some distance and solitary place, no male bening allowed to be present at the rite, which is always performed at night, aplaintain or a young bamboo is stuck in the ground and a women, throwing off their garments, dance round the mystic tree, singing old songs and charms. Thise rite is more especially performed when there is no rain and the crops are suffering from drought.[8]

আসলে এই হুদুমদেও মূলত ইন্দ্র-বরুণ দেবতাদ্বয়ের লোকায়ত রূপান্তর। হুদুম পুজোর তিথি, পদ্ধতি, নৈবেদ্য, উপাচারের দিকে নজর দিলে দেখা যায়—

১. এই পুজোর নির্দিষ্ট কোনো তিথি নেই। মূলত পূর্ণিমা-অমাবস্যা রাত্রিতে বিশেষত মঙ্গলবার ও শনিবারের দিন এই পুজোর আয়োজন করা হয়।

২. পুজোর জায়গাটি পরিষ্কার ও সমান করে গোবর জল ছিটিয়ে পবিত্র করে নেওয়া হয়। তারপর সেখানে স্ত্রী জননেন্দ্রিয় অঙ্কন করে তার মাঝখানে একটি কলাগাছের (আটিয়া কলা) চারা পুঁতে দেওয়া হয়।

৩. কল্পনা করা হয়, স্ত্রী জননেন্দ্রিয় বসুমতি এবং কলাগাছ ইন্দ্র-বরুণরূপে। জননেন্দ্রিয়কে উৎপাদন ও উর্বরতার প্রতীক রূপে কল্পনা করে পান-সুপারি, আমের পল্লব ও জলপূর্ণ ঘট কলা গাছের গোড়ায় বসানো হয়।

৪. এছাড়া পুজার উপাচার হিসেবে পাই তেল-সিঁদুর, নেউচ পাতা, দই, চিড়া, কলা, চিনি, গুড়, ধুপ-ধুনা, ফুল, পাখির বাসা, লাঙ্গাল, জোয়াল, স্ত্রী মানুষের গা ধোয়া জল ইত্যাদি।

৫. সমস্ত উপাচার সাজিয়ে অভিজ্ঞ বর্ষিয়ান মহিলা, যিনি পুজোর প্রধান দায়িত্বে থাকেন তিনি নগ্ন হয়ে পুজোর বিভিন্ন ছড়া বা মন্ত্র পাঠ করেন। পুজো শেষ হলে অন্যান্য মহিলারাও নগ্ন হয়ে হুদুমদেও'র কাছে বৃষ্টি ও সন্তান কামনা করেন।

৬. এরপরই হুদুমনিত্য বা খেলা। বিবস্ত্র মহিলারা জল ঢেলে নৃত্য করে। কাদা তৈরি করে। উদ্দাম নৃত্যের মধ্যে দিয়ে হাল চাষের অভিনয় করে, ইন্দ্ররূপী কলাগাছকে ঘিরে নৃত্য-আলিঙ্গান, চুম্বন, শৃঙ্গার রসের মধ্যেদিয়ে (মূলত কোচবিহার জেলায়) হুদুমদেও'কে সন্তুষ্ট করার প্রচেস্টা লক্ষ করা যায়।

৭. এরপর মহিলারা পুরুষদের সংযত করার কোনো সংকেত জানিয়ে মঙ্গালঘট মাথায় নিয়ে গান করতে করতে গ্রামের দিকে প্রবেশ করেন। সেই মন্ত্রপূত জল বাড়ি বাড়ি ছিটিয়ে দিয়ে বৃষ্টি কামনা করে।

এখানে লক্ষণীয় ব্রতকামী মহিলা বা সেই জাতি বা জনজাতির মানুষের আদি লৌকিক ধারণাটি। কৃষিজীবী মানুষ বিরুদ্ধ প্রকৃতি ও অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করে বেঁচে থাকার তীব্র বাসনাই এই ব্রত বা উৎসবের মূল লক্ষ্য। বিরুদ্ধ প্রকৃতিকে জয় করে ফসল উৎপাদন ও খাদ্যের সংস্থান করে কৃষিজীবী মানুষ সন্তান-সন্ততি, পরিবার-সমাজকে নিয়ে সুখে শান্তিতে

বেঁচে থাকার কামনাই এখানে ফুটে উঠেছে। এখন প্রশ্ন হলো, এই আচার-পর্বটি কি কেবল জাদুবিশ্বাস ও আদিমসংস্কার, না প্রকৃতির উপর এর কোনো প্রভাব, উপযোগিতা রয়েছে। এর কোনও বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব নয়। আবার উপযোগিতাহীন বা ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দেওয়াও বোধহয় বিজ্ঞানীদের পক্ষে সম্ভব নয়।

গল্পকার জীবন সরকার এই আচার-বিশ্বাসকে বিষয়বস্তু করে 'হুদুম দেখা দেও গো আসিয়া' গল্পটি লেখেন। গল্পের চরিত্র মনা। চারদিকে প্রকৃতির রুক্ষ-শুষ্ক, বিরূপ ছায়া। কিন্তু মনা বিশ্বাস করে বৃষ্টি হবেই। গল্পকার দেখিয়েছেন, প্রকৃতির সঙ্গে ব্রতচারী মহিলারা একাত্ম হয়ে ধরিত্রীর বুকে বৃষ্টি আনয়নের জাদু বিশ্বাসের দিকটি। গ্রামীণ মানুষের সেই বিশ্বাসকে গল্পকার অবিশ্বাসী হতে দেননি। গ্রামের যুবতী, রজঃস্বলা, গর্ভবতী মহিলারা আয়োজন করেছেন হুদুমদেও'র পূজা উৎসবের। আকাশে বাতাসে তারই গান ছড়িয়ে পড়েছে। গান করছে, নিত্য করছে ব্রতীরা। তখনও ওদের শরীরে আগুন জ্বলছে। উলঙ্গ শরীর পুড়ে যাচ্ছে। ওদের বুকে তলপেট বেয়ে নামছে আগুনের ঢল। তারা দাঁড়াতে পারছে না। ফাটা ফাটা জমিতে ওদের শরীরের ঘাম পড়ছে টুপ টুপ করে। পরক্ষণেই অনুভব করে উলঙ্গ শরীরে কিসের ফোঁটা লাগছে। শালপাতা থেকে পড়ছে টপটপ বৃষ্টির ফোঁটা। গাছ-গাছালিতে এলোমেলো বাতাস। পাখিরা ডানা মেলছে।

পিঁপড়েরা মাটির তলা থেকে উঠে এসেছে জমির আলে—"আকাশ কালো হয়ে মেঘ নেমে এলো ধরিত্রীতে। ওরা গোল হয়ে বসে পড়ল মাটিতে। বৃষ্টির জল ওদের উলঙ্গ শরীর ধুয়ে ধানক্ষেতে নামল। ওরা বুক ভরে বৃষ্টি নিল ভিতরে।"[৫] মনে রাখতে হবে, যখন প্রযুক্তি এতো উন্নত ছিল না তখন কৃষিকেন্দ্রিক কোচ-রাজবংশি সমাজের মহিলারা এভাবেই নিজেকে উলঙ্গ করে প্রকৃতির মধ্যে নিজেদের উৎসর্গ করতেন। প্রকৃতিও সাড়া দিতেন। এখানে একটা লোকবিশ্বাস কাজ করতো। ফলে নারী আর প্রকৃতি একাকার হয়ে যায়। এই নারীরাই আসলে উর্বরতা শক্তির প্রতীক। নারীর মধ্যে দিয়েই ধরিত্রী নিজেকে সাজায় গোছায়। হুদমদেও'র গান হয়ে ওঠে উর্বরতাকেন্দ্রিক আচারসর্বস্ব উৎসব। আপাতদৃষ্টিতে এই উৎসবটি অশ্লীল বলে মনে হতে পারে। কিন্তু এই উৎসবের উপকরণের গভীর অর্থ অনুধাবন করলে দেখা যায় যে প্রকৃতি ও পরিবেশের সঙ্গে মানব জীবনের নিবিড় সম্পর্ক স্থাপনই এই উৎসবের মূল লক্ষ্য—

উপাচার	**অন্তর্নিহিত অর্থ**
কলাগাছ :	স্রষ্টার প্রতীক
শস্য :	ধনের প্রতীক
অঙ্কিত যৌনাঙ্গ :	সৃষ্টিক্ষেত্র
ঘট :	সৃষ্টির প্রতীক
পঞ্চপল্লব :	পঞ্চভূত—ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, বোম অর্থাৎ নিসর্গ জগৎ এবং যাবতীয় সৃষ্ট পদার্থকে বোঝায়।
সিঁদুরের ফোটা :	সৃষ্টির প্রবর্তনা
পান সুপারি :	উর্দ্ধগামিতা

লাঙ্গাল-জোয়াল : কর্ম সাধনা
পাখির বাসা : শুষ্কতা
নারীর গা ধোয়া জল : বৃষ্টির প্রতীক ইত্যাদি

অর্থাৎ সজীব পৃথিবীর আরাধনা ছাড়া এই ব্রতের অপর কোনো উদ্দেশ্য নেই। আসলে আমরা যদি কোচ-রাজবংশি সমাজের জীবন-জীবিকা, বাসস্থানুসন্ধানের দিকে লক্ষ করি তাহলে সর্বত্রই প্রকৃতি ও পরিবেশের সঙ্গো সমন্বয় ও সহযোগিতার ভাব লক্ষ করা। বাসস্থান সম্পর্কে বলা হতো, 'উত্তর গুয়া দক্ষিণে ধুয়া পুবে হাঁস পশ্চিমে বাঁশ' অর্থাৎ বাস্তুকেন্দ্রিক পরিবেশ ভাবনা প্রখর ভাবে ফুটে উঠে এখানে। রাজবংশি সমাজের অন্যান্য সংস্কৃতির দিকে যদি লক্ষ করি তাহলে দেখা যাবে, প্রকৃতির সঙ্গো এই সমাজের মানুষের নিবিড় সম্পর্ক। বিবাহিত মহিলার সন্তান না হলে তার সঙ্গো জিগা গাছের আনুষ্ঠানিকভাবে সই পাতানো হয়। বংশবিস্তার ক্ষমতা অধিক। এই গাছের ডাল মাটিতে পুঁতে দিলেই গাছ হয়। মরে না। অনেক সময় বট গাছের সহিত পাকুড় গাছের বিবাহ দেওয়া হয়। সেই সঙ্গো কোথাও কোথাও কদম গাছকেও লক্ষ করা যায়। এই তিনটি গাছেরই সৃষ্টি ক্ষমতা অসাধারণ।

কোচ-রাজবংশি সমাজের পরিবেশ ভাবনা উৎকৃষ্ট নিদর্শন হলো বিষুয়া উৎসব। এইদিন কোচ-রাজবংশি সমাজের লোকেরা বাড়ির চারপাশের গাছগুলোকে (বিশেষ করে ফলের গাছ) খর দিয়ে বেঁধে দেয়। এর পিছনে বিশ্বাস যাই থাক না কেন, মানুষের সঙ্গো উদ্ভিদ জগৎ তথা পরিবেশের বন্ধনকে বড় করে দেখানো যেতে পারে। তাছাড়া বাড়ির চারপাশে গাছ লাগানো বিশেষ কর্তব্য এই উৎসবে। আসলে এই উৎসবে রয়েছে পরিবেশ ভাবনার কথা, পরিবেশকে জীবিত রাখার কথা। এছাড়া রাজবংশি সমাজের মধ্যে হারবাল ট্রিটমেন্টের সঙ্গো ম্যাজিক রিলিজিয়াস ট্রিটমেন্ট বা যাদুর চিকিৎসা লক্ষ করা যায়। তার মধ্যেও পাই পরিবেশ ভাবনার কথা। শুধু তাই নয় বিভিন্ন ছড়া, প্রবাদ, হাল চাষ ও ঋতু সম্পর্কিত যে ছড়াগুলি চলিত আছে তার মধ্যেও পরিবেশবাদী ভাবনার বীজ খুঁজে পাওয়া যায়। যেমন শিশুদের একটি ছড়ায় পাই—

আয়রে পানি ঝিম্ ঝিম্
পাঠা কাটিয়া দিম দিম।...
আইসেক পানি ঝাকে ঝাকে
শিদল খাবো গাছে গাছে।[৬]

আজ একবিংশ শতাব্দীতে প্রকৃতি একটু বিরূপ আকার ধারণ করলে আমরা দ্বিগুণ বিরূপ আকার ধারণ করে প্রকৃতির গলা টিপে ধরি। প্রযুক্তিকে হাতিয়ার করে আমরা দ্বিগুণ প্রতিশোধ নিই। অর্থাৎ বৃষ্টি না হলে শ্যালো দিয়ে প্রয়োজনের অতিরিক্ত ভূগর্ভস্থ জল তুলি, গরম একটু বেশি হলে এয়ারকন্ডিশন দ্বিগুণ বাড়িয়ে দিয়ে বিশ্ব উষ্ণায়নকে ত্বরান্বিত করি। এই প্রসঙ্গো কথা সাহিত্যিক কিন্নর রায়ের একটি মন্তব্য স্মরণ করা যেতে "দুহাজার আটচল্লিশ সালের এই পৃথিবী। তার আকাশে কোনও মেঘ নেই। মেঘ জমে না, ওড়ে না বলে কবিদেরও মেঘ নিয়ে অনেক রকম কবিতা লেখা বন্ধ। কোথায় সেই কালিদাসের মেঘদূত! উজ্জয়িনী নগর। বিরহী যক্ষ অলকা পুরীতে কেমন করে পৌঁছাবে তাঁর কষ্টের কথা। পূর্বমেঘ, উত্তরমেঘ সবাই ভ্যানিশ। এমনকি বাংলা ভূগোল বইয়ে পড়ার জন্য স্তূপ মেঘ, কোদালে মেঘ, অলক

মেঘতাদের কথাও আর কেউ মনে রাখে না।"[৭] তাহলে প্রশ্ন জাগে প্রকৃতি ও পরিবেশকে বাঁচাতে হলে আমরা কি সেই আদিম বিশ্বাস সংস্কারকে আঁকড়ে ধরবো আবার রাতের আধাঁরে উলঙ্গ হয়ে হুদুমদেও'র গান করব না। আজ একবিংশ শতাব্দীতে যখন চারদিকে প্রকৃতি ও পরিবেশকে নিয়ে নানাচর্চা চলছে তখন হুদুমদেও'র গান এটা শেখায় যে, উলঙ্গ নয় বাড়ির ছাদের বৃষ্টির জলকে ব্যবহারযোগ্য করো। হুদুমদেও'র গান নয়, যে পদ্ধতিতে প্রাকৃতিক সম্পদের সদ্ব্যবহার করা যায় সেটাই দশ জনকে জানানো অর্থাৎ প্রাকৃতিক সম্পদের কল্যাণমুখী ব্যবহার ও তার প্রচার। মনে রাখতে হবে, এই সংস্কৃতি পরিবেশকে ধ্বংসের কথা বলে না পরিবেশকে গড়ার কথা বলে। প্রকৃতিকে মুষ্টিগত না করে নিজেকে প্রকৃতির মধ্যে একাত্ম হয়ে যাওয়ার কথা বলে। এ সম্পর্কে দীপককুমার রায় বলেন—"রাজবংশি জনগোষ্ঠীরতে পুরানী হলিচাত পরিবেশ ভাবনা একে না দিঘিলা কাথা। পরিবেশোক ক্যামনক রি বত্তি রাখির না গিবে তারে বাদে রাজবংশি সংস্কৃতি ভাণ্ডারো তমেল্লা দিশা আছে। হুদুমেদেও তারে একে না গহেনা।"[৮] আমরা এই আচার-অনুষ্ঠানের গভীর অর্থ যদি অনুধাবন করতে পারি, তাহলে একবিংশ শতাব্দীর 'জল ধরো জল ভরো' কর্মসূচির সঙ্গে জলমাঙ্গার গান বা হুদুমদেও'র গান একাকার হয়ে যায়—

> হুদুম হুদুম হুদুমরে/হুদুম কি কাজ করিলরে।/কারো কারো হালকামাই।/হুদুমারঘরত সাত ভাই/কারো ক্ষেতে পানি নাই।/আছে পানি গাঙ্গোতে/ঢালিদিব জমিতে।[৯]

তথ্যের সন্ধানে

১. নিজ সংগৃহীত পুথি।
২. অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য ও সুমঙ্গল রাণা সম্পাদিত : 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়—মালাধর বসু', রত্নাবলী, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ ডিসেম্বর ২০১২, পৃ. ২১৩
৩. নির্মলেন্দু ভৌমিক : 'প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের লোকসংগীত', অঞ্জলি পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জুলাই, ২০১১, পৃ. ৯০
৪. W.W. Hunter : 'A Statistical Account Of Bengal' (Vol-X), Trubner & Co. London, 1876, পৃ. ৩৭৮
৫. অমিতকুমার দে : 'চিকরাশি-জীবন সরকার সংখ্যা', পৃ. ৩৮
৬. নির্মলেন্দু ভৌমিক : 'প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের লোকসংগীত', অঞ্জলি পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জুলাই, ২০১১, পৃ. ৫৩
৭. কিন্নর রায় : 'মেঘচোর', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ : জুলাই ২০১৬, পৃ. ১০৯
৮. দীপককুমার রায় : 'রাজবংশি সমাজ আরো সংস্কৃতির কাথা', সোপান, কলকাতা, প্রথম সংকলন, বৈশাখ ১৪১৯, পৃ. ৫২
৯. সুভাষচন্দ্র রায় (সংগ্রহ ও রচনা), শ্রীউপাসু (প্রকাশনা ও সম্পাদনা), হুদুমদেও বৈদিক ও লৌকিক উৎস কথা, পৃ. ৫০

উনিশ শতকে কলকাতার নাগরিক লোকসংস্কৃতিতে পল্লিগানের নাগরিক রূপায়ণ

সোহিনী নন্দী

ঊনবিংশ শতক আধুনিক ভারতবর্ষের ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সময়। ইতিহাসে এই সময়কাল নবজাগরণের যুগ হিসেবে খ্যাত। সামাজিক সংস্কারমূলক কার্যকলাপ ছাড়াও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও এই শতক নানাবিধ যুগান্তকারী পরিবর্তনের সাক্ষী হয়েছিল। এই সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের বিশেষ কিছু দিক অবিভক্ত বাংলার গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ভরকেন্দ্র কলকাতা প্রত্যক্ষ করেছিল। কলকাতার উত্থানের ফলে জন্ম নেয় নতুন নগরকেন্দ্রিক সংস্কৃতি; যেখানে লোকসংস্কৃতির গ্রাম্য উপাদানের সঙ্গে মিশে যায় শহুরে বাবু সংস্কৃতি। এই মিশ্র সংস্কৃতিতে গ্রামীণ গীতি যেমন—তরজা, পাঁচালি, কবিগান, উত্তর-ভারতীয় শাস্ত্রীয় গান এবং কিছু ক্ষেত্রে ইউরোপীয় বাদ্যের সম্মেলনে তৈরি বৈঠকীগানের মধ্যে পারস্পরিক আদান-প্রদান সম্ভব হয়।

এই আদান-প্রদানের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন নব্য উত্থিত ধনীসমাজ এবং গায়করা ছিলেন শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বা কেরানি এবং অশিক্ষিত, এছাড়াও জীবিকার তাগিদে আসা বিভিন্ন জাত এবং বর্ণের মানুষজন। এভাবেই নতুন পরিমণ্ডলে গ্রাম্য-গীতির অনিয়ন্ত্রিত বহুজনের সংস্কৃতি এবং বৈঠকীগানের স্বল্পজন নিয়ন্ত্রিত সংস্কৃতির পারস্পরিক আদান-প্রদানের ফলে যে সঞ্চালনশীলতা জন্ম নেয় তার চরিত্র নিয়ে ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ এই প্রবন্ধে আলোচিত হবে।

বাংলাদেশের অতীত ইতিহাস ঘাটলে দেখা যায়, এখানে উচ্চবর্গের বাঙালির সাংস্কৃতিক ইতিহাস সরব অথচ নিম্নবর্গের খেটে খাওয়া মানুষের সাংস্কৃতিক ইতিহাস নিয়ে সেরকম কোনো তথ্য নেই। দ্বাদশ শতক থেকে সপ্তদশ শতক পর্যন্ত নাগরিক সংস্কৃতির কেন্দ্রবিন্দু পৌণ্ড্রবর্ধন থেকে নবদ্বীপে স্থানান্তরিত হয়। নবদ্বীপে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আমলে যে নাগরিক সংস্কৃতি গড়ে ওঠে, সেখানে সাধারণ এবং অভিজাতশ্রেণির মানুষের উভয়ের চাহিদা মেনে এক ধরনের সাংস্কৃতিক বিবিধতার আদর্শ তৈরি হচ্ছে।[১]

কিন্তু এক্ষেত্রে পারস্পরিক আদান-প্রদানজাত সাংস্কৃতিক সঞ্চালনশীলতার সুযোগ ছিল কম। অষ্টাদশ শতকের নবদ্বীপের নাগরিক সংস্কৃতি এবং কলকাতার নাগরিক সংস্কৃতি কার্যত আলাদা ছিল। কলকাতায় কৃষ্ণাঙ্গ শহর বা নব্যউত্থিত বাবু সমাজের শহর এবং শ্বেতাঙ্গ শহর বা ইউরোপীয় কর্মচারীদের সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য যেমন ছিল, তেমনই ছিল কৃষ্ণাঙ্গ শহরের

মধ্যে উচ্চবর্গ বনাম নিম্নবর্গের আর্থ সামাজিক বিভাজন। কিন্তু এই শহরে সামাজিক সঞ্চালনশীলতার সুযোগ ছিল প্রচুর। ফলে সাংস্কৃতিক সঞ্চালনশীলতার পরিসর কিছুটা হলেও প্রশস্ত হয়েছিল। এই বিবিধতার পরিমণ্ডলে Great Tradition বা ধর্মতাত্ত্বিক, শিক্ষিত, অভিজাত ইত্যাদি মুষ্টিমেয় শ্রেণির ঐতিহ্য[২], Little Tradition বা বহুজনের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য[৩] পরস্পরকে গ্রহণ এবং বিয়োজনের মাধ্যমে মিশ্র সংস্কৃতির নতুন সংজ্ঞা তৈরি করে। এই বহু বনাম স্বল্পের ঐতিহ্য বাংলাদেশে নতুন নয়। সংগীততত্ত্ববিদ রাজ্যেশ্বর মিত্র বলেছেন, বাংলা এমনই একটি প্রদেশ ছিল যেখানে বৃহত্তর সংগীত আন্দোলনের জোয়ার পৌঁছাত না। যদিও সতেরো শতকের শেষে ধ্রুপদের সঙ্গে বাংলাদেশ পরিচিত হতে শুরু করলেও কিন্তু প্রাক মুঘল যুগে ধ্রুপদ সংগীতের ঐতিহ্য এই প্রদেশ কোনওভাবেই গ্রহণ করেনি। সে তুলনায় বাংলার রাজদরবার আত্মস্থ করছিল একধরনের প্রবন্ধগীতি।[৪]

সুপ্রাচীন পাঁচালি গান একধরনের প্রবন্ধ গীতি ছিল। এর পাশাপাশি পদাবলী কীর্তন, শাক্তগান এবং লোকভাবনার ঐতিহ্য নিয়ে কবিগান[৫] ছিল। সমাজের খেটে খাওয়া মানুষের জন্য ভাটিয়ালি, জারি, সারি, বিয়ের গান ছিল। এই ধরনের গানগুলিতে সাধারণের আনন্দ, দুঃখ, বেদনা উঠে আসতে থাকে। প্রাক্-উনিশ শতকের এই পদাবলী কীর্তন এবং প্রবন্ধ গীতি ছিল Great Tradition-এর অঙ্গ। কারণ এই গান সাধারণের মধ্যে সেই ভাবে প্রচলিত ছিল না। Little Tradition বনাম Great Tradition ধারণার কিছু পরিবর্তিত পরিচয় পাওয়া যায় মাতঙ্গ মুনির সংগীত শাস্ত্রে। সেখানে বলা হয়েছে, যে-বিভিন্ন ধরনের 'গীতি' কার্যত দেশি সংগীতের অন্তর্গত। এই ধরনের গানের মধ্যে দিয়ে একটি অঞ্চলের নিজস্ব ভাব-ভাবনা প্রকাশিত হয় এবং সাধারণ মানুষ এই ভাবনার সাথে যুক্ত থাকে।[৬] এর পাশাপাশি শাস্ত্রভিত্তিক সংগীত ছিল যা স্বল্পের সংস্কৃতিকে প্রতিফলিত করে। এই হিসেবে বলা যায় বাংলাদেশের গীতিগুলি বৃহত্তর দরবারী সংস্কৃতির বিপরীতে Little Tradition-কেই গুরুত্ব দিচ্ছিল।

অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগ থেকে রাজনৈতিক পরিমণ্ডল আস্তে আস্তে পরিবর্তিত হতে থাকে। একদিকে পতনশীল মুঘল সাম্রাজ্যের দরবারি সংস্কৃতি, অপরদিকে কলকাতায় গ্রামগঞ্জ থেকে আসা ময়রা, জেলে, ধোপা ইত্যাদির নিম্নবর্গীয় সংস্কৃতি নতুন ধরনের নাগরিক সংস্কৃতির পরিমণ্ডল তৈরি করে। অনেক ক্ষেত্রেই গ্রাম থেকে জীবিকার সন্ধানে আসা বেশ কিছু নিম্নবর্ণের মানুষ আর্থিক প্রতিপত্তির জেরে সামাজিক সঞ্চালনশীলতার সুযোগ পেয়ে যায়। জমিদার, বেনিয়া, গোমস্তা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করা এই ভুঁইফোড় শ্রেণি লোকসংস্কৃতিকে অবজ্ঞা করেননি। শোভাবাজারের রাজা নবকৃষ্ণদেবের প্রাসাদ অঙ্গণে একদিকে হরু ঠাকুর ও নিতাই বৈরাগীর কবি লড়াই হচ্ছিল, অন্যদিকে অন্দরের বৈঠকখানাতে উত্তর ভারতীয় বাইজি নাচ ও চলছে।[৭]

এমনকি বিংশ শতকে ঠাকুর বাড়ির যে বিখ্যাত কবি 'নষ্ট পরমায়ু'[৮] কবিগানের সাহিত্যমূল্য নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন তাঁর পূর্বপুরুষ রামলোচন ঠাকুর জোড়াসাঁকোতে তার পৈতৃক বাড়িতে সে যুগে ধ্রুপদিগানের জলসা বসিয়েছেন আবার সমসাময়িক নামজাদা কবিয়ালদের যেমন রাম বসু, হরু ঠাকুরদের ডেকে কবিগানের আসর পরিচালনা করেছেন।[৯] অর্থাৎ অভিজাত শ্রেণির নিয়ন্ত্রিত স্বল্পের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং সাধারণ সংস্কৃতির লোকপরম্পরা মিলে এক

ধরনের বহুমাত্রিক সাংস্কৃতিক পরিসর তৈরি করে। এক্ষেত্রে রুচিগত আপোসের জায়গা ছিল না। যার কারণ হিসেবে বলা যায় উভয়শ্রেণি তাদের অবস্থান সম্পর্কে সচেতন ছিল। জমিদার বাড়িতে বিয়ে বা শ্রাদ্ধ উপলক্ষ্যে কাঙালি ভোজনে নিম্নবর্গের আমন্ত্রণ থাকলেও উচ্চাঙ্গ সংগীতের আসর বা নাটকে তাদের প্রবেশের অধিকার ছিল না।[১০] তবে এই বিভাজন বজায় রাখার একক দায় অবশ্য উচ্চবর্গের অভিজাতদের দেওয়া যায় না; বরঞ্চ নিম্নবর্গের সাংস্কৃতিক রুচির এক সামাজিক এক্তিয়ার এক্ষেত্রে সুরক্ষিত ছিল, যার প্রমাণ পাওয়া যায় নিতাই বৈরাগীর একই আসরে সখী সংবাদ এবং খেউড় গাওয়ার মধ্যে দিয়ে।[১১] দুর্গাপুজোয় যাত্রা বা পাঁচালি গান চলতে পারত, কিন্তু এই বিবিধ গ্রাহিতার স্বীকৃতিতে রুচিগত আপোস কোন পক্ষই করেনি ফলে বিনোদনের অঙ্গ হিসেবে পল্লিগান নাগরিক মনোরঞ্জনের দাবিকে প্রাধান্য দিয়েও সমাজের সব স্তরের চাহিদা মেটাচ্ছিল।

এই শতকের শেষার্ধ থেকে কলকাতার নাগরিক সংস্কৃতিতে শিক্ষিত এবং ইংরেজদের অর্থানুকূল্যে পুষ্ট মধ্যবিত্তের অংশগ্রহণ বাড়তে থাকে। তারা শাস্ত্রীয়সংগীত এবং কথ্য বাংলা ভাষার সংযোগে নতুন ধরনের এক সংগীত ধারা নির্মাণ করে। নাগরিক সংস্কৃতি এই সংগীতকে বৈঠকী সংগীত নামে চিনেছিল। এই সংগীতগুলি অভিজাত শ্রেণির বৈঠকে গাওয়া হতো। উচ্চবিত্তের মনোরঞ্জনের জন্যে মূলত এই গানগুলি তৈরি হয়েছিল। টপ্পা, আখড়াই, হাফ আখড়াই, পক্ষীদলের গান-এগুলি বৈঠকী গান হিসেবে উনিশ শতকের নগর কলকাতায় পরিচিতি পায়। যে নাগরিক সংস্কৃতিতে বিবিধতার আদর ছিল, সেখানে এই নিয়ন্ত্রিত স্বল্পের ঐতিহ্যে বহুত্বের প্রভাব স্বাভাবিক।

সেই হিসেবে প্রশ্ন আসে পাঁচালি, কবিগান, শাক্তগীতি ইত্যাদির প্রভাব এই সংগীতের উপর কতখানি পড়েছিল। সুকুমার রায়ের গবেষণায় উঠে আসা প্রাচীন বাংলা গান বা পুরাতনি গানের সঙ্গে এই টপ্পা, আখড়াই, হাফ আখড়াই গানের সাযুজ্যতার প্রেক্ষিতে বলা যেতে পারে এই সব গানের নির্দিষ্ট প্রকৃতি, উপস্থাপন ভঙ্গিমা ছিল, যেখানে ধ্রুপদের মতো সার্বিক উপস্থাপন ছিল না কিন্তু রাগ এবং রাগিনীর ব্যবহারে শাস্ত্রীয় সংগীতের সঙ্গে তার বিন্যাসগত সদৃশতার জায়গাটি সে ধরে রেখেছিল।[১২] তবে পল্লিগানের সঙ্গে এর যোগসূত্রটি উপেক্ষণীয় নয়। অষ্টাদশ শতকের প্রথমভাগে সৃষ্ট কবিগানের ছটি অঙ্গ হিসাবে লোকসাহিত্যের ছটি বিশেষ ধারা ছিল—সখি সংবাদ, মালসী,তরজা, খেউড়, আখড়াই, বিচিত্র প্রসঙ্গ।[১৩]

এর মধ্যে তরজা, খেউড়, আখড়াই নাগরিক সংস্কৃতিতে নানাভাবে অভিযোজিত হয়। বিশেষত কবিগানের আখড়াই অংশ শহুরে পরিবেশে মার্জিত হয়ে উচ্চবিত্তের সংস্কৃতির অঙ্গ হয়ে ওঠে। 'আখড়াই' ইংরেজি প্রতিশব্দ concert।[১৪] কিন্তু কবিগানের আখড়াই সে অর্থে আধুনিক বাদ্যযন্ত্রে সমবেত অনুষ্ঠান ছিল না। এটা অনেকটা সংকীর্তনের মতো ছিল যেখানে নির্দিষ্ট রাগ তাল ইত্যাদির কোনো গঠনবিন্যাস অনুসৃত হতো না।[১৫] তবে নাগরিক পরিমণ্ডলে শিক্ষিত শ্রেণির হাতে আখড়াই-এর নানাধরনের সংযোজন হয়। প্রথমত কবি গানের আরেকটি অংশ খেউড়ের সঙ্গে ভবানী বিষয়ক সংবাদ যুক্ত করে[১৬] তাকে শিক্ষিতের বিনোদনের পরিসরে আনা হয়। খেতুর কথাটি বিবর্তিত হয়ে খেঁউড় হয়েছে, কখনো এটি খেঁড়ু বা খাড় হিসেবে ব্যবহৃত হতো। কবিগানের খেউড় হিসেবে অশ্লীল রসের গানই বোঝাত।[১৭] অতএব সংশোধিত

আখড়াই এর যে দেশজ উৎস ছিল সেটি অস্বীকার করা যায় না। তবে কলুইচন্দ্র সেনের হাত ধরে আখড়াই গানের বিশেষ পরিবর্তন সম্ভব হয়। এই পরিবর্তন রক্ষণশীল মানসিকতায় অবশ্য 'লোকচর্চার মালিন্য'[১৮]থেকে মুক্তি হিসেবে খ্যাত হয়। আখড়াই গানে শাস্ত্রীয় গানের মতোই স্থায়ী, মেলাপক, অন্তরা[১৯] থাকত। এর পাশাপাশি আধুনিক ইউরোপীয় বাদ্যযন্ত্রের সাজ গ্রহণ করে "বাদ্যযন্ত্রের বাহুল্যবর্জিত" আখড়াই নতুনভাবে আত্মপ্রকাশ করে।[২০] নাগরিক সংস্কৃতিতে এই অভিযোজন যেসব সময় উচ্চবর্গের নিয়ন্ত্রিত মার্জিত রুচির পক্ষেই থিত থাকতে চেয়েছিল তা নয়। হাফ-আখড়াই গানের স্রষ্টা মোহনচাঁদ বসু আখড়াই গানকে দাঁড়াকবিগানের গঠন বিন্যাস দেন; এর ফলে তাঁর গুরু নিধুবাবু অবমূল্যায়নের আক্ষেপ করলেও নাগরিক সংস্কৃতিতে জনপ্রিয়তার সুবাদে এই উদ্ভাবনটি মেনে নেন।[২১]

পল্লি গানের নাগরিক রূপায়ণের একটি ইতিহাস যেমন শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির তথাকথিত সংশোধনের ভূমিকাকে গুরুত্ব দেয়, তেমনি পল্লিগায়কদের ভূমিকাটিও আলোচনার দাবি রাখে। নাগরিক পরিমণ্ডলে টপ্পা গান বিশেষভাবে জনপ্রিয় হয়। এই টপ্পা আদতে পাঞ্জাবি টপ্পা থেকে স্বতন্ত্র ছিল। টপ্পার স্রষ্টা হিসেবে নিধু বাবু[২২], শ্রীধর কথক[২৩], কালীমির্জার[২৪] ইত্যাদি বিভিন্ন ব্যক্তির নাম শোনা যায় তবে এক্ষেত্রে জনপ্রিয় নিধুবাবুর টপ্পা একদিকে শাস্ত্রীয় রাগরাগিনীর বিন্যাসে এবং অপরদিকে কথ্য ভাষার প্রয়োগে স্বতন্ত্র ছিল এবং এই টপ্পায় ধর্মীয় উপাদানের কোনো জায়গাই ছিল না সেই তুলনায় মানুষের প্রেম ভালোবাসা ইত্যাদি মূর্ত হয়েছে।

এই টপ্পা গানের নাগরিক মহলে জনপ্রিয়তা লক্ষ করে কবিগায়করা তুক[২৫] হিসেবে টপ্পা যুক্ত করতে থাকে। গবেষিকা উৎপলা গোস্বামী বলেছেন এই ধরনের টপ্পা আদতে 'গীতাঙ্গ'[২৬] হিসেবে যুক্ত হচ্ছিল। উনিশ শতকের মধ্যভাগে করুণানিধান বিলাস গ্রন্থে সর্বপ্রথম কবিগানের তিনটি তুকের মধ্যে টপ্পাকে রাখা হচ্ছে। আবার গবেষক দীনেশচন্দ্র সিংহ পূর্ববঙ্গের কবিগানের যে বিভিন্ন অঙ্গগুলি দেখিয়েছেন সেখানে টপ্পাকে প্রশ্ন হিসেবে দেখিয়েছেন যার উত্তর দিতে হতো।[২৭] এই বিষয়ে কবিগানের গবেষক প্রফুল্লচন্দ্র পাল বলছেন কবি গানের ঝুমুর অংশ থেকেই টপ্পা এবং ঢপকীর্তনের প্রচলন হয়।[২৮]

সুতরাং এই বিষয়ে কোনও দ্বিমত নেই যে এই সময়ে কবিগানের একটি অঙ্গ হিসেবে টপ্পার প্রচলন হয়েছিল। আবার রমাকান্ত চক্রবর্তী বলছেন, অনাথকৃষ্ণ দেব কবিগানে টপ্পার উল্লেখ করেছেন; যদিও এর ভাষা ছিল অশ্লীল।[২৯] নাগরিক সংস্কৃতিতে পাঁচালি গানেরও রূপান্তর ঘটে। প্রথমে এই গান প্রবন্ধ গানের অন্তর্গত ছিল, কিন্তু কীর্তনের প্রভাবে এখানে হালকা সুর এবং ছোটো ছোটো তাল যুক্ত হয়। অবশ্য এই গানও ধীরে ধীরে তার গ্রাম্যরূপ বর্জন করে। এর সঙ্গে যুক্ত হয় শাস্ত্রীয় রাগ।[৩০] তেমনই নাগরিক রুচি অনুযায়ী সঙের আমদানিও[৩১] করা হয়। এভাবেই এক গান নাগরিক রুচি অনুযায়ী নানাভাবে নিজেকে মার্জিত করছে। মেয়েপাঁচালি[৩২] বলেও এক ধরনের গান ছিল যা অবশ্য শিক্ষিত সমাজে আদৃত হয়নি। লোকসংস্কৃতির অন্যতম অঙ্গ হিসেবে তরজা গান নতুন রূপ পেয়েছিল। দীর্ঘকাল জুড়ে তরজা গান ধর্ম ঠাকুরের উৎসবে প্রচলিত ছিল।

তরজা শব্দের মূল অর্থ "তর্কায়িত সংস্কৃত শব্দ"।[৩৩] যেখানে বাকযুদ্ধ হতো। কবিগানের তরজা এরকমই বাকযুদ্ধ ছিল যেখানে প্রচুর শ্লেষ থাকত। তবে লোকরুচি অনুযায়ী রঘুনাথ

দাস এই গানে অশ্লীলতার উপাদান এনেছিলেন।[৩৪] ফলে উনিশ শতকের কলকাতায় তরজা মানেই গালমন্দ এরকম প্রকরণের প্রবণতা আসে। নাগরিক সংস্কৃতিতে পদাবলী কীর্তন ঢপ কীর্তনের একটি রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ পায়। মধুসূদন কিন্নর বা মধু কানের ঢপ কীর্তনে, শাস্ত্রীয়গীতি রীতির প্রভাব থাকলেও নাগরিক সমাজে পরবর্তীতে মেয়ে কীর্তনীয়ারা ঢপ কীর্তনকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করলে, এই গানের বিরুদ্ধে শিক্ষিত সমাজ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে।[৩৫] সার্বিকভাবে বলা যায় এই নতুন ধরনের আত্মীকরণে পল্লিগান কিছু ক্ষেত্রে প্রাচীন প্রবন্ধ গান এবং নব্য উদ্ভূত বৈঠকী গান উভয়েই সামিল হয়েছিল। সেক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রিত সমাজের সংস্কৃতি বহুত্বকে বরণ করে একধরনের সংকীর্ণতাকেও প্রশ্রয় দেয়। আবার অনিয়ন্ত্রিত বহুজনের সংস্কৃতি স্বল্পের মার্জিত সাংস্কৃতিক চরিত্র গ্রহণ করে এক ধরনের বিশ্বজনীনতার পথ বেছে নেয়। এভাবেই পরস্পর স্বতন্ত্র দুটি সংস্কৃতি নাগরিক গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে চলতে থাকে।

উনিশ শতকের পরিবর্তিত আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে লোকসংস্কৃতির এক অন্যতম অঙ্গ পল্লিগানের নাগরিক রূপায়ণ খুব স্বাভাবিক ছিল। এর অন্যতম কারণটি ছিল নব্য সৃষ্ট শহুরে সংস্কৃতিতে বিত্তশালী সম্প্রদায় কোনো একটি বিশেষ ধরনের ঐতিহ্যের প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখায়নি। যে কারণে বৈঠকী সংগীতের মতো শিক্ষিতের সংস্কৃতি কবিগানের মতো তথাকথিত অশিক্ষিতের সংস্কৃতির মধ্যে পারস্পরিক আদান-প্রদান সম্ভবপর হয়। আরেকটি কারণ ছিল নতুন ধরনের বিবিধতায় সাংস্কৃতিক আপোসের তুলনায় পরস্পর নির্ভরতা সত্ত্বেও স্বতন্ত্রতা নির্মাণের তাগিদ। নতুন সংস্কৃতিতে শিক্ষিত শ্রেণি বা অশিক্ষিত শ্রেণি কেউই রুচিগত আপোস করেননি। ফলে উভয়শ্রেণির সম্মিলনে তৈরি নাগরিক সমাজে টপ্পার মতো বৈঠকী গান কবিগানের গীতাঙ্গ হয়ে লোকরুচি অনুযায়ী বিন্যাস পাচ্ছে, আবার বৈঠকী টপ্পা নিম্নবর্গের মনোরঞ্জনের কোনোরকম চাহিদা পূরণের জায়গাই রাখেনি, তার শ্রোতা ছিল উচ্চশিক্ষিত শ্রেণি।

একইভাবে আখড়াই গান উচ্চবিত্তের যাবতীয় সংশোধন মেনে চিন্তাশীল শ্রেণির বিনোদনের উপকরণ হলেও তারই একটি সংস্করণ হাফ আখড়াই দাঁড়াকবিগানের বিন্যাস গ্রহণ করছে। এই পরিবর্তনের কারিগর শিক্ষিত অশিক্ষিত গায়কের দল নাগরিক সংস্কৃতিতে নিজস্ব পরিচিতির জায়গাও তৈরি করছেন। কাজেই পল্লিগানের নাগরিক রূপায়ণে এই যুক্তি কম বেশি কার্যকর হতেই পারত। আখড়াই গানে কলুইচন্দ্র সেন, হাফ আখড়াই-এ মোহন চাঁদ বসু, রঘুনাথ দাস এবং লকে কানার নাম পাঁচালি গানের জগতে বিশেষ জনপ্রিয়তা পাচ্ছে। নাগরিক রূপায়ণের সুদূরপ্রসারী প্রভাব ব্রাহ্মসংগীত রচয়িতাদের সাংগীতিক নির্মাণে ছাপ ফেলছে। সাংস্কৃতিক বহুমাত্রিকতাকে স্বীকৃতি দিয়ে তথাকথিত "দেশি কৃষাণগীতির"[৩৬] সারিতে আরোপ করা সত্ত্বেও টপ্পা, ভাটিয়ালি, সারি গানের নাগরিক জনপ্রিয়তার উপাদান এই নির্মাতারা তাদের সংগীতে ব্যবহার করছেন।

তথ্যের সন্ধানে ও টীকা

১. সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় : 'উনিশ শতকের কলকাতা ও সরস্বতীর ইতর সন্তান', অনুষ্টুপ, কলকাতা, ২০০৮, পৃ. ১৭

২. Gananath Obeyesekere : 'The Great Tradition and the Little in the Perspective of Sinhalese Buddhism', The Journal of Asian Studies, Vol. 22, Issue 2, 1963, p. 139

৩. তদেব : পৃ. ১৩৯

৪. Narendra Krishna Sinha (ed) : 'The History of Bengal' (1757-1905), University of Calcutta, Calcutta, 1967, p. 542

৫. কবিগান বাংলার বিশিষ্ট সম্পদ এবং সংস্কৃত দীপ্ত কাব্যের পর্যায়ভুক্ত বলা চলে। বিশেষভাবে দীপ্তকাব্যের অগভীর বিষয়বস্তু এবং বাঁকা উক্তি এই কবিগানে লক্ষ করা যায়। আবার কবিগানের গঠনবিন্যাস অনেকটাই লোকসংগীতের বড়ো গানের মতো। কারণ এই গান লোকসংগীতের বড়ো গানের মতো খাতায় লেখা অবস্থায় পাওয়া গেছে এবং এখানেও বড় গাইবার দল থাকত, সেখানে একাধিক গাইয়ে বাজিয়ের দল থাকত। (দেখুন, ডক্টর শ্রী প্রফুল্লচন্দ্র পাল, প্রাচীন কবিওয়ালার গান, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, ১৯৯৪; অনিমেষকান্তি পাল, লোকসংস্কৃতি, প্রজ্ঞা বিকাশ, কলকাতা, ১৯৯৬)

৬. Prem Lata Sharma (Ed) : 'Brhaddesi of Sri Matanga Muni' in Kapila Vatsayan (ed), 'KALAMULASASTRA SERIES' (8), Indira Gandhi National Centre for the Arts, New Delhi, 1992, p. 5

৭. সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় : প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯

৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : 'লোকসাহিত্য', রবীন্দ্র রচনাবলী, তৃতীয় খণ্ড, বিশ্বভারতী, (সুলভ সংস্করণ), কলকাতা, ১৩৯৩ (বঙ্গাব্দ), পৃ. ৭৯৩

৯. সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯

১০. তদেব : পৃ. ২৪

১১. তদেব : পৃ. ২৭

১২. Sukumar Ray : 'Music of Eastern India' Vocal music in Bengali, Oriya, Assamese and Manipuri with Special Emphasis on Bengali, Firma K.L.M Private Limited, Calcutta, 1973, p. 65

১৩. ডক্টর শ্রী প্রফুল্লচন্দ্র পাল : 'প্রাচীন কবিওয়ালার গান', কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, ১৯৯৪, পৃ. ১৩

১৪. তদেব : পৃ. ৪৪

১৫. তদেব : পৃ. ৪৭

১৬. শ্রী ভবতোষ দত্ত সম্পাদিত : 'ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত রচিত কবিজীবনী', ক্যালকাটা বুক হাউস, কলকাতা, পৃ. ২৯

১৭. ডক্টর শ্রী প্রফুল্লচন্দ্র পাল : প্রাগুক্ত, পৃ.৪১

১৮. শ্রী ভবতোষ দত্ত সম্পাদিত : প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০

১৯. উৎপলা গোস্বামী : 'কলকাতায় সংগীতচর্চা', পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সংগীত আকাদেমি, কলকাতা, ১৯৯১, পৃ. ৫৮

২০. শ্রী প্রফুল্ল চন্দ্র পাল : প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭-৪৮

২১. উৎপলা গোস্বামী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০
২২. রমাকান্ত চক্রবর্তী সম্পাদিত : 'বিস্মৃত দর্পণ : নিধু বাবু/বাবু বাংলা/"গীতরত্ন", সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা, পৃ. ৭৩
২৩. তদেব : পৃ. ৭৩
২৪. তদেব : পৃ. ৭৫
২৫. তুক কীর্তনের একটি অঙ্গ। নির্দিষ্ট পদ গাইবার সময় ছন্দ নিয়ে ও অনুপ্রাস সহযোগে এই তুক গাইতে হত। অষ্টাদশ শতকের কবি গানে তিনটি তুক ব্যবহার করা হতো। এগুলি ছিল—ধুয়া, চিতেন এবং টপ্পা। (দেখুন, ড. উৎপলা গোস্বামী, কলকাতায় সংগীতচর্চা, রাজ্য সংগীত আকাদেমি, কলকাতা, ১৯৯১, পৃ. ৩৯, ৬০)
২৬. তদেব : পৃ. ৬০
২৭. ড. দীনেশচন্দ্র সিংহ : 'পূর্ববঙ্গের কবিগান সংগ্রহ ও পর্যালোচনা', কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, ১৯৯৭, পৃ. ন
২৮. শ্রী প্রফুল্লচন্দ্র পাল : তদেব, পৃ. ৬৭
২৯. রমাকান্ত চক্রবর্তী সম্পাদিত : প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮
৩০. উৎপলা গোস্বামী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২
৩১. সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় : প্রাগুক্ত, পৃ. ২২
৩২. ড. উৎপলা গোস্বামী : প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩
৩৩. শ্রী প্রফুল্ল চন্দ্র পাল : প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫
৩৪. তদেব : পৃ. ২৮
৩৫. ড. উৎপলা গোস্বামী : প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪
৩৬. বাণী দেবী : প্রাচ্য সংগীতের বাণী : প্রত্যুষকুমার রীত সম্পাদিত, ঠাকুর বাড়ির পত্রিকায় সঙ্গীতচর্চা : প্রসঙ্গ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, পত্রলেখা, কলকাতা, ২০১২, পৃ. ১০৭

মুর্শিদাবাদের অনালোচিত পুজো-গীতি : বসন বুড়ির গান

টুকটুকি হালদার

'বসন বুড়ির গান'-এর 'বসন' শব্দটি 'বস্' ধাতু থেকে জাত। 'বস্' ধাতুর সঙ্গে করণ বাচ্যে 'অনট্' যোগ করলে 'বসন' শব্দ পাওয়া যায়, যার অর্থ বস্ত্র, কাপড়, পরিধেয় প্রভৃতি। আবার, 'বস্' ধাতুর সাথে ভাববাচ্যে 'অনট্' যোগ করলে উৎপন্ন হয় 'বসন' শব্দ, যার অর্থ দাঁড়ায় বাস, বাসস্থান, আচ্ছাদন প্রভৃতি। অন্যভাবে, 'বস্' ধাতুর সাথে অধিকরণবাচ্যে 'অন্ত' যোগ করলে উৎপন্ন হয় 'বসন্ত' শব্দ। এই বসন্ত শব্দের অর্থ 'ঋতু' বিশেষ 'বসন্ত ঋতু'; যা শীতের পরে আসে, ফাল্গুন ও চৈত্র মাস মিলিয়ে হয় বসন্ত ঋতু বা বসন্তকাল। এই বসন্তকালের সঙ্গে সংযুক্ত রয়েছে গুটি বসন্ত। তাহলে 'বসন' শব্দের একাধিক অর্থ আছে। বস্ত্র, কাপড়, পরিধেয় কিংবা বাস, বাসস্থান, আচ্ছাদন কিংবা অতিসার রোগ, সংক্রামক রোগ বসন্ত, গুটিবসন্ত, মসরিকা। এর কোনোটিই 'বসন বুড়ির গান'-এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। 'বসন বুড়ির গান'-এর 'বসন' শব্দের অর্থ—বসা অবস্থা, নিয়ত বাস, বসবাস অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

বসন বুড়ির পূজার্চনার মূল হোতা মহিলারা—কুমারী ও বিবাহিতা মহিলারা। বিবাহিত মহিলারা বিবাহিত জীবন দীর্ঘস্থায়ী তথা আমৃত্যুকরণের উদ্দেশ্যে এবং কুমারী মেয়েরা ভালো সংসার, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য পাওয়ার আশায় এই পুজো করে। এটি একটি লৌকিক পুজো, পৌরাণিক পুজো নয়। দেবতার কোনো অধিষ্ঠানে এই পুজো হয় না। কল্পিত দেবীর মূর্তিহীন পুজো বসন বুড়ির পুজো। কল্পিত দেবী 'দুর্গা' যিনি পরমাপ্রকৃতি বা বিশ্বের আদি কারণ। ভাগবত ও বিষ্ণুপুরাণ মতে, সতী মহাদেব জায়া ও দক্ষকন্যা। দক্ষযজ্ঞে সতী প্রাণ ত্যাগ করেন এবং দ্বিতীয়বার হিমালয়-পত্নী মেনকার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর শতাধিক নাম ও রূপ। সতীর সকল রূপের মধ্যে একটি রূপ হলো 'বসন্ত' বা 'বাসন্তী' আর এই অর্থেই বসবাস বা নিয়তবাস। নিয়ত বসবাসের উদ্দেশ্যেই এই বসন বুড়ির পুজো। বলাবাহুল্য, দুর্গার চিরাচরিত পুজোর সময় শারদ-বহির্ভূত আরেক পুজো বসন্তকালে অনুষ্ঠিত হয়, যা বাসন্তী পুজো নামে খ্যাত। বাসন্তী পুজো ও তার গান মুর্শিদাবাদ জেলায় 'বসন বুড়ির গান' নামে পরিচিতি পেয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গীয় বাঙালি হিন্দু মহিলাদেরকে এই পূজার্চনা করতে দেখা যায় না। একমাত্র বিহার ও উত্তরপ্রদেশ থেকে বঙ্গদেশে আগত এবং মুর্শিদাবাদ জেলায় স্থায়ীভাবে বসবাস করা চাঁইমণ্ডল ও গুঁড়িমণ্ডল জনজাতির মহিলারা এই পুজো করে থাকে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের লোক এসেছে মুর্শিদাবাদ জেলার মধ্যে। তাদের আগমন হয়েছে নবাব বাদশাহদিগের হাত ধরে। তারা ছিল উচ্চশ্রেণির হিন্দু। তারা মুর্শিদাবাদ জেলার অভ্যন্তরে এসেছে এবং রাজকীয় সাহচর্যে ভূস্বামীতে পরিণত হয়েছে। মুর্শিদকুলি খাঁ ও তৎপরবর্তী কালে মুর্শিদাবাদের নবাব সরকারের সমরবাহিনী আসে বিহার ও উত্তরপ্রদেশ থেকে। সমরবাহিনীর লোকেরা ছিল

মূলত আদিম জনজাতি চাঁই সম্প্রদায়। তাদের পদবি 'মণ্ডল'। চাঁই সমাজ দুই ভাগে বিভক্ত, যথা—১. চাঁইমণ্ডল ও ২. গুঁড়িমণ্ডল। মোটামুটি ৬০ বছরের মধ্যে শেষ হয়ে যায় নবাবী জামানা। শাসন চলে যায় ব্রিটিশ কোম্পানির হাতে। ভেঙে যায় দেশিয় সামরিক বাহিনী। কর্মহীন হয়ে পড়ে তারা। বাঁচার তাগিদে গোচারণ, কৃষিকাজ, চাষবাস ও মাছ ধরার কাজ বেছে নেয় তারা। চাঁইমণ্ডলদের আদি পেশা গোচারণ ও চাষবাস এবং গুঁড়িমণ্ডলদের আদি পেশা মাছ ধরা। বেছে নেয় তারা গঙ্গা-পদ্মা ও ভাগীরথীর মতো বড়ো নদীর ধার এলাকা। মুর্শিদাবাদ বাগড়ির মধ্যে জলঙ্গী থেকে জঙ্গিপুর থানা এলাকা এবং জঙ্গিপুর থেকে বহরমপুর থানা এলাকা পর্যন্ত নদীর ধারে তারা বসতি করে। এরাই 'চাঁই' নামে পরিচিত। চাঁইমণ্ডল ও গুঁড়িমণ্ডল পরিবারের মহিলারাই করে বসন বুড়ির পূজার্চনা। সুতরাং বসন বুড়ির পূজা-গান বিহার ও উত্তরপ্রদেশ থেকে আসা জনজাতির। মুর্শিদাবাদ জেলার মধ্যে সীমাবদ্ধ আছে এই বসন বুড়ির গান। চাঁইদের সঙ্ঘবদ্ধ বসবাস জনিত বর্তমান গ্রাম নিম্নরূপ—

জলঙ্গী থানা : বাসুদেবপুর চাঁইপাড়া, দয়ারামপুর, সূর্যনগর কলোনী, নওদাপাড়া, গোদাগাড়ী, চকচৈতন, ২০ নং শিরোচর, সাহেবনগর, ২০ নং সাহেবনগর, জয়পুর প্রভৃতি।

রানিনগর থানা : শিরোচর, খয়েরতলা, পোল্লাগাড়ি ভাঙ্গা মন্দির, নতুন বামনাবাদ, পোল্লাগাড়ি বারোবিঘা, চরমুনশীপাড়া, চররাজাপুর ভাটপাড়া, চর রাজাপুর, চর রাজানগর, চর রাজাপুর পশ্চিম কলোনি, চর সরন্দাজপুর, মালীপাড়া, লক্ষীনারায়ণপুর, বর্ডারপাড়া, দুর্গাপুর, মহাদেবপুর ও উত্তর চর মাঝাড়দিয়াড় প্রভৃতি।

ইসলামপুর থানা : শিবকৃষ্ণপুর, ঘুঘুপাড়া, চাতরা, গোরাইপুর, দৌলতপুর, চর দৌলতপুর, জয়মনিপাড়া, দামোসের ধার, একান্ন বিঘা, শিবনগর, উঁচু শালবোনা, নিচু শালবোনা প্রভৃতি।

মুর্শিদাবাদ থানা : ডাহাপাড়া চাঁইপাড়া, খোশবাগ চাঁইপাড়া, চাঁইপাড়া, সন্ন্যাসীডাঙ্গা, আমানিগঞ্জ, কুর্মিটোলা চাঁইপাড়া, শশীধরপুর চাঁইপাড়া, চর চাতরা, চুনাখালি মুক্তিনগর, চুনাখালী নিষৎবাগ প্রভৃতি।

জিয়াগঞ্জ থানা : দেবীপুর চাঁইপাড়া, চাঁইপাড়া (জে. এল. নং ১৭), বাগডহর চাঁইপাড়া, আমাইপাড়া চাঁইপাড়া, বড়নগর, মুকুন্দবাগ প্রভৃতি।

ভগবানগোলা থানা : চাঁইপাড়া (জে.এল. নং ২৩), নশীপুর চাঁইপাড়া, বাবুপুর, নির্মলচর, ডিহি ডুমুরিয়া, খামার দিয়াড়, কান্তনগর মৌজার দেবীপুর চাঁইপাড়া, উপর ওড়াহার মৌজার ওড়াহার চাঁইপাড়া, নীচু ওড়াহার চাঁইপাড়া প্রভৃতি।

রানিতলা থানা : মালিপুর মৌজার করিমপুর চাঁইমণ্ডলপাড়া, নসিপুর মৌজার বদলমাটি চাঁইপাড়া, খাগজানা মৌজার জাজিয়া গ্রামের ১. গিরি মণ্ডলের পাড়া ও ২. সতীশ মণ্ডলের পাড়া নামে চাঁইপাড়া, তোপীডাঙ্গা চাঁইপাড়া, ফরিদপুর মৌজার সানকিডাঙ্গা গ্রামের ১. পটল মণ্ডল পাড়া ও ২. যতীন মণ্ডল পাড়া নামে চাঁইপাড়া, ভাণ্ডারা চাঁইপাড়া প্রভৃতি।

লালগোলা থানা : ঝামরা নয়াগ্রাম মৌজার নতুনদিয়ার চাঁইপাড়া, পানিশালী চাঁইপাড়া, নদাইপুর মৌজার বিরামপুর চাঁইপাড়া, কৃষ্ণপুর মৌজার চাঁইপাড়া, কাতর্কিপুর মৌজার বিশ্বনাথপুর চাঁইপাড়া, বাঁশগড়া মৌজার বাঁশগড়া চাঁইপাড়া, ব্রহ্মোত্তর মানিকপুর মৌজার মানিকচক চাঁইমোড়লপাড়া, রাধাকান্তপুর চাঁইপাড়া প্রভৃতি।

জঙ্গীপুর থানা : ধনপত নগর, গিরিয়া মৌজার লবণচোয়া চাঁইমোড়লপাড়া, তেঘরি চাঁইমণ্ডলপাড়া, কৃষ্ণসাইল চাঁইপাড়া প্রভৃতি।

উপরের গ্রাম ও পাড়াগুলিতে চাঁইসমাজের সঙ্ঘবদ্ধ বাস। ফলে, তাদের আচার-আচরণ, খাদ্যাভ্যাস-জীবনযাপন, ধর্ম-কর্ম, কৃষ্টি-সংস্কৃতির প্রভাব সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে প্রতিফলিত হওয়া অবশ্যম্ভাবী। মুর্শিদাবাদ জেলার লোকসংস্কৃতি ও লোকগানের ইতিহাসে চাঁইসমাজের বসন্ত পুজো ও বসন বুড়ির গানের অন্যমাত্রা আছে। ওই সংস্কৃতি ও লোকগান বাদ দিলে অসম্পূর্ণ মুর্শিদাবাদ জেলার জনমানসের তথা লোকজীবনের ইতিহাস। তাই মুর্শিদাবাদ জেলার লোকসংস্কৃতির ইতিহাসে চাঁই ও গুঁড়ি সমাজের মহিলা নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত বাসন্তী উৎসব, বসন বুড়ির পুজো ও গান এক অনন্য মাত্রার দাবিদার ও অধিকারী।

দেবী দুর্গার পুজো শরৎকালে আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষে হয়, যা শারদোৎসব বা দেবীর অকালবোধন নামে পরিচিত। আর বসন্তকালের চৈত্র মাসে দেবী দুর্গার বোধন বাসন্তী পুজো নামে পরিচিত। শারদকালীন দুর্গাপুজোয় কল্পারম্ভে সিঁদুর, পঞ্চবর্ণেরগুঁড়ি, পঞ্চপল্লব, পঞ্চরত্ন, পঞ্চশষ্য, পঞ্চগব্য, ঘট ও কুণ্ডহাঁড়ি, দর্পণ, তেকাঠা, তীর, একসরা আতপ তণ্ডুল, সশীষ ডাব, ঘটাচ্ছাদন, গামছা, বিল্বৃবধুতি, কল্পারম্ভশাটী, চণ্ডীর শাটী, তিল, হরিতকী, পুষ্পাদি, চন্দনমাল্য, দধি, মধু, ঘৃত, চিনি, বড় নৈবেদ্য, কুচা নৈবেদ্য, আসানাঙ্গুরীয়ক, মধুপর্কবাটী, ভোগের দ্রব্যাদি, আরতির দ্রব্যাদির প্রয়োজন। এইভাবে দুর্গাপুজোর সময়কালে আমন্ত্রণ, অধিবাস, সপ্তমী, মহাস্নান, অষ্টমী, নবমী, বিজয়া দশমী অনুষ্ঠান হয় এবং প্রত্যেকদিন নতুন নতুন উপাচার লাগে। কিন্তু বাসন্তী পুজো তথা চাঁইমণ্ডলের বসন বুড়ির পুজো প্রথমদিন থেকে শেষদিন পর্যন্ত তেমন কোন তৈজসতণ্ডুল প্রয়োজন হয় না। চাঁইসমাজের মহিলারা যারা দেবী দুর্গার বাসন্তী পুজো করে তারা কোনও মূর্তি ব্যবহার করে না। তাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য দেবী দুর্গার অনুগ্রহ প্রাপ্তি কিন্তু কোনও বিগ্রহকে সামনে রেখে নয়। চাঁই মহিলারা বাংলা সনের চৈত্র মাসের প্রথম দিন থেকে বসন বুড়ির পুজো শুরু করে এবং যা শেষ হয় চৈত্র সংক্রান্তিতে। একমাসব্যাপী পুজোর অধিবাস হয় ফাল্গুন মাসের সংক্রান্তির দিন সন্ধ্যাবেলায়। মাসব্যাপী প্রত্যেকদিন ভর সাঁঝে হয় পুজো। পুজোর উপকরণ হিসেবে প্রয়োজন পড়ে একটি কলাগাছ, আলতা, সিঁদুর, তেল, হলুদ, একটি পয়সা, কড়ি, আলপনা, কাজল আর পূজার শুরু ও শেষের দিন প্রয়োজন হয় সাধ্যমত ফলমূল। ফাল্গুন মাসের সংক্রান্তির দিন অধিবাসে মূর্তিহীন দুর্গাদেবীর ঘট স্থাপিত হয় কোনো বড়গাছের তলায় কিংবা গ্রামের কোনো বাড়ির উঠানে। পোঁতা হয় একটি কলাগাছ। কলাগাছ পোঁতা হয় চৌকো আকারে। কলাগাছের গোড়াতে তেল-সিঁদুর-হলুদ মাখিয়ে তার সাথে একটি পয়সা, কড়ি, আলতা, কাজলসহ কলাগাছটি পোঁতা হয়। এই কলাগাছ ঘিরে গোল করে বেদী বাঁধা হয়। বেদী ঘিরে এক-একটা পূজারীর এক-একটা থান তৈরি করা হয়। চৈত্র মাসের প্রথম দিন থেকে প্রত্যেকে নিজ নিজ থানে প্রতিদিন ধূপ-মোমবাতিসহ প্রদীপ জ্বালিয়ে বসন রাইয়ের উদ্দেশ্যে গানের

মাধ্যমে পূজা করে মহিলারা। বেদীর বাইরে দিয়ে ৭, ৯, ১১ আসন তৈরি হয় পূজারী অনুযায়ী। স্বভাবতই একই গ্রামে একাধিক পুজো হতে পারে। কারণ পূজারীর সংখ্যা ৭, ৯, ১১-এর বেশি হওয়ার কথা নয়; তবে বর্তমানে একটা বেদীকে ঘিরে অনেক মহিলারাই পুজো করে। বেদীতে প্রথম যে ফুল দেয় তার পরিচয় 'ভূষণ ঝুটি'। ঝুটি ফুল দিতে দিতে গান করবে, সহ পূজারিণীগণ সে গানের সাথে গলা মিলাবে। এইভাবে পূজারিণীগণের সকলের ফুলচন্দন দেওয়া হলে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম জানিয়ে ছিটিয়ে দেবে গঙ্গাজল। চৈত্র সংক্রান্তির দিন পর্যন্ত চলবে এই আচার-অনুষ্ঠান। শেষদিন বসন বুড়ির পুজোর জাঁকজমক ও আড়ম্বরের জন্য প্রত্যেক মহিলা নিজ নিজ বাড়ি থেকে সাধ্যমত লুচি, পায়েস, মিষ্টি, ফল, বাতাসা এনে পুজোর থানে দেবে এবং সারা রাত্রি গ্রামের সকল মহিলারা মিলে গান-পুজোর পর একসঙ্গে সেই দিন আহার করবে এবং শেষে বসন বুড়িকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম জানিয়ে পুজো সমাপ্ত করবে। বসন বুড়ির পূজার শুরু হয় প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে। পূজারিণী মহিলারা সবাই একটা করে প্রদীপ জ্বালাবে এবং বেদীতে প্রদীপ বসানোর সময় সমস্বরে বন্দনার সংগীত গাইবে। বন্দনা সংগীত—

> সন্ধ্যা লাগালাম জুড়ালাম বাতি, জুড়ালাম বাতি.../বসন রাইয়ের মুখে দেখি কাঁচা ফুলের ঝুটি।/রাম রাজা হাসে রে, কৃষ্ণ রাজা হাসে রে/এত বড়ো পূজা করি শিবকৃষ্ণপুরের নগরা।/সন্ধ্যা লাগালাম জুড়ালাম বাতি, জুড়ালাম বাতি.../বসন রাইয়ের মুখে দেখি কাঁচা ফুলের ঝুটি।/আমরা কিবা জানি হে, বসন ঠ্যাকরান আসিবে/হে বসন ঠ্যাকরান আসিবে।/আমরা যদি জানতাম, আগে যদি জানতাম/তো ফুলের যোগান দিতাম হে, ফুলের যোগান দিতাম।...

একমাসব্যাপী যেসব গান মহিলারা গায়, সেইসব গান এক একদিন এক একটি করে গাওয়া হয় বা অনেক সময় সব গান গেয়ে ওঠা সম্ভব হয় না। কিন্তু প্রতিদিন প্রদীপ ধরিয়ে উক্ত গানটি না গাইলে পুজো শুরুই হবে না। উক্ত গানটি গাইতে গাইতে তারা নিজ নিজ বেদীতে নিজ নিজ প্রদীপ স্থাপন করে। তারপর বসন বুড়ির চিহ্নস্বরূপ যে কলাগাছ, সেটিকে নিয়ে গান গায়। গানটি হলো—"উঁচা উঁচা কলার গাছ/রসবতী গোড়ান কা.../রসবতী গোড়ান কা।/গড়িয়া দেরে মা.../বসন রাইয়ের সেঁথির সেঁদুর/সেঁদুর না আনিয়া.../দিলাম মায়ের হাতে, /দিলাম মায়ের হাতে।/ও বসন রাইয়ের মেলেনী পূজা হে।" পূজারিনী মহিলারা বসন বুড়ির সামনে দুধ অর্পণ করে নিজের ক্ষেদ প্রকাশ করে। ক্ষেদ প্রকাশের গান—

> কোপটা ভরে দুধর মেলান/কোপটা ভরে দুধর মেলান/মায়ের আগে থুয়ে.../ঝাপো খেলবার ম্যালান সাগরে নামিয়ে।/উজল পিত্তির মেসের ঘাট/রসের খেলা গড়ন কোর.../কি রসের খেলা গড়ন কোর।/গড়িয়ে দে রে আমার.../বসন রাইয়ের পায়ের আলতা/আমরা নারী অভাগিনী.../আমরা নারী অভাগিনী/চললাম বাপের দেশে।

পায়ের আলতা ও সিঁথিতে সিঁদুর দেওয়ার গান—

> খোরকা মুঠা খোরকা মুঠা,/চোরে ডিঙা যায়.../চোরে ডিঙা যায়।/যোতদূরে যায় রে ডিঙা,/তোতদূরে পায়।/বসন রাইয়ের পায়ের আলতা/পায়ে মুরা যায়।/বসন রাইয়ে বাড়ি,/পাথর হলো পুঁজি.../কি পাথর হলো পুঁজি।/ঘর থেকে বেড়াইলো রানি/সিথি ক্যানে খালি।/সিথি ভরা সেদুর দেবো/ঝিরঝির কোরে জ্বলে.../ঝিরঝির কোরে জ্বলে।/ও ভাগনি কদমতলায়,/দিনে দিনে বারে।

ফুল দিয়ে পুজো করার গান—

> ডাল ভাঙ্গো না... ডাল ভাঙ্গো না,/ডালে উঠে যাবো... ডালে উঠে যাবো।/সুনারো সাজি

লিয়ে... ফুল ভাঙ্গাতে যাবো,/সুনারো সাজি লিয়ে...ফুল ভাঙ্গাতে যাবো।/এক সাজি ফুলের দাম.../দুই সাজি কুড়ি... দুই সাজি কুড়ি।/স্যাই ফুল যাবে রে... কার কার বাড়ি,/স্যাই ফুল যাবে রে... মদন সাউয়ের বাড়ি।/মদন সাউ উঠে বলে, হাতে নাইরে কুড়ি.../কি হাতে নাইরে কড়ি।/ওর মাগ ছেলেকে বাঁধা থুয়ে, দাও ফুলের কুঁড়ি.../কি দাও ফুলের কুঁড়ি।/মাগ নাই রে... ছেলে নাই রে,/কাকে থুবো বাধা... কাকে থুবো বাধা।/ছবিকে বাধা থুয়ে ওর... দাও ফুলের কুঁড়ি.../কি দাও ফুলের কুঁড়ি।

বসন রাইকে আলতা, সিঁদুর ও শাড়ি পরানোর গান—

বসন রাইকে আলতা পড়াইতে.../আলতা পড়াইতে।/গা ঘামিলো... গা ঘামিলো।/ঐ রি রানির মা বাতাস করো,/ঐ রি রানির মা বাতাস করো।/বসন রাইকে সেদুর পড়াইতে.../সেদুর পড়াইতে।/গা ঘামিলো... গা ঘামিলো।/ঐ রি রানির মা বাতাস করো,/ঐ রি রানির মা বাতাস করো।/বসন রাইকে সাড়ি পড়াইতে.../সাড়ি পড়াইতে।/গা ঘামিলো... গা ঘামিলো।/ঐ রি রানির মা বাতাস করো,/ঐ রি রানির মা বাতাস করো।

বসন রাইয়ের নৈবেদ্যের গান—

রাই সাক... মোটরের সাক,/সাক তুলভো... থাকের থাক।/রাই সাক... মোটরের সাক,/সাক তুলভো... থাকের থাক।/সাক তুলে দিভো... বসন রাইয়ের পূজাতে,/চোলেরে খলিফার খেলাতে।/খলিয়া বড়ই রসিয়া.../তোর কোমর বাঁধব কষিয়া,/খলিয়া বড়ই রসিয়া.../তোর কোমর বাঁধব কষিয়া।/জাত মেরে লিলো খলিয়ার খেলাতে,/চোলোরে খলিফার খেলাতে।/একটি মোটরের... দুটি সাক/তাতে দিলাম আতপ চাল।/রেনে বেড়ে দিলাম.../ বসন রাইয়ের পাতাতে,/চোলোরে খলিফার খেলাতে।/সাক তুলতে নেমেছি.../মুড়োল নানাকে বলেছি, /সাক তুলতে নেমেছি.../মুড়োল নানাকে বলেছি।/রেনে বেড়ে দিলাম... বসন রাইয়ের পাতাতে/চোলোরে খলিফার খেলাতে।

বসন বুড়ির বিয়ের গান—

বালুচোরে থাকো জামাই,/বাজায়ো বাশরি হে.../স্যাই বাশরির শব্দ শুনে,/কনা লুকায় বাবার কোলে।/আরো কি লুকাইতে পারো.../দশের দেওয়া বিটি রে.../লাল লাল কুসরের বনে/খেলিছে সুন্দরী হে.../বালুচোরে থাকো জামাই,/বাজায়ো বাশরি হে.../স্যাই বাশরির শব্দ শুনে,/কন্যা লুকায় বাবার কোলে।/আরো কি লুকাইতে পারো.../দশের দেওয়া বিটি রে...

বসন বুড়ির বিদায়ের গান—

কেমনে তুলিয়া দিবো,/বসন রাইকে লৈকার উপর.../কি লৈকার উপর।/লৈকাতে সাজালছি ডিঙা,/ঠাঁই নাই রে মোর.../কি ঠাঁই নাই রে মোর।/কেমনে তুলিয়া দিবো,/বসন রাইকে লৈকার উপর.../কি লৈকার উপর।/চান সুদাগর.../কি চান সুদাগর।/কেমনে তুলিয়া দিবো,/বসন রাইকে লৈকার উপর.../কি লৈকার উপর।

বসন বুড়ির গানের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে এইটুকুই বলা যায় মুর্শিদাবাদ জেলায় চাঁই জনসংখ্যা নিতান্ত কম নয়। তাদের বসতি হয় গ্রামভিত্তিক না হয় পাড়াভিত্তিক। কোনো কোনো গ্রামে দু-এক ঘর আছে তাদের কথা বাদ দিলেও গ্রাম বা পাড়াভিত্তিক বসবাসকারী চাঁইদের সমাজকাঠামো খুব শক্ত। তাদের অভাব অভিযোগ থাকতে পারে, দারিদ্র্যের পীড়ন থাকতে পারে, কিন্তু ভিক্ষাবৃত্তি নেই। তারা কাজ করে। কাজ করতে ভালোবাসে। কাজ করতে ভালো লাগে বলেই ভিক্ষাবৃত্তি স্থান পায়নি তাদের সমাজে। দেবী দুর্গার কাছে নিয়ত বসবাসের

আশীর্বাদ প্রার্থনা করে বলেই তাদের পরিবারের বৃদ্ধ-বৃদ্ধাকে অনাচার সহ্য করতে হয় না। যেতে হয় না বৃদ্ধাশ্রমে। দেবী দুর্গাও আশীর্বাদ দেন প্রাণ উজাড় করে। এই আশীর্বাদ চিরন্তনী। যতদিন বিশ্বাস ও ভক্তি থাকবে, থাকবে দেবশক্তিতে আস্থা ও পরিবারের প্রতি দায়বদ্ধতা, ততদিন বসন বুড়ির গান মুছে যাবে না।

চাঁই মহিলাদের দুর্গার প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা, বিশ্বাস ও ভালোবাসা অত্যন্ত প্রগাঢ়। তাই তারা লেখাপড়া না জানলেও বসন রাইয়ের গান রচনা করতে পারে, যা অন্য কোনো জাতি বা সম্প্রদায় পারে না। তাদের রচিত গানে ছন্দ বা অন্ত্যমিল না থাকতে পারে কিন্তু দেবী ভগবতীর উপর অগাধ বিশ্বাস, শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা প্রকাশ পায় সেই গানে। প্রকাশ করে ভাবগম্ভীর অনুভূতির। এইখানেই চাঁইসমাজের বিশেষত্ব, চাঁই মহিলাদের প্রজ্ঞা।

যতদিন যাচ্ছে মানুষ শিক্ষিত হচ্ছে, জ্ঞানের পরিধি বাড়ছে কিন্তু ততই ঠুনকো হচ্ছে ধর্মীয় বিশ্বাস। ধর্মের ক্রিয়া-কলাপে রঙের পারদ চড়ছে, লঘু হচ্ছে বিশ্বাস। পলে পলে বেড়ে চলেছে সামাজিক ও সমাজ কাঠামোয় বৈচিত্র্য। কিন্তু চাঁইসমাজের সমাজ কাঠামোতে উন্নতির ছোঁয়া লাগলেও বিশ্বাসের কাঠামোয় আঘাত করতে পারেনি। চাঁই সমাজ কাঠামো বিশ্বাস, ভক্তি ও শৃঙ্খলায় অটুট। নববধূ বি.এ. এম.এ. যাই পাশ করুক, চৈত্র মাসে তাকে নিয়ত স্থিতি কামনায় দুর্গার বাসন্তী পুজো করতেই হবে—বসন বুড়ির গান গাইতেই হবে। বাঁধতেই হবে নিজের কথা নিজের গান। গানের সূত্র ও শিল্পীর আলোচনায় একথা জোর দিয়ে বলা যায়।

বাঙালি হিন্দুদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব দুর্গাপুজো। বিহার থেকে আগত চাঁই হিন্দুদেরও ধর্মীয় প্রধান উৎসব দুর্গাপুজো। তিন শতাধিক কাল বঙ্গভূমে নিয়ত থাকা বা বাংলা সমাজ কাঠামোয় পুরোদস্তুর অভ্যস্ত হওয়ার কারণে এই উৎসবে পুরুষের কোনো ভূমিকা নেই। প্রতীয়মান হয় যে, বাসন্তী পুজোর মাধ্যমে নিয়ত স্থিতির আশীর্বাদ প্রার্থনা করা সামাজিক দায়বদ্ধতা, সহনশীলতা, সৌভ্রাতৃত্ব রক্ষার অঙ্গীকার। বসন বুড়ির গান তার রক্ষাকবচ। কিন্তু তাদের সামাজিক কাঠামোয় দাঁড়িয়ে তারা মনে করে বসন বুড়ির গান তাদের প্রাণের উৎসব—সম্মানের উৎসব—শ্রেষ্ঠ ধর্মীয় উৎসব—জাতীয় উৎসব এবং বসন বুড়ির সামনে গাওয়া গানগুলি তাদের জাতীয় সাহিত্য সম্পদ।

তথ্যের সন্ধানে

১. আনন্দ মোহন মণ্ডল : বয়স—৪৯, শিক্ষা—বি.এস.সি., পেশা—সরকারি চাকুরীজীবী, গ্রাম—পশ্চিম চর রাজাপুর, থানা—রানিনগর, জেলা—মুর্শিদাবাদ।
২. কুসুম মণ্ডল : বয়স—৫০, শিক্ষা—সাক্ষর, পেশা—গৃহকর্মী, গ্রাম—নামুরপাড়া, থানা—লালগোলা, জেলা—মুর্শিদাবাদ।
৩. তুলসী মণ্ডল : বয়স—৫৭, শিক্ষা—নিরক্ষর, পেশা—গৃহকর্মী, গ্রাম—শিবকৃষ্ণপুর, থানা—ইসলামপুর, জেলা—মুর্শিদাবাদ।
৪. লুধন মণ্ডল : বয়স—৩৮, শিক্ষা— সাক্ষর, পেশা—সপ্তম শ্রেণি, গ্রাম—কাজিপাড়া, থানা—জলঙ্গী, জেলা—মুর্শিদাবাদ। (এছাড়া পানু দাসী, টুলু মণ্ডল, চঞ্চলা মণ্ডল, বিশাখা মণ্ডল, রাখি মণ্ডল, সবিতা মণ্ডল, প্রভাতী মণ্ডল, সাবিত্রী মণ্ডল, সুশীলা মণ্ডল, রাসকুমারী মণ্ডল প্রমুখ। যাঁদের সহায়তা ছাড়া এই ক্ষেত্রসমীক্ষামূলক প্রবন্ধটি রচিত হত না)

বাংলার অপ্রচলিত লোকসংগীত প্রসঙ্গো

সোমা দাস মণ্ডল

ভারতীয় সংগীত পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, খুব প্রাচীনকাল থেকে বলাবাহুল্য, সংগীতের জন্মলগ্ন থেকে দুটি স্বতন্ত্রধারা প্রচলিত আছে। যথা—রীতিনীতি ও শাস্ত্রসম্মত সংগীত এবং সহজ-সরল লোকমুখে সৃষ্ট লৌকিক বা দেশজ সংগীত। প্রসঙ্গক্রমে বলা যায়, কোনো দেশে সংগীত তখনই স্বীকৃতি পায়, যখন সেই সংগীতের মধ্যে দেশজ উপাদানগুলো বর্তমান থাকে। সেই হিসেবেই বলা যায়, ভারতীয় শাস্ত্রীয় এবং লৌকিক সংগীতেরও কিছু স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য আছে।

যুগের বিবর্তনের ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে যেকোনো শিল্পকলাই পরিবর্তনশীল। সুতরাং সংগীতের ক্ষেত্রেও বিভিন্ন সময়ে নানা পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। এই পরিবর্তনের সুবাদেই কিছু কিছু সংগীতের প্রচলন ধীরে ধীরে লুপ্তপ্রায় হয়ে যায়। ভারতীয় সংগীতে এইরূপ ঘটনার নজির আমরা পেয়ে থাকি। ভারতে খুব প্রাচীনকাল থেকেই সংগীতের দুটি স্বতন্ত্র ধারা প্রচলিত আছে। একটি ব্যাকরণসম্মত বা রীতি-নীতি ও শাস্ত্রসম্মত সংগীত। আর একটি সহজ-সরল লোকমুখে সৃষ্ট লোকসংগীত। সবদেশেই তার নিজস্ব শিল্প ও সংস্কৃতি রয়েছে। সাধারণের মধ্যে যে সংগীত প্রচলিত তা মাটির থেকে উঠে আসা দেশজ লোকসংগীত। আর নানা সংগীত ও সুরের সমন্বয়ে অভিজাত ও সংগীত গুণীরা সংগীত রচনা করে থাকেন। যার বেশ কিছু নিয়ম বা রীতি-নীতি অনুসরণ করে গাওয়া হয় তাকে অভিজাত সংগীত বা শাস্ত্রীয় সংগীত বলা যেতে পারে।

কোনো দেশ মূলত তার শিল্প ও সংস্কৃতির মধ্যে দিয়েই পরিচিতি লাভ করে থাকে। ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীতের যেমন রকমফের আছে, তেমনি লৌকিক সংগীতেরও কিছু স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যুগের বিবর্তনের ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে যে-কোনো শিল্পকলা পরিবর্তনশীল। কালের গতিতে সমাজ-সংসারে যে প্রভাব পড়ে তার প্রভাব পড়ে সংগীতেও। আর তাই সংগীতে বিভিন্ন সময়ে নানা পরিবর্তন হয়েছে। এই পরিবর্তনের সুবাদেই কিছু কিছু সংগীতের প্রচলন ধীরে ধীরে লুপ্তপ্রায় হয়ে যায়। ভারতীয় সংগীতে এই রকম ঘটনার নজির আমরা পেয়ে থাকি। লোকসংগীতের ধারাগুলির মধ্যে বেশ কিছু ধারা বিবর্তিত হয়ে তা শাখা প্রশাখায় নতুন রূপে বিকশিত হয়েছে বা প্রচলিত হয়েছে। তখন পুরাতন মূল ধারাটি হয়তো কোনও কারণে একটু একটু করে সাধারণের কাছে আর আগের মতো গ্রহণযোগ্য নেই। স্বল্প পরিচিত হয়ে পড়ে। ক্রমে তা সর্বত্র খুঁজে পাওয়া যায় না। সেক্ষেত্রে অতীতের

সংগীত ধারাটিকে অপ্রচলিত বা স্বল্প প্রচলিত ধারা হিসাবে গণ্য করা হয়। আবার অন্যদিকে এমন কিছু লোকসংগীতের ধারা ছিল যেগুলি প্রচারে স্বল্প বা অন্য যে-কোনো কারণেই হোক জনপ্রিয়তা হারায়। হয়তো কোনও কোনও জায়গায় তার অস্তিত্ব অল্পমাত্রায় দেখা যায়। এই সকল সংগীত ধারাকেও অপ্রচলিত বা স্বল্প প্রচলিত লোকসংগীত হিসেবে গণ্য করা সমীচীন। যাইহোক যেসকল লোকসংগীত অপ্রচলিত, তারও কিছু কিছু নমুনা আমরা পেয়ে থাকি। এরকম বেশ কিছু লোকসংগীতের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। যেমন—

◆ **মালসী গান :** যে খুব জনপ্রিয় লোকসংগীত ধারা তেমনটি নয়। মালসী গান অনেকের কাছেই অপরিচিত। দেবী বিষয়ক এরকম গানকে মালসী বলা হয়। কখনও দুর্গা পুজোর আগমনি বা শাক্ত সংগীতকেও মালসী বলা হয়। লোকসংগীত গবেষকদের অনেকে মনে করেন, মালশ্রী নামক রাগের একটি ভগ্নরূপ হলো মালসীগান।[১] প্রাচীনকালে সৃষ্ট মালশ্রী রাগের সঙ্গে মালসীগানের একটা সম্পর্ক হয়তো আছে বা ছিল। কিংবা মালসীগানের বহুল প্রচলিত সুর থেকেই মালশ্রী রাগের সৃষ্টি হয়ে তা হতে পারে। কেননা রাগ থেকে কখনোই লোকসংগীতের সৃষ্টি হবার কোনো কারণ নেই। রাগ যদি বিশেষ লক্ষণযুক্ত স্বর সমন্বয় হয়, তাহলে একটি গানের ধারাকে কীভাবে চালিত করবে, আর কীভাবেই বা একটি লোকসংগীতের স্বতন্ত্রধারা সৃষ্টি করবে সে প্রশ্ন থেকেই যায়।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে শাক্তধর্ম বিকাশের সময় বাংলার শাক্তপদাবলির সূচনা। এই পদাবলী দুটি রূপে ছড়িয়ে পড়ে। প্রথম ধারাটি শ্যামাসংগীত ও কালীকীর্তন, দ্বিতীয় ধারাটি মাকে নিয়ে আগমনি ও বিজয়া গান। কালী সাধকদের মতে উচ্চমার্গের শ্যামাসংগীত সাধারণ কালী ভক্তরা সবাই রচনা করতে পারেন না। তারা সহজ কথায় লোকায়ত সুরে এবং প্রচলিত তালে কালীমায়ের কীর্তনগান করেন। এই গানই কালীকীর্তন বা মালসী গান নামে পরিচিত। মালসী গান কালীপুজোর সময় খোল করতাল সহযোগে প্রদক্ষিণরত অবস্থায় সমবেত পুরুষকণ্ঠে গাইতে শোনা যায়। নীচে সংকলিত গানটি রাঢ়বাংলার বীরভূম, বাঁকুড়া, বর্ধমান জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত মালসীগান। এই গানটি দাদরা তালে নিবন্ধ—

> একা ঘরের কামিনী/একা হইয়ার সে সাইজ্যেছে গো মা।/একে তো পাষাণের মাইয়া/অসুর কাটে ধাইয়া ধাইয়া/রুধিরেতে রাঙা হইয়াছে গো মা।[২]

◆ **ঢুয়াগান :** ওপার বাংলার পাবনা-রাজশাহি কুষ্টিয়া অঞ্চলে প্রচলিত ধুয়াগান, এই বাংলার পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর অঞ্চলে ঢুয়াগান নামে পরিচিত। ভাব ও আঙ্গিকে বাউলের সঙ্গে মিল থাকলেও ঢুয়াগানে ঈশ্বর কেবলমাত্র মুক্তি পথের দিশারী। সংসার এবং জীবনের আসক্তি কাটিয়ে আধ্যাত্ম মুক্তির জন্য নিজেকে সমর্পণ করা হয় এইগানের ভিতর দিয়ে। দেহতত্ত্ব শৈলীর এই ঢুয়াগানের খুব প্রচলন না থাকলেও লোকজীবনের আধ্যাত্মবোধ বিকাশের ক্ষেত্রে এই গানের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। গানটি দাদরা তালে নিবন্ধ—"মন সোনার বেনে/নিতে নারলিনে সোনা চিনে/ও তুই ওজন খাঁটি করবিকেনে/তোর শ্রদ্ধারতি দেখিনি।"[৩]

◆ **দুর্গার বারোমাস্যা :** দেবী দুর্গা বাঙালি জীবনে বারোমাস ধরে বারোটি দেবীরূপে আবির্ভূতা হন। কৈলাসবাসিনী ভোলা শিব যেমন আমাদের লোকসমাজের প্রিয়দেবতা, তেমনি গিরিরাজ কন্যা শিবপত্নী ও আমাদের একান্ত আরাধ্যশক্তি। লোকবিশ্বাস দেবী অসুর বিনাশ করে সমাজ সংসারে শুভর আগমন ঘটান। আশ্বিনের শারদপ্রাতে শ্বশুরবাড়ি থেকে বাপের

বাড়িতে এসে উমা অসুরকে বিনাশ করেন। সেই উমা সারাবছর নানা রূপ ধারণ করে লোক সমাজের সুখ-দুঃখ আনন্দ-বেদনায় এক হয়ে গিয়ে লোকজীবনকে মঙ্গলময় করে তোলেন। এই ধারণা থেকেই তাঁর বারোমাসে বারোটি রূপের মাহাত্ম্য বর্ণনা করে যে গান গাওয়া হয় সেটাই দুর্গার গান বারোমাস্যা গান। নীচে একটি বারোমাস্যা গানের উদ্ধৃতি দেওয়া হলো। গানটি কাহারবা তালে নিবন্ধ—

তুমি গো মা তারিণী ত্রিগুণধারিণী
এ কিংকরে করুণাকর ওগো মা
কাল ভয়কারিণী।[৪]

◆ **বনবিবির গান :** কথায় বলে 'সুন্দরবনে জলে কুমীর ডাঙায় বাঘ'। জীবিকার প্রয়োজনে সুন্দরবনের গভীর জঙ্গালে যারা কাঠ কাটতে যান তাঁদের বলে বাউল আর যারা মধু সংগ্রহ করতে যান, তাঁদের বলে 'মউলে'। জঙ্গালের রক্ষাকর্ত্রী দেবী বনবিবি। মউলে বাউলে যাতে বড়ো মিঞা অর্থাৎ বাঘের আক্রমণ থেকে রক্ষা পান সেই কামনাতেই বনবিবির পুজো করেন। পুজোর জায়গাকে বলে থান। হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই বনবিবির পুজো করেন। হিন্দুদের বনবিবির মূর্তির রং হলুদ, পরনে শাড়ি, গায়ে অলংকার, গলায় বন ফুলের মালা। মুসলমানদের বনবিবির মূর্তি কিশোরী, পরনে ঘাঘরা, কামিজ, ওড়না, মাথায় টুপি, পায়ে মোজাসহ জুতো, কোলে শিশু আর পাশে গদা হাতে শাহজলঙ্গী মূর্তি। বনবিবির পুজোতে ফল-মূলের সঙ্গো সিন্নি ভোগ দেওয়া হয়। পুজো উপলক্ষ্যে বনবিবি ও বাঘের দেবতা দক্ষিণ রায়ের মাহাত্ম্য নিয়ে বনবিবির পালাগান হয়। তাতে দুঃখে নামের এক মুসলমান বিধবার ছেলের করুণ কাহিনি বর্ণনা করা হয়। এই পালাতেই গাওয়া হয় বনবিবির গান। নীচে একটি গানের উল্লেখ করা হলো। গানটি দাদরা তালে নিবন্ধ—

বনবিবি বনবিবি মা বলে, ডাকি গো জঙ্গালে
বাউলে মোরা কাঠ কাঠতি, গহীন বনে এইযে গতি,
পেটের জ্বালা বড় জ্বালা মাগো মেটাই কি সম্বলে॥[৫]

◆ **জল ভরার গান :** বিয়ের মতো মাঙ্গালিক অনুষ্ঠানে বিশেষ আচার পালন করে জল ভরা হয়। জল ভরা পর্বটি বিয়েতে একটি অন্য মাত্রা যোগ করে। গ্রামাঞ্চলে বিয়ের দিন বাড়ির মেয়েরা নদী, খাল বা পুকুরে সমবেতভাবে জল ভরতে যান। তাদের পেছনে সানাই, কাঁসি, ঢোল ইত্যাদির বাজনদাররা বাজনা বাজান। মেয়েরা সুর করে গান করেন। গানের বিষয়বস্তু রাধাকৃষ্ণের প্রেম। অপেক্ষাকৃত হালকা রসের কথায় মেয়েরা বর বা কনের সম্ভাব জীবনের আনন্দের মুহূর্তগুলোকে তুলে ধরেন গানে। এই গানকেই জল ভরার গান বলা হয়ে থাকে। সংকলিত গানটি মধ্যবঙ্গো প্রচলিত একটি জল ভরার গান। গানটি খেমটা তালে নিবন্ধ— "হায় গো জলে ঢেউ দিও না সখি/আমি জলের ঘাটে কৃষ্ণ নিরখি।"[৬]

◆ **গুনাই বিবির গান :** গুনাই বিবির পালাগান ওপার বাংলার বরিশাল অঞ্চলে অত্যন্ত জনপ্রিয়। এই বাংলার উত্তর চব্বিশ পরগনারতেও এই পালা গানের প্রচলন আছে। আগে ব্যালাডধর্মী এই পালা এককভাবে গল্প করে গাওয়া হতো। পরবর্তীকালে এটি যাত্রাপালায় রূপ নেয়। মূলত তোতা মিঞা এবং গুনাই নামের এক সুন্দরীর প্রণয় আখ্যান এই পালা। তোতা তার চাচা দুলু মিঞার শয়তানী এবং ভয়ংকর ষড়যন্ত্রের হাত থেকে রক্ষা পেয়ে কীভাবে

সুন্দরী গুনাইকে নিজের বিবি করে নিল এবং গুনাই এর মহৎগুণ কীভাবে তোতাকে রক্ষা করল এসবই কাহিনি আকারে বর্ণনা করা হয় এই পালায়। পালার অঙ্গ হিসেবে ব্যবহৃত গানই গুনাই বিবির গান নামে পরিচিত। সংকলিত গানটি উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলার। গানটি খেমটা তালে নিবন্ধ—

> আইজ বুঝি তোরে যাবে লইয়া লো বুবুজান/আইজ বুঝি তোরে যাবে লইয়া।/শ্বশুর বাড়ি যাইতে হবে/ঘোমটা মুড়ি দিয়ে লো বুবুজান/আইজ বুঝি তোরে যাবে লইয়া॥[৭]

◆ **নাচনিশালিয়া ঝুমুর :** রাঢ় বাংলার লোকসংগীতের অন্যতম প্রাণ সম্পদ ঝুমুর গান। এই ঝুমুর গানের নানা ভাগ উপভাগ আছে। লৌকিক ধারার মধ্যে প্রধানতম একটি পর্যায় হলো নাচনিশালিয়া ঝুমুর—সিংভুম, মালভূমি, ধলভূম, অঞ্চলে রসিকদের নাচনি পোষা এক করুণ কিংবদন্তী। নাচনিরা মানুষের মনোরঞ্জনের জন্য যেখানে নাচ পরিবেশন করে থাকে, সেই জায়গাটিকে নাচনিশাল বলা হয়। নাচনিদের নাচের সঙ্গে চটুলরসের যে গান হয়, তাকেই নাচনিশালিয়া ঝুমুর বলা হয়। সংকলিত গানটি পুরুলিয়া জেলার—

> কোমড় পাইড়া নীল শাড়ি, আবল বেড়ি করি
> বাজু ঝুলনি, হায় হায় বাজু ঝুলনি
> কত গরব নারী বেশভূষণী॥

◆ **দক্ষিণ রায়ের গান :** সুন্দরবনের ধপধপিতে দক্ষিণরায়ের বিগ্রহ এবং মন্দির আছে। দক্ষিণ রায়কে বাঘের দেবতা হিসেবে পুজো করা হয়। দক্ষিণ রায় সম্পর্কে একটি কাহিনি প্রচলিত আছে। সেটি হলো, যশোরের রাজা মুকুট রায় তাঁর বীর সেনাপতি দক্ষিণ রায়কে শ্বাপদসংকুল সুন্দরবন অঞ্চলের শাসনভার দিয়ে পাঠালেন। দক্ষিণ রায় এই অঞ্চলে এসে জনহিতকর কাজ করে প্রজাদের মধ্যে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠলেন। প্রজারা যে যখন তাঁর কাছে গিয়ে যে-কোনো বিষয় সাহায্য চেয়েছে তিনি হাসি মুখে তা পূরণ করেছেন। অল্প সময়ের মধ্যে তিনি হয়ে উঠলেন সুন্দরবন অঞ্চলের ত্রাতা। তিনি কোনো পুরাণ চরিত্র না হয়েও হয়ে গেলেন এই দক্ষিণাঞ্চল বা দক্ষিণের ঈশ্বর। প্রজাদের কোন প্রত্যাশাই তাঁর কাছে বিফল হতো না। এই জন্য তাঁর নাম কল্পতরু। তিনি সুন্দরবন অঞ্চলে কৃষ্টির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। কথিত আছে তাঁর প্রতিপক্ষ পূর্বকান্তির শাসক বড়ো খাঁ গাজির সঙ্গে যুদ্ধে তিনি নিহত হন এবং তারপরেই দক্ষিণরায় দেবতার মর্যাদা পান। শোনা যায় অষ্টাদশ শতাব্দীতে একজন ধপধপিতে একটি গাছ কাটতে গিয়ে বিস্মিত হয়ে লক্ষ করেন যে, কুড়ুলের ঘায়ে গাছ থেকে রক্ত বেরোচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে খবর যায় বারুইপুরের জমিদার বাড়িতে। ওইদিন রাতে দক্ষিণ রায়ের মূর্তি দেখা যায় বাঘের পিঠে বসা অবস্থায়। মূর্তির রং সাদা, সুঠাম দেহ, মাথায় কোঁকড়া চুল, মুখে সুদৃশ্য গোঁফ, হাতে তির ধনুক, পিঠে তুহিন, বাহন বাঘ, সুন্দরবনের কোথাও কোথাও আবার ছিন্নমুণ্ডের মূর্তিও দেখা যায়। সাধারণ মানুষ মনে করেন ইনি বাঘের দেবতা, তাই তাঁর মাহাত্ম্য প্রচারে তাঁকে নিয়ে যে গান, সেগুলোই দক্ষিণ রায়ের গান। সংকলিত গানটি কাহারবা তালে নিবন্ধ—

> রাজনির শেষে এই দেখলাম স্বপন/বাঘ পিঠে আরোহণ এক মহাজন/করে ধনুঃশর চারু সেই মহাশয়/পরিচয় দিলা মোরে দক্ষিণের রায়।

◆ **আউল :** পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে 'আউল', 'আউলিয়া' বা কর্তাভজা নামের

এক শ্রেণির সাধক সম্প্রদায় আছেন। হিন্দু এবং মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যেই আউল সাধন করতে দেখা যায়। আউল দর্শন বা সাধনা করতে দেখা যায়। আউল দর্শন বা সাধনা প্রক্রিয়া বাউলের সঙ্গে প্রায় একই মার্গের। চৈতন্য ভক্তিবাদের 'ইস্টের কাছে আত্মনিবেদন' সুফিবাদের 'হক' অর্থাৎ সত্যপথ অবলম্বন এই দুই মূল আদর্শই আউল মতবাদের প্রধান বিষয়। আউল সম্প্রদায়ের আদিগুরু ফকির আউলচাঁদ। অলৌকিক ক্ষমতা সম্পন্ন ছিলেন তিনি। আউলরা জাতিভেদ প্রথায় বিশ্বাস করেন না। বাউলের আদর্শ, 'তিন দায় কর্ম', অর্থাৎ পরস্ত্রী গমন, পরদ্রব্য হরণ এবং পরহত্যার ইচ্ছা, 'চারবাক্য কর্ম' অর্থাৎ মিথ্যা কথন, কটূ-কথন, অনর্থক বচন, প্রলাপ ভাষণ থেকে বিরত থাকা। আউল সাধন সংগীতকার 'কুবির গোঁসাই', 'হাউর গোঁসাই', 'যাদু বিন্দু' ইত্যাদি নামে পরিচিত—

ভগ্ন ঘরে মগ্ন কেন রইলি মন
তাহে কুসঙ্গী হয় অনেকজন।

◆ **অহিরা গান :** পুরুলিয়া, বাঁকুড়া জেলায় অহিরা নামক একধরনের গান প্রচলিত ছিল। মূলত আদিবাসীদের মধ্যে কুরমি, ভূমিজরা এই গান গেয়ে থাকে। 'অহি' শব্দের অর্থ হলো গোরু। আর গোরুকে যারা লালন পালন করে দেখাশোনা করে তাদের বলে অহিরা। এই অহিরা গান জঙ্গালমহল ঝালদা প্রত্যন্ত মালভূমি এলাকা, ছোটোনাগপুর, মালভূমি এলাকার পুরুলিয়া সহ পার্শ্ববর্তী বাঁকুড়া, মেদিনীপুর এমনকি ঝাড়খন্ড সীমান্তে শোনা যায়। এই গান মূলত রাঢ় বাংলার জঙ্গালমহল, ছোটোনাগপুর, মালভূমি এলাকার কৃষিজীবী মানুষেরাই এই সহরাই কুরমি, মাহাতো ভূমিজ, আদিবাসী, সাঁওতাল, মুন্ডা প্রভৃতি মানুষদের মধ্যে গাইতে দেখা যায়। মালভূমি এলাকার মানুষ দীপাবলির সময় মেতে উঠতেন বাঁদনা পরব আর অহিরা গান নিয়ে। 'অহিরা' বলতে যেটা বোঝায়, সেটা হলো গ্রামবাংলায় শারদীয়ার পর থেকেই 'বাঁদনা' বা 'সহরায়' উৎসবের আগমনীর বার্তা সুর বেজে ওঠে। এই সুরগুলিই অহিরা গানের হয়ে থাকে। 'বাদনা' পরব হচ্ছে গ্রাম বাংলার লোকের কাছে ধর্মীয় ও সামাজিক খুব বড়ো উৎসব যা শহরে খুব একটা আলোড়ন ফেলে না। কারণ বাঁদনা পরবটা হচ্ছে গৃহপালিত পশুকেন্দ্রিক উৎসব। এই বাঁদনা পরব ও অহিরা গান পশ্চিমবঙ্গের ঝাড়গ্রাম, দুই মেদিনীপুর, বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া জেলায় বেশি প্রভাবিত।

গ্রামের লোক গোরুকে 'ভগবতী' দেবী রূপে পুজো করে, আর এই অমাবস্যা রাত্রি থেকে তিন দিন ধরে চলে। অমাবস্যার রাত্রে নাকি স্বয়ং ভগবান গোরুকে দেখতে আসেন যে তাদের কীভাবে রেখেছে, তাই গোরুকে তিন দিন আগের থেকে পুকুর, খালে ধোয়ানো হয় ও অমাবস্যার বা কালীপুজোর সময় গো-বন্দনা করা হয়। অমাবস্যার রাতে গোরুকে গোয়াল ঘরে পুজো করে চুমানো হয়। তারপর গোরুর শিঙে কচড়ার তেল মাখানো হয়, হলুদ, সিঁদুরও লাগানো হয় এবং বাঁদনা পরবে রং বেরং এর ধানের শিষ দিয়ে মুকুট পরানো হয় গরুকে এবং সারাদিন প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখা হয়। এই বাঁদনা পরবে কালী পুজোর রাতে ঘরে ঘরে গিয়ে 'গোরু জাগানো' হয়, যাকে স্থানীয় ভাষায় 'ঝাঙ্গাড়' নামে অভিহিত করা হয়। সারারাত ধরে ধামসা, মাদল, সানাই বাজিয়ে থাকে এই ঢাঙ্গাড়ের দল। এই গোরু-মহিষদের জাগিয়ে রাখতে যে গান গেয়ে থাকে, তাকে অহিরা গান বলা হয়—

অহিরে.../ইসসরে মহাদেবে বলিয়ে পাঠাইল রে বাবু ইউ/ঘরে ঘরে আইসে জ্যাগাতে।/জাগো মাই লখখিনি, জাগে মাই ভগবতী,/জাগতে আমাবইসা রাতি।

যখন 'অহিরে' গান হবে তখন বাদ্যযন্ত্র বন্ধ থাকবে। গানের শেষ শব্দ উচ্চারণের সঙ্গো সঙ্গোই ঠোঁট আর হাতের তালুর সাহায্যে একপ্রকার চিৎকার করে উঠবেন সবাই। বেজে উঠবে বাদ্যযন্ত্র—

গিজজি গিজি গিজিগিন, গিজজি গিজি গিজিজিন
গেজাক গেজাক গিজি গিন।[৯]

অহিরা গান, ঘাটু, দক্ষিণা রায় এর পালার গান, মালসী গানের মতো অনেক প্রকারের লোকগীতি একসময় বিভিন্ন অঞ্চলে বহুল প্রচলিত ছিল। প্রচলিত ছিল লোকউৎসবে, বিভিন্ন ব্রত, লোকাচারের সঙ্গো মিলে মিশে। পরে সামাজিক বা রাজনৈতিক বহু কারণে এই সব লোকসংগীতের গতি প্রকৃতি বদলেছে। কিছু গানের অবলুপ্তি ঘটেছে। যেগুলি হয়তো কালের নিয়মে আর খুঁজে পাওয়া যায় না। হয়তো পাওয়া যাবে না কোনোদিন। বেশ কিছু লোকসংগীত আধুনিক শিল্প ও সংস্কৃতির কবলে পড়ে হারিয়ে যেতে বসেছে। আবার বেশ কিছু গান খুব কম পরিধির মধ্যে পরিব্যাপ্ত।

আধুনিকতার সঙ্গো মিলিয়ে অনেকের মধ্যে দীর্ঘকালের বহুল প্রচলিত গানগুলিকে বাণিজ্যিক রূপ দেবার তাগিদও লক্ষ করা যাচ্ছে বহু ক্ষেত্রে। কিছু কিছু লোকসংগীতের প্রচলন হ্রাস পেয়েছে। বাংলার কোনও কোনও অঞ্চলে এখনও খুব স্বল্পমাত্রায় প্রচলন আছে বেশ কিছু বাংলা লোকগীতির। যেগুলিকে বাঁচিয়ে রাখার মতো মানুষ আর পাওয়া যাবেনা বেশি দিন। সরকারী উদ্যোগে সেগুলি হয়তো সংরক্ষিত হবে খাতায় কলমে, মিউজিয়ামে বা সংরক্ষণশালায়। তার যে প্রাণশক্তি তা অন্তর্হিত হবে অচিরেই। তবু নতুনের পথে যে যাত্রা শুরু হয়েছে, সেখানে লোকসংগীতও বাঁচবে হয়তো নিজের মতো করেই। আধুনিকতা আর ঐতিহ্যের মধ্যে নতুন ধারার সন্ধান করে ফিরবে লোকগীতির যাত্রা পথ। আমরা সেই অতীতের স্মৃতি থেকে খুঁজে ফিরব অপ্রচলিত আর স্বল্প প্রচলিত লোকজীবন আর লোকসংগীতকে।

তথ্যের সন্ধানে

১. শান্তি সিংহ : 'লোকসংগীত সংগ্রহ', কলকাতা রাজ্য সংগীত একাডেমী, প্রথম সংস্করণ
২. চিত্তরঞ্জন দেব : 'বাংলার পল্লীগীতি', ন্যাশনাল বুক এজেন্সী, ১৯৬৬
৩. দিনেন্দ্র চৌধুরী : 'গ্রামীণ গীতি সংগ্রহ', কলকাতা, ১৯৯৯
৪. শামসুজ্জামান খান : 'বাংলাদেশের সংগীত', ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩
৫. অমর পাল ও ধীরেন ভৌমিক : 'বাংলার লোকসংগীত', আনন্দ লহরী, ২০০১
৬. বিনয় ঘোষ : 'পশ্চিমবঙ্গোর সংস্কৃতি', কলকাতা, ১৯৫৭
৭. দিনেন্দ্র চৌধুরী : 'পূর্ববাংলার লোকসংগীত', কলকাতা অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স, ১৩৭৫
৮. দিলীপকুমার গোস্বামী : 'সীমান্ত রাঢ়ের লোকসংস্কৃতি', প্রকাশক পারিজাত প্রকাশনী, বিদ্যাসাগর পল্লী, পুরুলিয়া, প্রথম প্রকাশ ২৪ ডিসেম্বর, ২০১৪
৯. https://bn.wikipedia.org/wiki/অহীরা_গান

❑ লোকভাষা

লোকভাষা : বিশ্বাস সংস্কার ও নিষেধাজ্ঞার আড়ালে

তনুশ্রী মিশ্র

একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে বসবাসকারী সম ভাষা-ভাষী সরল ঐতিহ্যবাহী জন সমাজকে বলা হয় লোকসমাজ। এই সমাজের ঐক্য ও প্রাণশক্তি প্রস্রবণের মতো চিরপ্রবহমান ও স্বতোৎসারিত। যে কোনও সমাজের অন্তর্নিহিত প্রাণশক্তির উৎস হলো তার সংস্কৃতি। লোকসমাজ তাদের জীবনের আনন্দে, বেদনায়, বিদ্রোহে, উচ্ছলতায় এই সংস্কৃতিকেই বিজয়ের বৈজয়ন্তী কিংবা জীবনযুদ্ধের হাতিয়ার হিসেবে গ্রহণ করে। গোষ্ঠীবদ্ধ জনজাতির ভাষা, ভৌগোলিক অখণ্ডতা, জাতিগত সংহতি, ঐতিহ্যের মতো বিষয়ের দ্বারা লোকসমাজ তার সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ ও পুষ্পিত করে। লোকসংস্কৃতি লোকসমাজের নানাবিধ উপাদান যথা উৎসব-পার্বণ, বিশ্বাস-সংস্কার,ভাষা-সাহিত্যের সমন্বয়ে গঠিত। বিশ্বাস ও সংস্কার লোকজীবনচর্যার পরতে পরতে জড়িত। লোকসমাজের অভ্যন্তরে প্রবেশ না করলে সেই বিস্তৃতির রূপটি উপলব্ধি করা সম্ভব নয়।

"বিশ্বাসে মিলায় বস্তু তর্কে বহু দূর"—লোকবিশ্বাস ও সংস্কারকেন্দ্রিক ভাবনায় কথাটির প্রাসঙ্গিকতা অনস্বীকার্য। বিশ্বাস লোকমানসকে বদ্ধমূল প্রত্যয় প্রদান করে। মনের সমস্ত প্রশ্ন চিহ্নকে সমাধান সূত্রে পৌঁছে দেয়। বিশ্বাস মানব মনের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিটি কোণ স্পর্শ করে মঙ্গলময় ভাবনার উদ্ভাবন করে। বিশ্বাসকে কেন্দ্র করে মানুষ চায় তার সমস্ত জয়পরাজয়ের অনিশ্চয়তাকে, বিফলতাকে, জীবনসংগ্রামকে কোনও একটি অলৌকিক শক্তির সঙ্গে বেঁধে ফেলতে। সেই মতো তারা সংস্কারকেন্দ্রিক আচার-আচরণ বা ক্রিয়াকলাপে নিজেদের যুক্ত করে। এক্ষেত্রে লোকসমাজ, ধর্মীয় চেতনা, যাদুবাদ বা ইন্দ্রজাল, সর্বাত্মাবাদ, ট্যাবু, টোটেমের মতো বিষয়গুলির দ্বারাও প্রভাবিত হয়। আর এই বিশ্বাস-সংস্কারের ভাবপ্রকাশে লোকভাষা বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

সংস্কার আর ভাষা তখন একে অপরের স্রোতে মিলেমিশে একাত্ম হয়ে যায়। সৃষ্টি হয় সংস্কারকেন্দ্রিক লোকভাষা বা সুভাষণ। লোকভাষা কোনও নির্দিষ্ট অঞ্চলের উপভাষা নয় তা শিষ্ট, মার্জিত নাগরিক ভাষা থেকে বিচ্ছিন্ন গ্রামীণ মানুষের মুখের ভাষা। ভাষাবিজ্ঞান চর্চায় মানুষের মুখের ভাষাকে যে গুরুত্ব দেওয়া হয় লোকভাষার সুভাষণ এই পর্যায়ের ভাষা ছাঁদের এক প্রকৃতি। পৃথিবীর জন্মের আদিলগ্নে মানবসমাজ যখন গোষ্ঠীবদ্ধ জীবন যাপন করত তখন পরিবেশ-পরিস্থিতি ও জীবনসংগ্রামের তাগিদেই তারা বিশ্বাস-সংস্কারের সঙ্গে

নিজেদের যুক্ত করে নিয়েছিল। উৎপত্তি হয়েছিল নানা বিধি নিষেধ বা ট্যাবুর। আজ একবিংশ শতাব্দীতে এসেও মানব সমাজ পারেনি আদিম বিশ্বাস-সংস্কার, নিষেধাজ্ঞার মতো বিষয়গুলিকে দূরে সরিয়ে রাখতে। আজও মানুষ বিশ্বাস করে মঙ্গাল-অমঙ্গালে। আর অমঙ্গালজনিত শব্দকে উচ্চারণ করে মোড়কের আড়ালে। আবার কখনও বা ইতিবাচক শব্দের প্রয়োগেও উচ্চারিত হয় সেই সব শব্দগুচ্ছ। এই ধরনের মানসিক ভাবনার পেছনে যেমন আছে সামাজিক অনুশাসন তেমনি ক্রিয়াশীল আছে মানব মনের দুর্বলতা, মনের ভীতি ও অমঙ্গাল আশঙ্কা।

চর্চাগত দিক থেকে লোকসমাজে প্রচলিত বিশ্বাস ও সংস্কারসমূহের প্রধান ধারক ও বাহক হিসেবে পুরুষের তুলনায় নারীরা যে অনেক এগিয়ে সে কথা অস্বীকার করা যায় না। বর্তমান সমাজে নারীর অবস্থান অনেকাংশে বৃদ্ধি পেলেও আজও অনেক নারী শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত। ফলত তাদের ভাবনাচিন্তার সংস্কারকেন্দ্রিকতা তাদের ব্যবহৃত ভাষাকে অতিক্রম করতে পারে না। তবে শিক্ষার আলোকপ্রাপ্ত অনেক নারীও কিন্তু এই সংস্কারাচ্ছন্নতা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে পারেনি। বরং সমাজের এই বিধি নিষেধকে বংশ পরম্পরায় স্বীকৃতি দিয়ে নানা Taboo Word বা নিষিদ্ধ শব্দকে নির্দ্বিধায় তারা গ্রহণ করেছে। বিভিন্ন সৌজন্য বা শিষ্টাচার, গোপনীয়তা বা লজ্জামূলক শব্দগুলি তারা উচ্চারণ করে নিষিদ্ধতার আড়ালে। সৌজন্য ও শিষ্টাচার প্রদর্শনে নারীদের মুখে শোনা যায় 'চাল বাড়ন্ত' বা 'শাঁখা বেড়ে গেছে'-র মতো ধনাত্মক শব্দকে ঋণাত্মক শব্দের দ্বারা প্রয়োগ করে অমঙ্গাল বোধ থেকে রক্ষা পেতে। আসলে লক্ষ্মী অচলা, তিনি রুষ্ট হলে যদি সংসারে অকল্যাণ হয় তবে তো ঘোরবিপদ। তাই খাদ্যবস্তুর ফুরিয়ে যাওয়া বিষয়টিকে শেষ হয়ে গেছে একথা দিয়ে বোঝানো যাবে না, বলতে হবে 'বাড়ন্ত' হয়েছে।

আবার যে শাঁখা-সিঁদুর বিবাহিত নারীর সৌন্দর্য, সৌভাগ্য প্রদানকারী, স্বামীর মঙ্গালকামনার প্রতীক তা কোনোদিন ভেঙে বা ফুরিয়ে যায় না। বিবাহিত রমণীদের মধ্যে আরও একটি ভাষা ভীষণভাবে প্রচলিত আছে 'হাত শিথলানো' হচ্ছে। বিবাহিত রমণীদের ক্ষেত্রে চুড়ি বা শাঁখা পরিষ্কারের সময় খোলার কথা বলা বারণ। আবার খুলে রাখার হলে বলতে হয় 'ঠাণ্ডা করা' হয়েছে। বাঙালি হিন্দু সমাজে সধবাই হোক বা বিধবাই হোক নারীর পক্ষে স্বামী, শ্বশুর এবং ভাসুরের নামোচ্চরণ নিষিদ্ধ। মানুষের আদিম বিশ্বাস স্বামী, শ্বশুর, ভাসুরের নাম মুখে আনলে তাঁদের আত্মার কিয়দংশ দেহ থেকে বাইরে এসে হাজির হবে। ফলে তাদের জীবন সত্তার হানি ঘটতে পারে। তাই নামের পরিবর্তে 'বটঠাকুর' 'ঠাকুর' ইত্যাদি নামে সম্বোধন করতে হয়। আবার মেয়েদের শ্বশুরালয়ে গুরুজনদের নাম দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত শব্দ সামগ্রীর মধ্যে থেকে যদি আসে তবে মেয়েরা সেই নাম কিছুটা বিকৃতভাবে বা বিকল্প শব্দের প্রয়োগে উচ্চারণ করে।

দেখা যায়, 'তুলসি' শব্দের পরিবর্তে পুজোপাতা ব্যবহার করেন অনেক নারী। এ যেন পারিবারিক সুস্থ, স্বাভাবিক সম্পর্কবোধ, সৌজন্য ও শিষ্টাচার রক্ষা করার এক প্রাণপণ প্রচেস্টা। যার মধ্যে প্রচ্ছন্ন আছে পুরুষদের মান-সম্মান উচ্চ মর্যাদা প্রদানের ভাষা। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে সামাজিক অনুশাসনকে মেনে নিয়ে এ যেন পুরুষ দ্বারা সৃস্ট নারীর সুভাষণ। কোনও

কোনও ক্ষেত্রে আবার সামাজিক অনুশাসনের বশবর্তী হয়ে গোপনীয়তা রক্ষার্থে নারী নিজ অঙ্গ বা শারীরবৃত্ত বিষয়কও নানা নিষিদ্ধ শব্দ ব্যবহার করে।

লোকবিশ্বাস এবং লোকসংস্কার উভয় ক্ষেত্রেই মূল কথা হলো বিশেষ কার্য বা ক্রিয়ার একটি সুনির্দিষ্ট কারণের অনুসন্ধান। "In all this activity, however, can be detected an awareness of some law of cause and effect."[১] অর্থাৎ বলা যেতে পারে, লোক-বিশ্বাস ও সংস্কারজনিত প্রতিটি কার্যই সুনির্দিষ্ট কারণের সঙ্গে সম্পৃক্ত। এই কার্যকারণ সূত্রে ট্যাবু, টোটেম, জাদু বিশ্বাস একে অপরের সঙ্গে সংযুক্ত হয়। টোটেম উদ্ভবের মূল ভাবনা ছিল গোষ্ঠী চিহ্নিতকরণ। পরবর্তীকালে গোষ্ঠী নামকরণের পাশাপাশি ব্যক্তি নামের প্রসঙ্গ প্রচলিত হয়েছে। আর ব্যক্তি নামের প্রসঙ্গে এসেছে সাদৃশ্যমূলক জাদুবিশ্বাসজনিত সুভাষণ। তাই মৃতবৎসা জননী জন্মমাত্র নবজাতককে দীর্ঘ জীবন প্রদান করতে নানা ঘৃণাসূচক বা অনাদরসূচক নামকরণ করেন—'দুখু', 'নিমাই', 'পচা', 'গুয়ে' ইত্যাদি।

আসলে সন্তানের এই বিবমিষা উদ্রেককারী নামের মধ্যে দিয়ে সুকৌশলে যমকে ফাঁকি দিতে চান পিতা-মাতা। তারা ভাবেন এইসব নামের অধিকারিকে যম অবজ্ঞা করবেন। আবার মঙ্গলসূচক নামকরণের ক্ষেত্রে চলে আসে 'জয়', 'কল্যাণ', 'শুভ' ইত্যাদি। মঙ্গলবোধের সঙ্গে সঙ্গে মানবমনে থাকে অমঙ্গলবোধের চেতনাও তাই কোনও পিতা মাতা চান না 'বেহুলা', 'সীতা', 'মনসা', 'গৌরাঙ্গ', 'সিদ্ধার্থ', 'গৌতম' ইত্যাদি নামকরণ করতে। এই নিষেধাজ্ঞার মূলে আছে নামগুলির অন্তর্নিহিত দুঃখতত্ত্ব ও গৃহত্যাগী হওয়ার ভাবনাটি।

পুরুষতান্ত্রিক সমাজে একটি পুত্র সন্তানের জন্ম যে পরিমাণ আনন্দ সঞ্চার করে কন্যাসন্তানের জন্ম যেন তার দ্বিগুণ দুঃখ প্রদান করে। কন্যাসন্তানের জন্ম তাই জননীদের কাছে যন্ত্রণাদায়ক। সমাজের ভ্রূকুটিকে উপেক্ষা করতে না পেরে সাদৃশ্যমূলক যাদুবিশ্বাসের ক্রিয়াশীলতার প্রতি আশা রেখে কন্যাসন্তানের নামকরণ করা হয়—'ক্ষান্তা', 'চাইনা', 'সমাপ্তি, 'আন্নাকালী' ইত্যাদি। আবার শিশুর সৌভাগ্যজনিত সাদৃশ্যের কথা ভেবে দেব দেবীর নামেও করা হয় সন্তানের নামকরণ। যেমন—ষষ্ঠী, দুর্গা, রাধা, কৃষ্ণ, গোপাল, মহাদেব ইত্যাদি। জনমানসের ধর্মীয় চেতনার দ্বারা বিশ্বাস ও সংস্কার অনেকাংশে নিয়ন্ত্রিত হয়। রোগ-ব্যাধির থেকে শীঘ্র নিরাময় পেতে বসন্ত রোগের কথা তারা উচ্চারণ করেনা বলে "মায়ের দয়া বা অনুগ্রহ হয়েছে"।

রোগ-ব্যাধির ক্ষেত্রে ধর্মীয় বিশ্বাসের পাশাপাশি সামাজিক বিশ্বাসও জড়িয়ে রয়েছে কিছু কিছু ক্ষেত্রে। যেমন 'হাম' হলে 'হাম' শব্দের পরিবর্তে ব্যবহৃত হয় 'মাসিপিসি'। মাসিপিসির স্নেহাদর শিশুর পক্ষে প্রীতিকর, তাই দ্রুত রোগ উপশমের জন্য এই সুভাষণের আশ্রয় গ্রহণ। অনুরূপভাবে 'কুষ্ঠ' বা 'কলেরা' ব্যাধির ক্ষেত্রে এই শব্দের পরিবর্তে ব্যবহৃত হয় 'মহাব্যাধি' বা 'ওলাউঠা'-র মতো সুভাষণ।

ধর্মীয় বোধের ন্যায় মানবজীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত রয়েছে প্রকৃতি-পরিবেশ ও তার বিভিন্ন উপাদানসমূহ। প্রকৃতির এই উপাদানগুলিকে ঘিরে মানুষের মধ্যে প্রচলিত আছে নানা বিশ্বাস-সংস্কারমূলক নিষিদ্ধ শব্দ। বাংলার লোকসমাজে রাতে বাঘ, সাপ, হাতি,

ভূত, চোর ইত্যাদি শব্দগুলি অনুচ্চার্য। লোকসমাজ বিশ্বাস করে এইসব শব্দ উচ্চারণ করলে বাস্তবে তাদের আবির্ভাব ঘটবে যা কিনা ভীতিপ্রদ ও বিপজ্জনক। তাই এদেরকে একটি শুভ নামে সম্বোধন করা হয় যেমন—'সাপ'-এর পরিবর্তে 'লতা, পোকা বা দড়ি', 'হাতি' গণেশ মামা, 'ভূত' তেঁনারা, ওনারা, 'বাঘ' বড়ো শিয়াল, বড়ো মিঞা, বড়ো বিড়াল বা বাবা। বাঘ সম্পর্কিত এই লোকবিশ্বাস সুন্দরবন অঞ্চলের মানুষদের মধ্যে যেমন প্রচলিত তেমনি মধ্য ইউরোপে বা স্কেন্ডিনেভিয়ার লোক সমাজেও প্রচলিত। সেখানে নেকড়ে বাঘকে রাত্রে বলা হয় 'Wood runner' বা 'Silent one'. আবার 'চোর' শব্দের পরিবর্তে রাতের কুটুম বিকল্প শব্দটির ব্যবহার করা হয়। একটি প্রবাদে আছে—"রাতের কুটুম চাঁড়ালের বাড়ি যা"। রাত্রিকালীন সময়ের নিষেধাজ্ঞাকে কেন্দ্র করে আরও বিভিন্ন রকম লোকবিশ্বাস-সংস্কার জনিত লোকভাষা প্রচলিত আছে। যেমন—রাত্রি বেলা হরিদ্রা বলতে নেই বলতে হয় 'রং' বা 'গুড়া'। সন্ধ্যেবেলায় 'দই' এর সাজা দিতে নেই। দিলে বলতে হয় 'দম্বল'। রাত্রি বেলা 'মড়া' শব্দ উচ্চারণ করতে নেই। রাতে কলা কেনার সময় 'গোটা' বলতে হয়। কারোর গায়ে চুলের অগ্রভাগ লেগে গেলে বলতে হয় 'চুল না ফুল' উত্তরদাতা বলেন 'ফুল'। এছাড়াও দইকে—'চূণ', পানকে 'বোঁটা', আদাকে—'ঝাল', খয়েরকে—'তিত', মধুকে—'মৌ', হরিতকীকে—'কথা' এই বিকল্প শব্দগুলির ব্যবহারে উচ্চারণ করতে হয়।

আবার রাতের আকাশে একটি তারা দেখলে পাশের সঙ্গীকে বলতে হয় 'তোর আমার ক'চোখ' সংগীটি বলে 'চার চোখ'। তবে উচ্চারিত এই শব্দবন্ধেই দোষ মুক্ত নয়, তিন তারা না দেখা পর্যন্ত গৃহে প্রবেশ করা নিষেধ। বিষয়টি প্রবাদে আছে এইভাবে 'একতারা মানুষ মারা/দুই তারা কাঁঠালের শেষ/তিন তারা নাই দোষ'। শিশুকে কেন্দ্র করেও আছে নানা বিশ্বাস-সংস্কারের ভাষা। দুগ্ধপোষ্য শিশুর হেঁচকি উঠলে নিকটবর্তী বয়স্ক কাউকে একটুকরো সুতো শিশুর মাথায় রেখে বলতে হয়—'মা ষষ্ঠীর বোঝা বও'। শিশু হাঁচলে বলতে হয় 'জীইও মা ষষ্ঠীর পদে খাইও'।

পরিণত মানুষ হাঁচলে 'জীব' বলতে হয়, প্রবাদে আছে—'জীব বলতে লোক নেই'। আবার বেশ কয়েকটি স্থান নাম আছে যা উচ্চারণ নিষিদ্ধ। যেমন—চব্বিশ পরগনার দক্ষিণাঞ্চলে 'গোচরণ' নামটি উচ্চারণ হয়না, শুধু চরণ বলা হয়। এই রকম 'ফুটিগোদা' নামটিরও উচ্চারণ অশুভ বলে মানুষ বিশ্বাস করে। ইংরেজি 'Folk belief' শব্দটির বাংলা প্রতিশব্দ লোকবিশ্বাস আর 'Superstition' শব্দটির প্রতিশব্দরূপে সংস্কার শব্দটির ব্যবহার করা হয়। 'Superstition' বলতে সাধারণভাবে সংস্কারের মন্দ দিকটিকে বোঝানো হয়। কিন্তু বিষয়টি আসলে সেরকম নয়। লোকবিশ্বাস-সংস্কারের মূলে কাজ করে এক ঐহিক শুভাশুভ বোধ। তাই কয়েক সহস্র বছর পূর্বে সেই বেদের কাল থেকে এর উদ্ভব হয়ে আজও আধুনিক মনস্ক মানুষের অবচেতন মানসিক প্রক্রিয়ায় ইতিবাচক আশা-আকাঙ্ক্ষা ও শুভবোধের ভাবনার সঙ্গে জড়িত হয়ে লোকসমাজের দ্বারা মান্যতা প্রাপ্ত হচ্ছে।

আর এই ভাবনাগুলির বহিঃপ্রকাশের মাধ্যম হল ভাষা। যা সংস্কারকেন্দ্রিক লোকভাষা বা সুভাষণ নামে পরিচিত। এই সংস্কারকেন্দ্রিক লোকভাষা তার নিজস্ব চলনে এতটাই সাবলীল

যে, সেগুলির ব্যবহার ভিন্নভাবে আমাদের মধ্যে বিস্ময়বোধ জাগ্রত করে না। বরং এই সংস্কারকেন্দ্রিক ভাষাগুলি বিকল্প শব্দের প্রয়োগে কখনও নারীর মুখের ভাষায়, কখনও বা লোকসমাজের মুখের ভাষার সঙ্গো এতটাই সুন্দরভাবে নিজেদের মিলিয়ে নিয়েছে যে তা হয়ে উঠেছে ঐশ্বর্যময়, অর্থবহ ও সুমধুর।

উৎসের সন্ধানে

১. ড. বরুণ কুমার চক্রবর্তী : 'লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কার', বিশ্বকোষ, পুস্তকবিপণি, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ ২০০৩, পৃ. ৮
২. দুলাল চৌধুরী : 'পল্লব সেন (সম্পাদনা) 'লোকসংস্কৃতির বিশ্বকোষ', পুস্তাকবিপণি,কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ ২০১৩
৩. পবিত্র সরকার : 'লোকভাষা-লোকসংস্কৃতি, ১৯৯৭
৪. তপন চক্রবর্তী : 'ভবানী প্রসাদ সাহু—দুই বাংলার কুসংস্কার বিরোধী বিজ্ঞান চিন্তা', দীপ প্রকাশন, কলকাতা, ১৯৯৩

ইন্টারনেট

১. http-en.m.wikipedia.orgàwiki/Folk-b/elief
২. bn.m.wikipedia.org

ভাষা, উপভাষা ও লোকভাষা

দীনবন্ধু কুণ্ডু

মানুষের ভাববিনিময়ের অন্যতম মাধ্যম হলো ভাষা। ভাষা একটি বিমূর্ত ধারণা। এই বিমূর্ত ধারণার মূর্ত রূপ হলো উপভাষা (Dialect)। উপভাষাকে ভাষার আঞ্চলিক রূপ ধরে নেওয়া হয়। আবার অন্যভাবে বলা যায় অনেকগুলি উপভাষার সমষ্টিগত রূপ হল ভাষা। ভাষা ও উপভাষার পারস্পরিক সম্পর্কটি বেশ জটিল। ভাষার থেকে উপভাষার সৃষ্টি, না কি উপভাষা থেকে ভাষার ধারণা গড়ে ওঠে—এই প্রশ্নের সমাধান সহজ নয়। আধুনিককালের বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানীরা উপভাষা বিশ্লেষণের তিনটি মানদণ্ড স্থির করেছেন। এই মানদণ্ডের ভিত্তিতে উপভাষাকে সাহিত্যিক উপভাষা (Literary Dialect), সামাজিক উপভাষা ও আঞ্চলিক উপভাষা (Regional Dialect) এই তিন ভাগে ভাগ করা যায়। অঞ্চলভেদে ভাষার মধ্যে যে ভিন্নতা তাকে বলে আঞ্চলিক উপভাষা। উপভাষার আঞ্চলিক রূপের নাম বিভাষা (Sub- Dialect)। বিভাষার আঞ্চলিক রূপের নাম নিভাষা (Ideolect)। সামাজিক স্তর বিন্যাসের (লিঙ্গ, বয়স, পেশা, ধর্ম, অর্থনৈতিক অবস্থান) কারণে ভাষার যে বৈষম্য বা বৈচিত্র্য তাকে বলা হয় সামাজিক উপভাষা (Sociolect)। ভাষার নানা মাত্রিক রূপের সন্ধান করতে গিয়ে লোকভাষা (Folk language) নামে একটি পরিভাষার সন্ধান পাওয়া যায়। উপভাষা ও লোকভাষা কি সমার্থক, নাকি ব্যবহারিক, ভাষাতাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক দিক থেকে ভিন্নতা বা পার্থক্য রয়েছে। উপভাষা ও লোকভাষার পারস্পরিক সম্পর্ক সূত্রটি আমাদের খুঁজে বের করতে হবে।

লোকসংস্কৃতির আলোচনায় লোকভাষার প্রসঙ্গটি খুব স্বাভাবিকভাবেই এসে পরে। লোকসমাজের সৃষ্ট সংস্কৃতি যদি লোকসংস্কৃতি হয়, তাহলে লোক সমাজের দ্বারা সৃষ্ট বা লোকসমাজে প্রচলিত ভাষাকে লোকভাষা বলা যেতে পারে। অপরপক্ষে লোকসাহিত্যের ভাষাকেও লোকভাষা বলা যেতে পারে। কিন্তু এই অল্প কথায় লোকভাষার যথার্থ স্বরূপ অনুধাবন করা সম্ভব নয়। পাশ্চাত্যে Folk Language গেঁয়ো বা গ্রাম্য ভাষা অর্থে ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ যে ভাষা নাগরিক মার্জিত শিষ্ট ও আদর্শ নয়।

উপভাষা বলতে ইংরেজিতে Dialect শব্দটি ব্যবহৃত হয়। কিন্তু লোকভাষা অর্থে Folk Language বা Rural Language উভয়ই ব্যবহৃত হয়। Rural Language-এর পাশাপাশি Rural Linguistics কথাটিরও বিশেষ প্রচলন রয়েছে। Rural Linguistics-এর বাংলা হতে পারে গ্রাম্য ভাষাবিজ্ঞান। এই গ্রাম্য ভাষাবিজ্ঞান ভাষার আঞ্চলিকতার বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ

করে না। Folk Language-এর পরিভাষা হিসাবে গ্রাম্য ভাষা শব্দটি ব্যবহারের পক্ষপাতী ড. পবিত্র সরকার। তাঁর মতে—"আমরা Folk Language-এর বাংলা হিসাবে গ্রাম্য ভাষা শব্দটি সুপারিশ করি 'লোকভাষা' নয়। অবশ্য এই গ্রাম্য শব্দটির মধ্যে কোনো নিন্দা বা অবজ্ঞার প্রশ্ন নেই। এটি নেহাৎই একটি স্বাতন্ত্র্য সূচক ধারণা; যা নাগরিক বা শহুরে নয়, তা-ই গ্রাম্য।"[১] তবে এই গ্রাম্য ভাষা কোনো নির্দিষ্ট অঞ্চলের উপভাষা নয়। তা বিভিন্ন ভাষার গ্রাম্যতা ও অনাগরিকতার লক্ষণগুলিকে চিহ্নিত করে। ভাষাগত এই গ্রাম্যতার ধারণাটি অনেক ক্ষেত্রেই আংশিক ও আপেক্ষিক। এই প্রসঙ্গে ড. পবিত্র সরকার বলেছেন—"এক সময় ভাষাগত গ্রাম্যতা ছিল ঢাকাই উপভাষা ভিত্তিক। এখন প্রধানত দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার উপভাষা ভিত্তিক হয়ে দাঁড়িয়েছে।"[২] বাংলা ভাষায় লোকভাষার আলোচনা শুরু হয়েছে অনেক পরবর্তীকালে। অনেকে লোকভাষা বলতে আঞ্চলিক উপভাষাকেই বুঝে থাকেন। কিন্তু এই ধারণা সম্পূর্ণ ঠিক নয়। একটি উপভাষার স্বাতন্ত্র্য তার অঞ্চলগত বা নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমার মধ্যেই আবদ্ধ বা নির্দিষ্ট। অন্যদিকে ভাষার অনাগরিকতার মূল বৈশিষ্ট্যগুলি প্রতিফলিত হয় লোকভাষার মধ্যে। উপভাষার একটি সামগ্রিক মান্যতা ও নির্দিষ্ট নিয়ম রয়েছে। কিন্তু লোকভাষার ক্ষেত্রে তা সর্বদা থাকে না। একই উপভাষা অঞ্চলে লোকভাষাগত বিভিন্নতা দেখা যেতে পারে। লোকভাষা মূলত গ্রাম ও শহরের উভয় স্থানেরই পিছিয়ে পড়া লোকগোষ্ঠীর মধ্যে অধিক প্রচলিত। এ প্রসঙ্গে পবিত্র সরকার বলেছেন—

> লোকভাষা (Folk Language) কোনো বিশেষ অঞ্চলের উপভাষা নয়। নাগরিক ভাষার সঙ্গে—বাংলারক্ষেত্রে মান্য মার্জিত কলকাতা শহরের বা শিষ্ট ভাষার বিরোধে যে ভাষা গ্রাম্য বলে চিহ্নিত হতে পারে তা-ই লোকভাষা। আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানে কখনও একে Rural Language ও বলা হয় যা থেকে Rural Linguistics কথাটি তৈরি হয়েছে।[৩]

ভাষা গবেষক সুধীর কুমার করণের মতে—

> ইংরাজিতে যাকে বলা হয় Colloquial Spoken তাকেই আমরা যথার্থ লোকভাষা নামে অভিহিত করতে পারি। গ্রামীণ অশিক্ষিত জনসমাজের মধ্যেই তার অবস্থিতি। সামাজিক স্তর বিন্যাসের প্রাথমিক পর্যায়ভুক্ত কৃষক শ্রমজীবী মানুষের প্রাত্যহিক ভাব প্রকাশের বাহন। এই লোকভাষাই ভাষার মূল বুনিয়াদ। শিল্পচর্চার বাহনরূপে এর ব্যবহার নেই। প্রকৃতির মতই এ ভাষার নিরাবরণ নিরলংকৃত এবং স্বচ্ছ। এ ভাষা কোনো নির্দিষ্ট ব্যাকরণের গণ্ডি মানে না। প্রবহমান লোকশ্রুতির ওপরই তার নির্ভরতা অধিক, লোকভাষার বাচক সচেতন ভাবে কোনো শব্দ ব্যবহার করে না, তাই অঞ্চল ভেদে শব্দের তারতম্য ঘটতেই থাকে। লোক সমাজের মুখে মুখে শব্দের প্রসার ঘটতে থাকে; ব্যাকরণের রীতিনীতি মেনে চলার জন্য এ ভাষা প্রস্তুত থাকে না" (লোকায়ত সংস্কৃতি পরিপ্রেক্ষিত ও রূপরেখা)।

লোকভাষা সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন—"বাংলার অসাধু ভাষাটা খুব জোরালো ভাষা এবং তার চেহারা বলিয়া একটা পদার্থ আছে— সে আউলের মুখে, ভক্ত কবিদের গানে, মেয়েদের ছড়ায় রহিয়াছে। কেবল ছাপার কালিতে তিলক পরিয়া সে ভদ্র সাহিত্য সভায় মোড়লি করিয়া বেড়াইতে পারে নাই। কিন্তু তাহার কণ্ঠে গান থাকে নাই। তাহার বাঁশের বাঁশি বাজিতেছেই।" (১৩৯২ বঙ্গাব্দের সবুজ পত্র পত্রিকার 'বাংলা ছন্দ' শীর্ষক প্রবন্ধ) লোকভাষা সুনির্দিষ্ট কোনো ভৌগোলিক বা আঞ্চলিক উপভাষার সীমানায় সীমাবদ্ধ

নয়। এ সাধুও নয়, আবার মান্য চলিত ভাষা থেকেও পৃথক। প্রবাদ প্রবচন, ধাঁধা, ছড়া, লোকসংগীত, লোককথা, লোকনাট্য, ব্রতকথা ও আউল-বাউল গানের মধ্যে লোকভাষার নিদর্শন ছড়িয়ে আছে। লোকভাষায় এমন কিছু শব্দ ব্যবহৃত হয় যা আপাত অর্থহীন। যেমন এলাটিং বেলাটিং, আগডুম বাগডুম ও ইকিড় মিকিড় প্রভৃতি। এই শব্দগুলি কোনো নির্দিষ্ট আঞ্চলিক উপভাষার শব্দ নয়।

লোকভাষা মূলত নাগরিক রুচিবর্জিত, অমার্জিত গ্রাম্য মানুষদের কথ্য ভাষা। এই ভাষার বাক্‌ভঙ্গি আঞ্চলিক উপভাষার মান্যতার স্তর থেকে কিছুটা প্রভেদ যুক্ত। এই ভাষার ছাঁদের মধ্যে গোষ্ঠীভিত্তিক উচ্চারণের প্রবণতা লক্ষ করা যায়। কোনো কোনো সংহত সমাজের আচার বিশ্বাস সংস্কার ধর্মাচারণ ও জীবনাচরণের প্রতিফলন লক্ষ করা যায় লোকভাষার মধ্যে। এই ভাষা সংহত সমাজের অন্তরের ভাষা। এই ভাষা মূলত মৌখিক। এই ভাষার মধ্যে গ্রামের মাটির সোঁদা গন্ধ খুঁজে পাওয়া যায়। এই ভাষার মধ্যে ককনি, রকনি, অপরাধ জগতের ভাষা, ইতর শব্দ এবং অশ্লীল শব্দও অবলীলায় ব্যবহৃত হতে পারে। উপভাষার পরিধি নির্দিষ্ট কয়েকটি অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ। কিন্তু লোকভাষার পরিধি উপভাষার থেকে অনেক বিস্তৃত ও গভীর। ভাষিক প্রয়োগের ক্ষেত্রেও লোকভাষার কোনো আঞ্চলিক গন্ডি নেই। কিন্তু উপভাষার ক্ষেত্রে এই আঞ্চলিক গন্ডিবদ্ধতা খুব জরুরি। উপভাষার নির্দিষ্ট ধ্বনিতাত্ত্বিক ও রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য খুঁজে পাওয়া যায়। কিন্তু লোকভাষার নির্দিষ্ট ধ্বনিতাত্ত্বিক ও রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য খুঁজে বের করা কঠিন। তবে লোকভাষার ক্ষেত্রে কখনও কখনও সামাজিক উপভাষার মাপকাঠিগুলি প্রযোজ্য হতে পারে। এই ভাষার অন্তরালে যে লৌকিক অভিজ্ঞতা, সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার ও সামাজিক প্রতিবেশ লুকিয়ে আছে তাকে উদঘাটন করা দরকার। বিভিন্ন প্রকারের লোকসাহিত্য থেকে লোকভাষার ছোটো ছোটো এককগুলিকে খুঁজে বের করা যেতে পারে।

বিশিষ্ট লোকসংস্কৃতিবিদ ড. পল্লব সেনগুপ্ত তাঁর 'লোকসংস্কৃতির সীমানা ও স্বরূপ' (পৃ. ৩৫৮) গ্রন্থের 'লোকভাষা ১ উৎস ও মোহনা' শীর্ষক অধ্যায়ে লোকভাষার কতকগুলি সীমানা, স্তর ও উপাদানের কথা বলেছেন। যথা—১. প্রান্তীয় উপভাষা, ২. গ্রামীণ ভাষা, ৩. মেয়েলি ভাষা, ৪. লোকসাহিত্যের ভাষা, ৫. শহুরে ককনি, ৬. শহুরে রকনি, ৭. ছাত্রমহলের ভাষা, ৮. গালাগালির ভাষা, ৯. অপরাধ জগতের ভাষা। প্রান্তীয় উপভাষা বলতে তিনি আঞ্চলিক উপভাষার সীমান্তবর্তী এলাকার মিশ্রিত উপভাষাকে বুঝিয়েছেন। যেমন—উড়িষ্যার সীমান্তবর্তী পশ্চিম মেদিনীপুর ও ঝাড়গ্রামের ভাষার মধ্যে ওড়িয়া ভাষার শব্দ ও উচ্চারণের প্রভাব লক্ষ করা যায়। যশোর ও খুলনা অঞ্চলে রাঢ়ি ও বঙ্গালির মিশ্রণ দেখা যায়। মালদহের বেশ কিছু এলাকায় বরেন্দ্রীর সঙ্গো বিহারের খোট্টার সংমিশ্রণ দেখা যায়। এই সংমিশ্রণের কারণে এগুলি লোকভাষার দৃষ্টান্ত হতে পারে না। এ প্রসঙ্গো তিনি বলেছেন—

> স্বভাবতই এই বহুকোণিক পরিব্যাপ্তির জন্য লোকভাষা রূপে গণ্য হতে পারে না কোনো উপভাষাই। কোন উপভাষার কোন প্রান্তীয় রূপটিকে লোকভাষা বলব ফলত প্রতিটি প্রান্তীয় রূপান্তরকে ভিত্তিতে রেখেই পেশা, লিঙ্গ, সামাজিক অবস্থান, অর্থনৈতিক পরিবেশ ইত্যাদি যে সব উপাদানের কথা একটু আগে বলেছি, তাদের সূত্রে স্থানীয়ভাবে কিছু লৌকিক ভাষা তৈরি হতে পারে, হয়ও হামেশাই।[৩]

ককনি বলতে আমরা উত্তর কলকাতার আঞ্চলিক বিভাষাকে বুঝে থাকি। ককনির দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় 'হুতোম প্যাঁচার নকশা' ও 'আলালের ঘরে দুলাল' গ্রন্থে। কিছু কিছু বিশেষ উচ্চারণ ও শব্দ ব্যবহারের ভিন্নতার কারণে গড়ে ওঠে ককনি ভাষা। এর মধ্যে কিছু ইতর শব্দ প্রবাদ প্রবচন বাগধারার স্থানিক রূপভেদ আছে। ককনির পাশাপাশি রকনি নামে আর একটি ভাষারূপের সন্ধান পাওয়া যায়। রকনি বলতে রকের ভাষাকে বোঝায়। রকনির মধ্যে হিন্দি, ইংরেজি, ইতর শব্দ ও অন্ধকার জগতের শব্দের মিশ্রণ থাকে। রকনি কোনো নির্দিষ্ট আঞ্চলিক ভাষা নয়। এটা যে কোনো অঞ্চলের ভাষা হতে পারে। এই শ্রেণির লোকভাষার মধ্যে পরিহাসপ্রিয়তা ও ব্যঙ্গ ধর্মীতার প্রাধান্য লক্ষ করা যায়। তবে বর্তমানে কলকাতা শহরের মধ্যবিত্ত ব্যক্তিরা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই মান্য চলিত বাংলাতেই কথা বলে। কিন্তু তার মধ্যেও ভাষার লৌকিক উপাদানের প্রভাব বেশ কিছু কিছু ক্ষেত্রে লক্ষ করা যায়।

লোকসাহিত্যের ভাষার মধ্যে রূপকথায় ব্যবহৃত কিছু শব্দ ব্যবহৃত হয়। সেই শব্দগুলি ছাড়া রূপকথার ইমেজ তৈরি হয় না। যেমন তেপান্তরের মাঠ, সোনার কাঠি, রূপোর কাঠি, রাক্ষস-খোক্ষস, পক্ষীরাজের ঘোড়া, জলপরি ও ব্যঙ্গমা-ব্যঙ্গমী প্রভৃতি। ধাঁধা, প্রবাদ ও লোকসংগীতেরও বেশ কিছু সাধারণ ও জনপ্রিয় শব্দ ব্যবহৃত হয় যে গুলিকে লোকভাষার শব্দ বলা যেতে পারে। লোকসাহিত্যের সঙ্গে মেয়েদের যোগটি অত্যন্ত গভীর। সমস্ত অঞ্চলে কথা বলার কিছু মেয়েলি ভঙ্গি আছে, যেগুলি অনেক ক্ষেত্রেই সাধারণ। যেমন হ্যাঁগো, ওগো, ভাতার, বটঠাকুর, ওলো, ওমা, ন্যাকা, ছিছি, আবাগি, পোয়াতি প্রভৃতি। এই লোকশব্দ গুলি স্থান কাল পাত্র নিরপেক্ষভাবে অধিকাংশ গৃহস্থ মেয়েদের মুখে শোনা যায়। লৌকিক ভাষার মধ্যে মেয়েলি শব্দের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। মেয়েলি ভাষার মতো লোকভাষায় গ্রামীণ ভাষারও বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। 'নীলদর্পণ' ও 'বুড়ো শালিখের ঘাড়ে রোঁ' নাটকে এই রকম কিছু গ্রামীণ লোকভাষার দৃষ্টান্ত দেখা যায়।

লোকভাষার ডাকনাম ও স্থাননামের প্রয়োগগুলির মধ্যে আচার বিশ্বাস ও সংস্কার কাজ করে। যেমন খ্যাঁদা, হাঁদা, ভোঁদা, গোবরা, টেঁপি, ভুঁদি, পেঁচি, খেঁদি প্রভৃতি। এই রকম নামকরণ করার কারণ তাকে যেন অপদেবতা স্পর্শ না করে। স্থান নামগুলি দেবদেবীর নাম বা প্রাকৃতিক বিষয়কেন্দ্রিক হতে পারে। যেমন কৃষ্ণগঞ্জ, শ্যামবাজার, রাধাবাজার, রামপুর, হরিহরপুর, শিবপুর, নারায়নগঞ্জ, কালীপুর প্রভৃতি এই স্থান নামগুলি কোন আঞ্চলিক নাম নয়। এই জাতীয় জায়গার নাম গ্রাম ও শহরের সর্বত্রই দেখা যায়। প্রাকৃতিক বস্তুকেন্দ্রিক স্থান নামগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল বাঁশবেড়িয়া, কচুখালি, পটলডাঙা, পদ্মপুকুর প্রভৃতি।

স্কুল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা নিজেদের অন্তরঙ্গ কথাবার্তায় বেশ কিছু শব্দ ব্যবহার করে থাকে। এই জাতীয় শব্দগুলি অনেক ক্ষেত্রেই অশ্লীল ও ব্যঙ্গাত্মক। এগুলি কোনো নির্দিষ্ট অঞ্চলের ভাষা নয়। কিন্তু বিভিন্ন অঞ্চলের ছাত্র-ছাত্রীরা প্রায় একই রকম কিন্তু অন্তরঙ্গ ব্যাঙ্গাত্মক শব্দ ব্যবহার করে, সেগুলিকে লোকভাষার পর্যায়ভুক্ত করা যেতে পারে। বাংলা ভাষার এমনকিছু ইতর শব্দ তথা গালাগালির শব্দ আছে যে গুলি স্থান কাল পাত্রভেদে কমবেশি সকলেই ব্যবহার করে। যেমন শালা, শুয়োরের বাচ্ছা, কুত্তার বাচ্ছা, ঢ্যামনা, হারামজাদা, মাগি প্রভৃতি। অপরাধ জগতে বেশ কিছু কোড ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যবহৃত হয়

এগুলিও লোকভাষার উপাদানরূপে ব্যবহৃত হয়। তবে কালের পরিবর্তনে লোকভাষাও পরিবর্তনশীল হয়ে উঠেছে। আর এই পরিবর্তনশীলতা ভাষার চিরকালের ধর্ম। ভাষা, উপভাষা ও লোকভাষার পারস্পরিক সম্পর্কটিকে খুব সহজ, সরল ও স্পষ্ট সীমারেখার দ্বারা চিহ্নিত করা সহজ কাজ নয়। এই সম্পর্কটি অনেক ক্ষেত্রেই আপেক্ষিক। ভাষা, উপভাষা ও লোকভাষার সম্পর্ক অনুধাবনের জন্য বিস্তৃত অভিজ্ঞতা, ক্ষেত্র সমীক্ষা ও বিশ্লেষণের প্রয়োজন আছে। এখানে সংক্ষিপ্ত পরিসরে তা সম্ভব হয়নি।

লোকভাষা বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে সমাজভাষাবিজ্ঞানভিত্তিক পর্যালোচনার প্রয়োজন রয়েছে বলে মনে হয়। সমাজভাষাবিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ মানদণ্ড হলো বৃত্তি বা পেশা। আমার জন্মস্থান ও বাল্য কৈশোরের অবাধ বিচরণভূমি বাঁকুড়া জেলার কোতুলপুর থানার সাহাবাদ চক গ্রামে ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় ব্যবহৃত বেশ কিছু কৃষিজীবনকেন্দ্রিক লোকভাষার তালিকা ও তাদের অর্থ দেওয়া হলো। কৃষক পরিবারের সন্তান হওয়ার কারণে শৈশব থেকেই এই লোকভাষাগুলির সঙ্গে পরিচয় হয়েছে। এই শব্দের তালিকা তৈরির জন্য ক্ষেত্র সমীক্ষা বা কোনো গ্রন্থের সাহায্য নিতে হয়নি। ছোটো থেকেই এই শব্দগুলি শুনতে শুনতে বড়ো হয়েছি।

লোকভাষা	**অর্থ**
১. পালুই	ধানের খড়কে একত্রিত করে সংরক্ষণ করে রাখা।
২. পাওয়ানো	জমিতে জলের সেচ দেওয়া (আলু পাওয়ানো)
৩. আল	একাধিক জমির সীমানা নির্দেশক স্থান, যার ওপর দিয়ে হেঁটে জমিতে যাওয়া হয়।
৪. এঁটোনা	ধান কাটার পর শুকিয়ে গেলে সেগুলিকে বিশেষ পদ্ধতিতে বাঁধা হয়। এই পদ্ধতিটিকে এঁটোনা বলে।
৫. পন	৮০ আঁটি ধানে এক পন।
৬. কাহন	১৬ পন ধানের আঁটিতে এক কাহন হয়।
৭. জাঙি দেওয়া	গোরুর গাড়িতে বোঝাই করার আগে আঁটি সহ ধানকে এক জায়গায় জড়ো করা।
৮. ভিতে কাটা	জমির আল বরাবর চারদিকে কোদাল দিয়ে কেটে ঘাস বা আগাছা পরিষ্কার করা।
৯. রোয়া	ধান রোপণ করা।
১০. বীজ ভাঙা	বীজতলা থেকে ধানের চারাগাছকে সংগ্রহ করার বিশেষ পদ্ধতি।
১১. মই দেওয়া	লাঙল দেওয়ার পর বিশেষ পদ্ধতিতে গোরুর সাহায্যে এলোমেলো মাটিকে সমান করা।
১২. পুয়াল বা পুয়োল	ধান মাড়াইয়ের সময় আঁটি থেকে ধান গাছের যে অংশগুলি বিক্ষিপ্ত হয়ে যায় সেগুলিকে পুয়াল বলে।
১৩. লাড়াগজা	ধান কাটার পর জমিতে তথা মাটিতে গেঁথে থাকা মূল সহ ধান গাছের অবশিষ্ট অংশ।
১৪. বিচালি	খড় দিয়ে বিশেষ পদ্ধতিতে তৈরি দড়ি। বিভিন্ন শস্য বাঁধার কাজে ব্যবহৃত হয়।

১৫. হালপায়না	লাঙল দেওয়ার সময় এবং গোরুর গাড়ি চালানোর সময় বলদ গোরুকে নির্দিষ্ট পথে পরিচালিত করার জন্য ব্যবহৃত লাঠি।
১৬. ভুঁড়ো (Row)	যে সমান্তরাল পঙ্ক্তির মধ্যে আলুর বীজ পোঁতা হয়। এই ভুড়োর মাঝে মাঝে নালা থাকে জলসেচ দেওয়ার জন্য।
১৭. পাই	ধান রোয়ার জন্য একটি নিদিস্ট সারি। এক পাইয়ের মধ্যে ৫ থেকে ৬ গোছা চারা পোঁতা হয়।
১৮. কাদা করা	ধান রোয়ার আগে জমিতে লাঙল দিয়ে জমিকে কর্দমাক্ত ও নরম করে তোলা।
১৯. ইশ	লাঙলের মধ্যিখানে যুক্ত কাঠ বা বাঁশের লম্বা দণ্ড, যা জোয়ালের সঙ্গো সংযোগ রক্ষা করে।
২০. আঙড়	বাঁশের মোটা কঞ্চি ও দড়ির সাহায্যে লাঙল ও জোয়ালের সংযোগ ঘটানো হয়।
২১. পাসুনি	ছোটো কোদাল। এর সাহায্যে আলু জমিতে জল দেওয়ার জন্য নালা তৈরি করা হয়।
২২. সিওর	জমিতে সেচের জল দেওয়ার জন্য নালার গায়ে মাটির লম্বা স্তুপ।
২৩. কোল	ধানের একটি গাছের থেকে আরেকটি গাছের দূরত্ব
২৪. ঘোগ	আলের মধ্যে গোপন গর্ত। যার মধ্য দিয়ে জমির জল অন্য জমিতে চলে যায়।
২৫. লগিদ দেওয়া	রাসায়নিক সার ছড়ানো।
২৬. আঙড়ি	জমিতে ঘাস তোলার জন্য ছোটো কোদালের মত যন্ত্র।
২৭. আলু ঝিটা	কোনো যন্ত্রের সাহায্যে নালা থেকে জল নিয়ে আলু গাছের ওপর ছড়ানো।
২৮. ধাসালাগা	নাবি-ধ্বসার আক্রমণে আলুর অন্যান্য ফসল নষ্ট হয়ে যাওয়া।
২৯. আগড়া/আকড়া	শস্যবিহীন বা চালবিহীন ধানের খোসা।

এগুলি শুধু একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের ভাষা নয়। কৃষিকেন্দ্রিক বিভিন্ন অঞ্চলের গ্রামীণ সমাজের এই লোকভাষার প্রচলন রয়েছে। প্রান্তিক অঞ্চলের গ্রাম গঞ্জে কৃষিকাজ ও অন্যান্য পেশাকে কেন্দ্র করে অসংখ্য লোকশব্দ গড়ে উঠেছে। ক্ষেত্রসমীক্ষার মধ্য দিয়ে এই লোকশব্দগুলিকে উদ্ধার করে লোকভাষার শব্দভাণ্ডার বৃদ্ধি করা যেতে পারে।

উৎসের সন্ধানে

১. চূড়ামণি হাটি সম্পাদিত : 'লোকসংস্কৃতির দিক দিগন্ত' গ্রন্থবিকাশ, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ ২০০৯, পৃ. ১৪
২. তদেব : পৃ. ১৮
৩. তদেব : পৃ. ১৪
৪. পল্লব সেনগুপ্ত : 'লোক সংস্কৃতির সীমানা ও স্বরূপ', পুস্তক বিপণি, কলকাতা, পরিশীলিত ও পরিবর্ধিত চতুর্থ সংস্করণ, জানু ২০১৮, পৃ. ৩৪৭

লোকভাষার ভবিষ্যৎ

শ্যামসুন্দর প্রধান

খ্রিস্টপূর্ব চার হাজার বছর আগে, যখন বলার কথাগুলিকে লিখে রাখার কৌশল কিংবা পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়নি, মানুষ তখন মুখে মুখে যে সব ঘটনা ও কাহিনি ধরে রাখতো বংশ পরম্পরায়, তাই হলো লোকসাহিত্য বা মৌখিক সাহিত্য। এক কথায় 'লোকসাহিত্য' লোকজীবন ও মানস চর্চার সামগ্রিক শিল্পিত রূপ। লোকসাহিত্যে 'লোক' হলো কোনো ভৌগোলিক পরিমণ্ডলে অবস্থানকারী সামাজিক-সাংস্কৃতিক-অর্থনৈতিক জীবনচর্যায় বেড়ে ওঠা বা এগিয়ে চলা জনগোষ্ঠী। শিষ্ট সাহিত্যে লোকদের পরিচয় পাই অমিয় চক্রবর্তীর 'সংগতি' কবিতায়—

মোটর গাড়ির চাকায় ওড়ায় ধুলো,
যারা সরে যায়, তারা শুধু লোকগুলো[১]

পাশাপাশি তারাশঙ্করের 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'র 'কাহার পাড়ায়', মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়-এর 'পদ্মানদীর মাঝি'র 'জেলে' পাড়ায়, অদ্বৈত মল্লবর্মণ-এর 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসে 'মালোপাড়ায়', সতীনাথ ভাদুড়ীর 'ঢোঁড়াইচরিত মানস' উপন্যাসের 'তাৎমা'টোলিতে লোকেদের পরিচয় ধরা পড়েছে। এ কথার সূত্র ধরে বলা যায়, এই ক্ষয়িষ্ণু লোকেদের কিংবা তাদের জীবন-যাপনের জন্য একদিন আমাদের আফশোস করতে হবে। লোকেদের পরিচয় দিতে গিয়ে অ্যালান ডানডিসের (Alan Dundes) বক্তব্য পুরোপুরি গ্রহণীয় না হলেও একেবারে নিরর্থক নয়। তিনি বলেছেন—

> The term 'folk' can refer to any group of people whatsoever who share at least one common factor. It does not matter what the linking factor is-it could be a common occupation, language, or religion-but what is important is that a group formed for whatever reason will have some traditions which it calls its own.[2]

স্মরণ করা যেতে পারে, প্রতিটি জনগোষ্ঠী যখন প্রথম এসেছিল, তখন তারা নিয়ে এসেছিল তাদের নিজস্ব লোকভাষা—যার মধ্যে দিয়ে তারা কথা বলত, গান বাঁধত, রচনা করত লোককথা, উপকথা, কিংবদন্তি, ধাঁধা, ছড়া-প্রবাদ-প্রবচন। তারপর দীর্ঘ সহাবস্থানের ফলে অনেকের সঙ্গে সংমিশ্রণ ঘটায় একে অপরে গ্রহণ করেছে অন্যের ভাষা। তবে এখন আর প্রতিটি লোকভাষাকে আলাদা করে চিহ্নিত করার উপায় নেই। তবে জনবিন্যাসের গতিপ্রকৃতি লক্ষ করলে লোকভাষার হদিস পাওয়া যায়। এর ইতিহাস স্বাধীনতা-উত্তরকালে তেমনভাবে আলোচিত হয়নি। রাজনীতি কিছুটা অন্তরায় সৃষ্টি করেছে। কারা কখন এসেছিল বলা কঠিন।

তবে বেশিরভাগ লোকভাষাগুলি অস্ট্রিক, দ্রাবিড়, ভোট-চিনীয় এবং ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার পরিবারভুক্ত। ছোটো ছোটো পরিবারের বসতি স্থাপনের সঙ্গো সঙ্গো এর প্রচলন শুরু। সেকালে যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাবে স্বাতন্ত্র্য রক্ষিত হয়েছিল অনেকদিন। কালক্রমে জনসংযোগ বাড়তে থাকায় একে অন্যের প্রভাবাধীন হয়ে পড়ে। কাছাকাছি একই ভাষাভাষী অনেক পরিবার থাকার ফলে মাতৃভাষা লোকভাষার রূপ নেয়। পরবর্তীকালে লোকসাহিত্য ও লোকসংস্কৃতি লোকভাষাকে আরও দৃঢ় করে তোলে।

ভাষা মানুষের ভাব প্রকাশের প্রধান অবলম্বন। অতি প্রাচীনকালে মানুষ যখন ভাষা আবিষ্কার করতে শেখেনি, তখন তারা নানারকম ধ্বনি সৃষ্টি করে অথবা আকার ইঙ্গিতে মনের ভাব প্রকাশে সচেষ্ট ছিল। এই আকার-ইঙ্গিত থেকে তাদের কণ্ঠে ভাষা কী করে এলো তা নিয়ে ভাষাতাত্ত্বিকেরা বহুকাল থেকেই চিন্তা করে এসেছেন। মানবমনের এই আদিম প্রয়াস কালক্রমে ভাষা সৃষ্টির মাধ্যমে মনোভাব প্রকাশের দিগন্ত খুঁজে পেয়েছে—যা ক্রমে সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গো বিকাশশীল। এর ক্রমবিকাশের ইতিহাস বড়ো বিচিত্র। ভাষাবিজ্ঞানীরা বর্তমানকালে এর নানা রহস্য উদ্‌ঘাটন করেছেন। আমাদের দেশে সংস্কৃতকে মনে করা হয় দেবভাষা। অর্থাৎ এই ভাষা সৃষ্টির ব্যাপারে মানুষের কোনো ভূমিকা নেই। এ ভাষার স্বর ও ব্যঞ্জনধ্বনিগুলি মহেশের মুখ থেকে প্রথম উচ্চারিত হয়েছিল। কিন্তু এ সম্বন্ধে ভিন্ন মত পোষণ করেন আরেকদল ভাষাতাত্ত্বিক। তাঁদের মতে মানুষের জীবনযাত্রা প্রণালীর বিবর্তনের সঙ্গোই ভাষার আবির্ভাব জড়িত। তবে মনের ভাব অপরকে জানাবার প্রয়োজন কেবল মানুষেরই ঘটে না, মনুষ্যেতর নানা জীবেরও ঘটে থাকে। সঠিকভাবে বলতে গেলে মানুষ ছাড়া অন্য কোন জীবের ভাষা নেই। ভাষার তিনটি বৈশিষ্ট্য তার মৌলিক গুণ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে—১. অর্থযুক্ত ধ্বনি সমষ্টি, ২. মানুষের কণ্ঠোচ্চারিত, ৩. বহুজনবোধ্যতা। ভাষার এই বৈশিষ্ট্যগুলি স্মরণে রেখে এর সংজ্ঞা হিসেবে বলা যেতে পারে—মানুষের কণ্ঠোচ্চারিত বহুজনবোধ্য ও অর্থপূর্ণ ধ্বনিসমষ্টিই ভাষা। আবার এই ভাষা সম্প্রদায়ের লোকসংখ্যা খুব বেশি হলে এই ভাষার কিছু উপভাষার উদ্ভব অনিবার্য হয়ে পড়ে। শুধু অবস্থানগত দূরত্ব নয়, প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য এবং রাজনৈতিক কারণেও ভাষা উপভাষার মধ্যে পার্থক্য তীব্রতর হতে থাকে।

মানুষে মানুষে সংযোগের প্রধান মাধ্যম ভাষা। যখনই তারা একত্রিত হয়েছে তখনই প্রয়োজন দেখা দিয়েছে ভাব বিনিময়ের। হাতে-পায়ের মতো এটি কাজের সহায়ক হয়েছে। বস্তুকে চিহ্নিত করেছে, উদ্দেশ্যকে প্রকটিত করেছে, প্রকাশ করেছে হৃদয়ের অনুভূতিকে। অর্থাৎ ভাষা ছাড়া চিন্তার প্রসার অসম্ভব। সামাজিক বিকাশে এর ভূমিকা একদিকে যেমন অনন্য, তেমনি অন্যদিকে এর বিকল্প হতে পারে না। তাই নিজেদের মধ্যে অনিবার্য সংযোগ রক্ষা করতে গিয়ে গুহাবাসী অরণ্যচারী যূথবদ্ধ মানুষকে দায়ে পড়ে তৈরি করে নিতে হয়েছে কিছু অর্থবিশিষ্ট ধ্বনি, যেগুলির সঠিক বিন্যাসে গড়ে উঠেছিল আদিম গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষের মুখের ভাষা—যা প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল। ক্রমে চিন্তাকে লিখিত রূপ দিতে গিয়ে যখন লিপির উদ্ভব ঘটল তখন এর দু'টি স্পস্ট ভেদ গড়ে উঠল—লিখিত আর মৌখিক। একটু গভীরভাবে দেখলে বোঝা যায়, লিখিত ভাষার সুসংবদ্ধত রূপ থাকলেও তা আসলে মৌখিক ভাষারই একটি উদ্বর্তিত রূপ। ভাষার সর্বজনমান্য লেখ্য কিংবা মৌখিক রূপটি বহুতল বিশিষ্ট

ভাষা-অট্টালিকার সর্বোচ্চ স্তর, যা তার অলঙ্কৃত সৌধচূড়া স্বরূপ। এর নিচের তলে রয়েছে অনুমোদন-প্রাপ্ত উপভাষাগুচ্ছ—যারা অপেক্ষাকৃত কম প্রশস্ত অঞ্চলে সঞ্চরমান। তারও নিচের তলে অবস্থান করছে ক্ষুদ্রাঞ্চলভিত্তিক কথ্যউপভাষাগুলি। ভাষাতাত্ত্বিক ড. সুকুমার সেন যাদের নাম দিয়েছেন 'বিভাষা'। বর্তমানে একে কেউ কেউ ভ্রান্তিবশত 'লোকভাষা' বলতে শুরু করেছেন।

১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে লস্ এঞ্জেলেসে অনুষ্ঠিত ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজভাষাবিজ্ঞানের সেমিনারে হেন্‌রি হেনিগ্‌সোয়াল্‌ড যখন প্রথম folk languistics বিষয়ে অনুসন্ধান করার প্রস্তাব তুলে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন, তখন থেকে এর বাংলা পরিভাষাবিষয়ক একটি সমস্যা তৈরি হয়ে যায়।[৩] ইংরেজি Folklore-এর যথার্থ বাংলা প্রতিশব্দের যেমন অভাব, তেমনি Folk Language। (Folk Language কথাটি সম্ভবত জার্মান Volkssprache শব্দের অনুবাদ। জার্মানে তার মূল অর্থ উপভাষা।)-এর বাংলা শব্দ অভিধা কি হবে তা নিয়েও যথেষ্ট মত বিরোধ রয়েছে।[৪] এ ক্ষেত্রে Folk Language-এর বাংলা পরিভাষা হিসেবে 'লোকভাষা' শব্দটিকে মেনে নিলে গোল মিটে যেত, কিন্তু লোক (সাহিত্য)-বিদ ও ভাষাতত্ত্ববিদ উভয়েরই ধারণা যে, এই শব্দটি সম্পূর্ণ অর্থ ধারণে যথেষ্ট নয়, অথবা এর তাৎপর্য ভিন্ন। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথেরও দ্বিধা ছিল। ১৩৯২ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ মাসের 'সবুজ পত্র'-এ 'বাংলা ছন্দ' নামের একটি প্রবন্ধে তিনি বলেছিলেন—

> কিন্তু বাংলার অসাধু ভাষাটা খুব জোরালো ভাষা, এবং তাহার চেহারা বলিয়া একটি পদার্থ আছে। আমাদের সাধু ভাষার কাব্যে এই অসাধু ভাষাকে একেবারেই আমল দেওয়া হয় নাই; কিন্তু তাই বলিয়া অসাধু ভাষা যে বাসায় গিয়া মরিয়া আছে তাহা নহে। সে আউলের মুখে, বাউলের মুখে, ভক্ত কবিদের গানে, মেয়েদের ছড়ায় রহিয়াছে। কেবল ছাপার কালির তিলক পরিয়া সে ভদ্র-সাহিত্য সভায় মোড়লি করিয়া বেড়াইতে পারে নাই, কিন্তু তাহার কণ্ঠে গান থামে নাই, তাহার বাঁশের বাঁশি বাজিতেছেই।[৫]

এই একই ধরনের উক্তি তিনি অন্যত্রও করেছেন—

> এই প্রাকৃত বাংলা মেয়েদের ছড়ায়, বাউলের গানে, রামপ্রসাদের পদে, আপন স্বভাবে প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু সাধু ভাষায় তার সমাদর হয়নি বলে সে মুখ ফুটে নিজের সব কথা বলতে পারেনি এবং তার শক্তি যে কত তারও সম্পূর্ণ পরিচয় হল না।[৬]

বিভিন্ন সময়ে অসাধু বাংলা, প্রাকৃত বাংলা প্রভৃতি পারিভাষিক শব্দ ব্যবহারে সে কথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। পশ্চিমদেশে folk language বলতে সাধারণভাবে বোঝায় গেঁয়ো ভাষা, অর্থাৎ যে-ভাষা নাগরিক, মার্জিত বা স্ট্যান্ডার্ড নয়। ভাষাবিজ্ঞানী ড. পবিত্র সরকারের মতে, লোকভাষা (folk language) কোনো বিশেষ অঞ্চলের উপভাষা নয়। আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানে একে কখনও কখনও rural language বলা হয়। তবে অনেকে মনে করেন গ্রামীণ অঞ্চল বিশেষের উপভাষাই লোকভাষা। তবে তা নয়, ভাষায় সাধারণভাবে গ্রামীণতার যে-লক্ষণগুলিকে শহরের লোক আলাদা করে চিহ্নিত করে সেগুলিই লোকভাষা। ড. সরকার তাঁর 'লোকভাষা লোকসংস্কৃতি' গ্রন্থে folk language-এর বাংলা পরিভাষা হিসেবে 'লোকভাষা' শব্দটি ব্যবহার না করে রবীন্দ্রনাথের প্রায় অনুসরণে 'গ্রাম্যভাষা' শব্দটি ব্যবহার করার পক্ষে মত দিয়েছেন।[৭] এখানে গ্রাম্য কথাটির মধ্যে কোনো নিন্দা বা অবজ্ঞার প্রশ্ন নেই, যা নাগরিক

বা শহুরে নয়, তা-ই গ্রাম্য। তবে মৃণাল নাথ পবিত্র সরকারের মতের আপত্তি জানিয়েছিলেন। সুধীরকরণ একে 'লোকভাষা' ও কামিনী কুমার রায় একে 'লৌকিক শব্দ' রূপে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন। অভিধানগত অর্থে অবশ্য লোকমুখের ভাষা মাত্রেই 'লোকভাষা'।

লেনার্ড ব্লুমফিল্ড তাঁর Language গ্রন্থে ভাষা সৌধের পাঁচটি তলের কথা জানিয়েছিলেন— মান্যসাহিত্যিক ভাষা (Literary Standard), মান্য চলিত ভাষা (Colloquial Standard), প্রাদেশিক মান্য ভাষা (Provincial Standard), গ্রাম্যভাষা (Substandard) এবং আঞ্চলিক উপভাষা (Local dialect)[৮]। অন্যদিকে জন কেনিয়ান[৯] ভাষার ব্যবহারিক সূত্র ধরে আটপৌরে অ-মান্য ভাষা বলতে গ্রাম্যভাষা ও উপভাষা দুই-এর কথা বলেছেন। ভাষাবিজ্ঞানী মারিয়ো পেই গ্রাম্যভাষাকে national slang হিসেবে ব্যবহৃত করেছেন।[১০] কিন্তু তা সত্ত্বেও বলা যায় গ্রাম্যভাষা কোনো একটি নির্দিষ্ট উপভাষা নয়। তা নানা উপভাষার অ-নাগরিকতার বিচিত্র লক্ষণের সরলীকৃত সমাবেশ মাত্র। গ্রামে মানুষেরা নিজেদের ভাষাকে লোকভাষা বা গ্রাম্যভাষা হিসেবে জানে না; তারা যা বলে সেটাই তাদের স্বাভাবিক ও জন্মসিদ্ধ ভাষা। বাংলা ভাষার লোকভাষা বা গ্রাম্যভাষা বলতে অন্তত পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যত দক্ষিণ ২৪ পরগনা অঞ্চলের উপভাষা ভিত্তিক একটি আদর্শায়িত ভাষারূপ বোঝায়—যার মূলে আছে মনোজ মিত্র, মোহিত চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ নাট্যকারদের নাটকের প্রভাব।

বাচিক প্রকাশের সামাজিক দিকটি স্মরণে রেখে আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানীগণ যে কোনো ভাষার তিনটি স্তরের কথা স্বীকার করেন থাকেন—শিষ্ট ভাষা (Cultivated Speech), জনভাষা (Common Speech) এবং লোকভাষা (Folk speech)[১১]। শিষ্টভাষা হলো শিক্ষিত, শহুরে এবং মধ্যবিত্ত বা উচ্চবিত্তের পরিশীলিত ভাষা, আর লোকভাষা হলো বিভিন্ন কারণে বিচ্ছিন্ন গোষ্ঠী, সম্প্রদায় বা কৌমজনের ভাষা। কিন্তু একটি বিশেষ গোষ্ঠীর মধ্যে সীমিত হলেও তার মধ্যে একটি সার্বজনীন মনস্তত্ত্ব ফুটে ওঠে। যা তাকে বিশ্বজনীন লোকসংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত করে। বিশ্বজনীনতাই লোকভাষাকে শিষ্ট সাহিত্য ধারায় অনুপ্রবেশের সুযোগ দিয়েছে।

ফ্রান্স ও জার্মানিতে বিজ্ঞানসম্মত কথ্যভাষার গবেষণা এতদূর অগ্রসর হয়েছিল যে, তাঁরা লোক সম্প্রদায়ের ভাষায় ব্যবহৃত বহুবিধ রূপ ভৌগোলিক অবস্থাভেদে যে পৃথক, তা বোঝাতে Dialect Atlas প্রস্তুত করেছিল। আমাদের দেশে এমন উদ্যোগ নেই। তাই কথ্যভাষা বা লোকভাষা সম্পর্কে বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণ আজও সম্ভব হয়নি। তবে লোকভাষার প্রকৃত সংজ্ঞা কি—এ নিয়ে চলেছে নানা মত। কেউ কেউ বলেছেন লোকভাষা লোকসাধারণের ভাষা। আবার কেউ কেউ মত প্রকাশ করেছেন—লোকভাষা লোকসাহিত্যের ভাষা। এ দু'টি মতকে অগ্রাহ্য করে বলা যায় লোকভাষা লোকমানসের প্রকাশের ভাষা। লোকসাহিত্যের ভাষা সম্পর্কে ড. সুকুমার সেন বলেছিলেন, যা খাঁটি লোকভাষা তার ভাষা ছাঁদ যে মুখের ভাষা, যাকে 'কথ্য ভাষা' বলে, এবং সে ভাষায় যে স্থানীয় বিশেষত্ব থাকবে একথাও স্বতঃসিদ্ধ। ভাষাতাত্ত্বিক ড. সেনের এই মন্তব্য থেকে বোঝা যায় লোকভাষা আঞ্চলিক উপভাষারই প্রকারভেদ। তা সত্ত্বেও একে উপভাষার সঙ্গে এক করে দেখা হয়নি। অর্থাৎ উপভাষা ও লোকভাষা এক নয়। এর পার্থক্যগুলি হলো[১২]—

১. ভাষিক প্রয়োগের ক্ষেত্রে লোকভাষার কোনও আঞ্চলিক গণ্ডিবদ্ধতা নেই, যেমনটি আছে উপভাষার।
২. উপভাষায় একটি ব্যক্তিক রূপ আছে, যাকে বলে নিভাষা। কিন্তু লোকভাষার ক্ষেত্রে এমন কোনো ব্যক্তিক রূপ থাকতে পারে না। যদি থাকে তা হলে তা উপভাষাগত উপাদানের পরিবর্তন মাত্র।
৩. সামাজিক স্তরে উপভাষার কোনও মর্যাদা নেই। তবে কোনো কোনো উপভাষার সঙ্গে লোকভাষার যোগ থেকে যায়। কিন্তু লোকভাষার স্থান উপভাষার চেয়ে একধাপ নিচে।
৪. উপভাষার চলমানতার সবকটি ধর্ম (মান্যায়ন, স্বয়ংভরতা, ঐতিহাসিকতা এবং সজীবতা) লোকভাষায় স্পষ্ট নয়।

সমাজ ভাষাবিজ্ঞানের নিরিখে লোকভাষাও (Folkspeech) এক সমাজ উপভাষা (Sociolect)।[১৩] বিভিন্ন কারণে বিচ্ছিন্ন গোষ্ঠী, সম্প্রদায় বা উপজাতির মধ্যে লোকভাষা ধারাবাহিক সূত্রে জীবিত থাকে। এই ভাষা শহুরে সংস্কৃতির প্রভাবে কিংবা মান্য বা শিষ্ট ভাষার চাপে ক্ষীয়মাণ। তবুও লোকভাষা ভাষীদের সমাজ আনুগত্য কিংবা গোষ্ঠীসত্তার জোরে উচ্চতর সমাজের সঙ্গে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে সমর্থ হয়েছে। আসলে লোকভাষা গোষ্ঠী যতটা ভাষিক ঐক্য গড়ে তোলে, তার চেয়ে বেশি গড়ে তোলে সামাজিক ঐক্য।

ভাষা ছাড়া মানুষের জীবন অচল, এই অর্থে সে ভাষাজীবী। অভিব্যক্তিবাদের নিয়মে মানুষ স্বাভাবিকভাবে এই ভাষাকে অর্জন করেছে। মস্তিষ্কের অভ্যন্তরীণ গঠনভাগের সহজাত বিধান ও তার বিবর্তনে মানুষ পেয়েছে ভাষা সৃষ্টির স্বভাবসিদ্ধ বা প্রাকৃতিক ক্ষমতা। তাই মানুষ যত, ভাষাও তত। তা ছাড়া মানুষ যে পরিবেশে বড় হয়ে ওঠে, তাই হয় যেমন তার মাতৃভাষা তেমনি প্রয়োজনে নিজের পরিবেশের বাইরেও আসতে হয় তাকে। তখন তার ভাষা-বোধ ও ব্যবহারে বিস্তার ঘটে। ভাষা-ব্যবহার ক্ষমতা ও প্রয়োগ রীতি নিয়ে ফার্দিনান্দ দ্য স্যসুর থেকে চমস্কি পর্যন্ত বা তার পরেও অনেকে এর বহু তাত্ত্বিক বিস্তার ঘটিয়েছেন। সাধারণ মানুষ একটি ভাষারূপকে পারস্পরিক সংযোগ রক্ষার উপায় বা মাধ্যম রূপে ব্যবহার করে থাকেন। স্থানীয় ভাষাকে তার বহিরঙ্গী রূপবৈচিত্র্যে অনেকে ছোট ভাষা, মেঠো ভাষা, গ্রাম্য ভাষা (গেঁয়ো ভাষা), আঞ্চলিক ভাষা, লৌকিক ভাষা, প্রাদেশিক ভাষা, মৌখিক ভাষা, উপভাষা প্রভৃতি নামে চিহ্নিত করেন, যার বিপরীতে থাকে মান্য ভাষা, সাধু ভাষা, লিখিত ভাষা ইত্যাদি। অভিধানে এর কিছু কিছু উল্লেখ থাকলেও ব্যাখ্যা থাকে না। সাম্প্রতিককালে এর সঙ্গে আরও কিছু শব্দ পরিচিতি লাভ করেছে। আশিস কুমার দে এরকম একটি ভাষার নাম দিয়েছেন 'জনভাষা'[১৪]। অনিমেষকান্তি পাল এ ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ কথিত 'প্রাকৃত ভাষা'-র পুনর্ব্যাখ্যা করেছেন এবং রবীন্দ্রনাথের অস্পষ্ট ইঙ্গিতের সাহায্যে এবং "'লোকভাষা' সম্পর্কে মতৈক্য না থাকায়, বর্ণনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এ ভাষার নাম 'লোকসাহিত্যের ভাষা'[১৫] প্রস্তাব করেছেন। এই ভাষার সাধারণ প্রবণতা ও বৈশিষ্ট্যগুলি[১৬] হলো—

১. লোকসাহিত্যের ভাষার চতুঃস্তরীয় বিভাগের (ধ্বনিতত্ত্ব, রূপতত্ত্ব, বাক্যরীতি ও শব্দভাণ্ডার) মধ্যে বাক্যরীতি ও শব্দভাণ্ডারের আলোচনাই মুখ্য; অর্থাৎ তাদের ভাষার পরিবর্তন দ্বিমাত্রিক—আঞ্চলিক ও সমাজ-মনস্তাত্ত্বিক।

২. লোকসাহিত্যের ভাষা মূলত কথ্য ভাষাভঙ্গিকেই আশ্রয় করে থাকে এবং চলমান জীবনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে তা পাল্টে যায় সহজেই।

৩. কথ্য ভাষারীতিকে আশ্রয় করার জন্য বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের আঞ্চলিক ভাষা বা উপভাষার সঙ্গে লোকভাষার একটা যোগ অনুভব করা যায়। যদিও উপভাষা ও লোকভাষা একই ঔপভাষিক লক্ষণযুক্ত।

৪. আঞ্চলিক ভাষার সঙ্গে লোকভাষার অন্তর যোগ থাকলেও এর ভাষায় লোকসমাজ ও লোকসংস্কৃতির প্রভাব সক্রিয় শক্তি হিসেবে কাজ করে।

৫. ভাষার অবয়ব ও সমাজের সাংগঠনিক রূপের মধ্যে দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক স্পষ্ট বলে লোকসাহিত্যের ভাষায় যেমন আঞ্চলিক লক্ষণ পরিস্ফুট, তেমনি জাতি-ধর্ম-লিঙ্গ-বৃত্তি ইত্যাদি জনিত সামাজিক পার্থক্যও সুচিহ্নিত।

ভাষার লেখ্য ও কথ্য রূপ নিয়ে কোনও অস্পষ্টতা নেই। আগে সাধু ভাষাকে লেখ্য ভাষা মনে করা হত, অসাধু ভাষাকে নয়। সাধু ভাষার ধর্মই আলাদা যার সঙ্গে লোকজ ভাষার কোনও যোগ নেই। সৎসাহিত্য, ধর্মগ্রন্থ, শিলালিপি, তাম্রলিপি ও অন্যান্য দলিল-দস্তাবেজ, সংবাদপত্র এবং আনুষ্ঠানিক লেখা পত্র প্রভৃতির ভাষাই লেখ্য ভাষা। অপরাপর ভাষাগুলি মৌখিক বা কথ্য ভাষার বিভিন্ন রূপ। এই ভাষা ত্রিবিধ সমস্যার জালে আক্রান্ত—

১. প্রথম সমস্যাটি হলো ভাষাটি লোকব্যাপ্ত কিনা। অনেকে এর মধ্যে আধুনিকতার চেয়ে গ্রামীণতার ভাবটি দেখে একে শহরের ভাষা থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখেন। ফলে অনেকে এই ভাষাকে জনসংযোগী ভাষা হিসেবে মানতে চান না। অন্যদিকে তৃতীয় একটি ভাষা জনভাষা সৃষ্টি হওয়ায় লোকভাষাকে আঞ্চলিক ভাষার গেঁয়ো রূপ বলে মনে করেন।

২. দ্বিতীয় সমস্যাটি হলো ভাষাটির ব্যাপ্তি নিয়ে। জার্মান শব্দ Volksprache ও ইংরেজি Folkspeech শব্দের মধ্য দিয়ে আদিতে সেখানকার মেঠো বা উপভাষাকেই বোঝানো হতো, যার মধ্যে অবজ্ঞা বা হেয় ভাবটি যুক্ত। ক্রমে এর অর্থের উন্নতি ঘটায় এবং রবীন্দ্রনাথের স্পর্শে তা স্বীকৃতি লাভে সমর্থ হয়েছে। লোকভাষাকে খুঁজতে হলে যেতে হবে অ-মান্য পরিবেশে কিংবা অ-নাগরিক অবস্থানে, যেখানে লোকও থাকবে, ভাষাও থাকবে। পবিত্রবাবুর মতে শহরের শিষ্ট ভাষার বিপরীতে এর স্থান হলেও উপভাষার সঙ্গে এর সহবস্থান। আশিস কুমার দে এর সঙ্গে যুক্ত করেছেন এই ভাষা 'শিষ্টভাষা' ও 'জনভাষা'-র মধ্যবর্তী কিন্তু গ্রাম্য মানুষের বৈশিষ্ট্যবহ। উভয়েই একে উপভাষার একটি রূপ মনে করলেও আসলে এটি অঞ্চল বিশেষের উপভাষা নয়। আশিস কুমার দে একে 'আঞ্চলিক উপভাষার' প্রকারভেদ বলে উল্লেখ করলেও পবিত্রবাবুর অবস্থান ছিল সামান্য পৃথক।

৩. তৃতীয় সমস্যাটি হলো লোকসাহিত্যের ভাষা নিয়ে। অনেকে লোকভাষাকে লোকসাহিত্যের ভাষার কাছাকাছি মনে করেন। অর্থাৎ লোকসাহিত্যের ভিত হল লোকভাষা।

মনিরুজ্জামান তাঁর 'উপভাষা' (১৯৯৪) গ্রন্থে ভাষা বা উপভাষার পুনঃশ্রেণিকরণের মাধ্যমে লোকভাষার অবস্থানকে ত্রিস্তরীয় রীতিতে ভাববার প্রস্তাব দিয়েছেন। এই শ্রেণিকরণের

পাশাপাশি Linguistic Atlas of the United States and Canada নামক জরিপটি ভাষার তিনটি শ্রেণি বিভাগের (Cultivated speech, Common speech এবং Folk speech) উপর গুরুত্ব দিয়েছিল। কিন্তু এই শ্রেণিকরণের ভিতটি খুবই দুর্বল। ফলে লোকভাষা বিশেষ কোনো স্তরে বিধিবদ্ধ ভাষা নয়। কারণ এই ভাষার কোনো ব্যাকরণগত পরিচয় নেই। তাই যত মত তত পথের মত যত লোক তার তত ভাষা। একক ভাবে একে বিশেষ কোনো পর্যায়ে ফেলা না গেলেও লোকভাষার রূপটি কিন্তু বহুমুখী। নির্মলেন্দু ভৌমিক উপভাষার বিপরীতে 'লোকভাষা'-কে মেনে নেওয়ার পেছনে মনস্তাত্ত্বিক কারণটি হলো—'Folk speech' এবং উপভাষা কিন্তু সর্বাংশে এক নয়। অনেকের ধারণা এ দুটি অভিন্ন, কিন্তু তা ভুল। দুই-এর মধ্যে অনেকটা মিল থাকলেও সর্বত্র তা নয়। উপভাষা মূল ভাষার সঙ্গে একটি যোগ রক্ষা করে চলে, কিন্তু লোকভাষা লোকমনস্তত্ত্বকেই ফুটিয়ে তোলে। তাঁর আলোচনায় 'লোকমনস্তত্ত্বের' কথা বারবার এলেও তার বিশেষ ব্যাখ্যা তিনি দেননি, কিন্তু লোকভাষার বিশেষত্ব বা লক্ষণ প্রসঙ্গে কিছু বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছেন। তিনি এর সঙ্গে যোগ করেন ছড়ার ভাষাভঙ্গি বিচার করতে হবে উপভাষার আলোকে নয়, লোকভাষার নিরিখে। অজিত কুমার চক্রবর্তী লোকভাষাকে প্রাচীন ভাষা ও প্রাকৃত ভাষার সঙ্গে মিলিয়ে দেখেছেন এবং শিষ্ট, সংস্কৃত ভাষাগুলির বিপরীতে তার অবস্থানকে নির্দেশ করেছেন। লোকভাষা রুচির বিচারে কিছুটা স্থূল এবং অমার্জিত, কারণ এর ক্ষমতা সীমিত। এতে জ্ঞান বিজ্ঞান ও দর্শনের গূঢ় তত্ত্ব এবং সত্য সর্বতোভাবে উদ্‌ঘাটন সহজ নয়। তবুও মানুষের দৈনন্দিন জীবনে বা লোকজীবনে যে সব ব্যবহারিক সত্যের সাক্ষাৎ ঘটে তার প্রকাশ যেমন এই জটিলতাহীন লোকভাষাতেই অমোঘ হয়ে ওঠে তেমনি সেই সব সত্যও হয়ে ওঠে কালজয়ী। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের অভিজ্ঞতালব্ধ ডাক ও খনার বচন, প্রবাদ, ছড়া, লোকগীতি, রূপকথা প্রভৃতি মুখে মুখে দীর্ঘকাল ধরে দৃঢ়মূল, কারণ এ ভাষার বাহন লোকভাষা। বাউল, পীর, নৌকার মাঝি কিংবা বনে-জঙ্গলে কাঠ, মধু সংগ্রহকারীরা লৌকিক দেবদেবীদের উদ্দেশ্যে নিবেদিত সহজ সরল অলংকারহীন মন্ত্রগুলিও লোকভাষায় রচিত—যা কালের সীমা পেরিয়ে চিরস্থায়ী হয়েছে। পাশাপাশি লোকজীবনের সার্বিক উন্নয়ন, শিক্ষার সর্বব্যাপী প্রসার, অর্থনৈতিক-সামাজিক-রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রচলিত লোকভাষা খুব সূক্ষ্মভাবে লোকচক্ষুর অগোচরে বদলে যেতে পারে। তবে এর পরিবর্তন হলেও বোধহয় জীবন ও জনমানসের ভাবকল্পনার অভিজ্ঞতার প্রচারক এক ধরনের লোকভাষা থেকেই যায় লোকমানসের মনে।

সবশেষে বলা যায় লোকভাষা যেমন উপভাষা থেকে একেবারে পৃথক নয় তেমনি লোকসাহিত্য কিংবা মার্জিত বা সংস্কৃত ভাষার সঙ্গেও এর অঙ্গাঙ্গি সম্পর্ক নেই। তবে লোকভাষার কোন সার্বিক চরিত্র আবিষ্কার করা সহজ নয়। তা সত্ত্বেও লোকভাষার কিছু বিশিষ্টতা চোখে পড়ে—

১. শব্দ উচ্চারণের ক্ষেত্রে ধ্বনিগত বিকারের প্রাধান্য।
২. অপ্রচলিত লোকমুখের ভাষা লোকভাষায় যথেষ্ট প্রয়োগ করা হয়।
৩. ক্রিয়াপদে আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য এই ভাষায় অত্যন্ত বেশি। যেমন—পিঁধে > পরিধান করে, ফেলেছে > ফেলাঁইছে।

৪. লোকভাষায় প্রচুর নামধাতুর প্রয়োগ ক্রিয়াপদকে শক্তিশালী করেছে। অনেক সময় নামধাতু উপভাষা থেকে অপহৃত হলেও স্বতন্ত্র নামধাতুর প্রয়োগও লক্ষ করা যায়।

৫. লোকভাষায় প্রচুর কুসংস্কারজাত শব্দ ও গ্রাম্য Slang Word ব্যবহৃত হয়। এইভাবে শব্দ প্রয়োগের ক্ষেত্রে লোকভাষা যে সর্বদা উপভাষাকে অনুসরণ করে না তার পরিচয়ও পাওয়া যায়।

৬. 'ও'-কারের স্থলে 'অ' ও 'উ'-কারের প্রয়োগ লোকভাষায় লক্ষ করা যায়। যেমন— লোক > লোক।

৭. লোকভাষায় গ্রামীণ প্রবাদ-প্রবচনের বহুল ব্যবহার লক্ষ করা যায়। যেমন—"ভাত দেয় কি ভাতারে/ভাত দেয় মোর গতরে।"

৮. লোকভাষায় বিদেশি শব্দের প্রয়োগও লক্ষ করা যায়। যেমন—ডিজেল > ডিজল

৯. প্রচলিত তদ্ভব ও তৎসম শব্দগুলি লোকভাষায় বিকৃতি লাভ করেছে। যেমন— জ্যোৎস্নাগ্ন জ্যুৎস্না, বুড়াগ্ন বুহুড়া, ইঁদুরগ্ন উঁদুর।

ভাষায় এমন একটা জীবন্ত বহতা স্রোতের গভীর পরিবর্তনশীলতা লক্ষ করা যায়, যা নিয়ত ভাষা প্রবাহকে ভাঙাগড়া উত্থান-পতনের ভেতর দিয়ে পরিবর্তিত করে। এ বিষয়ে সাধারণ মানুষের সচেতনতা খুব একটা চোখে পড়ে না। তাহলেও ঐতিহ্যস্বরূপ এই ভাষাকে ধরে রাখা খুবই দরকার। না হলে কালের স্রোতে একদিন তা হারিয়ে যাবে।

সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় লোকভাষাগুলি সংরক্ষিত হলেও পুঁজিবাদী কাঠামোয় এগুলি বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। ব্যবসায়ীরা ভাষাবিদ্‌ নন, সাহিত্য-সংস্কৃতির ব্যাপারেও মাথা ঘামান না। বড়ো বড়ো কয়েকটি ভাষা থাকলেই তাদের চলে যায়। লোকভাষাগুলি তাদের কাছে অন্তরায় হিসেবে দেখা দেয়। বর্তমানে এক ভাষা, এক দেশ, একতা—এই নীতিরই সৃষ্টি। এই ধারণা নগরকেন্দ্রিকতার দিকে প্রভাবিত। ভাষার একতান্ত্রিকতা এর অবশ্যম্ভাবী ফল। অপরপক্ষে, গ্রামীণ মানুষেরা মনের কথা বলে লোকভাষাতেই। লোকসংস্কৃতি ও লোকসাহিত্যের বিকাশ ঘটেছে এতেই। শিষ্ট সাহিত্য, সাহিত্য এবং সংস্কৃতির উপাদান জুগিয়েছে এগুলিই। বিমূর্ত জীবনের অনেক কাছকাছি বলেই এগুলি প্রাণরসে উচ্ছলিত। ভারতীয় সংস্কৃতির মূল শিকড় রয়েছে এখানেই। উৎপাদনে যাঁরা কায়িক শ্রম দেন, তাঁরা লোকভাষা, লোকসংস্কৃতিরই শরিক। নগরমুখী বণিকসভ্যতার শোষণব্যবস্থায় এসবের মর্যাদা নেই।

শুধু আলোচনা নয়, লোকভাষার উপাদান সংগ্রহের ক্ষেত্রে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। যেহেতু লোকভাষার সুনির্দিষ্ট ব্যাকরণ কাঠামো নেই, তাই সংগৃহীত উপাদানের উপর নির্ভর করেই ভাষার প্রকৃতি বিচার করতে হয়। এরূপ ক্ষেত্রে সংগ্রহ যদি নির্ভুল না হয় তবে লোকভাষার বিকৃতি কিংবা অর্থগত বিপর্যয় ঘটতে পারে। তাই লোকভাষার প্রকৃত স্বরূপ বিচারের জন্য ক্ষেত্র সমীক্ষা বা Field Work-এর প্রয়োজন যথেষ্ট। সমীক্ষাকার্যে লোকভাষা যাতে অধিকৃতভাবে, রূপগত ও অর্থগত স্বাতন্ত্র্য সমেত সংগৃহীত হয় সেদিক থেকে কয়েকটি সতর্কতা প্রয়োজন। যেমন—

১. লোকমুখে লোকসাহিত্যের ভাষা নির্ভুলভাবে শোনা ও তাকে প্রকাশযোগ্যভাবে লিখে রাখা।

২. প্রয়োজনে টেপরেকর্ডার যন্ত্রের সাহায্য গ্রহণ।
৩. স্থানীয় সহায়কের সাহায্যে ভাষার শব্দার্থ জেনে নেওয়া।
৪. উচ্চারণ স্বাতন্ত্র্য ধরে রাখার জন্য ধ্বনি সংকেত ব্যবহার করা।

উৎসের সন্ধানে

১. বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত : 'আধুনিক বাংলা কবিতা'; এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রা. লি., কলকাতা, প্রথম প্রকাশ-জুলাই, ১৯৪০; পঞ্চম সংস্করণ (পরিবর্তিত) সেপ্টেম্বর, ১৯৭৩, পৃ. ৯৪-৯৫
২. Alan Dundes : 'The Study of Folklore', University of California at Berkeley, Prentice-Hall, Inc. Englewood Cliffs, N.J, 1965, P. 2
৩. পবিত্র সরকার : 'লোকভাষা লোকসংস্কৃতি', চিরায়ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ৭৩, প্রথম প্রকাশ, এপ্রিল, ১৯৯১, পৃ. ১৪২
৪. মনিরুজ্জামান : 'লোকসাহিত্যের ভিতর ও বাহির' ৩৮/২-ক বাংলাবাজার; ঢাকা ১১০০; প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি, ২০০০; দ্বিতীয় সংস্করণ-স্বপ্টেম্বর, ২০০২, পৃ. ১১২
৫. অনিমেষকান্তি পাল : 'লোকসংস্কৃতি', প্রকাশনা; এম ১২ শরৎপল্লী; মেদিনীপুর, প্রথম প্রকাশ-জানুয়ারী, ১৯৯৬; পৃ. ১১৫
৬. তদেব : পৃ. ১১৬
৭. পবিত্র সরকার : 'লোকভাষা লোকসংস্কৃতি' ওই, পৃ. ১৪৩
৮. তদেব : পৃ. ১৪৬
৯. তদেব : পৃ. ১৪৬
১০. তদেব : পৃ. ১৪৭
১১. সনৎকুমার মিত্র সম্পাদিত : 'লোকসংস্কৃতি গবেষণা' (ত্রৈমাসিক পত্রিকা–মাঘ-চৈত্র, ১৪০৩), লোকসংস্কৃতি গবেষণা পরিষদ, পশ্চিমবঙ্গ, কলকাতা, পৃ. ৩৭৪
১২. লোকশ্রুতি (ষষ্ঠ সংখ্যা/মার্চ ১৯৯০), পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য লোকসংস্কৃতি পর্ষদ; তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ; পশ্চিমবঙ্গ সরকার; পৃ. ৮
১৩. তদেব : পৃ. ৮
১৪. মনিরুজ্জামান : 'লোকসাহিত্যের ভিতর ও বাহির', ওই, পৃ. ১১৪
১৫. তদেব : পৃ. ১১৪-১১৫
১৬. লোকশ্রুতি (ষষ্ঠ সংখ্যা/মার্চ ১৯৯০), পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য লোকসংস্কৃতি পর্ষদ, ওই, পৃ. ১০
১৭. মনিরুজ্জামান : 'লোকসাহিত্যের ভিতর ও বাহির' ওই; পৃ.- ১২৭-১২৯ (সুধীর করণ ১৯৭৮ : ৪৯-৫৩ পৃষ্ঠা)

পূর্ব মেদিনীপুরের উপকূলবর্তী এলাকার কিছু আঞ্চলিক শব্দ বিলুপ্তির পথে

নীলোৎপল জানা

ভারতবর্ষের মানচিত্রের দিকে তাকালে দেখা যায়, পূর্ব মেদিনীপুরের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে ওড়িশা রাজ্যের সীমারেখা, পাশেই হিন্দি ভাষা অধ্যুষিত রাজ্য ঝাড়খণ্ড, বিহার। ফলে পূর্ব মেদিনীপুরের উপকূলবর্তী এলাকার বাংলা ভাষার সঙ্গো ওড়িয়া, হিন্দি ও পোর্তুগিজ ভাষার সহজ মিশ্রণে এক নতুন ধরনের আঞ্চলিক ভাষা ও শব্দের সৃষ্টি হয়েছে যা পূর্ব মেদিনীপুরের অন্য অঞ্চলের ভাষা থেকে আলাদা। যেমন—ওড়িয়া ও পোর্তুগিজ ভাষা প্রভাবিত অঞ্চলের মানুষ ইঁদুরকে বলে 'মুশা', প্রদীপকে বলে 'চেরাক' ইত্যাদি।

হাজার হাজার বছর ধরে চলছে ভাষার সংমিশ্রণ ও বর্জন। এছাড়া বহু জনগোষ্ঠীর মানুষ দীর্ঘদিন ধরে এইসব এলাকায় বাস করছে, যেমন—মাঝি, সাঁওতাল, শবর প্রমুখ। এদের মুখের ভাষা এলাকায় প্রচলিত হয়েছে। এইভাবে অসংখ্য শব্দ এইসব এলাকার মানষের মধ্যে প্রচলিত হয়েছে, যেমন 'হিটমা' (হিটিম = কচ্ছপ) বা পারসি শব্দ 'কুঁই' হয়েছে 'কইনাড়ী' (শালুক)। আবার ওড়িশার মানুষের সঙ্গো বৈবাহিক কারণ বা যাতায়াতের কারণে বহুল ওড়িয়া শব্দের আমদানি ঘটেছে। যেমন—আজা, মাউগ, আই ইত্যাদি। এইসব এলাকার জঙ্গাল সাফ করার জন্য বিহারী ও হিন্দুস্থানী জনমজুর আনা হয়েছিল, ফলে তাদের লোকভাষা এলাকায় ছড়িয়ে পড়েছে বলে ধরা হয়, যেমন—পানি, সামসা ইত্যাদি। এইসব আগন্তুক আঞ্চলিক শব্দ এ অঞ্চলে এসে আরও পরিবর্তিত হয়ে নতুন এক আঞ্চলিক ভাষার সৃষ্টি করেছে।

পূর্ব মেদিনীপুরের উপকূলবর্তী এলাকা বিশেষ করে দীঘা, কাঁথি, জুনপুট, শঙ্করপুর, দরিয়াপুর, খেজুরী, নন্দীগ্রাম ইত্যাদি স্থান আজ আর আঞ্চলিকতায় বন্দি নয়। গত কুড়ি বছরের মধ্যে এইসব এলাকায় ব্যাপক ভাষাগত পরিবর্তন ঘটেছে। কারণ, এখন যোগাযোগ ব্যবস্থা ভালো হওয়ার ফলে বাংলা তথা ভারতবর্ষের বহু মানুষ এ অঞ্চলে বেড়াতে আসছে এবং তাদের মান্য ভাষা এইসব স্থানে ছড়িয়ে পড়ছে। তাই এখানকার আঞ্চলিক শব্দের অবলুপ্তি ঘটে চলেছে। আগামী কয়েক বছরের মধ্যে হয়তো এই সব এলাকার আঞ্চলিক শব্দের আর পরিচয় পাওয়া যাবে না। এমনই আমার জানা হারিয়ে যাওয়া কিছু আঞ্চলিক শব্দের পরিচয় তুলে ধরবো; তবে এদের উৎস আমার পক্ষে জানা সম্ভব হয়নি। পরবর্তী সময়ে এই শব্দগুলোর উৎস নির্ণয়ের চেষ্টা করবো।

অদা = আধ-ভেজা। যে কোনো আধ-ভেজা জিনিসকে এই এলাকার লোক অদা বলে।
অঘা = ভোঁতা, অপদার্থ। কাটারিটা অঘা; এটায় গলাবি (গলাও) কাটবেনি।
অঁটা = কোমর।
অড় = আড়াল করা।
আগলা = খোলা।
আগড়া = অপুষ্ট ধান।
আজড়ানা = পরিবর্তন বা ছাড়া। বাসি কাপড় আজড়ি পেকা।
আগোড় = বাড়ির প্রচীরের দরজাকে মূলত বোঝায় যা পলকা বাঁশ ও দড়ি দিয়ে তৈরি।
আদঘাত = আইঢাই। শ্বাস নিতে নাই পারলে আদঘাত হয়।
অরঘাতিয়া = মানবিকতা হীন, নৃশংস।
অলকা = নামিয়ে ফেলা। কাখনু (কোমর) কলসী অলকি পেকা।
আওটানা = গলিয়ে নেওয়া।
আমুয়া = আধপোড়া ইঁট, হাঁড়ি, কলসী ইত্যাদি।
আঁতি = অ-সার অংশ। পাঁয়ি কাখুরের আঁতি (সাদা নরম অংশ) দিকি ফুল বড়ি দিয়া হয়।
আঁতেল = যে নিজেকে বুদ্ধিমান মনে করে।
আপ = থুতু। শিব চুতুর্দশী বার করনে আপ ঘিঁটা যায়নি।
আদুড় = খোলা।
আঁউঠ = হাঁটু।
ইলিবিলি = এলোমেলো।
ইড়কি = গুঁতো। সে ইড়কি দিয়ে আমাকে সতর্ক করল।
ইলচি = পরিহাস করা।
উবা বা উভা = মাটির উপর থাপড়ে না বসে উঁচু হয়ে বসা।
উথলি = ঔদ্ধত্য। টকাটা (ছেলেটা) মরবে বলিকি উথলায়টে।
উতরি = ফুলে উঠে গড়িয়ে পড়া। লয়া ঘরে ঢুকতে হিনে দুধ উতরিতে হয় জানুত
উৎকুসলি = অস্বস্তি বোধ করা। বেশি খাইনে একটু উৎকুসলি হয়।
উঁকুঁউ/উকুন = মাথার পোকা।
উচক্কা = চরিত্রহীন।
উলি কাঁদাড় = গৃহের বাহিরের চারপাশ। পাগলাটা সারারাত উলি কাঁদাড়ে শুই আছে।
উদলা = অনাবৃত গা।
উদভুট্টি = অত্যদ্ভুত।
উচকা = উঠতি। উচকা যুবতী।
একরুখা = যা বলবে তাই /কথা নড়-চড় না হওয়া/এক গুঁয়ে।
কঁনক বা কণকা = কাঁসার সঙ্গে টক জাতীয় পদার্থের বিক্রিয়ার ফলে জাত ধাতুমল। তাই কাঁসায় টক খেতে নেই।
কুচুটি = হিংসুটে। সব জাইগায় কুচুটি লোক রয়।
কজাক = সংকীর্ণ।
ককাপ বা কুকাপ = জ্বরের তীব্রতা বোঝাতে।
কাখুর = যেকোনো কুমড়ো

কিটানি = যে খুপ বিরক্ত করে (নাছোড় বান্দা)। টকাটা প্রচুর কিটানি আছে, পারবানি কইটি তবু শুয়েনি।
কানপাটা = গলা ও কানের মাঝের স্থান।
কাঁথ = মাঠির দেওয়াল।
কুঁদান = অমানবিক মার। পকেটমারটাকে পাবলিক আচ্ছা কুঁদান দিচে।
কেতরি যাওয়া = কাহিল বা দম পাওয়া। চোরটাকে এমন মারচে পুরা কেতরিচে।
কেড়ি আঙুল = ছোটো আঙুল।
খরমিশ = ছোটো-বড় সব রকম।
খুপনা = ঠোক্কর মারা। প্রতিদিন ভোর চড়ুই পাখি আমার ঘরে জানলায় খুপায় পকা-মাকড় খাওয়ার জিন্যে।
খইফুটা = অনর্গল কথা বলা। বাচ্চা টকা কিন্তু মুয়ে খইফুটেটে।
খিড়কি দরজা = পেছনের দরজা।
গঁফা = চুলের খঁপা। চুল সব সময় নাই ছাড়িকি গঁফা (খোঁপা) করনে তোকে দেখতে ভালো লাগে। /কাপড়ের গোঁজ। গাছে উঠার সময় কাপড়ের গঁফা (গোঁজ) ভাল করিকি মারতে হয়।
গেল = রসিকতা।
গাঁতি = লম্বা আকৃতির মাটিতে গর্ত করার যন্ত্র বা শাবল।
গেঁজানো = আসল কথার বদলে আলফাল কথা।
গড়াদানা = গোয়ালের বাহিরে গরু বেঁধে রাখার স্থান।
গাভড়া = বাঁশের তৈরি সিঁড়ি।
গা-ধুয়া = স্নান করা।
গোঁয়ার = অরসিক ব্যক্তি।
গোয়া = পাছা। কাজ করার সময় গোয়ার কাপড় ঠিক কর দাদা।
গোহারা = সর্বোচ্চ পরাজিত হওয়া।
গ্যাঁড়াবাজ = ঝামেলা বাজ।
গ্যানশাবাজি = ফাজলামি করা
গরাক = রাক্ষস/যে বেশি খাই খাই করে।
ঘিঁটা = দ্রুত গিলেফেলা। চ্যাকতা খাড়ার রস প্রচণ্ড তিতা, টপকি ঘিঁটি দে।
ঘোট = ঢোক গেলা।
চহরম = ঔদ্ধত্ব। টাকার চহরম দেখিবুনি, একদিন ফকির হবু।
চাখা = পরখ করা (Test)
চান = পাথরের ব্লক/স্নান করা। (চানের উপর উপর বুসিকি স্নন কর।)
চামচা = স্তাবক। (Sycophant)
চাইল = উবু।
চুয়াড় = মিথ্যুক/ঢ্যামন।
চুথিয়া = কৃপন। চুথিয়ার বড় বড় কথা।
চেংনা = বাজে লোক।
চেঁকা = ছেঁকা। রাঁধতে যাইকি হাতে চেঁকা লাগলা।
ছটা = খোঁড়া। লোকটা ছটুউচি।

ছর = কামানো। দাঁড়ি ছর করা।
ছনকি = বেয়াদপ মেয়ে/ব্যাভিচারী মহিলা। (ওড়িয়া প্রভাব)
ছয়লাপ = অপচয়।
ছেপ = থুতু
ছিটাল = পাগলামি।
ছিঁক = হাঁচি।
ছেঁচড়া = প্রতারক। (Lunacy)
ছেঁদা = ছিদ্র। বাঁশটা ছেঁদা করি দে।
ছিয়া = ছেদা করা বা ভাগ করা। গাছটাকে ছিয়া কর।
ছোকরা = ছেলে।
ছুকরি = নব যুবতী (Young Girl)
জাউ = নরম ভাত (Gruel)
জাহান = প্রাণ। পেটে ভাত পড়তে জাহান আইলা।
জাড় = শীত। তোর কী জাড় চাপচে।
জাড়ি = জিহ্বার ঘা।
জাঁক = টাইট। জাইগা কম জাঁকি জাঁকি বুস।
জাবড়া/জ্যাবড়া = অসুন্দর। (Ugly)
ঝিঁট = হোঁচট। দেখিকি যা, নাইলে ঝিঁট লাগলে পায়ের বারোটা বাজি যাবে।
ঝটকা = ঝড় ওঠা।
ঝাড়া ফেরা = মলত্যাগ করা
ঝুনা = পাকা। লাড়িয়াটা ঝুনা কী।
ঝুল = কালো ফাঁদ।
ঝামলানা = ঝিমিয়ে যাওয়া। জল নাই পাইকি গাছ ঝামলি যায়টে।
টকা = কম-বয়সী ছেলে।
টপকি = দ্রুত। আমাকে দেখিকি টপকি মুয়ে (মুখে) ভরি দিলা।
টেক = জেদ। সব কথায় টেক ধরা ভালো না।
টাঙানা = ঝোলানো। ছবিটা টাঙি দে কাঁথে (দেওয়ালে)।
টেমক = অহংকার। লয়া বউর টেমক দেখ।
টেংরি = পা। টেংরি কাটি লিবা, বেশি বাহাদুরি দেখিবুনি।
টুসকি = হালকা টোকা দেওয়া।
টেঁঠি = বির = সহকারে চিৎকার করে কথা বলা।
ঠেকা = ছোটো ঝুড়ি বা পাছিয়া।
ঠাট = ঢং করা।
ঠাপ = মার/প্রহার
ঠেঁট কালা = শুনে না শোনার ভান।
ঠেকুয়া = কোনো বাঁশের খুঁটি দিয়ে ঠেক দেওয়া।
ঠ্যাং = পা। (Leg)
ডিঁয়া = বড় কালো পিঁপড়া
ডপকা/ডাগর = যৌবন প্রাপ্ত।

ডাঁট = অতিরিক্ত কোনোকিছু দেখানো। কটা গয়না পরিকি ডাঁট দেখাউটু।
ড্যাঁণা = পুরো বাহু।
ড্যারা = বাঁকিয়ে রাখা
ঢিপা = বাস্তু।
ঢাপু = নুড়ি দিয়ে খেলা। গুটিগুলো নাচিয়ে খেলতে হয়।
ঢিপকান = শব্দ করে মারা।
ঢেলা = চোখ। এমা চাঁইবুনি ঢেলা উপড়ি লিবা।
ঢ্যয়্যা = ঝলঝলে/খোলামেলা।
তড়ফা = লম্বা
তড়ফা = লম্ফ-ঝম্প করা। বেশি তড়ফানি, ঝামেলা হবে।
তপকা = তামাক জাতীয় পদার্থ।
তাড়ি = পচানো রস। মূলত খেজুর রস ও পচা পান্তা থেকে তৈরি।
তাতানো = অন্যের বিরুদ্ধে ক্ষেঁপিয়ে তোলা। বেশি তাতিবুনি খেপি যাবে।
তেঁদড় = খচড়ামি/ধূর্ত/শঠ/শয়তানি।
তেড়িয়া = মার মুখী।
থাতানি = মার দেওয়া।
থোপ = থুতু
থোবড়া > থবড়া = মুখ মণ্ডল।
দা = কাস্তে।
দন্টায় > দঁড়ে = সামন্য সময়
দাউলি = কাটারি
দাঁড়া = অপেক্ষা করা। দাঁড়া, যাইটি।
দোরো = পাতার রস
দুদু = স্তন।
ধকচান/ধচকান = তীব্র যন্ত্রণা।
ধোবল > ধোবো = সাদা।
ধারা = চোখ থেকে জল বওয়া।
ধড়াস = জোরে কিছু পড়ার শব্দ।
ধাঙড় = বয়স মনে করানো। (গালি পাড়তে ব্যবহৃত হয়)
ধাতানি = বকাবকি করা।
ধামসা = অতিরিক্ত বড়।
ধাংড়ি = ধড়িবাজ মহিলা
ধুমসি = মোটা। তার ঘরে সীতা বেস ধুমসি।
ধাড়ি = বয়স্ক। অতবড় ধাড়ি মাইঝি লজ্জা নাই খালি গায়ে ঘুরুটু।
ধোকড় = কিছু না। বামুনের টকা মাকড় মারনে ধোকড় হয়।
নাদুস = মোটা।
নেঙা = স্বাভাবিক নয় বা কম শক্তিশালী। নেঙা হাত বা পা। (বাম হাত বা পা)
নুনু = শিশ্ন/অপরিণত পুরষাঙ্গা।

পকটি/পাঘা = গোরুর গলার দড়ি যা দিয়ে বেঁধে রাখা হয়।

পতুল = গরুর দ্বারা খড়কে এলমেল করা।

পনকি = বঁটি। মাছ ও সব্জী কাটার জন্য ব্যবহৃত।

পত্তা = ভর্তি। পত্তা কলসী লিতে পারবুনি।

পাঞ্জানা = লোহার জিনিস ধারালো করা।

পাউচি = সিঁড়ির ধাপ।

পাস্তানা = গোঁজা। রাতে ঘুমোনোর সময় মশারী পাস্তাতে হয়।

পঁদ = পায়ু।

পুঁজা/পুঞ্জা = আঁটি। শাকের পুঁজা/মূলার পুঁজা।

পোটিঙ্গা = ভাব।

পোড় = পাকা। ইঁটের পোড় ভালা নাই হিনে নুনা (লবন) লাগবে।

ফেঁণা = ছড়া/গোছা। কলার ফেঁণা।

ফলার > ফরাল = ফলমূল দান।

ফরা = ফাঁপা।

ফাপ = ব্যথা।

ফ্যারা = সামঞ্জস্যহীন/পার্থক্য

বুজলা = এলোমেলো করে জড়ো করা।

বতরানা = ফুলেওঠা। মটর জলে বতরানা হয়।

বাটচাঁয়া = অপেক্ষ করা।

বাড়ুয়া = মোড়ল।

বুজা = বোতলের ছিপি।

বে-টাকুরিয়া = যে সহবৎ জানেনা বা মানেনা।

বোড়বা/বোড়মা = জ্যাঠামশায়/জ্যাঠাইমা।

ভাকু = তাড়ি/মদ।

ভ্যেগা = বোকা।

ভুঁকড়া = কিল।

বিষ আঙুল = তর্জনী

ভঁসড় = মোটা। ভঁসর লোকের হাঁটতে অসুবিধা হয়।

ভুরকুটি = ভেলকি/চমকানো

মঞ্জরি = ঝিমিয়ে পড়া/আয়তন কম হওয়া। এক কড়া শাক চুলায় বুসিনে দেখবু মঞ্জরি যাবে।

মোট = মাথায় করে কিছু বওয়া/বোঝা।

মালুম = অনুমান

মুঠুণ = কনুই থেকে মুষ্টিবদ্ধ হাত পর্যন্ত দূরত্ব।

মুড়া = মাথা।

মুহাড়ি = মুখ ভার করা। ঝিমলিকে কোনো কথা কইবার রাস্তা নাই; ভালো কিছু কইলেই সবেতে মুহাড়ি করে।

মুগরি = মাছ ধরার যন্ত্র বিশেষ, যা বাঁশের কঠি দিয়ে তৈরি হয়।

মাউক = স্ত্রী।

মাড়া = বহুজন যাওয়ায় যে নতুন পথ তৈরি হয়।
মেড়াখিয়া = গালি বিশেষ। (ওড়িয়া প্রভাব)
রিক = ক্রোধ
রগড়ি = নছোড়বান্দা। বাপিকে রগড়িকি ধর চাকরি হবে।
রিষ্টি = খারাপ সময়।
রুলি = পোলা। লাল প্লাস্টিকের চুড়ি।
রুই = রোপন করা
লাই = নাভি।
লৌটি = উল্টি।
লড়কানি = খারাপ জিনিস।
শটকা = স্বল্প টানা (এক শটকা হুকায় টান দিলে হিতা)। শরীরে কোথাও লেগে যাওয়া। (ধাপতে যাইকি কমরে শটকা লাগলা)।
সিঙনি = সর্দি।
সেঁকন = পিটিয়ে শিক্ষা দেওয়া।
হলা = নড়া। দাঁত হলেটে।
হড়া = কর্দমাক্ত।
হড়কা = পিচ্ছল।
হাটুয়া = সাধারণ।
হেলগম = নির্বিকার। ভবার সংসারের প্রতি হেলগম নাই।
হিঁসকুটিয়া = হিংসুটে।

এই সংক্ষিপ্ত আলোচনায় সমস্ত কিছু তুলে ধরা যেমন সম্ভব হল না তেমনি বহু শব্দ আরো থেকে গেল যার সম্পর্কে আমার পরিচিতি নেই বা আরো অনেক আগে অবলুপ্ত হয়েছে; আবার অনেক শব্দ বহুল ব্যবহারের ফলে অভিধানে স্থান পেয়েছে। যেভাবে সভ্যতা ও সংস্কৃতি এগিয়ে চলেছে আগামী পঞ্চাশ বছরের মধ্যে এইসব এলাকার আঞ্চলিক শব্দ লিখিত প্রমাণ ছাড়া পাওয়া সম্ভব হবে না।

তথ্যের সন্ধানে

১. ক্ষেত্রসমীক্ষার তথ্য

❑ **মোটিফের প্রয়োগ**

মধ্যযুগীয় শৈব-আখ্যানে মোটিফের প্রয়োগ বৈচিত্র্য

লিলি হালদার

'মোটিফ' শব্দটি ফরাসি ভাষা থেকে গৃহীত। পৃথিবীতে বসবাসকারী প্রতিটি জনগোষ্ঠীরই নিজস্ব লোককথা রয়েছে। কাজেই পৃথিবীর লোককথার ভাণ্ডার বিপুল; অথচ এই বিপুল সমৃদ্ধ ভাণ্ডারকে যদি বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, তাহলে প্রতিটি মৌখিক ঐতিহ্য (Oral Tradition) থেকে গৃহীত লোককথাকেই নির্দিষ্ট কতকগুলি মূল বিষয়ে ভেঙে ফেলা সম্ভব হবে। এই মূল বিষয় বা কাহিনি অংশকে থম্পসন মোটিফ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। সোজা ভাষায় মোটিফ হলো—"Simply defined, a motif is a small narrative unit recurrent in folk literature." মূলত মোটিফের বিশ্লেষণের মাধ্যমে একটি লোককথার অন্তর্মুখী অভিপ্রায় স্পষ্ট হয়ে ওঠে। একটি লোককথার পরিচয় লাভের জন্য টাইপ পদ্ধতির যেমন প্রয়োজন তেমনি কাহিনির অভ্যন্তরের উপাদানের বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে মোটিফের মাধ্যমে। এই টাইপ-মোটিফ পদ্ধতিতে লোককথাকে বিশ্লেষণ করলে লোককথার মৌলিক তাৎপর্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে। লোককথার বিশ্লেষণে টাইপ ইনডেক্সে যার সূচনা, মোটিফ ইনডেক্সে তার পরিণতি।[২] মোটিফ বা অভিপ্রায়ের সার্বজনীনতা বিস্ময়কর। বিশ্বের যে-কোনো লোককথার তুলনামূলক আলোচনা ও বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে এর মধ্যে যে অভিপ্রায় বা মোটিফগুলি পাওয়া যাবে, তা মূলত একই। কেননা, লোককথাগুলো মূলত মৌখিক ঐতিহ্যের ধারাবহনকারী। ফলত মানুষের মানসিক মেলবন্ধন বিশ্বের যে-কোনো প্রান্তেই একইরকম। এইজন্য লোককথার বিশ্লেষণে যে টুকরো কাহিনি অংশ বা 'ভাবসত্য' পাওয়া যায়, তাতে মূলত একই ধরনের অভিজ্ঞতা ও ঘটনার প্রবাহ লক্ষ করা যায়। এই কারণে কাল বা যুগ, কথকের কথনভঙ্গি এবং স্থানের দূরত্ব অতিক্রম করেও যুগ যুগ ধরে বিভিন্ন গোষ্ঠীর লোককথাগুলির মধ্যে একই ধরনের অভিপ্রায় বা মোটিফ লক্ষ করা যায়। অর্থাৎ অভিপ্রায় বা মোটিফের সার্বজনীনতা লোককথার একটি বিশিষ্ট বৈশিষ্ট্য।

এবার দেখে নেওয়া যাক যে মঙ্গলকাব্য বিশেষত মনসামঙ্গল, অন্নদামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গলে শিবকেন্দ্রিক কাহিনির বয়ানে, গোরক্ষবিজয়, শূন্যপুরাণ, শিবায়ন ও মৃগলুব্ধ-সংবাদ কাব্যকাহিনির বুননে কেমনভাবে মোটিফের প্রয়োগ পরতে পরতে প্রযুক্ত হয়েছে। স্টিথ থম্পসন তাঁর গ্রন্থে মোটিফ-সূচির যে তালিকা তৈরি করেছেন, তাতে তিনি লোক-কাহিনিতে প্রাপ্ত মোটিফগুলিকে 'এ' থেকে 'জেড' পর্যন্ত (আই, ও, ওয়াই বাদে) ২৩টি মূল ভাগে ভাগ করেছেন।[৪] এই বিভাগগুলি থেকে বর্তমান প্রবন্ধে শিবকেন্দ্রিক ও শিবপ্রাসঙ্গিক মোটিফগুলি সম্বন্ধে নীচে

আলোচনা করা হলো—

● **এ.১** 'এ' মূলভাগের মোটিফ হলো লোকপুরাণ (Mythological Motif)। লোকপুরাণ বিভাগে শিবকাহিনির প্রাসঙ্গিক মোটিফগুলি নিম্নে আলোচিত হলো—

১. পশু রূপে দেবতা (God in animal form) : পশু রূপে দেবতার উপস্থিতি লোককাহিনির একটি পরিচিত মোটিফ। শিবজায়া দেবী চণ্ডী ব্যাধ কালকেতুর শিকার যাত্রার সময় সুবর্ণ গোধিকা রূপে দেখা দিয়েছিলেন—"পশুরে অভয় দিয়া শংকরগৃহিণী।/সুবর্ণগোধিকারূপা হইলা আপনি॥'(মুকুন্দরাম : কবিকঙ্কণ চণ্ডী : ২০০৭ : ১৪) মোটিফ ইনডেক্স অনুসারে আলোচ্য কাহিনির মোটিফ সংখ্যা হলো এ ১৩২।

২. বৃষবাহন দেবতা (God rides a bull) : বৃষবাহন দেবতার মোটিফ ছড়িয়ে রয়েছে মঙ্গলকাব্য ও শিবায়নের শিবকাহিনিতে। শিবের বাহন বৃষ বা বলদ। তাই বৃষবাহন দেবতা বলতে শিবকে বোঝানো হয়েছে। অন্নদামঙ্গল কাব্যে বৃষবাহন শিবকে পল্লিগ্রামে ভিক্ষারত অবস্থায় দেখা যায়। 'শিবের ভিক্ষাযাত্রা' অংশের বর্ণনাতে পাওয়া যায়—"ওথায় ত্রিলোকনাথ বলদে চড়িয়া।/ত্রিলোক ভ্রমেণ অন্ন চাহিয়া চাহিয়া॥" (ভারতচন্দ্র : অন্নদামঙ্গাল : ১৩৮৮ : ৬৫) মোটিফ ইনডেক্স অনুসারে এই মোটিফটির সংখ্যা এ ১৩৬.১.৩।

৩. সৃষ্টিকর্তা বিশ্ব সৃষ্টি করলেন (Creation of Universe by creator) : সৃষ্টিকর্তা বিশ্ব সৃষ্টি করলেন এই মোটিফটির বহুল প্রয়োগ দেখা যায়—মঙ্গালকাব্য থেকে শুরু করে শিবায়ন, শূন্যপুরাণ, গোরক্ষবিজয় কাব্যে। গোরক্ষবিজয় কাব্যে বিশ্ব সৃষ্টি প্রসঙ্গো রয়েছে—"আদি অনাদি প্রভু নিজ অবতার,/নিজ অংশে করিলেক হই এ প্রচার।/হুঙ্কারে জন্মিল ব্রহ্মা বিষ্নু হইল মুখে,/আপনা আকার তবে রাখিলা সমুখে।" (ভীমসেন : গোর্খ-বিজয় : ১৩৫৬ : ১) শূন্যপুরাণে সৃষ্টি বর্ণনা প্রসঙ্গো বলা হয়েছে—"শূন্যত ভরমন পরভুর সূন্যে করি ভর।/কাহারে সম্মাব পরভু ভাবে মা আধর॥/মহাসূন্য মধ্যে পরভুর জনমিল পবন।/তাহা হইতে জনমিল অনিল দুইজন॥ (রামাই পণ্ডিত : শূন্যপুরাণ : ১৩২১ : ৭০) মোটিফ ইনডেক্স অনুযায়ী আলোচ্য কাহিনির মোটিফ সংখ্যা এ ৬১০।

৪. ধ্বংসের দেবতা (God of destruction) : লোকপুরাণ অনুসারে শিব ধ্বংসের দেবতা। শিবায়ন কাব্যে এর প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায় 'মহারূদ্র মধ্যভাগে/সংহারের ভার লাগে'। ধ্বংসের দেবতা রূপে শিবের উপস্থিতি বিশেষত শিবায়ন, মৃগলুব্ধ, ও মঙ্গালকাব্যের কাহিনিতে লক্ষ করা যায়। শিবায়ন কাব্যে শিবের নির্দেশে বীরভদ্র দক্ষ যজ্ঞ বিনাশ করেছে। আবার 'কামদেব ভস্ম' আখ্যানে ধ্যানরত শিবের মধ্যে দেবী পার্বতীর প্রতি কামোন্মাদনা জাগানোর জন্য রতি-পতি কামদেবকে দায়িত্ব দেন দেবরাজ ইন্দ্র। কামদেব সেই কাজ সমাধা করলে ধ্যানভ্রষ্ট শিব উগ্রমূর্তি ধারণ করেন ও কামদেবকে ভস্মীভূত করেন। এটি শিবের ধ্বংসাত্মক রূপের পরিচয়—"উগ্র হইল তপোভঙ্গা/ভস্ম অনঙ্গের অঙ্গা/হরকোপানলে গেল প্রাণ॥" (রামেশ্বর : শিবায়ন : ১৩৭১ : ৩৭৯) ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গালে পাওয়া যায়—"বিধি বিষ্নু আমি আদি নানা মূর্তি ধর।/সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় লীলায় নিত্য কর॥" (ভারতচন্দ্র : অন্নদামঙ্গাল : ১৩৮৮ : ৮১) মোটিফ ইনডেক্স অনুসারে আলোচ্য কাহিনির মোটিফ সংখ্যা এ ৪৮৮।

৫. দেবতার ঈর্ষাপরায়ণা স্ত্রী (Jealous wife of God) : দেবতার ঈর্ষাপরায়ণা স্ত্রী লোককাহিনির একটি উল্লেখযোগ্য মোটিফ। এই পর্যায়ে দেবী পার্বতীকে লক্ষ করা যায় ঈর্ষান্বিত হতে অন্য দেবীর প্রতি। শিবজায়া দেবী পার্বতী মনসামঙ্গল কাব্যে ফুলের সাজিতে লুক্কায়িত মনসাকে দেখে নিজ সতীন মনে করে ঈর্ষান্বিত হয়েছিলেন। ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গাল কাব্যে—"দেখিয়া ভবানী/জ্বলিল আগুনি/ক্রোধে কাঁপে কলেবর।/ইহার কারণ/করিল বঞ্চন/বিভা করিয়াছে হর॥/দৈবের কাহিনি/মনসা ভবানী/দুইজনে বাজে দ্বন্দ্ব।" (কেতকাদাস : মনসামঙ্গাল : ১৩৮৪ : ২০) মোটিফ ইনডেক্স অনুযায়ী আলোচ্য মোটিফের সংকেত সংখ্যা এ ১৬৪.৭।

৬. চাষি হিসেবে দেবতা (God as cultivator) : লোকপুরাণে, মঙ্গালকাব্যে যে লৌকিক শিবের পরিচয় পাওয়া যায় সে কৃষকবৃত্তি গ্রহণ করেছে, ঘরের নিত্য দিনের অভাব মেটানোর জন্য। এই কৃষক বা চাষি শিবকে রামেশ্বরের শিবায়ন কাব্যে পাওয়া যায়—"তুমি ভূমি দিলে আমি চষি গিয়া চাষ।/পূর্ণ হয় তবে পার্বতীর অভিলাষ।।/হরের বচন শুন্যা হরিহয় হাসে।/রামেশ্বর বলে হর দয়া কর দাসে॥ (রামেশ্বর : শিবায়ন : ১৩৭১ : ৪৪৯) মোটিফ ইনডেক্স অনুযায়ী এ ১৮১ সংখ্যায় রয়েছে পৃথিবীতে দেবতার দ্বারা সংঘটিত হীন কাজ (God serves a menial on Earth)। এই সূচিরই একটি মোটিফ হলো আলোচ্য মোটিফটি। যার সংকেত সংখ্যা এ ১৮১.২।

৭. দেবতাদের মধ্যে বিরোধ (Conflict of the God) : লোক-কাহিনিতে দেবতাদের মধ্যে বিরোধ এই মোটিফটি খুবই পরিচিত। শিবায়ন ও অন্নদামঙ্গাল কাব্যকাহিনিতে দেবতাদের মধ্যে বিরোধ লক্ষ করা যায়। অন্নদামঙ্গাল কাব্যে 'নারায়ণের অংশ' ব্যাসদেব শিবের বিরোধিতা করে শিবপূজা না করার জন্য উপদেশ দেন। হরি বা নারায়ণকে প্রশংসা করে ব্যাস যখন প্রকাশ্যে শিবের নিন্দা করেন তখন দুই দেবতার মধ্যে বিরোধের ছবিটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে—"হর আদি আর যত ভোগের গোঁসাই।/মোক্ষদাতা হরি বিনা আর কেহ নাই॥/এই বাক্যে ব্যাস যদি নিন্দিলা শঙ্করে।/শিবের হইল ক্রোধ নন্দী আগুসরে॥" (ভারতচন্দ্র : অন্নদামঙ্গাল : ১৩৮৮ : ৯৮) রামকৃষ্ণ কবিচন্দ্র রচিত শিবায়ন কাব্যে ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর মধ্যে বিবাদের উল্লেখ পাওয়া যায়। আলোচ্য কাহিনির মোটিফ ইনডেক্স অনুযায়ী মোটিফ সংখ্যা এ ১৬২।

৮. ভাগ্য ও সম্পদশালী দেবী (Goddess of prosperity) : ভারতীয় লোকপুরাণ অনুযায়ী দেবী অন্নপূর্ণাকে সৌভাগ্য ও সম্পদের দেবী হিসাবে কল্পনা করা হয়, এটিও একটি মোটিফ। অন্নদামঙ্গালের কাহিনিতে 'হরিহোড়ের বরদান' অংশের বর্ণনা অনুযায়ী—"আমি দেবী অন্নপূর্ণা লহ পরিচয়॥/দুঃখ দেখি আসিয়াছি তোরে দিতে বর।/ধনপুত্র লক্ষ্মী পরিপূর্ণ হবে ঘর॥.../আমার পূজার ফলে বড় সুখে রবে।/মাটিমুটা ধর যদি সোনামুটা হবে॥" (ঐ : ১৪৫) মোটিফ ইনডেক্স অনুযায়ী এ ৪৭৩ সংখ্যায় রয়েছে সম্পদের দেবতা (God of Wealth)। এই সূচির একটি মোটিফ হল আলোচ্য মোটিফটি। যার সংকেত সংখ্যা-এ ৪৭৩.১.১।

৮. পাতালের দেবী (Goddess of infernal region) : লোককাহিনির একটি অতি সাধারণ মোটিফ হল পাতালের দেবী। বাংলা লোকপুরাণ অনুযায়ী শিবকন্যা মনসা পাতালের দেবী হিসেবে স্বীকৃত। মনসামঙ্গাল কাব্যে পাতালের দেবী হিসাবে মনসার একাধিক প্রসঙ্গা পাওয়া যায়—"পাতালে নামিল মহারস/পাইয়া পাতালপুরী/জন্মিল নাগিনী নারী/দেবকন্যা

দেখিতে রূপস।" (বাইশা : ১৯৬২ : ৮) দিব্যজ্যোতি মজুমদারের বাংলা মোটিফ ইনডেক্স অনুসারে আলোচ্য কাহিনির মোটিফ সংখ্যা-এ ৩১৫।

● **বি.** ➲ 'বি' মূলভাবের মোটিফ হল জীবজন্তু (Animal)। জীবজন্তু বিভাগে শিবপ্রাসঙ্গিক মোটিফগুলি নিয়ে নীচে আলোচনা করা হলো—

১. উপকারী পতঙ্গ (Helpful insect) : শিবায়ন কাব্যে উপকারী পতঙ্গের মোটিফটি পাওয়া যায়, যা লোক-কাহিনির পরিচিত একটি অভিপ্রায়। মর্ত্যভূমিতে চাষের কাজে ব্যস্ত শিব কৈলাসে না আসায় শিববিরহে শিবজায়া পার্বতী কাতর। তাই শিবকে কৃষিকর্ম থেকে নিরত করার জন্য তিনি একে একে মাছি, উঙানি, ডাঁশ, জোঁক পাঠাতে শুরু করেন। এইসমস্ত পতঙ্গ দেবী পার্বতীকে সাহায্য করেছে এবং শিবকে বিরক্ত করতে সক্ষম হয়েছে। কাজেই এই অর্থে এরা সাহায্যকারী পতঙ্গ। শিবায়নে পাওয়া যায়—"মন্ত্রবলে ধায়্যা চলে পায়্যা জীবন্যাস।/অকালে কুজ্বটি যেন ছাইল আকাশ॥.../এমন উঙানি আস্যা অবনী ভিতরে।/খায়্যা ক্ষত বিক্ষত করিল দিগম্বরে॥" (রামেশ্বর : শিবায়ন : ১৩৭১ : ৪৫৯) মোটিফ ইনডেক্স অনুযায়ী 'বি' ৪৮০ সংখ্যায় রয়েছে সাহায্যকারী পতঙ্গ (Helpful Insects)। আর 'বি' ৪৮৩.১ সংখ্যায় রয়েছে সাহায্যকারী মাছি (Helpful Fly)। থম্পসনের ইনডেক্স অনুযায়ী মাছি ব্যতীত অন্য কোনও পতঙ্গের যেগুলি এই প্রবন্ধে আলোচনা করা হলো, তাদের নির্দিষ্ট কোনো মোটিফ সংখ্যা দেওয়া নেই। এই কারণে সেগুলিকে মূল ভাগের অন্তর্গত করে আলোচনা করা হয়েছে।

২. বার্তাবাহক কাক (Crow as messenger) : লোককাহিনিতে বার্তাবাহক হিসেবে পাখির মোটিফ অত্যন্ত পরিচিত। কাকের মাধ্যমে বার্তা প্রেরণ এই মোটিফটি পাওয়া যায় মনসামঙ্গল কাব্যে। লখীন্দরের মৃত্যুর পর বেহুলা যখন মৃত স্বামীর দেহ নিয়ে গাঙ্গুরের জলে ভাসবার সংকল্প করে, তখন সেই সংকল্পের কথা কাককে দূত হিসেবে প্রেরণ করে তার বাপের বাড়িতে জানিয়ে দিয়েছিল—"পত্র অঙ্গারি পায়া/কাক চলিল ধাইয়া/বার্তা কৈল সুমিত্রা গোচর।" (নারায়ণদেব : পদ্মাপুরাণ : ১৯৪৭ : ৯৩) মোটিফ ইনডেক্স অনুসারে 'বি' ২৯১.১ সংখ্যায় রয়েছে বার্তাবাহক হিসেবে পাখি (Bird as Messenger)। এই সূচির অন্তর্গত হলো আলোচ্য মোটিফটি। যার সংকেত সংখ্যা হলো 'বি' ২৯১.১.২।

৩. আহত সাপের প্রতিশোধ নেওয়া (Animal avenges injury) : লোক-কাহিনিতে আহত সাপের প্রতিশোধ নেওয়ার মোটিফটি সুপরিচিত। মনসামঙ্গল কাব্যানুসারে বাসর রাতে শিবভক্ত চাঁদ সদাগরের পুত্র লখিন্দরকে মৃত্যুমুখে পতিত করার জন্য শিবকন্যা মনসা তিনটি সাপ পাঠান। কিন্তু তারা সকলেই বেহুলার মিষ্টি কথায় সম্মোহিত হয়ে দংশন করতে ভুলে যায়। তখন মনসা লখিন্দরকে দংশন করার জন্য কালনাগিনীকে প্রেরণ করেন কিন্তু সেও বেহুলা-লখিন্দরের রূপে মুগ্ধ হয়ে না দংশাতে পেরে যখন ফিরে আসতে উদ্যত হয়, ঠিক তখনই ঘুমন্ত লখিন্দরের পায়ের আঘাত লাগলে আহত কালনাগিনী লখিন্দরকে দংশন করে—"মোর দোষ নাই দেবী দিলেন আরতি।/বিনি অপরাধে মোর দণ্ডে মারে লাথি॥/বিষদন্ত দিয়া কালি দংশে তার পায়।/দুর্লভ লখাই জাগে বিষের জ্বালায়॥" (কেতকাদাস : মনসামঙ্গল : ১৩৮৪ : ২৫৭) মোটিফ ইনডেক্স অনুযায়ী আলোচ্য মোটিফের সংকেত সংখ্যা হলো 'বি'. ৮৫৭।

৪. কথা বলা পশু (Speaking animal) : লোককাহিনি, রূপকথার গল্পে প্রায়শই কথাবলা পশুর মোটিফ লক্ষ করা যায়। মঙ্গালকাব্যও এর ব্যতিক্রম নয়। চণ্ডীমঙ্গালের আখেটিক খণ্ডে কালকেতু উপাখ্যানে 'চণ্ডী ও বন্যপশুর প্রশ্নোত্তর' অংশে কথা বলা পশুদের দেখতে পাওয়া যায়। ব্যাধ কালকেতুর শিকারে যখন বন্যপশুদের প্রাণধারণ প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে তখন তারা চণ্ডীর কাছে মানুষের ভাষাতেই নিজেদের অভিযোগ জানায়। শিবজায়া চণ্ডী তাদের কষ্ট নিবারণের চেষ্টা করেন। আবার 'মৃগলুব্ধ-সংবাদ'—এ ব্যাধের পাতা ফাঁদে যখন শাপভ্রষ্ট বিদ্যাধর হরিণরূপে শিকার হিসেবে ধরা পড়ে তখন তার স্ত্রী হরিণী কাতর বাক্যে স্বামীর মুক্তি প্রার্থনা করে—"দারুণ বন্ধনে মৃগ নাহিক চেতন॥/শোকে ব্যাকুল হইয়া কান্দিল বিস্তর।/স্বামী সম্বোধিয়া মৃগী কহিল বিস্তর॥/কেমন দিবসে প্রভু আইলা এই বনে।/পাপিষ্ঠ ব্যাধের হাতে হারাইলা জীবনে॥" (রামরাজা : মৃগলুব্ধ-সংবাদ : ১৩২১ : ৩০) মোটিফ-ইনডেক্স অনুযায়ী উপরিউক্ত দুটি কাহিনির মোটিফ সংখ্যা হল 'বি' ২১০।

● **সি. ➲** 'সি' মূলভাগের মোটিফ হল ট্যাবু বা নিষেধাজ্ঞা (Taboo)। এই বিভাগে আলোচ্য শিবকেন্দ্রিক ও শিবসংযুক্ত কাহিনির মোটিফগুলি নিম্নলিখিত—

১. জামাই-শাশুড়ি দর্শন নিষিদ্ধ (Mother-in-law and Son-in-law must not have anything to do with each other) : লোক-কাহিনিতে এই মোটিফটির প্রয়োগ যেমন পাওয়া যায়, তেমনি মঙ্গালকাব্য-কাহিনিতেও এর ব্যবহার লক্ষ করা যায়। বিবাহ অনুষ্ঠানে জামাই বরণের সময়ই কেবলমাত্র শাশুড়ি জামাই-এর মুখদর্শন করতে পারতেন। অন্যথায় শাশুড়ি-জামাই দর্শন নিষিদ্ধ ছিল। শিবায়ন কাব্যে তার প্রমাণ পাওয়া যায়—"বর দেখা দেই কে বা ভিক্ষুকের বেশে॥/শাশুড়ি জামাঞে কথা আছে কোন দেশে।" কন্যাদান করে কে বা যাচক পুরুষে॥ (রামকৃষ্ণ : শিবায়ন : ১৩৬৩ : ১০৩) ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গালে পাওয়া যায়—"গলবস্ত্রা হয়ে এল শিবের সম্মুখ।/শাশুড়ি দেখিয়া শিব লাজে হেঁটমুখ॥" (ভারতচন্দ্র : অন্নদামঙ্গাল : ১৩৮৮ : ২৫) মোটিফ ইনডেক্স অনুযায়ী আলোচ্য মোটিফটির সংকেত সংখ্যা 'সি'. ১৭১।

২. স্বামীর নামোচ্চারণ নিষেধ (Uttering spouses name) : ভারতীয় সমাজে বিবাহিত নারীরা নিজ মুখে তাদের স্বামীর নাম উচ্চারণ করেন না। তাই ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গাল কাব্যে দেবী অন্নদা যখন ঈশ্বরী পাটনীর কাছে আত্মপরিচয় ব্যক্ত করছিলেন, তখন দেবীকে বলতে শোনা যায়—"বিশেষণে সবিশেষ কহিবারে পারি।/জানহ স্বামীর নাম নাহি ধরে নারী॥" (ভারতচন্দ্র : অন্নদামঙ্গাল : ১৩৮৮ : ১৫৭) মোটিফ ইনডেক্স অনুযায়ী এই মোটিফটির সংকেত সংখ্যা 'সি' ৪৩৫.১।

৩. দেবতাকে বিরূপ করায় নিষেধাজ্ঞা (Offending the Gods) : মঙ্গালকাব্য-কাহিনির বয়ানে এবং শিবায়ন কাব্যে একাধিকবার এই অতিপরিচিত মোটিফটি ঘুরে ফিরে এসেছে। শিবায়ন কাব্যে প্রজাপতি দক্ষ দেবাদিদেব মহাদেবকে আমন্ত্রণ না করে যজ্ঞের আয়োজন করেন ও তাঁকে নানা কটূ ভাষায় অপমান করেন। স্বামীর অপমান সহ্য করতে না পেরে শিবজায়া সতী প্রাণত্যাগ করলে শিব দক্ষের প্রতি বিরূপ হয়ে দক্ষযজ্ঞ বিনাশ করেন—"শুন মা গো সত্যবতি/পাগল তোমার পতি/নিমন্ত্রণ করি নাঞি লাজে।/কদাচার দিগম্বর/অস্থিমালা

অমঙ্গল/দেবের সমাজে নাঞি সাজে॥" (রামেশ্বর : শিবায়ন : ১৩৭১ : ৫৪)। গোবিন্দ তথা শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধ অহঙ্কারবশত শিবকে অবহেলা করলে শিব তার প্রতি বিরূপ হন। ফলস্বরূপ শিবের অভিশাপে অনিরুদ্ধ শাপভ্রষ্ট হয়ে চাঁদসদাগরের কনিষ্ঠ পুত্র লখিন্দর রূপে জন্মগ্রহণ করেন। উপরিউক্ত দুটি কাহিনিরই মোটিফ ইনডেক্স অনুসারে মোটিফ সংখ্যা হলো 'সি' ৫০।

৪. **খাদ্যবিষয়ে নিষেধাজ্ঞা (Eating taboo) :** মোটিফ ইনডেক্স অনুযায়ী এই মোটিফগুলি সি ২০০-২৪৯ পর্যন্ত বিস্তৃত। মঙ্গলকাব্যে শিবপ্রাসঙ্গিক ও শিবকেন্দ্রিক কাহিনিতে প্রাপ্ত খাদ্যবিষয়ে নিষেধাজ্ঞামূলক মোটিফগুলি নিম্নলিখিত—

❑ **নির্দিষ্ট দিনে বা সময়ে খাদ্যগ্রহণে নিষেধাজ্ঞা (Taboo : eating at certain time) :** শিবায়ন কাব্যে বর্ণিত শিবচতুর্দশী ব্রতকথায় পাওয়া যায় এমন নিষেধাজ্ঞা—"অপর দিবসে আগে ব্রাহ্মণ ভোজন॥/বিপ্র পূজ্যা পশ্চাৎ পারণ করে গিয়া।" (রামেশ্বর : শিবায়ন : ১৩৭১ : ৪৩৯) শিবচতুর্দশীর দিন উপবাসী থেকে পূজা করে পরদিবসে আগে বিপ্রসেবা করে তারপর খাদ্যগ্রহণ শাস্ত্রসম্মত। অর্থাৎ একটি নির্দিষ্ট দিন বা সময়ে খাদ্যগ্রহণ বিষয়ে নিষেধাজ্ঞার রীতি সমাজে প্রচলিত ছিল। এর মোটিফ সংখ্যা হলো 'সি' ২৩০।

❑ **নির্দিষ্ট দ্রব্য ভক্ষণে নিষেধাজ্ঞা (Taboo : eating certain things) :** শিবায়ন কাব্যে শিবচতুর্দশী ব্রত পালনের বিধি শিব নিজে ব্যক্ত করেছেন এভাবে—"ব্রহ্মচর্য্যা সমাহিত ত্রয়োদশী দিনে॥/স্নান পূজা নিত্যকীর্ত্তি কর‍্যা সমাপন।/নিরামিষ্য হবিষ্য বা সকৃৎ ভোজন॥" (ঐ)। অর্থাৎ ত্রয়োদশীর দিনে নিরামিষ আহার গ্রহণের কথা বলা হয়েছে। এই দিনে আমিষ আহার গ্রহণে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। আলোচ্য মোটিফটির সংকেত সংখ্যা 'সি' ২২০।

❑ **নির্দিষ্ট বর্ণের লোকের সঙ্গে খাওয়া বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা (Taboo : eating with person of certain caste) :** মনসামঙ্গলে দেখা যায় ডোমনি বেশি চণ্ডীর আসঙ্গলিপ্সার জন্য শিব ব্রাহ্মণ হয়েও নিম্নবর্ণের ডোমনী রমণীর হাতে ভাত খেতে সম্মত হয়েছে—"সংসারের নাথ হইয়া ডোমের হাতে ভুঞ্জে।/চরিত্র দেখিয়া দেবী মনে মনে গঞ্জে॥/ভাল মন্দ জ্ঞান নাই কামে অচেতন।/সম্পূর্ণ ভোজন করি করে আচমন॥" (বাইশা : ১৯৬২ : ১৯) আলোচ্য মোটিফটির ক্রমাঙ্ক সি ২৪৬।

❑ **নিষেধাজ্ঞা ভঙ্গের জন্য শাস্তি স্বরূপ ভস্মে পরিণত হওয়া (Falling to ashes as punishment for breaking taboo) :** মঙ্গলকাব্য, শিবায়ন-এ দেখা যায় ইন্দ্রের নির্দেশে তপস্যারত ধ্যানমগ্ন যোগী শিবের মধ্যে দেবী পার্বতীর জন্য কামোন্মাদনা সঞ্চার করেন কামদেব। কামদেব ধ্যানরত শিবকে বিরক্ত করা নিষেধ জেনেও পুষ্পবাণ বর্ষণ করে তাঁর মধ্যে কাম জাগানোর চেষ্টা করলে ধ্যানভঙ্গ করার অপরাধে শিব কামদেবকে ভস্মে পরিণত করেন। চণ্ডীমঙ্গলে এই অংশের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—"কোপদৃষ্টে মহেশের বরিষে দহন।/দেখিতে দেখিতে ভস্ম হইল মদন॥" (মুকুন্দরাম : কবিকঙ্কন চণ্ডী : ২০০৭ : ৭৮) মোটিফ ইনডেক্স অনুযায়ী আলোচ্য মোটিফটির সংকেত সংখ্যা সি ৯২৭.২।

● **ডি.** ➲ স্টিথ থম্পসনের মোটিফ ইনডেক্স অনুযায়ী 'ডি' মূলভাগের মোটিফ হলো ঐন্দ্রজালিকতা বা জাদু (Magic)। এই অধ্যায়ে শিবসংযুক্ত কাব্য-কাহিনিতে এই মূল ভাগের প্রাপ্ত মোটিফগুলি সম্বন্ধে নীচে আলোচনা করা হলো—

ক. রূপ পরিবর্তন (Transformation) : রূপ পরিবর্তন এর অতিপরিচিত মোটিফটি গোরক্ষবিজয় কাব্য-কাহিনির বয়ানে লক্ষ করা যায়। রূপ-পরিবর্তন (Transformation) সম্পর্কে থম্পসন বলেছেন—"A person or animal or object changes its form and appears in a new guise, and we call that transformation;... Transformation is also a commonplace assumption in folktales everywhere." গোরক্ষবিজয় কাব্যে গোর্খনাথকে দেবী চণ্ডী মাক্ষীরূপে ছলনা করেছে—"গোর্খেরে ছলিতে দেবী মাক্ষী রূপ হইল।" (ভীমসেন : গোর্খ-বিজয় : ১৩৫৬ : ১৯) মোটিফ ইনডেক্স অনুযায়ী রূপ পরিবর্তনের (Transformation) মোটিফ সংখ্যা হলো ডি ০-৬৯৯। আলোচ্য মোটিফটি দেবীর পতঙ্গে পরিবর্তন। কিন্তু মোটিফ ইনডেক্স অনুযায়ী এই নির্দিষ্ট মোটিফটির কোনো ক্রমিক সংখ্যা পাওয়া যায় না। তাই একে সাধারণ রূপ পরিবর্তন (Transformation : General) বিভাগ (ডি.)-এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

খ. বারবার রূপ পরিবর্তন (Repeated transformation) : শিব বারবার রূপ পরিবর্তন করে কখনও তপস্বী, কখনও শাঁখারী, আবার কখনওবা সিদ্ধাযোগীর বেশে হাজির হয়েছে পার্বতীর সামনে। শিবায়ন কাব্যে পাওয়া যায়—"শঙ্কর ধরিল শঙ্খবণিকের বেশ।/তিন কাল পূর্ণ হল্য পাক্যা গেছে কেশ॥—(রামেশ্বর : শিবায়ন : ১৩৭১ : ৪৮৫)—"ত্রিলোচন ত্রিকালজ্ঞ তপস্বীর বেশে।/কৃপা করি কন কথা কুমারীর পাশে॥"—(ঐ : ৩৮১)। "তপস্বী হইলা হর অন্নদা ভাবিয়া।"—(ভারতচন্দ্র : অন্নদামঙ্গল : ১৩৮৮ : ৮১) মোটিফ ইনডেক্স অনুযায়ী এই মোটিফটির সংকেত সংখ্যা ডি ৬১০।

খ.১. দেবীর বারবার রূপ পরিবর্তন (Goddess repeatedly transforms herself) : নারায়ণ দেবের পদ্মাপুরাণ কাব্যে শিবের ঘরণী দেবী চণ্ডী ডুমনী বেশ ধারণ করে খেয়া-পারাপারের কাজে নিযুক্ত হয়েছে। ঐ বেশেই শিবকে ছলনা করেছেন—"জেহি রূপে চণ্ডিকা বচন বুলিল।/সেহি রূপে ডুমনি বদল করিল॥"—(নারায়ণদেব : পদ্মাপুরাণ : ১৯৪৭ : ৬)। আবার ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গল কাব্যে শিবজায়া চণ্ডী পাটনীর ছদ্মবেশে শিবকে ছলনা করেছেন—"গৌরী পাটনী আমি থাকি পারাপারে।/তুমি বুড়া, বাক্য কিবা জিজ্ঞাস আমারে॥—(কেতকাদাস : মনসামঙ্গল : ১৩৮৪ : ১৫)। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে চণ্ডী কালকেতুর সামনে রূপসী নারীর ছদ্মবেশে পূজা প্রচারের উদ্দেশ্যে উপস্থিত হয়েছেন—"কুড়্যার দুয়ারে দেখে রাকাচন্দ্রমুখী॥/প্রণাম করিয়া রামা করয়ে জিজ্ঞাসা।/কার নারী কোন জাতি কহ সত্যভাষা॥"—(মুকুন্দরাম : কবিকঙ্কন চণ্ডী : ২০০৭ : ১৬২) আবার 'দেবীর মৃগরূপ পরিগ্রহ' কাব্যাংশে কালকেতুর সামনে দেবী মৃগরূপে উপস্থিত হয়েছেন। এছাড়াও দেবীর দেবীত্বে কালকেতু সন্দিহান হওয়ায় দেবী মহিষমর্দিনী রূপ ধারণ করেছেন—"মহিষমর্দিনী রূপ ধরেন চণ্ডিকা।/অষ্টদিকে শোভা করে অষ্ট নায়িকা॥ (ঐ: ১৭৪) অন্নদামঙ্গল কাব্যে 'হরিহোড়ের বৃত্তান্ত' অংশে দেবী অন্নদা বুড়ির ছদ্মবেশ, 'অন্নদার ভবানন্দভবনে যাত্রা' অংশে কুলবধূর ছদ্মবেশ ধারণ করেছেন। ব্যাসদেবকে ছলনা করতে দেবী অন্নদা আবার বৃদ্ধা জরতী বেশ ধারণ করেছেন।

'পার্বতীর কালীমূর্তি ধারণ' কাব্যাংশে যখন শাঁখারীর ছদ্মবেশে শিব শ্বশুরগৃহে উপস্থিত হয়ে স্ত্রী পার্বতীকে শাঁখা পরান এবং পুরস্কারস্বরূপ তাঁর আলিঙ্গন প্রার্থনা করেন তখন সহচরী

পদ্মার পরামর্শে দেবী কালীমূর্তি ধারণ করেন। মনসামঙ্গাল কাব্যে শিবকন্যা মনসা তার পূজা প্রচারের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রূপ ধারণ করে কার্যসিদ্ধি করেছেন। কেতকাদাসের মনসামঙ্গাল কাব্যে উল্লিখিত মনসার পরিবর্তিত রূপগুলি নিম্নে দেওয়া হলো—দেবীর ব্রাহ্মণীর বেশ ধারণ, দেবীর নটীরূপ ধারণ, দেবীর শঙ্খচিল রূপ ধারণ, দেবীর মালিনী বেশ ধারণ, দেবীর গোয়ালিনী বেশ ধারণ, দেবীর শ্বেতমাছি রূপ ধারণ। উপরিউক্ত রূপ পরিবর্তনের দৃষ্টান্তগুলির লোককথার মোটিফ ইনডেক্স অনুযায়ী নির্দিষ্ট মোটিফ ক্রমাঙ্ক হল ডি ৬১০.১।

গ. আর্শীবাদ বা বরদান (Saint blessings brings victory) : লোককাহিনির একটি অন্যতম মোটিফ হল আশীর্বাদ বা বরদান। শিবায়ন কাব্যে ‘বৃকাসুর উপাখ্যানে’ বৃকাসুর তপস্যায় শিবকে তুস্ট করে বরপ্রার্থনা করে এবং শিব তাকে বরদান করে বলেন—“বঞ্চিত বাঞ্ছিত বর মাগিলেন এই।/যার শিরে হস্ত দিব ভস্ম হব সেই।/এড়াইতে নারিয়া অসুরে দিনু বর।”—(রামেশ্বর : শিবায়ন : ১৩৭১ : ৪৩৭)। আবার শিবকে স্বামী হিসেবে লাভ করার জন্য পার্বতী তপস্যায় মগ্ন হলে তপস্বীর বেশে শিব নিজে উপস্থিত হয়ে তাঁকে বাঞ্ছিত বরদান করেন। মোটিফ সূচি অনুসারে আলোচ্য কাহিনি দুটির মোটিফ ক্রমাঙ্ক হলো ‘ডি’ ২১৬৩.৮।

ঘ. বশীকরণ বা যাদুপ্রয়োগ (Magic formula) : লোকসাহিত্যের একটি অতিপরিচিত মোটিফ হল বশীকরণ বা জাদুপ্রয়োগ। রামেশ্বরের শিবায়ন কাব্যে জামাই শিবকে বশীকরণের প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—“ছামনি নাড়িয়া অভিচারে দিল মন।/একে একে আরম্ভিল ঔষধের গণ।।/মন্ত্র পড়্যা গুড় চাউলি চক্ষে দিল পেল্যা।/দপ দপ পাবক দহন উঠে জল্যা।।”—(রামেশ্বর : শিবায়ন : ১৩৭১ : ৩৮৭) রামকৃষ্ণ কবিচন্দ্রের কাব্যেও জামাতা বশীকরণের প্রসঙ্গ পাওয়া যায়—“চতুরা হেমন্তবধূ/আপুনি পিলেন মধু।/মহৌষধি দিলেন ছিটাফোট।।”—(রামকৃষ্ণ : শিবায়ন : ১৩৬৩ : ১৩৩)। মোটিফ ইনডেক্স অনুসারে আলোচ্য মোটিফের ক্রমাঙ্ক ডি ১২৭৩।

ঙ. দেবতার থেকে লব্ধ যাদুজ্ঞান/মহাজ্ঞান (Magic knowledge from God) : লোককাহিনির আর একটি মোটিফ হল মহাজ্ঞান বা যাদুশক্তির অধিকারী। এই শক্তির ফলে অনেক অসাধ্যসাধন হয়। সাধারণত দৈব শক্তিসম্পন্ন বিশেষ কোন জিনিস খাওয়ার পর এই শক্তির অধিকারী হওয়া যায়। মনসামঙ্গাল কাব্যে চাঁদসদাগর ও শঙ্কর গারড়ী উভয়েই মহাজ্ঞানের অধিকারী। বিশেষত ধন্বন্তরি শঙ্কর গারড়ী সর্পবিষ নাশ করার শক্তিতে শক্তিশালী ও পারদর্শী ছিলেন। নেতার সাধনা করে গারড়ী এই মহাজ্ঞান অর্জন করেছিলেন। চাঁদসদাগরকে মহাজ্ঞান দিয়েছিল স্বয়ং মহাদেব। গোর্খ-বিজয় কাব্যে মহামন্ত্রের অধিকারী মীননাথকে গোর্খনাথ বলেছেন মহামন্ত্র দিয়ে বিন্দুনাথকে বাঁচিয়ে তোলার জন্য—“শঙ্করের শিষ্য তুমি সর্বলোকে জানে,/মহামন্ত্র আহুড়িয়া জিয়াও তাহানে।”—(ভীমসেন : গোর্খ-বিজয় : ১৩৫৬ : ১১৫)। আলোচ্য মোটিফটির ক্রমাঙ্ক ডি ১৮১০.৯।

● **ই. ➲** মোটিফ-সূচি অনুযায়ী ‘ই’ মূলভাগের মোটিফ হল মৃত (The Dead)। এই মূলবিভাগের শিব কাহিনির প্রাসঙ্গিক মোটিফগুলি সম্বন্ধে নিচে আলোচনা করা হলো—

ক. পুনর্জীবন লাভ (Resuscitation) : লোককাহিনির আর একটি জনপ্রিয় মোটিফ মৃত ব্যক্তির পুনর্জীবন লাভ (Resuscitation Motif)। এর সংকেত সংখ্যা ই.। মোটিফ

ইনডেক্‌স অনুযায়ী এই মোটিফটি ই০—ই১৯৯ পর্যন্ত বিস্তৃত। মঙ্গলকাব্যে শিব-প্রাসঙ্গিক ও শিবকেন্দ্রিক কাহিনিতে প্রাপ্ত পুনর্জীবন বিষয়ক মোটিফগুলিকে নিম্নলিখিতভাবে ভাগ করা যায়—

ক.১. দেবতার কৃপায় পুনর্জীবন (Resuscitation by God) : মনসামঙ্গল কাব্যে চাঁদসদাগরের পুত্র লখিন্দর দেবী মনসার কোপে প্রাণ হারালে বেহুলা স্বর্গে নৃত্যের মাধ্যমে দেবতাদের তুষ্ট করেন। শিব তখন লখিন্দরের প্রাণ ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য মনসাকে নির্দেশ দেন—"সিবে বোলে শুন পদ্মা য়ামার উত্তর।/অবিলম্বে জিয়াইয়া দেও লখিন্দর॥"—(নারায়ণদেব : পদ্মাপুরাণ : ১৯৪৭ : ১৩৬)। আলোচ্য মোটিফটির ক্রমাঙ্ক ই ১২১.১।

ক.২. দেবীর কৃপায় পুনর্জীবন (Resuscitation by power of Goddess) : মনসামঙ্গল কাব্যানুসারে সমুদ্রমন্থনে উত্থিত গরল পান করে শিব মারা গেলে মনসা গরল হরণ করে শিবকে পুনর্জীবন দান করেছেন—"গরল হরিয়া নিল দেবী বিষহরি।/চেতন হইয়া চান দেব ত্রিপুরারি॥" (কেতকাদাস : মনসামঙ্গল : ১৩৮৪ : ৬৭) বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গল কাব্যে শিবের ফুলের সাজিতে লুক্কায়িত মনসাকে দেখে ক্রোধান্বিত চণ্ডী প্রচণ্ড প্রহার করেন। চণ্ডীর প্রহার সহ্য করতে না পেরে মনসা তাকে দংশন করলে চণ্ডীর মৃত্যু ঘটে। পুনরায় শিবের অনুরোধে মনসা তার প্রাণ দান করেন। মোটিফ-সূচি অনুযায়ী কাহিনি দুটির মোটিফ সংখ্যাই ১২১.১.২।

ক.৩ মন্ত্রপূত জলের মাধ্যমে পুনর্জীবন (Resuscitation from water sanctified by mantras) : গোরক্ষবিজয় কাব্যে মীননাথের পুত্র বিন্দুনাথ মারা গেলে মন্ত্রপূত জলের সাহায্যে তার প্রাণ ফিরিয়ে দিয়েছেন গোর্খনা—"হাতে জল লৈয়া জেন মীননাথ পড়ে।/ভ্রম হইয়া আছে নাথে মনে নাহি স্মরে॥/আদ্যকথা আউরিয়া গোর্খে দিল তুড়ি।/উঠিয়া বসিল মরা জীবন সঞ্চারি॥"—(ভীমসেন : গোর্খ-বিজয় : ১৩৫৬ : ১১৫-১১৬) আবার মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গাল কাব্যে 'মৃত সৈন্যদের জীবন প্রাপ্তি' অংশে কলিঙ্গারাজের সঙ্গো যুদ্ধে নিহত সৈন্য ও পশুরা দেবী চণ্ডীর কৃপায় মন্ত্রপূত জলের মাধ্যমে পুনর্জীবন লাভ করেছে। আলোচ্য কাহিনিদুটির মোটিফ সূচি অনুযায়ী মোটিফ ক্রমাঙ্ক ই ৮০.৩।

খ. পুনর্জন্ম (Reincarnation) : মোটিফ ইনডেক্‌স অনুযায়ী এই মোটিফটিই ৬০০-৬৯৯ পর্যন্ত বিস্তৃত। মঙ্গালকাব্য ও শিবায়নে প্রাপ্ত এই বিষয়ক মোটিফগুলি নিম্নলিখিতভাবে বিভক্ত—

খ.১. পাপের শাস্তিস্বরূপ পুনর্জন্ম (Reincarnation as a punishment for sin) : চণ্ডীমঙ্গাল কাব্যে ইন্দ্রপুত্র নীলাম্বর শিবের দ্বারা শাস্তিপ্রাপ্ত হয়ে মর্ত্যে ব্যাধের ঘরে কালকেতু রূপে জন্মগ্রহণ করে—"আমার দৈবের ফলে/শাপ হইল, ব্যাধকুলে/জনম করাল্যে পশুপতি॥"—(মুকুন্দরাম : কবিকঙ্কন চণ্ডী : ২০০৭ : ১১)। আলোচ্য মোটিফের ক্রমাঙ্কই ৬০৬.১।

খ.২ দেবতার দেবতা হিসেবে পুনর্জন্ম (God reborn God) : শিবায়ন কাব্যে 'নন্দী কর্তৃক শিবমাহাত্ম্য কথন এবং সতীর দেহত্যাগ' কাব্যাংশের বর্ণনা অনুযায়ী দক্ষযজ্ঞে শিবের অপমান সহ্য করতে না পেরে শিবজায়া সতী দেহত্যাগ করলেও 'হিমালয়ে গৌরীর জন্ম' অংশে তিনি গিরিকন্যা পার্বতী রূপে পুনর্জন্ম লাভ করেন—"দক্ষে বাম হত্যে ধাতা/যার

ঘরে জগতমাতা/শৈলগৃহে জনমিল শিবা।"—(রামেশ্বর : শিবায়ন : ১৩৭১ : ৩৭৩) আলোচ্য মোটিফটি থম্পসনের মোটিফ-সূচি অনুযায়ী পুনর্জন্মের কোনও বিভাগের অন্তর্গত নয়। কিন্তু বাংলা লোককাহিনি ও মঙ্গলকাব্যে মোটিফটির বহুল প্রয়োগ থাকায় এটিকে পুনর্জন্মের সাধারণ বিভাগ (Reincarnation General)-এর ক্রমাঙ্ক ই. ৬০০ এর অন্তর্গত করে আলোচনা করা হয়েছে।

● **এইচ.** ➲ 'এইচ' বিভাগের মোটিফ হল পরীক্ষা (Tests)। এই মূল বিভাগে আলোচ্য গবেষণাপত্রের প্রাসঙ্গিক মোটিফগুলি নিম্নলিখিত—

ক. অসাধ্যসাধন (Tasks imposed) : অসাধ্যসাধন অর্থাৎ অসম্ভবকে সম্ভব করা লোককাহিনির এই মোটিফটি শিবায়ন, মঙ্গলকাব্যে লক্ষ করা যায়। শবায়ন বা শিবসঙ্কীর্তন কাব্যে ভিক্ষুক শিবের ভিক্ষার ঝুলি থেকে রত্নভাণ্ডার উপচে পড়া, প্রকৃত অর্থেই অসাধ্যসাধন। হর-গৌরীর অভাবের সংসারে সন্তান-সন্ততিসহ সকলে মিলে 'বার মুখে পাঁচ হাথে' খায়, নিমেষ ফেলতে না ফেলতেই অন্ন শেষ হয়ে যায়। তবুও সকলে পেট ভরে খাওয়ার পরেও হাঁড়িতে অনেক অন্ন রয়ে যায়। এই অসাধ্যসাধন অন্নপূর্ণার পক্ষেই সম্ভব—"তিন জনে বার মুখে পাঁচ হাথে খায়।/এই দিতে এই নাঞি হাঁড়ি পানে চায়॥.../ফির্যা অন্ন রাখে উমা দেখে গিরিবাসী।/ভোখে এত খাইনু তবু অন্ন আছে রাশি॥ (ঐ : ৩৯৭-৩৯৮)। মোটিফ ইনডেক্স অনুসারে উপরিউক্ত অসাধ্যসাধনের কাহিনিগুলির মোটিফ ক্রমাঙ্ক হল এইচ ৯০০।

খ. সতীত্বের পরীক্ষা (Chastity test) : সতীত্ব পরীক্ষা প্রথা বহু প্রাচীনকাল থেকে সমাজে প্রচলিত। নারী চরিত্রে সন্দিহান হলে আনুষ্ঠানিক আয়োজন করে নারীকে তার সতীত্বের পরীক্ষা দিতে হতো। মনসামঙ্গল কাব্যে বেহুলা এবং চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে খুল্লনার সতীত্ব পরীক্ষার একাধিক প্রসঙ্গ যেমন পাওয়া যায়, তেমনি শিবায়ন কাব্যেও গৌরীকে সতীত্বের পরীক্ষা দিতে হয়েছে। শিবপ্রাসঙ্গিক কাহিনি হিসাবে গৌরীর কাহিনিটি নিম্নে আলোচিত হল। রামকৃষ্ণ কবিচন্দ্র রচিত শিবায়নের কাহিনি অনুযায়ী হিমালয় নীলগিরির মুখে গৌরীর অপবাদ শোনেন। এই অপবাদ ঘোচানোর জন্য গৌরী অগ্নিপরীক্ষা (Passing through fire) দিতে সম্মত হন—"কালি মোর দিহ বিভা/আজি কর জ্ঞাতি সভা/বহ্নিশুদ্ধা হইব সংপ্রতি।"—(রামকৃষ্ণ : শিবায়ন : ১৩৬৩ : ১১৯)। আলোচ্য কাহিনির অগ্নিপরীক্ষা শীর্ষক মোটিফটির ক্রমাঙ্ক এইচ ৪১২.৪।

তথ্যের সন্ধানে

১. Garry Jane and El-Shamy Hasan (Ed.) : 'Archetypes and Motifs in Folklore and literature' (A HandbookŠ, Introduction, M.E. Sharpe, Armonk, New York, 2005, P. xv

২. আশুতোষ ভট্টাচার্য : 'বাংলার লোক-সাহিত্য' (৪র্থ খণ্ড), ক্যালকাটা বুক হাউস, কলকাতা, ১৯৬৬

৩. জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস : 'বাঙ্গালা ভাষার অভিধান' (প্রথম খণ্ড), দ্বিতীয় সং, পুনর্মুদ্রণ, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ১৯৭৯

৪. মৃত্যুঞ্জয় গুঁই : 'প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে লোকাচার ও লোকবিশ্বাস', সাহিত্যলোক, কলকাতা, ২০০৮

পর্ব : ৪

১ অঙ্গভঙ্গিকেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতি

❑ প্রবাদ-প্রবচন

ত্রিপুরি লোকনৃত্য গড়িয়া : সুর ও তালের যুগলবন্দি

অনুপম সরকার

> নৃতত্ত্ববিদদের মতে প্রস্তর যুগে মানুষের আদিম উল্লাস প্রকাশের মাধ্যম ছিল নৃত্য। কিন্তু সেই নৃত্যে কোন তাল, লয়ের অনুভূতি ছিল না। শুধু ছন্দে ছন্দে প্রাণের উল্লাস ও আশঙ্কাগুলো প্রকাশ পেত। তখন ছিল না কোন ভাষা। ছিল শুধু অভিব্যক্তি। আদিম যুগের মানুষ নৃত্যের ভিতর দিয়ে তাদের মনোবৃত্তিকে প্রকাশ করত। এই ছিল নৃত্যের আদিম পর্যায়।[১]

উপজাতীয় নৃত্য শিল্পমাত্রই জীবনাশ্রয়ী। তাই যে-কোনো শিল্পকলায় সংশ্লিষ্ট মানবগোষ্ঠীর জীবনাচরণ কমবেশি প্রতিফলিত হয়। উপজাতীয়দের গোষ্ঠীবদ্ধ কর্মকান্ডও তাদের শিল্পকলায় প্রতিফলিত হতে দেখা যায়। মূলত তাদের জীবনযাত্রার ওপর ভিত্তি করেই উপজাতীয় নৃত্যের উদ্ভব ঘটেছে। সেচ আদিকাল থেকে হিংস্র জন্তু-জানোয়ারের সঙ্গে তাদের লড়াই করতে হয়েছে; বনবাদাড় থেকে পশুপাখি শিকার করে খাদ্য আহরণ করতে হয়েছে। শিকারে যাওয়ার আগে পশুর ছবি এঁকে তারা দলবদ্ধভাবে শিকারের নকল করে নৃত্য করেছে। রুষ্ট দেবতাকে তুষ্ট করা, জ্বরা-ব্যাধি দূর করা, ফসল উদ্গামনের আকাঙ্ক্ষায় বৃষ্টি কামনা করা কিংবা মারি-মড়ক থেকে বাঁচার জন্য তারা নানারকম আচার-অনুষ্ঠানের জন্ম দিয়েছে এবং সে সূত্রেই সৃষ্টি হয়েছে নৃত্যেরও। যুগের পরিবর্তন ও সমাজবিকাশের কারণে মানুষের কাজের পদ্ধতি পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নৃত্যের ভঙ্গিমাও পরিবর্তিত হয়েছে। নৃত্যে হিংস্রতা ও আক্রমণাত্মক মানসিকতার পরিবর্তে স্থান পেয়েছে নান্দনিকতা। এভাবে আদি মানবগোষ্ঠীর সেই আদিম নৃত্যধারা রূপান্তরের মাধ্যমে আজও প্রবহমান। আদিম মানুষ প্রকৃতির সঙ্গে যুদ্ধ করে করে নিজেকে টিকিয়ে রেখেছে। বন্যপ্রাণি শিকারে সফলতা, খাদ্য আহরণের আনন্দ, যুদ্ধ জয়ের সফলতা প্রকাশ করতে গিয়ে যে শারীরিক অভিব্যক্তি তা থেকেই নৃত্যের জন্ম হয়। আদিম মানুষের জীবনযাত্রাকে লক্ষ রেখেই গবেষকরা আদিম যুগের নৃত্যকলাকে তিনভাগে ভাগ করে—

আদিমযুগের নৃত্যকলা

শিকারভিত্তিক জীবন　　পশুপালনভিত্তিক জীবন　　কৃষিভিত্তিক জীবন

প্রাচীন প্রস্তর যুগের শিকারজীবী মানুষদের থেকেই শুরু হলো শিকারভিত্তিক নাচ। এরপর শুরু হলো মানুষের পশুপালনভিত্তিক জীবন। মানুষ এবার পশু-পাখি ইত্যাদির চলার ভঙ্গি অনুকরণের চেষ্টা করতে শুরু করল নৃত্যের মাধ্যমে। নৃত্যকলা রূপ নিয়েছে পশুপালনভিত্তিক। এরপর তাম্র যুগে কৃষির আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে কৃষিভিত্তিক নাচ-এর প্রচলন শুরু হয়। এই প্রসঙ্গে সমালোচক বলেছেন—

> উপজাতীয় বা লোকনৃত্যের ক্ষেত্রে একটি কথা মনে রাখা দরকার—জীবিকাই হলো মানুষের সমাজ ও সংস্কৃতির প্রধান ভিত্তি। নৃত্যের আদিতে শিকারভিত্তিক নাচ, পশুপালনভিত্তিক নাচ বা কৃষিভিত্তিক নাচ নিয়ে যত কিছুই বলি কি না কেন, সব কিছুই রয়ে গেছে জীবন জীবিকাভিত্তিক তথা খাদ্য উৎপাদনের সঙ্গে পরোক্ষভাবে যুক্ত। অবসর বিনোদনের জন্য নৃত্য অনেক পরে এসেছে। তাই নৃত্যের উৎসের প্রথম শীর্ষবিন্দুতে রয়ে গেছে জীবিকা তথা খাদ্য উৎপাদন, এরপর অনুকরণ এবং সবার শেষে বিনোদন।[৩]

একটি ছক করলে দাঁড়ায়

নৃত্যের উৎস
|
জীবিকা তথা খাদ্য উৎপাদন
|
অনুকরণ
|
বিনোদন (৪)

২

ত্রিপুরায় মূলত ১১টি উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর লোক দেখা যায়। এই জনগোষ্ঠীর মধ্যে আবার ভিন্ন ভিন্ন নৃত্য রীতি প্রচলিত আছে। এই আদিম উপজাতিরা প্রাচীন মঙ্গোলীয় গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। আদিম জনগোষ্ঠীর স্বকীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য তাদের মধ্যেও প্রতিফলিত হয়েছে। যেমন অস্ট্রিক জাতিগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত সিংহলের বন্নম নাচে পশুপালনভিত্তিক বৈশিষ্ট্য আছে তেমনি ত্রিপুরার মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠীর উপজাতিদের মধ্যেও মোরগ, বাঁদর, টিয়াপাখি, পায়রা, ব্যাঙ ইত্যাদির অনুকরণে নৃত্যের ভঙ্গি দেখতে পাওয়া যায়।

প্রতিবছর বৈশাখ মাসের প্রথম দিন থেকে গড়িয়া দেবতাকে নিয়ে গ্রামের প্রতিটি বাড়িতে

ঘোরেন একদল লোক। গড়িয়া দেবতা বাড়িতে আসছেন দেখে বাড়ির নারীরা উঠানে জল ছিটিয়ে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে একটি পিঁড়ি বসান। গড়িয়া মূর্তিকে এ পিঁড়িতে বসানো হয়। পরিবারের কর্তা, গৃহিণীসহ সব সদস্য ধূপ দেখিয়ে বরণ করে প্রণাম করেন। একই সঙ্গে চালসহ অন্য ফসল ও নগদ রুপি চাঁদা হিসেবে দেন। দেবতাকে উঠানে পিঁড়িতে বসানো পরিক্রমার সঙ্গে আসা নারী-পুরুষ বাবা গড়িয়াকে ঘিরে গান করতে করতে নৃত্য করেন। একই ভাবে পহেলা বৈশাখ থেকে ৭ বৈশাখ পর্যন্ত এভাবে এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে পরিক্রমা করা হয়। বৈশাখ মাসের সপ্তম দিনে হয় গড়িয়া পূজা। এদিন গ্রাম ঘুরে যে চাঁদা সংগৃহীত হয় তা দিয়ে পুজোর আয়োজন করা হয়। হিন্দুদের অন্য সব মূর্তি থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। গড়িয়া মূর্তি তৈরি হয় বাঁশ, আদিবাসীদের হস্ততাঁতে তৈরি কাপড় ও জুমের চাল দিয়ে। গড়িয়া পুজোর জায়গাও তৈরি করা হয় বাঁশ দিয়ে। পুজোর দিন মোরগ, কবুতর ও পাঠা বলি দেওয়া হয়। আবার কেউ কেউ কবুতর বলি না দিয়ে গড়িয়ার কাছে উৎসর্গ করে ছেড়ে দেন। মূলত গ্রামের মানুষের মঙ্গল কামনা করে ও জুমে অধিক ফসল ফলনের প্রার্থনার আশায় গড়িয়া দেবতাকে সন্তুষ্ট করতে যুগ যুগ ধরে ত্রিপুরার সনাতন আদিবাসীরা এ পূজার আয়োজন করে আসছেন। ভারতীয় লোকনৃত্যগুলোর উৎপত্তি হয়েছে খাদ্য উৎপাদন, অনুকরণ, যাদুবিশ্বাসকে কেন্দ্র করে। ত্রিপুরীদের লোকনৃত্যেও এই বৈশিষ্ট্যগুলো প্রতিফলিত হয়েছে কারণ এর মূল উৎস একই ভাবনা থেকে। গড়িয়া নৃত্য ককবরক ভাষা গোষ্ঠীর প্রধান নৃত্য। এছাড়াও অন্যান্য উপজাতিদের মধ্যে এই নৃত্য প্রচলিত আছে তা হলো—

উপজাতি	সামাজিক উৎসব কেন্দ্রিক নৃত্য	পশুপাখির অনুকরণ মূলক নৃত্য	আচার অনুষ্ঠান মূলক নাচ	ধর্ম ও দেবতা কেন্দ্রিক নাচ
ত্রিপুরী	গড়িয়া	গড়িয়া	গড়িয়া নৃত্যের আচার অনুষ্ঠান	গড়িয়া প্রতীক পূজা বাঁশ
জমাতিয়া	গড়িয়া		গড়িয়া প্রতীক বাঁশ নির্বাচনের কিছু কিছু আচার অনুষ্ঠানের আশ্রয় নেওয়া হয়	গড়িয়া মূর্তির শুধুমাত্র মাথা পূজা
নোয়াতিয়া কলই	গড়িয়া	পশুপাখির অনুকরণ মূলক নৃত্য	গড়িয়া নৃত্যের পূর্বে আচার অনুষ্ঠান	
রূপিণী	গড়িয়া	পশুপাখির অনুকরণমূলক নৃত্য	গড়িয়া নৃত্যের শুরুর পূর্বে আচার অনুষ্ঠান	

চৈত্রসংক্রান্তি থেকে বৈশাখের সাতদিন ধরে এই পুজো হয়। একটি বাঁশকে নতুন রিয়া বা রিসা পড়িয়ে পুজোর আয়োজন করা হয়। পুজোর পর রাতে ছেলেমেয়েরা দলবেঁধে গড়িয়া দেবতার সামনে নাচে। গড়িয়া দেবতার নামানুসারে এই নৃত্যটির নাম গড়িয়া। গড়িয়া পুজোতে এই নৃত্যটি একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। গড়িয়া নৃত্যটি অনেকগুলো পর্বে ভাগ করা হয়েছে। ত্রিপুরী উপজাতিরা বলেন যে, গড়িয়া নৃত্যে ১০৮টি পর্ব প্রচলিত ছিল কিন্তু বর্তমানে ২৪ বা ২৫টি পর্বই রয়ে গেছে। বৈশাখ শুরু হয় বর্ষবরণের আগের দিন থেকে। আর শুরুর এক সপ্তাহ আগেই সাধারণত গড়িয়া নৃত্যের দল বেরিয়ে পড়ে পাহাড়ের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে। গড়িয়া নৃত্য ত্রিপুরাদের জনজীবনে বিজয় স্মারক হিসেবে অনুষ্ঠিত হয়। বৈশাখ-এর অন্তত এক সপ্তাহ আগে থেকে কমপক্ষে ১৬ জন ত্রিপুরা নারী-পুরুষের দল বেরিয়ে পড়েন পাহাড়ি পল্লিতে। প্রতিটি ঘরের উঠোনে বিশেষ বৈশিষ্ট্যের গড়িয়া নৃত্য পরিবেশন করেন। শিল্পীদের মধ্যে সবচেয়ে বয়সী একজনের কাঁধে থাকে শুল। পতাকার মতো করে শুলে বাঁধা থাকে একটি খাদি। শূলটি যে ঘরের আঙিনায় বসানো হবে, সেখানেই চলে বিচিত্র ও আনন্দঘন পরিবেশে নৃত্য। জানা যায়, নৃত্যের উল্লেখযোগ্য অন্তত ২২টি মুদ্রার মধ্যে চাংখা কানাই, খলাপালনাই, মাইকিসিল নাই, তাকরু তাই নাই, তুলা কানাই, খুল খুক নাই, রিসু নাই, মাতাই খুলুমনাই প্রভৃতি পরিবেশন করা হয়। মেয়েরা রিনাই রিচাই, গলায় মুদ্রার মালা এবং ছেলেরা ধুতি মাথায় গামছা বাঁধেন।

সিপাহীজলা ত্রিপুরার বিধানসভা ‘রংমালা’ গ্রামে ত্রিপুরা উপজাতিদের মধ্যে প্রচলিত গড়িয়া নৃত্যটিকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় এখানে ১৫টি পর্ব উপস্থাপিত হয়েছে—

১. খুলমনি—নমস্কার
২. খুমখলমানি—ফুল পাড়া
   তাই—এবং
   খুমসার মানি—কানে ফুল দেওয়া
৩. মাইসার মানি—জমিতে ধান ছড়ানো
৪. মাইকাই মানি—ধান রোপণ করা
৫. মুখবারুক মানি—বাঁদর তাড়ানো
৬. মাইনাকমা—ধান মাড়ানো
৭. খিচু মুসুমা—বাচ্চাদের জামা কাপড় ধোওয়া
৮. খুনজু—কানে কানে কথা বলা
৯. তুকুমা—স্নান করা

১০. ইয়াথাবুমানি—হাতে তালি দেওয়া

১১. খাকলাপ ফেহালালাম—কাঁধ এবং বক্ষ আন্দোলন করা

১২. ইয়াকুং বাই ইয়াকুং—হাতির পা তোলা

১৩. মাসুনদাই খিংবপুরামা—সজারু ডান দিক এবং বাঁদিক ফিরে লেজ নাড়ানো

১৪. হরসমনি—বাঁশে বাঁশ ঘর্ষণ করে আগুন জ্বালানো

১৫. তকবীর মানি—পাখির উড়ে যাওয়া

১ নং ভঙ্গি—খুলমনি : যুবক—যুবতীরা নৃত্যের মাধ্যমে গড়িয়া দেবতাকে প্রণাম জানান।

২ নং ভঙ্গি—খুমখলমানি তাই খুমসার মানি : একহাত দিয়ে একপাশে ঝুঁকে নীচু হয়ে ফুল তুলে কানে ফুল দেওয়া।

৩ নং ভঙ্গি-মাইসার মানি : যুবক—যুবতীরা ডান পা পায়ের আঙুলের অগ্রভাগে রেখে বাঁ হাত কোমরে রেখে, ডান হাত উপরে তুলে সূচিমুখ মুদ্রা করে বাঁদিক থেকে ডান দিকে ঘোরে।

৪ নং ভঙ্গি-মাইকাই মানি : ছেলেমেয়েরা বৃত্তের মধ্যেই বা হাত মুকুল মুদ্রায় রেখে ডান হাত দিয়ে বাঁ হাত থেকে ধানের চারা নিয়ে রোপণ করতে করতে এগিয়ে যায়। আবার একই ভঙ্গিতে পিছিয়ে আসে।

৫ নং ভঙ্গি-মুখবারুক মানি : এই ভঙ্গিতে ছেলেরা দুহাত সামনে পতাকা মুদ্রায় পাশাপাশি রেখে সামনে পিছনে আন্দোলন করাতে করাতে ডান পা দিয়ে বাঁ পা পাশাপাশি টেনে নিয়ে যায়।

৬ নং ভঙ্গি—মাইনাকমা : যুবক-যুবতীরা মিলে কোমরে ধরে বাঁ পা দিয়ে জাম্প করে ডান পা উপরে তুলে আস্তে আস্তে সামনে পেছনে করতে করতে এক থেকে সাত মাত্রা পর্যন্ত যাবে। ঘুরে বাঁ দিকে একই প্রকার করে।

৭ নং ভঙ্গি-খিচু মুসুমা : ছেলেমেয়েরা বাঁ পা উঠিয়ে তিন মাত্রার মধ্যে ডান পাশে ঘুরে দুটো হাত নিচুতে জুড়ে নাড়ানো ।

৮ নং ভঙ্গি—খুনজু : ছেলেমেয়েরা পূর্বের মতনই তিন মাত্রার মধ্যে একবার ডান পাশে ঘুরে ডান হাত দিয়ে বাঁ হাতের উপর থেকে জল ঝাড়ার ভঙ্গি করা।

৯ নং ভঙ্গি—তুকুমা : ছেলে মেয়েরা একবার ডান পাশে ফিরে কানে কানে কথা বলার ভঙ্গি করে। আবার বাঁ পাশে ফিরে একই ভঙ্গি করে।

১০ নং ভঙ্গি—ইয়াথাবুমানি : যুবক-যুবতিরা প্রত্যেকে মুখোমুখি হয়ে প্রত্যেকে প্রত্যেকের হাত একবার ডান হাত দিয়ে তালি দেওয়া আবার বাঁ হাত দিয়ে তালি দেওয়া।

১১ নং ভঙ্গি-খাকলাপ ফেহালালাম : ছেলেমেয়েরা মুখোমুখি হয়ে হাত কোমরে রেখে একবার সামনে এগিয়ে কাঁধ এবং বক্ষ আন্দোলন করা। আবার নিজেদের দেহকে পিছন দিকে বাঁকিয়ে বক্ষ আন্দোলন করা।

১২ নং ভঙ্গি-ইয়াকুং বাই ইয়াকুং : প্রথমবার ডানপাশে ঘুরে পা তুলে একটি ছেলে এবং একটি মেয়ে হাঁটুতে লাগান। আবার বাঁ পাশে একই পা তুলার অনুকরণে এই ভঙ্গিটি করা হয়।

১৩ নং ভঙ্গি-মাসুনদাই খিংবপুরামা : ছেলেমেয়েরা কোমরে ধরে পর্যায়ক্রমে লাফিয়ে লাফিয়ে কোমর বাঁকানো।

১৪ নং ভঙ্গি—হরসমনি : ছেলেমেয়েরা নিচু হয়ে মুষ্টি মুদ্রা করে দুই হাত পর্যায় ক্রমে সামনে-পিছনে দেওয়া।

১৫ নং ভঙ্গি-তকবীর মানি : শরীরকে একপাশে বাঁকিয়ে দুই হাত দুপাশে মেলে দিয়ে অল্প অল্প আন্দোলন করে।

গড়িয়া নাচের প্রত্যেকটি পর্বের শেষে দাঁড়িয়ে দুই মাত্রার মধ্যে শরীর এবং হাত আন্দোলন করে দুবার ঘুরে এসে পরবর্তী পর্ব শুরু করে। গড়িয়া নৃত্যে ত্রিপুরী উপজাতিদের চিরাচরিত পোশাক অর্থাৎ ছেলেরা পড়ে রি—বরক ও কাংচুলুই এবং মেয়েরা রিগনাইও রিসা। এই নৃত্যে প্রধান বাধ্য হচ্ছে খাম। এছাড়া সুমু, চংপ্রেং ব্যবহার করা হয়। গড়িয়া নৃত্যের প্রধান তালটি হলো—

ঘিন ঘিনি চন চন
ঘিঘিনি ঘিচন চন
ঘিচন চন ঘিচন চন
ঘিঘিনি ঘিচন চন

➲ গড়িয়া নৃত্যের বৈশিষ্ট্য

১. গড়িয়া দেবতা প্রায় ত্রিপুরার সব উপজাতিদের উপস্য, নৃত্যেই তা প্রকাশিত।
২. এই নাচের প্রতিটি পর্বের আলাদা নাম রয়েছে এবং নির্দিষ্ট পর্ব বা স্তরের মধ্যে এই নাচটি সীমাবদ্ধ রয়েছে।
৩. এই নাচের বাদ্যের তালের শুরুর পূর্বে বোল রয়েছে ।
৪. বর্তমানে এই নৃত্যে কিছুটা পরিবর্তনের ছোঁয়া দেখা গেলেও সনাতনতা বজায় রয়েছে।

বাঙালিদের ধামাইল-এর নৃত্যের সঙ্গে গড়িয়া নৃত্যের কিছুটা মিল দেখা যায়। দুটো নৃত্যই সামাজিক এবং গতিসম্পন্ন। দুটোতেই উলম্ফন ও হাতের তালুর ব্যবহার দেখা যায়। ত্রিপুরার উপজাতীয় নৃত্যগুলোর মধ্যে এটি অন্যতম সমৃদ্ধশালী নৃত্য। বিভিন্ন গবেষণা ও প্রচার এর মধ্যে সবার সামনে উঠে এসেছে এবং ভারত প্রচলিত লোকনৃত্যগুলোর মধ্যে নিজের জায়গা করে নিয়েছে। বিভিন্ন এলাকার উপজাতীয় নৃত্যের মধ্যে কমবেশি সাদৃশ্য রয়েছে। এ সাদৃশ্য দেখা যায় নাচের ধরন ও পরিবেশনায়।

অনেক ক্ষেত্রে বিষয়েও সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। ফসল কাটা, নবান্ন, জন্মমৃত্যু, বিবাহ ইত্যাদি নৃত্যানুষ্ঠানে প্রায়শই কোনও ভিন্নতা দৃষ্ট হয় না। জ্বরা-ব্যাধি দূর করা, দেবতাকে তুষ্ট করা, খরায় বৃষ্টি কামনা এসব উপজাতীয় নাচগানের সাধারণ বিষয়। তাদের নাচে বীররসের প্রাধান্য খুবই কম এবং বেশির ভাগ নাচই ধীরলয়ের ও একঘেয়ে। উপজাতীয় নৃত্যে সাধারণত মঞ্চ দরকার হয় না; সাজসজ্জা, আলোকসম্পাত বা শব্দনিয়ন্ত্রণেরও কোনও প্রয়োজন নেই। সুরে-বেসুরে সবাই মিলেই গান গায়। যন্ত্রের ব্যবহারও অনুরূপ। তবে এসব নৃত্য যখন মঞ্চে পরিবেশিত হয় তখন বিশুদ্ধ সঙ্গীত, আলোকসম্পাত, সাজসজ্জা ইত্যাদির প্রয়োজন হয়। টেলিভিশন প্রযুক্তির কারণে বর্তমানে উপজাতীয় নৃত্যের প্রচার বৃদ্ধি পেয়েছে।

উৎসের সন্ধানে

১. ড. বিলকীস বেগম : 'নৃত্যের একাল-সেকাল', চন্দনা পাবলিকেশনস, ২০০৩, ঢাকা, পৃ. ৩০
২. ড. পদ্মিনী চক্রবর্তী : 'গড়িয়া নৃত্য', মানবী সাহিত্য পত্র, মানবী প্রকাশন ২০০১, আগরতলা, পৃ. ২৬
৩. তদেব : পৃ. ২৭
৪. উৎ-১ : পৃ. ৩৫৫
৫. তদেব : পৃ. ২৯

প্রসঙ্গ বাংলার লোকনৃত্য 'ছৌ' ও বিশ্ব-পরিক্রমা

নীলোৎপল জানা

১৯৭২ সালে ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য ছৌ-নৃত্যের উপর একটি ইংরেজি গ্রন্থ প্রকাশ করেন, যার নাম 'Chhau Dance of Purulia'। এটি রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত হয়। ঠিক এর পরেই এই নৃত্য সারা বিশ্বে খ্যাতিলাভ করে; পরে বাংলার মানুষ বাংলায় লেখা একটি গ্রন্থের প্রয়োজন অনুভব করেন। এই প্রয়োজনীয়তা ড. ভট্টাচার্য অনুভব করে ১৯৭৬ সালে 'বাংলার লোকনৃত্য' গ্রন্থটি প্রকাশ করেন। এরপর বাংলার জনমানসে বইটির প্রচার ও প্রসার ঘটে। 'বাংলার লোকনৃত্য' গ্রন্থের সূচিপত্রে নৃত্যের উদ্ভবের কারণ সম্পর্কে একটি অধ্যায়ের উল্লেখ থাকলেও ড. ভট্টাচার্য নিবেদন অংশে এই নৃত্যের ব্যুৎপত্তি নিয়ে আলোচনা করেছেন। তাঁর বক্তব্য হলো—

> এই নৃত্যের নাম ছৌনৃত্য, এই বিষয়ে কোনো সংশয় নেই। কারণ, ময়ূরভঞ্জ, সেরাইকেল্লা এবং পুরুলিয়া সর্বত্রই এই নৃত্য কোনো না কোনো ভাবে প্রচলিত আছে এবং তা একই উৎস থেকে উদ্ভূত হয়েছে। ময়ূরভঞ্জ এবং সেরাইকেল্লায় নৃত্যের নাম ছৌনৃত্য, পুরুলিয়ায় ও তার নাম ছৌনৃত্য। কিন্তু পুরুলিয়ায় অনেক জায়গায় আঞ্চলিক উচ্চারণে তা কোথাও কোথাও 'ছৌ', কোথাও 'ছো' এবং কোথাও 'ছ' শুনতে পাওয়া যায়।

বিশিষ্ট ভাষাতাত্ত্বিকগণ মনে করেন 'ছদ্ম' থেকে 'ছৌ' শব্দটির উৎপত্তি। কিন্তু ছৌ-নৃত্য সর্বত্র ছদ্মনৃত্য নয়, বিশেষ করে ময়ূরভঞ্জের ছৌ-নৃত্য। ড. ভট্টাচার্য বলেছেন—"ছৌনৃত্য যে যুদ্ধনৃত্য থেকে উদ্ভূত এই বিষয়ে কারো কোনো সংশয় নেই।... সেনাবাস বা ছাউনিতে যে নৃত্যের অভ্যাস হতো তাই ছৌনৃত্য; একথা মনে করাই সঙ্গত। গ্রন্থের মধ্যে কোনো কোনো স্থলে যে আমি ছদ্ম' শব্দ থেকে 'ছৌ' শব্দটির ব্যুৎপত্তি নির্দেশ করেছি তা পরিত্যজ্য।" ড. সুধীরকুমার করণ 'সীমান্ত বাঙলার লোকযান' গ্রন্থে বলেছেন—"শিবের গাজনকে উপলক্ষ করে পশ্চিম সীমান্ত বাংলায় বিশেষ একধরনের লোকনৃত্যের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ ঘটেছে—যার নাম ছো-নাচ। না, ছৌ নয়, কোনো কারণেই ছৌ নয়; নিছক ছ-এ এ-কার ছো।" (পৃ.২১৯/২০১৩)

ছৌ নামে পরিচিত তিনটি নৃত্য পূর্বভারতের তিনটি রাজ্যে (বাংলা-বিহার-উড়িষ্যায়) প্রচলিত আছে। এই তিনটি রাজ্যে এই নাচের ধারার নাম হলো পুরুলিয়া, সেরাইকেলা, ময়ূরভঞ্জ। এই তিনটি ধারার অন্তঃপ্রেরণা যেমন অভিন্ন, তেমনি ভৌগোলিক অবস্থানের দিক থেকেও রয়েছে প্রচুর মিল। এক সময় (১৯৪৮ সালের আগে) ময়ূরভঞ্জ ও সেরাইকেল্লা —দুই ছৌ-অঞ্চল সিংভূম জেলার সঙ্গে যুক্ত ছিল। বর্তমানে তিন রাজ্যে 'ছৌ' নৃত্যের তিনটি ধারা (যেমন—পশ্চিমবঙ্গে পুরুলিয়া, উড়িষ্যায় ময়ূরভঞ্জ, বিহারের সেরাইকেল্লা) প্রচলিত।

এই অঞ্চলগুলিতে ভূতাত্ত্বিক, ভৌগোলিক, সামাজিক কারণে অনেক নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীর পরিচয় পাওয়া যায়। এই গোষ্ঠীগুলি হলো—কুর্মি, মাহাতো, ভূমিজ, হো, শবর, খেড়িয়া, মুন্ডা, ওরাওঁ, গাওরা ইত্যাদি। জনগোষ্ঠীর দিক দিয়ে বিচার করলে এই তিন 'ছৌ' অঞ্চলের মধ্যে সামঞ্জস্য লক্ষ্য করা যায়। এই 'ছৌ' নাচে মূলত কুর্মি, মাহাতো এবং ভূমিজ সম্প্রদায় অংশগ্রহণ করে। পুরুলিয়ার উল্লেখযোগ্য জনসমষ্টি যারা মূলত ছৌ-নৃত্যের কর্ণধার তারা হলো কুর্মি, সাঁওতাল, ভূমিজ ও মুন্ডা। মুন্ডারা সমাজে বিশেষ গুরুত্ব লাভ করে; কারণ এরাই সমাজে পুরোহিত শ্রেণির কাজ করে থাকে। এই সম্প্রদায় হলো ছৌ-নৃত্যের শিক্ষক। এদের বলা হয় 'ওস্তাদ'। এই সম্প্রদায়ের লোকেরা প্রথম দিকে মন্দির-দেবদাসীদের নৃত্য-শিক্ষক ও পরিচালক ছিল বলে মনে হয়। পরে যখন মন্দিরের সঙ্গে সংযোগ ছিন্ন হয় তখন তারা 'ছৌ' নৃত্যের শিক্ষক রূপে কাজ করে চলে। ('ভারতের নাট্য ঐতিহ্য'—ড. কপিলা বাৎসায়ন, পৃ. ৯৭)।

'ছৌ'-এর উদ্ভব সম্পর্কে পদ্মশ্রী গম্ভীর সিং মুড়ার অভিমত হলো "ছৌ নাচের উদ্ভব কাপ ঝাপ থেকে। শিবগাজনের সময় কিছু লোক মুখে রং-কালি মেখে গায়ে ডালপালা বেঁধে গাদিন গাঁজা খাপ খাপ, গেদদা গেজা খাপ খাপ-এই তালে নাচত। একে কাপ ঝাপ বলা হতো" ('বাংলার লৌকিক নৃত্য', মহুয়া মুখোপাধ্যায়)। 'ছৌ' নাচের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ নিয়ে নানান প্রকারভেদ আছে। নাচটি ছৌ, ছছ, ছউ, ছ, ছো, ছাউ ইত্যাদি নামে অভিহিত হয়। কেউ মনে করেন সংস্কৃত 'ছদ্ম' শব্দ থেকে 'ছৌ' শব্দের উৎপত্তি। অনেকে মনে করেন 'ছৌ' শব্দটি শৌভিক শব্দজাত। কেউবা মনে করেন উৎসব শব্দ থেকে 'ছৌ' শব্দের উৎপত্তি। কোনো কোনো সমালোচক মনে করেন মুন্ডারি 'ছক' বা 'ছটা' শব্দ থেকে 'ছৌ' শব্দের উৎপত্তি। অতএব অঞ্চলভেদে 'ছৌ' নাচ নানান নামে পরিচিত হলেও সর্বজনপরিচিত নাম হলো—'ছৌ'।

তিন ধারার 'ছৌ' নাচ বিশ্লেষণ করলে পুরুলিয়ার ছৌ নাচকেই স্বাভাবিক ভাবেই আদি বলে মনে হয়। এই নাচ—পুরুলিয়া থেকে সেরাইকেল্লায় যায় এবং সেরাইকেল্লা থেকে ময়ূরভঞ্জে যায়। "ভারতের নাট্য ঐতিহ্য" গ্রন্থে ড. কপিলা বলেছেন—"পুরুলিয়ার 'ছৌ' উদ্ভব হয়েছিল, বৈষ্ণব ধর্মের বিকাশ আর পূর্ববর্তী সংস্কৃতি সমূহের মধ্যে সংস্পর্শ ও সংঘাতের ফলশ্রুতি হিসাবে।" আবার কেউ মনে করেন 'ছৌ' শব্দটি চৈতন্য-পরবর্তী যুগের। ছৌ নৃত্যের প্রেক্ষাপটে লক্ষ করা যায় ধর্মীয় বিশ্বাস ও সংস্কার। এই নৃত্য চৈত্র পরবের উল্লেখযোগ্য অঙ্গ। এর মূল ভিত্তি হল শিবশক্তির পূজা। 'সীমান্ত বাঙলার লোকযান' গ্রন্থে বলা হয়েছে 'ছৌ-নাচের সময় হল-চৈত্র মাস'। সীমান্ত বাংলায় এই নাচের নাম 'ছো' নাচ। এই নাচের শুরু চৈত্রসংক্রান্তিতে এবং সমাপ্ত হয় জ্যৈষ্ঠের রোহিণীতে। ছৌ-নৃত্যে ভক্তদের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। চৈত্র পরবে পুরুলিয়া অঞ্চলে শিবের থানগুলিতে শিবের পূজা দিয়ে ছৌ-নাচের অনুষ্ঠান হয়ে থাকে।

পুরুলিয়া জেলার গ্রামগুলিতে গাজন ও ছৌ নাচের উৎসব দেখা যায়। রাত্রি গভীর হলে ভক্তাদের স্নান অনুষ্ঠান হয়। ভক্তারা মুখোশ পরে নাচ করে থাকে। গ্রামের লোকেরা সারা রাত জেগে নাচ উপভোগ করে। শুধুমাত্র পুরুষেরা মুখোশ পরে, নারীদের মুখোশ স্পর্শ করা নিষিদ্ধ ছিল একসময়। পুরুলিয়া ছৌ-নাচের পালা শেষ হয় অশুভ শক্তির বিনাশের মধ্য দিয়ে। ড. আশুতোষ ভট্টাচার্যই প্রথম এই নাচকে বিশ্বের মানুষের কাছে পরিচিতি লাভ করালেন। এর ফলে দেশে ও বিদেশে সমৃদ্ধ নৃত্যশৈলী হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। ছৌ-নাচ মূলত

মুখোশ নৃত্য। মুখোশ অর্থে বোঝায় নকল মুখ। পূর্বে কাঠের ও লাউ-কুমড়োর খোলার মুখোশ ব্যবহারের প্রচলন ছিল। পরে কাগজের মণ্ডার দ্বারা মুখোশ তৈরি হতে দেখা গেছে। বিষয়ের তারতম্য অনুযায়ী মুখোশ-গবেষকরা মুখোশকে তিন শ্রেণিতে ভাগ করেছেন—১. ধর্মীয় আচারযুক্ত ২. নাট্যকলা সংবলিত ৩. নৃত্যকলা সংবলিত। আদিম সমাজ থেকে মুখোশ ব্যবহারের রীতি চলে আসছে। জাদু ক্রিয়ায়, শিকারে ও যুদ্ধের প্রয়োজনে মুখোশের ব্যবহার হত। কখনো কখনো মুখোশ বর্মের কাজ করত। পুরুলিয়ার প্রাচীন নৃত্যকলা 'ছৌ' যার সঙ্গে মুখোশের ব্যবহার ওতপ্রোত এবং বৈচিত্র্যময়। পুরুলিয়া জেলার বাগমুণ্ডি থানার মধ্যবর্তী এবং বাগমুণ্ডির রাজবাড়ি থেকে দু-মাইলের মধ্যে চড়িদা গ্রাম। কয়েক পুরুষ ধরে কয়েকটি পরিবার মুখোশ তৈরি করে চলেছে। গত ২০১৮ সালের ক্ষেত্র-সমীক্ষা অনুযায়ী প্রায় ৬০-৭০টি পরিবার মুখোশ নির্মাণ করেন। চড়িদা ছাড়া পুরুলিয়ার জয়পুর থানার ডুমুরডিহিতে মুখোশ তৈরি হয় বলে জানা যায়। পুরুলিয়ার মুখোশ শিল্পীরা প্রায় প্রত্যেকে হিন্দু, তবে এদের মধ্যে বেশির ভাগ কায়স্থ ও সূত্রধর সম্প্রদায়ের লোক। এদের পদবি হল পাল, দত্ত, শীল। সারা বছর ধরে এই মুখোশ তৈরির কাজ চলে না তখন তারা মাটির প্রতিমা তৈরি করে জীবিকা চালায়। আর বর্ষাকালে তারা ছুতোরের কাজ করে থাকে। এদের শিক্ষা-দীক্ষা কম হওয়ায় অর্থনৈতিক অবস্থা তেমন ভালো নয়।

নিতান্ত সাধারণ উপকরণ দিয়ে অসাধারণ মুখোশ তৈরি করে থাকে। মুখোশ গড়ার কতগুলো ধাপ আছে। সেগুলি একে একে হলো—মাটি দিয়ে ছাঁচ তৈরি করা, এরপর রোদে শুকিয়ে বা পুড়িয়ে শক্ত করা। দ্বিতীয় ধাপ হলো কাগজ চিটানো, প্রায় চার-পাঁচ বার। তৃতীয় ধাপটি হলো কাগজের প্রলেপ শুকনো হলে তার ওপর মিহি কাদার আস্তরণ দেওয়া। চতুর্থ পর্যায়টি হলো পুরনো কাপড় চেটানো। পঞ্চম পর্যায়টি হল কাঠের যন্ত্র দিয়ে পালিশ করা ও বাটালি দিয়ে চোখ কান-নাক তৈরি করা। এরপর মুখোশে রং লাগানো। রং করা শেষ হলে মুখোশ সাজানো হয়। মুকুট-পুরুলিয়া ছৌ-মুখোশের এক অপূর্ব রূপ। ক্ষেত্র-সমীক্ষা থেকে মুখোশের দাম জানা যায়; সাধারণ মুখোশ দেড় থেকে আড়াই হাজার টাকা, সাজানো মুখোশ পাঁচ থেকে কুড়ি হাজার টাকা।

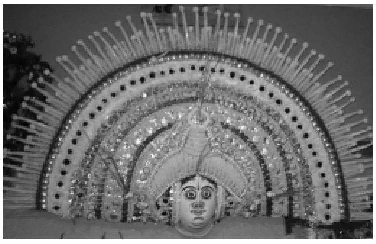

সাজানো মুখোশ

ছৌ-নাচ চারদিক খোলামঞ্চে অনুষ্ঠিত হয়। মঞ্চের চারদিকে বাদ্যকারেরা বসে। মঞ্চে কোনো মঞ্চোপকরণ থাকে না। নৃত্যানুষ্ঠানটি দলভিত্তিক হয়ে থাকে। এই নাচ দলভিত্তিক, কখনো এককভাবে হয়ে থাকে। এই সমবেত নাচকে বলে 'মেল ছৌ' এবং একক নাচকে বলে 'একুড়া ছৌ'। ছৌ-এর পালাগুলি মূলত যুদ্ধ কাহিনিমূলক। 'ছৌ-নাচ' গ্রামের মাটিতে

জন্ম নেওয়ার ফলে গ্রামের মানুষের আত্মিক যোগ লক্ষ করা যায়। এই নৃত্যের ধারা গুরুকেন্দ্রিক। তাই এর সঙ্গে গ্রামীণ জীবন যেমন আছে তেমনি আছে শাস্ত্রীয় নিয়মরীতি। এই নাচের ছয়টি অঙ্গ হলো—**১. ড্যাগ**—এক পা তুলে হাঁটা **২. চালি**—বিভিন্ন ধরনের চলন। যেমন—পশুচালি, পক্ষীচালি ইত্যাদি। **৩. ডিগবাজি**—বীরত্বব্যঞ্জক অঙ্গসঞ্চালন। **৪. উড়া**—শূন্যে পাক খাওয়া **৫. ঘুরা**—নানা ধরনের পাক খাওয়া **৬. রংবাজি**—বিভিন্ন ধরনের অভিনয়াত্মক নকশা। পুরুলিয়ার ছৌ-নাচের কাহিনি মূলত রামায়ণ-মহাভারত থেকে গৃহীত। পালাগুলোর মধ্যে দেখানোর চেষ্টা হয় শুভের জয় ও অশুভের পরাজয়। অভিনয় মঞ্চ যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয় যা ভারতবর্ষের আর কোনো নৃত্যে দেখা যায় না বলে ড. মহুয়া মুখোপাধ্যায় মনে করেন। পালাগুলোর মধ্য দিয়ে বীর, রৌদ্র, করুণ, ভক্তি ও শৃঙ্গার রসের প্রকাশ ঘটানো হয়।

'ছৌ' নাচের অপরিহার্য অঙ্গ হলো-এর আবহসংগীত। এই আবহসংগীত রচনা করতে যে যে বাদ্যযন্ত্র ব্যবহৃত হয় তা হলো ঢোল, ধামসা, টিকরা, চড়চড়ি মাহুরী, সানাই, বাঁশি ইত্যাদি। বর্তমানে কোথাও কোথাও ক্যাপাকাস, হারমোনিয়াম, করতাল ইত্যাদি ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। পুরুলিয়ায় যে ছৌ-নাচের অনুষ্ঠান হয় তার মধ্যে চারটি আঞ্চলিক ধারার সন্ধান পাওয়া যায়—১. বাঘমুণ্ডী ২. বান্দোয়ান ৩. ঝালদা ৪. আরসা। বাঘমুণ্ডী রীতির মধ্যেই ছৌ-নাচের আদি রূপটির সন্ধান পাওয়া যায়।

ছৌ-নৃত্যের বিষয়

লোকসাধক ড. আশুতোষ ভট্টাচার্যই প্রথম পুরুলিয়া অঞ্চলে ঘুরে ঘুরে ছৌ-নাচের বিষয়গুলিকে সংগ্রহ করেছেন। তিনি বলেছেন—ছৌ-নাচের প্রতিটি আসরই শুরু হয় গণেশ বন্দনা দিয়ে। এই বন্দনা থেকেই কাহিনি শুরু হয়। অঞ্চল বিশেষে এই গণেশবন্দনা নানান ভাবে হয়ে থাকে। তবে গণেশ বন্দনার সঙ্গে মূল নৃত্যের কোনো যোগফল নেই। বিশেষত ছৌ-নৃত্যের বিষয় রামায়ণ-মহাভারতকেন্দ্রিক। বাগমুণ্ডী অঞ্চলে অনুষ্ঠিত নৃত্যের বিষয়গুলি তুলে ধরা হলো—

১. গণেশবন্দনা-পরশুরামের সঙ্গে যুদ্ধ (পুরাণ) ২. খাণ্ডব দহন ৩. দুর্গা কর্তৃক গোশিঙা বধ (পুরাণ) ৪. অভিমন্যু বধ ৫. অর্জুন কর্তৃক জয়দ্রথ বধ ৬. ভীম কর্তৃক দুঃশাসনের রক্তপান ৭. অর্জুন কর্তৃক কর্ণবধ ৮. উরুভঙ্গ ৯. জরাসন্ধ বধ (ভাগবত পুরাণ) ১০. বালী বধ ১১. হনুমানের গন্ধমাদন আনয়ন ১২. অমৃত হরণ (পুরাণ) ১৩. ঘটোৎকচ বধ ১৪. বকাসুর বধ ১৫. কালকেতুর সঙ্গে প্রতাপভানুর যুদ্ধ (পুরাণ) বাংলার লোকনৃত্য ১৬. কীরাতাজুনীয় ১৭. লক্ষ্মণ কর্তৃক মেঘনাদ বধ ১৮. হিরণ্যকশিপু বধ (ভাগবত) ১৯. অঘাসুর, বকাসুর বধ (ভাগবত) ২০. মায়ামৃগবধ (রামায়ণ) ২১. কলন্দের সঙ্গে হনুমানের যুদ্ধ ২২. রাবণ কর্তৃক

সীতাহরণ ২৩. রাবণের সঙ্গে জটায়ুর যুদ্ধ ২৪. মহিষাসুর বধ ২৫. অর্জুনের সঙ্গে বভ্রুবাহনের যুদ্ধ ২৬. বলরামের রাম ২৭. শূর্পনখার নাসিকাচ্ছেদন ২৮. ব্যাধ কর্তৃক কৃষ্ণের দেহত্যাগ ২৯. তারকাসুর বধ ৩০. দুর্গাকর্তৃক চিকুরাসুর বধ ৩১. প্রসেনজিতের মণিহরণ (ভাগবত) ৩২. রাবণ বধ ৩৩. তাড়কা রাক্ষসী বধ ও সীতার সয়ংবর ৩৪. কৃষ্ণকর্তৃক যুদ্ধ ৩৫. মহীরাবণ বধ ৩৬. নরান্তক রাক্ষস ৩৭. শিব ও যমের যুদ্ধ ৩৮. তরণীসেন বধ ৩৯. বালী কর্তৃক রাবণের বন্ধন ৪০. শুম্ভ-নিশুম্ভ বধ ৪১. শিবরামের যুদ্ধ ৪২. গয়াসুর বধ (ভাগবত)।

ঝালদা অঞ্চলে নৃত্য বিষয়ের মধ্যে আধুনিক সাজসজ্জার প্রবেশ ঘটায় অনেকে এর ঐতিহ্যের বিচ্যুতিকে লক্ষ করেছেন। ঝালদা অঞ্চলের ছৌ-নৃত্যের বিষয়ের কয়েকটি দিক উল্লেখ করা যাক—১. তারকাসুরের জন্ম ও তপস্যা (পুরাণ) ২. মদনভস্ম (পুরাণ) ৩. কৃষ্ণকালী (ভাগবত) ৪. বলরামের রাম (ভাগবত) ৫. অর্জুনের পাশুপাত অস্ত্রলাভ ৬. রামলক্ষ্মণের অস্ত্রশিক্ষা ৭. মহিষাসুর বধ ৮. মেল নৃত্য (মুখোশ ছাড়া) ৯. তাড়কা রাক্ষসী বধ ১০. লাঠি ছৌ ১১. অর্জুন ও প্রমীলা ১২. একুড়া নৃত্য ১৩. দক্ষযজ্ঞ নাশ ১৪. সতীদেহ স্কন্ধে শিবের ত্রিভুবন ভ্রমণ ১৫. উষা হরণ (ভাগবত) ১৬. প্রলম্বাসুর বধ (পুরাণ)।

আশুতোষ ভট্টাচার্য ‘ছৌ নৃত্যে বিষয়’ প্রবন্ধের শেষে একটি আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেছেন—“ঝালদার ছৌ-নৃত্যে সুনির্দিষ্ট কাহিনিগত কোনো ধারা আজ আর অনুসরণ করা হয় না, তার ফলে নৃত্যের কোনো বিষয়ই মনের উপর দাগ কাটতে পারে না। সুতরাং এখানে এই নৃত্যের বিলোপ আসন্ন হয়ে এসেছে।” (‘বাংলার লোকনৃত্য’ পৃ. ৬২)

এই নৃত্যের সঙ্গে যে সংগীতযুক্ত তা নৃত্যশিল্পীরা গায় না; এর জন্যে একজন গায়ক থাকেন। গানের সঙ্গে সঙ্গে নাগরা, ঢোল, ধামসা বাদ্য বাজতে থাকে। কোথাও কোথাও সানাই বাজতে দেখা যায়। তবে যে অঞ্চলে সামন্ত রাজপরিবারের প্রভাব লক্ষ করা যায়, সেখানে সানাই-এর ব্যবহার করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের ‘ছৌ-নৃত্যে ধামসা, নাগরা এবং ঢোলই মৌলিক বাদ্যযন্ত্র, নৃত্যকারীরা পায়ে ঘুঙুর বাঁধে; এর দ্বারা নৃত্যের তাল রক্ষা করা হয়। তবে ঢোল হল এই নৃত্যের উল্লেখযোগ্য বাদ্যযন্ত্র। ‘বাংলার লোকনৃত্য’ গ্রন্থে আশুতোষ ভট্টাচার্য লিখেছেন ছৌ-নৃত্য ইউরোপ ভ্রমণ কালে তিনটি ধামসা, দুটি ঢোল, একটি সানাই নিয়ে বাদ্যভাণ্ড গঠন করেছিল। মার্কিন দেশ সফরকালে একটি ধামসা, একটি ঢোল এবং একটি সানাই নিয়ে ছৌ-নৃত্যের বাদ্যভাণ্ড গঠিত হয়েছিল।

ছৌ-নৃত্যের রূপসজ্জা

পুরুলিয়ার ছৌ-নৃত্যের কোনো লৌকিক চরিত্র নেই। রামায়ণ-মহাভারত থেকে কাহিনি গ্রহণ করা হয় এবং চরিত্র অনুযায়ী মুখোশের পরিকল্পনাও করা হয়ে থাকে। কিন্তু ময়ূরভঞ্জের ছৌ-নৃত্যে মুখোশ নেই বলেই রূপসজ্জা লৌকিক প্রকৃতির। ওরা মালকোচা দিয়ে ধুতি পরে ও কোমরে শক্ত করে চাদর পরে। পশ্চিমবাংলার ‘ছৌ-নৃত্য’ ক্লাসিক রীতির। নৃত্যের প্রয়োজনে কটিদেশ থেকে পা পর্যন্ত হালকা ধরনের পাজামা ব্যবহার। বালিদ্বীপেও পুরুষের নৃত্যে অনুরূপ পাজামা পরতে দেখা যায়। এই পাজামার উপরে যে ডোরাকাটা দাগ থাকে তা থেকে চরিত্রের প্রকৃতি জানা যায়। একই রীতি পশ্চিমবঙ্গের ছৌ-নৃত্যের ক্ষেত্রেও লক্ষ করা যায়। ক্ষেত্রসমীক্ষা থেকে জানা যায় ছৌ-নৃত্যের ঊর্ধাঙ্গের পরিচ্ছেদে চারটি খণ্ড—যা এই নৃত্যের বিশেষত্ব।

১. সামনের বুকের উপর কারুকার্য খচিত একটি খণ্ড
২. পিঠ আচ্ছাদিত করে একটি খণ্ড
৩. কারুকার্য খচিত কোমর বন্ধ
৪. হাঁটুর উপর পর্যন্ত লম্বিত চতুর্থ খণ্ড, যার নাম 'ঘের'।

হালকা পা-জামার নাম 'ঘুটনা'। ঘুটনা কালো কাপড় দিয়ে তৈরি। চরিত্র অনুযায়ী 'ঘুটনা'র উপর লাল কিংবা সাদা ডোরাকাটা থাকে। লাল হলে বুঝতে হবে অসুর কিংবা কোনো খল চরিত্র। সাদা হলে বোঝায় রাজা কিংবা সৎ চরিত্র। আবার কোনো কোনো সময় লাল ছাড়াও অন্য কোনো রং হতে পারে। নারী চরিত্র তাঁতের তৈরি সাধারণ শাড়ি ব্যবহার করে। তাদের রূপসজ্জায় দুর্গাপ্রতিমার রূপ লক্ষ করা যায়। রাক্ষসী বা ব্যাধপত্নীর রূপসজ্জা লৌকিক। গণেশ এবং শিবচরিত্রের রূপসজ্জায় একটু ব্যতিক্রম আছে। শিব কোনোদিন 'ঘুটনা' পরে না। দুর্গা এবং কালীর রূপসজ্জা পুরোনো প্রথাকে অবলম্বন করে। পুরুষ চরিত্রের গায়ের পোশাক কনুই পর্যন্তলম্বিত, কনুই থেকে মণিবন্ধ পর্যন্ত আবৃত করা হয় রাংতার ফিতা দিয়ে। পশুপক্ষীর চরিত্রে মানুষই অভিনয় করে, তবে চরিত্র অনুযায়ী রূপসজ্জা করে। মায়ামৃগ হরিণের মুখোশ পরে হরিণের গায়ের রং অনুযায়ী জামা পরে। জাম্বুবান বা সিংহের রূপসজ্জা জীবন্ত বলে মনে হয়। কালী, দুর্গা, রাবণ প্রতিটি চরিত্র কাঠের তৈরি হাত ও মুখ লাগিয়ে অভিনয় করে। জটায়ুর রূপসজ্জায় সত্য পাখির পালক ব্যবহার করে। অশ্বারোহীর রূপসজ্জাও মনোমুগ্ধকর।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় মুখোশ-নৃত্য

পশ্চিমবঙ্গের 'ছৌ নৃত্যের সঙ্গে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর নানান নৃত্যের ঐক্য-অনৈক্যের পরিচয় পাওয়া যায়। যে সমস্ত দেশে এই নৃত্যের পরিচয় পাওয়া যায়, তা হলো—ব্রহ্মদেশ, থাইল্যাণ্ড, কম্বোডিয়া, ইন্দোনেশিয়া-যবদ্বীপ, ইন্দোনেশিয়া-বালাদ্বীপ, জাপান। জাপানের 'নো' নাটক। ব্রহ্মদেশে এক শ্রেণির লোকনাট্যের পরিচয় পাওয়া যায়, যার নাম 'জাকি'। এই নৃত্যে মুখোশের ব্যবহার লক্ষ করা যায়। তবে এদের মুখোশে বৈচিত্র্য নেই পুরুলিয়ার ছৌ-এর মতো। রাজার মুকুটও পুরুলিয়ার ছৌ-এর মতো নয়। তবে এরা রামায়ণের কাহিনি ব্যবহার করে এবং এই কাহিনিতে নতুনত্ব আছে। যেমন—ব্রহ্মদেশের যে রামায়ণ কাহিনি প্রচলিত তাতে দেখা যায় রাবণ নির্লিপ্ত, পুরুলিয়ার 'ছৌ' কাহিনিতে এর উল্টোরূপ দেখা যায়। পুরুলিয়ার ছৌ নাচে কোনো মঞ্চোপকরণ নেই অথচ বর্মি রামায়ণে মঞ্চোপকরণ আছে।

থাইল্যান্ডেও মুখোশনৃত্য হতে দেখা যায়। সেখানে অধিবাসীরা বৌদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও রামায়ণ-কাহিনি উপভোগ করেন। থাইল্যান্ডের মুখোশ বর্মি মুখোশের অনুরূপ; তবে একটু জটিল। থাইল্যান্ডের মুখোশ নৃত্যের নাম 'খন'। আগে সব চরিত্র মুখোশ পরত, ক্রমে তা লুপ্ত হয়ে কেবলমাত্র রাক্ষস-খোক্কসরা মুখোশ পরে থাকে। গ্রন্থকার থাইল্যান্ডের মুখোশনৃত্যের কয়েকটি কাহিনির পরিচয় দিয়েছে। যেমন—১. রাম-লক্ষণ কর্তৃক কাকদৈত্যের বধ, ২. সীতার ভাসান, ৩. মহীরাবণের মায়াযুদ্ধ, ৪. সর্পপাশ, ৫. ব্রহ্মাস্ত্র, ৬. হনুমানের রামভক্তি, ৭. সীতার অগ্নিপরীক্ষা। থাইল্যান্ডের 'ছৌ'-তে কোনো বিয়োগান্তক কাহিনি তুলে ধরা হয় না। কম্বোডিয়ায় রামায়ণকে বলে 'রামকের'। এতেও মুখোশের ব্যবহার হয়ে থাকে। এই মুখোশের গঠন অনেকটা বর্মি মুখোশের মতো খোলামেলা। এই নৃত্যে রাক্ষস ও বানরের চরিত্রে মুখোশ

ব্যবহৃত হয়। এই মুখোশগুলো সহজে পরা ও খোলা যায়, যা পুরুলিয়া মুখোশের পক্ষে সম্ভব নয়। কম্বোডিয়ার মুখোশনৃত্যে রামায়ণের যে সকল কাহিনি অনুষ্ঠিত হয় তা হলো—১. দণ্ডকারণ্যে রাবণ ২. রামের সোনার হরিণের পেছনে ছোটা, ৩. সীতাহরণ ৪. বালী-সুগ্রীব যুদ্ধ, ৫. সেতুবন্ধ, ৬. সীতার বনবাস, ৭. সীতার পাতালে গমন ৮. অগ্নিপরীক্ষা ইত্যাদি। বর্মি মুখোশের মতো এই মুখোশ বৈচিত্র্যহীন।

ইন্দোনেশিয়ার যবদ্বীপেও মুখোশ নৃত্যের প্রচলন আছে। এই মুখোশ বৈচিত্র্যহীন এবং নাচবার পক্ষে অত্যন্ত সহজ। পূর্বে শুধু পুরুষেরাই এই নৃত্যে যোগদান করত, এখন নারীরাও যোগদান করে থাকে। যবদ্বীপের মুখোশনৃত্যে সীতাহরণ থেকে রাবণবধ পর্যন্ত অংশ ক্রমিক ভাবে অনুষ্ঠিত হয়। ভারতবর্ষের বাইরে সবচেয়ে বেশি হিন্দু বাস করে বালিদ্বীপে। নৃত্য হলো বালীদ্বীপের হিন্দুসংস্কৃতির প্রাণ। বালীদ্বীপে মুখোশনৃত্যের প্রচলন আছে। এই মুখোশনৃত্যগুলো অত্যন্ত বৈচিত্র্যময়। এই দ্বীপের একটি উল্লেখযোগ্য মুখোশনৃত্য হল 'ওয়েঙ ও নৃত্য। এই নৃত্যের কাহিনি কেবলমাত্র রামায়ণ থেকে গৃহীত হয়। গ্যামোলিন নামক একশ্রেণির ধাতুনির্মিত যন্ত্র এই নৃত্যে বাজানো হয়। এই নৃত্যকে এই দ্বীপের প্রাচীন নৃত্য হিসাবে ধরা হয়।

রামায়ণের বিষয় নিয়ে আর একশ্রেণির নৃত্যনাট্য বালিদ্বীপে প্রচলিত আছে তার নাম 'কেচক নৃত্য'। এই নৃত্যে সাজ-সজ্জার কোনো বাহুল্য থাকে না। তবে সীতা ছাড়া কোনো কোনো চরিত্র মুখোশ পরে। এছাড়াও আর এক শ্রেণির রামায়ণ-নৃত্যের পরিচয় পাওয়া যায় তার নাম হলো— 'আর্যনৃত্য'। এই নৃত্যনাট্যে মুখোশের ব্যবহার নেই। চতুর্থ শ্রেণির আর একটি রামায়ণ নৃত্যের নাম হলো 'প্রেম্বন। এটি সর্বাধুনিক নৃত্যনাট্য। ১৯৭০ সালে এই নৃত্য জাতীয় স্বীকৃতি লাভ করে। এই সব দেশ ছাড়াও শ্রীলঙ্কা, লাওস, ফিলিপাইন প্রভৃতি দেশে মুখোশনৃত্যের প্রচলন আছে। জাপানের 'নো' নাটক একটি মুখোশনৃত্য; তবে আনুপূর্বিক মুখোশ নৃত্য নয়। পুরুলিয়ার ছৌ-নৃত্যে যেমন অশুভশক্তির বিনাশ দেখানো হয়; 'নো'-নাটকেও তেমনি আছে। প্রাচীন মহাকাব্য থেকে যেমন ছৌ-নাচের বিষয় সংগৃহীত হয় তেমনি 'নো' নাটকেও জাপানিদের প্রাচীন মহাকাব্য থেকে কাহিনি গৃহীত হয়। 'ছৌ' ও 'নো'—নাটকের বাদ্যভাণ্ডের মধ্যেও ঐক্য আছে বলে জানা যয়।

বিশ্বপরিক্রমায় ছৌ-নৃত্য

বিশ্বের দরবারে ভারতের ধর্মকে, সংস্কৃতিকে যেমন চেনাতে সাহায্য করেছিলেন বিবেকানন্দ তেমনি বিশ্বের দরবারে বাংলার প্রত্যন্ত গ্রামের একটি লুপ্তপ্রায় নৃত্যকে তুলে ধরতে সাহায্য করেছেন ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয়। ১৯৬৯ সালের আগে এই নৃত্য সম্পর্কে, বিশ্বের মানুষ জানত না। ১৯৭১ সালে ইন্দোনেশিয়ার একটি আলোচনাচক্রে যোগ দিয়ে ছৌ-নৃত্য সম্পর্কে তিনি নানান তথ্য দেন। এর পর ১৯৭২ সালে ফরাসি সরকার বাংলার ছৌ-নৃত্যকে আমন্ত্রণ জানায়। এরপর ইংলন্ড, হল্যান্ড, স্পেন দেশে এই নৃত্য করবার সুযোগ হয় ছৌ-শিল্পীদের। এই সময় প্রায় দুমাস ইউরোপের দেশগুলিতে এই নৃত্যের অনুষ্ঠান চলতে থাকে। ১৯৭৫ সালের জানুয়ারি মাসে ছৌ-নৃত্যের দল মার্কিন দেশে যাত্রা করে। সেখানেও প্রায় আড়াই মাস ধরে নৃত্যের অনুষ্ঠান চলতে থাকে। এই সময় যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার পঁচিশটি বিশ্ববিদ্যালয়ে নৃত্য বিষয়ে বক্তৃতা ও নৃত্যের অনুষ্ঠান করেন। এর ফলে পাশচাত্য দর্শকদের

মধ্যে যে প্রতিক্রিয়া হয়েছিল তা বিদেশের নানান পত্রপত্রিকায় তার প্রকাশ ঘটে। ড. আশুতোষ ভট্টাচার্যের তীক্ষ্ণ বিচক্ষণ দৃষ্টিতে বিদেশভ্রমণের জন্য নির্বাচিত ছৌ-নৃত্যশিল্পীরা ছিলেন—

নৃত্যে :

কলেবর কুমার : বয়স ৫৫—তোড়াং ● গম্ভীর সিং মুড়া : বয়স ৪৫—চড়িদা ● রমেশ কুমার : বয়স ২৫—তোড়াং ● জনক সিং মুড়া : বয়স ২৪— চড়িদা ● ক্ষীরোদ সিং মুড়া : বয়স ২৪—ঐ ● চৈতন সিং মুড়া : বয়স ১৮—ঐ ● জাগরু মাহাতো : বয়স ২৬—তোড়াং ● শশধর মাহাতো : বয়স ২৪—ঘোড়াবাধা ● দীপনারায়ণ মাহাতো : বয়স ২৪—কড়ং ● পতিচরণ মাহাতো : বয়স ২১—তোড়াং ● অনিলকুমার সূত্রধর : বয়স ৪০—চড়িদা

বাদ্যে :

সানাই : গণেশ কালিন্দী (বয়স ৬০)—চড়িদা ● ঢোল : ধ্রুব লায়া (বয়স ৫০)—ঐ ● দিবাকর কালিন্দী—বয়স ৪৫—ঐ ● কাড়ানাগড়া—ধামসা ● কানগু মাছোয়ার (বয়স ৫০)—চড়িদা ● বুদ্ধেশ্বর মাছোয়ার (বয়স ৪০)—তোড়াং ● উমেশ মাছোয়ার (বয়স ২৮)—ঐ ● (তথ্যসূত্র : ‘লোকনৃত্য ছৌ’-শান্তি সিংহ, পৃ. ৮২/২০১৬)

ছৌ-নৃত্য সম্পর্কে বিদেশি পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত খবর

১. **দি গার্ডিয়ান :** ২২ মে ১৯৭২ লন্ডন, সোমবার। এই পত্রিকায়—ড. ভট্টাচার্যের প্রশংসা ও তাঁরই তত্ত্বাবধানে এই নৃত্য যে প্রাণ ফিরে পেয়েছে, তার কথা আছে। এই নৃত্য যে গ্রামীণ নৃত্য তার কথাও এখানে বলা হয়েছে।

২. **ইভিনিং নিউজ :** ২৩ মে ১৯৭২, লন্ডন এই পত্রিকায়ও ছৌ-নৃত্যের প্রশংসা করা হয়েছে। প্রত্যেকের এই নৃত্য দেখা উচিত বলে মন্তব্য করা হয়েছে।

৩. **ডেইলি টেলিগ্রাফ :** ২৩ মে ১৯৭২ লন্ডন, এই পত্রিকায় ছৌ’কে চমকপ্রদ নৃত্য বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কথাকলির থেকে স্বতন্ত্র বলে উল্লেখ আছে। এই নৃত্যের মধ্যে বীরত্বের ভাব প্রশংসা করা হয়েছে এই পত্রিকায়।

৪. **টুয়েসি কুয়েন্ট :** ২৪ জুন ১৯৭২, হল্যান্ড। এই পত্রিকায় ড. আশুতোষ ভট্টাচার্যকে ‘ছৌ নৃত্যের আবিষ্কারক’ বলা হয়েছে এবং হল্যান্ডবাসী এই উচ্চমানের শিল্পকীর্তি এই নৃত্যের মধ্য দিয়ে প্রত্যক্ষ করলেন বলে উল্লেখ আছে।

৫. **ভকৃস্ক্রান্ত (Vakskrant) :** ২০, জুন ১৯৭২, আমস্টারডাম এই পত্রিকায় ‘ছৌ’-কে মুখোশ-নৃত্য রূপে উল্লেখ করা হয়েছে। এই নৃত্যে রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনি যুক্ত হয়েছে ২০০ বছর পূর্বে, এই কথা পত্রিকায় লেখা হয়েছে।

৬. **হেটবিনেহ (Het Binnenho) :** ২৬, জুন ১৯৭২ দি হাগ (হল্যান্ড)—এই পত্রিকায় ছৌ-কে ভরতনাট্যম, কথাকলি, কথক ও মণিপুরী নৃত্য থেকে সম্পূর্ণ পৃথক বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়াও পেশাদারি নাট্যমঞ্চ অপেক্ষা উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে এই নৃত্যের উপভোগ্যতা সম্পর্কে বলা হয়েছে।

৭. **দ্য নুর উসটার (De Noord-Oster) :** ২৩, জুন ১৯৭২, হল্যান্ড এনে। এই

পত্রিকায় ছৌনৃত্য সম্পর্কে বলা হয়েছে এটি নিঃসন্দেহে হল্যান্ড উৎসবের অন্যতম বাংলার ‘লোকনৃত্য উদ্দীপক লোকনৃত্য’ এই নৃত্যের বিষয়বস্তু যুদ্ধ। এই নৃত্যে অংশগ্রহণকারীরা সকলে পুরুষ এবং তারা স্ত্রীর ভূমিকায়ও অংশগ্রহণ করে থাকে সফলতার সঙ্গে।

৮. **দি নিউইয়র্ক টাইমস :** ২৯, জানুয়ারি-১৯৭৫-নিউইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র। এই পত্রিকায় ‘ছৌ নৃত্যের নানান দিক নিয়ে আলোচনা প্রকাশিত হয়েছে। বিশেষ করে নৃত্যভঙ্গিমা নিয়ে নানান দিক তুলে ধরা হয়েছে।

৯. **ডেইলি ইলিনি :** ২৬, ফেব্রুয়ারি ১৯৭৫, ইলিনয়, যুক্তরাষ্ট্র। এই পত্রিকায় ড. ভট্টাচার্যের বহুল প্রশংসা করা হয়েছে এবং এই নৃত্যকে মুখোশ-নৃত্য রূপে বলা হয়েছে। মুখোশগুলো কীভাবে ও কী দিয়ে তৈরি তার কথা বলা হয়েছে এই পত্রিকায়। (‘বিশ্ব পরিক্রমায় ছৌ-নৃত্য’ প্রবন্ধ-ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য)

তথ্যের সন্ধানে

১. আশুতোষ ভট্টাচার্য : ‘বাংলার লোকনৃত্য’ প্রথম খণ্ড ১৯৭৬, কলকাতা
২. আশুতোষ ভট্টাচার্য : ‘বাংলার লোকসাহিত্য’, ২০০৪, কলকাতা
৩. পল্লব সেনগুপ্ত : ‘লোকসংস্কৃতির সীমানা ও স্বরূপ’, ২০০২, কলকাতা
৪. সুধীরকুমার করণ : ‘সীমান্ত বাংলার লোকযান’, ২০১৩, কলকাতা
৪. অনিমেষকান্তি পাল : ‘লোকসংস্কৃতি’, ২০০৯, কলকাতা
৫. বরুণকুমার চক্রবর্তী : ‘লোকসংস্কৃতি প্রসঙ্গ’, ২০১৩, কলকাতা
৬. সরওয়ার মুর্শেদ : ‘লোকসংস্কৃতি অন্বেষা’, ২০১৪, ঢাকা, বাংলাদেশ
৭. মযহারুল ইসলাম : ‘ফোকলোর পরিচিতি ও পঠন-পাঠন’, ২০১২, ঢাকা, বাংলাদেশ
৮. মহুয়া মুখোপাধ্যায় : ‘বাংলার লৌকিক নৃত্য’, ২০০০ কলকাতা
৯. শান্তি সিংহ : ‘লোকনৃত্য ছৌ’, ২০১৬, কলকাতা
১০. নীলোৎপল জানা : ‘লোকসাধক আশুতোষ ভট্টাচার্য’, ২০১৯ মহিষাদল, পূর্ব মেদিনীপুর
১১. ক্ষেত্র সমীক্ষা : পুরুলিয়া ২০১৮

লোকনাট্যে ছুক্‌রি : প্রসঙ্গ ব্যক্তিজীবন

দেবব্রত রায়

লোককৃষ্টির এক অনন্য পরম্পরা লোকনাট্য। লোকসমাজের মনতুষ্টি সাধনের ঐতিহ্য লোকনাট্য বহন করে চলেছে বহু প্রাচীনকাল থেকে। বর্তমান আধুনিক যুগেও লোক সমাজের মনতুষ্টি সাধনের ক্ষেত্রে লোকনাট্যের প্রাসঙ্গিকতা যথেষ্টই। কালের বিবর্তনে লোকসমাজের যেমন পরিবর্তন সাধিত হয়েছে, তেমনি লোকনাট্যও অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিকভাবে বিবর্তিত হয়ে নিজেকে লোকসমাজের আশানুরূপ করে গড়ে নিয়েছে। ফলত বর্তমান আধুনিক যুগের বিনোদন মাধ্যমের মায়া-যাদু কাটিয়ে লোকসমাজের মনতুষ্টি সাধনে লোকনাট্য আজও জনপ্রিয় মাধ্যম। আলোচ্য প্রবন্ধের আলোচনার মূল বিষয় 'ছুক্‌রি'। তবে মূল প্রসঙ্গে আলোচনায় প্রবেশের প্রাক্কালে লোকনাট্য কাকে বলব এবং বাংলায় প্রচলিত লোকনাট্যগুলো সম্পর্কে আলোকপাত প্রয়োজন।

'লোকনাট্য' শব্দ কোন একক শব্দ নয়, এটি যে একটি যুক্ত শব্দ তা প্রথমেই উল্লেখ বাঞ্ছনীয়। 'লোক' ও 'নাট্য' এই দুই শব্দের সংযুক্ত রূপ হল 'লোকনাট্য'। তাই লোকনাট্যকে জানতে লোক ও নাট্য শব্দদ্বয়ের ভাবার্থ অনুধাবন প্রয়োজন। 'লোক' শব্দের ইংরেজি প্রতি শব্দ 'Folk'। এই 'Folk' বা 'লোক' শব্দের ব্যাখ্যায় লোকনাট্য বিশেষজ্ঞ অজিত কুমার ঘোষ-এর অভিমত—

> লোক শব্দটির আভিধানিক অর্থ মানুষ বা ব্যক্তি হলেও বর্তমানে বিশেষ অর্থে নাগরিক মানব সম্প্রদায় থেকে ভিন্ন নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে আবদ্ধ ঐতিহ্য ধারাবাহী গ্রামীণ মানব সম্প্রদায়কেই বোঝায়।[১]

'লোক' শব্দের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে দুর্গাশঙ্কর মুখোপাধ্যায়-এর মন্তব্য—

> লোকনাট্যের অন্তর্গত 'লোক' শব্দটির বিশেষ অর্থ আছে। এর অর্থ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা না থাকলে লোকনাট্যকেও ঠিক বোঝা যাবে না। একটি সুনির্দিষ্ট অঞ্চলে বসবাসকারী গ্রামীণ যে মানবগোষ্ঠী দীর্ঘকাল ধরে জাতিগত একটা প্রাচীন ঐতিহ্যকে বহন করে চলেছে সেই মানবগোষ্ঠীই হলো 'লোক-গোষ্ঠী'।[২]

উপরোক্ত ব্যাখ্যা দুটির মাধ্যমে আমরা লোকনাট্যের 'লোক' সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পেলাম। এবার 'নাট্য' শব্দের ব্যাখ্যায় আসা যাক। 'নাট্য' শব্দের ইংরেজি প্রতিশব্দ 'Theatre'। তবে অনেক ক্ষেত্রেই 'নাট্য' শব্দের সমার্থক শব্দ হিসেবে 'নাটক' শব্দের ব্যবহার দেখা যায় যা সঠিক নয়। কারণ 'নাটক' হলো সাহিত্যরূপ অর্থাৎ 'Text' আর 'নাট্য' হলো 'Performance' অর্থাৎ অভিনয় সংক্রান্ত অনুষ্ঠান বা প্রদর্শন। 'নাট্য' শব্দের অর্থ প্রসঙ্গে সুকুমার সেন-এর

মন্তব্য—“নাট্য শব্দটির অর্থ হলো ‘নটের কর্ম’।”[৩] সঞ্জীব নাথ ‘নাট্য’ শব্দের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন—“নাট্য বলতে দৃশ্যবন্ধ এমন এক বিশেষ শিল্প প্রকরণকে বোঝায় যা অভিনয় করার উদ্দেশ্যে এবং আনন্দ উপভোগের জন্য মানুষের দ্বারা রচিত ও পরিবেশিত হয়ে থাকে।”[৪] সুকুমার সেন ও সঞ্জীব নাথ-এর ব্যাখ্যা থেকে ‘নাট্য’ বিষয়ে নিশ্চয়াত্মক ধারণা পাওয়া গেল।

বিশেষজ্ঞগণ ‘লোক’ ও ‘নাট্য’ শব্দদ্বয়ের অর্থ অনুযায়ী লোকনাট্যের সংজ্ঞা প্রণয়নে ব্রতী হয়েছেন। এবিষয়ে সর্বপ্রথম আশুতোষ ভট্টাচার্যের মত উল্লেখ্য—“লোকনাট্য লোকজীবনের কাহিনির উপর ভিত্তি করে মুখে মুখে রচিত এবং অভিনীত নাটক।”[৫] শিশির মজুমদার লোকনাট্যের সংজ্ঞা প্রণয়ন করেছেন এভাবে—“লোকনাট্য তাকেই বলব, যা একটি জনগোষ্ঠী সৃষ্ট, গ্রামীণ জনসাধারণের জীবনভিত্তিক, মুখে মুখে রচিত হয়ে মুখে মুখে প্রচারিত।”[৬] দুর্গাশঙ্কর মুখোপাধ্যায় প্রণীত লোকনাট্যের সংজ্ঞাটি হলো—

> গ্রামীণ সমাজে জনসাধারণের জীবনকে আশ্রয় করে মুখে মুখে রচিত রচনা যখন নাট্যলক্ষণাক্রান্ত হয়ে ওঠে এবং যা আসরে নৃত্য-গীতের মধ্য দিয়ে অভিনীত হয় তাই লোকনাট্য।[৭]

অজিতকুমার ঘোষ লোকনাট্যের সংজ্ঞা প্রসঙ্গে বলেছেন—“লোকেদের দ্বারা রচিত, অভিনীত এবং লোকেদের সম্মুখে পরিবেশিত নাটককেই লোকনাট্য বলে।”[৮] ধ্রুব দাস-এর মতে—

> লোকনাট্য হলো সমাজের ইন্দ্রিয়গত প্রত্যক্ষ দর্শন সজ্ঞাত অভিজ্ঞতা দ্বারা সঞ্চালিত নাট্য, অন্যভাবে বললে বলা যায় যে লোকনাট্য হলো লোকধর্মী আচরণের বা সংস্কারের এমন এক নাট্যরূপ যা তার আপন ক্ষেত্রের জনমানসকে আনন্দিত, উল্লসিত এবং অনুপ্রাণিত করে।[৯]

লোকনাট্যের সংজ্ঞা প্রসঙ্গে বরুণকুমার চক্রবর্তী-র মন্তব্য—“আমরা গণতন্ত্রের সংজ্ঞার অনুকরণে বলতে পারি লোকেদের দ্বারা অনুষ্ঠিত, লোকেদের জন্য অভিনীত, লোকেদের দ্বারা আদৃত মূলত লোক বিষয়ক যে নাটক তাই হলো লোকনাট্য।”[১০] সঞ্জীব নাথ লোকনাট্যের সংজ্ঞা নির্দেশ প্রসঙ্গে বলেছেন—

> লোকসমাজ কর্তৃক লোকভাষায় মৌখিক বা লেখ্যরূপে রচিত, অভিনীত, লোকসমাজের পৃষ্ঠপোষকতায় লোকবেষ্টিত আসরে পরিবেশিত, স্বল্পচরিত্র ও নৃত্য-গীত-বাদ্য সমন্বিত, প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ও শাস্ত্র নিরপেক্ষ ঐতিহ্যানুসারী বিষয়, অঙ্গসজ্জা, অভিনয় রীতিপ্রকরণাদি অনুবর্তিত বা কালানুক্রমে পরিবর্তিত হয়ে স্বতঃস্ফূর্ত ধারায় লোকজীবন ও লোকমননকে প্রতিভাসিত করে যে দৃশ্যকলা, তা-ই লোকনাট্য।[১১]

বিশেষজ্ঞদের উপরোক্ত লোকনাট্যের সংজ্ঞাগুলি বিশ্লেষণে এই প্রত্যয় হয় যে, প্রত্যেকটি সংজ্ঞাতেই লোকনাট্যের কোনও না কোনও বৈশিষ্ট্যের অনুল্লেখ রয়েছে। অতঃপর ক্ষেত্রসমীক্ষায় পর্যবেক্ষণকৃত লোকনাট্যের বৈশিষ্ট্যগুলির সার্বিক সমন্বয়ে লোকনাট্যের একটি সর্বগ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা প্রণয়নের প্রয়াস গৃহীত হলো—লোকসমাজ দ্বারা লোক-ভাষায় মৌখিকভাবে রচিত কাহিনি অথবা কখনও কখনও সেই কাহিনির লিখিত রূপ, ধর্মীয় বা লৌকিক আচার-উৎসব উপলক্ষ্যে তো বটেই, এমনকি কোনও কোনোও আনুষ্ঠানিক উপলক্ষেও লোকসমাজের পৃষ্ঠপোষকতায় লোকবেষ্টিত আসরে অপেক্ষাকৃত অল্প চরিত্র, দেশজ নৃত্য-গীত-বাদ্য-এর সমন্বয়ে কখনও কখনও আবার স্বল্প পশ্চিমী বাদ্য সহযোগে, প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ছাড়াই, দেশজ

সাজসজ্জা এবং দেশিয় রীতির অভিনয়ের মাধ্যমে স্বতঃস্ফূর্ত ধারায় পরিবেশিত হয়ে যে অভিকরণ কলা লোকজীবন তথা লোকচিত্তকে মনোরঞ্জিত এবং শিক্ষিত করে তাকেই লোকনাট্য বলা চলে।

১.

বাংলার লোকনাট্য ও চরিত্র প্রসঙ্গ

বাংলা অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গের নানা বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতির উল্লেখযোগ্য অঙ্গ লোকনাট্য। এই লোকনাট্যের বিভিন্ন আঙ্গিকের মধ্যেও রয়েছে নানা বৈচিত্র্য। বাংলার প্রধান প্রধান লোকনাট্যগুলো হলো—খন, কুশান, দোতরাপালা, গম্ভীরা, সোনারায় পালা, মদনকাম পালা, নটুয়া, রাসধারী, পালাটিয়া বা পাঁচালি, খ্যাটাযাত্রা বা যুগীপর্ব, মানব পুতুল, ডোমণী, বোলান, আলকাপ, লেটো, গাজন, লক্ষ্মীয়ালা বা লক্ষ্মীমঙ্গল, ছৌ, বনবিবি, ভাঁড়যাত্রা ইত্যাদি।

নাট্যের সঙ্গে চরিত্রের যোগ সমার্থক। চরিত্র ব্যতীত কোনো নাট্য প্রযোজনা অসম্ভব। নাট্য-এর চরিত্রগুলোকে প্রধানত দুটো ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন—মুখ্য চরিত্র ও পার্শ্ব চরিত্র। উভয় চরিত্রের ক্ষেত্রেই নাট্য চরিত্রের সামাজিক নাম থাকে (যেমন—শ্যামল, অমল, সঞ্জয়, অনিতা, কাজল ইত্যাদি) তবে লোকনাট্যের বেলায় সামাজিক নাম ব্যতীত নাটকীয় গুণানুযায়ী চরিত্রগুলোর কিছু বিশেষ নাম রয়েছে। যেমন—মূল গায়েন বা মূল বা অধিকারী, দোহার, ওসিয়া বা রসিয়া বা জোঁকার বা খিচরিয়া এবং ছুক্‌রি বা বাঈ বা ছোক্‌রা। আবার কোথাও (দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায়) ভাঁড় চরিত্রটিকে ছোক্‌রা বলা হয়। লোকনাট্য পিপাসু দর্শকদের নিকট বেশি সমাদর পায় এই নামগুলোই।

লোকনাট্যের পালাগুলিতে চরিত্র সংখ্যা কম হয়। অধিকাংশ লোকনাট্যের পালাতেই চরিত্র সংখ্যা থাকে ৫ থেকে ৮ জনের মধ্যে। কেবল পৌরাণিক ও লৌকিক কাহিনি নির্ভর লোকনাট্যের পালাগুলিতে চরিত্র সংখ্যা বেশি থাকে। তবে সবেতেই কুশীলবের সংখ্যা কম থাকে। একজন কুশীলবই একাধিক চরিত্র সম্পাদন করে থাকেন। চরিত্র সংখ্যা যাই হোক না কেন বাংলার লোকনাট্যগুলোর প্রায় সবেতেই এক বা একাধিক ছুক্‌রি চরিত্রের উপস্থিতি বর্তমান। প্রবন্ধের মূল আলোচ্য ছুক্‌রি প্রসঙ্গে আলোচনায় এবার অগ্রসর হওয়া কাম্য।

২.

ছুক্‌রি'র পরিচয়

প্রথমেই জানা যাক বাংলা অভিধানগুলিতে 'ছুক্‌রি' শব্দের কি অর্থ ব্যাখ্যা রয়েছে। সাধারণত কিশোরী কিংবা নবযৌবনা নারীর সমার্থক শব্দ হিসেবে লোকসমাজে 'ছুক্‌রি' শব্দটি প্রচলিত। 'আধুনিক বাংলা অভিধান'-এ 'ছুক্‌রি' শব্দ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে— "ছুকরি/ছুক্‌রি। (স.ছমণ্ডী >) বি.(অবজ্ঞায়) বালিকা; কিশোরী; ছুড়ি।"[১২] অর্থাৎ বালিকা বা কিশোরী'র অবজ্ঞার্থে বা তাচ্ছিলার্থে ছুক্‌রি শব্দটি ব্যবহৃত হয়। বিবর্তনমূলক বাংলা অভিধান[১৩]-এ ছুকরি/ছুক্‌রি অর্থে কাজের মেয়ে; পরিচারিকার কথা বলা হয়েছে। 'শব্দ-সংকেত' বাংলা অভিধানেও কিশোরী, বালিকা-র তুচ্ছার্থে ছুকরি/ছুক্‌রি শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।[১৪] 'বাংলা অশিস্ট শব্দের অভিধান'-এ "ছুক্‌রি অর্থে বি.নবযুবতী, কিশোরী। পুং ছোক্‌রা; মহিলা চরিত্রে

অভিনয়কারী পুরুষ অভিনেতা (লোকনাট্যদল) বলা হয়েছে।"[১৫] উক্ত অভিধান গুলোতে 'ছুক্‌রি' শব্দের বিভিন্ন বানান ব্যবহার হয়েছে। এছাড়া বিশেষজ্ঞদের ক্ষেত্রেও 'ছুক্‌রি' শব্দের ব্যবহারে বানানের ভিন্নতা স্পষ্ট। অতঃপর আলোচনার সুবিধার্থে 'ছুক্‌রি'-এই বানানকেই গ্রহণ করা হয়েছে। আমরা জানি লোকনাট্যে সাধারণত মেয়েরা অভিনয় করে না। পুরুষরা মেয়েদের চরিত্রে অবতীর্ণ হয়। প্রায় হাজার বছর ধরে আমাদের প্রাদেশিক লোকনাট্যে পুরুষ অভিনেতারাই নারী চরিত্রে অভিনয় করে আসছে। অতএব ছুক্‌রি মেয়ে হলেও আসলে পুরুষেরা ছুক্‌রি'র ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। প্রশ্ন হলো এই 'ছুক্‌রি' কে দেখতে শুনতে ভালো হলে অল্পবয়সী ছেলেদের সাধারণত ছুক্‌রি'র ভূমিকায় নামানো হয়। তাঁদের চলন বলন এমনই যে হঠাৎ করে দেখলে তাঁদের ছেলে বলে মনে হয় না। দর্শকদের মধ্যে অনেক পুরুষই শুধু নয় নিজ দলেরও অনেকে ছুক্‌রি'র প্রেমে পড়ে। অথচ তারা জানে ছুক্‌রি মেয়ে নয়—পুরুষ। স্থানভেদে ছুক্‌রি'দের কোথাও বাঈ আবার কোথাও ফ্যামিলি (পরিবার) বলে। আলকাপের ক্ষেত্রে এদের ছোক্‌রা বলা হয়। ছুক্‌রি'র অন্তর্নিহিত অর্থ নবযৌবনা কিশোরী। কিন্তু সরল অর্থে যে কোন বয়সের নারী চরিত্রে অভিনয়কারী পুরুষ শিল্পীদেরই ছুক্‌রি বলা হয়। এরা মেয়েদের মতন সায়া- ব্লাউজ ও শাড়ি পরেন। বক্ষবন্ধনীর ভেতর ব্যবহার করেন কাপড়ের দলা কিংবা তুলার প্যাড। কানে দুল, নাকে নাকছাবি, গলায় মালা, হাতে চুড়ি, চুলে ফিতা বেঁধে, মুখে চড়া মেকাপ করে গালে লাল আভা এবং ঠোঁটে লাল লিপস্টিক লাগান। সব মিলিয়ে সাজ এমন হয়, যেন যৌন আবেদনময়ী নারী।

৩.

ছুক্‌রি'দের ব্যক্তি জীবন

ছুক্‌রি বা নারী চরিত্র অভিনেতারা লোকনাট্যের অন্যান্য কুশীলবদের ন্যায় গ্রাম বাংলার অন্ত্যজশ্রেণির সাধারণ মানুষ। দারিদ্র্য এই ছুক্‌রি'দের নিত্য সঙ্গী। এদের অনেকেই কেবল পরিবারের ওপর থেকে তাঁদের ভরণ পোষণের ভার লাঘবের জন্য লোকনাট্যদলে যোগ দেন বালক বয়সেই। দরিদ্র পরিবারগুলির সন্তানদের অনেকেরই স্কুলের গন্ডি পেরোনো হয় না। কারো কারো আবার লোকনাট্যদলে যোগদানের পর স্কুল জীবনের সমাপ্তি ঘটে। ফলত ছুক্‌রিদের মধ্যে স্বল্প শিক্ষিতদের প্রাধান্য হওয়াটাই স্বাভাবিক। ছুক্‌রি'দের অধিকাংশই হিন্দু ধর্মালম্বী, অল্প কিছু সংখ্যকই কেবল মুসলিম ধর্মালম্বী। জাতিগতভাবে দেখলে আমরা মূলত তপশিলি জাতি, তপশিলি উপজাতি ও ও.বি.সি. জাতিরই উপস্থিতি দেখতে পাই। তবে কিছু সংখ্যক উচ্চবর্ণের উপস্থিতি দেখা গেলেও তাঁরা আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে তপশিলি জাতি কিংবা ও.বি.সি.জাতির অন্যান্য ছুক্‌রি'দেরই সমগোত্রীয়। তবে একথা বলতেই হবে যে, ছুক্‌রি'দের মধ্যে সবচেয়ে বেশি আধিক্য তপশিলি জাতিরই। ছুক্‌রি'দের অধিকাংশই দিনমজুর কিংবা কৃষিজীবী। অধিকাংশ ছুক্‌রি'ই দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করেন। এদের বেশির ভাগই কৃষি জমিহীন। ছুক্‌রি'দের অনেকেই লোকনাট্য শিল্পীদের আর্থ-সামাজিক মান উন্নয়নের লক্ষ্যে রাজ্য সরকারের গৃহীত লোকপ্রসার প্রকল্পের সুবিধা পান। যা ছুক্‌রি'দের ব্যক্তিজীবনকে যথেষ্টই প্রভাবিত করে। আমরা জানি ছুক্‌রি'দের সাধারণত সমাজ অবজ্ঞার চোখেই দেখে। তবে অনেক ছুক্‌রি'ই সমাজে বিশেষ মর্যাদাও পান।

ক্ষেত্রসমীক্ষা[১৬]-র মাধ্যমে বাংলার দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার ৪৮ জন ছুক্‌রি বা নারী চরিত্রাভিনেতার ব্যক্তি তথা সামাজিক জীবন ও কর্মজীবনের তথ্যাদি সংগৃহীত হয়েছে। যা উপস্থাপনে ছুক্‌রি'দের ব্যক্তি জীবন সম্পর্কে স্পষ্টতই ধারণা পাওয়া যায়। ছুক্‌রি'দের মধ্যে ১৪ বছর থেকে ৪০ বছর বয়স্করা সমীক্ষায় স্থান পেয়েছে। ছুক্‌রি'দের ব্যক্তিজীবন বিষয়ে ক্ষেত্রানুসন্ধান লব্ধ তথ্য কি কথা বলে এবার দেখা যাক। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার সমীক্ষিত ৪৮ জন ছুক্‌রি'র মধ্যে সকলেই হিন্দুধর্ম পালন করেন। ৪৮ জনের মধ্যে সাধারণ জাতিভুক্ত ৩ জন, তপশিলি জাতিভুক্ত ৪০ জন, তপশিলি উপজাতিভুক্ত ২ জন এবং ও ও.বি.সি. ৩ জন। সাধারণ জাতির মধ্যে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ভুক্ত ১ জন ও মাহিষ্য ২ জন। তপশিলি জাতির ৪০ জনের মধ্যে রাজবংশি সম্প্রদায়ের মানুষ ২২ জন, পলিয়া ১৫ জন, মুচি ২ জন ও ১ জন লোহার সম্প্রদায়ভুক্ত।

তপশিলি উপজাতির ১ জন লোহারা ও ১ জন সাঁওতাল সম্প্রদায়ের মানুষ। ও.বি.সি. শ্রেণীর ৩ জনই নাপিত সম্প্রদায়ের মানুষ। ছুক্‌রি'দের শিক্ষা জীবনের দিকে দেখলে দেখা যায় জেলার ৪৮ জনের মধ্যে ৬ জন নিরক্ষর ও ৪২ জন সাক্ষর। সাক্ষরদের মধ্যে প্রাথমিক স্তর শিক্ষিত ১৬ জন, উচ্চ প্রাথমিক স্তর ১৮ জন, মাধ্যমিক ৫ জন, উচ্চ মাধ্যমিক ১ জন ও ২ জন স্নাতক স্তর শিক্ষিত। পেশার ক্ষেত্রে ৪৮ জনের মধ্যে ৮ জন লোকনাট্য ছাড়া অন্য কোন পেশায় যুক্ত নয়, লোকনাট্যই তাঁদের উপার্জনের একমাত্র উৎস। ১৩ জন কৃষিজীবী ১৭ জন দিনমজুর ৩ জন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও ৭ জন অন্যান্য পেশাজীবী (যেমন—১ জন টোটো চালক, ১ জন ব্যান্ড বাদক, ৪ জন নর্তক ও ১ জন নাপিত)। সাধারণত ১০ বছর বয়স থেকেই ছুক্‌রি হিসাবে লোকনাট্যদলে যোগদান শুরু হয়ে যায়। অনেকের ক্ষেত্রে এই যোগদান ১৯-২০ বছর বয়সে গিয়েও হয়। তবে ছুক্‌রি'দের মধ্যে অধিকাংশই যোগদান করেন বালক জীবনে ১০ বছর থেকে ১৪ বছর বয়সেই।

ক্ষেত্র সমীক্ষায় দেখা যায় ৪৮ জনের মধ্যে ছুক্‌রি'র ভূমিকায় অংশগ্রহণের জন্য ১০ বছর থেকে ১৪ বছর বয়সে লোকনাট্যদলে যোগদান করেছেন ৩৫ জন এবং ১৫ বছর থেকে ১৯ বছর বয়সে যোগদান করেছেন ১৩ জন। এদের মধ্যে নিজের ইচ্ছায় যোগদান করেছেন ৩৬ জন ও পরিবারের ইচ্ছায় যোগ দিয়েছেন ১২ জন। ৪৮ জনের মধ্যে লোকনাট্যে যোগদানের সময় ১৯ জনের ব্যক্তি জীবনে নারীসত্তার প্রভাব কাজ করতো। ২৯ জনের মনে নারীসত্তার কোন প্রভাব ছিল না।

লোকনাট্যদলে যোগদানের সময় সমীক্ষিত ৪৮ জনের মধ্যে ৩২ জন পড়াশোনা করত না এবং কেবল ১৬ জন পড়ত। এদের মধ্যে ২ জন পড়ত তৃতীয় শ্রেণিতে, ২ জন পড়ত চতুর্থ শ্রেণিতে, ষষ্ঠ শ্রেণিতে পড়ত ৩ জন, সপ্তম শ্রেণিতে পড়ত ২ জন, অষ্টম শ্রেণিতে ৫ জন, নবম শ্রেণিতে পড়ত ১ জন এবং ১ জন পড়ত একাদশ শ্রেণিতে। লোকনাট্যদলে যোগদানের পরেও দুই বছরের অধিক পড়া চালিয়েছে ১৩ জন। বর্তমানে শুধু ১ জনই পড়ছে—শ্রেণি স্নাতক প্রথম বর্ষে। ক্ষেত্রসমীক্ষণ থেকে প্রাপ্ত তথ্য থেকে জেনে নেওয়া যাক কাজের ফাঁকে অর্থাৎ অবসর সময় ছুক্‌রি'রা কি করেন—সমীক্ষিত ৪৮ জনের মধ্যে ২০

জন সামাজিক মাধ্যমে লিপ্ত থাকেন। অবসরে ঘরের কাজ করেন ৫ জন, বই পড়েন ৩ জন, আড্ডা দিয়ে অবসর সময় ব্যয় করেন ৮ জন এবং টি.ভি. দেখে অবসর যাপন করেন ১২ জন। আমরা জানি, লোকনাট্যে ছুক্‌রি'র ভূমিকায় অংশগ্রহণের জন্য লোকসমাজে অনেককেই শ্লেষমিশ্রিত উপহাস শুনতে হয়। সমীক্ষিত ৪৮ জনের ৩১ জন ছুক্‌রি'কে বিদ্রুপ পূর্ণ উক্তি শুনতে হয় না। কিন্তু ১৭ জন ছুক্‌রি'কে ব্যঙ্গাত্মক উক্তি শুনতে হয়। এছাড়াও ছুক্‌রি'দের অনেককেই যৌনতা সম্পর্কিত অস্বস্তিতে পড়তে হয়। আমরা জানি যে ছুক্‌রি'রা আসলে পুরুষ হলেও তাঁদের যৌন আবেদনময়ী নারীর মতো করে সাজা এবং চাল-চলনের ফলে অনেক পুরুষেরই মানসিক চাঞ্চল্য দেখা দেয়। ফলত তাঁরা যৌন সংসর্গের অভিলাষে ছুক্‌রি'দের তুলে নিয়ে যায়। সমীক্ষিত ৪৮ জনের মধ্যে এইরূপ পরিস্থিতির মধ্যে পড়তে হয়েছে ১৪ জন ছুক্‌রিকে (শতকরা হার ২৯.১৭ শতাংশ)।

স্বাভাবিক প্রবণতা হেতু আমরা সাধারণত বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকৃষ্ট হই। কিন্তু ছুক্‌রি'দের অনেকের এমন মানসিক পরিবর্তন ঘটে যে তাঁরা পুরুষ হয়েও পুরুষদের প্রতিই আকৃষ্ট হন। তথাপি অধিকাংশ ছুক্‌রি-ই নারীকে বিবাহ করে স্ত্রী-সন্তান নিয়ে স্বাভাবিক সংসার জীবন-যাপন করেন। সমীক্ষিত ৪৮ জন ছুক্‌রি'র মধ্যে বিবাহিত ৩৪ জন। এদের মধ্যে ৩২ জন দেখাশুনা করে নিজ জাতির মেয়ে বিয়ে করেছেন এবং ২ জন প্রেম করে বিয়ে করেছেন (১ জন স্বজাতিতে ও আর ১ জন ভিন্ন জাতির মেয়ে বিয়ে করেছেন)। বিবাহিতরা সকলেই স্ত্রী-সন্তানসহ স্বাভাবিক সংসার জীবন অতিবাহিত করছেন। অবিবাহিত ১৪ জনের মধ্যে ৭ জনের বিবাহের ইচ্ছে নেই এবং ৭ জন বিয়ে করবেন। অন্যান্য সাধারণ মানুষের ন্যায় ছুক্‌রি'দেরও কারো কারো বিবাহ বহির্ভূত প্রণয় সম্পর্ক থাকে। অবিবাহিত ১৪ জনের মধ্যে ৯ জন কোন প্রণয় সম্পর্কে যুক্ত নন। কিন্তু বাকি ৫ জন প্রণয় সম্পর্কে লিপ্ত আছেন। যাদের মধ্যে ১ জন বিপরীত লিঙ্গ অর্থাৎ মেয়ের সঙ্গে ও বাকি ৪ জন সমলিঙ্গ অর্থাৎ ছেলের সঙ্গে প্রণয় সম্পর্কে আবদ্ধ।

এখানে জানিয়ে রাখা ভালো যে, সামাজিক লিঙ্গ (Social Gender)-এর বিচারে ৪৮ জন ছুক্‌রি'র মধ্যে ২ জন নারী ও ৪৬ জন পুরুষ। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে ২২ জন মানসিক লিঙ্গগতভাবে নারী হলেও সমাজকে উপেক্ষা করে কেবল ২ জনই সামাজিকভাবে নিজেদের নারী হিসেবে প্রকাশ ঘটায়। এছাড়া নারী মনস্কা এই ২২ জনের মধ্যে ১ জন শারীরিক লিঙ্গ পরিবর্তন করেছেন এবং ৫ জনের ভবিষ্যতে লিঙ্গ পরিবর্তনের ইচ্ছে রয়েছে। লোকসমাজে ছুক্‌রি'রা যেমন অনেক ক্ষেত্রেই উপহাসের পাত্র হন তেমনই অনেক ক্ষেত্রে সমাজে মর্যাদাও পান। লোকনাট্য দলে ছুক্‌রি'র ভূমিকায় অভিকরণের ফলে সমীক্ষিত ৪৮ জনের মধ্যে ২১ জনের সামাজিক মর্যাদা বেড়েছে বলে সমীক্ষায় জানা যায়। পরিবারের বাঁধা, সমাজের শ্লেষ এবং পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নিজেদের পুরুষ সত্তাকে দূরে সরিয়ে খুশি মনে আজও ছুক্‌রি'রা যেভাবে সুপ্রাচীন ঐতিহ্য ধরে রেখে সংহত সমাজের মনস্তুষ্টি সাধন করে চলেছেন তাতে অবশ্যই তারা সাধুবাদের যোগ্য।

উৎসের সন্ধানে

১. অজিত কুমার ঘোষ : 'নাটকের কথা', সাহিত্যলোক, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ, মাঘ, ১৩৯২, পৃ. ১৭২
২. দুর্গাশঙ্কর মুখোপাধ্যায় : 'নাট্যতত্ত্ব বিচার', মডার্ন বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৩১, পৃ. ২৬৫
৩. সুকুমার সেন : 'নট নাট্য নাটক', মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ভাদ্র, ১৩৯১, পৃ. ৯
৪. সঞ্জীব নাথ : 'বাংলার লোকনাট্য : স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য', অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স, কলকাতা, জানুয়ারি, ২০০৩, পৃ. ২
৫. আশুতোষ ভট্টাচার্য : 'বাংলার লোকসংস্কৃতি', ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইন্ডিয়া, ১৯৮২, পৃ. ১২৯
৬. শিশির মজুমদার : 'উত্তরবঙ্গের লোকনাট্য ও পশ্চিম দিনাজপুরের খন গান', ত্রিবৃত্ত, উত্তরবঙ্গ সংখ্যা, ১৯৭৮
৭. দুর্গাশঙ্কর মুখোপাধ্যায় : 'নাট্যতত্ত্ববিচার', মডার্ন বুক এজেন্সি, প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৩১, পৃ. ২৬৫
৮. ধ্রুব দাস : 'ভারতের লোকনাট্য', প্রতিভাস, কলকাতা, ১৯৯২, পৃ. ৯ (ভূমিকা)
৯. প্রাগুক্ত : পৃ. ১৪-১৫
১০. বরুণকুমার চক্রবর্তী সম্পাদিত : 'বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতি কোষ, অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স, কলকাতা, শ্রাবণ, ১৪০২, পৃ. ৫১৯
১১. সঞ্জীব নাথ : 'বাংলার লোকনাট্য : স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য, অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স, কলকাতা, ২০০৩ পৃ. ৬
১২. জামিল চৌধুরী সম্পাদিত : 'আধুনিক বাংলা অভিধান', বাংলা একাডেমি, ঢাকা, সেপ্টেম্বর ২০১৭, পৃ. ৪৯০
১৩. গোলাম মুরশিদ সম্পাদিত : 'বিবর্তনমূলক বাংলা অভিধান', বাংলা একাডেমি, ঢাকা, জুন, ২০১৩, পৃ. ১০০৩
১৪. জামিল চৌধুরি : 'শব্দ সংকেত', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, মে, ২০০৯, পৃ. ৪৩৪
১৫. মানসকুমার রায় চৌধুরী সম্পাদিত : 'বাংলা অশিষ্ট শব্দের অভিধান', অভিজাত প্রকাশনী, কলকাতা, জানুয়ারি, ২০০১, পৃ. ৯৭
১৬. ক্ষেত্র সমীক্ষা : দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে ২০১৯ সালের জানুয়ারি থেকে জুলাই মাসে ক্ষেত্রকার্য সংঘটিত হয়েছে।

লোকনাট্য ‘আলকাপ’ : হিন্দু-মুসলমান মিলন সেতুর সেকাল-একাল

শম্পা সাহা

শুধু নাচ কিংবা গানের তুলনায় নাট্যাভিনয়ের আবেদন যেহেতু বেশি তাই এর সামাজিক অভিঘাত সৃষ্টি করার ক্ষমতাও অনেক ব্যাপক। যেহেতু লোকশিক্ষা এবং গণমাধ্যম হিসেবে লোকনাট্যের গুরুত্ব অনস্বীকার্য নয়, নাটক একসঙ্গে দেখা এবং শোনা যায়, তাই নাটকের পরিপূর্ণ স্বাদটুকু উপলব্ধি করতে অসুবিধে হয় না। লোকনাট্যগুলিতে সমাজ সচেতনতা কোন্ পর্যায়ে পৌঁছোতে পারে তার প্রমাণ মেলে বেশকিছু রকম লোকনাট্যের উপজীব্য বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করলে। পরিবার পরিকল্পনা থেকে শুরু করে সাক্ষরতার প্রসার, নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি থেকে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও বিচ্ছিন্নতাবাদ সমস্যা থেকে শুরু করে স্থানীয় বিভিন্ন সমস্যার বিশ্লেষণ তথা সময় বিশেষে প্রতিকারের হদিশ (অবশ্যই নিজেদের মতো করে) এইসব পালার পরিচালক তথা কুশীলবেরা দেখিয়ে থাকেন। বস্তুতপক্ষে লোকনাট্য, লোকসংস্কৃতির অন্যতম অগ্রসর মাধ্যম হওয়ায় পরিবর্তনশীল সমাজ এবং অর্থনীতির অভিক্ষেপ তার উপর এসে পড়ে অত্যন্ত দ্রুত ভাবে, যেটা সমাজ-সংস্কৃতি বিজ্ঞানের অনিবার্য একটি শর্ত।

● আলকাপের প্রেক্ষাপট ও অন্যান্য লোকনাট্যের সঙ্গে তুলনা

মধ্যবঙ্গের মুখ্য লোকনাট্য ধারা আলকাপ—মূলত সামাজিক বিষয় নিয়েই গড়ে উঠেছে বলে এর মূল্যায়ন করতে হয় ভিন্নতর এক নিরিখে। যেহেতু আলকাপের শিল্পীরা মুসলিম এবং হিন্দু দুইরকম ধর্মাবলম্বী পরিবারগুলি থেকেই আসেন এবং দলে এসে তাঁরা প্রায় একই পরিবারের মানুষে পরিণত হন। এইসব শিল্পীদের অধিকাংশ মুসলিম ধর্মাবলম্বী হলেও দলের মধ্যে কোনওরকম রক্ষণশীল অন্ধতা প্রশ্রয় পেতে পারে না। আলকাপ শিল্পীদের নিয়ে লেখা উপন্যাস ‘বৈতালিক’ এবং ‘মায়ামৃদঙ্গ’ (যথাক্রমে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় এবং সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ রচিত) যারাই পড়েছেন তারা এই ধর্মগত বিভেদ-বুদ্ধি বর্জিত শিল্পী জীবনের পরিচয়টুকু অবশ্য খুঁজে পেয়েছেন যথার্থভাবে।

‘গম্ভীরা’ হোক কিংবা ‘আলকাপ’—সামাজিক বিষয় নিয়ে লেখা পালার মধ্যে যে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ তিরস্কার প্রতিবাদ ব্যক্ত হয়ে ওঠে, তার উদ্দিষ্ট যাঁরা, তাদের জাত-ধর্ম ইত্যাদির বিচার করতে রেয়াত করেন না শিল্পীরা। যেমন, ‘নানা’ রূপী শিবের কাছে নিন্দার্হ ব্যক্তিরা হিন্দু এবং মুসলিম দুই বর্গেরই অন্তর্ভুক্ত থাকেন। আলকাপের পঞ্চরঙের হুল পৈতে কিংবা নুর আছে কিনা সেই বিচার করে বাঁধে না। চোকোচুন্নি এবং হালুয়া-হালুয়ানি জাতের লঘুচালের লোকনাট্যের পালাগুলিও সমাজে ধর্ম তথা সম্প্রদায়ের বিভাজনরেখাকে স্বীকার করে না। সেকথাও এখানে উল্লেখের দাবি রাখে।

আলকাপের ইতিহাস, সংজ্ঞার্থ এবং বাংলা সাহিত্যে উল্লেখ

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ তাঁর 'মায়ামৃদঙ্গ' উপন্যাসের প্রথম সংস্করণ-এর ভূমিকায় লিখেছেন—সম্ভবত এই বিষয়ে প্রথম উপন্যাস শ্রদ্ধেয় নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'বৈতালিক'। সুতরাং এটি দ্বিতীয়। উপন্যাসের চরিত্ররা নামে-স্বনামে এখনো বেঁচেবর্তে আছে এবং পদ্মা-গঙ্গা-অজয়-ময়ূরাক্ষীর এপার-ওপার যোজন বিস্তৃত অববাহিকায় গ্রামগঞ্জ হাটমেলায় উৎসবে-নিরুৎসবে লোকগাথা বিস্ফোরণ করছে। এই অত্যাশ্চর্য এবং ধ্রুপদী লোকনাট্যরীতির জনপ্রিয়তা লোকসমাজে শ্রেষ্ঠতম। আবার বলছি শ্রেষ্ঠতম। অবশ্য আরও লোকশিল্পের মতনই এর গায়েও মৃত্যুর ধূসর ছায়া পড়েছে।

কিন্তু কি আশ্চর্য! তথাকথিত লোকসংস্কৃতি বিশেষজ্ঞদের কেতাব পত্তরে এই লোকনাট্যদল 'আলকাপ'-এর যা ব্যাখ্যা বর্ণনা পড়েছি, ভাবা যায় না! শুনতে পাওয়া যায় গ্রামীণ দারিদ্র্য আর সিনেমার মারাত্মক চাপে আলকাপ এখন বিপন্ন। হাজার হাজার বছরের মানুষের ইতিহাসে অনেক জন্ম-মৃত্যু ঘটেছে। রাষ্ট্র এবং সময়ের তাতে কিছু যায় আসে না। শুধু এ বইয়ের লেখক এবং রাঢ়-বরেন্দ্র ভূমির লক্ষ লক্ষ সাধারণ গ্রামীণ মানুষের মনে আমৃত্যু থেকে গেল যা তা ধনপত নগরের প্রখ্যাত ওস্তাদ ধনঞ্জয় সরকারের ভাষায়—"এক বিরল মায়া।"[১]

প্রকৃতপক্ষে বিগত শতকের ষাটের দশকের শুরুতেই 'নাচিয়ে ছোকরা'র বদলে যখন থেকে মেয়েদের আলকাপে ঢোকানো শুরু হয়, মূলত তখন থেকেই আলকাপ নামক লোকনাট্য রীতিটি একেবারে মৃত। কারণ মেয়েরা ওস্তাদ ঝাঁকসা কথিত বিরল মায়াসৃষ্টিতে একেবারে ব্যর্থ হয়। স্বয়ং ওস্তাদ ঝাঁকসা বা ঝাঁকসুই নিজের কন্যাকে দলে ঢোকান এবং ব্যর্থ হওয়ার পর তিনি আলকাপের আঙ্গিক সম্পূর্ণ বদলে দিয়ে সৃষ্টি করেন যাত্রাধর্মী লোকনাট্য 'পঞ্চরস'। এই পঞ্চরস, আলকাপ নয়। এর আঙ্গিক যাত্রাধর্মী। এতে চরিত্রদের প্রবেশ-প্রস্থান এবং চরিত্রানুযায়ী পোশাক পরা ছাড়াও মুখে রং মাখা বা মেকাপ নেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। আলকাপের দোহাররা খঞ্জনী বাজিয়ে পাত্র-পাত্রীদের গানের ধুয়া দ্রুত থেকে দ্রুততম তালে গেয়ে চরম একটা পর্যায়ে থেমে যেত। 'পঞ্চরস' এই দোহার রীতি সম্পূর্ণ বর্জন করে। অসংখ্য গ্রামে 'পঞ্চরস অপেরা' এভাবেই গড়ে ওঠে।

পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটে ওস্তাদ ঝাঁকসার মৃত্যুর পর। তথাকথিত লোকসংস্কৃতিবিদ্‌রা ছোটাছুটি শুরু করেন আলকাপের খোঁজে। খুব স্বাভাবিকভাবেই তাদের পক্ষে প্রকৃত আলকাপের আসর চাক্ষুষ করা ছিল একেবারে অসম্ভব। ফলে তারা তৎকালীন প্রচলিত 'পঞ্চরস'কেই আলকাপ ধরে নেন। যেহেতু লোকসংস্কৃতি খাতে সরকারি সাহায্যের ব্যবস্থা আছে। তাই সরকারি দাক্ষিণ্যের লোভেই 'পঞ্চরস' ওয়ালারা তাঁদের অনুষ্ঠানকেই 'আলকাপ' বলে চালিয়ে দিতে শুরু করেন। যেটা ধাপ্পাবাজি ছাড়া কিছু ছিল না। কারণ যে আঙ্গিকের লোকনাট্যকে আলকাপ বলা হতো তা মোটামুটি ১৯৬০-৬১ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ লোকসংস্কৃতির জগত থেকে মুছে গেছে। তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ওস্তাদ ঝাঁকসু ও তার পরিবার, সুধীর দাস থেকে শুরু করে সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ পর্যন্ত আর কোনও আলকাপওয়ালাই বর্তমানে বেঁচে নেই। যখন কেউ বর্তমান নেই তখন আলকাপের অভিনয় বা আলকাপের ওয়ার্কশপ হয় কি করে ঘটনাটি যুগপৎ অবিশ্বাস্য তথা হাস্যকর।

এরপর আসতে হয় 'আলকাপ' কথাটির প্রকৃত অর্থে। যেহেতু সবচেয়ে বেশি বিতর্ক ওঠে শব্দটির অর্থ ও তার প্রকৃত ব্যাখ্যা নিয়ে। আসলে 'আল' শব্দটি আহ্লাদের অপভ্রংশ আহ্লাদ>আল্লাদ>আল। এটি একটি পুরনো বাংলা শব্দ। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক সংকলিত ও সম্পাদিত 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' (পৃষ্ঠা ২৮৫, দ্বিতীয় খণ্ড, চতুর্থ সংস্করণ, আষাঢ় ১৩৮৪, প্রকাশক-বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ) গ্রন্থে 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রিকার সম্পাদকীয় (১৩ অক্টোবর ১৮৩২/২৯ আশ্বিন, ১২৩৯) থেকে সংশ্লিষ্ট বাক্যটির উদ্ধৃতি এরকম—

> এবং যাঁহারা আল করিবা কাল বিনাশ করিতেন, তাঁহারাও প্রায় এতদ্বর্ষে বাড়ির আশ্রয় করিয়াছেন অতএব দুর্গোৎসবে যে আমোদ-প্রমোদ পূর্বে ছিল এ বৎসরে তাহার অনেক হ্রাস হইয়াছে।[২]

যে-কোনো ভাষা-ভাষীর ক্ষেত্রেই তাদের ব্যবহৃত সব শব্দই সেই ভাষার অভিধান-এ পাওয়া যাবে এমনটা নয়, এমনকি শব্দকোষেও খুঁজে পাওয়া যায় না। এর অনেক রকম কারণ হতে পারে। হতে পারে শব্দটি অন্য ভাষার। হতে পারে প্রচলিত হতে হতে লোকমুখে এতটা পরিবর্তিত হয়ে গেছে যে শব্দটির মুদ্রিত রূপ শব্দকোষ কিংবা অভিধানে খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। হয়তো সে কারণেই 'আল' শব্দটি একদা ব্যাপকভাবে প্রচলিত থাকলেও শব্দটির মুদ্রিত রূপ আজকাল আর দেখতে পাওয়া যায় না। যদিও গ্রামাঞ্চলে পূর্বে লোকের মুখে শোনা যেত, 'ওর বড্ড আল হয়েছে', 'খুব আল করে বেড়াচ্ছে ও'। এখন 'আল' একটি প্রাচীন বাংলা শব্দ। যেটি প্রায় লুপ্ত। এখন শুধু বেঁচে আছে 'কাপ' অর্থাৎ নাটিকার সঙ্গে জোড় বেধে। 'আলকাপ' কথাটির প্রকৃত অর্থ আমোদ-প্রমোদ মূলক নাটিকা। তবে অর্থ বিস্তারে একে রঙ্গরসাত্মক বা রঙ্গ ব্যঙ্গাত্মক নাটিকাও বলা হয়ে থাকে। অনেকে 'আলকাটাকাপ' ও বলে থাকেন। 'কাটাকাপ' একটি চলতি বাংলা বাগধারা। এর অর্থ মূর্তিমান রঙ্গনাটিকার চরিত্র কিংবা আস্ত রঙ্গ নাটিকা। 'কাটা' শব্দটিরও অনেক অর্থ হয় বাংলায়। সুতো কাটা, ছড়াকাটা বা জাবরকাটা ইত্যাদি। অর্থবিস্তারে 'কাটা' বলতে তৈরি করাও বোঝায়। কাটাকাপের সঙ্গে আলকে জুড়ে তাই অনেকে বলে থাকেন 'আলকাটাকাপ'। 'আলকাপ' হলো ভারতের অন্তর্গত পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মুর্শিদাবাদ, মালদহ, বীরভূম জেলা এবং বাংলাদেশের রাজশাহী বিভাগে প্রচলিত একটি লোকনাট্য শৈলী। পশ্চিমবঙ্গের প্রতিবেশী বিহার রাজ্যের পূর্ণিয়া জেলা, ঝাড়খণ্ড রাজ্যের দুমকা জেলাতেও 'আলকাপ' প্রচলিত।

'আল' শব্দের অর্থ 'কাব্যের অংশ' এবং 'কাপ' শব্দের অর্থ 'কাব্য'। আবার 'আল' শব্দের একাধিক অর্থের মধ্যে একটি হলো তীক্ষ্ণ, তীব্র বা ধারালো। অপরদিকে 'কাপ' শব্দের একাধিক অর্থের মধ্যে একটি হলো 'সঙ'। রঙ্গস্থলে বিকৃত আকারে অঙ্গ-ভঙ্গিতে দর্শকের কৌতুককর, হাস্যোদ্দীপক বিষয়ের বা সামাজিক কুৎসিত বিষয়ের প্রতিমূর্তি বা চিত্র। আলকাপে নাচ, গান এবং এই হাস্য-কৌতুকোদ্দীপক অভিনয়ের সংমিশ্রণ ঘটেছে।

এক একটি আলকাপ দলে দশ থেকে বারো জন শিল্পী থাকেন। এদের নেতাকে বলে 'সরদার' বা 'গুরু'। দুই বা তিনজন অল্পবয়সী শিল্পী থাকে যাদের 'ছোকরা' বলা হয়। এছাড়া এক বা দুই জন করে 'গায়েন' বা গায়ক, 'দোহার' বা সম্মেলক গায়ক, 'বাজনাদার' থাকে। 'আলকাপ'-এর মোট পাঁচটি অংশ। ১. আসর বন্দনা, ২. ছড়া, ৩. কাপ, ৪. বৈঠকি গান,

৫. খেমটাপালা। আলকাপের অনুষ্ঠানে গ্রাম্য সমাজ এবং সেই সমাজের আর্থ-সামাজিক অবস্থা প্রতিফলিত হয়।

আলকাপের বিভিন্ন সংজ্ঞা

'আলকাপ' মুর্শিদাবাদ ও সন্নিহিত জেলাসমূহের জনপ্রিয় লোকনাট্য। আলকাপে হিন্দু-মুসলমান উভয় ধর্মেরই দরিদ্র শ্রেণির শিল্পীরা অংশগ্রহণ করে থাকেন। আলকাপ কোনো আনুষ্ঠানিক বা পুজো উৎসব ভিত্তিক লোকনাট্য নয়। বছরের যে-কোনো সময় অনুষ্ঠিত হয়। সাধারণত কার্তিক-অগ্রহায়ণ মাস থেকে শুরু করে বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাস পর্যন্ত আলকাপের আসর বসে বেশি। লোকনাট্যের প্রখ্যাত সমালোচক গৌরীশংকর ভট্টাচার্যের ভাষায়—"আলকাপের 'কাপ' অংশটি রঙ্গরসের কৌতুকের দ্যোতক।"[৩] মুর্শিদাবাদ জেলার নবগ্রাম, খড়গ্রাম, কান্দি, ভরতপুর, বীরভূম জেলার মুরারই, নলহাটি ইত্যাদি এলাকায় আলকাপকে বলা হয় 'ছ্যাঁচড়া' জাতীয় লোকনাট্য। কারণ হিসেবে এলাকার লোকশিল্পীদের অভিমত আলকাপের মধ্যে ছ্যাঁচড়া রান্নার মত পাঁচমিশালী অনুষ্ঠান আঙ্গিক বা উপকরণ থাকে। আলকাপের 'কাপ' শব্দটির ব্যবহার পাওয়া যায় ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গলে'। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য 'শিবের ভিক্ষা যাত্রা' অংশে—

কেহ বলে ওই এল শিব বুড়া কাপ।
কেহ বলে বুড়া টি খেলাও দেখি সাপ।।[৪]

এখানে রঙ্গ-ব্যঙ্গাকারী অর্থে কাপ শব্দটি ব্যবহৃত। যার উৎপত্তি কাপট্য থেকে। এর অর্থ ছদ্মবেশ বা কৌতুক। প্রখ্যাত লোকসংস্কৃতিবিদ আশুতোষ ভট্টাচার্য আলকাপের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন—

> একপ্রকার গ্রামীণ নাট্যের নাম 'আলকাপ'। মালদা এবং মুর্শিদাবাদ জেলাতেই তা সমধিক জনপ্রিয়। যদিও অনুষ্ঠানটি ধর্মনিরপেক্ষ তথাপি মুসলমান সম্প্রদায়ের কাছে তা বিশেষ সমাদর লাভ করেছে। আলকাপ পূর্ণাঙ্গ নাটক নয়, তাকে গ্রাম্য জীবন চিত্র ভিত্তিক নাটকীয় নকশা বলা যেতে পারে।[৫]

আবার আলকাপের প্রবাদপুরুষ ওস্তাদ ঝাঁকসুর অভিমত 'কাপ' ব্যঙ্গ-রসাত্মক নাটক। আর 'আল' মানে মৌমাছির হুল। এমন কাপ যার আল আছে। অর্থাৎ আলকাপে লোককে হাসানোর সঙ্গে সঙ্গে সমাজের ত্রুটি-বিচ্যুতি অসঙ্গতিগুলিকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ প্রতিবাদের আকারেও তুলে ধরা হয়। সজাগ করে দেওয়া হয় জনসাধারণকে।

আলকাপের উৎস

অনেক সমালোচক মনে করেন 'আলকাপ' হলো গম্ভীরা গানের ইসলামী সংস্করণ। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য 'আলকাপ' গম্ভীরা গানের মুসলিম সংস্করণ নয়। কারণ হিসেবে অনেকে উভয়ের মধ্যে প্রভূত সাদৃশ্যের উল্লেখ করলেও এই প্রসঙ্গে বলা যায় যে, লোকনাট্যের সঙ্গে অন্য লোকনাট্যের বৈশিষ্ট্য ও আঙ্গিকগত কিছু মিল অবশ্যই থাকতে পারে, কিন্তু একটি থেকে যে অন্যটি সৃষ্ট তার জোরালো যুক্তি অন্তত আলকাপের ক্ষেত্রে দেখা যায় না। আলকাপের গানে হিন্দু-মুসলিম উভয় ধর্মের শিল্পীরা অংশগ্রহণ করেন। আলকাপের গানের শুরুতে আসর বন্দনায় শিব, দুর্গা, সরস্বতী, শ্যামা ইত্যাদি দেব-দেবীর বন্দনা করা হয়। এছাড়া

আলকাপের স্রষ্টা বলে যিনি সর্বজনবিদিত, তিনি হলেন অধুনা রাজশাহী শিবগঞ্জের মোনাকয়সার বোনাকানা বা বনমালী সরকার। হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতির মেলবন্ধন "আলকাপ" লোকনাট্য। মালদা জেলার আলকাপ শিল্পীদের কেউ কেউ মনে করেন 'বোলবাহি" থেকে আলকাপ এর উৎপত্তি। তারা আলকাপের দ্বৈত সংগীতের সঙ্গে খোট্টা ভাষায় রচিত 'বোলবাহি'র দ্বৈতসংগীতের সাদৃশ্য দেখতে পান। আলকাপ এর উৎপত্তি প্রসঙ্গে অপর যে অভিমত আলকাপ শিল্পীদের কাছে পাওয়া যায়, তা হলো—ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের মাধ্যম হিসেবে আলকাপ এর উৎপত্তি। ব্রিটিশ সরকার গান-বাজনা, সভা-সমিতি সবকিছু নিষিদ্ধ করলে গ্রামের শিল্পীরা বনের মধ্যে গিয়ে কেউ রাজা, কেউ প্রজা, কেউ জমিদার সেজে অভিনয় করত এবং কেউ জিজ্ঞাসা করলে বলতো আলকাপ করছি। এভাবে তারা আলকাপের নাম করে অভিনয়ের মাধ্যমে ইংরেজ সরকারের অত্যাচার-নিপীড়ন দোষ-ত্রুটিগুলি জনসমক্ষে তুলে ধরে মানুষকে সচেতন করে তুলত। মালদা জেলার মানিকচক থানার রাইমপুর নিবাসী আলফাজ, অধুনা বাংলাদেশের রাজশাহী জেলার শিবগঞ্জ মোনাকয়সার ভবতারণ সরকার, বোনাকানা প্রমুখ শিল্পী ইংরেজ বিরোধী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তারা ইংরেজদের কুকীর্তি জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করার জন্য এক ধরনের নাট্যাভিনয়ের ব্যবস্থা করেন। এটিই পরবর্তীকালে 'আলকাপ' নামে খ্যাত হয়।

আলকাপের নিয়ম কানুন

'আলকাপ নাট্যরীতি এবং থার্ড থিয়েটার' প্রবন্ধে আলকাপ এর বিস্তারিত পরিচয় তুলে ধরেছেন সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ। পঞ্চাশের দশকে বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, মালদহ সেইসঙ্গে বিহারের পূর্ণিয়া, দুমকা, সাঁওতাল পরগনার বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলগুলিতে আলকাপের চাহিদা ছিল। আলকাপের দল গড়তে কমপক্ষে দশজন লোক লাগত। ওস্তাদ বা মাস্টার, সঙাল বা সঙদার বা কপে নামক একজন কৌতুক-অভিনেতা। নাচ-গান, নারী চরিত্রে অভিনয়ের জন্য দুজন ছোকরা, হারমোনিয়ামবাদক, তবলাবাদক এবং জনা চারেক দোয়ারকি।

হারমোনিয়াম-তবলা যাঁরা বাজাতেন বা যাঁরা দোহারের কাজ করতেন তাঁদেরও সময় বিশেষে অভিনয় করতে হতো। খোলা জায়গার মাঝখানে আসর বসতো, চারপাশে থাকত দর্শক। নাটকের মতো নির্দিষ্ট প্রবেশ-প্রস্থানের পথ থাকতো না। কখনো কখনো আসরে দুটো প্রতিযোগী দল থাকত। এর নাম পাল্লার আসর। দুই দল দুই দিকে বসে ঘণ্টা তিনেক ধরে অনুষ্ঠান করত। নিদেনপক্ষে বারো ঘন্টা অনুষ্ঠান না চললে দর্শকদের মন উঠত না। আলকাপের দলের প্রাণ বলা হত নাচিয়ে ছোকরা এবং কৌতুকাভিনেতাকে। ছোকরাদের বয়সের সীমা ছিল বারো থেকে কুড়ি—

নামুতে বারো ওপরে বিশ
তাতে একটু উনিশ বিশ।[৬]

এদের তালিম শুরু হতো বারো বছর বয়স থেকেই। মেয়েদের মতন চুল, গায়ে সারাক্ষণ ফ্রক, হাতে চুড়ি, তাকে ভুলে থাকতে হতো যে সে ছেলে। চলন-বলন হতে হতো মেয়েদের মত। মোটামুটি সুন্দর মুখশ্রী এবং গানের গলা ছিল ছোকরা হবার প্রাথমিক শর্ত। বয়স পেরিয়ে গেলেও যোগ্যতা অনুযায়ী ছোকরারাই হত পুরুষ অভিনেতা, কমেডিয়ান বা ওস্তাদ। পঞ্চাশের

দশকে আলকাপ দলে কোনও আসল মেয়েকে কল্পনাই করা যেত না। আসরে বাদ্যযন্ত্র বলতে হারমোনিয়াম, ডুগি-তবলা, আর কয়েক জোড়া ছোট কত্তাল বা খঞ্জনী।

আলকাপের অভিনয় রীতি

আলকাপের সমবেত দর্শকমণ্ডলীর সন্তোষ বিধানের জন্যই হয়তো বা বিভিন্ন দেব-দেবী, পির-দরবেশ এবং প্রখ্যাত ওস্তাদদের বন্দনা করার এই রেওয়াজ ছিল হিন্দু এবং মুসলিম নির্বিশেষে শিল্পী ও দর্শকদের একটি সার্বজনীন প্রীতির বন্ধনে বেঁধে রাখা হতো। এই দেবতা বন্দনা প্রথার সূত্রে স্থানীয় মানুষদের সঙ্গে আলকাপ শিল্পীদের একটা আত্মীক নৈকট্য গড়ে ওঠে। সাম্প্রদায়িকতার ভেদবুদ্ধিকে অতিক্রম করে সংহতির অনুভবে উদ্বুদ্ধ হওয়ারই একটা ব্যাপার অলক্ষে ঘটে যায় এর ফলে। আলকাপের একটি পালার একটি গানের মধ্যে এই সমন্বয়ের কথা বড় আবেগময় ভাবে উচ্চারিত হয়েছে—

আমরা নয়গো হিন্দু নয় মুসলমান
জাতিতে সবাই যে সমান।।
শুধু ধর্মেতে হিন্দু-মুসলমান গো
দেখুন খোদা হরি একজনা।।[৭]

নাটকের পালায় এই ধরনের কাহিনি একটি বিশেষ মাত্রা যোগ করে সন্দেহ নেই।

আলকাপের পালার খুঁটিনাটি

আলকাপ এর শুরুতে হারমোনিয়ামের এগারো পর্দায় মুদারা অর্থাৎ স্বরগ্রামের মাঝেরটি বাজিয়ে দল সমেত কোরাসে জয়ধ্বনি। দেবী সরস্বতী থেকে শুরু করে আরো কিছু দেব-দেবী, স্থানীয় পির, এরপর ওস্তাদ তানসেন, এরপর দলের দীক্ষাগুরু এবং পরবর্তী যেসব প্রসিদ্ধ ওস্তাদ আলকাপে এসেছেন বিভিন্ন সময়ে তাঁদের কারো কারো এবং শেষে দলের বর্তমান ওস্তাদের নামে প্রথাগত জয় ঘোষণা করা হয়। এরপরে হয় সমবেত বন্দনা। ছোকরা হয় মূল বন্দনা গায়ক। বাকিরা দ্রুততালে ধুয়া গায়। তারপর দু-তিন মিনিট ধরে চলে যে কোনো সুরে যন্ত্রসংগীতের বোল। ততক্ষণে নাচিয়ে ছোকরা তৈরি হয়, শুরু করে খেমটা, টপ্পা, ঝুমুর জাতীয় গান—আলকাপ এর নিজস্ব গায়েনরীতি অনুযায়ী, সঙ্গে নিয়ম করে ধুয়া গাওয়া হয়। ছোকরা কিছুক্ষণ নাচে। তারপর তাল দিতে দিতে ওস্তাদ ওঠেন। তাৎক্ষণিক কোনও বিষয় নিয়ে মুখে মুখে ছড়া বেধে গাইতে শুরু করেন। আসর নিয়ে, সেই গ্রাম নিয়ে, সমকালীন দেশের পরিস্থিতি নিয়ে কবিয়ালের মত মিনিট কুড়ি চালিয়ে যান। এরপর শুরু হয় মূল অনুষ্ঠান কাপ বা নাটক।

কাপকে সঙও বলা হয়, কারণ আলকাপের নাটক ব্যঙ্গ-রসাত্মক। তাতে প্রচুর হাস্যকৌতুকের উপাদান থাকে। কখনও বা থাকে বিদ্রূপের সূক্ষ্ম চিমটিও। যদিও কোনও লিখিত রূপ-এ ধরনের নাটকে থাকেনা, থাকেনা নির্দিষ্ট নাট্যকার। অভিনেতাদেরও সংলাপ মুখস্ত করার দায় থাকেনা। নাটকের জায়গায় থাকে একটি কাঠামো, বড়জোর একটি গল্প। সেটিই আসরের গতি-প্রকৃতি অনুসারে দর্শকদের সঙ্গে তাল রেখে এগোয়। প্রয়োজন মতো কোনও নির্দিষ্ট গল্পে সময় বিশেষে ঢুকে যায় দেশ ভাগ, হিন্দু-মুসলিম দ্বন্দ্ব প্রভৃতি সমসাময়িক তথা স্পর্শকাতর বিষয়।

যেহেতু মুর্শিদাবাদ মালদহের মুসলমান প্রধান জেলায় আলকাপ এর প্রচলন বেশি। তাই লোকসংস্কৃতিবিদ, নামী সাহিত্যিকরাও একে ভুল করে মুসলিম চাষিদের গান বলে প্রান্তে ঠেলে দিতে চান। একথা ঠিক, আলকাপের শিল্পীদের একটা বড়ো অংশই ছিলেন মুসলমান এবং দর্শক শ্রোতাদের মধ্যেও মুসলিমের সংখ্যাই থাকত বেশি। যদিও হিন্দু দেব-দেবীর জয়ধ্বনি দিতে বা বন্দনা গান গাইতে তাঁরা কোনদিনই আপত্তি করেননি এবং এই বন্দনাগানের অনেকগুলির রচয়িতা মুসলমানেরাই। সিরাজের 'মায়ামৃদঙ্গ' পড়লে বোঝা যায় আলকাপ কিভাবে বিভিন্ন সম্প্রদায়কে এক মঞ্চে নিয়ে এসে জাতপাতের বিভেদ মুছে দিতে পেরেছে এবং হয়ে উঠেছে গ্রাম-শহরের এক সার্বজনীন শিল্প।

তথ্যের সন্ধানে

১. সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ : 'মায়ামৃদঙ্গ', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ ফাল্গুন ১৪২২/ মার্চ ২০১৬, পৃ. প্রথম সংস্করণ এর ভূমিকা অংশ—(ক)(খ)
২. পূর্বোক্ত : পৃ. দ্বিতীয় সংস্করণ এর ভূমিকা অংশ
৩. মহম্মদ নুরুল ইসলাম : 'আলকাপ', লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ এপ্রিল ২০০১, পৃ. ১
৪. পূর্বোক্ত : পৃ. ২
৫. তদেব
৬. জাহিরুল হাসান : 'সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ ও বাঙালি সমাজ', পূর্বা, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ-জানুয়ারি ২০১৮, পৃ. ১৬৪
৭. পল্লব সেনগুপ্ত : 'লোকসংস্কৃতির সীমানা ও স্বরূপ', পুস্তক বিপণি, কলকাতা, পরিবর্ধিত তৃতীয় সংস্করণ জানুয়ারি ২০১০, পৃ. ২৪৮

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১. অশোক গুপ্ত : 'বাংলা ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষণ পদ্ধতির রূপরেখা', সেন্ট্রাল লাইব্রেরী পাবলিকেশন, কলকাতা, পরিবর্ধিত চতুর্থ সংস্করণ নভেম্বর ২০০৪
২. জাহিরুল হাসান : 'বহুমুখী সাহিত্যকোষ', পূর্বা, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০১৪
৩. সনৎ কুমার মিত্র : 'সাহিত্যটীকা', পুস্তক বিপণি, কলকাতা, একাদশ সংস্করণ ডিসেম্বর ২০১৪
৪. সংসদ বাংলা সাহিত্য সঙ্গী : সংকলন ও সম্পাদনা শিশিরকুমার দাশ, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ষষ্ঠ মুদ্রণ আগস্ট ২০১৯

আন্তর্জাতিক সহায়তা

১. bn.m.wikipedia.org>wiki>আলকাপ

লোকনাট্য নিয়ে দু-চার কথা

বোধিসত্ত্ব ভট্টাচার্য

'লোকনাট্য' শব্দটি আধুনিক হলেও 'নাট্য' শব্দটি প্রাচীন। তবে বর্তমানে কোনো লোকসমাজেই এই শব্দের প্রচলন নেই। পাঠক যাকে বিশেষভাবে 'লোকনাট্য' বলেন, তা ব্যাপকভাবে লোকসমাজের কাছে 'গান'। গীতি-সংলাপে পালাগুলি সম্পূর্ণ বলেই হয়তো এগুলি গান। 'যাত্রা'ও তো 'গান' বলেই পরিচিত। 'লোকনাট্য' বিষয়ের একটি প্রাথমিক সতর্কতা পাঠকের উপলব্ধিতে স্মরণে রাখা আবশ্যক—"লোকনাট্য কথাটি বর্তমান কালে অত্যন্ত শিথিলভাবে ব্যবহৃত হতে আরম্ভ করেছে। উচ্চশিক্ষিত অধ্যাপক, শিক্ষক কর্তৃক রচিত সম্ভ্রান্ত প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত একাধিক সংস্করণের বহু গ্রন্থও বর্তমানে লোকনাট্য বলে পরিচিত হচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে এই তথাকথিত 'লোকনাট্য'গুলি যেমন পাশ্চাত্য নাট্য রচনার রীতি-প্রকৃতি দ্বারা প্রভাবিত তেমনি পাশ্চাত্য ধরনের রঙ্গমঞ্চের উপযোগী। সুতরাং এদের লৌকিক গুণ কিছুমাত্র নেই। অথচ এগুলিকে লোকনাট্য বলে অভিহিত করার ফলে লোকনাট্য এবং লোকসাহিত্য সম্পর্কে মানুষের মনে একটা ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হচ্ছে।"[১] ড. সুকুমার সেন 'নাট্য' শব্দটির একটি অর্থ করেছেন। তাঁর ভাষায়, 'নাট্যের কর্ম'। এর ভিত্তিতেই, লোকনাট্যকে লোকনাট্যের কর্ম বলা যেতে পারে। অবশ্য, 'নট' বললেই বিশেষ বৃত্তিধারী এক শ্রেণির কথা স্মার্ত হয়। লোকনাট্যে নট বৃত্তিধারী শ্রেণি নেই। লোকনাট্যের শিল্পীরা প্রধানত কৃষিজীবী হয়ে থাকেন। নিজেদের অভিজ্ঞতায় তারা মুখে মুখে নৃত্যগীতাত্মক অভিনয় করে থাকেন। 'লোকবৃত্তানুকরণ', 'লোকযাত্রা' এবং নাটকের লোকজ অনুষঙ্গ মনে রাখলে বলা যায় যে, ভারতে লোকনাট্যের ধারা প্রাচীন। লোককথা এবং লোকশিল্প-এর অনুষঙ্গেই এই নাট্যের ধারা বহমান। লোকনাট্যের প্রাচীনত্ব উদ্ধার প্রায় অসম্ভবের পর্যায়েই পড়ে। ভারতবর্ষে দর্শন শাস্ত্রের স্বতঃস্ফূর্ত বস্তুবাদের ধারা বোধগম্য হলে ভারতীয় নাটকের মৌলিক ঐতিহ্য উদ্ধার করা যেতে পারে। এজন্য ঐতিহাসিক, বস্তুনিষ্ঠ এবং এক সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজন। সুদূর অতীতকাল থেকেই জীবন এবং জীবিকার তাগিদে মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে নানাপ্রকার সামাজিক অনুষ্ঠান দায়বদ্ধতার সঙ্গে পালন করে আসছেন। গীত, নৃত্য, কথা এবং আলাপনে তার জাগ্রত বহিঃপ্রকাশ দেখা গেছে। একটির সঙ্গে আরেকটির সংমিশ্রণে রীতি তৈরি হয়েছে। এভাবেই অভিজ্ঞতার মাধ্যমে ক্রমপরম্পরায়, উৎসব এবং তার ক্রিয়ানুষ্ঠানের মাধ্যমে লোকনাট্যের উদ্ভব হয়েছিল। বর্তমানের একটি লোকনাট্যের পালা দেখে তার পর্যালোচনায় বসলে দেখা যাবে, তার মধ্যে বহু ধারা এবং উপধারার সুমিত মেলবন্ধন ঘটেছে। বহু খণ্ড

ক্রিয়ার অতীত স্মৃতি তার মধ্যে অন্তর্লীন রয়েছে। এইসকল ক্রিয়ানুষ্ঠানের অপেক্ষাকৃত এক সংহতরূপেই লোকনাট্যের বিকাশ হয়েছে।

ঋদ্ধ ইতিবৃত্তের আখ্যান : প্রাচীন বাংলাদেশের সমাজ এবং সংস্কৃতির মূল উৎস অস্ট্রিক এবং অনার্য জনসমাজ। সমাজ গড়নের প্রাক্ মুহূর্তে আদিম মানুষের জীবিকা ছিল খাদ্য আহরণ এবং ফল সংগ্রহ। শিকারী জীবনের চরম আনন্দের মুহূর্তে নৈশবিলাসের আমোদ-প্রমোদ সেদিনের মানুষের অন্যতম উদ্‌যাপনের অঙ্গ ছিল। তাদের দিনান্তের সাধনা, প্রজ্জ্বলিত নিষ্কম্প অগ্নি প্রদক্ষিণ করে জীবনের আদিম উল্লাস এবং আনন্দকে অভিব্যক্ত করা। আদিম জীবন এবং সমাজের বিবর্তনে কৃষ্টির আগমন ঘটল এরপরে।

ভারতের সাধনা মুখ্যত দ্রাবিড়, অনার্য এবং আর্যদের সম্মিলিত সাধনার ত্রিবেণিসঙ্গম। আজকের ভারতে প্রচলিত সকল শিল্পকলার আবির্ভাব রয়েছে দ্রাবিড় ভাষার মধ্যেই। আদিম সমাজের কর্ম এবং আনন্দানুষ্ঠানের ইতিহাসে গৃহপালিত জীবজন্তু এবং শস্যের উৎপাদিকা শক্তির স্তুতিমূলক অনুষ্ঠানই প্রাধান্য পেয়েছে। সমাজের ধারাবাহিক উন্নয়নে প্রকৃতি এবং পরিবেশ জীবনাচরণের নিয়ন্ত্রক শক্তি হয়েছিল। অধিকাংশ লোক-উৎসবের উৎস সূর্য। সূর্যের উত্তরায়ণ এবং দক্ষিণায়ণের আশ্রয়েই মধ্যপ্রাচ্যের মতো বাংলার উৎসবের সৃষ্টি। রথযাত্রা, রাসযাত্রা, কৃষ্ণযাত্রা, গাজন, চড়ক প্রভৃতি প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য। পৃথিবীর সকল দেশেই লিখিত সাহিত্যের ধারার সঙ্গে মৌখিক ধারাও সমান্তরালভাবে ক্রিয়াশীল থেকেছে। এই অলিখিত কলার মধ্যে প্রাচীন শিল্প, অনুষ্ঠান ইত্যাদি সমাজ সংহতির আসল রূপ। বাংলার লোকনাট্য আলোচনায় এগুলির বিচার আবশ্যক। নাট্যের মতো লোকসমাজের ভাবপ্রকাশার্থে একদিন নৃত্যও এসেছিল। প্রাকৃতিক জীবন থেকেই এসেছিল। জীবনে চলার আলংকারিক পরিচিতি ছন্দের মধ্যেই অন্তর্লীন ছিল। প্রাকৃতিক স্বাচ্ছন্দ্য এবং নৈসর্গিক সারল্যের মিশেলে জীবনের প্রেক্ষাপট সুন্দর হয়েছিল। গানের মাধ্যমে তাই আদি বাঙালির কাব্যধারার নির্যাস নিহিত। কথার ফুলঝুরির পাশাপাশি বাণীকে যথার্থ রূপ দেবার জন্যেই সুর, তাল, ছন্দ, রাগ-রাগিণী আবিষ্কৃত হলো। সে আয়োজনের দেবদেবী ছিল কৃষির এবং কৃষিই মৌল প্রতিমা ছিল। আদি বাঙালি শস্যরোপণ এবং ফলচয়নের আনন্দকে উৎসবের মাধ্যমে প্রকাশ করেছে। পরবর্তীকালে শ্রীকৃষ্ণের জীবনকেন্দ্রিক প্রচলিত লৌকিক প্রেমকাহিনি সারা ভারতে প্রসারিত হয়েছিল, তার ফলেই কালজয়ী লোকসংস্কৃতির বিকাশ হয়েছিল। রাসযাত্রা, দোলযাত্রা, ঝুলনযাত্রা, কুশান, তুষু, ভাদু, গম্ভীরা, আলকাপ, কৃষ্ণযাত্রা, দেবযাত্রা, যাত্রাপরব প্রভৃতি গড়ে ওঠে। যাত্রা মুখ্যত লোকনাট্যের আদিরূপ। আদিম সমাজের ঐন্দ্রজালিক প্রতীক খেলার মধ্যেই ঋতুমৌল যাত্রার প্রবৃত্তি অন্তর্লীন। ওঁরা ওদের মধ্যে নৃত্যগীত সমন্বিত যাত্রা আয়োজন এবং বাংলার সাঁওতালদের মধ্যে যাত্রা পরব নামক একটি অনুষ্ঠান প্রচলিত আছে। বাংলার লৌকিক দেবতাকে উত্তরবঙ্গের একটি আয়োজন 'যাত' নামে প্রসিদ্ধ। মধ্যযুগীয় দেবোৎসব মাত্রেই তা যাত্রা নামে পরিচিত। এসমস্ত উৎসবকে কেন্দ্র করে নৃত্যগীত অনুষ্ঠিত হয়। লোকসমাজে নৃত্য এবং গীতকে আশ্রয় করেই অভিনয়কলার যথার্থ বিকাশ ঘটে।

বাংলা সাহিত্যের অনুষঙ্গ : প্রাচীন পাঁচালিগান অথবা মঙ্গালগান যেমন ছন্দিত তাল-লয়ের সমাহারে গীত হত, নাট্য-গীতাভিনয় সেভাবে গীত হতো না। গীতগোবিন্দ বা শ্রীকৃষ্ণকীর্তন—এর মূল বিষয়কে প্রাচীন বাংলা ভাষায় গীতি সহযোগে অভিনয় করা হতো।

সমাজ সংহতির বিভিন্ন পর্যায়ে লোকনাট্যের বিচিত্র বিভঙ্গ দৃশ্যমান হয়েছে। গীতগোবিন্দ বা শ্রীকৃষ্ণকীর্তন থেকে শুরু করে উনিশ শতক পর্যন্ত সুদীর্ঘকালের লৌকিক জীবনের আচরণ এবং অনুষ্ঠান পর্যালোচনা করলে লোকনাট্যের প্রচুর উপাদান পাওয়া যায়। নাট্যগীত মধ্যযুগের বাংলা মঙ্গলকাব্যের অনিবার্য উপাদান। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে নাটগীত পাওয়া গেছে। মৈমনসিংহ গীতিকাগুলি নাট্যগীত ভিত্তিক আখ্যান। বৌদ্ধ জাতকাশ্রয়ী নাটগীত উল্লেখযোগ্য। বাংলার লোকনাটক কৃষিজীবনের 'পেস্টোরাল ড্রামা'। 'ছৌনাচ' নামক লোকনৃত্যনাট্যে নাট্যকলার মৌল উপাদানের কিঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যায়। ভারতবর্ষে একসময় রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত পুরাণের কাহিনি লোকমুখে প্রচারিত ছিল। উত্তরবঙ্গের 'কুশান', চোরচুরণি পালা, খনের পালা, বোলান, আলকাপ, ব্রত ইত্যাদি বাংলার লোকনাট্যের সজীব উপকরণ। লোককাহিনির ধারায় বিকশিত লোকশিল্পকলার অন্যতম রূপ মুখোশ নাচ। উত্তরবঙ্গের লেপচা জনসমাজে প্রচলিত লোকগীতনৃত্যধারা লোকনাট্যের প্রাথমিক উপাদান। বাংলার বর্তমান পর্যায়ের সুসংস্কৃত নাট্যকলার উৎস ধরা আছে বাংলার সুপ্রাচীন সংস্কৃতির স্মৃতিনির্ভর লোকজীবনের শিল্পকলার মধ্যে।

সাধারণ লক্ষণ : আলোচনার বর্তমান পর্যায়ে লোকনাট্যের সাধারণ লক্ষণগুলির দিকে নজর দেওয়া যেতে পারে—

১. লোকনাট্য সাধারণ জনমানসের দ্বারা অপর সাধারণ জনমানস সমীপেই পরিবেশিত হয়। রচয়িতা, শিল্পীগোষ্ঠী এবং দর্শক—সকলেই লোকায়ত পর্যায়ের জনগণ।
২. শহরের বিদগ্ধ এবং অভিজাত সমাজ থেকে দূরে গ্রামের উন্মুক্ত পরিসরে বারোয়ারিতলার মঞ্চগুলিতে এই সংরূপের উদ্ভব এবং অভিনয় দেখা যায়।
৩. খোলা আকাশের নিচে, উন্মুক্ত পরিসরে লোকনাট্যের অভিনয় হয়ে থাকে।
৪. সুগঠিত এবং শিল্পগুণান্বিত নাটকের নিয়মাবলি নির্দিষ্ট হলেও লোকনাট্য নির্দিষ্ট শিল্পশাসনের মধ্যে আবদ্ধ নয়। দর্শকের রুচি এবং চাহিদা অনুযায়ী নতুন উপাদানের প্রবেশ অনিবার্য।
৫. লোকনাট্যের বিষয়বস্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ধর্মীয়। লোকনাট্য চিরকাল লোকশিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ বাহক (পড়ুন, শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস অনুরূপ ভাবে ভাবিত ছিলেন)। সনাতন ভাবধারা এবং ঐতিহ্যই এই সংরূপের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়ে থাকে।
৬. লোকনাট্য সংগীতবহুল। সংলাপের চেয়ে সংগীতের প্রাবল্য এখানে অধিক।
৭. লোকনাট্যের অভিনয়ে আবৃত্তি এবং সুরের প্রাধান্য অধিক। সূক্ষ্মভাবের অভিব্যক্তির তুলনায় সেখানে জোরালো এবং গম্ভীর কণ্ঠস্বর বেশি প্রয়োজনীয়। অতিশয় ভাব প্রকাশের তাগিদে অনেকসময় মুখোশের ব্যবহার হয়ে থাকে।

আরও বেশ কয়েকটি লক্ষণ লোকনাট্যে সম্পৃক্ত হয়ে আছে—

১. লোকনৃত্য লোকনাট্যের একটি বিশেষ অঙ্গ। অভিনেতাদের সাজ-সজ্জা অতিসাধারণ। লোকনাট্যে লৌকিক বাদ্যযন্ত্র ব্যবহৃত হয়ে থাকে।
২. ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ, হাস্যকৌতুক, তামাসা, ঠাট্টা ভরপুর থাকে। আগত দর্শককে প্রশান্তি দেওয়ার কারণেই এসব উপাদানের অনুপ্রবেশ। তাই 'ভাঁড়' লোকনাট্যের মুখ্য আকর্ষণ। ব্যঙ্গের কশাঘাতে দর্শককে পুলকিত করার জন্য এসব করা হয়ে থাকে।

৩. লোকনাট্য প্রধানত অলিখিত। এখন অবশ্য লেখা শুরু হয়েছে। লেখনীর শাসন না থাকলেও লোকনাট্যের গান, সংলাপ যথেষ্ট শৃঙ্খলাবিহীন নয়।
৪. বাংলার লোকনাট্য বিয়োগান্তক নয়, তা মিলনান্তক। সংঘাতের নাটকীয় উদ্বেগ আছে ভরপুর।
৫. সামাজিক আখ্যানে লোকনাট্য বিরল নয়। রূপকথার নাট্যরূপ লোকনাট্যে স্থান পেয়েছে। পির ফকিরেরাও লোকনাট্যের চরিত্র হয়েছে। মহাকাব্যের চরিত্র নিয়েও লোকনাট্য মঞ্চস্থ হয়েছে। শাস্ত্রীয় দেবদেবী অপেক্ষা এখানে লৌকিক দেবদেবীর অধিক প্রাধান্য।
৬. লোকনাট্যে সামাজিক জীবনযাত্রার অন্তর্লীন সংঘাত দেখা গেছে। শ্রমজীবী নরনারীর কামনা-বাসনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, দুঃখ-নিরাশা কখনো প্রত্যক্ষে আবার কখনো পরোক্ষে প্রকাশিত হয়েছে। রসিকজনেরাই এর তল পেয়েছিলেন।

কাঠামো, চরিত্র, বিষয়বস্তু এবং অভিনয়শৈলী : লোকনাট্যের একটি কাঠামো গড়ে উঠেছে, এখানে 'অঙ্ক' বা 'পর্বাঙ্ক' এবং দৃশ্যভাগ নেই। কাঠামো কতকটা এরকম—

১. বাদ্যযন্ত্রের ঐকতান, বাদ্যযন্ত্রে ঢোলক, ডুগি-তবলা, জুড়ি, বাঁশি, খোল, বেহালা, হারমোনিয়াম, সারিঙ্গা, দোতারা, ব্যানা ইত্যাদি।
২. আসর বন্দনা, গীত ও নৃত্য হয়।
৩. পালার পরিচায়ক গান, এটা বসে বা দাঁড়িয়ে করা যায় এবং তাতে ধুয়ো থাকে।
৪. চরিত্রের গীত, কখনও সংলাপ হয়, তার মাধ্যমে মূল কাহিনি উপস্থিত হয়।
৫. ছড়া কাটা চলে।
৬. পরিণতি আসে।

এই ভাগের কতকগুলি আঞ্চলিক নামকরণ আছে এবং তাদের মধ্যে অন্তর্লীন প্রভেদও আছে। লোকনাট্যে মূল কাহিনির সঙ্গে একাধিক উপকাহিনি যুক্ত হয়ে থাকে। কুশীলবের স্বাধীনতা এখানে বিপুল। আসরে উঠে দাঁড়ানো এবং বসে পড়ার মাধ্যমেই কুশীলবের প্রবেশ এবং প্রস্থান। সমস্ত শিল্পীরা আসরেই বসে থাকেন। একজন শিল্পী কদাচিৎ একাধিক চরিত্রে অংশ নেন। একজন মুখ্য শিল্পী পালাকে নিয়ন্ত্রণ করেন। লোকনাট্যে একটি ভাঁড় চরিত্র থাকে। যার বিচিত্র নাম 'যাত্রা', 'দোহার', আরো কত কি! নাটকের শুরুতে বন্দনা অংশ থাকে। নাট্যের বিষয়বস্তু পৌরাণিক হলেও লোকজীবনের পরিচিত অনুষঙ্গ তাতে সম্পৃক্ত থাকে। সুদূর অতীতের কল্পনার জগত থেকে বাস্তব জগতের দিকেই তার সফল অভিযাত্রা। লোকনাট্য জীবন্ত এক সংযোগ মাধ্যম। যে লোকসমাজের অভিজ্ঞতা এখানে সংশ্লিষ্ট থাকে, তারা জীবনশৈলী এবং যাপনের বিচিত্র অবয়বে নিজেদের গড়ে নেয়। লোকনাট্যের 'মাস্টার' বা 'গীদাল' বা 'ওস্তাদ' আছেন। তাঁর পরিচালনায় মহড়া চলে। লোকনাট্যের অভিনয়ে দক্ষতা আবশ্যিক। স্বরক্ষেপন, পদচালন, হস্ত আলোড়ন—এসব অভিনয়ে আবশ্যিক। শিল্পীরা নিজেরাই এসব আয়ত্ত করে নেন। অনেকসময়েই অনুকরণ করে থাকেন। মানুষ কখনো নির্বাক পুতুলের অভিনয় করে থাকেন নাটকে। এঁরা দর্শককে হাসান, ভাবান, ক্রুদ্ধ করে তোলেন, নীতিশিক্ষা দেন আবার ঐতিহ্যকে ধারণেও কার্পণ্য করেন না। এরকম অভিনয়শৈলী একমাত্র

লোকনাট্যেই আছে। এই শিল্প সংরূপের অভিনেতারা তাই অদ্বিতীয়। অভিনয়ের মঞ্চ নির্দিষ্ট এক স্থানেই থাকে। চারপাশের দর্শকের মধ্যবর্তী অংশে বৃত্তাকারে তা রচিত হয়ে থাকে। মঞ্চের মাঝে বাদ্যযন্ত্রী এবং অভিনেতারা থাকেন। ইদানিং এরূপ মঞ্চ কম। বাদ্যযন্ত্রীদের কেউ এসে কোনো চরিত্রে অভিনয় করে যান। অভিনয় শেষের পরে বাদ্যযন্ত্রীদের অংশ হয়ে যান। একই লোক সামান্য পরিবর্তনের মাধ্যমে প্রতীকের সাহায্যে বিভিন্ন চরিত্রের রূপদান করে থাকেন। লোকনাট্যের মঞ্চ অনির্দিষ্ট এবং চলমান হতে পারে। সংলাপ দু'রকম—ক. গীত এবং খ. গদ্য। এসব মৌখিক অনুষঙ্গো যুক্ত। বিশেষত, গদ্য সংলাপ উপস্থিত মতোই আসরনির্ভর। গীত সংলাপেই কাহিনি কাঠামোর বিন্যাস। লোকনাট্য আবার দু'রকম— ১. আনুষ্ঠানিক, ২. অনানুষ্ঠানিক। অনুষ্ঠানকেন্দ্রিক যে লোকনাট্যের আয়োজন, তাই আনুষ্ঠানিক লোকনাট্য। কোনো অনুষ্ঠান ব্যতিরেকে লোকনাট্য আয়োজিত হলেই তা অনানুষ্ঠানিক লোকনাট্য।

কিছু পরিচিত লোকনাট্য-কথা : আলোচনার উপান্তে এসে বাংলাতে প্রচলিত কিছু লোকনাট্য বিষয়ে নাতিদীর্ঘ আলোচনা করা যাক। পশ্চিমবঙ্গো লোকনাট্যের মধ্যে সোনা রায়ের গান, মনসার গান (কোচবিহার), ধামগান, কুশান গান, চোরচুরনি (জলপাইগুড়ি), চৈতাগান, খনগান (পশ্চিম দিনাজপুর), গম্ভীরার গান, ডোমনিগান (মালদহ), আলকাপ (মুর্শিদাবাদ)। বোলান, পুতুল নাচ (নদীয়া), লেটোগান (বীরভূম), বনবিবি, অষ্টক (২৪ পরগনা), কৃষ্ণযাত্রা (হাওড়া), মাছানি (পুরুলিয়া) প্রভৃতি কোনো স্থানে শিক্ষিতজনের সামনেই মঞ্চস্থ হয়েছে। বোলান, আলকাপ এবং পুতুলনাচ একাধিক জেলায় রয়েছে। এখনো পর্যন্ত ক্ষেত্রানুসন্ধানের মাধ্যমে জানা গেছে যে, সমগ্র রাজ্যেই লোকনাট্যের বিস্তৃতি রয়েছে। এগুলির মধ্যে বৈচিত্র্যের পাশাপাশি ঐক্যের সূত্র রয়েছে।

১. আলকাপ : ধানবাদ, মালদা, বীরভূম, রাজশাহী, দুমকা, সাহেবগঞ্জ এবং পূর্ণিয়া জেলার প্রচলিত আদৃত লোকনাট্য হল আলকাপ। ব্যঙ্গবিদ্রূপধর্মী এবং রঙ্গরসাত্মক লোকনাট্য হলো আলকাপ। অবিভক্ত বাংলার রাজশাহী জেলার অন্তর্গত মোনাকয়সা নিবাসী বনমালী দাস আলকাপের প্রবর্তক বলে ধারণা করা হয়। আলকাপ গান কোনো ধর্মমূলক লোকনাট্যের অন্তর্ভুক্ত নয়। গম্ভীরার আয়োজন, দুর্গাপূজা, গাজন, কালীপূজা ইত্যাদি উপলক্ষ্যে গাওয়া হয়ে থাকে। আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে ৬-৭ জন নিয়েই দল গঠিত হত। তাঁদের মধ্যে একজন কপ্যা, জন দুই-তিন ছোকরা নাচিয়া এবং জন দুই-তিন বাজনদার। বর্তমানে, এজাতীয় গানের মধ্যে চরিত্রনির্ভর যাত্রাপালা এসে যাওয়ায় এবং নানা বাদ্যযন্ত্রের আবির্ভাব ঘটায় কমপক্ষে ৩০ জন প্রয়োজন।

২. কৃষ্ণযাত্রা : কৃষ্ণলীলাকে কেন্দ্র করে গ্রাম্য কবিরা অতি স্বল্পকালীন সময়ে অভিনয়যোগ্য নাতিদীর্ঘ এবং সংগীতপ্রধান এই পালা রচনা করে থাকেন। কোনো আয়োজন, পার্বণ এবং মেলা উপলক্ষ্যে এই পালা হয়ে থাকে। ছেলেরাই মেয়েদের ভূমিকায় অভিনয় করে থাকে। অধুনা অবশ্য মেয়েদের চরিত্রে ছোটো বালিকাদের অংশগ্রহণ হয়ে থাকে। দর্শক তাদের শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে এটি সহজ বলেই মনে করেন। হারমোনিয়াম, করতাল, ফ্লুট ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্রের সমাহারে বাদকরা আসরে বসে পড়েন। আদিরসাত্মক সুরে কৃষ্ণযাত্রার গান গীত হয়। মানুষ একই বিষয়ে যুগান্তের যাত্রাপালা দেখেও ক্লান্তিহীনভাবে দেখে চোখের জলে ভাসে। আসরে

বসা বাদকবৃন্দ এবং চলতি দৃশ্যের সময়ের অবসরপ্রাপ্ত অভিনেতা বা অভিনেত্রীরা ধুয়া করেন। দৃশ্য সেরে অভিনেতারা আসরে এসে বসে গানের ধুয়া ধরেন।

৩. বনবিবির পালা : সুন্দরবন অঞ্চলে বহুল প্রচলিত এবং অভিনীত লৌকিক পালার অভিনেয় নাম বনবিবির পালা। সুন্দরবনের নদী-জঙ্গালনির্ভর মানুষেরা একে 'বনবিবির পালা', 'বনবিবির গান', 'দুঃখের যাত্রা', 'দুঃখের পালা', বলে থাকেন। সুন্দরবনের 'আঠারো ভাঁটি' অঞ্চলে ইসলাম ধর্মের প্রতিষ্ঠা দিয়ে হিন্দুশক্তি বনাম মুসলমান শক্তির বিরোধ বনবিবির জহুরানামা বা বনবিবির পালাগানের মূল উপজীব্য হলেও কেচ্ছাকাহিনির উপাখ্যান দুটি ধারায় বিভক্ত।

১. বনবিবির জন্ম বিবরণ ও প্রতিষ্ঠা।
২. বনবিবির মাহাত্ম্য প্রচার।

মুখ্যত, দ্বিতীয় অংশের লোকপ্রচলিত নাট্যরূপ বনবিবির পালা বা দুঃখে যাত্রা।

৪. সঙ : নাটকীয় ভাবপ্রকাশের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন এবং সর্বজনীন মাধ্যম হলো সঙ। পরে এই রীতি যাবতীয় নাট্যকলার কেন্দ্রীভূত হয়। অঙ্গাভঙ্গি, পদক্ষেপ ও মুখভঙ্গির দ্বারা ভাব, কার্য ও পারিপার্শ্বিকতা বর্ণনা করে সঙের অন্বিষ্ট। যুদ্ধের নৃত্য দেখিয়ে এবং পশুপাখির ডাকের অনুকরণ করে শ্রোতাদের মুগ্ধ করত। বাংলার বিভিন্ন পূজা-পার্বণে সঙ বের হবার প্রথা বহুদিনের। চৈত্র সংক্রান্তির দিন গাজনের দল বিভিন্ন পথে ঢাক এবং কাঁসি বাজিয়ে ঘুরে সঙ বের করত। চৈত্র মাসেই শুধু সঙ বেরোত না। বিভিন্ন পূজা-পার্বণে সঙ বের করার রীতি প্রচলিত হয়ে পড়েছিল। বাংলার বিভিন্ন স্থানেও সঙ বের করার রীতি প্রচলিত হয়েছিল। বাংলার বিভিন্ন স্থানের মধ্যে কলকাতার জেলেপাড়ার সঙ সর্বাধিক আদৃত হয়েছিল।।

উৎসের সন্ধানে

১. মাধুরী সরকার : 'লোকনাট্য', 'বাংলার লোকসংস্কৃতির বিশ্বকোষ', কলকাতা, আকাদেমি অব ফোকলোর, প্রথম প্রকাশ, ২০০৪, পৃ. ২১০

তথ্যের সন্ধানে

১. গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য : 'বাংলা লোকনাট্য সমীক্ষা', রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, ২০০০
২. দুলাল চৌধুরী সম্পাদিত : 'বাংলার লোকসংস্কৃতির বিশ্বকোষ', আকাদেমি অব ফোকলোর, কলকাতা, ২০০৪

❑ যাত্রা

মনসাযাত্রায় পালাকারদের জনপ্রিয় সংযোজন : ভাসান পালা

তনুশ্রী বিশ্বাস

বাংলা সাহিত্যের আদি পর্ব থেকে আজ অবধি নাটক, যাত্রা ইত্যাদি অভিনয় শিল্পের এক ধারাবাহিক চলন লক্ষ করা যায়। চর্যাপদ, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, জয়দেবের গীতগোবিন্দ, চৈতন্যজীবনীতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এর প্রাথমিক পর্যায় ধরা আছে। পরবর্তীকালে রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠা হলেও গ্রামজীবনে লোকনাট্য তার স্বতন্ত্র ধারা বজায় রাখে। গানের আধিক্যে লোকসমাজে তা পালাগান নামে প্রচলিত হয়। সিনেমা টেলিভিশনের সঙ্গে নতুন নতুন মাধ্যমে বিনোদনের দুনিয়া আজ বহুমুখী। তবু বাংলার লোকসমাজে যাত্রাপালা আজও স্বতন্ত্র আবেদন রাখে। মধ্যযুগে রচিত দেবী মনসার মাহাত্ম্যজ্ঞাপক মনসামঙ্গল কাব্য আবহমান কাল ধরে রূপে ও ভাবে বাংলা সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করে চলেছে। লোকসংস্কৃতির ধারায় মনসাযাত্রা এরই একটি বিশিষ্ট রূপ। লোকসমাজে মনসাযাত্রা, মনসার গান নামেই অধিক প্রচলিত।

বাংলায় প্রচলিত মঙ্গলকাব্যগুলি ছিল বহু প্রাচীনকাল থেকে গ্রামজীবনে প্রচলিত পাঁচালীর বিবর্তিত ও বিবর্ধিত রূপ। বাংলাদেশের নানা প্রান্তে এই পাঁচালীর চল আজও রয়েছে—কোথাও তা গৃহবধূর বারব্রতে লোকসুরে কয়েক পাতার মুদ্রিত রচনা পাঠে, কোথাও বা পালাকারদের বিস্তৃত রচনায় তথা মঞ্চে গীত বাদ্য সহযোগে উপস্থাপনায়। এই পাঁচালীকেই দর্শকদের চাহিদা অনুযায়ী পরবর্তীকালে লোকযাত্রায় রূপান্তরিত করা হয়। বেড়ে যায় অভিনেতা-গায়ক-বাদকের সংখ্যা, সেই সঙ্গে ইয়ামা, ইলেকট্রিক কী-বোর্ড ইত্যাদি আধুনিক বাদ্যযন্ত্র দিনে দিনে যুক্ত হতে থাকে বিভিন্ন দলের সঙ্গে। কখনও লোক মনোরঞ্জনের জন্য, কখনও বা উপরি রোজগারের আশায় সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মনসাযাত্রায় যুক্ত হতে থাকে লোকদলগুলির গড়ে তোলা নানা মৌলিক কাহিনি। পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, উত্তর চব্বিশ পরগনা, নদিয়া, মুর্শিদাবাদ, মালদহ, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া সহ বিভিন্ন জেলার লোকসমাজে ছড়িয়ে রয়েছে অজস্র লোকযাত্রার দল, যারা কেবলমাত্র মঙ্গলকাব্য ও আখ্যানকাব্যের কাহিনি অবলম্বনে যাত্রাপালা পরিবেশন করে থাকেন। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় এই রকম অজস্র দল দর্শকদের চাহিদা অনুযায়ী মনসা, শীতলা ও বনবিবি এই তিন দেবীর মাহাত্ম্যকেন্দ্রিক যাত্রাপালা উপস্থাপন করে থাকেন। এই সব দলের অভিনীত মনসাযাত্রা মূলত চারটি পালায় বিভক্ত—

১. চাষ পালা
২. জন্ম পালা
৩. বাণিজ্য পালা এবং
৪. ভাসান পালা

চাষ পালা মূলত হর-গৌরী কথা। মনসা কথার সঙ্গো সরাসরি সম্পর্ক না থাকায় এবং গৃহস্থের সংগতি অনুযায়ী সমগ্র পালাকে পরিসরে সংক্ষিপ্ত করার তাগিদে মনসাযাত্রার অনেক দলই আর বর্তমানে চাষপালা উপস্থাপন করেন না। জন্ম পালায় রয়েছে মনসার জন্ম কথা। মহাভারতের নাগমাতা কদ্রুর শিবরতি পান করা, তার গর্ভে নাগলোকে মনসার জন্ম এবং কদ্রুর মাতৃস্নেহে শিবকন্যা মনসার ছোটো থেকে বড়ো হওয়ার অভিনব কাহিনির অবতারণা করা হয়েছে মনসাযাত্রার জন্ম পালায়। চাঁদ বণিকের বাণিজ্য যাত্রা, বেহুলা লখিন্দরের জন্ম কথা, বাণিজ্য করে ফেরার সময় নদীপথে তার বাণিজ্যতরী নিমজ্জন, চাঁদের ভিখারি দশা, মনসার নানাবিধ চক্রান্ত ইত্যাদি মনসামঙ্গালের কাহিনির বাঁধা ছকেই মনসাযাত্রার পালাকারেরা বাণিজ্য পালার কাহিনি গেঁথেছেন। আর ভাসান পালায় মৃতস্বামীকে নিয়ে কলার ভেলায় বেহুলার ভাসান কথা মূল উপজীব্য হলেও এই পালার সিংহভাগ জুড়ে আছে পালাকারদের সৃষ্ট 'নয়াবাজার' পর্ব। একটানা সাত আট রাতের মনসার পালাগানে সবচেয়ে জনপ্রিয় শেষ পালাটি যা মূলত ভাসান পালা। অর্থাভাবে যেখানে এক বা দুদিনের জন্য মনসার পালাগানের আয়োজন হয় সেখানে এই ভাসান পালাটিরই উপস্থাপন হয়। কারণ এখানেই রয়েছে বেহুলার অসাধ্য সাধন আর চাঁদ কর্তৃক মনসার পুজো প্রচারের মূল কাহিনি। ভাসান পালায় পালাকারদের সংযোজিত বিশিষ্ট কিছু কাহিনি নিম্নরূপ—

নয়াবাজার পর্ব : বাণিজ্য পালায় বেহুলা লখিন্দরের বিবাহ পূর্ব প্রেমপর্বের পটভূমি তৈরি করেছেন পালাকারেরা, যেখানে বেহুলা লখিন্দর একই পাঠশালায় লেখাপড়া শিখছে, এরকমই দৃশ্যের মঞ্চায়ন হয়। শৈশবের মুগ্ধতাই যৌবনের অনুরাগে পরিণত হয়, একথা ভাসান পালায় লখিন্দরের জবানিতে জানা যায়। সনকা লখিন্দরকে বিবাহের প্রস্তাব দিলে সে বেহুলাকে পাওয়ার জন্যই মৌনব্রত গ্রহণ করে গৃহত্যাগী হয়। নবগ্রাম নামক একটি স্থানে পৌঁছে সেখানে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে সে নয়াবাজার স্থাপন করেন। লক্ষণীয় যে, নয়াবাজারের বিভিন্ন ব্যবসায়ীরা ব্যবসার মূলধন হিসেবে লখিন্দরের কাছ থেকে যে অর্থ দাবি করে তা একেবারে আজকের দিনের অর্থমূল্য অনুসারী। এভাবেই পুরাণ গ্রন্থিত হয় সমকালের প্রেক্ষাপটে, দর্শকেরাও বেশি করে একাত্ম হন শিল্পীদের সঙ্গো। বাজার পরিষ্কার করার কাজে আসে উত্তমা হাঁড়ি। উত্তমার স্বামী মাতাল, কাজকর্মে অপটু। বাজার পরিষ্কার করার জন্য স্বামীর সাহায্য প্রয়োজন—এই পর্বে স্বামীকে সে যেভাবে ঝাঁটাপেটা করে কাজ করায় এবং শেষমেশ যেভাবে তাদের প্রেম দেখানো হয়, তাতে নিম্নবিত্ত বাঙালি পরিবার—মাতাল পুরুষ আর তার মুখরা পরিশ্রমী স্ত্রীর সংসারের চিরন্তন ছবি ফুটে ওঠে। এই উত্তমাকেই মূল পর্বের ঘটনার সঙ্গো যোগসূত্র হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে। লখিন্দরের নির্দেশে টাকার বিনিময়ে উত্তমা উজানি নগরের সায়বেনের কন্যা বেহুলাকে কৌশলে নয়াবাজারে নিয়ে আসে। উত্তমার সঙ্গো নয়াবাজার যেতে নাছোড়বান্দা বেহুলা অনেক অনুরোধ-উপরোধের পর মা অমলার থেকে অনুমতি আদায় করে। অবশেষে উত্তমার মধ্যস্থতায় বেহুলা লখিন্দরের প্রেম পর্ব সূচিত হয় এবং চন্দ্র সূর্য সাক্ষী রেখে মালাবদল করে তাদের গন্ধর্ব বিবাহ দেখানো হয়। এই পর্বে উত্তমার মাতাল স্বামী, নয়াবাজারের ঠক ব্যবসায়ী, বুড়ো ঘুঘনি বিক্রেতা—এই ভাঁড় চরিত্রগুলি লোকসমাজে হাসির খোরাক হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে।

গদাই পাল আর পাঁচির বিবাহ পর্ব : লখিন্দরের বিবাহ প্রস্তাব নিয়ে ঘটক দ্বিজবর উজানি নগরে সায়বেনের গৃহে উপস্থিত হয়। চাঁদ সদাগর দেবী মনসার সঙ্গে বিবাদে কীভাবে ছয় পুত্র হারিয়েছেন সে বিষয়ে অবহিত সায়বেনের স্ত্রী অমলা এই বিবাহ সম্বন্ধ ভেঙে দিতে তৎপর হন এবং সেই উদ্দেশ্যেই অসম্ভব দাবি রূপে বেহুলা ওজনের সোনার দাবি করেন ঘটকের কাছে। মনসার আশীর্বাদে ঘটক দ্বিজবর চাহিদা মতো সোনা দিতে সক্ষম হন। এ ঘটনাও মনসাযাত্রার মৌলিক সংযোজন। অতঃপর চাঁদের আনা লোহার কলাই রান্না করার জন্য গদাই পালের বাড়ি থেকে কাঁচা হাড়ি ও কাঁচা সরা আনার ঘটনা মনসামঙ্গল কাব্য অনুযায়ী দেখানো হয়েছে। কিন্তু এই পর্বে গদাই পালের বিবাহের ঘটনা যাত্রাদলের নিজস্ব সংযোজন। কুম্ভকার গদাই পাল বিয়ে পাগল। তিন তিনটি স্ত্রীর মৃত্যুতে তার দুঃখের শেষ নেই। এই দৃশ্যের শুরুতে তাকে দু-পা ছড়িয়ে বসে হাউ মাউ করে কাঁদতে দেখা যায়। সায়বেনের নির্দেশে দ্বারিক কাঁচা হাড়ি ও কাঁচা সরা কিনতে গদাইয়ের কাছে এলে সে জানায় যে আবার বিয়ে হলে তবেই সে কাজে মন দিতে পারবে। বাধ্য হয়ে দ্বারিক তার দিদির মেয়ে পাঁচির সঙ্গে গদাইয়ের বিয়ের প্রস্তাব করে। গদাই পালের হাস্যকর আচরণ, ছেঁড়া জামা, গলায় গামছা, ফোকলা দাঁত, নোংরা চেহারা সব মিলিয়ে একেবারে কিম্ভুত-কিমাকার। উপরন্তু সে কানে কম শোনে। পাঁচি বা পাঁচির মা, যে-কোনো নারীকে পেলেই সে কৃতার্থ হবে, এমন হাবভাব, পাত্র যাচাই করার জন্য হবু শাশুড়ির প্রশ্নের উত্তরে তার অসংলগ্ন কথাবার্তা, চালচলনে ছেলে বুড়ো সকল দর্শক হাসিতে ফেটে পড়ে। অতঃপর গদাই পাচির বিবাহ এবং লোহার কলাই রান্নার জন্য কাঁচা হাড়ি ও কাঁচা সরা তৈরি হওয়ার ঘটনা। লোক মনোরঞ্জনের জন্যই এই রূপ কাহিনির সংযোজন করেছেন পালাকারেরা।

বেহুলার অগ্নিপরীক্ষা : বেহুলা মৃত স্বামীকে নিয়ে কলার ভেলায় ভেসে যাওয়ার অনুমতি চাইলে চাঁদসদাগর প্রথমে রাজি হননি। তিনি বেহুলাকে অগ্নিপরীক্ষার শর্ত দেন এবং সেই মত অগ্নিকুণ্ড প্রস্তুত করেন। বেহুলা তার সুদৃঢ় মনোবল দ্বারা সেই অগ্নিকুণ্ড পার করে শ্বশুরের দেওয়া শর্ত পূরণ করে স্বামীর প্রাণ ফেরাতে কলার ভেলায় পাড়ি দেয়। লোক-মননে কাহিনির করুণ রসের আবেদন তীব্রতর করতে এরকম অভিনবত্ব এনেছেন পালাকারেরা।

কাঁচের ওপর নাচ : লোকমনোরঞ্জনের জন্য এবং দর্শকের কাছে আকর্ষণীয় করে তুলতে অনেক দলে একশো কেজি ভাঙা কাঁচের ওপর নৃত্য পরিবেশিত হয় ভাসান পালায়। এভাবে বেহুলার দেবসভায় নৃত্যকে দর্শকের কাছে আরও মর্মস্পর্শী করে তুলে ধরা হয়। কাঁচের ওপর নাচের সময় নৃত্যশিল্পী এবং মহিলা দর্শকদের নিজের চুল খুলে রাখার লৌকিক নিয়ম রয়েছে। তাই প্রয়োজনে নির্দিষ্ট নারী চরিত্রে অভিনয়কারী পুরুষ শিল্পী মেয়েদের মতো লম্বা চুল রাখেন। মঞ্চে নাচ শুরু হলে নিজেদের চুল খুলে দিয়ে উপস্থিত নারীরা উলুধ্বনি ও শঙ্খধ্বনি করেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য জনপ্রিয় বাংলা সিনেমা 'বেদের মেয়ে জ্যোৎস্না'য় সাপের কামড়ে আক্রান্ত রাজপুত্রের বিষ তোলার সময়ও বিষ তোলায় পারদর্শী মেয়েটি নিজে চুল খুলে বীণ বাজায় এবং উপস্থিত সকল নারীদেরও চুল খুলে দিতে বলে। গ্রামাঞ্চলে কিছু সময় পর্যন্ত সাপে কামড়ালে ওঝা বা বেদের বিষ তোলার যে বিশ্বাস প্রচলিত ছিল, তার সঙ্গেই এই মেয়েদের চুল খোলার সংস্কারও জড়িয়ে ছিল। সেই সংস্কারের রূপায়ণ হয়

চলচ্চিত্রে, লোকযাত্রায়। আজ প্রত্যন্ত গ্রামেও সাপে কামড়ালে সচেতন মানুষ ডাক্তারের কাছে যান। তবে মনসা যাত্রার ভাসান পালায় মনসা তথা সকল দেব-দেবীকে খুশি করতে বেহুলার নৃত্যের সময় দর্শক সহ সকল মহিলাদের চুল খোলার রীতি কোনও কোনও দলে প্রচলিত আছে। একই সঙ্গে সাতটি পিতলের কলসি নিয়ে কাঁচের ওপর নৃত্যও দেখায় কোনও কোনও দল। একটা সময় যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন অভিনেতা বা অভিনেত্রী। যন্ত্রণা বাস্তব হলেও লুটিয়ে পড়াটা পূর্ব পরিকল্পিত। এরপর মঞ্চে উপস্থিত অন্য অভিনেতা মনসার ঘটের জল ছিটিয়ে তাকে সুস্থ করে তোলেন। এই উপস্থাপনার জন্য দর্শকের কাছে দেবীর নামে শিল্পীকে যথাসাধ্য টাকা দান করার জন্য অনুরোধ করা হয়। দর্শকও এগিয়ে এসে সামর্থ্য মতো টাকা দিয়ে আহত অভিনেতা বা অভিনেত্রীকে সম্মানিত করেন। যাত্রার কাহিনিতে এই ধরণের সংযোজন মূলত বাড়তি রোজগারের জন্য করা হয়। সামান্য অর্থের জন্য এভাবে চরম যন্ত্রণাকে বেছে নেওয়ার মধ্যে দিয়েও লোকযাত্রার দলগুলির আর্থিক বিপন্নতা ধরা পড়ে। পাশাপাশি দলীয় কুশীলবদের ধর্মপ্রাণতার প্রমাণ দেয় যাত্রার নানা অংশ। লখিন্দরকে দংশন করার জন্য দেবী মনসা কালনাগিনীকে আদেশ করেন। কালনাগিনী অরাজি হলে দেবী তাকে চাবুকের আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত করেন। মঞ্চে মোটা দড়িকে চাবুক হিসেবে দেখানো হয়। পালা শেষ হওয়ার পরেও কালনাগিনীর ভূমিকায় অভিনয়কারী অভিনেতার শরীরে দড়ির দাগ চরিত্রের সঙ্গে তাদের একাত্মতা প্রমাণ করে। কাঁচের ওপর নাচ বা দড়ির আঘাত সহ্য করার ক্ষমতা মা মনসার আশীর্বাদ প্রদত্ত বলেই তারা জানান।

বিয়াল্লিশ কর্মা প্রসঙ্গ : বিশ্বকর্মার পুত্র বিয়াল্লিশ কর্মা চরিত্রটি মনসাযাত্রা ভাসান পালার নতুন সংযোজন। চাঁদের নির্দেশে লোহার বাসরঘর নির্মাণ করার সময় সে পিতাকে সাহায্য করে। বিয়াল্লিশ কর্মা বিয়ে পাগল। বিয়ের খরচ চালাতে টাকার প্রয়োজন। আর তাই মনসার নির্দেশে বাসর ঘরের ঈশান কোণে ছিদ্র করে ফেরার সময় সে মনসার কাছে পারিশ্রমিক দাবি করে। দেবী অস্বীকার করলে বিয়াল্লিশ কর্মা সকলের কাছে মনসার চক্রান্ত ফাঁস করে দেবার হুমকি দেয়। ক্রুদ্ধ মনসাও অভিশাপ দেন যত দিন মর্ত্যলোকে তার পুজো প্রচারিত না হবে, তত দিন পিতা পুত্রের বাক্‌শক্তি অবরুদ্ধ থাকবে। তবে সেই সঙ্গে এই আশীর্বাদও করেন মনসাপুজোর সঙ্গে সঙ্গে তাদের পুজোও প্রচারিত হবে। বিয়াল্লিশ কর্মা প্রসঙ্গ মনসার গানে পালাকারদের নিজেদের সংযোজন।

'ভাসান' পালা অত্যন্ত জনপ্রিয় হলেও কাহিনি সংস্থাপনে কিছু অসংগতি দেখা যায়। নয়াবাজার পর্বে লখিন্দর বেহুলাকে পাওয়ার জন্য গৃহত্যাগী হয়। এমনকি ভিনদেশে একটি বাজারও বসিয়ে ফেলে। উদ্দেশ্য সফল হয়, সে বেহুলার ভালোবাসা অর্জন করে। ইতিপূর্বে 'বাণিজ্য পালা'য় তারা একই পাঠশালায় শিক্ষা লাভ করেছিল এবং বালক বয়সেই লখিন্দর বেহুলার প্রতি আসক্ত হয়েছিল, এমনটা দেখানো হয়েছিল, কিন্তু নয়াবাজার পর্বে প্রায় ঘণ্টা দুই তাদের প্রেমপর্বের দৃশ্যায়ন হলেও পাঠশালা ও প্রথম সাক্ষাৎ-এর কোনও প্রসঙ্গ উল্লেখ করে না নায়ক-নায়িকা। আবার প্রেমপর্ব সাঙ্গ হলে বেহুলা লখিন্দর নিজ নিজ গৃহে ফিরে যায় এবং পরবর্তী ক্ষেত্রে বিবাহের জন্য কোনও প্রয়াস নেয় না। কোনও কোনও দলে আবার নয়াবাজারেই চন্দ্র- সূর্যকে সাক্ষী রেখে বেহুলা লখিন্দরের গন্ধর্ব বিবাহ দেখানো হয়। অথচ এরপর লখিন্দর গৃহে ফেরে এবং তার সম্মতিতেই তার পিতা ঘটক দ্বিজবরকে পাঠান দিকে

দিকে কন্যা সন্ধানের জন্য। যে লক্ষিন্দর বেহুলাকে পাওয়ার জন্য একদিন অসাধ্য সাধন করেছিল, সে-ই কিভাবে ঘটকের মনোনীত যে-কোনো কন্যার সঙ্গে বিবাহে সম্মতি দেয়। অন্য দিকে বেহুলাও লখিন্দর প্রসঙ্গের অবতারণা করে না নিজের পিতামাতার কাছে। ঘটক দ্বিজবর এলে, লখিন্দরের জন্য বিয়ের প্রস্তাব এসেছে, একথা না জেনেই সে বিবাহে সম্মত হয়। এক্ষেত্রেও পালাকারেরা কাহিনির পারম্পর্য তথা কার্যকারণ সম্পর্ক বজায় রাখতে অসমর্থ হয়েছেন। ভাসান পালায় বেশ কয়েকবার মঞ্চে অভিনেতা আর দর্শকের মধ্যে যোগসাধন করা হয়—

পদ্মার সাজসজ্জা : স্নানের ঘাটে বেহুলার পায়ের জল ছদ্মবেশী মনসার গায়ে লাগে। দেবীর চক্রান্তে বেহুলা অভিশপ্ত হয়। অতঃপর মনসা তার ভেজা সাজ-সজ্জা বদলে দেওয়ার নির্দেশ দেন। দলের আমন্ত্রক পরিবারের গৃহকর্ত্রীকে নতুন সজ্জায় সাজিয়ে দিতে ডাকা হয় মঞ্চে। আলতা, সিঁদুর, শাঁখা-পলা, ফুলের মালা, নতুন শাড়ি, মিষ্টি নিয়ে এসে দেবীকে সাজানো এবং বরণ করা হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, বেশির ভাগ মনসাযাত্রা দলেই মনসা চরিত্রে অভিনয় করেন পুরুষ শিল্পী। দলের নির্দেশ অনুযায়ী পদ্মার সাজ-সজ্জার দৃশ্যের জন্য আগে থেকেই মনসা চরিত্রের অভিনেতা বা অভিনেত্রীর হাতের মাপের শাঁখা-পলা কেনা হয়। এই দৃশ্যেও সাজ-সজ্জার শাড়ি ইত্যাদি দলের উপরি আদায় হয়।

বেহুলা লখিন্দরের আশীর্বাদ : বিবাহের আগে বেহুলা লখিন্দরের আশীর্বাদ পর্ব প্রায় আধঘণ্টা ধরে চলে। এই উপলক্ষ্যে বাড়ির দুটি শিশুকে বেহুলা লখিন্দরের প্রতিনিধিস্থানীয় করে মঞ্চে আশীর্বাদ করা হয়। মাথায় ধান-দূর্বা দিয়ে মিষ্টি খাইয়ে আশীর্বাদ করতে গানে গানে চলে আমন্ত্রণ। শিশু দুটির সুখ-সমৃদ্ধির কথা বলে আশীর্বাদ করতে ডাকা হয় তাদের বাবা-মা, কাকা-কাকিমা, ঠাকুমা, পিসি সহ প্রতিবেশীদের। আত্মীয় পরিজনেরা মন খুলে সাধ্যমত এ ক্ষেত্রে টাকা দিয়ে তাদের আশীর্বাদ করেন। বলা বাহুল্য এ রীতিও দলের অতিরিক্ত উপার্জনের মাধ্যম রূপেই প্রচলিত হয়েছে। একইভাবে বেহুলা লখিন্দরের বিয়ের সময় মঞ্চে উপস্থিত হয়ে টাকা দিয়ে নবদম্পতির হস্তবন্ধন খোলার জন্য এবং ব্রাহ্মণ বিদায় দেওয়ার জন্য শিশু দুটির পরিবার থেকে তাদের অভিভাবকদের ডেকে নেওয়া হয়। বিয়ের পর চাঁদের বাড়িতে নবদম্পতিকে আশীর্বাদ করার ক্ষেত্রেও ওই দুটি শিশুকে সামনে রেখে পরিবারের আত্মীয়ের কাছ থেকে পাওয়া আশীর্বাদী টাকা দলের ঝোলায় যায়। লখিন্দরের জীবনদানের দৃশ্যেও কোনও কোনও দলের তরফ থেকে মা মনসার চরণে সাধ্য মতো প্রণামী দেওয়ার আহ্বানে সাড়া মেলে দর্শকের। মাইকে দাতার নাম করে ঘোষণা করা হয় যে মা মনসা তাকে এবং তার পরিবারকে সমস্ত বিপদ-আপদ, রোগ-ব্যাধি তথা সর্পাঘাত থেকে উদ্ধার করবেন। এছাড়া লখিন্দরের পুনর্জীবন লাভের পর বেহুলার সিঁথির সিঁদুর ছোটো করে কাটা বিছুলির টুকরোতে লাগিয়ে বিক্রি করা হয় কোনও কোনও দলে। গানে গানে বেহুলা চরিত্রের অভিনেত্রী মা-বোনেদের সতীত্ব সিঁদুর কেনার জন্য আহ্বান জানান। সিঁথির সিঁদুর অক্ষয় রাখা, ভালো স্বামী পাওয়ার জন্য গ্রামের নারীরা এই সিঁদুর লাগানো বিছুলির টুকরো অল্প মূল্যে কিনে নিয়ে ঘরে রাখেন। ভাসান পালা মুখ্য হলেও লোককথা, লোকাচার, লোকভাষা সর্বোপরি লোকগানের এক মস্ত বড় ভাণ্ডার সমগ্র মনসাযাত্রায় ধরা আছে। লোকসাহিত্যের এক বৃহৎ চর্চার কেন্দ্র মনসাযাত্রার মত লোকযাত্রার বিস্তৃত ও উন্মুক্ত প্রাঙ্গণ।

সাক্ষাৎকার

তথ্যদাতা (পুরুষ)

১. সুব্রত সিংহ, বয়স : ২৮, পেশা : 'মা দশভূজা সিংহবাহিনী গীতিনাট্য সংস্থা' যাত্রাদলের অভিনেতা, এছাড়া চাষের কাজ করেন, ঠিকানা : ধবলাট, প্রসাদপুর, সাগর ব্লক।

২. রামপ্রসাদ নস্কর, বয়স : ৪০, পেশা : মনসার পাঁচালী ও যাত্রার পালাকার। 'মা মনসা শীতলা যাত্রা সংস্থার দলমালিক। এছাড়া গাছ কাটার কাজ করেন। ঠিকানা : গ্রাম-জলধাপা, পো.-বনসুন্দরিয়া।

৩. রাধাপদ রায়, বয়স : ৫৮, পেশা : মনসা, শীতলা, বনবিবির যাত্রা ও পাঁচালিকার, এছাড়া সবজির ব্যবসা করেন। ঠিকানা : কাঁঠালবেরিয়া, পো.-শঙ্করপুর, থানা-বারুইপুর

৪. নারায়ণ নস্কর, বয়স : ২৬, পেশা : মনসা যাত্রাদলের অভিনেতা, দিন মজুরের কাজও করেন। ঠিকানা : গ্রাম-কেশবপুর, নস্করপাড়া, থানা-বারুইপুর।

৫. পরিমল চক্রবর্তী, বয়স : ৫৮, পেশা : দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় শিল্পী সংসদের প্রাক্তন সম্পাদক, পাঁচালী, পালাগান, ইত্যাদি লোকসংস্কৃতির নানা ধারার সংগ্রাহক ও গবেষক। পাশাপাশি পৌরোহিত্যও করেন। ঠিকানা : গ্রাম ও পোস্ট হোটোর, থানা মগরাহাট, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা।

৬. দিব্যেন্দু সরকার, বয়স : ১১, পেশা : আদি ত্রিধারা গীতিনাট্য সংস্থা (জয়নগর) দলের অভিনেতা, ঠিকানা : ১২ নং জালাবেরিয়া, জয়নগর, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা।

৭. খোকন মণ্ডল, বয়স : ৫৪, পেশা : আদি ত্রিধারা গীতি নাট্য সংস্থা (জয় নগর) দল মালিক, যন্ত্রী। ঠিকানা : ১২ নং জালাবেরিয়া, জয়নগর, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা

৮. অশোক সর্দার, বয়স : ৩২, পেশা : ইয়ামা বাজান, আদি ত্রিধারা গীতি নাট্য সংস্থা, জয়নগর। ঠিকানা : ১২ নং জালাবেরিয়া, জয়নগর, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা।

৯. প্রবীর নস্কর, বয়স : ৫০, পেশা : অভিনেতা, আদি ত্রিধারা গীতি নাট্য সংস্থা, জয়নগর। ঠিকানা : দেউল বাড়ি গ্রাম, কুলতলি থানা, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা।

১০. তুষার নস্কর, বয়স : ১২, পেশা : অভিনেতা, আদি ত্রিধারা গীতিনাট্য সংস্থা, জয়নগর। ঠিকানা : জয়নগর, আঁটোসাঁট তলা, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা

১১. উৎপল নস্কর, বয়স : ২৫, পেশা : অভিনেতা, আদি ত্রিধারা গীতিনাট্য সংস্থা, জয়নগর। ঠিকানা : গোপালগঞ্জ, কুলতলি থানা, ১২ নং জালাবেড়িয়া।

তথ্যদাতা (মহিলা)

১. কমলা সর্দার, বয়স : ৩০, পেশা : যাত্রাদলের অভিনেত্রী, এছাড়া চাষের কাজও করেন। ঠিকানা : গ্রাম ডাবু, কানিং, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা।

২. অর্চনা মাল, বয়স : ৩২, পেশা : যাত্রাদলের অভিনেত্রী, এছাড়া চাষের কাজও করেন। ঠিকানা : গ্রাম ডাবু, কানিং, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা

৩. তাপসী নস্কর, বয়স : ১৬, ঠিকানা : কাশীনগর, থানা রায়দিঘি, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, পেশা : যাত্রাদলের অভিনেত্রী।

৪. একাদশী গায়েন, বয়স : ৪০, ঠিকানা : গ্রাম মধুসূদনপুর, জয়নগর, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, পেশা : যাত্রাদলের অভিনেত্রী।

৫. মৌসুমি সর্দার, বয়স : ৪৫, পেশা : অভিনয় (ডাবু শিব শক্তি ও ভাগ্যলক্ষ্মী অপেরা), চাষের কাজ, ঠিকানা : ডাবু, ক্যানিং দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা।

সুন্দরবনের মনসার ভাসান গান
বিভিন্ন বৃত্তিজীবি মানুষের জীবনের গান

দীপ্ত সরদার

সমগ্র মধ্যযুগকেই এককথায় বলা যেতে পারে মঙ্গলকাব্যের বা মঙ্গল সাহিত্যের যুগ। কারণ এই সময়পর্বে বাংলা সাহিত্যের বিস্তৃত কালপর্বে সৃষ্টি হয়েছে একাধিক মঙ্গলকাব্যের। চণ্ডীমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল, কালিকামঙ্গাল, অন্নদামঙ্গল তো আছেই, তবে বাঙালির জনজীবনে সবচেয়ে বেশি প্রাধান্যের ছাপ ফেলে 'মনসামঙ্গল'। লোকায়ত জীবন ও সংস্কৃতিতে দেবী মনসা পূজিত হন একদিকে কৌমসমাজে প্রজনন শক্তির প্রতীক হিসেবে; আর একদিকে ভয়, সংস্কারজাত প্রভাবগুলি সহজে এড়িয়ে যাওয়ার জন্য। সুন্দরবন অঞ্চলে দেবী মনসাও মানুষের জীবনচর্যায়, তাদের সামাজিক, পারিবারিক জীবনে পূজিতা হন বহু স্থানেই। শহরাঞ্চল থেকে গ্রামীণ পরিবেশে সেই পুজোর চল অনেক বেশি লক্ষিত হয়। এই অঞ্চলে প্রায় ঘরে ঘরেই এই দেবীর পুজো অতি ভক্তিনিষ্ঠা সহকারেই পালন করা হয়। আর এই পুজো উপলক্ষ্যে দেবীর মহিমা বিষয়ক গান করা হয়ে থাকে। সাধারণভাবে দেবী মনসাকে উদ্দেশ্য করে রচিত এই মহিমা কীর্তনের যে মৌখিক রূপটি, সেটি লোকায়ত গ্রামীণ কবিরা মুখে মুখে আজও গেয়ে বেড়ান। তাকে 'মনসার ভাসান' গান বলে আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে।

এই মনসার ভাসান গান মাটির গান। মূল মনসামঙ্গালের কাহিনিকে একই রেখে লোকায়ত কবিরা তার পরিবেশনাগত ভাবটিকে রূপদান করেছেন নতুন করে যাত্রা এবং পালাগানের আকারে। সেখানে এগুলি মঞ্চে বা আসর পেতে গ্রামীণ খোলা আকাশের নীচে অভিনেতা-অভিনেত্রীরা নৃত্য ও গীতের মাধ্যমে দর্শকদের সামনে উপস্থাপন করেন। মনসামঙ্গাল কাব্যের সমস্ত ঘটনার বর্ণনাই যে এখানে বিস্তৃত আকারে উপস্থিত রয়েছে এমন নয়। কবিরা তাঁদের নিজেদের মতো করে অনেক নতুন চরিত্র, ঘটনার প্রবেশও ঘটান এই গান এবং যাত্রাগুলির মধ্যে। তবে সেই চরিত্র, ঘটনা বা গানগুলি অবশ্যই মূল মনসামঙ্গালকাব্যকে উপেক্ষা করে নয়, তার সামঞ্জস্যতা বজায় রেখেই তাঁরা সেই আখ্যানকে জনসাধারণের সম্মুখে তুলে ধরেন।

তবে এই গানগুলি মূলত 'Oral Form' আকারেই রয়ে গেছে। বংশ পরম্পরায় বাড়ির ব্যক্তিবর্গরা অভিনয় করতে করতেই একপ্রকার মুখস্থ করে ফেলেছে গানগুলি। মুখে মুখে গাওয়া এই গানগুলি একসঙ্গো সংকলন করে কোনো গ্রন্থ আজও প্রকাশ পায়নি কোথাও। এমনকি আজও গানগুলি সংরক্ষণ করা হচ্ছে না কোনো স্থানে। ফলে অনেক পুরোনো শিল্পী,

যাঁরা গত হয়েছেন বা শারীরিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, তাদের মুখের গাওয়া সেই গানগুলি আজ হারিয়ে যেতে বসেছে বহুলাংশেই।

মনসার ভাসান গান এক অর্থেই মাটির গান। যার সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক প্রাণের। তাই এই প্রাণের সঙ্গে যোগ আছে জীবনের, সমাজের। একেবারে খেটে খাওয়া মানুষের তাদের জীবনে বেঁচে থাকার জন্য বিভিন্ন জীবিকার পরিচয় আছে এই গানগুলিতে। আসলে এই আঞ্চলিক গানগুলি তো বিভিন্ন বৃত্তিজীবী মানুষের জীবনের আর এক অঙ্গ। বিভিন্ন পেশায় যুক্ত থাকায় এই অসংখ্য মানুষের পরিচয় হাজির করেছেন এই গানগুলির মধ্যে। সে দিক দিয়ে এই অঞ্চলের গায়েনরা একটি পৌরাণিক পালার মধ্যে এমনতর সব মানুষকে তুলে এনে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। আর সেজন্যই গানগুলি শুধুই গানের মধ্যে থেমে থাকেনি। জীবনের গান হয়ে উঠেছে সাহিত্যের পাতায়। বলাবাহুল্য, গান বা সংলাপ যেগুলি এই আলোচনার উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরেছি সেগুলি প্রত্যেকটি কোনো নির্দিষ্ট হাতে লেখা পালার পাণ্ডুলিপি থেকে আমি গ্রহণ করেছি। কোনো কোনো বিষয়ে এই ভাসান গানের সঙ্গে যুক্ত আছেন এমন সব মানুষগুলির কাছে থেকেও সাহায্য নিয়ে আলোচনায় তাকে প্রতিস্থাপিত করেছি। আমি সেখান থেকেই সব উদাহরণগুলি তুলে আলোচনা করলাম।

ক.

লখিন্দরের বাসর ঘর নির্মাণের জন্য বিশ্বকর্মার পরিচয় পাই। চাঁদ, লখিন্দরের বিবাহের পর সাঁতালি পর্বতে একটি লৌহ নির্মিত বাসর ঘর নির্মাণের জন্য তার প্রয়োজন পড়ে। এই বিশ্বকর্মা বাসর নির্মাণে পারদর্শী। চাঁদ তাকে এমন একটি বাসর নির্মাণের কথা জানায় যেখানে কোথাও কোনো ছিদ্র যেন না থাকে। কারণ বেহুলা-লখিন্দরের বাসর রাতে মনসা যেন তার ভিতরে প্রবেশ করতে না পারে। অবশ্য তার আগেই দেবী মনসা বিশ্বকর্মার সঙ্গে দেখা করে তাকে অভিশাপ দিয়ে বাসর ঘরে তার ফণীগণের চলাচলের পথ তৈরি করে নিয়েছিল। বিশ্বকর্মাকে চাঁদ বাসর ঘর বাঁধার আদেশ দিলে প্রথমে সে অস্বীকার করে। তার কারণ অতি স্পষ্টভাবেই এই গানের মধ্য দিয়ে ব্যক্ত করেছে বিশ্বকর্মা—

> আমি তা পারবো না হে সওদাগর/কেমন করে বাঁধবো লোহার বাসর ঘর।/আমি তা পারবো না,/সাঁতালি পর্বত উপরে আমি উঠবো কেমনে/ও সওদাগর আমি তাই ভাবি মনে মনে।/আবার পর্বত হতে উল্টে পড়লে/কোমর বাঁচবে না।/আমি তা পারবো না হে সওদাগর/কেমন করে বাঁধবো লোহার বাসর ঘর।[১]

খ.

লখিন্দরের বিবাহের পাত্রী দেখার জন্য ঘটকের কথা জানতে পারি। গ্রামবাংলায় আজও কোনো পাত্র বা পাত্রীর বিবাহের জন্য ঘটক ঠাকুরের ডাক পড়ে। সেই ছবিও আমরা এই গানের মধ্যে দেখতে পাই। লখিন্দরের বিবাহের জন্য পাত্রী দেখতে এই ঘটকের প্রয়োজন হয়। এই ঘটক চরিত্রটি নিছানি নগরের সওদাগরের একমাত্র কন্যা 'সতী বেহুলার' সন্ধান দেয়। বেহুলার বাড়িতেও লখিন্দরের খবর সে জানায়। দুই দিকের পাত্র-পাত্রীর দর্শনের খবর ঘটকই উপস্থাপন করে। উভয়পক্ষের কাছে বিবাহের সমস্ত গানের দল ভাড়া করা, পালকি বাহকদের সংবাদ দিয়ে নিয়ে আসা, এই বিবাহকেন্দ্রিক সমস্ত কাজ সম্পাদন করে এই চরিত্রটি।

তবে এরই মধ্যে এই চরিত্রটি বেশ রসিক। তার কথাবার্তার মধ্যে দিয়ে দর্শকদের কাছে হাস্যরসের সৃজন করা হয়ে থাকে। ঘটক চরিত্রটির পোশাক এবং অঙ্গভঙ্গি বেশ মজার। কথা বলার ঢং দিয়েও সে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আসলে একটানা একটি সিরিয়াস ঘটনা দেখতে দেখতে দর্শকরা যেন হাঁপিয়ে ওঠেন। তাই এই রকম দু-একটি চরিত্র এই অঞ্চলের গানগুলিতে লক্ষ করা যায়। ঘটক চরিত্রের কথাবার্তায় স্থানীয় আঞ্চলিক ছাপটিও বেশ স্পষ্ট ভাবে ধরা পড়ে। এই চরিত্রটির কথা বলার মধ্যে কতটা যে হাসি লুকিয়ে থাকে, একটি উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি পরিষ্কার করছি।

ঘটক : হরিবোল, হরিবোল। লখিন্দর-এর জন্য পাত্রী দেখার শুভকাজে যাত্রা করলাম। পথে কেউ যেন বাধা দেবেন না।

নায়েব : আরে মশাই, ছাতা মাথায় নিয়ে বাড়ির ভেতর ঢুকে পড়েছেন কেন? ছাতা ভাঙুন বলছি।

ঘটক : কি মুশকিল। সকাল বেলা সাড়ে সাত গণ্ডা লোক ডেকে এই ছাতার কল তুলেছি, আর আপনি বলছেন কিনা ছাতা ভাঙুন। আমি সেই সাড়ে সাত গণ্ডা লোক কি সঙ্গে এনেছি, যে আপনি বললেই আমি ছাতা ভাঙবো।

নায়েব : আরে মশাই, আপনার ছাতা আমি ভেঙে দিলাম।

ঘটক : আরে মশাই, করলেন কি! আমার 'ওকে' জ্যান্ত ছাতাটা আপনি ছিঁড়ে দিলেন।

নায়েব : মশাই আপনি কি লোক?

ঘটক : কেন, দেখতে পাচ্ছেন না যে আমি একটা মদ্দা লোক।

নায়েব : আরে মশাই, তা বলা হচ্ছে না। আপনি কোন শ্রেণির?

ঘটক : সাবধান মশাই। আমি ওসব 'ছেনি-হাতুড়ি' না। আমি একেবারে নতুন গুড়ের নতুন পাটালি।

নায়েব : আরে মশাই, তা বলা হচ্ছে না, আপনি কি জাত?

ঘটক : সাবধান মশাই, জাত তুলে কথা বলবেন না। জাতিতে আমি কেউটে।

নায়েব : আরে মশাই, তা বলছি না। আপনি কি কাজ করেন?

ঘটক : তাই বলেন। সে কথা তো আগে বললেই হয়। আমি ঘটকালি করে থাকি।[২]

উপরের কথোপকথনটি ঘটক ও নায়ক চরিত্রের মধ্যেকার। চাঁদ ঘটককে তার পুত্রের জন্য নিছানি নগরে পাত্রীর খোঁজে পাঠালে, রাজ্যে ঢোকার পরে রাস্তায় এই নায়েবের সঙ্গে দেখা হয় ঘটকের। সেই সময়ের দুজনের কথোপকথন এটি। পড়লেই আমরা লক্ষ করবো যে, ঘটকের কথা বলার মধ্যে একটা ঠাট্টা, মজা, মশকরা এই ব্যাপারগুলি আছে। তাই হাস্যরসের সৃজনে এই চরিত্রের অবদান এই ভাসান গানের অন্যতম একটি বিষয়ও বটে।

গ.

গানের মধ্যে গণক ঠাকুরের পরিচয় আছে। গ্রামের মানুষ আজও তাদের সংস্কারগুলি থেকে বের হয়ে আসতে পারেনি। তাইতো তারা হাত গণনা, কুষ্টি বিচার, কপাল দেখানো ইত্যাদি বিষয়গুলি আজ সভ্য জগতে কুসংস্কার বলে মনে হলেও, আজ থেকে চল্লিশ বছর আগে গ্রামবাংলায় প্রত্যন্ত সুন্দরবন অঞ্চলের মানুষ সেগুলিকে নিজের সংস্কৃতির মধ্যে গ্রহণ করেছিল। তাইতো তারা গণককে দিয়ে গণনা করে তাদের বিভিন্ন ভালো-মন্দ খবরাখবর

নিত। তেমনি একটি চরিত্রের পরিচয় পাই উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার এই মনসার ভাসান গানগুলির মধ্যে। গণক ঠাকুরের খোঁজ করা হয়ে থাকে, চাঁদ সওদাগরের বাণিজ্য করতে গিয়ে সে কোথায় আছে তার পরিস্থিতি জানার জন্য, কেমন আছে তার জীবন তা জানার জন্য এবং বাড়ির আরো অন্যান্য খবর জানার জন্য। সেই হেতু রাজ্য থেকে রানিমা অর্থাৎ সনকা গণকঠাকুরকে সংবাদ পাঠায়। সেই সময়ই এই চরিত্রটির সন্ধান মেলে। এই গণক ঠাকুর রানি মায়ের হাত গণনা করে জানায় যে—

গণক : রানি মা, আমাকে কি জন্য ডেকেছেন?

সনকা : দেখুন ঠাকুরমশাই। আমার প্রাণপতি আজ ১২ বছর বাণিজ্যে গমন করেছেন। আপনাকে গনাপড়া করে দেখতে হবে তিনি ভালো আছেন না মন্দ আছেন।

গণক : বুঝতে পেরেছি। আপনার প্রাণপতি আজ ১২ বছর বাণিজ্য গমন করেছেন। তাই আমাকে গনাপড়া করে দেখতে হবে তিনি ভালো আছেন কি মন্দ আছেন।

সনকা : হ্যাঁ, সত্য।

গণক : এখানে বসুন রানিমা। আর আপনার বামহস্ত খানি দিন। আর মনে মনে একটা ফুলের নাম করুন। সোম শনি পূর্বে হবে, বুধ বৃহস্পতি দক্ষিণে হবে, সুখাদি পশ্চিমে মূল, একা মঙ্গলে করেছে নির্মূল। ও রানিমা, আমার মাথার চুলগুলো সব লাফ পাড়াপাড়ি করছে।

সনকা : কি হলো ঠাকুরমশাই

গণক : রানিমা, আপনার দুটি কুমঙ্গল আর একটি সুমঙ্গল।

রানিমা : বলুন ঠাকুরমশাই। আমারে দুটি কুমঙ্গালের কথা আর একটি সুমঙ্গালের কথা।

গণক : তাহলে রানিমা আপনার একটি কুমঙ্গালের কথা হলো আপনার প্রাণপতি বাণিজ্য থেকে ফেরার সময়ে কালীদহের জলে হাবুডুবু খাচ্ছে।

সনকা : ওহ, ঠাকুরমশাই এ কি কথা শুনালেন আমায়।

গণক : কাঁদবেন না রানিমা। কোন ভয় নেই তিনি অতি কষ্টে কূল পেয়েছেন।

সনকা : কূল পেয়েছেন। তাহলে আমার আর একটি কুমঙ্গালের কথা বলুন।

গণক : তাহলে শুনুন। আপনার রামকদলী বনে একটি চোর ঢুকবে। আপনার বাড়ির রাম সিং জমাদার আছে সে চোরকে বন্দি করবে।

সনকা : ঠাকুর আর আমার সুমঙ্গাল কি বলুন।

গণক : আপনার গর্ভে পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করবে। সেই পুত্র রবে না, মা বলে ডাকবে না। কিন্তু এই ফুলটি গ্রহণ করুন তাহলে সব ঠিক হয়ে যাবে।[৩]

আমরা উপরের এই সংলাপগুলি থেকে দেখলাম যে গণকঠাকুর শুধু গণনা মাত্রই করে না। সে জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা যে সত্যগুলি তার পরিচয়ও জানায়। এমনকি বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য সে তার উপায়ও জানিয়ে দেয়। যদিও সেই উপায়গুলি কতটা বাস্তবায়িত হয় তার প্রশ্ন এখানে নয়। মূল কথা হলো বিশ্বাস। সেই বিশ্বাসের দিকগুলি দিয়ে বিচার করলে এই চরিত্রটির এক অন্যরূপ আমাদের কাছে ধরা দেয় ভাসান গানগুলির মধ্যে দিয়ে।

ঘ.

লখিন্দর-বেহুলার বিবাহের সময় পুরোহিতের পরিচয় পাই। পুরোহিত চরিত্রটির মধ্যে আমরা দেখতে পাই হাস্যরসের অবতারণা। লখিন্দর-বেহুলার বিবাহবন্ধন, তাদের মালাবদল, বিয়ের মন্ত্র ইত্যাদি কাজের জন্য পুরোহিত চরিত্রটির বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের পরিচয় পাই। এই জীবিকার মানুষ আজও আমাদের বিবাহের সময়ে পাওয়া যায়। ভাসান গানগুলোতে তার অবস্থান দেখি। এই ভাসান যাত্রায় পুরোহিতের প্রবেশ হয়েছে এমন ভাবে—

> **পুরোহিত :** মা সকলেরা জয় দিন, নারায়ণ যাচ্ছে নারায়ণ। বাবা তুমি এখানে বসো, মা তুমি এখানে বসো। মন্ত্র বলুন সূর্যের দিকে তাকিয়ে। বলুন করুণা সিন্ধু দীনবন্ধু জগতপথে, গোপেষু গোপিকাকান্ত রাধাকান্ত নমস্তুতে। তুলসী দর্শনে ভাস্করে, শুভক্ষে পূর্ণিমা রাত্রে বিবাহ সম্পূর্ণ হইলো। ঘটক ঠাকুর আমার চাল, কলা গুলো বেঁধে দিন।[৪]

অর্থাৎ, হাসির খোরাকের জন্য একদিকে যেমন চরিত্রটিকে উপস্থাপিত করা হয়েছে; ঠিক তেমনিই আবার চরিত্রটির মধ্যে দিয়ে ঘটনার পারম্পর্য রক্ষিতও হয়েছে। এই রকম বিভিন্ন বিত্তজীবি মানুষের পরিচয় এই গানগুলিতে রয়েছে।

ঙ.

জন্মগ্রহণ করার সময় দাইমার পরিচয় পাই। গ্রাম-বাংলার প্রান্তীয় সুন্দরবন অঞ্চলে বসবাসকারী মানুষের মধ্যে আজও সন্তান-সন্ততি জন্ম গ্রহণের সময় সেখানে এই দাইমাদের আনা হয় সন্তান প্রসব করানোর জন্য। এই অঞ্চলের মানুষ প্রসবের সময়ে কাছাকাছি উপযুক্ত ডাক্তার না পেলেও প্রত্যেক গ্রামে কমবেশি এইরকম দাইমা মহিলাদের সন্ধান মেলে। এনারা অল্পবিস্তর ডাক্তারিবিদ্যা জানেন। তার সাহায্যেই সন্তান প্রসবের সময় তাদের সেই অভিজ্ঞতা দিয়েই তারা এই কর্মটি নিজের জীবনের সঙ্গে জুড়ে নিয়েছেন। পারিশ্রমিক হিসেবে এনারা ডাক্তারের মতো কোনো অর্থ নেন না। তবে উপহারস্বরূপ শাড়ি, কাঁসার থালা এবং খাওয়া-দাওয়া তারা পান। সেইরকম এই দাইমার ডাক পড়েছিল চাঁদের বাড়িতে লখিন্দরের জন্মগ্রহণের সময়। এই দাইমার দ্বারাই লখিন্দরের প্রসব করানো হয়। গানের মধ্যে তাই দেখানো হয়, এই চরিত্রটিকে সাধারণত সন্তান হওয়ার পরে নাড়িছেদন অংশে। এটিও তার কর্মের মধ্যে অন্যতম। সেই সময় ডাক্তারি যন্ত্রপাতি না পেলেও সে জল, সুতো, ব্লেড, ছাই ইত্যাদির সাহায্যে এই কাজটি সম্পন্ন করে থাকে। ভাসান যাত্রার মধ্যে সেই অংশটির বর্ণনা এমনভাবেই করা আছে—

> সনকা : দাসী, দাইমাকে এক্ষুনি আনার ব্যবস্থা করো।
>
> দাসী : ঠিক আছে রানিমা। আমি এক্ষুনি নিয়ে আসছি।
>
> (দাইমার প্রবেশ ও গান)
>
> দাইমা দাইমা বলে ডাকলো আমায় কে/অতি আরামে শুয়ে ছিলাম খাট পালঙ্কে।/দাইমা দাইমা বলে ডাকলো আমায় কে,/অতি আনন্দে শুয়ে ছিলাম নলবাগানে।/দাইমা দাইমা বলে ডাকলো আমাকে/অতি আনন্দে শুয়ে ছিলাম নাড়াবাগানে।
>
> দাসী : আমাদের একটি পুত্র সন্তান হয়েছে। তাই তোমাকে নাড়িছেদন করতে হবে।
>
> দাইমা : তাহলে তুই আমার নাড়িছেদনের জিনিসগুলো এনে দে।[৫]

এরপরেই এই জিনিসপত্র দিয়ে সে পুত্রের নাড়িছেদন করে। এজন্য সনকার কাছ থেকে নতুন

বস্ত্রাদি ও দশ কেজি চাল গ্রহণ করে। এই অংশটিতে অভিনয়ের সময় মূলমঞ্চে একটি ছোট্ট শিশুকে নিয়ে যাওয়া হয়ে থাকে এবং সে কান্নাকাটি করে। বিষয়টি অতি চমৎকার ভাবে দর্শকদের সামনে উপস্থাপনা করা হয়ে থাকে।

চ.

ভাসান গানগুলির মধ্যে আমরা হদিস পাই ওঝা চরিত্রের। গ্রামে-গঞ্জে আজও কিছু কিছু অঞ্চলে মানুষ এই জীবিকার সঙ্গে যুক্ত। কোনো মানুষকে সাপে কামড়ানোর পরে অসহায় হয়ে যায় গ্রামীণ এই চব্বিশ পরগনার মানুষগুলি। তাদের গ্রামে কোনো ডাক্তার না পেয়ে হাজির হয় ওঝার কাছে। এই ওঝারা সাপের বিষ ঝাড়িয়ে মানুষকে সুস্থ করে তোলেন। তেমনই এই মনসার ভাসান গানের মধ্যে পরিচয় পাই বিনোদ ওঝার। লখিন্দরের বাসর রাতে সাপে কামড়ানোর পরে বেহুলা এই বিনোদ ওঝাকে নিয়ে আসে। বিনোদ ওঝার গানটিও আছে যাত্রাগুলিতে—"ওরে আর কাঁদিস না আর কাঁদিস না/বেহুলা সুন্দরী হায়রে বেহুলা সুন্দরী।/আমি ওঝা বিনোদ খোঁড়া যাচ্ছি তোদের বাড়িতে,/আমার এই বিনোদের বড়ি যে রোগীতে খায়/সেই মানুষ যে হেঁটে চলে যায়।/ওরে আর কাঁদিস না আর কাঁদিস না।"[৬]

এই বিনোদ ওঝা বেহুলার অনেক প্রার্থনাতে লখিন্দরের দেহ পরীক্ষা করে তাকে তন্ত্র-মন্ত্র, ঝাড়ান, গাছ খাওয়ানো ইত্যাদির পরেও তার দেহে প্রাণ ফিরিয়ে আনতে পারেনি। বিনোদ জানায়, তার স্বামীকে কালসাপে দংশন করেছে। তাই সে বাঁচাতে পারবে না। তবে বেহুলা যদি কলার মান্দাস করে তার মৃত স্বামীকে নিয়ে দেবপুরে যায়, তবেই স্বামীকে বাঁচাতে পারে। তাই এই গানগুলোর মধ্যে ওঝা বৃত্তিধারী মানুষেরও পরিচয় আমরা পাই।

ছ.

ভাসান গানগুলির মধ্যে পাই কুমোর জীবিকাধারী মানুষের পরিচয়। বেহুলা-লখিন্দরের বিয়ে ঠিক হলে বিয়ের অন্যতম শর্তস্বরূপ চাঁদবেনে বেহুলার কাছে কাঁচা হাঁড়ি ও কাঁচা সরাতে রন্ধনের কথা জানায়। সেই কাঁচা হাঁড়ি ও কাঁচা সরা তৈরি করার সময় বেহুলার পিতা সায়বেনে সওদাগর তার রাজ্যে সংবাদ পাঠায়। এই কুমোর হলেন ছিদাম পাল। ছিদাম ও তার স্ত্রী দুজনেই মাটির হাঁড়ি, কলসি বানায়। প্রথমে ছিদাম পাল বর্ষাকালের দিনে এই জিনিস দুটি বানাতে অসম্মতি জানায়। কিন্তু তারপরে—

সায়মন : হ্যাঁ, শোনো। ছিদাম পাল আমি তোমাকে ডেকেছি একখানি কাঁচা হাঁড়ি ও কাঁচা সরা তৈরি করে দেওয়ার জন্যে।

ছিদাম : দেখুন সওদাগর মশাই, আমি আপনার কাঁচা হাঁড়ি ও কাঁচা সরা তৈরি করে দিতে পারবো না। কারণ এই আষাঢ় মাসের দিনে আমাদের চাক ঘোরাতে নেই।

সায়মন : সাবধান, ছিদাম পাল। কাঁচা হাঁড়ি ও কাঁচা সরা তোমাকে তৈরি করে দিতেই হবে। নইলে কি করবো জানো—

ছিদাম : কি করবেন সওদাগরমশাই?

সায়মন : এই রাত প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গে তোমাকে রাজ্য থেকে বিতাড়িত করে দেবো। এই নাও দুইশত টাকা। এখন আমি আসি।

ছিদাম : তাই তো বায়না তো নিলাম আমি। এখন কি যে করি।[৭]

অতএব দেখা যায় যে, ছিদাম পাল বর্ষাকালে তার চাকা ঘোরাতে রাজি হলেও সায়বেনের বলা রাজ্য ছাড়া হওয়ার ভয়ে তাকে সেই বায়না নিতে হয় হাঁড়ি, সরা তৈরি করার জন্য। এখানে এই কুমোর বৃত্তিধারী চরিত্রটিকে দেখি তার পরিচয় ভাসান গানগুলিতে উঠে এসেছে।

উপরিউক্ত যে জীবিকাসম্পন্ন মানুষের কথা আলোচনা করলাম তাছাড়াও আরও কিছু মানুষের পরিচয় সন্ধান পাওয়া যায় মনসার ভাসানগান বা ভাসান যাত্রাগুলির মধ্যে। লখিন্দর-বেহুলার বিয়ের যৌতুক নেওয়ার সময়ে 'স্বর্ণকার' চরিত্রটিকে পাওয়া যায়। লখিন্দরের সৃষ্টি করা মায়াবাজার পরিষ্কার করার সময়ে 'ঝাড়ুদার' চরিত্রের খোঁজ পাওয়া যায়। চাঁদ সওদাগরের বাণিজ্য করতে যাওয়ার কালে মাঝি-মাল্লাদের পরিচয় পাওয়া যায়। তবে এই সমস্ত চরিত্রগুলির অভিনয়ের অংশ অত্যন্ত সামান্য। ভাসান গানগুলিতে প্রয়োজন মতো চরিত্রগুলি হাজির হয়ে তাদের অবস্থান জানান দিয়ে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই তারা অভিনয় শেষ করে। খুব বেশি কথোপকথন চরিত্রগুলির মধ্যে পাওয়া যায় না। তবে একথা মানতেই হবে যে, মনসার ভাসানগান ও যাত্রাগুলি শুধুমাত্র গান আকারে আমাদের কাছে থেমে থাকে না। উপরন্তু গানগুলি হয়ে ওঠে অনেক সময় গ্রামীণ খেটে খাওয়া একেবারে নিম্নবিত্ত মানুষের জীবনের বেঁচে থাকার গান। আর সেখানেই ভাসান গানগুলি শুধুমাত্র সাহিত্যের পাতাতেই আবদ্ধ থাকে না, সেগুলি সমাজের বহুমাত্রিকতায় ধরা দেয়।

মনসার ভাসান গানগুলি আজও প্রাসঙ্গিক মানুষের জীবনের সঙ্গে। আসলে এই গান মানুষের জীবনের গান। তাদের ঐতিহ্য সংস্কৃতিকে বহন করে ভবিষ্যতে নিয়ে যাওয়ার গান। তবে আজ খুবই দুঃখের কথা, গানগুলি হারিয়ে যাচ্ছে সংগ্রহের অভাবে। জানি না, অদূর ভবিষ্যতে এগুলোর অস্তিত্ব আর কতটা থাকবে! কবিরা, গায়েনরা আর এমন পালাগান লিখবেন কিনা, তাও ভাবনার প্রয়োজন আছে। কেননা, যে আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষিতে এই মানুষেরা এই ভাসান গান করেন; সেখানে দাঁড়িয়ে আর্থিক সংকটে থাকা মানুষ, জীবন ও জীবিকার প্রয়োজনে অনেক সময় চূড়ান্ত অর্থাভাবে থাকায় তাঁরা ভাসান গান থেকে সরে আসেন।

উৎসের সন্ধানে

১. হাতে লেখা পালার পাণ্ডুলিপি (অগ্রন্থিত), পালার নাম — 'চাঁদের দর্প চূর্ণ', রচনা ও নির্দেশনা —শ্রী নির্মল কুমার মণ্ডল, দল ম্যানেজার—নির্মল মিস্ত্রী, ঠিকানা—যোগেশগঞ্জ, হেমনগর কোস্টাল থানা, উত্তর ২৪ পরগনা, পৃ. ৪২
২. তদেব : পৃ. ৮৫
৩. তদেব : পৃ. ৪১
৪. তদেব : পৃ. ১২০
৫. তদেব : পৃ. ৪৩
৬. হাতে লেখা পালার পাণ্ডুলিপি (অগ্রন্থিত), পালার নাম—'মনসা মায়ের বিদ্রোহী সন্তান', রচনা ও নির্দেশনা—শ্রী তুষার কান্তি মণ্ডল, দল ম্যানেজার—শ্রী পরিতোষ সরকার, ঠিকানা—মিলন সংঘ, বসিরহাট মহাকুমা, উত্তর ২৪ পরগনা, পৃ. ১৩১
৭. তদেব : পৃ. ৯৩

হাওড়া জেলার 'কালিকাপাতাড়ি' নৃত্য ও নাট্যশৈলী'র এক অনুপম মেলবন্ধন

অংশুমান রায়

কিছুদিন আগে 'অরুণবাণী' পত্রিকার প্ল্যাটিনাম জুবিলি স্মরণিকা সংখ্যায় স্মৃতিচারণধর্মী একটি লেখা লিখতে গিয়ে একটি কথা ঘুরে ফিরে বারবারই মনে হচ্ছিল যে, 'আমরা সৌভাগ্যবান, আমরা '৯০ এর সন্তান'[১]। অ্যান্ড্রয়েড দৌরাত্ম্য-মুক্ত আমাদের সেই নন্দিত শৈশবকালের আকাশ আলো করে থাকত এক টাকার দিলখুশ, উজ্জ্বল কমলা পানকেক, স্টিকার পাতা, রাবার ডিউস, টিনপাতের টিকটক, 'কারেন্ট হজমি গুঁড়ো', 'দাঁতের লড়াই' সহ আরো কত টুকরো খুশির জলনূপুর। আমাদের শৈশব কখনোই আক্রান্ত হয়নি নীল তিমির নিঃসঙ্গ আক্রমণে, নীল আকাশ সীমাবদ্ধ হয়ে যায়নি ৬-৬.৫ ইঞ্চির জাঁকালো স্ক্রিনে।

বরং উদাসী বিকেলের সোনারোদ মাখা আলপথ পেরিয়ে আমাদের বন্ধুবেলা গিয়ে থামত কোনও বুড়ো শিবতলার গাজন-উঠোনে, অষ্টপ্রহর হরিনাম সংকীর্তনের সান্ধ্যবাসরে প্রথম সারিতে বসার মাটির আসনের টান পি.ভি.আর, আইনক্সের অনলাইনে বুকিং করা শীততাপ নিয়ন্ত্রিত বিলাসবহুল আরামকেদারার চেয়ে কোন অংশে কম ছিল না। আমাদের সেই 'আগে কাটানো কি সুন্দর দিনগুলি' তাই সতত মুখর ছিল পল্লিগ্রামের সবুজাভ প্রাণের পরশ ছোঁয়ানো হাজারো লোকসংস্কৃতির বিনোদন মাধ্যমে। আভিজাত্যের স্বর্ণকিরীট হয়তো শোভা পায়নি সেই সব মাটির গন্ধ মাখা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাহীন গেঁয়ো শিল্পীদের মাথায়, কিন্তু তবুও শিল্পের প্রতি একাগ্রতায় ও হৃদয়ের বিপুল ঔদার্যে দিনের শেষে সমস্ত জাগতিক দেনা-পাওনার ঊর্ধ্বে উঠে তাঁরাই হয়ে উঠতেন এক একজন বিশুদ্ধ কলাকৈবল্যবাদী।

শুধুই মনোরঞ্জন নয়, লোকায়ত জীবনদর্শন ও সংস্কারের অকৃত্রিম ধারক ও বাহক হলো এই লোকশিল্পগুলি। হাওড়া জেলার শ্যামপুর থানার একেবারে প্রান্তিক অবস্থানের একটি গ্রামে শৈশব ও কৈশোরকাল কাটানোর সৌভাগ্য হয়েছে বলে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় বুঝেছি লোকশিল্পীদের সিংহভাগেরই নিত্যসঙ্গী চিরন্তন দারিদ্র্য ও প্রবল অভাব। তা সত্ত্বেও লোকশিক্ষা মাধ্যমের এই প্রকৃত শিক্ষকেরা নিজেদের দৈনন্দিন হতাশা ও বঞ্চনার বারোমাস্যাকে খিড়কি দুয়ারের বাইরে রেখেই প্রবেশ করেছেন অপার সম্ভাবনাময় লোকসংস্কৃতির শিল্পশৈলীর সিংহসদনে।

'কালিকাপাতাড়ি' নামটির সঙ্গে প্রথম পরিচয় শৈশবকালের এক তপ্ত বৈশাখের খর মধ্যাহ্নে, কিছুটা অপ্রত্যাশিত ভাবেই। দশ বাই দশের অমোঘ পরিণতি তখনও নেমে আসেনি আমাদের লাগাম ছাড়া পাড়া বেড়ানো যাপনে। গ্রামের সব ঘরই তখন পরিচিত হাতের আদরে আমাদের নিজেদের ঘর, অলি-গলি-আঁদাল-কাঁদাল আমাদের উন্মুক্ত চারণভূমি। বেলা গড়িয়ে প্রায় দুপুর হয়ে গেলে এক জ্যাঠামশাই যজমানদের ঘর থেকে পাওয়া একগাদা মাছ নিয়ে এসে জ্যেঠিমার রান্নাঘরে উপস্থিত হলে ক্রোধে অগ্নিমূর্তি ধারণ করে জ্যেঠিমা যখন বলছিলেন, "দ্বিতীয় দিন এমন কাণ্ড ঘটালে আমি কিন্তু 'কেলকেভাতাড়ি' নাচ নাচব", আমার সেদিনই প্রথম এই নাম শোনা।

স্বীকার করতে দ্বিধা নেই যে, ধ্বনিসাযুজ্যে ও অজ্ঞতার কারণে বিষয়টা যেন কিছুটা অশ্লীল বলে মনে হয়েছিল আমার কাছে। পরে মায়ের কাছে ভয়ে ভয়ে বলতেই তিনি বুঝিয়ে বলেন 'আরে পাগল ওটা একটা কালীনাচের ধরণ'। কলকাতার যমজ শহর বলা হয় হাওড়াকে। একদিকে মহানগর ঘেঁষা ও অন্যদিকে শিল্পশহর হুগলি, রূপনারায়ণের অপর পাড়ে মাটির সোঁদা গন্ধ মাখা পূর্ব মেদিনীপুর, কিছুটা পশ্চিম মেদিনীপুর ও অন্যদিকে দক্ষিন চব্বিশ পরগনা জেলার বন্ধনীতে ঘেরা বলে আয়তনে ক্ষুদ্র হলেও এই জেলার সংস্কৃতিতে একটা অদ্ভুত মিশ্র সংস্কৃতির ছাপ পাওয়া যায়।

আধুনিক নগরায়ণের বৈশিষ্ট্যগুলি সময়োচিত প্রভাবেই চুঁইয়ে নীচের স্তরে নেমেছে কিন্তু গ্রামীণ হাওড়ার লোকায়ত স্তরের সাংস্কৃতিক উপাদানগুলির উপরে কিয়দংশে প্রভাব বিস্তার করলেও তার মূল সত্তা বা সজীব নিজস্বতাকে আমূল বদলে দিতে পারেনি। তাই একবিংশ শতকের এই প্রবল বিশ্বায়ন ও পণ্যায়নের যুগেও জেলার বিভিন্ন প্রান্তে লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন প্রদর্শ শিল্পকলার বহমান ধারা আজও যুগপৎ মনোরঞ্জন ও জ্ঞানচর্চার গুরুদায়িত্ব পালন করে বেগবতী হয়ে আছে।

সভ্যতার আদিতে মানুষ ছিল অরণ্যচারী বর্বর। শিকারই ছিল তাদের ক্ষুণ্ণিবৃত্তি নিবারণের একমাত্র পথ। তাদের যাবতীয় আনন্দ, আহ্লাদ, হর্ষ, বিষাদ প্রভৃতি সেদিন মুখরিত হত শিকারের মধ্য দিয়ে। পরবর্তী পর্যায়ে শিকারী ও তার দলবল শিকারটিকে ঘিরে আপন দেহকে বিচিত্র ভঙ্গিমায় ও ছন্দে আলোড়িত করে এক বৈশিষ্ট্যের অবতারণা করে, তার থেকেই পরবর্তীকালে নৃত্যের ধারণা সঞ্জাত হয়। আরও পরে ক্রমবিবর্তনশীল মানবসংস্কৃতির সঙ্গে সঙ্গে বহু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে কৃষিজীবী মানুষেরাও এই নৃত্যশৈলীর ধারাকে লালন করে চলেছে। ভারতবর্ষে প্রচলিত নৃত্যশৈলীগুলির রূপরেখায় জাতিগত বা প্রজাতিগত ভেদে প্রধানত তিনটি সমাজ ব্যবস্থার চিন্তা-চেতনার প্রতিফলন ঘটেছে বলে মনে করেন গবেষক শঙ্করলাল মুখোপাধ্যায়—

১. আদিবাসী নৃত্যে-আদিবাসী বা উপজাতীয় সমাজ।
২. লোকনৃত্যে-গ্রামীণ কৃষিভিত্তিক গণসমাজ।
৩. উচ্চাঙ্গ নৃত্যে-নগরকেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবী সমাজ।[২]

গ্রামবাংলার বিভিন্ন লোকনৃত্য বা লোকনাট্যগুলির উৎসের প্রতি একটু পর্যবেক্ষণী দৃষ্টি ফেললে দেখা যাবে গম্ভীরা, আলকাপ, বোলান ইত্যাদির মতো হাওড়া জেলার লোকনৃত্য

বা নাট্যগুলিও প্রধানত গাজন অনুষ্ঠানকেন্দ্রিক। এগুলি হলো—কালিকাপাতাড়ি নৃত্য, অর্ঘ্য নৃত্য, হনুমান নৃত্য, বঁটি নৃত্য ও হাকন্ড নৃত্য। অনুষ্ঠানকেন্দ্রিকতা লোকনাট্যের অন্যতম প্রধান চরিত্র বৈশিষ্ট্য। 'কালিকাপাতাড়ি'কে হাওড়া জেলার দক্ষিণাংশের বিশেষত শ্যামপুর থানার একটি সম্পূর্ণ নিজস্ব লোকনৃত্য বা লোকনাট্য বলা চলে। পুরুলিয়ার ছৌ-এর সঙ্গো এর কিছুটা মিল আছে, তবে এতে মুখোশ ব্যবহার করা হয় না। বরং মুখে বা কখনো কখনো গায়েও রং মেখে এই নাচ পরিবেশন করা হয়। উত্তরবঙ্গের 'মশান' নাচের সঙ্গেও কালিকাপাতাড়ির কিছুটা সাধর্ম আছে। হাওড়া জেলার খ্যাতনামা লোক-গবেষক ও কালিকাপাতাড়িকে জাতীয় স্তরে পরিচিতি এনে দেওয়া চিত্রশিল্পী শ্রী তপন করের মতে—

> কালিকাপাতাড়ি নামের উৎস খুঁজতে গিয়ে জানা গেছে যে, কালী চরিত্রটি সিঁদুরে রাঙানো তালপাতার জিভ লাগিয়ে নাচে বলে এর নাম কালিকাপাতাড়ি। এই নামের চলতি উচ্চারণ হয়েছে 'কেলকেপাতাড়ি'।[৩]

এই নামকরণ প্রসঙ্গো হাওড়া জেলার অন্যতম কৃতবিদ্য গবেষিকা ড. অবন্তী রায় তাঁর 'হাওড়ার লোকচর্চা' গ্রন্থে অপর এক মতের সন্ধান দিয়েছেন। আবার কারও কারও মতে—এই নৃত্যটি রণমূর্তিধারিণী দেবী কালিকার প্রমত্ত নৃত্যকে কেন্দ্র করেই রচিত। সুতরাং কালীর এই এলোপাতাড়ি পদবিক্ষেপ থেকেই এই নৃত্যের নামকরণ।[৪] কালিকাপাতাড়ি বা অপভ্রংশে কেলকেপাতাড়িকে লোকনৃত্য না লোকনাট্য কোন্‌টা বলা সমীচীন হবে—এই নিয়ে মতভেদের যথেষ্ট কারণ রয়েছে।

নৃত্যের প্রধান লক্ষ্য, কথা না বলে বাদ্যের সঙ্গো অঙ্গ-ভঙ্গিমার মাধ্যমে বক্তব্য-বিষয়কে উপস্থাপিত করা, সেই গুণ কালিকাপাতাড়ির মধ্যে ভরপুর মাত্রায় রয়েছে বলে একে নৃত্য আখ্যা দেওয়া যেতেই পারে, কিন্তু লোকনাট্যের যে বাকি বৈশিষ্ট্যগুলি রয়েছে তার পরিপ্রেক্ষিতে এবং সামগ্রিক উপস্থাপনার নিরিখে একে লোকসাহিত্যের গবেষকরা নাট্য পর্যায়ে রাখারই পক্ষপাতী। স্বনামধন্য লোকসংস্কৃতিবিদ্ অধ্যাপক পল্লব সেনগুপ্ত তাঁর 'লোকসংস্কৃতির সীমানা ও স্বরূপ' গ্রন্থে লোকনাট্য সম্পর্কে বলেছেন—

> সাধারণভাবে লোকনাট্য, মুক্ত অঙ্গনে খোলা মাঠে কিংবা চাষের জমিতে অথবা গ্রামদেবতার থানের সামনে অভিনীত হয়। মোটামুটি একটা কাহিনি বাঁধা থাকলেও, সংলাপের অধিকাংশই তাৎক্ষণিক ভাবে রচিত হয় বহু সময়ে। গান, নাচ এবং সংলাপ এখানে হামেশাই একে অন্যের পরিপূরক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ধর্মীয় কাহিনি, পৌরাণিক বৃত্তান্ত এবং সামাজিক অসঙ্গতিই মোটামুটিভাবে এই জাতীয় নাটকের উপজীব্য। আর প্রায়শই, এগুলি প্রকারান্তরে লোকশিক্ষা তথা—গণজ্ঞাপন মাধ্যমরূপে গণ্য হয়। অন্যায় অধর্মের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, প্রতিরোধ এবং পরিণামে জয়লাভ—এই নাটকগুলির বিশিষ্ট চরিত্র লক্ষণ।[৫]

কালিকাপাতাড়ি'র সূচনাও কিন্তু চৈত্রসংক্রান্তির ভোরে অর্থাৎ নীলরাত্রির শেষে। বাবা শিবের থানে সন্ন্যাসব্রত ধারণকারী ভক্তসাধারণের মনোরঞ্জনার্থে এবং দৈবীশক্তির অনুকরণ করলে তাদের কৃপা নর্তকদের উপরে বর্ষিত হবে এমন ধারণা থেকেও এর উৎপত্তি হতে পারে। এ ধরণের অনুষ্ঠানগুলিকে মূর্তিপুজোরই একটি ঈষৎ পরিবর্তিত রূপ বললে অত্যুক্তি করা হয় না। কালী বা শিবরূপে আমাদের সামনে যেন চলন্ত মূর্তিরই আবির্ভাব ঘটেছে এবং

অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে আমরা সংশ্লিষ্ট দেবতার কাছে পৌঁছে দিচ্ছি আমাদের প্রার্থনা বা নিবেদন। লোকমানসের অভিপ্রায় পূরণের মাধ্যম হিসেবে লোকনাট্যকে দেখেছেন লোকগবেষক অধ্যাপক অনির্বাণ মান্না—

> লোকনাট্য হলো গ্রামীণ নিরক্ষর মানুষের যৌথ প্রয়াস। সচেতনতা ও বিনোদন সৃষ্টি পরিশীলিত নাটকের মূল উদ্দেশ্য। কিন্তু লোকনাট্য উদ্ভবের অন্তরালে লুকিয়ে আছে লোকমানসের যাদু অনুষ্ঠান, উৎসব-অনুষ্ঠান এবং খেলাধূলার অনুষ্ঠান কেন্দ্রিক আচার-বিশ্বাস-সংস্কার পরিপূরণের অভিপ্রায়।[৬]

হাওড়া জেলার শ্যামপুর থানার রতনপুর, চাঁপাবাড়, কালীনগর, ছয়ানি গুজরাট, রাজীবপুর, ঘনশ্যামপুর প্রভৃতি গ্রামের গাজন অনুষ্ঠানে আজও এই নৃত্যনাট্যের প্রচলন রয়েছে। কিন্তু সর্বাধিক প্রসিদ্ধ হিসেবে শ্যামপুর থানার রতনপুর গ্রামের কালিকাপাতাড়ি নাচের দলটি প্রায় ৩০ বছর ধরে দক্ষতার সঙ্গে এই নাচ পরিবেশন করে চলেছে। পরবর্তীতে বিভিন্ন গ্রামে যে কোন মেলা, উৎসব অনুষ্ঠানে কালিকাপাতাড়ির দলগুলি আমন্ত্রণমূলক অভিনয় প্রদর্শন করলেও আমরা মূলত নীল রাত্রিতে অনুষ্ঠেয় মূল রূপের কালিকাপাতাড়ি নিয়েই আলোচনা করব। কারণ সেই বাঁধামঞ্চের প্রদর্শনে কালিকাপাতাড়ির গরিমা অনেকাংশেই ক্ষুণ্ণ হয়েছে, সে প্রসঙ্গে পরে আসছি।

চৈত্রমাসের নীলরাত্রির ভোরে গ্রামের শিবমন্দিরের উন্মুক্ত প্রাঙ্গনে মশালের আলোয় এই ভয়ংকর বীররসের নাচ পরিবেশিত হতো। প্রথমদিকে, সাধারণত যে কাহিনিটি নেওয়া হতো তা ছিল পৌরাণিক চণ্ড-মুণ্ড তথা শুম্ভ-নিশুম্ভ বধের কাহিনি। তবে বর্তমানে অনেক দল রামায়ণ, মহাভারত বা অন্যান্য পুরাণভিত্তিক কাহিনিও মঞ্চস্থ করে থাকেন। শুম্ভ নিশুম্ভকে বধ করার জন্য দেবী চণ্ডী একসময় ভয়ংকর কালীমূর্তি ধারণ করেন। যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার আগে চণ্ডী সুন্দরী মোহিনীরূপ ধারণ করে হাস্য-লাস্য-ভঙ্গিমার মাধ্যমে দৈত্যদ্বয়ের মধ্যে বিভেদের বীজ বুনে দিতে চেয়েছিলেন, এমন কথাও কাহিনিতে পাওয়া যায়। তবে কেলকেপাতাড়ির শিল্পীরা অত সবের মধ্যে যান না, তাঁরা সরাসরি কালী ও শুম্ভ-নিশুম্ভের ঘোরতর যুদ্ধের পর্বটি নিয়েই কমবেশি ৩০-৪০ মিনিটের একটি অনুষ্ঠান করেন। কালিকাপাতাড়ি যে দর্শক মনে প্রবল বীররসের সঞ্চার করতে পারে তার অন্যতম প্রধান কারণ সজ্জারীতি। শনের তৈরি কালো চুলের গোছা নেওয়া হতো কালীর সাজ-সজ্জার জন্য। আজানুলম্বিত এলোকেশ তৈরী হতো তা দিয়ে। কালো ব্লাউজ ও কালো ল্যাঙট পরার পর সর্বাঙ্গে হাঁড়ির তলার ভুষো কালি মেখে নিতে হতো।

গ্রামের ঘরে ঘরে ধান সিদ্ধ করার জন্য ব্যবহৃত হাঁড়ির তলা থেকে এই কালি সংগ্রহ করা হতো। কপালে ভুরু আঁকার জন্য, ঠোঁট রাঙানো বা হাতের তালুতে মাখার টকটকে লাল রঙের জন্য তেলে সিঁদুর গুলে নেওয়া হতো। আর ছিল সিঁদুরে রাঙানো ৫-৬ ইঞ্চি লম্বা তালপাতার একটি জিভ, যা ঠোঁট বন্ধ অবস্থায় দাঁতে চেপে ধরে থাকেন মহাকালী। অসুররূপী শুম্ভ-নিশুম্ভের বিশেষ সাজ-সজ্জার প্রয়োজন ছিল না। শুম্ভ-নিশুম্ভের ঘোর কৃষ্ণবর্ণ তেল চকচকে স্বাস্থ্যবান পেশীবহুল যুবক শরীরে যখন তাল ডাঁটার উপর কাপড় জড়ানো কেরোসিনের মশালের আলো পড়ত, তখন দর্শককুলের শরীরে মনে খেলে যেত এক ভয়ানক

শিহরণ। তাদের নৃত্য তথা অঙ্গ-ভঙ্গিমার গুণে দর্শক মোহাবিষ্ট হয়ে পড়তেন। সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন শ্রদ্ধেয় তপন কর তাঁর 'কালিকাপাতাড়ি' প্রবন্ধে—

> মশালধারীগণ আলোকসম্পাত করছেন এবং ঢুলি আর কাঁসর বাদক তাঁদের বাজনা বাজিয়ে নর্তকদের উত্তেজনাই বাড়াচ্ছেন। কে বুখবে তাঁদের, নির্দেশই বা কে কীভাবে দেবে তারা তখন কৌশল খুঁজছে কে কীভাবে কাকে আক্রমণ করবে, বা সে কীভাবে প্রতিপক্ষের আক্রমণ কাটিয়ে সরে যাবে। এরই মধ্যে সে হাত, পা, কোমর নাচিয়ে, দুলিয়ে কতটা লালিত্য আনতে পারে, চলতে থাকে সেই চেষ্টা। সেটাই কলা, সেটাই আর্ট। দর্শকদের রক্তে ছড়িয়ে পড়ে তীব্র ঝঞ্ঝনা, তার কানে ঢোল আর কাঁসরের আদিম বাদ্য আর চোখে নর্তকদের ত্বরিত পদক্ষেপ বা স্থির মুখভাব। সম্মিলিত সহস্রাধিক নারী-পুরুষের নির্বাক নিস্পন্দ চাহনির সামনে চলে এক অলৌকিক নাট্যরসের অবতারণা।[৭]

নীলরাত্রিতে দূর-দূরান্ত থেকে মেয়ে-বৌরা কোলে কাঁখে ছেলে-পুলে নিয়ে অনুষ্ঠান প্রাঙ্গণে উপস্থিত হয়। রাত বাড়তে থাকলে ছোটরা ঘুমিয়ে পড়ে সেখানেই, ছেলে কোলে মাও ঢুলতে থাকে। কালিকাপাতাড়ির ঢোলে কাঠি পড়লেই সকলে লাফিয়ে ওঠে। সঙ্গে যোগ্য সংগতদানে কাঁসর ও আড়বাঁশি তৈরি করে ভয় লাগানো এক মায়াময় পরিবেশ। শিল্পীরা সকলেই স্থানীয়, কিন্তু শিল্পের প্রতি তাঁদের আন্তরিক ভালোবাসা, সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা আর অনুশীলনের ত্রিবেণী সঙ্গমে লোকশিল্পের এই সমৃদ্ধ ধারাটিকে এক উন্নত পর্যায়ে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছেন। প্রধান স্ত্রী চরিত্রগুলিতে অভিনয়ের জন্য সাধারণত গ্রামের সুন্দর মুখের তরুণরাই অংশগ্রহণ করেন এবং এ ব্যাপারে তাঁরা যথেষ্ট পারদর্শিতার ছাপ রেখেছেন।

তবে নীলরাত্রিতে শিবের মাড়োয় যে কালিকাপাতাড়ি হয় তাতে মহিলারা অংশ না নিলেও ২০১৮ সালে 'কুলটিকরি ফাল্গুনী কালিকার মেলা'য় দেখেছি 'মহিষাসুরমর্দিনী' পালায় লক্ষ্মী ও সরস্বতী'র বেশধারী দুই বালিকাকে। হাওড়ার দক্ষিনাঞ্চলের এমন প্রায় অখ্যাত স্থানে কালিকাপাতাড়ি নামক লোকশৈলীকে জনপ্রিয় করার পিছনে 'কালী' চরিত্রে নেপাল বাগ ও 'দুর্গা' চরিত্রে গোপাল বাগ নামক দুই ভাইয়ের অবদান অনস্বীকার্য। আর ছিলেন 'জলদকুমার' ওরফে জলধর বাগ। যাত্রাসমাজের লোকপ্রিয় নায়কদের মতোই জনসাধারণ্যে ভালোবাসায় যিনি বৃত হয়েছিলেন 'কুমার' অলংকারে।

এই নাচের একান্ত শুভানুধ্যায়ী তপন কর, শ্যামল দত্ত, অরুণ কর, ড. শিশির মজুমদার, নাট্যকার অনুপ চক্রবর্তী, 'লোক' নাট্যসংস্থা, পশ্চিমবঙ্গ সংগীত নাটক আকাদেমি, চণ্ডীপুর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রমুখ ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের বদান্যতায় অনেকাংশেই পরিচিতি লাভ করেছে এই লোকশিল্পটি। ১৯৮৯-এর এপ্রিল মাসে কলকাতা আই.টি.এফ গ্রাউন্ডে পূর্বাঞ্চলীয় লোক সংস্কৃতি ও লোকনাট্যের প্রতিনিধিত্বমূলক আসর বসে, সেই 'ডমরু' উৎসবে[৭] মুক্তাকাশ মঞ্চে কেলকেপাতাড়ি যথেষ্ট সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয় এবং প্রখ্যাত নাট্যব্যক্তিত্ব রতন থিয়াম, রাজ্যপাল টি.ভি.রাজেশ্বর, প্রখ্যাত সেরামিক ভাস্কর প্রভাস কুমার সেন, ড. সুনীল কোঠারি, শিল্প-সংগ্রাহক শ্রীমতী রুবি পাল চৌধুরীসহ অনেক বিদগ্ধজনের প্রশংসা অর্জন করে। এরই ফলশ্রুতিতে ১৯৯০ সাল থেকে রতনপুরের কালিকাপাতাড়ি সরকারি স্বীকৃতি পায় ও এই শিল্পের সাথে যুক্ত ব্যক্তিরা মাসিক একটি ন্যূনতম ভাতাও পেতে শুরু করেন।

প্রকৃতির ভারসাম্য নীতির সার্থকতা রাখতেই মনে হয় প্রতিটি চোখ ধাঁধানো উত্থানের আলোক-উদয় পথের প্রান্তেই থাকে অনীপ্সিত অথচ অমোঘ এক বিষাদ-অস্ত রেখা। বর্তমানে কালিকাপাতাড়ি তার আভিজাত্য অনেকটাই হারিয়েছে জনসমাজের অর্থনৈতিক পটবদল, রুচির পরিবর্তন, পশ্চিমী ঝঞ্ঝায় সাংস্কৃতিক দূষণ ইত্যাদি নানাবিধ ছোটো-বড়ো কারণে। কালিকাপাতাড়ির কালীর মধ্যে যে চামুণ্ডা রূপ প্রার্থিত তাও অন্তর্হিত হয়েছে ইচ্ছেমত নীলচে-সবুজ রঙের মেকাপ করা আধুনিকীকৃত 'শ্যামাকালী'তে। যাত্রার ড্রেস ভাড়া করে, থিয়েটারের স্পট লাইট, এল.ই.ডি হ্যালোজেন লাগিয়ে দর্শকের মনোরঞ্জন হয়তো সম্ভব হচ্ছে, কিন্তু কালিকাপাতাড়ি নাচ তার আদিম রূপ ও গরিমা অনেকাংশেই হারিয়ে ফেলেছে। কিন্তু আশাবাদেই সভ্যতার অগ্রগতি। কালিকাপাতাড়িও তাই প্রতীক্ষারত নতুন কোনো 'কুমার'-এর, যে তার অভিনয় শৈলী ও সুযোগ্য নেতৃত্বদানে ছোটাবে তার বিজয়রথ, অনাগত কালের বুক চিরে।

উৎসের সন্ধানে

১. অংশুমান রায় : 'স্মৃতিপটের উজ্জ্বল বৃত্ত', অরুণবাণী, প্ল্যাটিনাম জুবিলি স্মরণিকা, অনন্তপুর সিদ্ধেশ্বরী উচ্চ বিদ্যালয়, হাওড়া, ডিসেম্বর, ২০১৯, পৃ. ১৫৫

২. শঙ্করলাল মুখোপাধ্যায় : লোকনৃত্য, 'বাংলা লোকসংস্কৃতির বিশ্বকোষ', আকাদেমি অব ফোকলোর, কোলকাতা, ১ম সং. ২০০৪, পৃ. ১৯২

৩. তপন কর : 'কালিকাপাতাড়ি', 'লোকায়ত হাওড়া', পুস্তক বিপণি, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৫, পৃ. ২৪

৪. অবন্তী রায় : 'হাওড়ার লোকচর্চা', বলাকা, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ ২০১৬, পৃ. ৩২৫

৫. পল্লব সেনগুপ্ত : 'লোকসংস্কৃতির সীমানা ও স্বরূপ', পুস্তক বিপণি, কলকাতা, সেপ্টেম্বর ২০০২, পৃ. ২২৪

৬. অনির্বাণ মান্না : লোকনাট্য : একটি স্বতঃস্ফূর্ত প্রয়োগকলা, বলাকা পত্রিকা, কলকাতা, বাঙ্গালির লোকসাহিত্য সংখ্যা (৩৬), ফেব্রুয়ারি ২০১৮, পৃ. ১১৫

৭. শ্যামল দত্ত : কালিকাপাতাড়ি উৎসের সন্ধানে একটি উদ্যোগ, ছয়ানি-গুজরাট পত্রিকা, শ্যামপুর, অক্টোবর, ২০০২

তথ্যদাতা : শ্রী নরোত্তম রায়। কালিকাপাতাড়ি শিল্পী, ৫৪ বৎসর, রতনপুর, শ্যামপুর, হাওড়া

লোকায়ত জীবন-সংস্কৃতিতে দেবী মনসার উৎস, মাহাত্ম্য এবং মনসাপালার উপস্থাপন রীতির বিবর্তন

বিশ্বজিৎ দাস

লোকায়ত জীবনধারার সঙ্গো লোকসংস্কৃতির ধারা প্রবহমান। লোকায়ত মানুষের বেঁচে থাকার মূলে রস সঞ্চার করে এই লোকসংস্কৃতি। এই লোকসংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্রে রয়েছে লোকধর্ম আর এই লোকধর্মের মূল উৎসে রয়েছে নানান লৌকিক দেব-দেবী। লোকায়ত মানুষ বিপদ ও মৃত্যুভয় থেকে বাঁচতে বিভিন্ন লৌকিক দেব-দেবীর কল্পনা করল। দেবী মনসা উল্লেখযোগ্য এক লৌকিক দেবী। লোকায়ত মানুষ পরম ভক্তিতে তার পুজো করে। এই লোকদেবীর উৎস ও মাহাত্ম্য নিম্নে বর্ণিত হলো—

১ দেবী মনসার উৎস ও মাহাত্ম্য : মনসা হিন্দুদেবী। ইনি হিন্দুদের আরাধ্যা দেবী। ইনি লোকায়ত সমাজে সর্পের দেবীরূপে পূজিতা হন। একসময় সর্প দংশনে মানুষের মৃত্যু হতো। তাই মানুষ আত্মরক্ষার জন্য সর্পদেবী মনসার কল্পনা করেছিল। তবে আদিতে লোকায়ত মানুষ মনসাকে সর্পদেবতা হিসেবে পুজো করত না। তখন ইনি বাস্তুদেবতা, আরোগ্যের দেবতা এবং সম্পদের দেবতারূপে পরম ভক্তিতে পূজিতা হতেন। ড. সুকুমার সেন লিখেছেন—"বাস্তু দেবতা, আরোগ্যের দেবতা অথবা সম্পদের দেবতা বলিয়া বিভিন্ন নামে মনসার পূজা বরাবর চলিয়া আসিয়াছিল। এখন ইনি বিশেষ করিয়া সাপের দেবতা, তবে নিজে সাপ নন।"[১]

মহাভারত থেকে জানা যায়, সর্পরাজ বাসুকির ভগ্নি ছিলেন মনসা। ইনি কালক্রমে সর্পকুলের দেবী রূপে আরাধিতা হন। এ প্রসঙ্গো ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য লিখেছেন—"নাগরাজ বাসুকির ভগিনী জরুৎকারু মুনির পত্নী বাংলাদেশে আসিয়া সর্প দেবী মনসা হইয়া যান।"[২] মনসার উৎপত্তি সম্বন্ধে নানা মত রয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন—বৌদ্ধ দেবী জাঙ্গুলি হলেন বাংলার মনসা দেবী। এ প্রসঙ্গো ড. বিনয়তোষ ভট্টাচার্য লিখেছেন—"হিন্দুদের মনসা দেবীকে জাঙ্গুলীর প্রতিরূপ বললে অত্যুক্তি হয় না।"[৩] বৌদ্ধ ধর্ম বিলোপের সঙ্গো সঙ্গো বাংলাদেশে তিনি মনসাদেবী নামে পরিচিতা হন। ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য বৌদ্ধ সর্পদেবী জাঙ্গুলি এবং বাংলার মনসাদেবীকে অভিন্ন বলে মনে করেছেন। আচার্য ক্ষিতিমোহন সেনের অভিমত হলো, কর্ণাটক প্রদেশের নাগমাতা মঞ্চাম্মা পরবর্তীকালে বাংলার সর্পদেবী মনসাতে রূপান্তরিত হন। মনসার আর এক নাম হলো পদ্মা বা পদ্মাবতী। কারও কারও ধারণা জৈন পদ্মাবতী, বৌদ্ধ জাঙ্গুলি তারা এবং মনসা অভিন্ন দেবী। এই পদ্মাবতী পরবর্তীকালে বাংলাদেশে মনসা রূপে

আরাধিতা হন। এ প্রসঙ্গো ড. হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য লিখেছেন—"বৌদ্ধ জাঙ্গুলী ও জৈন পদ্মাবতীও মনসাতে আপন সত্তা বিসর্জন দিলেন। সর্পসংকুল বাংলাদেশে আসামে বা নিকটবর্তী অঞ্চলে সর্পাধিষ্ঠাত্রী সর্বনাশিনী দেবী হিসেবে মনসার পূজা ও প্রতিষ্ঠা।"[৪]

কেউ কেউ বলেছেন, মনসা পৌরাণিক দেবী। লক্ষ্মী আর মনসা একই দেবী বলে অনেকে মনে করেন। ড. সুকুমার সেন লিখেছেন—"মনসা-লক্ষ্মীর মৌলিক একতার অনেক প্রমাণ আছে। দুজনেরই নামান্তর কমলা ও পদ্মা। পদ্ম জলে মনসার উৎপত্তি, কমলার আসন পদ্মে। লক্ষ্মীর উৎপত্তি সাগরে, মনসার উৎপত্তি হ্রদে।"[৫] কেউ বলেছেন মনসা বৈদিক দেবী আবার কেউ বলেছেন মনসা লৌকিক দেবী। তবে মনসাকে লৌকিক দেবী বলা সমীচীন। ইনি অনার্যদের দ্বারা প্রথম পূজিতা হন। তবে মনসাকে লৌকিক দেবী বলা সমীচীন। ইনি অনার্যদের দ্বারা প্রথম পূজিতা হন। তারপর আর্যরা তার পুজো করে। লোকায়ত সমাজের মানুষ মূলত সর্প দংশনের হাত থেকে বাঁচতে তাঁকে পুজো করে এবং ভক্তি করে।

➲ **মনসার পালার উপস্থাপন রীতি ও বিবর্তন :** 'মনসার পালা' একটি উল্লেখযোগ্য লোকপালা। পালাটি বহুল প্রচলিত। এই পালাটি পূর্বে যেভাবে উপস্থাপিত হতো এখন সেভাবে হচ্ছে না। নির্দেশকগণ উপস্থাপন রীতিতে বিবর্তন সাধন করেছেন। পালার উপস্থাপন রীতিতে যে যে বিবর্তন সাধিত হয়েছে, সেগুলি সম্পর্কে নিম্নে আলোচিত হলো—

➲ **কাহিনি :** পূর্বে প্রচলিত কাহিনির ধারা অবিকৃত রেখে পালাকারগণ নাট্যরূপ দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। তারা মূল কাহিনির কোনো রকম পরিবর্তন করেননি। তবে কাহিনি মধ্যে অভিনবত্বের আমদানি করেছেন। যেমন—লখিন্দর ও বেহুলার পরিচয় ও প্রেমের দৃশ্য। এছাড়া বাসর ঘরে বেহুলা-লখিন্দর একান্তে কথা বলার দৃশ্য এবং দুজনের গানের দৃশ্য ইত্যাদি। বর্তমানে পালাকারগণ ও নির্দেশকগণ পালা থেকে শাখাকাহিনি এবং অপ্রয়োজনীয় সংলাপ বাদ দিয়েছেন। এতে দর্শকের কাছে পালা উপভোগ্য হয়ে উঠেছে।

➲ **চরিত্র :** পালায় পালাকারগণ বা নির্দেশকগণ মূল চরিত্রের কোনোরকম পরিবর্তন করেননি। যেমন—পালার মূল চরিত্রগুলি হলো মনসা, চাঁদ সওদাগর, সনকা, বেহুলা, লখিন্দর প্রভৃতি চরিত্র কোনোরূপ বিকৃত করা হয়নি। তবে চরিত্রগুলিকে আধুনিক রূপে পালাকারগণ দর্শকদের সামনে তুলে ধরেছেন। সেই সঙ্গো কিছু কাল্পনিক চরিত্রের অবতারণা করেছেন। যেমন—বিবেক চরিত্র। এই চরিত্র সৃজনের মধ্যে দিয়ে পালাকারগণ নাট্যপ্রয়োজন সিদ্ধ করেছেন।

➲ **বিন্যাস :** মনসাপালা-র পালাকার এবং নির্দেশকগণ পূর্বের বিন্যাস রীতি বর্জন করেছেন এবং উপস্থাপনায় নতুন বিন্যাস রীতির আমদানি করেছেন। তারা যাত্রা এবং থিয়েটারের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পালার বিন্যাস রীতিতে বিবর্তন সাধন করলেন। আগে পালার অভিনয় একটানা হতো, কোনো বিরতি ছিল না। এইভাবে পালার অভিনয় দেখতে দর্শকের আর ভালো লাগছিলো না। তাদের মনে বিরক্তির সঞ্চার হচ্ছিল। সেই জন্য পালার পালাকার এবং নির্দেশকগণ পুরাতন রীতির অনুবর্তন না করে যাত্রা এবং থিয়েটার এর মতো পালার কাহিনিকে বিভিন্ন দৃশ্যে বিন্যস্ত করে দর্শকের দরবারে পরিবেশন করতে সচেষ্ট হলেন।

➲ **সংলাপ :** আগে পালায় পৌরাণিক যাত্রা এবং ঐতিহাসিক যাত্রার সংলাপের মতো বড়ো বড়ো সংলাপ ছিল। কিন্তু সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পালাকারগণ যাত্রা এবং থিয়েটারের সংলাপের মতো ছোটো ছোটো সংলাপ পালার মধ্যে রূপায়ণ করেছেন। যেমন—

মনসা : ওরে মূর্খ চন্দ্রধর, তাহলে তুই আমার পুজো দিবিনা?

চাঁদ সওদাগর : না! তোর আশা কোনোদিন পূর্ণ হবে না।

মনসা : তবে তুই শুনে রাখা মূর্খ। তোর বংশের শেষ কুলপ্রদীপ লখিন্দরকে আমি চাই। এইভাবে ছোটো ছোটো সংলাপ সৃজনের ফলে পালা নতুন মাত্রা পেয়েছে।

➲ **গান :** মনসা পালায় বহু গানের সন্নিবেশ পরিলক্ষিত হয়। আগে পালায় প্রায় ৬০ থেকে ৭০টি করে গান থাকতো। কিন্তু বর্তমানে গানের সংখ্যা অনেক হ্রাস করে পালাকার ও নির্দেশকগণ নাটকীয়তা সৃজনে মনোনিবেশ করেছেন। যেমন—

১. **ভক্তিগীতি :** "শঙ্খ বাজিয়ে মাকে ঘরে এনেছি/সুগন্ধ ধূপ জ্বেলে আসন পেতেছি—"[২]

২. **রোমান্টিক প্রেমের গান :** (ডুয়েট)/(বেহুলা ও লখিন্দর মালা বদলের সময় গাইছে)/আমি পরিয়ে দিলাম/তোমার গলে/আমার গাঁথা মালা গো।

৩. **যাত্রার গানের অনুকরণে গান :** (লখিন্দর মৃত্যুতে সনকা কেঁদে কেঁদে গাইছে)/চোখের জলেতে ভেসে যায়/অভাগিনী এক মা-২/আয় ফিরে আয়।

➲ **অভিনয় :** মনসাপালার অভিনয়ের মধ্যে প্রাচীন লোকনাট্যের অভিনয়রীতি অনুসৃত হতে দেখা যেত, বর্তমানে আধুনিকতার আমদানি হয়েছে। পালার অভিনেতা-অভিনেত্রীরা পৌরাণিক যাত্রা ও থিয়েটারের অভিনয়রীতির অনুকরণে প্রম্পটার ছাড়া অভিনয় করছেন। আবার আধুনিক অভিনয়রীতি যেমন, আঙ্গিক, বাচিক, আহার্য অভিনয় করার চেষ্টাও করেন। এছাড়া পালায় মুখোশ পরে অভিনয় করতে দেখা যায়।

➲ **আসর :** পূর্বে মনসা পালার অভিনয় খোলা আসরে হতো। আসরের উপরে চট বা ত্রিপলের আচ্ছাদন থাকতো। তবে দর্শকদের মাথার উপর অধিকাংশ ক্ষেত্রে কোনও আচ্ছাদন থাকতো না। কিন্তু বর্তমানে পালার অভিনয় খোলা আসরে হয় না। মঞ্চে পালার অভিনয় হয়। তবে কোনও কোনও জায়গায় খোলা আসরে পালার অভিনয় হয়ে থাকে। কোথাও কোথাও অভিনয়ের জন্য ডবল স্টেজ দেখা যায়। সেই স্টেজের ওপর দাঁড়িয়ে অভিনেতা-অভিনেত্রীরা অভিনয় করেন। অভিনেতা-অভিনেত্রীদের মাথার উপর আচ্ছাদন থাকে। ডিমার লাইটের আলোর দ্বারা আসর বর্ণময় করে তোলা হয়।

➲ **আলোকসজ্জা :** মনসা পালার অভিনয় যখন আগে হতো তখন কোনও আলোকসজ্জার ব্যবস্থা থাকতো না। হ্যাজাক লাইট জ্বালিয়ে পালার অভিনয় হতো। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে হ্যাজাগ লাইট অবলুপ্ত হয়ে গেল। জেনারেটর এলো। এই জেনারেটরের আলোয় অভিনয় শুরু হলো। বড়ো বড়ো বাল্ব এবং বাটি লাইট ব্যবহার করা হলো। তারপর আলোকসম্পাতের জন্য হ্যালোজেন ও ডিমার লাইট ব্যবহার করা হলো। এরপর আলোকসজ্জার জন্য স্পটলাইট, ধোঁয়া লাইট, ফ্ল্যাশ লাইট এবং ঘূর্ণি লাইট ব্যবহার হলো। এর ফলে মঞ্চ রঙিন আলোয় আলোকিত হলো। এতে দর্শকরা মুগ্ধ হলেন।

➲ আবহ : আবহ সৃষ্টির মধ্যে দিয়ে পালার অভিনয় দর্শকদের কাছে উপভোগ্য হয়। পূর্বে আবহ সৃষ্টির জন্য ঢোলক, খোল, হারমোনিয়াম, বাঁশি, জুড়ি বা করতাল ব্যবহার করা হতো। এইসব বাদ্যযন্ত্র যারা বাজাতেন তারা আসরের দু'পাশে বসতেন। এগুলি বাজিয়ে বাদ্যযন্ত্রীরা আসরে অভিনয়ের মনোরম পরিবেশ সৃষ্টি করতেন। এরপর আবহের মধ্যে নতুনত্ব আনার চেষ্টা হলো। পালার নির্দেশক এবং পরিচালকেরা পৌরাণিক যাত্রায় আবহের দ্বারা প্রভাবিত হলেন। তখন যাত্রায় আবহ সৃষ্টির জন্য ডুগি, তবলা, ক্যাসিও, কাড়া-নাকাড়া, কর্নেট, ফ্লুটে, অরগান ব্যবহার শুরু হলো। এইসব বাদ্যযন্ত্র ব্যবহারের ফলে দর্শকের কাছে আসর শ্রুতিমধুর হয়ে উঠল। মেকাপ ছাড়া অভিনয় কখনই সম্ভব নয়। সেই জন্য মনসাপালার অভিনেতা-অভিনেত্রীরা মেকাপের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেন। আগে মনসাপালার অভিনেতা-অভিনেত্রীরা মেকাপের জন্য যেসব প্রসাধন সামগ্রী ব্যবহার করতেন, সেগুলি নিম্নমানের। প্রসাধন দিয়ে মেকাপ করলে, অভিনেতা-অভিনেত্রীদের মুখ সুন্দর দেখাতো না। বর্তমানে পালার অভিনেতা-অভিনেত্রীরা মেকাপের জন্য মেকাপ টিউপ, ফেস পাউডার, কাজল, লিপস্টিক, পরচুল ইত্যাদি ব্যবহার করেন। এতে মেকাপ সুন্দর হয়।

➲ পোশাক : আগে অভিনেতা-অভিনেত্রীরা নিতান্তই সাধারণ পোশাক পরে অভিনয় করতেন। কিন্তু যখন থেকে পৌরাণিক যাত্রায় রয়েল ড্রেস-এর ব্যবহার শুরু হলো। তখন থেকেই পালার নির্দেশক ও পরিচালক অভিনেতা-অভিনেত্রীদের জন্য রয়েল ড্রেস আমদানি করলেন। এই রয়েল ড্রেস পরে পালার অভিনেতা-অভিনেত্রীরা অভিনয় শুরু করলেন। এতে দর্শকরা মুগ্ধ হলেন। এইভাবে মনসা পালার উপস্থাপনা রীতিতে বিবর্তন সাধিত হয়েছে। ফলে দর্শকের কাছে মনসা পালা সমাদৃত হচ্ছে। তবু নাগরিক সমাজের কাছে এখনও মনসা পালা অনাদৃত ও ব্রাত্য।

উৎসের সন্ধানে

১. সুকুমার সেন : 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' প্রথম খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৪০, পৃ. ১৫৮

২. আশুতোষ ভট্টাচার্য : 'বাংলা মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস', এ মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রা. লি. এবং সপ্তর্ষি প্রকাশন, কলকাতা, মে ২০১৫, পৃ. ১৯৯

৩. বিনয়তোষ ভট্টাচার্য : 'বৌদ্ধদের দেবদেবী', কলকাতা, চতুর্থ মুদ্রণ, জুলাই ২০১৫, পৃ. ৭৬

৪. হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য : হিন্দুদের দেব-দেবী উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ, তৃতীয় পর্ব, ফার্মা কে এল এম প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৮০, পৃ. ১৩০

৫. সুকুমার সেন : 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস প্রথম খণ্ড', আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, চতুর্দশ মুদ্রণ, আগস্ট ২০১৮, পৃ. ১৫৯

পর্ব : ৫

➲ বস্তুকেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতি

❑ লোকপ্রযুক্তি

বস্তুকেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতি চর্চায় সুন্দরবনের লোক-প্রযুক্তি

উজ্জ্বল সরদার

ভারতীয় সুন্দরবন পশ্চিমবঙ্গের একেবারে প্রান্তিক অঞ্চলে, বঙ্গোপসাগর উপকূলে। জল-জঙ্গল মানুষের সহাবস্থান এখানে। বসতি শুরুর সময় থেকেই মানুষ এখানে তার জীবনধারণের জন্যে প্রকৃতির ওপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল। আপাত হাতের কাছে পাওয়া উপাদান দিয়েই তারা নিজেদের মতো করে বহু জিনিসপত্র তৈরি করেছেন, যেখানে জটিল যান্ত্রিকতা নেই। আজও এখানে যোগাযোগ ব্যবস্থা সেভাবে সহজসাধ্য নয়। সুন্দরবনে স্থানীয় হাট-বাজারই মানুষের বিকিকিনির একমাত্র ভরসাস্থল, তাই খুব স্বাভাবিকই নিজস্ব উদ্ভাবনীতে আর গ্রামীণ জীবনের লৌকিক প্রযুক্তিতে শহুরে যান্ত্রিকতাকে দূরে রেখে এইসব অঞ্চলের মানুষ তাদের দৈনন্দিন জীবনে কাজ চালানোর জন্য এতো অসাধারণ সব জিনিসপত্র বানিয়েছেন। উল্লেখ্য প্রতিটি জিনিসই স্থানীয় বাঁশ, গাছের ডালপালা, মাটি, খড়, গাছের পাতা এসব দিয়েই প্রস্তুত। উনবিংশ শতকের শেষ ও বিংশ শতকের শুরুতে সুন্দরবনে যখন জঙ্গল কেটে বর্তমান বসতি গড়ে উঠছে তখন থেকেই মানুষ এখানে তার নিজস্ব চাহিদা মেটাতে থেকেছে প্রাকৃতিক লোকজীবনের মাধ্যমেই। বিশ্বব্যাপী বিশ্বায়নের এই দাপাদাপির যুগে আজও সুন্দরবনের গ্রামে গ্রামে লোক-প্রযুক্তির ছড়াছড়ি।

সুন্দরবনের ভৌগোলিক পরিবেশ যে এখানকার মানুষের জীবনের ওপর সব থেকে বেশি প্রভাব ফেলবে সেটাই স্বাভাবিক। বস্তুকেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতি চর্চার দৃষ্টিতে যদি আমরা এই অঞ্চলের মানুষের ব্যবহার করা লোক-প্রযুক্তিগত দ্রব্যগুলির দিকে একটু নজর দিই তাহলে তা একটু হলেও চমকাতে হয় বৈকি। মানুষ তার নিজস্ব প্রয়োজনে, সহজলভ্য উপাদান দিয়ে নিজেদের গ্রামীণ প্রযুক্তিতে এতো যে জিনিসপত্র তৈরি করেছেন বা করছেন তা অবশ্যই প্রশংসনীয়। উল্লেখ্য এই চর্চায় গ্রন্থ নির্ভরতা যৎসামান্য, কিন্তু আজও সুন্দরবনের গ্রামে গ্রামে লোক-প্রযুক্তির অজস্র উপাদান ছড়িয়ে আছে যা সত্যই শিক্ষণীয়।

➲ ঘনি ও আঁটল : কৃষিকাজ আর মৎস্য শিকার এই দুটি প্রধান জীবিকা নির্ভর করেই সুন্দরবনের জনজীবন এগিয়ে চলছে। খুব স্বাভাবিকভাবেই এই দুটি বিষয়ের জন্যে গ্রামের মানুষ তাদের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিজেদের জন্য প্রস্তুত করে নেন নিজেদের লোক-প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে। সমুদ্র, নদী, খাল বিল, পুকুরে মাছ ধরার জন্যে জালের ব্যবহার এসব অঞ্চলে

হয়। কিন্তু এসব বাদ দিয়েও সুন্দরবনের ধান জমির মাঠে বহু ছোটো ছোটো মাছ পাওয়া যায়, যা ধরার জন্য ঘনি আঁটল নামের একধরনের ফাঁদ ব্যবহৃত হয়। সুন্দরবনের গ্রামে কোথাও এটি বাঁকি, কোথাও এটি মুগ্রি নামে পরিচিত। ঘনি বা ঘুনি সাধারণত ছোটো আকৃতির হয় আর আঁটল তুলনায় অনেক বড়ো আকৃতির হয়। বাঁশের চেরা অংশ, মাছ ধরার মোটা সুতো, জাল এসব দিয়ে এগুলি তৈরি হয়। খাল-বিল-পুকুরের জলের স্রোতের মুখে আঁটলকে আর ধান ক্ষেত্রের জলের স্রোতের মুখে ঘনিকে বসিয়ে দিলে মাছ আপনা-আপনি এর মধ্যে প্রবেশ করলেও আর তারপর ঘুরে বাইরে বের হতে পারে না। এগুলি আগে সুন্দরবনের বহু মানুষ নিজেদের প্রয়োজন অনুযায়ী বানিয়ে নিলেও আজকের প্রজন্ম এগুলি প্রস্তুতির পদ্ধতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল নন। ফলে আজকের সুন্দরবনের বহু হাটে-বাজারে এগুলি কিনতে পাওয়া যায়, যা তৈরি করে সুন্দরবনের নির্দিষ্ট কিছু মানুষ তাদের জীবিকা নির্বাহ করছেন।

➲ **রিং জাল** : সুন্দরবন জল-জঙ্গালের স্থান, ফলে এখানে মাছের আধিক্য সবসময়েই। প্রয়োজন অনুযায়ী হাঁটু জলে বা কোমর পরিমাণ জলে নেমে দু-হাত দিয়ে জাল কাটিয়ে কাটিয়ে মাছ ধরা হয় যে জাল দিয়ে তাকে রিং জাল বলা হয়। একটি বাঁশের চেরাকে গোলাকৃতির রিং করে মাছ ধরার জাল সেটির সঙ্গো বেঁধে দেওয়া হয়, আর ওই জালের অপর প্রান্ত এক মুঠির মধ্যে নিয়ে দড়ি দিয়ে শক্ত করে বেঁধে দেওয়া হয়। এসব অঞ্চলে এই ছোটো জালকে কোথাও ছেগিন জাল, কোথাও আবার চাক জালও বলা হয়। সাধারণত পুকুর, খাল, মাঠের জলের মধ্যে নেমে এই জাল দিয়ে মাছ ধরা হয়।

➲ **যাঁতা** : সুন্দরবন অঞ্চলের কিছু কিছু গ্রামে অড়হর, মুগডাল প্রভৃতি চাষ হয়ে থাকে। সাধারণত ফসল হিসেবে ডাল বাড়িতে বা খামারে চলে এলে তারপর ডালের খোসা ছাড়ানোর জন্য যাঁতা জরুরী। এটি সভ্যতার প্রাচীন উপাদানের অন্যতম চিহ্ন বহন করছে। দুটি ভীষণ ভারী ভারী পাথরের চাকার মাঝে একটি ছিদ্র ও ওপরের চাকাটির প্রান্তে একটি পূর্ণাঙ্গ ও একটি অর্ধেক ছিদ্র থাকা জরুরি। মাঝের ছিদ্রের সঙ্গো দুটি চাকা যুক্ত থাকে আর ওপরে চাকার প্রান্তের পূর্ণাঙ্গ ছিদ্র দিয়ে ডাল মুঠো মুঠো করে দিয়ে অর্ধ ছিদ্রটির ওপর শক্ত লাঠি দিয়ে ঘোরালে ডাল ভাঙা হয়ে যায়।

➲ **উড়কি মালা** : বেশ প্রাচীন লোক-প্রযুক্তির রান্নার সরঞ্জামের মধ্যে একটি লুপ্তপ্রায় উপাদান এই উড়কি মালা। সুন্দরবনে অঞ্চলভেদে এটি ডাল ঘুটনি নামেও পরিচিত। একটি বাঁশের কঞ্চির ডগায় নারকেলের মালার দুই ধার ছিদ্র করে এপাশে ওপাশে বরাবর ঢুকিয়ে দিয়ে অনেকটা চামচের মত রূপ দেওয়া হয়। মূলত গৃহস্থ রান্নাঘরে ডাল জাতীয় খাদ্য রান্নার জন্যে ও পরিবেশনের জন্যে এই সরঞ্জামটি বিশেষ কাজের সহায়ক। স্থানীয় সহজলভ্য উপাদান দিয়ে দরকারি এই জিনিসটি সহজেই গ্রামে প্রস্তুত করা যেত। অতীতে একটা সময় সুন্দরবন তথা গ্রাম বাংলার দক্ষিণবঙ্গোর ঘরে ঘরে এটি বহুল প্রচলিত হলেও আজ স্টিল, প্লাস্টিকের বহুল ব্যবহারে এটি একেবারেই হারিয়ে গিয়েছে বলা যায়।

➲ **মই** : সাধারণ মাটির সমতল থেকে উঁচুতে ওঠা, চাষের জমি প্রস্তুতের জন্যে লাঙ্গাল দিয়ে জমি চষে দেওয়ার পর মাটির ঢেলাকে সমান করার জন্যও মই-এর প্রয়োজন। শক্তপোক্ত একটি বাঁশকে লম্বালম্বি চিরে দুটি খণ্ড করে বা গোটা দুটি বাঁশকে সমান্তরালে রেখে নির্দিষ্ট ফাঁক ফাঁক মাপের দুটি বাঁশে একই জায়গায় ছিদ্র করে সেখানে ছোটো ছোটো বাঁশের শক্ত

টুকরো ঢুকিয়ে দিয়ে দড়ি দিয়ে বেঁধে বা জমাট করে দিলেই মই প্রস্তুত হয়ে যায়। সুন্দরবনের গ্রামে গ্রামে খড়ের ছাউনি দেওয়া মাটির বাড়ি, আর এসব করতে গেলে মই-এর প্রয়োজনীয়তা আবশ্যিক। কিছু কিছু অঞ্চলে পৌষ সংক্রান্তির সময়ে এই মই-কেই দেবতা রূপে পুজোও করা হয়।

➲ **দে কাঠি** : সুন্দরবনের গ্রামে গ্রামে পাট কাঠি, গোরুর গোবর, ধানের তুঁষ সহজেই মেলে। গোয়ালে বা ঘরে মশা-মাছির উপদ্রব কমাতে অনেক সময় একটি মালসায় তুঁষের আগুন সবসময়ই জ্বালিয়ে রাখা হয়। আর শুকনো কাঠির অগ্রভাগ থেকে পাঁচ-ছয় ইঞ্চি লম্বা অংশ সংগ্রহ করে, সেই ফাঁপা লম্বা পাট কাঠির টুকরো নোড়া দিয়ে ফাটিয়ে আবার কয়েক টুকরো ভাগে বিভক্ত করতে হবে। এমনই ভাবে এক দু-গোছা পাট কাঠি নিয়ে দে কাঠি বানাতে হবে।[১] এই দে কাঠিতে গন্ধকদ্রব্য মিশিয়ে রেখে প্রয়োজন অনুযায়ী মালসার আগুনে ঠেকিয়ে নিলেই তা দেশলাই-এর মতোই কাজে দেয়।

➲ **চুবড়ি** : বাঁশের চেরা বা কঞ্চি একেবারে সরু সরু করে নিয়ে ঠাস বুনটে গৃহস্থ বাড়ির দৈনন্দিন কাজে মাছ আনাজ ধোয়া, কিছু রাখা, খাবার ঢাকা দেওয়ায় জন্য এসব অঞ্চলে চুবড়ি ব্যবহার করা হয়। এগুলি সাধারণত গ্রামের নিম্নস্তরের প্রান্তিক মানুষজনই প্রস্তুত করে। গোলাকৃতির পাত্রের মতো দেখতে হয় এটি। স্টিল, প্লাস্টিক বাসনের দাপাদাপিতে আজও সুন্দরবনের গ্রামে গ্রামে চুবড়ির বহুল ব্যবহার প্রচলিত। এসব অঞ্চলে এটি 'ঠ্যাকা' নামে পরিচিত।

➲ **ঝোড়া ও ঝাঁকা** : বাঁশের চেরা সরু সরু করে মসৃণ ভাবে চেঁছে-ছুলে চুবড়ির থেকে বড়ো আকারের পাত্র আকৃতির ঝোড়া ও ঝাঁকা বানানো হয়। গ্রামের বহুবিধ কাজের জন্যে প্রয়োজনীয় এটি। ঝোড়া সাধারাণত গোলাকৃতির হয় আর ঝাঁকা চ্যাপ্টা গোলাকৃতির। ঝোড়া সুন্দরবনের গ্রাম্যজীবনের দৈনন্দিন কাজে মাটি কাটা, কৃষিকাজ, পশুপালন, বড়ো সামাজিক অনুষ্ঠান, উৎসব পুজো, এসব ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। আর ঝাঁকা কৃষিজ ফসল, শাক-সব্জি, ফলমূল এসব রাখার জন্য বা বহনের জন্য বহুলভাবে ব্যবহৃত হয়। সমাজের প্রান্তিক শ্রেণির মানুষরা এগুলি তৈরি করেন। সুন্দরবনের প্রায় সকল গ্রামে এগুলির ব্যবহার আজও ব্যাপকভাবে চোখে পড়ে।

➲ **মুগুর** : মুগুর উচ্চারণ করলেই সকলের সামনে শরীরচর্চার পেল্লাই পেল্লাই সব মুগুর ভাঁজার ছবি সামনে ফুটে ওঠে। কিন্তু দক্ষিণবঙ্গের সুন্দরবনের গ্রামে সাধারণত গোরু, ছাগলের খোঁটাকে মাটিতে পুঁতে দিতে বা একইরকমের বাঁশ, লাঠি এসব মাটিতে পোঁতার জন্য তার মাথায় সজোরে আঘাত করতে মুগুর ব্যবহার করা হয়। প্রমাণ মাপের বাঁশ, কাঠকে চেঁছে-ছুলে মসৃণ বানিয়ে একটি প্রান্তে কিছুটা হাতলের মতো বানিয়ে স্থানীয়রা মুগুর তৈরি করেন। মুগুরের জন্য যে কাঠকে নেওয়া হয় তা ওজনে বেশ ভারী হওয়া আবশ্যক।

➲ **খোঁটা** : সুন্দরবনের গ্রামের প্রায় প্রতি ঘরে গোরু, ছাগল পোষার চল বিশেষভাবে নজরে আসে। গ্রামের মানুষ এই গোরু বা ছাগলকে মাঠে, গোয়ালে বেঁধে রাখার জন্য একটুকরো- দেড়-দুই ফুটের বাঁশের বা অন্যান্য গাছের ডালের অংশকে ব্যবহার করেন, যাকে স্থানীয় ভাবে খোঁটা বলে। এই ছোটো অথচ মোটা কাঠের, বাঁশের টুকরোটির এক প্রান্ত সরু থাকে যাতে সহজে মাটির মধ্যে পুঁতে দেওয়া যায়, অপর প্রান্ত একটু খাঁজ কাটা থাকে

যাতে গোরু- ছাগলের দড়ি পেঁচিয়ে শক্ত করে বেঁধে দেওয়া যায়। উল্লেখ্য গৃহস্থ বাড়ির মহিলা পুরুষরাই নিজেদের প্রয়োজনে নিজেরাই খুব সহজে এটি তৈরি করে নেন, কোনও যান্ত্রিক জটিলতা ছাড়াই।

➲ **আলটা** : সুন্দরবন তথা দক্ষিণবঙ্গের কৃষিজীবী পরিবারে এই আলটার ব্যবহার খুবই দেখা যায়। দক্ষিণ প্রান্তিক সুন্দরবন অঞ্চলে এগুলি বিড়া বা বিড়ে নামেই পরিচিত। ধান গাছ থেকে ধান ঝেড়ে নেওয়ার পর ধানের গাছকে খড় বলে। এই খড় কয়েকগুচ্ছ নিয়ে পাকিয়ে পাকিয়ে দড়ির মতো করে তাকে গোলাকৃতি করা হয়। ভাতের হাঁড়ি বা ঐ জাতীয় জিনিস মাটির ওপর সমানভাবে বসানোর জন্য এটি ব্যবহার করা হয়। বছরের সবসময় এটির ব্যবহার চালু থাকলেও বিশেষ করে পৌষ সংক্রান্তি, ভাদ্র মাসের অরন্ধন বা রান্না পূজা, দুর্গোৎসব এসব সময়ে এটির ব্যাপক চাহিদা অতীতে পরিলক্ষিত হতো। সুন্দরবনের প্রায় সমস্ত ঘরে ঘরে এটির চল একসময় থাকলেও বর্তমানে এটি প্রায় লুপ্ত বলা যায়।

➲ **তালপাতার শার্সি** : সুন্দরবনের মানুষ বর্ষাকালে আজও যখন ছাতা, বর্ষাতির পরিবর্তে সহজলভ্য তালপাতা দিয়ে শার্সি বানিয়ে কাজ চালিয়ে নেয়। মূলত তাল গাছের কচি ডগাসহ পাতা কেটে নিয়ে রোদে শুকানোর পর তালপাতার আঁশের সুতো দিয়ে ঐ পাতাগুলি একটির সঙ্গে অপরটি বেঁধে বেঁধে দিলেই শার্সি হয়ে যায়। সুন্দরবনের কৃষক, জেলেরাই এটি বেশি ব্যবহার করেন।

➲ **চাটাই** : সুন্দরবনের মধ্যবিত্ত বা নিম্নবিত্ত পরিবারের মাটিতে বসার জন্যে আসনের পরিবর্তে চাটাই ব্যবহার করা হয়। তালপাতা বা খেঁজুর পাতা গাছ থেকে কাঁচা অবস্থায় কেটে, তার দুই ধার থেকে শক্ত কাঠিগুলি বের করে নেওয়া হয়। তারপর একটি পাতার ওপর আর একটি পাতা ঠাস বুনটে মাটিতে ফেলে আসনের মতো প্রস্তুত করে চারিদিক থেকে কানা বা ধার মুড়ে দিলেই চাটাই প্রস্তুত হয়ে যায়।

➲ **লাঙল** : সুন্দরবনের গ্রামে গ্রামে আজও দেখা যায় লাঙ্গলের ব্যবহারের। ফাল, ঈশ, জোয়াল, আটচাল, হেলোবাড়ি, পালাবাড়ি, মই এসব হলো লাঙলের অংশ। কৃষিজীবী পরিবারের গুরুত্বপূর্ণ ভরসাযোগ্য উপাদান হলো এটি।

➲ **আগড়** : সুন্দরবন বা দক্ষিণবঙ্গে মাঠ থেকে ধান সাধারণত প্রথমে খামার নামে একটা বড়ো জায়গায় এসে জমা হয়। এরপর সেখানেই ধান গাছ থেকে ঝাড়াই বাছাই করে নিয়ে গোলা বা বস্তা ভর্তি করা হয়। এই ধান ঝাড়াই করার জন্য একাধিক মানুষ ধান গাছগুলিকে বাঁশের তৈরি চওড়া আয়তকার আগড়ের ওপর ক্রমাগত আঘাত করে। সুন্দরবনে আগড়কে অঞ্চলভেদে ধাবর, পাটা বা ধরাটও বলা হয়। ধান গাছের শীর্ষ প্রান্তে ধান হয়ে থাকে। গাছগুলির অপর প্রান্ত এক মুঠি করে ধরে আগড়ের ওপরে সজোরে আঘাত করলেই মাটিতে শুধু ধান ঝরে ঝরে জমা হতে থাকে, পরে তা সংগ্রহ করে নেওয়া হয়। এই আগড় প্রস্তুতের জন্য দুই প্রান্তে দুটি বাঁশ পাঁচ বা ছয় ফুট আয়তনের মাপে নিয়ে তার মাঝে মাঝে ছিদ্র করে অজস্র বাঁশের চেরা বা খণ্ড অংশ সেলাইয়ের মতো এফোঁড় ওফোঁড় করে ঠাস বুনটে ভরিয়ে তোলা হয়। উল্লেখ্য এক্ষেত্রে কোনও পেরেক বা পিন জাতীয় কোনো কিছুই ব্যবহার করা হয় না।

➲ পাল্কি : অতীতে একটা সময় গ্রাম বাংলার অন্যান্য অঞ্চলের মতো সুন্দরবনে পাল্কির ব্যবহার বহুল প্রচলিত ছিল। তবে আজও সুন্দরবনের প্রত্যন্ত গ্রামে গ্রামে বেশ কিছু অঞ্চলে পাল্কির চল প্রচলিত আছে। গ্রামের ছুতোর সম্প্রদায়ের হাতেই পাল্কি গড়ে উঠত। কাঠের চৌকো বাক্সের দুই প্রান্তে দুটি লম্বা হাতল থাকে যা বেহারা কাঁধ দিয়ে বয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে উপযোগী। ডুলি, চৌদোলা, মাহাফা, শিবিকা, কাণ্ডি, ঝাল্লেদার, চৌপাট এসব নামেও পাল্কি পরিচিত।[২] পূর্ববর্তী সময়ে সাধারণ যানবাহন গোত্রে এটি থাকলেও আজ সুন্দরবনের গ্রামে বিবাহ উপলক্ষ্যে বা ঠাকুর পুজোর জন্যই এটি শুধু ব্যবহার করা হয়। আধুনিক যন্ত্রচালিত যানবাহনের আধিক্য আর পাল্কিবাহক বেহারাদের অপ্রতুলতার জন্যই এটি বর্তমানে প্রায় লুপ্ত বলা যায়। এটি স্থানীয় লোক-প্রযুক্তিতেই গ্রামের মানুষের অন্যতম উপাদান ছিল বলা যায়।

➲ ঢেঁকি : গ্রাম-বাংলার অন্যান্য অঞ্চলের মতো সুন্দরবনের গ্রামে গ্রামে ঢেঁকিরও বহুল প্রচলন পরিলক্ষিত হয়। সিতন, পাছা, মুষল, শামা, আঁকশলী, পোয়া, গড়, ভানকি দড়ি, উসকো বাড়ি এসব হলো ঢেঁকির এক একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।[৩]

➲ বেলছরি : সুন্দরবনের গ্রামে নারকেল, তাল, খেঁজুর গাছের ছড়াছড়ি। নারকেল গাছের ডাব নারকেল সারা বছরভর মিললেও তাল, খেঁজুর গাছের রস মেলে বছরের নির্দিষ্ট সময়ে। আপাতভাবে বিশেষ পরিচর্যার প্রয়োজন না হলেও সময়ে সময়ে এইসব গাছের ওপরের দিকের পাতাগুলিকে ছাড়িয়ে দিয়ে গাছকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে রাখা হয়। আর এইসব বড়ো বড়ো গাছে উঠে এই কাজগুলি করেন এসব অঞ্চলের বিশেষ সম্প্রদায়ের মানুষেরা। তাদের প্রয়োজনীয় সরঞ্জামের মধ্যে দা, কাটারি, দড়ির সঙ্গে বেলছরি নামে একটি লম্বা কাঠ থাকে, যা আদতে প্রতিনিয়ত দা কাটারিকে মসৃণ ধার দিতে প্রয়োজন। সুন্দরবনের কিছু অঞ্চলে এটি পাটা নামেও পরিচিত। একটি আনুমানিক ফুট দুই লম্বা ও আট-নয় ইঞ্চি মতো চওড়া। কুল, বেল, তেঁতুল কাঠের ওপর সাদা বালি আর জল অনবরত মিশিয়ে দা-কাটারিকে চেপে ঘষতে থাকলে তা তীক্ষ্ণধারে পরিণত হয়। তবে গৃহস্থ বাড়ির অন্যান্য সরঞ্জাম যেমন—বঁটি, কাস্তে, দা, কাটারিকেও মসৃণ ধার দিতে এই বেলছরি কাঠটি ব্যবহার করা হয়।

সুন্দরবনের গ্রামে গ্রামে এমন বহু লোক-প্রযুক্তির জিনিসপত্র আজও ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে যা গ্রামীণ লোকসংস্কৃতি, ইতিহাস, ঐতিহ্য এসব কিছুর অনন্য দৃষ্টান্ত। সুন্দরবনের সাধারণ গৃহস্থ বাড়িতে কুলো, পালি, কুনকে, মাকু, তেলেডোঙা এসবের নামের তালিকা খুব কম না হলেও বিশ্বায়নের দুনিয়ায় যান্ত্রিক নগরায়নের চাপে এসব আজ লুপ্তপ্রায় ইতিহাসের উপাদান বলা যায়।

তথ্যের সন্ধানে

১. কৃষ্ণকিশোর মিদ্যা : 'বিলুপ্তির পথে লোক-প্রযুক্তি : দে-কাঠি ও লবণ প্রস্তুতি', 'নিম্নগাঙ্গেয় সুন্দরবন সংস্কৃতিপত্র', "জীবন-জীবিকা-সংস্কৃতি-৪"; সম্পাদক–বিমলেন্দু হালদার, সোনারপুর, কলকাতা, দশম সংখ্যা, জানুয়ারি ২০১২, পৃ. ৫

২. কালিচরণ কর্মকার : 'শিকড়ের খোঁজে', রোহিণী নন্দন, কলকাতা, অক্টোবর ২০১৯, পৃ. ১২

৩. তুহিনময় ছাটুই : 'লোকায়তিক সমাজ সংস্কৃতিতে ঢেঁকি', দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার লোকায়ত সংস্কৃতি, ড. বি. আর. আম্বেদকর স্মৃতি রক্ষা সমিতি, বারুইপুর, জানুয়ারি, ২০১১, পৃ. ২৩৯

❑ **লোকবাদ্য**

নৃত্য-গীতে পুরুলিয়ার লোকবাদ্য

নিবেদিতা দিন্দা

নাচা বাজা বেশ
মান ভুঁইয়ার দেশ।

পুরুলিয়ার লোকজীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে নৃত্য-গীত ও বাদ্য। ছৌ-ঝুমুরের দেশ বলেই পুরুলিয়ার পরিচিতি। আকাশে-বাতাসে ধ্বনিত হয় ঝুমুরের সুরমূর্ছনা। ধামসা-মাদলের শব্দ মনকে টেনে নিয়ে চলে পুরুলিয়ার আদিবাসী পল্লিতে। সারা রাত ধরে নারী-পুরুষের নৃত্য অভিভূত করে দেয়। পালা-পার্বণে ঘরে ঘরে টুসু, ভাদু গানের সুর ভেসে আসে। পুরুলিয়ার লোকসমাজে ছৌ, নাটুয়া, করম, নাচনি, বাহা, সহরাই—এমনই নানা নৃত্য প্রচলিত রয়েছে। রঙবাহারি পোশাক ও নানা লোকবাদ্যের ঐকতান মানভূম সংস্কৃতির বৈচিত্র্যময়তা প্রকাশ করে—

> বারো মাসে তেরো পরব, এইটায় তো পুরুল্যার গৌরব হে/এই সংস্কৃতির বিশ্বেতে ভ্রমণ,/টুসু, ভাদু, ঝুমুর গানে, কি আনন্দ দেয় পরানে।/ঢোল, ধামসা, ঢাকের তাল, গম্ভীরে গর্জে বিশাল হে/সঙ্গে বাজে সাহনায়ের সুর,/মাদল, মৃদঙ্গের সুর, শুনিতে কত মধুর,/সেই সুর মাতেছি আইজ আমি তুমি।[১] (কৃত্তিবাস কর্মকার)

'বারো মাসে তেরো পার্বণ' কথাটি পুরুলিয়ার ক্ষেত্রে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। সারা বছর ধরে এখানকার মানুষ পরবে মেতে ওঠে। পরব মানেই নাচ, গান আর বাজনা। নাচকে ছন্দময় করতে আর সুরের মূর্ছনায় গানকে বেঁধে রাখতে পুরুলিয়ার শিল্পীরা ধামসা, মাদল, ঢাক, ঢোল, কেন্দ্রী, মদনভেরি ইত্যাদি নানা ধরনের বাদ্যযন্ত্র তৈরি করেছেন। লোকজ উপাদান দিয়ে তৈরি হয় বাদ্যযন্ত্রগুলি। এই লোকবাদ্যের ব্যবহার পুরুলিয়ার নৃত্য-গীত লোকসংস্কৃতির জগতকে সমৃদ্ধ করে তোলে।

পুরুলিয়া নামটির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে বিশ্ববিখ্যাত ছৌ নাচের কথা। ছৌ বীররসাত্মক নৃত্য। সারা বছর ধরেই কোনো না কোনো স্থানে ছৌ নাচের আসর বসে। ফাঁকা স্থানে খোলা আকাশের নীচে মুখোশ পরে বাজনার তালে তালে এই নৃত্য পরিবেশিত হয়। ধামসার গুরুগম্ভীর শব্দ, মুখোশের অঙ্গভঙ্গির মধ্যে দিয়ে দর্শকদের মনে উদ্দীপনা জাগায়। ধামসার পাশাপাশি চড়চড়ি, নাগড়া, সানাই ইত্যাদি বাজনার তালে তালে শিল্পীর প্রতিটি অঙ্গ দুলতে থাকে। ডাঁওয়ালি, বাঁওয়ালি ও ডেগ—এই তিনটি জিনিসের নির্দিষ্ট মাপের মধ্যে তাদের নাচতে হয়। ছৌ নাচের মধ্যে বাজনার সম্মেলন অনুষ্ঠানে অন্য মাত্রা এনে দেয়। ছৌ নাচের গাম্ভীর্য বাড়ানোর জন্য খাপু বাদ্যযন্ত্রটিও ব্যবহার করা হয়। ছৌ-এর মতোই পৌরুষদীপ্ত লোকনৃত্য হলো নাটুয়া নাচ। নাগড়া, ঢোল, ঢাক, চেটপেটি, সানাই, তাসা, বাঁশি ইত্যাদি

বাদ্যযন্ত্র সহযোগে শিল্পীরা শারীরিক কসরৎ ও বলবীর্য প্রদর্শন করেন। ডোম সম্প্রদায়ের হাড়িরাম কালিন্দী, বীরেন কালিন্দী এবং কোনাপাড়ার হাড়ি সম্প্রদায়ের গুণধর সহিস নাটুয়া নাচের জন্য বিখ্যাত। শিল্পীরা রঙিন ঝলমলে পোশাক পরেন। মালকোঁচা দেওয়া ধুতি, কোমরে লাল রঙের গামছা, হাতের কব্জিতে রঙ-বেরঙের কাপড়ের ফালি বেঁধে নাচ করেন। নাচের শুরুতে ঢাকের কড়কড় আওয়াজ ও সানাইয়ের সুর দর্শকদের মনে শিহরণ জাগিয়ে তোলে।

ছৌ-এর থেকে প্রাচীন একটি লোকনৃত্য হলো নাচনী নাচ। ধামসা, মাদল বা হারমোনিয়াম-তবলা সহযোগে নাচনী নাচ মানভূমের এক অন্যতম সংস্কৃতি। ডোম, বাগদি, হাড়ি, বাউরি, মুচি ইত্যাদি সমাজের নিম্ন সম্প্রদায়ের নারীরা 'নাচনি' শিল্পী হয়ে ওঠেন। রসিকরাই নাচ-গান শিখিয়ে তাদের শিল্পী হিসেবে গড়ে তোলেন। নাচই হলো নাচনিদের জীবন ও জীবিকা। পূর্বে রসিকের কৃপাপ্রার্থী হয়ে নাচনিদের জীবন কাটাতে হতো। অনেক নাচনি নাচটিকে আদি বা শৃঙ্গার রসাত্মক বলে মন্তব্য করেছেন। তবে দর্শকদের মনোরঞ্জনের স্বার্থেই তাদের চটুল নাচ-গান করতে হয়। জনগণের সন্তুষ্টির ওপরেই তাদের জীবন-জীবিকা নির্ভর করে। নাচনি নাচের কেন্দ্রবিন্দু ঝুমুর গান। নৃত্য শুরুর প্রথমেই প্রচণ্ড শব্দে বাজনা বাজানো হয়। বাজনা থামলে রসিক গান ধরতেন। তারপর নাচনি নাচতে শুরু করতেন। বাজনার তালে তালে চলে নাচ আর গান। বর্তমানে ঢোল, লাগড়া, হারমোনিয়াম-তবলা, মেরাকস ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্রের প্রয়োগ দেখা যায়—"ধামসা মাদৈলের সুর/মনকে করে সুমধুর,/সেই সুরে সিন্ধুবালা নাচে।"[২] (কিরীটি মাহাত)

সিন্ধুবালা দেবী ছিলেন বিখ্যাত নাচনি শিল্পী। তিনি এই নাচটিকে অশ্লীলতার হাত থেকে মুক্ত করে শিল্পের মর্যাদায় উন্নীত করেছেন। এছাড়াও পোস্তুবালা দেবী, বিমলা দেবী, মালাবতী সহ অন্যান্য অনেক শিল্পী নাচনি নাচের ঐতিহ্য বজায় রেখেছেন। পুরুলিয়ার আরও একটি প্রাচীন নৃত্য কাঠি নাচ। ধামসা, মাদল, ঢোল প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র সহযোগে গানের তালে তালে এক পা, দু-পা এগিয়ে একজনের কাঠি অন্যজনের কাঠিতে আঘাত করে নৃত্যটি পরিবেশিত হয়। পুরুলিয়ার গ্রামাঞ্চলে বুলবুলি নাচটি খুবই জনপ্রিয়। বুলবুলি নাচে ছেলেরা মেয়েদের সাজ-পোশাক পরে নাচে। নাগড়া, ঢুলি, সানাই, ঝুমকা বাদ্যযন্ত্র সহযোগে নৃত্যটি সংঘটিত হয়। ঝুমুর গান আর বাজনার তালে তালে ঝলমলে পোশাক পরে নাচ হয়।

পুরুলিয়া জেলার অন্যতম বিখ্যাত নাচ হলো ঘোড়া নাচ। বিবাহ অনুষ্ঠানে, মেলা প্রাঙ্গণে, প্রতিমা বিসর্জন, রাজনৈতিক দলের মিছিলে ঘোড়া নাচ দেখা যায়। বাঁশ, বেত, কাপড়, শোলা, রঙিন কাগজ প্রভৃতি সহযোগে ঘোড়ার কাঠামো তৈরি করা হয়। কাগজের মণ্ড দিয়ে মুখোশ তৈরি করে বাঁশের কাঠামোর সঙ্গে যুক্ত করে ঘোড়ার আকৃতি দেওয়া হয়। পিঠের অংশ ফাঁকা থাকে। শিল্পী ফাঁকা অংশটি দিয়ে প্রবেশ করেন। কোমরের সঙ্গে খাঁচাটি বেঁধে নেন। রাজার মতো শিল্পী ঝলমলে পোশাক পরেন। শিল্পীর হাতে ঢাল ও তলোয়ার থাকে। ঢাক, ঢোল, কাঁসর, বাঁশি, সানাই ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্র সহযোগে ঘোড়া নাচ পরিবেশিত হয়।

মনসা পুজো পুরুলিয়ার জনপ্রিয় উৎসব। ধীবর, রাজোয়াড়, বাগদি, ডোম, হাড়ি ইত্যাদি তপশিলি জাতির মানুষদের পাশাপাশি অন্যান্য অনগ্রসর সম্প্রদায়ের মানুষও অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে মনসার আরাধনা করেন। সারা শ্রাবণ মাস ধরে পুরুলিয়ার গ্রামে গ্রামে মনসামঙ্গল গান অনুরণিত হয়। স্থানীয় লোকেদের কাছে এটি 'জাঁত' গান নামে পরিচিত। জাঁত গান

পরিবেশনের জন্য বিভিন্ন দল থাকে। এক একটি দলে ১০-১৪ জন শিল্পী থাকেন। হারমোনিয়াম, ঢোল, বাঁশি, করতাল বাদ্যযন্ত্রগুলির সমাবেশে জাঁতগানের আসর জমে ওঠে।

চৈত্র সংক্রান্তিতে পুরুলিয়ার লোকসমাজ মেতে ওঠে 'গাঁয়ের পরব' বা 'ভগ্‌তা পরব'-এ। পুরুষ ভগতারাই এখানে অংশগ্রহণ করতে পারেন। ফুলের সজ্জায় সেজে দলবদ্ধভাবে ভগ্‌তা নাচ করে। ঢাকের তালে তালে তাদের নাচ চলে। বৈশাখী পূর্ণিমায় আদিবাসী সাঁওতালরা নাচ-গানের মধ্য দিয়ে ধামসা মাদল বাজিয়ে টাঙ্গি,বল্লম, তীর-ধনুক, অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে বন্য পশু-পাখি শিকারে বেরিয়ে পড়ে। দিসুম সেন্দ্রা বা শিকার উৎসবে যোগ দিতে জেলা ও জেলার বাইরে দূর-দূরান্ত থেকে বহু আদিবাসী মানুষের সমাগম হয়। উৎসবের আনন্দের মধ্যে তাদের পারস্পরিক ভাব বিনিময় ঘটে। ভাদ্র সংক্রান্তির দিন চাকলতোড়ের ছাতা পরব উপলক্ষ্যে মেলা বসে। এই মেলার বৈশিষ্ট্য বড়ো বড়ো ধামসার বেচা-কেনা। স্থানে স্থানে ধামসা ডাঁই করা থাকে। রাতভর বেচা-কেনা চলতে থাকে। ধামসার আওয়াজে আকাশ-বাতাস মুখরিত হয়ে থাকে। "দেন দাদা পুইসা/চাকুলতাড়ি ছাতা ঞেঁ ঞেঁ চালাঃ আ/জুরী লাইগে রে দা/ধামসা লিব রে ধামসা লিব।"[৩]

উপরোক্ত চরণটিতে ধামসা কেনার জন্য আবেদনের সুর শোনা যায়। সাঁওতালদের অন্যতম উৎসব সোহরায়। পাঁচ দিন ও পাঁচ রাত্রি ধরে উৎসবটি পালিত হয়। উম, বংগাগুবু, ঘুণ্টাউ, ঘুন্টিচেঙে ও জালে—এই পাঁচটি নামে উৎসবটি পরিচিত। মুরগি ও শূকর পূর্বপুরুষদের উদ্দেশ্যে বলি দেওয়া হয়। সারা রাত ধরে নাচ-গান চলে। সকালে পুরুষেরা গ্রামের কুলিতে মাদল ও নাগড়ার সঙ্গে নাচ করতে থাকে।

ঝুমুর গানের বা অন্য লোকগীতির সঙ্গে কেঁদরি বাজানো হয়। যন্ত্রের ধ্বনিকোষটি নারকেলের আধখানা মালা দিয়ে তৈরি। ছাতার বাঁট দিয়ে দণ্ডটি নির্মিত। দুটো তার লাগানো থাকে। ছড় দিয়ে বাজানো হয়। এখানকার আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে এই যন্ত্রটির ব্যাপক প্রচলন। দাঁশাই নাচ ও গানের প্রধান বাদ্যযন্ত্র হলো ভুয়াং। লাউ-এর শুকনো খোলা দিয়ে ভুয়াং যন্ত্রটি তৈরি হয়। তার দিয়ে বাঁধা থাকে। তার টানলে ভুয়াং ভুয়াং শব্দ হয়—

> হায় রে হায়/অত্‌মা দিশম রেমা ভুয়াং সাড়ে কান/সেরমা দিশম রেমা কাঁসা রাঁওয়া কান।/হায়রে হায়!/চে-তে লাগিৎ দরে ভুয়াং সাড়ে কান/চে-তে লাগিৎ কাঁসা রাঁওয়া, কান/হায়রে হায়!/দেবীরে দুর্গা লাগিৎ ভুয়াং সাড়ে কান/আয়নম কাজল লাগিৎ কাঁসা রাঁওয়া, কান।।[৪]

মর্ত্যভূমিতে ভুয়াং বাদ্যের শব্দ আর স্বর্গপুরীতে কাঁসার শব্দ ধ্বনিত হয়। কি কারণে ভুয়াং বাজে কাঁসার আওয়াজ কিসের জন্য দেবী দুর্গার জন্য ভুয়াং বাজে। আয়নম কাজলের জন্য কাঁসার আওয়াজ শোনা যায়। পুরুলিয়া জেলার বাউলরা আনন্দ লহরী বাদ্যযন্ত্রটি ব্যবহার করে বাউল গান পরিবেশন করেন। পুরুলিয়ার লোকবাদ্যের মধ্যে মদনভেরির নাম উল্লেখযোগ্য। এটি লুপ্তপ্রায় লোকবাদ্য। এটি দেখতে লম্বা চোঙের মতো। পিতল, তামা, লোহা মিশিয়ে এর অবয়ব তৈরি হয়। চোঙটির মুখ উপরে থাকে এবং মুখটি ভেরির মতো আকৃতির। মুখ দিয়ে বাজালে সে আওয়াজ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। এটি লম্বা বলে বাঁশের সঙ্গে লাগিয়ে রাখা হয়। পুরুলিয়ার ঘাসি সম্প্রদায়ের লোকেরা এই বাদ্যযন্ত্র সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করেন। বিবাহ ও অন্যান্য অনুষ্ঠানে এই বাদ্যযন্ত্রটির ব্যবহার দেখা যায়। চামড়া, বাদ্যযন্ত্র ও অহিরা

গান-সহযোগে কাড়া খেলানোই হচ্ছে কাড়াখুঁটা পরব। ধামসা, মাদল যত জোরে বাজানো হবে ততই কাড়া রেগে গিয়ে শিং দিয়ে চামড়া বা বড়চুলাটিকে আঘাত করতে থাকে। এই উৎসবে লোকসমাজ আনন্দ উপভোগ করে।

এইভাবে পুরুলিয়ার অধিবাসীদের নৃত্য-গীত পরিবেশনায় বৈচিত্র্যময় বাদ্যযন্ত্রের গুরুত্ব উপলব্ধি করা যায়। লোকসংস্কৃতির সঙ্গে এইসব বাদ্যযন্ত্র ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বিভিন্ন সংগ্রহশালায় এদের সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। লোকসংস্কৃতির গবেষণায় এই বাদ্যযন্ত্রগুলি মূল্যবান উপাদান, যার ঐতিহাসিক মূল্য অপরিসীম।

উৎসের সন্ধানে

১. কিরীটি মাহাতো ও শ্রমিক সেন সম্পাদিত : 'নির্বাচিত ঝুমুর সমগ্র', ক্রিয়েটিভ এ্যাসোসিয়েটস, কলকাতা, ১৪১১ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১৫৭
২. তদেব : পৃ. ২৫১
৩. তরুণদেব ভট্টাচার্য : 'পাইল-পরব', পুরুলিয়া, ফার্মা কে. এল. এম. প্রা. লি., কলকাতা, তৃতীয় প্রকাশ ২০১৪, পৃ. ২৫৮
৪. পৌষালী চক্রবর্তী সম্পাদিত : 'অথ বলরামপুর কড়চা, এডুকেশন ফোরাম, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ২০১৮, পৃ. ২৫৫-২৫৬

তথ্যের সন্ধানে

১. আব্দুল ওয়াহাব : 'বাংলার লোকবাদ্য', লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ২০০৬
২. আশুতোষ ভট্টাচার্য : 'বঙ্গীয় লোকসংগীত রত্নাকর' (১-৪) খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ লোকসংস্কৃতি গবেষণা পরিষদ, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ-১৯৬৬-৬৭
৩. কিরীটি মাহাতো ও শ্রমিক সেন সম্পাদিত : 'নির্বাচিত ঝুমুর সমগ্র', ক্রিয়েটিভ এ্যাসোসিয়েটস, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ- ১৪১১ বঙ্গাব্দ
৪. তরুণদেব ভট্টাচার্য : 'পুরুলিয়া', ফার্মা কে. এল. এম. প্রা. লি., কলকাতা, তৃতীয় প্রকাশ-২০১৪
৫. দিলীপ কুমার গোস্বামী : 'সীমান্ত রাঢ়ের লোকসংস্কৃতি', পারিজাত প্রকাশনী, পুরুলিয়া, প্রথম প্রকাশ-২০১৪
৬. দেবপ্রসাদ জানা সম্পাদিত : 'অহল্যাভূমি পুরুলিয়া', প্রথম পর্ব, দীপ প্রকাশন, কলকাতা, ২০০৪
৭. বরুণ কুমার চক্রবর্তী ও দিব্যজ্যোতি মজুমদার সম্পাদিত : 'বাঙলার লোকসংস্কৃতি', অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৬
৮. মিতা ঘোষ বক্সি : 'পুরুলিয়ার লোকসংস্কৃতি', অক্ষর প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর ২০১০
৯. সুভাষ রায় : 'পুরুলিয়া জেলার লোকসংস্কৃতি', বর্ণালী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ২০১৫
১০. সুধীর কুমার করণ : 'সীমান্ত বাঙলার লোকযান', করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ পৌষ ১৪০২

পত্র-পত্রিকা

১. সুবোধ বসু রায় সম্পাদিত : 'ছত্রাক', শারদীয়া সংখ্যা, ১৩৯৭
২. পশ্চিমবঙ্গ (পুরুলিয়া সংখ্যা), তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ২০০৭

লোকপেশায় লোকবাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার

শ্রীকান্ত কর্মকার

মানুষের বেঁচে থাকার জন্য বা টিকে থাকার জন্য তিনটি বিষয় আবশ্যিক—খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থান। তার উদ্দেশ্যেই মানুষের যাবতীয় কর্ম-সাধনা। আমরা আমাদের সমাজে কিছু কিছু লোকায়ত পেশার সঙ্গো লোকবাদ্যযন্ত্র বা দেশীয় বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার লক্ষ করি। প্রাচীনকাল থেকে নানা পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে বাদ্যযন্ত্রগুলি আরও উন্নত হয়েছে। লোকপ্রযুক্তিতে তৈরি এই বাদ্যযন্ত্রগুলি পরবর্তী সময়ে নানা পেশার সঙ্গো যুক্ত হয়েছে। লোকপেশায় ব্যবহৃত সেই বাদ্যযন্ত্রগুলির ব্যবহার আমাদের আলোচনার বিষয়।

প্রথমেই আলোচনা করব মানুষের জন্মসূত্রে পাওয়া বাদ্যযন্ত্রটি নিয়ে; যে যন্ত্রটিতে সাতটি স্বরের সমাগম ঘটেছে। যন্ত্রটি হলো মানুষের বাক্‌যন্ত্র। সংগীতের ভাষায় এই যন্ত্রটিকে বলা হয় কণ্ঠবীণা। তবে বাক্‌যন্ত্রকে ঠিক বাদ্যযন্ত্র বলা যায় না। কারণ বাদ্যযন্ত্রকে বাজানো হয়। কিন্তু বাক্‌যন্ত্র সে শর্ত মানে না। বাক্‌যন্ত্র স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি যন্ত্র। লোকপেশায় যুক্ত মানুষের নিজ বাক্‌যন্ত্রটি একটি বাদ্যযন্ত্রের মতোই হয়ে ওঠে। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে চলার পথে তা সবসময় চোখে পড়ে। লজেন্স, ঝালমুড়ি, চা-কফি, সবজি বিক্রেতা, যেকোনো ধরনের ফেরিওয়ালার হাঁক-ডাক বাসে বা ট্রেনে ফেরি করার সময় শোনা যায়। আর এইগুলি বলার মধ্যে স্বাভাবিক মানুষের বলার থেকে অনেকটা তফাত লক্ষিত হয় আর তা শুনলেই ধরা যায়। এরপর চলে আসা যাক প্রকৃত লোকবাদ্যযন্ত্রগুলির প্রসঙ্গো।

১. ডুগডুগি : 'ডুগডুগি' এই বাদ্যযন্ত্রটি খুবই পরিচিত, মহাদেবের হাতে থাকে তা আমাদের সকলেরই জানা। এই বাদ্যযন্ত্রটি মূলত কাঠ দিয়ে তৈরি হয় আর তার দুই পাশের খালি বা ফাঁকা অংশটি চামড়া দিয়ে শক্ত করে ছাওয়া বা ঢাকা দেওয়া থাকে। বাদ্যটিকে একটি বিশেষ পদ্ধতিতে নাড়ালে তার মধ্যেখানে বাঁধা সুতোর দুই পাশের অগ্রভাগের শক্ত অংশ দুই দিকের চামড়াতে আঘাত করে আর তা থেকে 'ডুগ-ডুগ-ডুগ' আওয়াজ বেরিয়ে আসে। ডুগডুগি আকারে ছোটো, বড়ো ও মাঝারি হয়। তবে মাঝারি আকারের ডুগডুগির ব্যবহার বেশি লক্ষ করা যায়। ডুগডুগি বাদ্যযন্ত্রটির ব্যবহার একাধিক লোকপেশায় দেখা যায়। ডুগ-ডুগ আওয়াজ পেলেই গ্রামগঞ্জের ছেলেরা জানতে পারে খাজা বিক্রি করতে খাজাওয়ালা এসেছে। ভাঙা লোহা, প্লাস্টিক, টিন, কাগজ ইত্যাদি পুরোনো জিনিস কেনার জন্যে যে সমস্ত লোক আসে তারাও এই ডুগডুগি বাদ্যযন্ত্রটি ব্যবহার করে থাকে বিক্রেতাদের জানান দেওয়ার জন্য।

বাঁদরের নাচ

ভালুক নাচ

বাঁদর বা ভালুকের নাচ দেখানোর সময় ডুগডুগি ব্যবহৃত হয়। ডুগডুগির তালে তালে বাঁদর আর ভালুক তার বিভিন্ন নাচ ও খেলা দেখায়। অনেক সময় ডুগডুগির সঙ্গে আরো একটি বাদ্যযন্ত্র বাজাতে দেখা যায় আর সেটা হলো বাঁশি।

২. বাঁশি : বাঁশি বাদ্যযন্ত্রটি বাঁশ দিয়ে তৈরি হয়। সরু লম্বা বাঁশিটির গায়ে সাত থেকে আটটি ছিদ্র থাকে। মুখে করে হাওয়া দিয়ে ছয়টি আঙুলের মাধ্যমে সুরে বাজানো হয়। বিভিন্ন প্রকারের বাঁশি বিক্রি করা হয় বাঁশির সুরের কেরামতি দেখিয়ে।

৩. কাঁশি : বাঁশি বাজিয়ে যেমন বাঁশি বিক্রি করা হয় সেরকমই কাঁসার থালা বাজিয়ে কাঁসা-পিতলের থালা ও কাঁসা-পিতলের অন্যান্য সামগ্রী বিক্রি করার দৃশ্য গ্রাম-গঞ্জে লক্ষ করা যায়। কাঁসার থালার স্থানে অনেক সময় কাঁসির ব্যবহার দেখা যায়। 'কাঁসি' অনেকটা থালার মতোই দেখতে। একটা ছিদ্র করে তাকে দড়ি দিয়ে ছোটো করে বাঁধা হয়। সেই দড়ি দিয়ে বাম হাতে ঝুলিয়ে ধরে ডান হাতে করে একটা কাঠের বস্তু দিয়ে আঘাত করলে আওয়াজ হয়। গ্রামের লোক বুঝতে পারে যে কাঁসা পিতলের সামগ্রী বিক্রি করতে এসেছে। এরা নতুন সামগ্রী বিক্রি যেমন করত তেমনি কাঁসা পিতলের পুরাতন সামগ্রী কিনে নিয়ে যেত। তবে বর্তমানে এই শ্রেণির পেশা অনেক কমে গেছে। কারণ কাঁসা-পিতলের সামগ্রীর ব্যবহার অনেক কমে গেছে, স্টিল, প্লাস্টিক, ফাইবারের সামগ্রীর প্রচলন বেড়ে যাওয়ায়।

৪. বীণ : বেদে সম্প্রদায়ের লোকের পেশা সাপখেলা দেখানো। সাপখেলা দেখানোর অনবদ্য বাদ্যযন্ত্র হলো 'বীণ'। বীণ দেখতে মাকুরের মতো। তবে মধ্যেখানটা নারকেলের মতো গোল। দুই পাশ আসতে আসতে সরু হতে হতে শেষ হয়েছে। বীণকে চলতি ভাষায় 'সাপুড়ে-বাঁশি' ও বলা হয়। এই বাঁশির এক দিক থেকে হাওয়া দিয়ে অপর পাশে আঙুল দিয়ে এক ধরণের মাদকতার সুরে বাজানো হয়। সাপখেলা দেখানোর ক্ষেত্রে বীণ বা সাপুড়ে বাঁশি ছাড়াও বাঁশের বাঁশি বাজিয়ে সাপের খেলা দেখানোর নিদর্শন চোখে পড়ে। তবে বীণকেই মুখ্য ধরা হয়।

৫. ঢোল : 'ঢোল' হলো কাঠ দিয়ে তৈরি মাকুরাকৃতি বাদ্যযন্ত্র। কাঠের মোটা গোল অংশ নিয়ে তার মধ্যেকার অংশ খোদাই করে ফাঁপা করা হয়। তার দুই পাশ পশুর চামড়া দিয়ে শক্ত করে ছাওয়া বা ঢাকা দেওয়া হয়। এই ঢোল বিভিন্ন পেশার সঙ্গে যুক্ত আছে। পটুয়ারা যখন পট দেখায় এবং গান করে তখন গানের তালে তালে এই বাদ্যটি বাজায়। দড়ির ওপর বিভিন্ন প্রকার ব্যালেন্সের খেলা দেখানোর

সময় বা জিমনাস্টিক দেখানোর সময় গ্রামাঞ্চলে এই ঢোল বাজানো হয়। কবিগান গাওয়ার

সময়ও ঢোল বাজানো হয়। তবে কবিগানে ব্যবহৃত ঢোল আকারে আগের গুলোর তুলনায় একটু বড়ো হয়।

৬. ঘণ্টা : মন্দিরের প্রবেশদ্বারে ঘণ্টা ঝুলন্ত অবস্থায় আমাদের চোখে পড়ে। আবার পুজোর সময় পূজারির হাতেও ঘণ্টা বাজতে দেখি। অনেক সময় আমরা নঞর্থক বোঝাতে 'ঘণ্টা' বলি। কিন্তু এই ঘণ্টা কিছু মানুষের সদর্থক লোকপেশায় যুক্ত। ধাতু দিয়ে তৈরি এই বাদ্যটি ফানেলের মতো দেখতে। ভিতরের ফাপা অংশের মধ্যে একটা ধাতুর গোলাকার বস্তু লাগানো থাকে। ঘণ্টা নাড়ালে ভিতরের বস্তুটি ঘণ্টার গায়ে আঘাত করে এবং তা থেকে ঢং ঢং আওয়াজ বেরিয়ে আসে। আকার অনুযায়ী ঘণ্টার সুরের এবং আওয়াজের তারতম্য ঘটে। এই বাদ্যটির অধিক প্রচলন দেখা যায় তা হলো কুলফি এবং শোনপাপড়ি বিক্রি করায়। ঘণ্টার ঢং ঢং আওয়াজ থেকেই বোঝা যায় যে কুলফি বা শোনপাপড়ি বিক্রি করতে ফেরিওয়ালা এসেছে।

৭. হর্ণ বা পিক্‌পিক : এমন একটা বাদ্যযন্ত্র যা টিনের তৈরি বাঁশির মতো আর তার এক পাশে রাবারের শক্ত গোলাকার বলের মতো থাকে। রাবারের বলে চাপ দিলে টিনের বাঁশির মুখ থেকে আওয়াজ বের হয়। একে 'হর্ণ' বা চলতি ভাষায় 'পিকপিক্' বলা হয়। এই বাদ্যটি আইসক্রিম ফেরিওয়ালারা ব্যবহার করে তাদের পেশায়। এর পিক্‌পিক্ আওয়াজ গ্রামের ছেলেদের উতলা করে তোলে। আবার এই হর্ণ ট্রলিভ্যান এবং রিক্সাওয়ালারাও তাদের পেশায় ব্যবহার করে থাকে। পথ চলার সময় মানুষকে সচেতন করার জন্য, যাতে পথচারী কোনো মানুষ তার দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত না হয়।

তবে রিক্সা বা ট্রলিভ্যান এবং আইসক্রিম ফেরিওয়ালার পিক্‌পিক্ বাজানোর মধ্যে যথেষ্ট তফাত লক্ষ করা যায়। আইসক্রিম ফেরিওয়ালারা অনেকটা লম্বাটানে এবং অনেকক্ষণ ধরে আর রিক্সা বা ট্রলিভ্যানওয়ালা বাজায় ছোটো ছোটো টানে অল্পক্ষণ ধরে, অর্থাৎ ছন্দের বিচারে ধরলে ট্রলিভ্যান ও রিক্সাওয়ালা হর্ণ বাজান দলবৃত্ত ছন্দের বৈশিষ্ট্যে আর আইসক্রিম ফেরিওয়ালাগণ হর্ণ বাজান মাত্রাবৃত্ত ছন্দের মতো লম্বা টানে।

৮. একতারা : আমরা দেখি কেউ কেউ ঈশ্বরের সাধনার জন্য বাউল হয়। আবার কেউ কেউ বাউলকেই পেশা হিসেবে বেছে নিয়েছে জীবনযাত্রায়। গেরুয়া বস্ত্র পরে গেরুয়া পাগড়ি বেঁধে সংগীতে মত্ত থাকে আর সেই সংগীতে বাদ্যযন্ত্র হিসেবে হাতে থাকে একতারা, বাঁয়া তবলা কোমরে বাঁধা থাকে আর পায়ে থাকে ঘুঙুর। কোনো কোনো বাউলকে গাবগুবি বা গুপিযন্ত্র বা আনন্দলহরী এবং দোতারা সহযোগে দেখা যায়।

'একতারা' এক তার বিশিষ্ট বাদ্য। বাউলের একতারাটি তৈরি হয় লাউ-এর খোল থেকে। লাউ পেকে শুকিয়ে গেলে লাউ-এর ভিতরের অংশ পরিষ্কার করা হয়। তারপর নীচের অংশ কেটে সেই স্থানে পশুর চামড়া আঠা দিয়ে লাগানো হয়। উপরের অংশ বাঁশ দিয়ে তৈরি হয়। মধ্যেখানে একটা সরু লোহার তার নীচের চামড়া অংশ থেকে বাঁশের শেষ অংশ পর্যন্ত বরাবর থাকে। তারটিকে টান দেওয়ার জন্য একটা চাবি থাকে। লাউ ছাড়াও কাঠ দিয়ে, টিনের কৌটো দিয়ে একই পদ্ধতিতে একতারা তৈরি করা হয়।

৯. গুপিযন্ত্র/আনন্দ লহরী : গুপি যন্ত্র বা আনন্দ লহরীটি তৈরি হয় কাঠ দিয়ে। দুই মুখ খোলা কাঠের এই বাদ্যটির একদিক চামড়া দিয়ে ঢাকা থাকে। চামড়ার মধ্যেখানে একটি ছিদ্র দিয়ে একটি লোহার সরু তার লাগানো থাকে। তারের এক প্রান্তে হাতে ধরার জন্য ছোটো ঘটির মতো অংশ থাকে। সেই তারের মধ্যে দিয়ে ইচ্ছে মতো তারটিকে শক্ত করে বা হালকা করে টানের মাধ্যমে এবং একটি ছোটো 'ছুরি' নামক বস্তুর পুনঃপুন ঘর্ষণে সুর সৃষ্টি করা হয়।

১০. বাঁয়া : বাঁয়া পোড়া মাটি দিয়ে তৈরি হয়। দেখতে বাঁয়া তবলার মতো তবে বাউলের বাঁয়া আকারে একটু ছোটো হয়। মাটির হাঁড়ির মতো পাত্রটির খালি মুখটি চামড়া দিয়ে শক্ত করে ছাওয়া থাকে। এই বাঁয়া বাউলরা বাঁ হাত দিয়ে বাজায়। বায়াটি কোমরে বাঁধা থাকে।

১১. ঘুঙুর : ঘুঙুর আকারে একটু ছোটো হয়। লোহা, কাঁসা, পিতলের তৈরি হয়। দুই পায়ে দড়ি দিয়ে একগুচ্ছ করে বাঁধা থাকে।

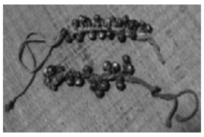

১২. ডুবকি : 'ডুবকি' একটি কাঠের গোল অংশ। তার এক পাশে চামড়া দিয়ে ঢাকা থাকে আর তার গোলাকার চার দিকে ছোটো ছোটো ঘুঙুর বা ওই জাতীয় জিনিস লাগানো থাকে।

১৩. দোতারা : আর একটি বাদ্য বাউলদের হাতে মাঝে মধ্যে দেখা যায় তা হলো দোতারা। কাঠ দিয়ে তৈরি লম্বা বস্তুটির চওড়া দিকের অংশ চামড়া দিয়ে ঢাকা থাকে। দুটি তার থাকে তাই 'দোতারা' বলা হয়। লম্বালম্বি তার দুটির উপরের দিকে চাবি থাকে সেই চাবি দিয়ে সুর ঠিক করা হয়। একতারা যেমন এক হাত দিয়ে বাজানো যায় কিন্তু দোতারা দুই হাত ছাড়া বাজানো যায় না।

১৪. খঞ্জনি বা করতাল ও খোল : হরিনাম বৈষ্ণবের ধর্ম সাধনার অঙ্গ। আবার কেউ কেউ হরিনামকে পেশা হিসেবে বেছে নিয়েছে। আর এই পেশায় কিছু বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার দেখা যায়। তার মধ্যে প্রধান হলো খঞ্জনি বা করতাল। করতাল তামা, পিতল বা

কাঁসা দিয়ে তৈরি হয়। দুই হাতে করে সরু দড়িতে বাঁধা দুটি করতাল বাজানো হয়। এছাড়াও থাকে খোল। খোল মাটি দিয়ে তৈরি চামড়া দিয়ে শক্ত করে ছাওয়া বা ছাদন করা মাকুরাকৃতির বাদ্য। একদিকের অংশ থাকে সরু অন্যদিক একটু বড়ো। দুই হাতে করে বাজানো হয়।

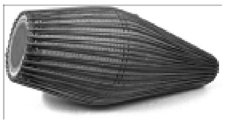

১৫. ঢাক : 'ঢাক' যারা বাজায় তাদের বলা হয় ঢেকো বা ঢাকি। ঢাকি হলো একটা পেশা। ঢাকির প্রয়োজন সকলের জানা। যে কোনো পুজোতে ঢাক অবশ্যই দরকার। এই ঢাক কাঠের বড়ো অংশ থেকে মধ্যেখানের অংশ খালি করে তার দুই দিকে চামড়া দিয়ে শক্ত করে ছাওয়া বা ঢাকা দেওয়া হয়। তবে বর্তমানে কাঠের বদলে লোহা দিয়েও তৈরি হয় ঢাকের ফাঁকা অংশ। একটি ঢাকের একপাশটাই বাজানো যায়। বাঁশের ছোটো কাঠি দিয়ে এই বাদ্যটি বিভিন্ন ছন্দে বাজানো হয়।

বর্তমানে এই সব লোকবাদ্যযন্ত্রগুলির অস্তিত্ব সংকটের সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছে। আমরা দেখছি এই সমস্ত পেশার সঙ্গে যুক্ত একাধিক ক্ষেত্রে মানুষ তার কষ্ট লাঘবের জন্য ইলেক্ট্রনিক্স যন্ত্র, রেকর্ডিং প্রভৃতির ব্যবহার করছে। আচার বিক্রি, আইসক্রিম বিক্রি, কুলফি বিক্রি, ম্যাজিক খেলা দেখানো, জড়িবুটি বিক্রি, কাঁসা পিতলের জিনিসপত্র প্রভৃতি ক্ষেত্রে রেকর্ডিং-এর ব্যবহার চোখে পড়ছে। এছাড়াও এই ধরনের পেশাগুলি আস্তে আস্তে আমাদের সমাজ থেকে উঠে যাচ্ছে। গ্রামগঞ্জে আগের মতো খাজা, শোনপাপড়ি, কাঁসা-পিতলের তৈজসপত্র বিক্রি করতে আসা দেখা যায় না। সাপ খেলা, ম্যাজিক খেলা, ভালুক নাচ, বাঁদর নাচ, পট খেলা প্রভৃতি পেশার মানুষদের আসা প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে। আমাদের সমাজে এবং সংস্কৃতিতে সব সময় কিছু না কিছু পরিবর্তন হয়েই চলেছে। এই পরিবর্তন আদিযুগ থেকে হয়ে আসছে। আমাদের বর্তমান সমাজ-সংস্কৃতিতেও বিশ্বায়নের প্রভাব পড়েছে। বিশ্বায়নের ডাকে সাড়া দিয়ে সমাজ-সংস্কৃতিতে নতুন কিছু যেমন যোগ হচ্ছে আর তার সাথে সাথে পুরাতন ঐতিহ্য হারিয়েও যাচ্ছে।

তথ্যের সন্ধানে

১. বরুণকুমার চক্রবর্তী : 'বঙ্গীয় লোক সংস্কৃতি কোষ', অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০০৪
২. শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য : 'বাংলা লোকসাহিত্য', প্রথম খণ্ড, ক্যালকাটা বুক হাউস, কলকাতা, চতুর্থ সংস্করণ, ১৯৭৩

পর্ব : ৬

১ শিল্পবস্তুকেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতি

❑ তাঁতশিল্প

বাংলার তাঁতি ও তাঁতশিল্প : ক্ষেত্রসমীক্ষাভিত্তিক একটি ভাবনা

বেণীমাধব দাস বৈরাগ্য

লোকসংস্কৃতি সমগ্র বিশ্বের সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে একথা অনস্বীকার্য। সংস্কৃতি মানবজীবনের এক স্বচ্ছ প্রতিবিম্ব, যা জনমানসে প্রতিফলিত হয়। কোনো স্থানের সংস্কৃতিকে জানতে তার মূল্যায়ন ও অনুসন্ধান একান্ত প্রয়োজনীয়। লোকসাহিত্যে 'লোক' বলতে কোনো ব্যক্তি বিশেষকে বোঝানো হয় না। এককথায় লোক হলো সংহত ও সংঘবদ্ধ এক শ্রেণির মানুষ যাঁরা ঐতিহ্যের বন্ধনে আবদ্ধ, স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের প্রতি আস্থাশীল। এই লোকসংস্কৃতি হলো লোকায়ত মানুষের জীবনসংগ্রাম ও তার চিন্তাচেতনার ফলশ্রুতি। মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাপন ও কর্মধারার সঙ্গে এগুলি ওতোপ্রোতভাবে জড়িত। একদিকে এর যেমন আছে মনস্তাত্ত্বিক উৎকর্ষতা; তেমনই অন্য দিকে আছে এর নন্দনতত্ত্বের প্রায়োগিক বা ব্যবহারিক দিকসমূহ। লোকসংস্কৃতির পরিধি বৃহৎ। এটি মানবজীবনের সঙ্গে সমান্তরালভাবে প্রবহমান। এই লোকসংস্কৃতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ লোকশিল্প। এই শিল্পগুলির মধ্যে আছে কারুশিল্প, চারুকলাশিল্প, মৃৎশিল্প, হস্তশিল্প, পটশিল্প, গৃহস্থাপত্য শিল্প, তাঁতশিল্প প্রভৃতি।

'তাঁত' এই কথাটি 'তন্তু' থেকে এসেছে। 'তন্তু' মানে 'সুতো বা আঁশ'। এই সুতো বা আঁশ দিয়ে তৈরি শিল্পকেই তাঁতশিল্প বলা হয়। এই পেশার সঙ্গে নিযুক্ত শিল্পীদের তন্তুবায় বা তাঁতি বলে। আর এই তাঁতের উপর যারা বিশেষ কৌশল প্রয়োগ করেন তাদের 'ফেব্রিক ইঞ্জিনিয়ার' বলা হয়। তাঁত হলো একধরনের যন্ত্র যা দিয়ে তুলা দ্বারা উৎপন্ন সুতো দিয়ে বস্ত্র বয়ন করা যায়। তাঁতশিল্প বাংলা তথা ভারতবর্ষের এক প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী শিল্প। হস্তচালিত তাঁত শিল্প মূলত স্বাধীনতার পূর্ববর্তী সময়ের অন্তর্গত এক দেশীয় শিল্প। স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলনের সময়ে এর ব্যাপক প্রভাব পড়েছিল। সে সময়ে সাধারণ মানুষজন। বিলিতি বস্ত্র বয়কট করে দেশজ তাঁতে তৈরি মোটা কাপড় ব্যবহারের দিকে আগ্রহী হয়ে উঠেছিলেন। এই সময়ে তাঁতের বস্ত্রকে ঘিরে রচিত হয়েছিল স্বদেশচিন্তামূলক গান—

মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নে রে ভাই।
দীন দুঃখিনী মা যে তোদের তার বেশি আর সাধ্য নাই॥

যাইহোক রাঢ় বাংলার অন্যতম এক জেলা বীরভূম। 'রুক্ষ-শুষ্ক-ঊষর লালমাটির দেশ'-এই বীরভূম জেলাতে তাঁতশিল্পের প্রচলন অনেকাংশে লক্ষিত হয়। বীরভূম জেলার সদর শহর সিউড়ির নিকটবর্তী তাঁতিপাড়া রেশম ও তসর শাড়ির জন্য বিখ্যাত। এছাড়াও মল্লারপুরের নিকটবর্তী বশোয়া-বিষ্টুপুরে তসরের শাড়ি এবং কীর্ণাহারে ফুটিসাঁকোর নিকটবর্তী বেণীনগর খাদি শাড়ি তৈরির জন্য খ্যাতি লাভ করেছে। মানুষের দৈনন্দিন চাহিদা মেটানোর জন্য খাদ্য ও বাসস্থানের সঙ্গে অপরিহার্য উপাদানরূপে বস্ত্রের প্রয়োজন। খালি পেটে একবেলা থাকা গেলেও বস্ত্র ছাড়া একদণ্ড থাকা সম্ভব নয়। তাই প্রাত্যহিক জীবনে বস্ত্রের চাহিদা সর্বাগ্রগণ্য। এই প্রয়োজনের নিরিখেই গড়ে উঠেছিল বস্ত্রবয়ন বা তাঁতশিল্পগুলি।

এখন আমি ময়ূরাক্ষী নিকটবর্তী অঞ্চলের দুটি গ্রামের তাঁতিদের তাঁতশিল্পের বিবরণ ও তাঁদের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটের উপর আলোকপাতের প্রয়াস করেছি। আমার এই নিবন্ধটি ক্ষেত্রসমীক্ষাভিত্তিক। এই অঞ্চলে বসবাস করার ফলে তাঁতি সম্প্রদায়ের জীবনপ্রণালী পর্যবেক্ষণ করি, তারই ফলশ্রুতি আমার এই নিবন্ধটি। এই অঞ্চলের দুটি গ্রামকে আমার সমীক্ষার স্থান হিসাবে নির্বাচন করেছি। গ্রাম দুটি সাঁইথিয়া থানার অন্তর্গত ভালদা ও চাঁদপুর গ্রাম। তথ্যদাতাদের নাম নিম্নরূপ—

১. তথ্যদাতা : নিখিল নন্দী, বয়স : ৪৫ বছর, পেশা : তন্তুবায়, লিঙ্গ : পুং, গ্রাম : চাঁদপুর, পো. : দেওয়াশ, থানা : সাঁইথিয়া, জেলা : বীরভূম, কর্মজীবনের অভিজ্ঞতা : ২৫ বছর, তথ্যসংগ্রহের তারিখ : ১৮/০৩/২০২০

২. তথ্যদাতা : রীনা দেবনাথ, বয়স : ৪০ বছর, পেশা : তন্তুবয়ন, লিঙ্গ : স্ত্রী, গ্রাম : ভালদা, পো. : দহিড়া, থানা : সাঁইথিয়া, জেলা : বীরভূম, কর্মজীবনের অভিজ্ঞতা : ২২ বছর, তথ্যসংগ্রহের তারিখ : ২১/০৩/২০২০

ক্ষেত্রসমীক্ষায় প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সমীক্ষাটি নিম্নরূপ ____________________

- **উপকরণসমূহ ও তাঁত বয়ন পদ্ধতি**

তাঁতশিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় প্রধান উপাদান হলো তন্তু বা সুতো। সুতো মূলত কারখানায় তৈরি হয়। ক্ষেত্রসমীক্ষায় জানতে পারি, বীরভূমের এই তাঁতশিল্পীগণ বাজার থেকে কখনও মহাজনদের কাছ থেকে অগ্রিম সুতো বাড়িতে নিয়ে আসেন। এই সুতো প্রধানত নবদ্বীপ বা শান্তিপুর অঞ্চল থেকেই আসে। তাঁতশিল্পীরা সুতো নিয়ে আসার পর তাকে মজবুত ও টেকসই করে তোলার জন্য সুতোতে 'মাড়' করে নেন। একে 'সুতো ভাতানো' বলা হয়। সুতোকে ভাত দিয়ে মাখানো হয় বলে হয়তো এরকম নামকরণ হয়েছে। মাড় তৈরির কাজে ভাত ছাড়াও সাবু, খই ইত্যাদি ব্যবহার করে থাকেন শিল্পীরা। সুতো ভাতানোর কাজ সম্পন্ন হলে 'চরকা-চরকি' দিয়ে সুতো কাটা এবং রোল করা হয়। সেগুলিকে 'ববিন' অথবা 'ছিটে বা ললি'তে রোল করে রাখা হয়। চরকার 'টোকো দণ্ডে' ললি বা 'ববিন'-এ রোল হয়ে গেলে তাঁতযন্ত্রে সুতোগুলি কুণ্ডলী আকারে টানটান করে প্রথমে 'ব বা ঝাঁপ'-এ পরে 'শানা'তে যথাক্রমে একটি ও দুটি করে সুতো প্রবেশ করিয়ে তাঁতযন্ত্রে ঝোলানো হাতল টেনে সুতো জড়ানো 'মাকু' (Spindle) আড়াআড়িভাবে ছোটানো হয়।

একইসঙ্গে পায়ে ঝাঁপটেপা ও ডানহাতে হাতুড়ি এবং বাম হাতে শানার সঙ্গে যুক্ত কল-এর মাধ্যমে সুতোর খেইগুলি পাশাপাশি রেখে 'টানাপোড়েন'-এর সাহায্যে বয়ন শুরু হয়। 'টানা' হলো লম্বালম্বি বা দৈর্ঘ্যর সেলাই আর 'পোড়েন' হলো আড়াআড়ি বা প্রস্থের সেলাই। পা দিয়ে 'ঝাঁপ'কে ওঠা নামানোর পদ্ধতিকে 'পারাপারি' বলা হয়ে থাকে। তাঁতযন্ত্রে দু'পাটি 'ঝাঁপ' থাকে যা সুতো দিয়ে তৈরি, একে 'খেও' বলা হয়। আর একপাটি 'শানা' থাকে যা ধাতু নির্মিত আয়তাকার ও ছিদ্রযুক্ত হয়, এতে সুতো প্রবেশ করিয়ে পর্যায়ক্রমে বয়ন কাজ সম্পন্ন হয়। উৎপাদিত বস্ত্র কাষ্ঠ নির্মিত গোলাকার নাতা অংশে রোল করে গুটিয়ে রাখা হয়।

আর এর বিপরীতে থাকে 'বালনরাজ' একে 'পেচা' বলা হয়। এদের একত্রে 'নাতা-পেচা' কিংবা বালনরাজ-কোলনারাজ বলা হয়ে থাকে। বয়ন সম্পূর্ণ হলে তা 'নাতা' থেকে অপসারণ করে বাজারমুখী করে তোলা হয়। উল্লেখ্য যে, তাঁতশিল্পে প্রযুক্ত বিভিন্ন যন্ত্রের এই বিচিত্র নাম মূলত নদিয়া জেলার নবদ্বীপ বা শান্তিপুর অঞ্চলের পারিভাষিক বা আঞ্চলিক নামকরণ দ্বারা প্রভাবিত। এই অঞ্চলেও সেই নামগুলি অবিকৃতভাবে ব্যবহৃত হয়।

- **বস্ত্র প্রস্তুতিতে প্রয়োজনীয় সুতোর পরিমাপ**

তাঁতযন্ত্রের ঝাঁপ বা 'শানা'র পরিমাপ অনুসারে সেই মাপের বস্ত্র বা শাড়ি তৈরি হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে শাড়ির বহর বা প্রসার নির্ভর করে তাঁতযন্ত্রের 'ব' এবং শানার উপর। এই 'ব' বা শানাতে ব্যবহৃত সুতোর নির্দিষ্ট পরিমাপ ও একক আছে। এক্ষেত্রে সুতোর পরিমাপ বস্ত্র অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। যেমন—১৬০০, ১৮০০, ২২০০ একক পরিমাপ সুতো শানা এবং 'ব'-তে ব্যবহৃত হয়। বারো হাত মাপের একটি শাড়ি প্রস্তুত করতে ১৮০০ 'ব' এবং ৩৬০০ 'শানা' পরিমাণ সুতো প্রয়োজন হয়। উল্লেখ্য যে, বস্ত্র তৈরির সময় শানাতে 'ব'-এর দ্বিগুণ পরিমাপ সুতো প্রবেশ করানো হয়। প্রয়োজন অনুসারে তাঁতিরা বিভিন্ন আয়তন বা বহরের শাড়ি ইত্যাদি বস্ত্র তৈরি করেন। অনেকে আবার শাড়িতে নানা রঙিন সুতোর ব্যবহার ও নকশা তৈরি করেন। নকশা তৈরি করতে 'কানটাকুর' নামে একপ্রকার যন্ত্র ব্যবহৃত হয়। তাঁতশিল্পীরা শাড়ি আদি বস্ত্রে ব্যবহৃত সুতোর পরিমাপকে তাদের পরিভাষা অনুযায়ী পরিমাপ করে বস্ত্র উৎপাদন করেন। এই পরিমাপগুলো হলো—পাঁচ গুছিতে হয় এক পলা। এরকম দশ পলাতে হয় এক মোরা। দেড় মোরা সমান এক টানা। একটি বারো হাত মাপের শাড়ি তৈরি করতে দেড় মোরা টানা ও এক মোরা পোড়েনের প্রয়োজন হয়। ছোটো দ্রব্যের ক্ষেত্রে প্রয়োজন অনুপাতে সুতোর রোল ব্যবহৃত হয়।

- **উৎপাদিত বস্ত্রসমূহ**

তাঁতের শাড়ি, জামদানি শাড়ি, পাঞ্জাবির পিস, ধুতি, সাদা থান কাপড়, কাঁথা সেলাই শাড়ি, চুড়িদারের পিস, বালুচরি তাঁত শাড়ি, বিয়ের বেনারসি ইত্যাদি।

- **বিভিন্ন প্রকার তাঁতবস্ত্র ও তার বিবরণ**

তাঁত শাড়ি : এই প্রকার শাড়ি তৈরিতে বিভিন্ন রঙিন সুতো ব্যবহৃত হয়। এই শাড়ি কখনো এক রঙের হয় আবার কখনো নকশাপেড়ে হয়ে থাকে। সর্বত্রই এই তাঁত শাড়ির

প্রচলন লক্ষিত হয়। পূজার্চনা থাকে শুরু করে দৈনন্দিন পরিধানের কাজে এই শাড়ি ব্যবহৃত হয়।

জামদানি : বিশেষ নকশা দ্বারা তৈরি। এতে নিপুণ হস্তের কারুকার্য লক্ষিত হয়। এর জনপ্রিয়তা সর্বাধিক। উৎসব, অনুষ্ঠান ইত্যাদি কাজে এই ধরনের শাড়ি ব্যবহৃত হয়।

পাঞ্জাবির পিস : মূলত ছেলেদের জন্য নির্মিত। এক্ষেত্রে রঙিন সুতো এবং নকশা বা হাতের কারুকার্য ব্যবহৃত হয়। এতে নানা ফুল, প্রাণি ইত্যাদির নকশা আঁকা হয়। একটি কাপড়ে মোটামুটি ৪-৫ টি পাঞ্জাবির পিস তৈরি হয়ে থাকে। একটি কাপড় মোটামুটি ৩৬ হাত প্রসারের হয়।

ধুতি : এটিতে মূলত একরঙা ও সাদা সুতো ব্যবহৃত হয়। এতে নকশাযুক্ত পাড় ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বিবাহ, পূজাদি কর্মে এর ব্যবহার লক্ষিত হয়। মূলত ছেলেরাই এগুলি পরিধান করে।

সাদা থান : এটি একরঙা সাদা সুতো দিয়ে নির্মিত। এতে প্রধানত নকশা থাকে না। বিধবা ও বয়স্করা এই ধরনের বস্ত্র পরিধান করে থাকেন।

কাঁথা সেলাই শাড়ি : প্রধানত নিম্নমানের সাদা বা রঙিন সুতো দিয়ে এই ধরনের শাড়ি তৈরি হয়। এগুলি মূলত লেপ, কাঁথা তৈরির কাজে ব্যবহৃত হয়। এর দাম অপেক্ষাকৃত কম হয়।

চুড়িদারের পিস : মূলত মেয়েদের জন্য এগুলি নির্মিত হয়। এক্ষেত্রে সাদা বা রঙিন সুতো ব্যবহৃত হয়। কখনো বা স্টিচের কাজ করে সৌন্দর্যায়নের জন্য নানা কারুকার্য বা নকশা আঁকা হয়। পাঞ্জাবির মতো একটি বড়ো কাপড়ের পিস থেকে ২-৩টি চুড়িদারের পিস তৈরি হয়।

বালুচরী তাঁত : এটি উজ্জ্বল রঙিন সুতোর তৈরি। এতে নিপুণ হস্তের কারুকার্য আঁকা হয়ে থাকে। এর জনপ্রিয়তা বিশেষ লক্ষিত হয়। পুজো-অনুষ্ঠানাদিতে এই প্রকার শাড়ির প্রচলন লক্ষ করা যায়।

বেনারসি : এগুলিও রঙিন ও নকশাযুক্ত সুতোর তৈরি। প্রধানত বিবাহের প্রয়োজনে এই প্রকার শাড়ি ব্যবহৃত হয়। এর সুতো উন্নতমানের হয় এবং ওজনে ভারি হয়ে থাকে।

- **উৎপাদিত দ্রব্যের বাজারদর**

বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তাঁতশিল্পীরা মহাজনদের কাছ থেকে অগ্রিম সুতো বা পয়সা নিয়ে বস্ত্র বয়নের কাজ শুরু করেন। তাই উৎপাদন শেষে উৎপাদিত দ্রব্যগুলি মহাজনদের হাতেই তুলে দিতে হয়। মহাজনেরা সেগুলি লাভের অঙ্কে চড়া দামে বিক্রি করেন। তবে যাদের আর্থিক সংগতি আছে তারা বাজার থেকে সুতো নিয়ে এসে শাড়ি তৈরি করেন এবং সেই অনুপাতে বিক্রি বা বাজারজাত করেন। সুতোর গুণমান, বহর বা দৈর্ঘ্য অনুসারে কিংবা নকশা বা কারুকার্য অনুযায়ী বিভিন্ন দ্রব্যের বাজারমূল্য বিভিন্ন রকমের হয়। নীচে কয়েকটি উৎপাদিত

দ্রব্যের বাজারমূল্য দেওয়া হলো—

১. তাঁত শাড়ি : ৫০০-৩০০০ টাকা
২. জামদানি : ১২০০-৪০০০ টাকা
৩. পাঞ্জাবির পিস : ২৫০-৩০০ টাকা
৪. ধুতি : ২০০-৩৫০ টাকা
৫. চুড়িদারের পিস : ৩০০-৪০০ টাকা
৬. বেনারসি : ৮০০-৩০০০ টাকা ইত্যাদি।

প্রসঙ্গত বলা চলে, একদিনে একটি শাড়ি বোনা যায় আবার কখনো একটি শাড়ি তৈরি করতে চার-পাঁচ দিনও সময় লেগে যায়। মূলত উন্নতমানের সুতো ও নকশাধর্মী শাড়ি ইত্যাদি তৈরি করতে চার-পাঁচ দিন সময় লেগে থাকে। সেক্ষেত্রে বাজারদরও সমানুপাতিক হয়।

● **বর্তমান চাহিদা ও অর্থনীতিতে এর প্রভাব**

আধুনিক যুগে উপনীত হয়েও তাঁতশিল্প অতীত ঐতিহ্যের প্রাচীন রীতি অনুবর্তন এখনো সমাজে লক্ষিত হয়। তাই বর্তমানে তাঁতবস্ত্র বা তাঁতের শাড়ির চাহিদাও ব্যাপক। বীরভূমের তাঁতশিল্পী নিখিল নন্দী মহাশয়ের মতে—‘শাড়ির রাজা এই তাঁত শাড়ি’। পূর্বসূরীদের হাত ধরে তাঁত বস্ত্র আজও ভদ্রতা-শুদ্ধতার সঙ্গে সাদরে গৃহীত হয়।

বর্তমান ভারতবর্ষের দিকে লক্ষ রাখলে দেখা যায় ভারতের মতো অনুন্নত কৃষিপ্রধান দেশে তাঁত শিল্পের স্থান অর্থনীতিতে দ্বিতীয়, কৃষির পরই। তাঁতবস্ত্রের উত্তরোত্তর চাহিদা বৃদ্ধি এবং এর বাজারদরের মাত্রাগত সামঞ্জস্য সুষ্ঠু স্থানে অবস্থান করায় তাঁতিরা এই শিল্পকে সাদরে বরণ করে নিয়েছেন, যা মানুষকে অর্থনীতিতে সুদৃঢ় এবং স্বনির্ভর করে তুলেছে। দক্ষতা ও কর্মনিপুণতার সঙ্গে সংযুক্ত তাঁতশিল্পীরা এর মাধ্যমে সহজেই পরিবার জীবন পরিচালনার রসদ সংগ্রহে সক্ষম হতে পারেন। এই পেশায় নিযুক্ত একজন তাঁতশিল্পী দৈনিক আড়াইশো থেকে চারশো টাকা উপার্জন করতে সমর্থ হয়।

সামগ্রিক বিশ্লেষণ প্রেক্ষিতে বলা চলে, লোকসংস্কৃতির অঙ্গনে তাঁতশিল্প উল্লেখযোগ্য এক লোকশিল্প। গ্রাম-বাংলার লোকসম্প্রদায়গণ বিশেষত তাঁতশিল্পীরা এই কর্মপ্রবাহকে সচল ও প্রাণবন্ত করে তুলেছেন নিজেদের কর্মদক্ষতা ও অসাধারণ নৈপুণ্যের জাদুকাঠিতে। যদিও অতীতে তাঁতিরা জমিদার মহাজনদের জাঁতাকলে নিষ্পেষিত হয়ে সঠিক পারিশ্রমিক বা মূল্য পেতেন না, কিন্তু পরবর্তীতে এই অবস্থার উত্তরণ ঘটেছে। তাঁতবস্ত্রের উত্তরোত্তর চাহিদা বৃদ্ধি এবং সঠিক মূল্যায়নের জন্য তাঁতশিল্পীরা এই শিল্পে সাগ্রহে মনোনিবেশ করেছেন। নিত্য নতুন বস্ত্র উৎপাদনের মাধ্যমে এই শিল্পকে অগ্রগতি দিচ্ছেন। ফলে দেশ উৎপাদনশীল ও অর্থনীতিতে উন্নততর হয়ে উঠতে সক্ষম হচ্ছে। একইসঙ্গে উল্লেখ্য যে, তাঁত যেহেতু একটি

ঘরোয়া কুটির শিল্প তাই মহিলারাও এই কাজে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে থাকে। তারাও আত্মনির্ভর ও স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে উঠতে সমর্থ হয়। পৌরাণিক বা আবহমানকাল ধরে মেয়েরাও যে এই কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিল তা আজও নানা ছড়ায় ও প্রবাদে বা ধাঁধায় প্রতিফলিত হতে দেখা যায়। তার দু-একটি নিদর্শন তুলে ধরলাম—

১. এক যে ছিল চাঁদের কোণায় চরকা কাটা বুড়ি।
পুরাণে তার বয়স লেখে সাতশো হাজার কুড়ি॥
মিহি সুতোয় জাল বোনে সে হয় না বুনন সারা।
পণ ছিল তার ধরবে জালে লক্ষ হাজার তারা॥

২. চাঁদের বুড়ি চরকা থামায় হারায় সুতোর খেও।' (ছড়া)

এখনো আমরা কথায় কথায় উচ্চারণ করি 'চাঁদের বুড়ি চরকা কাটা' কিংবা 'নিজের চরকায় তেল দে' ইত্যাদি প্রবাদগুলিকে। যা অতীত ঐতিহ্যবাহী তাঁতশিল্পের পরিচয় বহন করে। তাছাড়া তাঁতকে ঘিরে বেশ কিছু ধাঁধাও লোকসমাজে প্রচলিত আছে। তারই একটি—

সারাদিন ছটফটানি, ঠুকি শুধু মাথা।
তাইতে তুমি কোঁচা দোলাও, মাথায় নিয়ে ছাতা॥

এর উত্তর হচ্ছে : তাঁতযন্ত্র।

সারাদিন বহু পরিশ্রম ও ছোটাছুটি করে তাঁতি তাঁতযন্ত্রে কাপড় বুনে থাকে তবেই সেই কাপড় পড়ে অভিজাত সম্প্রদায় আভিজাত্যের গুণে বহু প্রসার করে কোঁচা দুলিয়ে মাথায় ছাতা চলতে পারেন। এই আক্ষেপ শুধু তাঁতযন্ত্রের নয়, সমগ্র তাঁতি সম্প্রদায়ের, সেই বার্তাই এখানে ধ্বনিত হতে শোনা যায়।

তথ্যের সন্ধানে

১. নিখিল নন্দী, বয়স : ৪৫ বছর, পেশা : তন্তুবয়ন, লিঙ্গ : পুং, গ্রাম : চাঁদপুর, পোস্ট: দেওয়াশ, থানা : সাঁইথিয়া, জেলা : বীরভূম, তথ্যসংগ্রহের তারিখ : ১৮/০৩/২০২০
২. রীনা দেবনাথ, বয়স : ৪০ বছর, পেশা : তন্তুবয়ন, লিঙ্গ : স্ত্রী, গ্রাম : ভালদা, পোস্ট: দহিড়া, থানা : সাঁইথিয়া, জেলা : বীরভূম, তথ্যসংগ্রহের তারিখ : ২১/০৩/২০২০

গ্রন্থপঞ্জি

১. অচিন্ত্য বিশ্বাস : 'লোকসংস্কৃতিবিদ্যা', অঞ্জলি পাবলিশার্স, কলকাতা
২. সেখ একরামুল হোসেন : 'ময়ূরাক্ষী তীরবর্তী অঞ্চলের লোকসংস্কৃতি', লোকভারতী পাবলিকেশন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ৩০ নভেম্বর ২০১৯

❑ মৃৎশিল্প

লোকশিল্পচর্চায় মাটির পুতুল

শুভঙ্কর মণ্ডল

মাটির পুতুল বৈচিত্র্যময় লোকশিল্প ও লোকসংস্কৃতিচর্চার একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। লোকশিল্পের জন্ম প্রয়োজনের নিরিখে হলেও শিল্পীর শৈল্পিক দক্ষতায় ও নান্দনিক দৃষ্টিভঙ্গির আশীর্বাদে সে যেন পরিণত হয়ে ওঠে। প্রকৃতির স্নেহধন্য, পৃথিবীর বুকে লালিত হওয়া এই মানুষ একসময় মাটি ও পাথরকেই তার সৃষ্টির প্রথম উপাদান হিসেবে বেছে নিয়েছিল। সেই সুপ্রাচীনকাল থেকে সময়-প্রবাহে চলতে চলতে পারিপার্শ্বিক পরিবর্তনশীল সমাজের দ্বারা মানুষ সর্বদাই প্রভাবিত হয়ে এসেছে। তার প্রভাব পরেছে স্রষ্টার সৃষ্টিতেও। মাটির পুতুল যার একটি অন্যতম উদাহরণ। ছেলে ভোলানো এই মৃৎ-পুতুলগুলি শুধুমাত্র যে শিশু-মনোরঞ্জনে সহায়ক তাই নয়, বরং এগুলি শিল্পীর পারিপার্শ্বিক অঞ্চলের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ভৌগোলিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয়, বিনোদন ইত্যাদি নানাদিকের বর্ণময় চিত্রকে তুলে ধরে। কখনও কখনও এর সঙ্গে যুক্ত হয় আবেগ, বিশ্বাস, সংস্কার, লৌকিক-অলৌকিক-জাদু সম্বন্ধীয় বিষয়সমূহ। কখনও তারা কোনো এক প্রাচীন সভ্যতার ঐতিহাসিক সাক্ষীস্বরূপ হয়ে ওঠে। যেমন, প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্যের ফলে সিন্ধু সভ্যতার নিদর্শনস্বরূপ প্রাপ্ত মৃৎ-পুতুল ও খেলনাগুলির কথা বলা যায়। কখনও আবার তা একটি নির্দিষ্ট সময়ের ও একটি নির্দিষ্ট সমাজের গল্প বলে। কৃষ্ণনগরের বাস্তবধর্মী মাটির পুতুলে যেমন শ্রমজীবী মানুষের কর্মনির্ভর জীবনধারা উদ্ভাসিত হয় তেমনই জয়নগর-মজিলপুরের পুতুলে ফুটে ওঠে ব্রিটিশপর্বের বাবু-বিবি সংস্কৃতি। হাওড়ার রানিপুতুলের মধ্যে অনেক গবেষক খুঁজে পান ইংল্যান্ডেশ্বরী রানি ভিক্টোরিয়ার প্রতিচ্ছবি'। আবার কালীঘাট, কুমোরটুলি, শান্তিপুর প্রভৃতি অঞ্চলের পুতুল-সমাজে স্থান পায় সমকালের খুঁটিনাটি। এক্ষেত্রে বেলুনওয়ালা, আইসক্রিম-বিক্রেতা, সাইকেল-আরোহী, রন্ধনরত মহিলা, ছিপধারী বাবু, তারকেশ্বর যাত্রী, ট্রাফিক-পুলিশ ইত্যাদি বিষয়গুলিও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

'পুতুল' শব্দটির আভিধানিক অর্থ 'প্রধানত খেলার সামগ্রীরূপে নির্মিত মানুষ ও জীবজন্তুর

প্রতিমূর্তি।'[২] তবে এই ব্যাখ্যা সামগ্রিকার্থে গ্রহণযোগ্য হলেও কিছুক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রমও ঘটে। কারণ পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে ঝুলন, জন্মাষ্টমী, ঘরন্দা প্রভৃতি উৎসব-পার্বণে এমন কিছু পুতুল নির্মিত হয়; যেখানে দেবদেবী, মানুষ ও অন্যান্য প্রাণির পাশাপাশি ঘর-বাড়ি, গৃহস্থালির নানাবিধ সামগ্রী, যানবাহন ইত্যাদিও থাকে। তবে এগুলিকে খেলনা বলাই শ্রেয়। আবার অনেক পুতুলের ক্ষেত্রে সংকরায়ন ও মিশ্র-উপস্থাপনাও চোখে পড়ে। মৃৎ-পুতুল সম্পর্কে বিধান বিশ্বাস বলেছেন—"পুতুলের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে আগে সে শিশুতোষ খেলনা তারপরে দেব ভাবনায় জারিত প্রতিমূর্তি। মাঝখানে ব্যবহারিক দ্রব্যে তার ছাপ।"[৩]

● মাটির পুতুলের শ্রেণিবিভাগ ও পশ্চিমবঙ্গের মৃৎ-পুতুলচর্চা

ভারতবর্ষের মৃৎ-পুতুলকে স্টেলা ক্রামরিশ দু'ভাগে বিভক্ত করেছেন। যথা—কালোত্তীর্ণ এবং সময়োচিত। তারাপদ সাঁতরা স্টেলা ক্রামরিশ বর্ণিত এই বিভাজনের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন যে, সময়োচিত পুতুলের মধ্যে একটি সমকালীন বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হবে এবং তাকে একটি ঐতিহাসিক পর্যায়ক্রমে নির্দিষ্ট করা যাবে। অপরপক্ষে কালোত্তীর্ণ পুতুলের সঙ্গে প্রাক সিন্ধু সভ্যতার পোড়ামাটির পুতুলের সাদৃশ্য থাকবে।[৪] বাংলার ঘরে ঘরে সেই সুপ্রাচীনকাল থেকে মা-ঠাকুরমারা শিশুদের ভোলাতে অথবা ব্রত-পার্বণের অনুষঙ্গ রূপে হাতে টিপে-ঠেসে যে মৃৎ-পুতুলের সৃষ্টি করে আসছেন সেগুলিকে এই কালোত্তীর্ণ পুতুলের পর্যায়ভুক্ত করা যায়। আবার নদীয়ার কৃষ্ণনগরের ঘূর্ণি, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার জয়নগর, মজিলপুর, বারুইপুর প্রভৃতি অঞ্চলের মাটির পুতুলকে সময়োচিত পুতুলের দলভুক্ত করা যেতে পারে। বিষয়গত দিক থেকে মৃৎ-পুতুল বৈচিত্র্যে ভরপুর। যথা—মনুষ্যাবয়বাকৃতি, দেবদেবীকেন্দ্রিক, পশুপাখি, সংকর প্রজাতির, মিশ্র বিষয়ধর্মী ও অন্যান্য। আবার ধর্মীয় প্রভাবের নিরিখে এগুলি দু'প্রকার।

১. ধর্মীয় প্রভাবান্বিত : যেমন, শাস্ত্রীয় ও লৌকিক দেবদেবীর মূর্তি-পুতুল এবং মানসিক পূরণের নিমিত্তে দেবস্থানে উৎসর্গীকৃত দেবতা অথবা পশুপাখির ছোটো ছোটো প্রতিমূর্তি বা ছলন।

২. ধর্মীয় প্রভাবমুক্ত : যেমন—সামাজিক বিষয়ধর্মী পুতুল, খেলনা-পুতুল, পশুপাখি, প্রতিকৃতিমূলক মূর্তি-পুতুল ইত্যাদি।

উদ্দেশ্যগত ও ব্যবহারিক দিক থেকেও মৃৎ-পুতুলকে কয়েকটি বিভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে। যেমন—খেলার পুতুল, প্রতিমা ও ছলন, লৌকিক-অলৌকিক-জাদু-সংস্কার ইত্যাদি ক্ষেত্রে ব্যবহৃত পুতুল, সংরক্ষিত বস্তুরূপে, গৃহসজ্জার পুতুল ইত্যাদি। পদ্ধতিগত দিক থেকে মাটির পুতুল মোটামুটি পাঁচ প্রকার।

প্রথমত॥ হাতে তৈরি টেপা-পুতুল। এক্ষেত্রে সম্পূর্ণ হাতের দক্ষতায় ও আঙ্গুলের সহায়তায় নিরেট পুতুলগুলি গড়ে ওঠে। সহজ সরল উপস্থাপনাই এই পুতুলের প্রধান বৈশিষ্ট্য। উদাহরণস্বরূপ মেদিনীপুরের ষষ্ঠীপুতুল, মুর্শিদাবাদের কাঁঠালিয়ার পুতুল, বাঁকুড়ার পাঁচমুড়ার রেলপুতুল ও থানে উৎসর্গীকৃত ছোটো ছোটো হাতি-ঘোড়া প্রভৃতির কথা বলা যেতে পারে[৫]। এগুলি একবর্ণীয় ও রঙিন উভয়ই হয়।

দ্বিতীয়ত॥ ছাঁচে নির্মিত পুতুল। এইধরনের পুতুলের ক্ষেত্রে শিল্পী সর্বাগ্রে একটি মাটির

মূর্তি অথবা পুতুল বানিয়ে সেটি থেকেই কাঙ্ক্ষিত ছাঁচটি গড়ে নেন। এই ছাঁচ সাধারণত দু'ধরনের—একখোল এবং দু'খোল বিশিষ্ট ছাঁচ।

আগে মুলত মাটি দিয়ে ছাঁচ বানানো হতো। বর্তমানে এগুলির স্থায়িত্ব বৃদ্ধির জন্য বেশিরভাগ ছাঁচই প্লাস্টার-অফ-প্যারিসের মাধ্যমে নির্মিত হয়। ছাঁচে পুতুল নির্মাণের পর তা রোদে শুকিয়ে নিয়ে প্রয়োজন মতো ভাটিতে পুড়িয়ে নেওয়া হয়। তবে কাঁচামাটির পুতুল পোড়ানো হয় না। পুতুলে রং করার পূর্বে খড়িমাটির প্রলেপ দেওয়া হয়। রং ও খড়িমাটির বন্ধক হিসেবে তেঁতুলবিচির আঠা, বেলের আঠা ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়। পুতুলগুলিকে রং করার জন্য বিভিন্ন ভেষজ রং, বাজারজাত সস্তার গুঁড়ো রং থেকে শুরু করে, বাজারের চাহিদানুযায়ী বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক রং, স্প্রে-রং ইত্যাদিও ব্যবহার করা হয়। কলকাতার বিধাননগরের দক্ষিণদাঁড়ি, কালীঘাট, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার জয়নগর, মজিলপুর, শিখরবালি, মথুরাপুর প্রভৃতি অঞ্চলের মৃৎ-পুতুল এই ছাঁচের পুতুলের একেকটি অনন্য উদাহরণ।

আবার অনেক পুতুল ছাঁচে তৈরি হলেও সেগুলিতে টেপা-পুতুলের ছাপ থেকেই যায়। যেমন, হাওড়ার রানিপুতুল, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার মেয়েপুতুল প্রভৃতি। এগুলি সম্পূর্ণ ছাঁচে তৈরি হলেও এগুলির হাত ঠিক টেপা-পুতুলের মতো। দেহ থেকে খানিকটা বাইরের দিকে বর্ধিত।

তৃতীয়ত॥ চাকে তৈরি পুতুল। বাঁকুড়ার পাঁচমুড়া, সেন্দড়া, সোনামুখী, পশ্চিম মেদিনীপুরের চন্দ্রকোনা, বেলিয়া প্রভৃতি অঞ্চলের কুমোরের চাকে তৈরি ঐতিহ্যবাহী হাতি-ঘোড়া, ষাঁড়, বাঘ ইত্যাদি এই পুতুলের সর্বোৎকৃষ্টতম উদাহরণ।[৬]

চতুর্থত॥ মিশ্র মাধ্যমে তৈরি পুতুল। এক্ষেত্রে পুতুলের কিয়দংশ চাকে, কিয়দংশ ছাঁচে কিংবা কিয়দংশ হাতে টিপে তৈরি করা হয়। যেমন, কুমোরটুলিতে গণগৌর ব্রত উপলক্ষ্যে যে পুতুলগুলি বানানো হয় সেগুলির মুখমণ্ডলসহ দেহকাণ্ড এবং হাতগুলি আলাদা আলাদা ভাবে ছাঁচে তৈরি করে পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়।

আহিরীটোলার প্রজাপতি সম্প্রদায়ের কিছু শিল্পীও এইভাবে পুতুল বানিয়ে থাকেন। আবার মেদিনীপুরের দেওয়ালী পুতুলগুলির[৭] নিম্নাংশ কুমোরের চাকায় তৈরি হলেও উর্ধ্বাংশ কখনও হাতে, আবার কখনও ছাঁচে তৈরি করা হয়। একইভাবে এই পুতুলের মাথার ও হাতের প্রদীপগুলি আলাদা ভাবে বানিয়ে নিয়ে সেগুলি পুতুলের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়। ফলে এগুলি দীপলক্ষ্মী নামেও বিশেষ পরিচিত।

পঞ্চমত॥ কাঠামোর মূর্তি-পুতুল। কাঠামোয় তৈরি দেব-দেবীর প্রতিমাগুলিই এই শাখার কেন্দ্রীয় চরিত্র। এক্ষেত্রে একটি আরমেচারে খড় বেঁধে তার উপর মাটির প্রলেপের সাহায্যে প্রতিমার প্রাথমিক আদল তৈরি করা হয়। চূড়ান্ত কাজগুলি মিহি মাটির প্রলেপে সম্পন্ন হয়। প্রতিমাগুলিকে প্রয়োজনানুসারে রঞ্জিত করার পর রঙিন কাপড়, শোলার সাজ, জড়ির সাজ ইত্যাদির সাহায্যে অলংকৃত করা হয়। অনেক পটুয়াশিল্পী আবার সম্পূর্ণ মাটির সাজেই মনোমুগ্ধকর প্রতিমা সৃষ্টি করে থাকেন। এই ধরনের প্রতিমার ক্ষেত্রে তার মুখমণ্ডল, হাতপায়ের আঙ্গুল, মাটির সাজ ইত্যাদি ছাঁচে বানিয়ে নেওয়া হয়। কুমোরটুলি এবং কৃষ্ণনগরের শিল্পীদের তৈরি প্রতিমাগুলি এই পর্যায়ের সর্বোৎকৃষ্ট উদাহরণ।

বর্ণানুযায়ী মৃৎ-পুতুলকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করা যায়।

প্রথমত, রঙিন পুতুল।

দ্বিতীয়ত, একবর্ণীয় পুতুল। অনেকক্ষেত্রে পুতুল পোড়ানোর আগে এগুলির গায়ে বনকমাটির প্রলেপ দেওয়া হয়। বনকমাটির ব্যবহারের ফলে পোড়ানোর পর পুতুলগুলি লালচে বর্ণ ধারণ করে। আবার তাপমাত্রার তারতম্যের ফলে এগুলি কখনও বাদামি আবার কখনও কৃষ্ণবর্ণ হয়ে ওঠে। যেমন, বাঁকুড়ার হাতি-ঘোড়া ও অন্যান্য পুতুল।

তৃতীয়ত, দ্বি-বর্ণযুক্ত পুতুল, অর্থাৎ পুতুলকে রঞ্জিত করতে সর্বসাকুল্যে দু'টি রঙ ব্যবহৃত হবে। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার রাজপুর অঞ্চলের মৃৎশিল্পীরা হাতে টিপে একধরনের পিরের ঘোড়া বানিয়ে থাকেন। এগুলিতে খড়িমাটির প্রলেপ লাগানোর পর ভুসোকালি দিয়ে কয়েকটি রেখা টেনে অলংকরণ করা হয়।

চতুর্থত, বর্ণহীন পুতুল, অর্থাৎ পুতুলগুলিকে শুধুমাত্র মাটি দিয়ে গড়ে রোদে শুকিয়ে নেওয়া হয়। রং করা হয় না।

আবার বার্নিশের ভিত্তিতে মৃৎ-পুতুল দু'প্রকার। যথা, বার্নিশবিহীন ও বার্নিশযুক্ত। পুতুলের রঙের স্থায়িত্ব বৃদ্ধি করতে বার্নিশ ব্যবহৃত হয়। অনেকে বার্নিশ করার আগে অ্যারারুটের প্রলেপ লাগিয়ে নেন। যেমন, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার রামমাটি-গোপালনগরের শিল্পীরা এই পদ্ধতিতেই তাঁদের পুতুলে বার্নিশ করেন।

[illegible]

স্থিরতার ভিত্তিতে মাটির পুতুল ও খেলনাকে স্থির পুতুল, চলমান খেলনা-পুতুল ও দোদুল্যমান পুতুল—এভাবে ভাগ করা যেতে পারে। চলমান খেলনা-পুতুল বলতে চাকাওয়ালা পুতুল, খেলনা-গাড়ি, চাকাযুক্ত ঘোড়া ইত্যাদিকে বোঝায়। এগুলি কাঁচামাটি ও পোড়ামাটি দু'ধরনেরই হয়। মেদিনীপুর, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, হাওড়া, উত্তর চব্বিশ পরগনা, মালদহ, উত্তর দিনাজপুর প্রভৃতি জেলায় এইধরনের শিশুতোষ খেলনা তৈরি করা হয়। দোদুল্যমান পুতুলের মধ্যে সর্বাগ্রে আছে মাথা-নাড়ানো পুতুল। এগুলির মাথাটি স্প্রিং-এর সাহায্যে দেহের সঙ্গে যুক্ত থাকায় একটু হাওয়া অথবা একটু টোকা লাগলেই তা দুলতে থাকে। তবে এই পুতুল-পরিবারে প্রবীণরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। এছাড়া সুতোর সাহায্যে ঝুলিয়ে রাখা যায় এমন মাটির পাখির ঝাঁক, দড়ি বাঁধা মাটির ছোট ছোট পুতুল ইত্যাদির কথা বলা যায় যেগুলি গৃহসজ্জায় সহায়ক।

দেবদেবীর ছলন, চাকা লাগানো ঘোড়া ও মাথা-নাড়ানো বুড়ো পুতুল

● ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যগুলিতে মৃৎ-পুতুলচর্চা

উড়িষ্যার গঞ্জাম, কোরাপুট, নৌরঙ্গাপুর, পুরীসহ কয়েকটি জেলায় গোবরের জগন্নাথ-সুভদ্রা-বলরামসহ বিভিন্ন দেবদেবীর ও পশুপাখির পুতুল তৈরি করা হয়। সম্বলপুরের বারগড় জেলার বারপলিতে মৃৎশিল্পীরা 'খাপ্পার' নামে একধরনের টালি বানিয়ে থাকেন। এগুলির উপরে গোলাকার গড়নযুক্ত হনুমান, হাতি, ইঁদুর, কচ্ছপ ইত্যাদি প্রাণীর অভিব্যক্তিময় ত্রিমাত্রিক মূর্তি-পুতুল যুক্ত করা হয়। স্থানীয় বিশ্বাস যে, এই ধরনের পুতুলগুলি গৃহে সৌভাগ্য ও সমৃদ্ধি নিয়ে আসে। এছাড়া সোনপুরে 'লঙ্কাপুরী হনুমান' নামে একধরনের চতুষ্পদ বিশিষ্ট হনুমানের মূর্তি-পুতুল তৈরি করা হয়। কুম্ভকারের চাকে তৈরি এই পুতুলের নিম্নমুখী পা গুলিতে ছিদ্র করা থাকে। ভাদ্র অমাবস্যার লঙ্কাদহনোৎসবের শোভাযাত্রায় ওই ছিদ্রগুলিতে লাঠি ঢুকিয়ে, মূর্তিটিকে কাঁধে চাপিয়ে সারা গ্রামে ঘোরানো হয়।[৮]

ছত্তিশগড় সারগুজা ও রাইগড়ের গ্রাম্য মহিলারা তাঁদের গৃহের শোভা বর্ধনের জন্য ঘরের দেওয়ালের বাহ্যপরিসরে বিবিধ বর্ণময় আলঙ্কারিক রিলিফওয়ার্ক করে থাকেন। অনেক সময় দেওয়াল সাজানো অথবা শিশুর মনোরঞ্জনের জন্য তাঁরা কাঁচামাটির বর্ণোজ্জ্বল পুতুলও গড়ে থাকেন।[৯]

মধ্যপ্রদেশ ঝাবুয়া জেলার আলিরাজপুরের মৃৎশিল্পীরা তাঁদের পোড়ামাটির 'ঘোড়া' ও 'ধাবা' নামক গম্বুজাকৃতি ছোটো ছোটো পোড়ামাটির মন্দির নির্মাণের জন্য বিশেষ পরিচিত। এগুলি বাপদেব নামক স্থানীয় দেবতার থানে ছলন হিসাবে অর্পিত হয়।[১০] মাণ্ডলার বেশকিছু আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসব উপলক্ষ্যে পোড়ামাটির প্রতীকী মুখোশ ও নানারকমের পুতুলের ব্যবহার প্রচলিত আছে। মাণ্ডলার কোঙ্গিয়া, বিরদিয়া, রেওয়াই, মালবিয়া এবং সুঙ্গারে সম্প্রদায়ের কুমোরশিল্পীরা এই ধরনের ধর্মীয় পুতুল ও অন্যান্য বিষয়গুলি বানিয়ে থাকেন।[১১]

রাজস্থানের নাগৌরের মাণ্ডওয়া তহশিলে গণগৌর ব্রতোৎসবের উদ্দেশ্যে কাঠের পাশাপাশি ইশার-গোরার (হর-পার্বতী) মৃৎ-মূর্তিও শিল্পীরা বানান। এগুলির নিম্নাংশ চাকে ও ঊর্ধ্বাংশ হাতে টিপে তৈরি। এছাড়া জয়সলমীরের পোখারানের খেলনা ও পুতুল, উদয়পুরের রাজসামান্দ জেলার মোলেলার টেরাকোটা রিলিফ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।[১২]

মহারাষ্ট্রের পুনের ঔরঙ্গাবাদ, আহমেদনগর, নাগপুর, মুম্বাই শহরের ধারাবি প্রভৃতি অঞ্চলে গৃহস্থালির মাটির বাসনপত্রের পাশাপাশি ছোটো ছোটো পুতুল, দেব-দেবীর মূর্তি

ইত্যাদি তৈরি করা হয়। মহারাষ্ট্রের কৃষি-উৎসব 'ব্যায়েল-পোলা'তে উৎসবের প্রতীক স্বরূপ শিশুদের বর্ণময় মাটির ষাঁড় ও অন্যান্য পুতুল উপহার দেওয়ার রীতি বহুল প্রচলিত।[১৩]

উত্তরপ্রদেশের আলিগড়ের বুলন্দশাহ জেলার খুরজা ও লখনউ-এর ছিনহাটে সেরামিকের বাসনপত্র ছাড়াও নানারকমের সেরামিকের পুতুল ও খেলনা পাওয়া যায়। লখনউ-এর মাটির পাখি, ফলমূল ইত্যাদি বর্ণময় খেলনাগুলি একেকটি অভিনিবেশযোগ্য লোকশিল্পবস্তু। গোরক্ষপুর ও দেওরিয়া জেলায় চাকে ও হাতের সাহায্য নির্মিত পোড়ামাটির হাতি-ঘোড়ার সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়ার হাতি-ঘোড়ার বেশ মিল পাওয়া যায়। এগুলি সবই একবর্ণীয় এবং মানসিক চোকাতে দেবস্থানে উৎসর্গ করা হয়।[১৪] তবে অন্ধ্রপ্রদেশের অউরভিল্লেতে উৎসর্গীকরণের জন্য নির্মিত ঘোড়াগুলি একটু ব্যতিক্রমী। কারণ এগুলি বর্ণময়।[১৫] তামিলনাড়ুর বিভিন্ন গ্রামে গ্রাম-দেবতা আয়্যানারের মন্দিরগুলিতে পোড়ামাটির ছলন দেখতে পাওয়া যায়। যেমন, ঘোড়া (গ্রামাথু কুট্টীরাই), হাতি (আম্বারি ইয়ান্নাই), আয়্যানারের সেনাবাহিনী (ভিড়ান), আয়্যানারের এককমূর্তি ইত্যাদি। এগুলি বেশিরভাগই চাকে তৈরি, লোহিতবর্ণযুক্ত।[১৬] এছাড়া ছত্তিশগড়ের বাস্তারের কুম্ভকারের ঘোড়া-হাতি-বাঘ[১৭], বিহারের মধুবনীর দারভাঙ্গার আরোহীসহ হাতি-ঘোড়া[১৮], গুজরাটের ভাদোদরার তেজগড়, ছোটা উদয়পুর, দেবহাট প্রভৃতি অঞ্চলের ঘোড়া, সুরাতের ঘোড়া[১৯], অন্ধ্রপ্রদেশের চিত্তুর জেলার পালামনের ও মাদানাপাল্লিতে কুম্বারা সম্প্রদায়ের নির্মিত হাতি-ঘোড়া[২০] প্রভৃতিও যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য।

অন্ধ্রপ্রদেশের কোণ্ডাপাল্লী ও তামিলনাড়ুর তাঞ্জাভুরের নর্তকী, রাজা-রানি, বুড়ো-বুড়ি ইত্যাদি চরিত্রবিশিষ্ট দ্যোদুল্যমান পুতুলগুলি দক্ষিণী লোকশিল্প শৈলীর একেকটি হীরকতুল্য উপাদান। তাঞ্জাভুরের পুতুলগুলি 'তাঞ্জাভুর থালাইয়াত্তি বোম্মাই' নামে সর্বজনবিদিত। আলঙ্কারিক গুণসমৃদ্ধ এই পুতুলগুলি সেখানকার ঐতিহ্যময় আভিজাত্যের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত[২১]। এছাড়াও অসম, ত্রিপুরা, ঝাড়খণ্ড প্রভৃতি রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে কমবেশি মৃৎ-পুতুল তৈরি করা হয়।

এই মাটির পুতুলের মধ্য দিয়ে শিল্পীদের সৃজনশীলতা, তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি ও পর্যবেক্ষণ জ্ঞান সম্পর্কে যেমন একটি সম্যক ধারণা লাভ করা যায়, তেমনই এই ধরনের লোকশিল্প বস্তুগুলির মধ্য দিয়ে তাঁদের দৈনন্দিন জীবনযাপনের ধারাবিবরণীও উদ্ভাসিত হয়। লোকশিল্পবস্তু নির্মাণের নানাবিধ ঐতিহ্যবাহী জ্ঞান বংশপরম্পরায় এক শিল্পী হতে অন্য শিল্পীতে সঞ্চারিত হতে থাকে।[২২]

উৎসের সন্ধানে

১. শুভঙ্কর মণ্ডল : 'রানিপুতুল বা মেয়েপুতুল বাংলার লোকশিল্পের এক ঐতিহ্যবাহী ধারা', কৌলাল, স্বপন কুমার ঠাকুর সম্পাদিত, ই-ম্যাগাজিন, পূর্ব বর্ধমান, ২২ জুলাই ২০২০ http://bengali.koulal.com/raniputul-ba-meyeputul-banglar-lokshilper-ek-oitiyabahi-dhara/

২. সুভাষ ভট্টাচার্য সম্পাদিত : সংসদ বাংলা অভিধান, শিশু সাহিত্য সংসদ প্রা লি, কলকাতা, পুনর্মুদ্রিত ২০০২, পৃ. ৫২৫

৩. বিধান বিশ্বাস : 'বাংলার মাটির পুতুল', টেরাকোটা, বাঁকুড়া, ২০১৫, পৃ. ৩৪-৩৫
৪. তারাপদ সাঁতরা : 'পশ্চিমবঙ্গের লোকশিল্প ও শিল্পীসমাজ', লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, পুনর্মুদ্রিত ২০১০, পৃ.৪৫
৫. তদেব : পৃ. ৪৪-৫৩
৬. দীপঙ্কর ঘোষ : 'পশ্চিমবঙ্গের মাটির পুতুল', লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, পুনর্মুদ্রিত ২০১২, পৃ. ৩০
৭. তদেব, পৃ. ৭৯
৮. Aditi Ranjan : M P Ranjan (Eds.), Crafts of India Handmade in India, Council of Handicraft Development Corporations (COHANDS), New Delhi, Reprinted 2014, p.209-224
৯. Ibid., p.482-483
১০. Ibid., p.462
১১. Ibid., p.474-478
১২. Ibid., p.113-119
১৩ Ibid., p.448-456
১৪ Ibid., p.141-157
১৫. Ibid., p.308
১৬. Ibid., p.326
১৭. Ibid., p.490
১৮ Ibid., p.182-183
১৯. Ibid., p.436-438
২০. Ibid., p.296
২১. DH News Service. "Elegance in Motion." Deccan Herald, 2 Mar. 2013 www.deccanherald.com/content/316015/elegance-motion.html
২২. ইউটিউব সম্প্রচার : সুজয় কুমার মণ্ডল, 'লোকশিল্পের ঐতিহ্যময় জ্ঞান ও লোকশিল্পী সমাজের সাম্প্রতিক আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষিত', এডুকেশনাল অ্যান্ড কালচারাল স্টেশনের নিবেদন, ১১ই অক্টোবর ২০২০, সময় ১৯:০০টা https-youtu.be/tVsH7utFnbE

❑ **পাটশিল্প**

কালের প্রেক্ষাপটে হারিয়ে যাচ্ছে পাটি শিল্প

নিজামুদ্দিন সেখ

মুর্শিদাবাদ জেলা মূলত দুটি ভাগে বিভক্ত—রাঢ়ভূমি এবং বাগড়িভূমি। দুই এলাকার এক পরিচিত শিল্প হলো পাটি শিল্প। মুর্শিদাবাদ মূলত বেশিরভাগটাই গ্রামীণ এলাকা আর এই গ্রামীণ এলাকার প্রাকৃতিক পরিবেশে ঘেরা এক অপরূপ সৌন্দর্য বিরাজমান। সেই প্রকৃতির খেয়ালে আপনা থেকেই সবার অযত্নে তালবন খেজুর বনের সারির দেখা পাওয়া যায়। এরই পাশাপাশি নারকেল গাছের সারির দেখা পাওয়া যায়। এগুলো অনেকটা অবহেলায় বেড়ে ওঠে, তবু এর গুরুত্ব অনেক। এই পাটি শিল্পের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান নারকেল ও খেজুর গাছের পাতা। এছাড়াও আতার ছাল, খেজুরের ডালের কাঁচা অংশ দড়ি ইত্যাদি পাটি শিল্পের ক্ষেত্রে কাজে লাগে।

খেজুরের চিকন চিকন পাতা গাছ থেকে সংগ্রহ করে, রোদে শুকিয়ে তারপর খেজুরের ডাল থেকে পাতাগুলো সংগ্রহ করা হয়। পাতাগুলো ভালো করে বাছাইয়ের পর, একটি একটি পাতা ধরে ফালি ফালি করে চিরতে হয়, যাতে পাটি বুননের ক্ষেত্রে সুবিধা হয়। পাতার প্রস্থ অনুযায়ী এই ফালির কাজ করা হয়। একটি মোটা পাতা থেকে চারটি ও সরু পাতা থেকে দুটো ফালি বের করা হয়। তারপর পাটি শিল্পীর হাতের ধারণ ক্ষমতা অনুযায়ী, পাটি জো তুলে বুননের কাজ শুরু করা হয়। যেমন যেমন লম্বা হতে থাকে তেমন একটি গোল আকৃতির হিসেবে জড়িয়ে রাখা হয়, আঞ্চলিক ভাষায় এই জড়ানো পাটির অংশকে ভুড় বলা হয়। এক এক এলাকায় এক এক নামে পরিচিত, ডোমকল এলাকায় চাক বলা হয়, হরিহরপাড়া এলাকায় গেড় নামে পরিচিত এই পাটির ফালির অংশ।

খেজুরের পাটি গঠনগত ও গুণগত দিক থেকে নানা ভাগে ভাগ করা হয়। শীতল পাটি, মোটাপাটি, জয় বাংলা পাটি প্রভৃতি। কোনও কোনও পাটি শিল্পী খেজুরের পাতায় নানান রঙ দিয়ে পাটি বুননের সময় সাদা পাতার মাঝে মাঝে রঙ্গিন পাতা দিয়ে একটি নান্দনিক রূপ দেওয়ার চেষ্টা করে। এই পাটির যে লেচি বা ফালি তৈরি করা হয়, তাতে হাতের মাপ অনুযায়ী ১৩ পাতা, ৯ পাতা, ১১ কেউ কেউ আবার ১৭ পাতা দিয়ে ফালির প্রস্থের মাপ নির্ধারণ করে।

পড়ন্ত বিকেলে রাঢ়বঙ্গের মাটির চালা ঘরের দাওয়ায় বসে গিন্নিরা পাটি বুননের কাজ করে চলেছে এই চিত্র দেখা যায়। গেরস্তের বাড়িতে আসন হিসেবে কিংবা চৌকি বা খাটে বসতে দিতে এই পাটির ব্যবহার করা হয়। তবে গ্রামের মহিলাদের এ এক বিনোদনের মাধ্যমও

বলা যায়। নিজেদের প্রয়োজন অনুযায়ী এই পাটি তৈরি করেন তারা। কেউ ৫ হাত কেউ আবার ৬ হাত পাটি তৈরি করেন তারা। অনেকে বিক্রির জন্যও এই পাটি তৈরি করে ৫ থেকে ৬ হাত পাটি ৪০০-৪৫০ টাকায় বিক্রি করে।

মুর্শিদাবাদ জেলার রেজিনগরের গোবিন্দনগর, দাদপুর, মরাদিঘি, ডোমকলের সারাংপুর, হরিহরপাড়া গরিরপুরসহ জেলার গ্রামীণ এলাকায় বিস্তৃত জায়গায় এই শিল্পের দেখা পাওয়া যায়। এই শিল্পের কয়েকজন শিল্পীর সঙ্গে একান্ত আলাপচারিতায় এই শিল্পের বর্তমান অবস্থার কথা জানা যায়। শিল্পীরা হলেন আশিয়া বেওয়া, মারজুমা বিবি, দিলরুবা খাতুন, মানুয়ারা বেওয়া, ফরিতন বেওয়া, ফুনু বেওয়া, শরিফা বেওয়া, মহিমা বিবি, জাম্বিয়া বেওয়া। শিল্পীদের স্মৃতিচারণে উঠে আসে, আজ অনেকটা হারিয়েছে পাটি শিল্প। তবুও শীতল পাটির কদর আজও আছে। শুধু খেজুর নয়, নারকেলপাতারও পাটি বা আঞ্চলিক ভাষায় বিছান তৈরি হয়। তবে খেজুরের পাতার বিছান বেশি জনপ্রিয়, কারণ গরমের সময় অনেক বেশি শীতল আবহ তৈরি হয়। সে যাই হোক, এই সময়ে দাঁড়িয়ে পাটির অবস্থা খুব যে আশাব্যঞ্জক নয় সে কথা বলা যেতেই পারে।

গ্রামবাংলায় বহু লোকশিল্প রয়েছে, যেগুলি মূলত অর্থনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত। একটা সময় দেখা গিয়েছে, বাড়িতে তৈরি পাটির উপরে নানারকম আলপনা বা নকশা এঁকে একপ্রকার শৈল্পিক সিদ্ধিতে সেই পাটিকে বহু মানুষের কাছে দৃষ্টিনন্দন করা হয়েছে। কিন্তু এই কাজ করার সমস্যা হলো—

১. উন্নতমানের খেজুরপাতা পাওয়া যায় না।
২. যে শ্রম দিয়ে একটি পাটি তৈরি করা হয়, বিপণনের সময় তার আর্থিক মূল্য এত কম ঘোষিত হয় যে, এই শিল্পের সঙ্গে যুক্ত কর্মীরা নতুন করে এই শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখার কোনো অনুপ্রেরণা পায় না।
৩. বর্তমানে বিশ্বায়ন-প্রভাবিত বাজারে উন্নতমানের জিনিসপত্রের যোগান থাকায় মানুষ সস্তায় সেগুলি কিনতে পারে। ফলে শিল্পের এই প্রাথমিক উপকরণগুলি ধীরে ধীরে হারিয়ে যাচ্ছে।
৪. গ্রাম থেকে অধিকাংশ মানুষ শহরমুখী হওয়ার ফলে পাটি শিল্প এখন আর সচরাচর দেখা যায় না।
৫. যে বিপুল সময় একটি পাটি তৈরিতে নিয়োজিত হয়, সেই সময় এখন হাতে নেই বললেই চলে। ফলে সাধ করে কেউ আর পাটি তৈরি করে না খেয়ে দিনের পর দিন ধুঁকে মরার আয়োজনে নাম লেখাতে চায় না।

পর্ব : ৭

⊃ অঙ্কনকেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতি

❑ আলপনা

বঙ্গ সংস্কৃতির অঙ্গ 'আলপনা'

সৃজন দে সরকার

লোকসংস্কৃতির বিষয়গুলি প্রশ্নাতীতকাল আপনরীতিতে বহমান, যার একটি হলো আলপনা। যদিও সমগ্র বাংলাদেশে এটি 'আলপনা' নামে খ্যাত হলেও, ভারতের স্থানভেদে সামান্য চরিত্র পরিবর্তনে নামের পরিবর্তন লক্ষ করা যায়।[১] চমৎকারভাবে আলপনার সংজ্ঞা নির্দেশ করেছেন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'আলিপনা' প্রবন্ধে—

> আলিপনাগুলি তেমনই সহজে যে রেখা যেসব আঁকা-বাঁকা ছোট ছোট মেয়েদের হাতে আসে সেই দিয়ে নিজ হাতে লেখা মনের ইচ্ছা। অশিক্ষিত হাত ছাপ বলেই তা সুন্দর হলো, এই বলব। আলিপনাও তেমনি জ্যামিতিক ও নির্ভুল নক্সা হলে আর আলিপনা থাকে না।[২]

এই প্রসঙ্গে তিনি একটি ছড়া উদ্ধার করেছেন—

> ছেলে-ভুলানো ছড়া যেমন চাঁদ ধরা ফাঁদ
> ব্রতচারিণীর আলিপনার সেই শ্রী ও ছাঁদ।

তেমনই, 'ভারতকোষ'-এ মেলে সংক্ষিপ্ত সম্পূর্ণ ধারণাটি—"ঘরের মেঝে, দেওয়াল বা উঠোনে পিটুলির সাহায্যে সম্পাদিত মাঙ্গলিক অঙ্কন।"[৩]

নিয়ম অনুসারে, ব্রতপালনের আগেরদিন বা সেদিন উপোস থেকে স্নান বা হাত-মুখ পরিষ্কার করে ভোগ বা নৈবেদ্য সাজিয়ে আলপনা দিয়ে সে সব নিবেদিত করা হয়, শেষে প্রচলিত ব্রতকথাটি নিজে বলে বা বড়দের মুখে শুনে তার সমাপ্তি ঘটে। আলপনার সমস্ত বিষয়টিই গৃহস্থালির শিল্পকর্ম বা Domestic Art এবং মেয়েলি বা Feminine Art যার সম্পর্কে তপনমোহন চট্টোপাধ্যায় বলেছেন—

> All these designs had their birth in Woman's imagination, there have never been models or implements to help in tracing or painting them.[৪]

ব্রতর সঙ্গে সম্পর্কিত 'আলপনা'-র বিষয়টি। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'বাংলার ব্রত'তে প্রাথমিকভাবে এই ধারণা প্রকাশ করেন। 'ব্রত' শব্দটির উল্লেখ মেলে ঋগ্বেদের অনেকগুলি সূত্রে (২, ৩, ৮, ৩৮ ইত্যাদি)।[৫] তেমনি, পৌরাণিক দেবদেবীর পুজোয় 'আলপনা'র ব্যবহার মিলেছে, যদিও সেগুলিকে মাঙ্গালিক চিহ্ন ছাড়া সরাসরি ব্যবহারিক প্রয়োগে দেখা যায়নি।

কিন্তু, বাংলার 'আলপনা' সে চরিত্র হতে স্বতন্ত্র। আমরা 'আলপনা'-র একটি সম্পূর্ণ ছকের দ্বারা তা পরিস্কার করতে পারি—

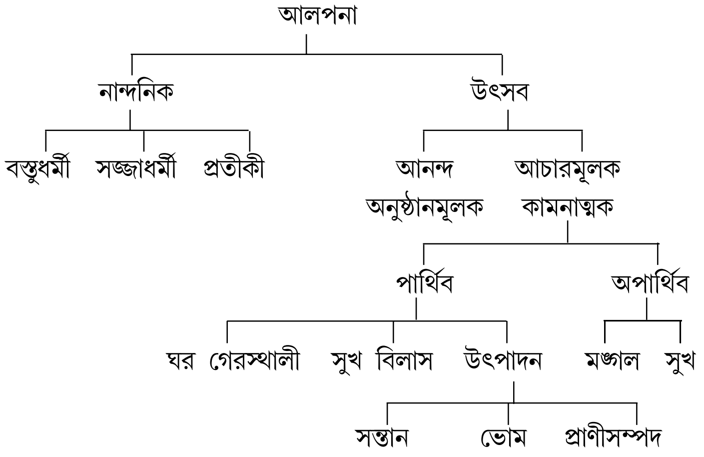

'আলপনা'-র শাখাগুলির রূপরেখাটি পরবর্তী আলোচনায় সহায়ক হবে।[৬]

'আলপনা' শব্দটির উৎস কিন্তু লোকায়ত নয় বা প্রাকৃত ভাষা হতে আগত নয়—তা সংস্কৃত হতে। সংস্কৃত 'আলিম্পন' থেকে তদ্ভবীকরণ করে আ-লিপ্-লুট পৃষোদবাদিত্বাৎ লুম হয়ে বাংলা 'আলপনা' হয়েছে। এর মূল অর্থ 'দেবস্থান লেপন বা চিত্রীকরণ'। ব্রজবুলিতে 'আলিপন' শব্দটি বিদ্যাপতি তাঁর পদেও উল্লেখ করেছেন—

আলিপন দেয়ব মোতিম হার।
মঙ্গল কলস করব কুচভার।।

তবে, 'আলপনা'-র প্রাক-ইতিহাস তাত্ত্বিকদের মতে প্রস্তরযুগ কিংবা তাম্রযুগ ও কৃষিসভ্যতার বিকাশের সূত্র জড়িত। দেবতার ধারণা 'সর্বপ্রাণবাদী' (Animism) ছিল। মানুষ যেকোনো প্রাণী, উদ্ভিদ, প্রস্তরখণ্ড, নদী, আবহাওয়ার বৈশিষ্ট্যসহ মনুষ্য-নির্মিত বস্তুকে প্রাণবন্ত (Animated) বলে মনে করত। সাংস্কৃতিক নৃতত্ত্বের প্রবক্তা এডওয়ার্ড বার্নেট টেলর এটিকে 'one of anthropology's earliest concepts, if not the first' বলেছেন। তাঁর গ্রন্থে[৭] তিনি মানা বা ম্যানা (MANA) নামে এক দৈবশক্তির কথা বলেছেন। যা মানুষ তাদের জীবনধারণের জন্য এক কল্পিত ব্যক্তি হিসেবে এক অদৃশ্য শক্তিতে বিশ্বাস করতেন। মাউরি মার্সডেন এ সম্পর্কে বলেছেন—

> Spiritual power and authority as opposed to the purely psychic and natural force.[৮]

এই মানাকে তুষ্ট করতে নানা জাদুবিদ্যার প্রয়োগ করা হতো। তার একটি চিত্রাঙ্কন—যার অঙ্গ হলো সাঙ্কেতিক চিহ্ন, রেখাঙ্কন, প্রতীকের ব্যবহার। মানুষের কল্পনাশক্তি বৃদ্ধির সঙ্গেই তাতে নান্দনিকতা যুক্ত হয়েছে। সেই কারণে মাধুরী সরকার জানিয়েছেন—"আলপনা শিল্প যুগ যুগ ধরে তার অঙ্গে বহন করে চলেছে আদিম শিকারকেন্দ্রিক অর্থনৈতিক সংস্কারগুলিকে।"[৯]

বিষয়টি হলো, নরম কাদামাটির ওপর দিয়ে কোনও পাখি বা প্রাণির পায়ের ছাপ দেখে তার সন্ধানে গিয়ে শিকার পাওয়া, কোনও একটি পশুর ছবি এঁকে তাকে একটি দাগ টেনে হত্যা করে তেমন পশু শিকারের আশা, পুকুর ভরা মাছের ছবি এঁকে তার আশা কিংবা ধানের ছড়া এঁকে ধান ফলনের আশা, কৃষকবন্ধু সাপ ও পেঁচার চিত্র, কুণ্ডলীকৃত বিষয় এঁকে সরীসৃপ বা প্রাণীর কুণ্ডলীকৃত হয়ে থাকা সঙ্গে তার ডিমের সন্ধান উপরি পাওনা, সরীসৃপের চলা-ফেরার দাগ অবলম্বন করে তার শিকার থেকে নানা সর্পিল লতার নকশা ইত্যাদি। তবে, তৎকালীন কৃষি-সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে 'আলপনা'-র সম্পর্কে পল্লব সেনগুপ্তর মত—

> আদিম মানুষের চিত্রকলায় অবলীণ তাৎপর্যটি ছিল জীবন ও জীবিকার জন্য কিছু অর্জন করা; পরবর্তীকালে আলপনার যে ব্যবহারিক অভিপ্রকাশ ঘটেছে, তার উৎস অবশ্য শিকার এবং সংগ্রহভিত্তিক আদিম অর্থনীতি নয়, বরঞ্চ কৃষি-নির্ভর সমাজের পরিমণ্ডল।[১০]

অতএব, আলপনার পিছনে যে দীর্ঘ ঐতিহ্য তার রূপরেখা মিলল। আর এরসঙ্গে মেয়েলি বিষয় ও ব্রতকথার সংযোগে এর প্রাচীনতার ক্ষেত্রটিও প্রকাশিত হলো। যেখানে মেয়েলি মানসিক কামনা-বাসনা পূরণের আশাই মূলত চরিতার্থ হয়। নিজ পরিবার বা সমাজকে ঘিরেই যা আবর্তিত হয়। যা কখনও নিজের, কখনও নিজ পরিবার, স্বামী, পুত্র বা কন্যা, কখনও বা ভাবী স্বামীকুল, পূর্বপুরুষদের জন্যেও নানা বিষয় প্রার্থিত হয়। ইন্দিরা দেবীচৌধুরানী এজন্যেই বলেছেন—"যেমন আলপনার অভিব্যক্তি, তেমনই তার ওপর কালে কালে মতামতের অভিব্যক্তিও দেখা গেল।"[১১]

বিষয় হিসেবে আলপনাতে যেগুলি উঠে আসে তা পরিবেশ প্রকৃতির অংশ, যার কারণটি আগে বলা হয়েছে। যেখানে সুধাংশুকুমার রায়ের অনুসরণে নির্দিষ্ট কিছু বিষয়ের (সুধাংশুবাবু যাকে 'ঠাঁট' বা 'ভঙ্গী' বলেছেন, গ্রাম্য মেয়েরা আলপনার বিষয়গুলিকেও 'ঠাঁট' বলেন) উল্লেখ করা যায়।[১২] সেগুলি হলো—পাখি (পেঁচা, সুবচনীর হাঁস, জোড়া পাখী, এক মুখে তিন পাখী), জীব-জন্তু (হাতি, ঘোড়া, গরু, মহিষ, কুমীর, কচ্ছপ, মাছ, সাপ), মানুষ (পুরুষ, মেয়ে, শিশু, সিপাহী, কোলে পো, কাঁখে পো), গাছ-লতা-পাতা-ফুল (সুপুরি, গুয়া, নারকেল, বট, তাল, সীজ, তুলসী, ধানের ছড়া, কাঁটা গাছ, কলমিলতা, শঙ্খলতা, খুন্তিলতা, লতা, সোনা ধানের শীষ, বাঁকা ধানের শীষ), উদ্ভট জীব, গ্রহ-নক্ষত্র (ত্রিকোণ পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য, ধরিত্রীদেবী, তারা), নিত্যব্যবহৃত বস্তু (পানের বাটা, কৌটো, কোশা-কুশী, ঘণ্টা, কুলো, চামর, কাজল-লতা, ধানের গোলা, আয়না, চিরুনি, নানা অলঙ্কার), ঘটনা বা দৃশ্য (হাট-বাজার, মন্দির, মঠ, পাল্কি-বেহারা, রান্নাঘর, ঢেঁকীঘর, ধানের গোলা, গঙ্গা যমুনা নদী, দালান বাড়ি)। এছাড়াও দেখা মেলে পদচিহ্ন, কৃষিকেন্দ্রিক বিষয় (লাঙ্গল, ধানের শীষ, ধানের গোলা, ঢেঁকী, ধান ভরা গোলা, ধানভরা লক্ষ্মীর ঝাঁপি), আসন বা পিঁড়ি চিত্র ইত্যাদি।

ভারতীয় চিত্রকলার প্রসঙ্গে এনাক্ষী ভাবনানী তাঁর Floor Decorations অংশে আলপনার কথায় বলেছেন—

> This form of decoration done by women is very old and closely bound up with ceremonial and special significance, such as occasions when requests are made for rain, prayers for successful harvests and thanksgiving, birthdays and weddings, prayers for the welfare of the family and community and for celebration and festival time generally.[১৩]

বৃহৎ অর্থে আলপনার ক্ষেত্রটি বোঝা গেল। তবে, আমরা বাংলার ১০টি নির্বাচিত ব্রত ও তার আলপনার বিষয়টি নিচে সারণিতে উল্লেখ করতে পারি—

ব্রতর নাম	**পালনের মাস**	**ব্রতর উপাচার**	**ব্রত পালন পদ্ধতি**	**আলপনার বিষয়**	**ফলাফল ও বৈশিষ্ট্য**	**চিত্র সংখ্যা**
পৃথিবী ব্রত	চৈত্র সংক্রান্তি থেকে বৈশাখ সংক্রান্তি	মধু, শাঁখ, দুধ, ঘি	শঙ্খের মধ্যে ঘি, দুধ, মধু দিয়ে ৩ বার ব্রতকথা বলে সেই মিশ্রণ আলপনায় ঢেলে দিতে হয়	পদ্মপাতা আঁকতে হয়, পানপাতা এঁকে তাতে পৃথিবী ও ধরিত্রী দেবী আঁকতে হয়	কুমারী মেয়েরা করে/ ৪বছর পালনের নিয়ম/ সমৃদ্ধি প্রার্থনা/ পৃথিবী, জল, বায়ু, অগ্নি ও আকাশ-পঞ্চতত্ত্বকে তুষ্ট	১
পুণ্যিপুকুর ব্রত	চৈত্র সংক্রান্তি থেকে সারা বৈশাখ মাস	সাদা ফুল, দূর্বা, চন্দন, এক ঘটি জল	উঠানে পুকুর কেটে, ঘাটের চারদিকে কড়ি দিয়ে সাজিয়ে পুকুরে বেল বা তুলসীর ডাল পুঁতে তাতে ৩ বার মন্ত্র পরে জল ঢালতে হয়	পান, সুপারি, কড়ি, পুকুর আঁকতে হয়	কুমারী ও সাধ্বী মেয়েরা করে/ ৪ বছর করতে হয়/ স্বামী ও পুত্রের কল্যাণ/ জল সংরক্ষণ, বৃক্ষ পুজোর সূত্র	২
দশপুতুল ব্রত	চৈত্র সংক্রান্তি থেকে বৈশাখ সংক্রান্তি	ফুল, তুলসী, দূর্বা	একটি করে মন্ত্র বলে প্রতিটি পুতুল আঁকতে হয়, ১০টি পুতুল এঁকে মন্ত্র পরে তাতে ফুল, দূর্বা দিতে হয়	চারিদিকে পদ্ম, মাঝে বড়ো একটি পদ্ম তারই চারপাশে দশটি পুতুল আঁকা	কুমারী মেয়েরা পালন করে/ ৪ বছর পালন করতে হয়/ নিজেদের মনস্কামনা পূর্ণের আশা	৩
সুবচনী ব্রত	নির্দিষ্ট সময় নেই, শনি ও মঙ্গলবার পালিত হয়	কলার কাঁদি, চাল, ঘট, খই, তামাক, নাড়ু, আমডাল, পান-সুপুরি, তিল, তেল, সিঁদুর।	চারদিকে ৪টে কলাগাছ, গোঁড়ায় ৪জোড়া হাঁস এঁকে জলভরা ঘট আমপল্লব দিয়ে বসিয়ে লাল	৪ জোড়া সুবচনীর হাঁস, ঘট, শঙ্খ, আসন, পান-সুপুরি, চিরুনি, আয়না, পদ্ম, ফুল আঁকতে হয়	নববিবাহিত বরবধূর কল্যাণে/ এয়োতীরা পান, কলা, তিলের নাড়ু, সিঁদুর ছেলে বউয়ের	৪

ব্রতর নাম	পালনের মাস	ব্রতর উপাচার	ব্রত পালন পদ্ধতি	আলপনার বিষয়	ফলাফল ও বৈশিষ্ট্য	চিত্র সংখ্যা
			সালুতে ঢাকা দিতে হয়, সামনে গর্ত খুঁড়তে হয় গর্তে দুধ দিয়ে শঙ্খ বাজিয়ে শেষ করে ব্রতকথা শোনে		মাথায় দেবে	
মনসা ব্রত	শ্রাবণ ও ভাদ্র মাসে অরন্ধন পালন, এছাড়া শনি ও মঙ্গলবার	মনসা/সীজ/সুহী গাছ, ৮টি নৈবেদ্য, কলা, দুধ	অরন্ধন উৎসবে আগের দিন রান্না করে রাখা হয়, পরেরদিন আলপনা দিয়ে মনসা গাছের সামনে উৎসর্গ করে দুধ-কলা গাছের নিচে দিয়ে বাকি বাসি রান্না খাওয়া	৮টি সাপ, পদ্ম, গয়না- কান পাশা, বালা, বাজু, গলার হার, পায়ের জোর, চিরুনি, আসন	সাপের কামড়ের থেকে রক্ষা পেতে	৫
লক্ষ্মী ব্রত	প্রতি বৃহস্পতিবার ও ভাদ্র, আশ্বিন, কার্তিক, পৌষ, চৈত্র	ধূপ, দীপ, ফুল, নারকেল, তালের ফোফরা, চন্দন, নৈবেদ্য, ফল, মিষ্টান্ন	উপোস থেকে স্নান করে ভোগ বা নৈবেদ্য সাজিয়ে আলপনা দিয়ে পূজা দেয়, শেষে ব্রতকথাটি নিজে বলে বা মুখে শুনে শেষ করে	ওপরে লক্ষ্মী-নারায়ণ, গরুড় ও প্যাঁচা পাশে, ধানভরা কুলো, গয়না তাতে বাজুবন্ধ, বালা, পদ্ম, সিঁদুরকৌট, পদচিহ্ন, ফুল, লতার নকশা	কুমারী ও সাধ্বী মেয়েরা পালন করে/ গৃহের সবকিছুর মঙ্গল কামনাতে পালন	৬
যমপুকুর ব্রত	আশ্বিন সংক্রান্তি থেকে কার্তিক সংক্রান্তি	মানকচু, কলা, হলুদ, কলমি, শুষনী, হিংচে, ধানের চারা	উঠানে পুকুর কেটে জলে সব শাক পুঁতে চারকোণায় ৪টে কড়ি, ৪টে হলুদ,	ত্রিকোণ পৃথিবী, পাখি, কচ্ছপ, একমুখে তিনটে মাছ, কুলো/ পুতুল- দক্ষিণে	৪বছর পালন/ পিতৃকুল, ভাবী স্বামীকুলের মঙ্গল কামনা/	৭

ব্রতর নাম	পালনের মাস	ব্রতর উপাচার	ব্রত পালন পদ্ধতি	আলপনার বিষয়	ফলাফল ও বৈশিষ্ট্য	চিত্র সংখ্যা
			৪টে সুপারি, পুতুল বসানো হয় তাতে মন্ত্র পরে ফুল দেয়	যম, যমী, যমের মামি, উত্তরে মেছো, মেছুনী, পশ্চিমে কাক, চিল, বক, কচ্ছপ, কুমীর, হাঙ্গর, পুবে ধোপা, ধোপানী	মৃত্যুর দেবতা যমকে তুষ্ট/ পরিবেশ ও জলসংরক্ষণের ধারণার সূত্র	
কার্তিক ব্রত	কার্তিক পূর্ণিমা থেকে রাস পূর্ণিমা	তুলসী, গোবর দলা, ধানের শীষ, আতপচাল, হরতকি, আমলকী, নারকেল, সুপুরি	তুলসীতলায় গোবরের পিণ্ড দিয়ে ধানের শীষ গুঁজে (শিব) পাশে মাটির পিণ্ডে (পাঁচজন দেবতা) শেষে সব ধুয়ে জল ঢেলে দেবে	পঞ্চগুড়ি (চাল, হলুদ, বেলপাতা, আমলকী, লাল মাটি, তুষ, পোড়া কয়লার গুড়ি) দুই আঙুলে নিয়ে ঝুর করে ফেলে মৌর্য আলপনা দেবে, পাখি, শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, জোড়া পা, সিপাহী, পুকুরের পাশে গৃহের নকশা	প্রতিদিন পুজো করতে হয়/ কুমারী ও সাধ্বী মহিলারা পালন করেন/ সুপুত্র ও সুপাত্র লাভের আশায়	৮
সেঁজুতি ব্রত	কার্তিক সংক্রান্তি থেকে অগ্রহায়ণ সংক্রান্তি	দূর্বা, মধু, চিনি, দই, জল, ঘি, চন্দন গোলা বাটি বা মধুপর্কের বাটি	শিবের চারদিকে ১৬টি ঘর, সেঁজুতির ৫২টি ঘর, প্রতিটির জন্য আলাদা মন্ত্র পরে দূর্বা দিতে হবে	চাঁদ, সূর্য, উনুন, ঢেঁকী, ত্রিভুজে গঙ্গা-যমুনা, দোলা, পাখি, কাজললতা, সাঁড়াশী, ইটের বাড়ি, পাহারা, তালগাছ, সুপুরিগাছ, পুতুল। এছাড়া	কুমারী মেয়েদের দ্বারা পালিত/ ৪বছর পালন করতে হয়/ তাদের সকল মনস্কামনা পূর্ণ হয়	৯

ব্রতর নাম	পালনের মাস	ব্রতর উপাচার	ব্রত পালন পদ্ধতি	আলপনার বিষয়	ফলাফল ও বৈশিষ্ট্য	
				সেঁজুতির আলাদা ৫২টি ঘর আঁকা		
বেলপুকুর ব্রত	কার্তিক সংক্রান্তি থেকে অগ্রহায়ণ সংক্রান্তি	বেলগাছের ডাল, ফুল, দূর্বা, একঘটি জল	উঠানে পুকুর করে তাতে বেলগাছের ডাল প্রতিদিন জল ঢালা, আলপনায় একবার করে মন্ত্র পরে দূর্বা দিতে হয়	বেলপুকুর, রান্না ঘর, গোয়ালঘর, কোলে পো কাঁখে পো, জোড়া পাখি, সতীনের ঘর, চন্দ্র-সূর্য, ঢেঁকী, ত্রিকোণ পৃথিবী	কুমারী মেয়েদের দ্বারা পালিত/ সুখ ও সমৃদ্ধির কামনায়	১০

'পিটুলি' (যা দিয়ে আলপনা দেওয়া হয়, আতপ চালের গুঁড়ো বা শামুকের খোল পুড়িয়ে যে সাদা চুন পাওয়া যায় তাকে বলে পিটুলি) অথবা খড়িমাটি, চুন, জিঙ্ক অক্সাইড এমনকি একালে প্লাস্টিক পেইন্ট দিয়ে যে আলপনা দেওয়া হয়ে থাকে তার বৈশিষ্ট্য ও তার সংশ্লিষ্ট প্রচলিত ব্রতকথার বিবরণ প্রদর্শনে দু'টি বিষয়ের অঙ্গাঙ্গী সম্পর্কসূত্রটি বোঝা গেল। সেক্ষেত্রে, বয়স অনুসারে ১৪ কিংবা স্থানভেদে ও ধর্মীয় প্রস্থানভেদে আলপনা প্রদানের পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। যদিও, তার মূল রূপটি সমগ্র বাংলাদেশে প্রায় সমধর্মী। সে প্রসঙ্গে গুরুসদয় দত্ত বলেছেন—

> বাঙ্গালী জাতি যে রসকলা-ক্ষেত্রে পারদর্শিতায় পৃথিবীর মধ্যে একটি অসাধারণ প্রতিভাবিশিষ্ট জাতি, বাংলার মেয়েদের এই আলিম্পনা অঙ্কন করিবার বহুব্যাপক স্বভাবজাত শক্তি তাহার একটি প্রমাণ স্বরূপ।[১৫]

এই কথার সূত্রেই বলা যায়, বাংলার লোকসংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ আলপনা বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে অনেকটাই ম্লান হয়েছে। পুজোর আগে বাজারে এখন প্লাস্টিকের পাতায় 'আলপনা'রূপী বাহারি নকশা সুলভে বিক্রি হয়। তাতে রঙের বিপ্লব আছে, কিন্তু মাধুর্য নেই! প্রাণ নেই! তবুও, বাংলা তথা সমগ্র বিশ্বের পরিপ্রেক্ষিতে 'আলপনা'র মতো বিষয় জড়িয়ে আছে আদিম জনজীবনের প্রবহমান ঐতিহ্যের সঙ্গে। বলা বাহুল্য, নারীর হৃদয়ের কামনা-বাসনা ও তাঁর একান্ত নিজস্ব প্রার্থনার অংশ ব্রতাচার ও আলপনার কোনওরূপ পৌরাণিক-ধর্মীয় কিংবা জাতিভিত্তিক বেড়াজাল কখনই আসেনি। সেজন্যই তপনমোহন চট্টোপাধ্যায় তাঁর গ্রন্থের ইতি টেনেছেন—

> In far-off villages of Bengal, remote from modern civilization, these Alponas live and glow a new in the heart of Bengali girls.[১৬]

সমগ্র আলোচনা সেই নারী মনের সামান্য প্রার্থনা নিয়ে বপন করা এমন অসামান্য শিল্পকর্মের

কুঁড়ি মাত্র। যেখানে আজও লুকিয়ে আছে ঐতিহাসিক যুগের মানবসভ্যতার শিকারি কিংবা পরবর্তীর কৃষিজীবী মানুষের মানসিকতা। সবশেষে বলা যায়, আলপনাকে শুধু ব্রতের পালিত বাহ্যিক উপাচাররূপে না দেখে বরং বিশ্বজনীন প্রাচীন শিল্পকর্মের অনুসৃষ্টি হিসেবে দেখা উচিত। তবে এই অন্তরের দেখার সৌরভটি একান্তই নিজস্ব অনুভবের।

তথ্যের সন্ধানে

১. রবি বিশ্বাস : 'লক্ষ্মীর পা' চর্যাপদ, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৪
২. তদেব : জানুয়ারি ২০১৪ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আলিপনা, বিশ্বভারতী পত্রিকা, চতুর্থ বর্ষ ১৩৫২
৩. তপনমোহন চট্টোপাধ্যায় : 'আলপনা', ভারতকোষ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা, শ্রাবণ ১৪২৪
৪. Tapan Mohon Chatterji : 'Alpona' Orient Longmans LTD. Calcutta, 1948
৫. দিলীপকুমার নন্দী : 'মেয়েলি ব্রত প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ' সনৎকুমার মিত্র সম্পাদিত মেয়েলি ব্রত বিষয়ে, লোকসংস্কৃতি গবেষণা পরিষদ, কলকাতা, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৫
৬. প্রদ্যোত ঘোষ : আলপনা এবং মনাঞ্জলি বন্দ্যোপাধ্যায় ও কল্যাণ চক্রবর্তী, আলপনার জৈববৈচিত্র্য, সনৎকুমার মিত্র সম্পাদিত, লোকসংস্কৃতি গবেষণা (পত্রিকা), লোকসংস্কৃতি গবেষণা পরিষদ, কলকাতা, বৈশাখ-আষাঢ় ১৪১২
৭. Edward Burnett Taylor : Primitive Culture, Researches into the development of Mythology, Philosophy, Religion, Art and Customs 2 Vols. : Cambridge University Press, Cambridge, 2010
৮. Maori Marsden, God, Man and the Universe, Ed. Micheal King, Te Ao HuriHurri : The World Movesà HicksSmith, Wellington, 1975
৯. মাধুরী সরকার : 'ব্রত : সমাজ ও সংস্কৃতি', পুস্তকবিপণি, কলকাতা, সেপ্টেম্বর ২০১৯
১০. পল্লব সেনগুপ্ত : 'আলপনার ইতিহাস', তদেব, বৈশাখ-আষাঢ় ১৪১২
১১. ইন্দিরা দেবীচৌধুরানী : 'আলপনা (মেয়েলি ব্রতের), তদেব, বৈশাখ-আষাঢ় ১৪১২
১২. সুধাংশুকুমার রায় : 'বাংলার আলপনা', তদেব, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৫
১৩. Enakshi Bhavnani : Decorative Designs and Craftsmanship of India, D.B Taraporevala sons & Co. PVT LTD, Bombay-01, 1974
১৪. তদেব : জানুয়ারি ২০১৪
১৫. গুরুসদয় দত্ত : 'বাঙলার মেয়েদের আলপনা', তদেব, বৈশাখ-আষাঢ় ১৪১২
১৬. ibid : 1948

*এছাড়া, সারণী নির্মাণের জন্য সাহায্য নেওয়া হয়েছে কালীকিশোর বিদ্যাবিনোদ/ বৃহৎ বারোমেসে মেয়েদের ব্রতকথা/ অক্ষয় লাইব্রেরী, কলকাতা-০৯/ ১৪০৮ এবং মাধুরী সরকার/ ব্রত : সমাজ ও সংস্কৃতি/পুস্তকবিপণি, কলকাতা-০৯/ সেপ্টেম্বর ২০১৯-এর গ্রন্থ থেকে।

*কৃতজ্ঞতা স্বীকার- ড. মাধুরী সরকার, গোপী দে সরকার ও বিধান বিশ্বাস।